প্রবন্ধ সমগ্র

অন্নদাশঙ্কর রায়

তৃতীয় খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন ঃ প্রবীর সেন

মুদ্রণ ঃ চয়নিকা প্রেস

লেখকের আলোকচিত্র

রবি দত্ত

PRABANDHA SAMAGRA

A Collection of Essays by Annadasankar Ray

Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.

10, Shyamacharan Dey Street, Calcutta-73

ISBN : 81-7293-266-9

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ নিরালা প্রেস, ৪ কৈলাস
মুখার্জী লেন, কলিকাতা-৬ হইতে ধীরেন্দ্রনাথ বাগ কর্তৃক মুদ্রিত

প্রবন্ধ সমগ্র

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদনা

ধীমান দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

লেখকের ভূমিকা

তৃতীয় খণ্ডও কালানুক্রমিক হলো না। দ্বিতীয় খণ্ড ও তৃতীয় খণ্ড দুইই বিষয়ানুক্রমিক হলো। কতক বিষয় দ্বিতীয় খণ্ড থেকে এই খণ্ডের জন্য জমা ছিল।

সেই হিন্দু কলেজের আমল থেকে আমাদের মন ইংরেজি কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদি পড়ার ফলে পশ্চিমমুখো হয়ে গেছে। তাকে পূর্বমুখো করতে গিয়ে দেখা গেল সে পূর্বদিক বলতে বোঝে পূর্বকাল। তার মানে সে চলে যায় রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, ভবভূতির কালে। সেকালের সঙ্গে একালের যোগসূত্র হাজার বছর ধরে ছিন্নপ্রায়। অন্বয় রক্ষা করে সংস্কৃত সাহিত্য নয়, বাংলা সাহিত্য। সে সাহিত্য কিছুতেই ইংরেজির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। সে ঐশ্বর্যই তার নেই। কাজেই পূর্বমুখো মন তাতে তৃপ্ত হতে পারে না।

এই হলো আমাদের সমস্যা। আমাদের এমন কিছু সৃষ্টি করতে হবে যা পূর্বকালমুখো হবে না, অতীতের পুনরাবৃত্তি হবে না, নতুন যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলবে। সে যুগ পশ্চিম দেশেই আরম্ভ হয়ে গেছে। তাই পশ্চিম দিকে তাকাতে হবে। মুখ ফিরিয়ে রাখার মানে সেকেলে হয়ে যাওয়া। বাংলা সাহিত্য এখন আর সেকেলে নয়। একালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। ফলে আমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।

কিন্তু পিছুটানও আমাদের ছাড়েনি। আবার সেই রামরাজত্ব, সেই রামমন্দির, সেই বজরঙ্গ অর্থাৎ হনুমান দল, সেই পুরাণকে ইতিহাস মনে করা। ভারতীয়ত্ব আর হিন্দুত্ব যেন এক ও অভিন্ন।

হাজার বছর ধরে যা ঘটেছে তা একপ্রকার ত্রিবেণীসঙ্গম। বিস্তর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি, অথচ পারসিক সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। এখনও সে প্রভাব লুপ্ত হয়নি। কুমারখালির হাইস্কুলের কয়েকটি ছাত্রকে ফারসি পড়তে দেখে জানতে চাইলুম তারা সংস্কৃত না নিয়ে ফারসি নিয়েছে কেন। শুনলুম তিলি পরিবারের ছেলেরা ফারসি পড়াই পছন্দ করে। বাহিরি হাইস্কুলের ছাত্ররাও ফারসি পড়ছে শুনে জানতে চাই তার কারণ। শুনি আগুরি পরিবারের ছাত্ররাও ফারসি পছন্দ করে। অথচ ওরা সবাই হিন্দু।

তা হলে আশ্চর্য হব কেন যদি শুনি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে হিন্দুর ঘরের ছেলেমেয়েদের ভিড়। তারা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেনি, কিন্তু পাশ্চাত্য বা আধুনিক সংস্কৃতি বরণ করেছে। সংস্কৃতি হচ্ছে ধর্ম-নিরপেক্ষ। আমরা সংস্কৃতির দিক থেকে উদারচরিত। তাই বসুধা আমাদের কুটুম্ব। তাই আমাদের ভারতীয়ত্ব নিছক হিন্দুত্ব নয়। বরঞ্চ বিশ্বনাগরিক।

অন্নদাশঙ্কর রায়

সম্পাদকের ভূমিকা

প্রবন্ধ সমগ্রের তৃতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে লেখকের এই কটি গ্রন্থঃ আধুনিকতা, খোলা মন ও খোলা দরজা, প্রাণরক্ষার ও বংশরক্ষার অধিকার, শিক্ষার ভবিষ্যৎ, আর্ট। এর ফলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড মিলে অন্নদাশঙ্কর রায়ের দেশ, কাল ও সংস্কৃতিবিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থাদির বা দেশ কাল পাত্র প্রেক্ষাপটে রচিত প্রবন্ধসম্ভারের একটি বড় অংশ সম্পূর্ণ হলো। শুধু বাদ সংস্কৃতির বিবর্তন গ্রন্থটি।

এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলির নামকরণের মধ্য থেকেই কয়েকটি মূল্যবান মোটিফ বেরিয়ে আসে যা লেখকের প্রবন্ধসাহিত্য তথা সমগ্র সাহিত্যকর্ম এবং লেখকের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিশেষ ইঙ্গিতকারী ও দুটির ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। মোটিফগুলি হলো আধুনিকতা, ভবিষ্যৎ, বিবর্তন ; খোলা মন, খোলা দরজা ; অধিকার। এই মোটিফগুলি কয়েকটা ধারাবাহিকতা, সমন্বয় ও সম্পর্কও নির্দেশ করে। যেমন বিবর্তন→আধুনিকতা→ভবিষ্যৎ, খোলা মন তথা খোলা দরজা, সংকট বনাম ভবিষ্যৎ (দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত তিনটি গ্রন্থের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল সংকট—সাহিত্যে সংকট, সংহতির সংকট, শিক্ষার সংকট), ব্যক্তির অধিকার ও শিল্পীর স্বাধীনতা অথবা ব্যক্তির প্রাণরক্ষা, বংশরক্ষা ও শিল্পসৃষ্টির অধিকার (সৃষ্টিকর্মও এক ধরনের বংশরক্ষা, উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া)।

প্রবন্ধ সমগ্রের প্রথম দুটি খণ্ডে আমরা লেখকের প্রবন্ধসাহিত্য নিয়ে বেশ কিছুটা সামগ্রিক আলোচনা করেছি। এ-খণ্ডে আমরা একটু বিশেষীকৃত আলোচনায় যাব। পূর্ববর্তী আলোচনা যদি মূলত সংশ্লেষণাত্মক হয়ে থাকে তো এবারের আলোচনা হবে অনেকটাই বিশ্লেষণাত্মক।

বলেছিলাম, অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধসাহিত্য প্রসঙ্গে বার বার রাসেলের কথা আসে। আসে দায়িত্ববোধের প্রসঙ্গে, গদ্যাদর্শের প্রসঙ্গে, মনোবৃত্তির প্রসঙ্গে। অন্নদাশঙ্কর ইনটেলেকচুয়ালের কর্তব্য পালন করেন, দুঃসময়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর নীরবতার বিরুদ্ধে তিনি এক সক্রিয় প্রতিবাদ। যখন বাইরে সংকট বাড়ে, কালচক্রের ঘর্ষণ শোনা যায়, তখন তাঁকে দায়িত্বক্ষেপ করতেই হয়, লেখনিমুখে কিছু বলতেই হয়। সেই লিখন ছুটে যায় বাইরে, সংকট-স্থলে, মানুষে-মানুষে, ধর্মে-ধর্মে, মতবাদে-মতবাদে যেখানে জট সেইখানে। এক্ষেত্রে অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধসম্ভার অনেকটাই রাসেলের প্রবন্ধাবলীর সগোত্র। উভয়ের গদ্যের আদর্শও এক—সবচেয়ে কম কথায় সবচেয়ে বেশি ভাব সবচেয়ে সহজ ও সরস ভাবে প্রকাশ। অন্নদাশঙ্করের গদ্য নিশ্চয়ই বুদ্ধিজীবীর গদ্য কিন্তু মিস্টিক বুদ্ধিজীবীর, তিনি একই সঙ্গে বুদ্ধিজীবী ও মরমী, বিদেশে যার সুন্দর তুলনা রাসেল। উভয়ই মননশীল বিশ্বাসী, উভয়ের গদ্যই মনন-

শীল বিশ্বাসের রচনা। রাসেলের সঙ্গে অন্নদাশঙ্করের তৃতীয় মিল এই মননের সঙ্গে বিশ্বাসের মিলনে। রাসেল অবশ্য ঈশ্বর উপলব্ধির কথা তোলেননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মিস্টিসিজমের সঙ্গে যুক্তির সম্মেলন, যাকে তিনি লজিক্যাল মিস্টিসিজম বলেছেন ও যার মধ্যে তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মূলসূত্র দেখতে পেয়েছিলেন। অন্নদাশঙ্কর কিন্তু ঈশ্বর উপলব্ধির কথা তুলেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হয়তো মিস্টিসিজমের সঙ্গে মননপ্রকৃতির (বিচারকসুলভ মনোবৃত্তি, মার্জিত রুচি ও শান্ত অথচ শাণিত বুদ্ধির দীপ্তি) সমন্বয়—যার মধ্য দিয়ে তিনি ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের মূলসূত্রকে হয়তো দেখতে চান।

মনন ও বিশ্বাসের মিলনের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট যে মুক্ত জগতের দিকে তিনি আমাদের নিয়ে যান, সেই জগতের সততা, সৌন্দর্য ও প্রজ্ঞাকে আমরা শ্রদ্ধা না করে পারি না। যৌবনে যদি থাকত প্রজ্ঞা, বার্ধক্যে যদি থাকত কর্মক্ষমতা —ফরাসি প্রবচনের এই আক্ষেপ আজ অন্নদাশঙ্করে পরিপূরণ পেয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় আমরা বলেছিলাম, লেখক দেখিয়েছেন, রূপ রস গন্ধের জগৎ, ঘটনার পর ঘটনার জগৎ, তথ্যের ও যুক্তির জগৎ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ—এই বাইরের মহল ছাড়িয়ে আর্টের অন্দর মহলে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, চিরবসন্ত, নিত্যযৌবন। তা 'যে চায় সে পায়। আর যে পায় সে তার প্রাপ্তির সৌরভ বিতরণ করে।' আর্টিস্টের কাজ ওই।

অন্নদাশঙ্কর রায় একই সঙ্গে ইনটেলেকচুয়াল ও আর্টিস্ট। তাঁর কিছু প্রবন্ধ ইনটেলেকচুয়ালের কর্তব্যপালন তো আর কিছু প্রবন্ধ রসিকের প্রাপ্তির সৌরভ বিতরণ। এই প্রেক্ষাপটে এবার আমরা এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্য থেকে কয়েকটি প্রবন্ধকে নমুনা হিসেবে বেছে নিয়ে সেই প্রবন্ধগুলির দিকে দ্রুত কিন্তু পৃথক পৃথক দৃষ্টিনিক্ষেপ করে লেখকের মানসলোককে অনুধাবন করার ও ওই প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে পূর্বোক্ত মোটিফসমূহ কীভাবে কার্যকর তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

সংকলনের প্রথম গ্রন্থ 'আধুনিকতা'। লেখকের ভাষায়, বিশ্বসাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু হয় এক হিসাবে রেনেসাঁসের সময় থেকে। আর এক হিসাবে ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্‌কাল থেকে। রুশো, ভলতেয়ার ও গ্যেটে এই হিসাবে যুগপ্রবর্তক। এই বইয়ে প্রবন্ধ আছে গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীকে নিয়ে এবং বিভিন্ন সাহিত্যিক ও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে লেখকের উপলব্ধি বিষয়ে।

কবিগুরু গ্যেটে (১৯৪৯)—এই আলোচনাটিও পরবর্তী আলোচনা: গ্যেটে ও তাঁর দেশকাল এ বইটির মূল সুর নির্দেশ করেছে। সে সুর: আধুনিকতা। অন্নদাশঙ্কর অনেক থিম নিয়ে লিখেছেন: সত্যান্বেষণ, প্রেমান্বেষণ, সৌন্দর্যের অন্বেষণ, জাগরণ ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে প্রিয় থিম বোধহয় **Eternal Feminine,** পরমানারীর যে আইডিয়াটা পান তিনি গ্যেটে থেকে: **The Eternal-Womanly draws us above.** কাজী আবদুল ওদুদের বই: কবিগুরু গ্যেটে-কে উপলক্ষ করে লেখক গ্যেটে

বিষয়ে সার্বিক আলোচনা করেন। প্রেমানুভূতি যেমন গ্যেটের ছিল, তেমনি ছিল সত্যের জন্য জিজ্ঞাসাও। এক্ষেত্রেও রোমাণ্টিক ও ক্লাসিকের বিচিত্র মিশ্রণ। গ্যেটের সত্যান্বেষণ নিয়ে লেখক লিখছেন,

ঋষি, তব স্থির দৃষ্টি উদ্বেগ কাতর।
সত্যের গোধনগুলি আসে নাই ঘর ;
রজনী গভীরা হলো। ক্বচিৎ নিরাশ
হেরিতে লেগেছে যেন ঊষার আভাস।
অসমাপ্ত অন্বেষণ নিতে হবে তুলে
কাল প্রত্যূষেই। (—গ্যয়টে, শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪)

প্রমথ চৌধুরী, সবুজপত্র ও আমি (১৯৫২)—লেখক প্রমথ চৌধুরীর মন্ত্রশিষ্য, সবুজপত্রের দ্বারা প্রভাবিত। ওড়িয়ায় নতুনপন্থী সবুজদলের প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি একজন। সবুজপত্রের ভাবে ও ভাষায় যে নতুনত্ব, সবুজ-দলের দৃষ্টি ও আদর্শে সেই নতুনতা। লেখক বীরবলের প্রভাব কালক্রমে কাটিয়ে ওঠেন, শৈলীগত ভাবে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোবৃত্তিতে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব দূরপ্রসারী হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও আমরা (১৯৫১)—রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকাররূপে যা-কিছু পেয়েছি তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো তাঁর জীবন, তাঁর জীবনের দৃষ্টান্ত। প্রকৃতপক্ষে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর জীবন। বাঙালির কাছে তাঁর জীবন 'কেন বাঁচব' ও 'কেমনভাবে বাঁচব' এই জিজ্ঞাসার এক অপূর্ব উত্তর। রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর চেয়ে বড়, জীবনশিল্পী। জীবনকেই তিনি শিল্প করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পাওয়া এই উত্তরাধিকার অন্নদাশঙ্কর আবার আমাদের হস্তান্তর করে দিয়ে যান, একদিকে তাঁর জীবনও 'কেমনভাবে বাঁচব' এই জিজ্ঞাসার এক সুন্দর উত্তর, অন্যদিকে তিনি বাংলা রেনেসাঁসের শেষ মনীষী প্রতিভা।

উপলব্ধি (১৯৪৯, ১৯৫২)—প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় দেখিয়েছি, চিন্তা-শীল ব্যক্তির জীবনে একটা রূপান্তর বা সংক্রমণের কাল আসে। ভিন্ন অবস্থায় রূপে রীতিতে বিষয়ে বা সুরে সংক্রমণ বা পরিবৃত্তি। এই সময়টাকে বলে ট্র্যান্‌জিশনাল এজ। অন্নদাশঙ্করের জীবনে এই সময়টা এসেছিল ৪৭ বছর বয়সে। ওই সময়ের অব্যবহিত আগের ও পরের উপলব্ধি এবং তাঁর বিবর্তনের রূপরেখা হিসেবে এই প্রবন্ধটি অত্যন্ত মূল্যবান। লেখক নিজের জন্য যে এগারোটি কর্তব্যকর্ম ধার্য করেছেন, তার মধ্যে তৃতীয়, চতুর্থ ও একাদশ—এই তিনটি প্রতিজ্ঞা লেখকের ট্র্যান্‌জিশনের পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক।

'খোলা মন ও খোলা দরজা' লেখকের একটি প্রবন্ধের বা প্রবন্ধগ্রন্থের নাম শুধু নয়, লেখকের ব্যক্তিত্বেরও নির্দেশক। তাঁরও মন ও দরজা দুইই খোলা। তাঁর মানসিকতাকে সঠিক অনুধাবন করার ক্ষেত্রে খোলা মন ও খোলা দরজা এই দুটি মেট্যাফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যোগভ্রষ্ট —রচনাটি চীন-ভারত সম্পর্ক বিষয়ে। এখানে সম্পর্ক বলতে সমস্যা-সংঘাত-মিথষ্ক্রিয়া সমস্ত অর্থে। প্রবন্ধটি খাপখোলা তলোয়ারের মতো। শিল্পীর স্বাধীনতার নাম করে গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসানো নয়, সত্যিকার স্বাধীন শিল্পী বলতে কী বোঝায় তার এক অনবদ্য পরিচয় উত্থাপন।

খোলা মন ও খোলা দরজা —রচনাটি ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক বিষয়ে। প্রবন্ধটিতে লেখক বলেছিলেন, ভারত ও পাকিস্তান দু-দেশই যেন মন ও দরজা দুই-ই খোলা রাখে, যাতে মত বিনিময় হতে পারে, যাতায়াতও বন্ধ না হয়। লেখকের এই আশা তেমন পূর্ণ হয়নি। দুই দেশই বন্ধ মনের পরিচয় দিয়েছে এবং খোলা দরজার বদলে এখন কাঁটাতারের ওপার থেকে ঢল নেমেছে সন্ত্রাসবাদীদের।

কেন সেকুলার স্টেট—সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতা)-র সপক্ষে লেখক বার বার ও বরাবর বলে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর প্রগতিশীলতার কথাও উল্লেখ করার মতো। কেননা তাঁর মতে সেকুলার স্টেট-এর ভিত্তি বা বনিয়াদ হলো দুটি। এক. প্রজাশক্তির অভ্যুদয়, দুই. ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সব প্রজার সমান অধিকার।

যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা —আগের রচনার একটি স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় এক্সটেনশন এই রচনাটি। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র বা সংস্কৃতি নয়, কিন্তু ভারতের মতো বহু ভাষাভাষী দেশে ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতিকে অস্বীকার করা যাবে কী করে! তবে ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতির বিপদ সম্পর্কেও লেখক সচেতন করে দিয়েছেন। 'ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতি যদি অন্ধদের হাতে পড়ে তবে ধর্মান্ধরা যেমন দুই ভাগ করেছে ভাষান্ধরাও তেমনি বহুভাগ করবে।'

'প্রাণরক্ষার ও বংশরক্ষার অধিকার' ওই নামের একটি প্রবন্ধ-ভিত্তিক একখানা পুস্তিকা। মূল প্রবন্ধটির প্রথম অনুচ্ছেদ আরো অনেকের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়ে দৈনিক পত্রিকায় ছাপতে দেওয়া হয়েছিল। প্রবন্ধটি যে-সময়ে লেখা পশ্চিমবঙ্গে তখন নকশাল আন্দোলন তুঙ্গে। ওই পরিস্থিতিতে রচনাটির উদ্দেশ্য ছিল বিচারবিমুখদের বিচারে প্রবৃত্ত করা ও হিংসাব্রতীদের হিংসার থেকে নিবৃত্ত হতে বলা। লেখক বলছেন, মানবমাত্রেরই দুটি মৌল অধিকার আছে। একটা তার বাঁচবার অধিকার, অন্যটা তার বংশরক্ষার অধিকার। এই বংশরক্ষা শুধু কায়িক অর্থে নয়, মানসিক ও সাংস্কৃতিক অর্থেও। রবীন্দ্রনাথের বংশ রবীন্দ্ররচনাবলী তথা বিশ্বভারতী তথা অশেষ কীর্তি, মহাত্মার বংশ তাঁর গ্রন্থমালা তথা তাঁর আশ্রম তথা তাঁর অগণিত স্মৃতিচিহ্ন। এই সবই জীবিত থেকে তাঁদের জীবিত রাখবে, তাঁদের বাণীকে জীবিত রাখবে। যেমন সোভিয়েত রাশিয়ায় তলস্তয় বা চেখভকে রেখেছে। কবির ভাষায়, 'এক্ষণ বিপন্ন মনে অনিবার্যতায় তাই দিয়ে যেতে হয় উত্তরাধিকার'। এই উত্তরাধিকার চোখের মণির মতো রক্ষা করতে হবে উত্তরাধিকারীকে। শুধু বেঁচে থাকাই একটা প্রজন্মের পক্ষে যথেষ্ট নয়,

তাকে বাঁচাতেও হবে। কেননা যে বাঁচায় সে-ই বাঁচে।

উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে শিল্পীর উত্তরাধিকার, এবং মহাশিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায় কী উত্তরাধিকার দিয়ে যাচ্ছেন আমাদের, সেই কথা ওঠে। যে পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর 'আর্ট' গ্রন্থটির মূল্য ও ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

আর্ট গ্রন্থের অনেক প্রসঙ্গই প্রাথমিক ভাবে বিনুর বইয়ে আলোচিত হয়েছিল। যেমন বিনুর বইয়ে আর্ট ফর আর্টস্ সেক সম্পর্কে যে প্রাথমিক ইঙ্গিতটুকু ছিল আর্ট গ্রন্থে আর্টের খাতিরে আর্ট নামের প্রবন্ধটিতে সেই ইঙ্গিত প্রসঙ্গের বিস্তারিত রূপ লাভ করেছে। বিনুর বইয়ে রূপচর্চার কথা তোলা হয়েছিল, আর্টে রূপের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথম গ্রন্থের অন্তঃস্রোত দ্বিতীয় গ্রন্থে অন্তঃসার ও অন্তঃসৌন্দর্য রূপে বিবর্তনের পথে দু-ধাপ অগ্রগতি পেয়েছে। এইভাবে শিল্পীর প্রথমে দৃষ্টিলাভ ঘটে, তারপর অখণ্ডদর্শন হয়। জীবনকে দেখাতে হবে সরল দৃষ্টিতে নয়, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ; খণ্ডদৃষ্টিতে নয়, অখণ্ডদৃষ্টিতে ; অন্তরালে গিয়ে, গভীরে নেমে। 'অখণ্ড-দৃষ্টির জন্যে সকলের সাহায্য নিতে হবে। বিজ্ঞানের, ধর্মের, নীতির, দর্শনের। কিন্তু শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী যেন আচ্ছন্ন বা বিভক্ত না হয়।' কেননা শিল্পে কী-বলেছে ও কেমন-করে-বলেছের সঙ্গে কে-বলেছে তাও সমান জরুরি। আর এই সফল ত্রিবেণীসঙ্গমের সার্থক রচনাই সাহিত্যে অমূল্য বলে স্বীকৃত।

কী সাহিত্যে কী ললিতকলায় আর্ট হচ্ছে রসাত্মক রূপ বা রূপাত্মক রস। রস থেকে রূপে পৌঁছতে হলে কল্পনাকে করতে হয় পথপ্রদর্শিকা তারা। কল্পনা সত্যের অভাব নয়, সত্যের একত্ব বিধায়ক। সত্যকে আমরা অবিভাজ্য রূপে পাই যদি কল্পনার আশ্রয় নিই। প্রধানত অনুভূতি ও কল্পনা নিয়েই আর্টের আপনার সংসার। যুক্তি কিংবা নির্যুক্তি কোনোটাই সেখানে মুখ্য নয়। আর্টের অগ্রগতির পথে একদিকে 'সবকিছু নিয়েই আর্ট' এই যুক্তি আর্টকে টানছে তেমনি আরেক দিক থেকে টানছে এই যুক্তি যে 'কোনো কিছুকে নিয়ে আর্ট নয়, আর্ট তার আপনাকে নিয়ে'। একদিকে 'ইতি ইতি' করে পাওয়া। আরেক দিকে 'নেতি নেতি' করে পাওয়া।

এ সমস্ত হচ্ছে আর্টের প্রকৃতি বিষয়ে কথা। আর্টের উদ্দেশ্য বিষয়ে লেখক বলছেন, 'আর্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে লীলা। যে কোনো একটি খেলার মতো তার নিয়মকানুন খুব কড়া। সেসব মেনে না নিলে খেলা জমে না। কিন্তু খেলার শেষে বোঝা যায় তার সার্থকতা আছে। খেলোয়াড়রা খেলায় সুখ পান নিয়মকানুন মেনে ও তার ঊর্ধ্বে উঠে।' এই বইয়ের পূর্বে উল্লিখিত দুটি প্রবন্ধ নিয়ে পৃথক আলোচনা করা যাক।

অন্তঃসার ও অন্তঃসৌন্দর্য—প্রবন্ধ দুটিকে একসঙ্গে রাখা যায়। বাইরের রিয়ালিটি ছাড়িয়ে অন্তঃসারে পৌঁছতে হবে। আর্টের অন্তঃসার জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যে, জীবনের অন্তঃসৌন্দর্যে। অন্তরের

অন্তঃসার হয়েই তা আর্টের অন্তঃসার। অন্তঃসারের পরবর্তী পর্যায় অন্তঃ-সৌন্দর্য। 'সুন্দর ছেয়ে আছে সকল ভিতে / সুন্দর জেগে আছে সত্তা মূলে / বিশ্বের নির্যাস সুন্দর যে'...(শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃষ্ঠা ৮৪)। সেই দুর্লভ প্রজাপতিকে ধরতে ছুঁতে পাকড়াতে ও পিনবদ্ধ করতে লেখকের এগারো বছর গেছে। দুটি প্রবন্ধের মধ্যে একযুগের ব্যবধান।

আর্ট আর বিনুর বই দুটি গ্রন্থই লেখকের আত্মজীবনীমূলক তথা আত্মশিল্পমূলক রচনা। মন্ময় যে শিল্পিতা অমোঘ স্বরে বলে উঠতে পারে—

ধর্ম না যদি বাঁচতে শেখায়
তারে নিয়ে আমি করব কী, হায়!
জানিনাকো আমি কত দিন আছি
বাঁচতে শিখব যত দিন বাঁচি।
ধর্ম যদি-না বাঁচতে শেখায়
শিল্পের কাছে যাব পুনরায়।
দিবসরাত্রি সৃষ্টি যে করে
রসমাধুর্য বৃষ্টি যে করে
জীবন কি তার কখনো ফুরায়!
পেয়ালা যে তার ভরে পুনরায়।

তবে তাই হোক, আমার ধর্ম
সব ছেড়ে দিয়ে শিল্পকর্ম।
আমার মুক্তি নীরবে নিজনে
অপ্রতিমের প্রতিমা সৃজনে।
আমি ধ্যান করি পরম রূপের
বীভৎসতাও তাঁরই হেরফের।
তাঁকেই দেখেছি চোখ খোলা রেখে
তাঁকেই এঁকেছি হাতে কালি মেখে।
এ জীবনে তাঁরে দেখা আর আঁকা
এই তো মুক্তি। আর সব ফাঁকা।

এ-ই লেখকের জীবনধর্ম, জীবনশিল্পীর জীবনধর্ম এই। জীবন, শিল্প আর ধর্ম সবকিছুকে একসঙ্গে গেঁথে এক পরম নান্দনিক সমীকরণে পেঁীছে যান অন্নদাশঙ্কর।

সেই উত্তুঙ্গ শিখর থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পান বলেই তিনি দুর্মর-ভাবে আশাবাদী। ভবিষ্যৎ কাল সম্পর্কে আশাবাদী, দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী। নতুন সৃষ্টির ও দৃষ্টির বিপুল সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদী। শুধু শিক্ষার ভবিষ্যৎ নয়, অপসংস্কৃতির বিপুল আগ্রাসন সত্ত্বেও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আশাবাদী, সংহতির সংকটও শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে ওঠা যাবে এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে

পারে না। এই প্রত্যয় তাঁর আছে বলেই সাম্প্রদায়িকতার, অশিক্ষার, অপ-সংস্কৃতির, সংহতিহীনতার ঘনায়মান অন্ধকারে আজো তিনি আলোকস্তম্ভ। তাঁর আলো দেবার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

ধীমান দাশগুপ্ত

আধুনিকতা

কবিগুরু গ্যেটে

ফরাসী বিপ্লবের পরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে নব ভাবের নব উদ্যমের নব নব প্রত্যাশার সাড়া পড়ে যায়। সে যুগের সাহিত্যকে সাধারণত রোমান্টিক বলে বিশেষিত করা হয়। কিন্তু ভোর হবার আগে যেমন পাখি ডাকে তেমনি ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কাল হতেই কোনো কোনো দেশে রোমান্টিক সাহিত্যিকদের কলকূজন শুরু হয়ে যায়। জার্মানীতে এঁদের পরিচয় ঝড়ঝাপটা যুগের সাহিত্যিক বলে।

প্রথম যৌবনে 'তরুণ ভের্টরের দুঃখ' লিখে গ্যেটে যখন দেশবিদেশে রাতারাতি বিখ্যাত হন তখন জার্মানীর ঝড়ঝাপটা যুগের বাণীমূর্তি বলেই তাঁর নাম করত সকলে। ইতিমধ্যে ও অতঃপর তিনি যেসব নাটক লেখেন তাতে তাঁর এ নাম পাকা হয়। কিন্তু সাফল্যের শিখরে উঠতে না উঠতেই তিনি স্বেচ্ছায় ও পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর। তাঁর কাছে তাঁর পক্ষপাতী পাঠক ও সমধর্মা লেখকদের আশার অন্ত ছিল না। আশায় নিরাশ হয়ে তাঁরা তাঁকে ভুল বুঝলেন ও দোষ দিলেন।

ঝড়ঝাপটা যুগের সাহিত্যিকদের যিনি নেতা তিনি কি তবে তাঁর যুগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন? আপাতদৃষ্টিতে এ রকম মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কারণ তিনি গেলেন ভাইমার নামক একটি সামন্ত রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে। সেখানকার অভিজাত মহলে তাঁর অবারিত দ্বার। তাঁদের সঙ্গেই তাঁর লীলা-খেলা দহরম মহরম। লেখা তাঁর হাত দিয়ে বেরোয় না বড়ো-একটা। বেরোয় যদি তো আগের মতো নয়। ক্বচিৎ এক-আধটা নিখুঁত কবিতা ঝরে পড়ে। ছাব্বিশ থেকে আটত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত এই তাঁর দশা।

বাইরে থেকে যা মনে হয় আসলে কিন্তু তা নয়। ঝড়ঝাপটা যুগের সাহিত্যও তো রোমান্টিক সাহিত্য। রোমান্টিক সাহিত্য বলতে যাই বোঝাক না কেন ওর ভিতরে এমন কিছু ছিল যা পাঠকদের অশান্ত করে তুলত। লেখককেও। সেই অশান্তি যে কিসের জন্যে তা যখন বিশ্লেষণ করতে বসি তখন নেতি নেতি করতে করতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে কথার সঙ্গে কাজ চাই, নইলে কথা কেবল মুখের কথা। কাজ মানে বীরের মতো কাজ, বিদ্রোহ, বিপ্লব, সংঘাত, সংঘর্ষ। রোমান্টিক সাহিত্যের ভিতর য়্যাকশনের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। যার জীবনে য়্যাকশনের লেশমাত্র নেই সে রোমান্টিক সাহিত্যিক হয়ে দু'দিন বীরপূজা পাবে। তার পরে তার বিজয়া দশমী।

দশমীতে বিসর্জনের জন্য অপেক্ষা না করে নবমীতে অপসরণ শ্রেয়। গ্যেটে সময় থাকতে সরে দাঁড়ালেন। তার পরে কী করবেন তা ভেবে মনঃস্থির করতে তাঁর দশ বারো বছর লাগল। একই মানুষ কবি হবে, বীর হবে, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আছে কি না সন্দেহ। থাকলেও প্রথম শ্রেণীর নয়। রোমান্টিক কবিরা অধিকাংশ স্থলে নিবে যায়। যারা নিবতে চায় না তাদের বড়ো জ্বালার জীবন। তাদের বেলা দেখা যায়, হয় তারা কথার সঙ্গে

কাজের সঙ্গতি রাখতে গিয়ে কাজের লোক হয়ে উঠেছে, কাব্য ছেড়ে দিয়েছে, নয় তারা সুর বদলে দিয়েছে, রোমান্টিকের বদলে ক্লাসিক ধরেছে। ক্লাসিক সাহিত্যিকদের কাছে কেউ বিদ্রোহ বিগ্রহ আশা করে না। আশা করে প্রশান্ত উপভোগ বা রূপভোগ। যারা স্বভাবত ক্লাসিক তাদের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু যে বেচারা রোমান্টিক পন্থ ছেড়ে ক্লাসিক পন্থ ধরবে তার পক্ষে এ যেন মৃত্যু ও নব জন্মগ্রহণ। মাঝখানে দশ বারো বছর গর্ভযন্ত্রণা।

বয়স যখন আটত্রিশ গ্যেটে পালিয়ে যান ইটালী। সেখানে বছর দেড়েক থেকে পুরোদস্তুর ক্লাসিক দীক্ষা নেন। তার পরে যখন দেশে ফিরে আসেন তখন তাঁর মুখে অন্য সুর। তখন তিনি বাণীমূর্তি আর-এক যুগের। এ যুগ নয়া ক্লাসিক যুগ। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এর স্বতোবিরোধ ছিল। ঠিক সেই সময় শুরু হয় ফরাসী বিপ্লব। লোকে তখন ক্লাসিক চায় না। যার চাহিদা নেই তা লিখছেই বা ক'জন! একা গ্যেটে এক হাতে কতটুকু করবেন! 'এগমণ্ট', 'তাসো' প্রভৃতি কয়েকটি পরীক্ষার পর তিনি বিজ্ঞানে মন দিলেন ও বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ লিখে অন্য এক রাজ্যে জয়যাত্রা করলেন।

পরে শিলার তাঁর পরীক্ষার সাথী হন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন দুজনেই। গ্যেটের 'হেরমান ও ডরোথেয়া', শিলারের 'ভিলহেলম টেল' দুজনের দুই ক্লাসিক কীর্তি। কিন্তু ইউরোপের নানা দেশে তখন ফরাসী বিপ্লবের বান ডাকছে। বাইরের জগতে যখন ঝড়ঝাপটা চলছে মানসিক জগতে তখন শরতের প্রশান্তি কেমন করে স্থায়ী হবে! গ্যেটে ক্লাসিকের দীক্ষা নিয়েও রোমান্টিকের আবর্ত থেকে উদ্ধার পেলেন না। শিলারের মৃত্যুর পর একাকী বোধ করলেন! একক চেষ্টায় শেষ করলেন 'ফাউস্ট' প্রথম ভাগ। ভাবলেন ক্লাসিক সাধনার পরাকাষ্ঠা হলো। কিন্তু হলো রোমান্টিক সাধনার বিলম্বিত ও বিমিশ্র পরাকাষ্ঠা।

ইতিপূর্বেই তাঁর 'ভিলহেলম মাইস্টারের শিক্ষানবীশী' শেষ হয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও ক্লাসিক ও রোমান্টিকের বিচিত্র মিশ্রণ। প্রধানত এই দু'খানি মহাগ্রন্থের উপর তাঁর দেশকালোত্তর যশ নির্ভর করছে। এ ছাড়া তাঁর বিভিন্ন বয়সের অগ্নিগর্ভ প্রণয়কবিতার উপর। প্রেমের দহন তাঁকে সারাজীবন দগ্ধেছে। ঈশ্বর তাঁকে এমন করে সৃষ্টি করেছিলেন যে প্রেমের অনুভূতি তাঁকে বার বার আগুনে পুড়িয়ে সোনার মানুষ করেছিল। সোনা হয়ে তিনি যাই লিখলেন তাই সোনা হয়ে গেল। নারী তাঁকে কোনদিনই বিপথে নেয়নি। প্রতিবারেই নিয়ে গেছে ঊর্ধ্ব হতে আরো ঊর্ধ্বে। বিরাশি বছর বয়সে মৃত্যুর অল্প দিন পূর্বে যখন 'ফাউস্ট' দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত হয় তখন তার শেষ কথা হলো—

"The Eternal Womanly draws us above."

নারী সম্পর্কে দান্তের পরে এত বড়ো প্রশস্তি আর কেউ রচনা করেননি।

যুগের সঙ্গে যোগাযোগ সেই ছাব্বিশ বছর বয়সের পর থেকে বেতালা হয়েছিল বলে গ্যেটের কপালে ছিল নিরবচ্ছিন্ন ভুল বোঝা। ঊর্ধ্বচারী বলে

শ্রদ্ধা করত তাঁকে সকলে, এমন কি শত্রুরাও। কিন্তু ঠিক বুঝত না বেশী লোক। এখনো তাঁর প্রতি একটা বিমুখভাব রয়ে গেছে তাঁর দেশে ও বিদেশে। ঝড়ঝাপটার যুগ এখনো জগৎ জুড়ে চলছে। রোমাণ্টিক সাহিত্যই সাধারণের হৃদয় হরণ করে। কিন্তু যারা লেখে তারা বীর নয়, তাই নিজেরাও তৃপ্তি পায় না, অপরকেও দিতে পারে না। যেভাবে গ্যেটে তাঁর সমস্যার সমাধান করেছিলেন সেভাবে অর্থাৎ ক্লাসিক দীক্ষা নিয়ে সমাধান করতে পারছে ক'জন! সমাধানের জন্যে যাচ্ছে নিচে নেমে। করছে মনোরঞ্জন। সাহিত্য হয়ে উঠছে সিনেমার মতো এনটারটেনমেণ্ট। আর যারা ওভাবে সমাধান করতে অনিচ্ছুক তারা অন্য কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাদের মানসিক অস্বাস্থ্য তাদের দেহকে আক্রমণ করেছে। এমনি করেই তো মারা গেলেন শেলী কীটস্ বায়রন। কেউ জলে ডুবে, কেউ যক্ষ্মায়, কেউ যুদ্ধের নাম করে। যারা মরে না তারা পাগল হয়ে যায়।

এ সব কথা যদি মনে রাখি তা হলে বুঝতে পারি গ্যেটে কেন 'কবিগুরু'। কাজী আবদুল ওদুদ কেন তাঁর গ্রন্থের নাম রেখেছেন 'কবিগুরু গ্যেটে'। ইচ্ছা করলে তিনি বলতে পারতেন, 'মহাকবি গ্যেটে'। কিন্তু আজকের দিনের কবিদের কাছে মহাকবির চেয়ে কবিগুরুর তাৎপর্য বেশী। একালের কবিরা যদি বুঝতে চেষ্টা করেন তাঁকে তা হলে তাঁর আর কতটুকু লাভ হবে! লাভ হবে একালের কবিদের অনেক কিছু। তা বলে তাঁর অনুসরণ করা চলবে না। সম্ভব নয়ও। যুগের সঙ্গে তাল রাখার কাজে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। তাঁর ব্যর্থতা যেন কেউ নিজের ব্যর্থতার সমর্থনরূপে ব্যবহার না করেন।

কাজী সাহেবের এই গ্রন্থ কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, বোধ হয় ভারতীয় সাহিত্যে অপূর্ব। ইংরেজীতেও এমন জীবনীর সঙ্গে অনুবাদের সংযোজন বড়ো-একটা চোখে পড়ে না। গ্যেটের অনেকগুলি কবিতার তর্জমা আমি এই প্রথম পড়লুম, কেননা ইংরেজী তর্জমা কিনতে পাওয়া যায় না অনায়াসে। কাজী সাহেব স্বয়ং একজন প্রচ্ছন্ন কবি। সেইজন্যে তাঁর তর্জমা হয়েছে মৌলিকের মতো মধুর। তার উপর তিনি আজীবন গ্যেটেপন্থী। গ্যেটে তাঁর কাছে কেবল কবি নন, জীবনপথের দিশারী। গ্যেটের বহু অমূল্য বাণী তিনি একত্র গ্রথিত করেছেন। এটিও এ গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। যাঁরা যেমন তেমন করে বাঁচতে চান না, কেমন করে বাঁচব এ যাঁদের প্রশ্ন, সেইসব জীবন-জিজ্ঞাসুকে পড়তে হবে এ বই। নয় তো খুঁজতে হবে 'একারমানের সঙ্গে গ্যেটের কথোপকথন' নামক ইংরেজী বই।

কাজী সাহেব গ্যেটেগৃহিণী ক্রিস্টিয়ানাকে যথেষ্ট জায়গা দেননি বলে তাঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে। গৃহিণীকে পত্নীর মর্যাদা দিতে পনেরো বছর ধরে ইতস্তত করা কি উচিত হয়েছিল গ্যেটের, এ কথা এই দেড় শ বছর অনেকের মনে উদয় হয়েছে। এর একটা নিষ্পত্তি চাই। নইলে লোকে চিরকাল তাঁকে ভুল বুঝবে। জীবনশিল্পীদের জীবনের বড়ো বড়ো সিদ্ধান্তগুলো অকারণ নয়। কারণ আছে নিশ্চয়ই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট নয়। প্রথম

যৌবনে কবি যাঁকে ভালোবাসতেন তাঁর নাম ফ্রীডেরিকা। এঁর ভালোবাসাও তিনি পেয়েছিলেন। বিবাহের বয়স হয়েছিল, এমন কোনো বাধাবিঘ্ন ছিল না, সমান ঘর না হলেও যাজকের সম্মান সব দেশে। কেন তবে তিনি ব্যথা বুকে চেপে বিদায় নিলেন? কারণ খ্রীস্টীয় বিবাহে পাত্রপাত্রীকে অঙ্গীকার করতে হয়, সারাজীবন বিশ্বস্ত থাকব। গ্যেটের পক্ষে এরূপ অঙ্গীকার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হতো। হয়তো তিনি বিশ্বস্ত থাকতেন জীবনের অবশিষ্ট ষাট বছর। কিন্তু যদি না পারতেন তা হলে কী হতো? তা হলে হতো অসত্যাচরণ। অথবা আপনার প্রতি অবিচার। চোখ বুজে অত বড়ো একটা অঙ্গীকার করা উচিত হতো না। সেই জন্যে তিনি বিবাহের প্রস্তাব না করে প্রস্থান করলেন। কয়েক বছর পরে লিলির সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। এমন সময় তিনি চললেন সুইটজারল্যাণ্ড ও তার পরে ভাইমার। বাগ্‌দানের পরে লিলির পিতামাতার মত ছিল না বলে বাগ্‌দান ভঙ্গ করতেন কেন গ্যেটে? তা নয়। খ্রীস্টীয় বিবাহের ভিত্তিভূমি যে আজীবন বিশ্বস্ত থাকার অঙ্গীকার সেই অঙ্গীকারের দ্বারা তিনি নিজেকে বাঁধতে পারলেন না। এমন যে গ্যেটে তিনি ক্রিস্টিয়ানাকে খ্রীস্টীয় মতে বিবাহ করতেন কেমন করে? সিভিল ম্যারেজ তখনকার দিনে চলিত ছিল না। সম্পর্ক না পাতালেই পারতেন, কিন্তু ক্রিস্টিয়ানার দিক থেকে বিবাহের প্রত্যাশা ছিল না। তিনি জানতেন যে অভিজাতের সঙ্গে শ্রমিকের বিবাহ সেকালের সমাজ সহ্য করত না। যা হবার নয় তার চেয়ে যা হয়ে থাকে তাই ভালো। এই ভাবেই তাঁদের মিলন হয়। পরবর্তীকালে পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে গ্যেটে নিজের থেকেই ক্রিস্টিয়ানার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিধিবদ্ধ করে নেন। এবং রাজদরবারকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেন যে তাঁর পুত্র তাঁর আইনসংগত বংশধর। এর পরে তাঁর ছেলের বড়ো ঘরে বিয়ে হয়। অভিজাত সমাজ তাকে মেনে নেয়। প্রথম থেকেই গ্যেটে ক্রিস্টিয়ানার প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন। বিশ্বস্ত থাকতে তাঁর কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি। ক্রিস্টিয়ানাও ছিলেন অসাধারণ পতিগতপ্রাণা। সুতরাং তাঁদের সম্পর্ক বিধাতার চোখে বিবাহই ছিল, মানুষের চোখে যাই হোক না কেন। আর একটা কথা, গ্যেটে কোনো দিনই কোনো মানুষকে হীন জ্ঞান করেননি। কোনো শ্রেণীকেই তিনি নীচ শ্রেণী বলে ভাবতেন না। অভিজাত বলে তাঁর গর্ব ছিল না। তবে এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন তা ঠিক। কাজী সাহেবের গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করি।

> "নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে গ্যেটে চিরদিন মিশতেন, দয়াপরবশ হয়ে নয়, শ্রদ্ধার সঙ্গে। তাদের তিনি ভাবতেন, 'ভগবানের সৃষ্টিতে যেন সর্বশ্রেষ্ঠ—সংযম, সন্তোষ, ঋজুতা, বিশ্বাস, সামান্য সৌভাগ্যে উৎফুল্লতা, সরলতা, অনন্তকষ্টসহিষ্ণুতা, এই সমস্ত গুণ তাদের মধ্যে বর্তমান।' গ্যেটের পুত্রবধূ লুইসের কাছে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে অত বড়ো জ্ঞানী সামান্য লোকদের সঙ্গে যে কী করে প্রাণভরে আলাপ করতেন তা তাঁর ধারণার অতীত।" (১৫৭ পৃষ্ঠা)

গ্যেটের এই নিম্নশ্রেণীপ্রীতির সূচনা হয় বাল্যকালেই। তখন ভালোবাসতেন সত্যিকারের এক গ্রেট্‌খেনকে। সেই গ্রেট্‌খেনই বিবর্তিত হতে হতে হয়ে উঠল 'ফাউস্টে'র মার্গারেট বা গ্রেচেন। নিম্নশ্রেণীর এই বালিকাই জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটকের মহীয়সী নায়িকারূপে কবির পরিণত বয়সের অন্তিম প্রশস্তির অধিকারিণী হয়েছে চিরস্মরণীয় আর্ষ বাক্যে—

"The External Womanly draws us above."

(১৯৪৯)

গ্যেটে ও তাঁর দেশকাল

গ্যেটের বয়স যখন চল্লিশ তখন ইউরোপের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে—ফরাসী বিপ্লব। গ্যেটের ব্যক্তিগত জীবনেরও একটা অধ্যায় শেষ হয়ে যায়। এই ঘটনার জন্যে নয়, অথচ এর সঙ্গে একটা প্রচ্ছন্ন সম্বন্ধও ছিল। সমষ্টির জীবনের সঙ্গে ব্যক্তির জীবন নানা অদৃশ্য সূত্র দিয়ে বাঁধা।'

ইংরেজীতে একটা প্রবচন আছে, যে ঘটনা ঘটবে তার ছায়া পড়ে তার পূর্বে। ফরাসী বিপ্লবের ছায়া কেবল ফ্রান্সে নয়, ফ্রান্সের বাইরেও পড়েছিল বেশ কিছু কাল আগে। জার্মানীতে এই ছায়াপাতের যুগটাকে বলা হয় ঝড়-ঝাপটার যুগ। এর অগ্রণীদের মধ্যে ছিলেন গ্যেটে স্বয়ং। তাঁর বাইশ-তেইশ বছর বয়সে লেখা 'গ্যোটস্‌' নাটক ও তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সে লেখা 'ভের্টর' উপন্যাস জার্মানীতে যে ভাবাবেগের সূচনা করে তা কেবল জার্মানীতেই আবদ্ধ থাকে না। ইউরোপের সর্বত্র 'ভের্টর'-এর অনুবাদ হয়। তা পড়ে বহু যুবক আত্মহত্যা করে। তরুণের প্রাণে তখন এক অভূতপূর্ব অশান্তি। তার যেন কত কী করবার আছে, না করতে পারলে তার জীবন বৃথা, অথচ সময় অনুকূল নয়। সময়ের জন্যে সবুর করতে হবে। সবুর করতে করতে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ অতিবাহিত হবে। ততদিনে বল বয়স চলে যাবে। কে করবে সবুর!

গ্যেটে হয়তো এই জ্বালা থেকে মুক্ত হবার জন্যে আত্মহত্যা করতেন, কিন্তু তাঁকে উদ্ধার করল তাঁর ভাগ্য। ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি ভাইমারের সামন্তরাজার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন। রাজকার্যের দায়িত্ব তাঁর অশান্ত অন্তরকে প্রশান্তি দিতে না পারলেও নিত্য নতুন প্রয়াসে ব্যাপৃত রাখল। তাঁর প্রয়াসের বিষয় ছিল কৃষি ও খনি। অন্য কোনো ভাগ্যবান হলে অবিলম্বে বিবাহ করতেন। উপযুক্ত গৃহলক্ষ্মীর অভাব ছিল না। কবি কিন্তু সে দিকে উদাসীন। থাকতেন একটি ছোট বাগানবাড়িতে। ওটি যদি না পেতেন তা হলে মন্ত্রীপদ স্বীকার করতেন না, ভাইমার থেকে চলে যেতেন। ঐ তপোবনে তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিল তাঁর মালী ও একমাত্র সঙ্গিনী ছিলেন বিশ্বপ্রকৃতি। সঙ্গিনীর সঙ্গে আলাপের ভাষা হলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞান তাঁকে তন্ময় করে রাখল।

এইভাবে কেটে গেল দশ-এগারো বছর। বিপ্লবের ছায়া পড়ছে দেশে বিদেশে। ঝড়ঝাপটার যুগ সমানে চলেছে। লোকে আশা করছে গ্যেটে থাকবেন যুগের পুরোভাগে। তিনি কিন্তু ধীরে ধীরে পেছিয়ে পড়লেন। তেমন লেখা আর তাঁর হাত দিয়ে বেরোয় না। দিন দিন তিনি নিজেকে সংযত ও অনাসক্ত করতে লাগলেন। অথচ সন্ন্যাসীর মতো নয়। ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস ছিল, মহাপুরুষদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু প্রচলিত ধর্মমতের উপর তাঁর আস্থা ছিল না। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের নেতাদের সমানধর্মা। রুসো-ভলতেয়ারের সগোত্র। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে যখন তিনি ইটালী যাত্রা করেন তখন তাঁর জীবন নানা বিপরীত শক্তির সংঘাতে দোলায়মান ও বিক্ষুব্ধ। কবি ও নাট্যকার হিসাবে তিনি ঝড়ঝাপটার যুগ অতিক্রম করেছেন, কিন্তু কোন্‌খানে নোঙর ফেলবেন তা ঠিক করতে পারছেন না। বিজ্ঞানসাধক হিসাবে তিনি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন, কিন্তু বিজ্ঞান তো মানুষের সৌন্দর্যপিপাসা মেটাতে পারে না। সামাজিকতা তিনি পরিহার করেছেন, ভলতেয়ার ও রুসোর মতো তিনি অবন্ধন। কিন্তু এমন কোন্‌ পাখি আছে যার নীড় নেই, সঙ্গিনী নেই, সন্তান নেই ? স্বাধীনতা ভালো, কিন্তু অতিমাত্র স্বাধীনতা ভালো নয়।

বছর দুই পরে যখন তিনি ইটালী থেকে ফেরেন তখন তাঁর সাহিত্যের আদর্শ স্থির হয়ে গেছে। ঝড়ঝাপটা এর পর থেকে তাঁর বাইরে। ভিতরে তার প্রবেশ নেই। জানালার খড়খড়ি ও শার্সি তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদের মতো তাঁর সৌন্দর্যের আদর্শ ক্লাসিক। স্বদেশের ও স্বকালের রোমান্টিক আদর্শ তিনি পিছনে ফেলে এসেছেন। কিংবা বলা যেতে পারে তিনিই পেছিয়ে যেতে যেতে প্রাচীন গ্রীস ও রোমে পৌঁছে গেছেন। আর কেউ অমন করে পিছু হটেনি। অথচ বিজ্ঞানে তিনি সবচেয়ে আধুনিক। তখনকার দিনে বিবর্তনবাদের উদয় হয়নি। গ্যেটেই তার পূর্বদ্রণ্টা। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেও তাঁর দান সেকালের পক্ষে বিস্ময়কর। কোনো বৈজ্ঞানিকের কোনো মতবাদই চিরস্থায়ী হয় না, তাঁর বেলাও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

ইটালী থেকে ফিরে তিনি সঙ্গিনী গ্রহণ করলেন। শ্রেণীর বাধা ছিল বলে হোক বা ধর্মের প্রতি অনাস্থা ছিল বলে হোক বিবাহের অনুষ্ঠান ঘটল না। হয়তো এ ক্ষেত্রেও তাঁর উপর রুসোর প্রভাব পড়েছিল। গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়। গৃহ পেয়ে তিনি স্থিতি পেলেন। অথচ সামাজিক মানুষ হলেন না। সমাজ থেকে যেমন দূরে ছিলেন তেমনি দূরেই, বোধ হয় তার চেয়েও দূরে, রইলেন। ও দিকে ডিউক দিলেন তাঁকে রাজকীয় রঙ্গমঞ্চের পরিচালনার ভার। থিয়েটার তাঁকে চিরকাল আকর্ষণ করেছে। এবার সুযোগ জুটল ইচ্ছামতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার।

এসব নিয়ে যখন তিনি সুশৃংখল ও শান্ত তখন এল কিনা ফরাসী বিপ্লব। আর পাঁচ-দশ বছর আগে আসতে কে বারণ করেছিল ! এমন অকস্মাৎ আসবে বলে কোন নোটিস দিল না ! দেখুন দেখি কী দারুণ অভদ্রতা ! মানুষ একটু

শান্তি ও শৃঙ্খলার স্বাদ পাবে চল্লিশ বছর বয়সে, তাও বরাতে নেই। গ্যেটে অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করলেন। ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর আপত্তির প্রথম কথা হলো ওটা শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিপন্থী। ভুলে গেলেন যে জার্মানীর ঝড়ঝাপটাও আইন বাঁচিয়ে চলবে বলে অঙ্গীকার করেনি। মোট কথা, সবুর করতে পারবে না বলে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছিল। সবুর করতে করতে কেউ কেউ বোঝাপড়া করেছিল। অনেকের বেলায় সে বোঝাপড়া আপোসের পর্যায়ে পড়ে। গ্যেটের বেলায় তা হয়নি। তাঁর জীবনযাত্রা আর দশজন অভিজাতের মতো ছিল না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও ফিউডাল যুগের নয়। যেসব শক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লব তাদের চেয়ে তিনি নিকটতর ছিলেন যেসব শক্তির অনুকূলে বিপ্লব, তাদের। তাঁর স্ত্রী জনগণের কন্যা, যেমন 'এগমণ্ট'এর ক্লারা। তাঁর প্রকৃতি-আরাধনা বিপ্লবী নায়কদের ধর্ম। তাঁর 'হেরমান ও ডরোথেয়া' নতুন ধরনের লোকসাহিত্য। বিপ্লবের পূর্বে রচিত ঝড়ঝাপটা যুগের নাটক উপন্যাস প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ ঘোষণা। বিপ্লবের পরে রচিত 'স্বয়ংবৃত সম্পর্কাবলী' সামাজিক বিধিনিষেধের চেয়ে মানবমানবীর স্বাধীন সম্পর্ককেই বড়ো স্থান দিয়েছে। 'ফাউস্ট' নাটকের জীবনদর্শন যে অক্লান্ত ও অনাসক্ত কর্মযোগ সে তো বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও পুরাতন হয়নি।

ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী পঁচিশ বছর ইউরোপের জীবনে যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি দুঃখে দ্বন্দ্বে ভরা। যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা বিপর্যস্ত ইউরোপ কবিকে হয়তো পাগল করে তুলত, যদি না থাকত তাঁর বিজ্ঞান সাধনা ও ক্লাসিক মার্গ। আপনাকে বাঁচাবার জন্যে তিনি একপ্রকার বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন। সেটা এক হিসাবে ছাব্বিশ বছর বয়স থেকেই, কিন্তু বিশেষ করে চল্লিশের পর। নেপোলিয়নের পতন হলে যখন বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের যুগ শেষ হয়ে যায় তখন গ্যেটের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় সারা হয়। তখন বাইরের জগতে শান্তি আসে, শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। জানালার শার্সি-খড়খড়ি বন্ধ করে রাখার দরকার থাকে না। পত্নীর সঙ্গে সম্বন্ধ ইতিমধ্যে বিধিবদ্ধ হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর কবির ঘরসংসারের ভার নেন উচ্চবংশীয়া পুত্রবধূ। বাগানবাড়ি থেকে ইতিপূর্বে উঠে আসা হয়েছিল বাসগৃহে। গ্যেটের জীবনের অবশিষ্ট সতেরো বছর যে-কোনো একজন পদস্থ রাজপুরুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে তুলনীয়। নানা দিগ্‌দেশ থেকে ভক্তেরা আসতেন তাঁর দর্শন পেতে। আরাম ও সম্ভ্রমের অভাব ছিল না। লোকে বলত, 'ইওর একসেলেন্সী'। পদবী মিলেছিল 'ফন গ্যেটে'। এই বয়সেও তাঁর প্রকৃতি-পূজার বিরাম ছিল না, তাঁর ক্লাসিক মার্গও ছিল অপরিত্যক্ত, কিন্তু একটু তফাত ছিল।

নেপোলিয়নের ফরাসী ফৌজ বার বার জার্মানী আক্রমণ করায় জার্মানীদের জাতীয় ঐক্যবোধ নতুন করে উদ্দীপিত হয়। এ বোধ যে কোনো কালে ছিল না, তা নয়। বহু বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত ও বোহেমিয়া হাঙ্গেরী প্রভৃতি অঞ্চলের

সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় জার্মানীর রাজনৈতিক জীবনে ঐক্য ছিল না। কিন্তু সংস্কৃতিতে, সংগীতে, সাহিত্যে জার্মানমাত্রেরই একটা মিলনভূমি ছিল, যদিও সেখানেও প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিকের ভেদবুদ্ধি ছিল। এবার রাজনৈতিক জীবনকেও এক সূত্রে বাঁধবার প্রয়োজন দেখা দিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স রাজনৈতিক ঐক্যের দরুন দিগ্বিজয়ী হয়েছে, ভূমণ্ডলের সর্বত্র রাজ্যলাভ করেছে, অর্থে ও সামর্থ্যে তারা অগ্রগণ্য। জার্মানী তাদের চেয়ে সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েও সব বিষয়ে পশ্চাৎপদ শুধু রাজনৈতিক ঐক্যের অভাবে। জার্মানী যদি এক রাষ্ট্র হতো, জার্মানরা যদি এক নেশন হতো তা হলে কি নেপোলিয়নের হাতে বার বার লাঞ্ছিত ও পরাজিত হতো ?

এমনি করে ন্যাশনালিজমের সূত্রপাত হয়। সারা শতাব্দী ধরে এর মরসুম চলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমরা এর পরিণাম দেখেছি। ন্যাশনালিজমের সঙ্গে তথাকথিত সোশ্যালিজম মিলিত হয়ে যে বিভীষিকা সৃষ্টি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তারও পরিণাম লক্ষ করেছি। গ্যেটে গোড়া থেকেই এর বিরোধী ছিলেন। একবার তিনি বলেছিলেন, ফরাসীদের প্রাণকেন্দ্র প্যারিস, ইংরেজদের লণ্ডন। জার্মানদের প্রাণকেন্দ্র কিন্তু ভিয়েনা নয়, বার্লিন নয়—জার্মানীর প্রাণ বহুকেন্দ্রিক। ফ্রাঙ্কফোর্ট, লাইপৎসিগ, মিউনিক প্রভৃতি ভিয়েনা-বার্লিনের মতো প্রাণবন্ত। জার্মানীর মতো দেশকে ইংলণ্ডের মতো নেশন করতে গেলে তার সভ্যতার মূলসূত্রটি হারিয়ে যাবে। প্রাণধারার ঐক্যই আসল ঐক্য, রাজনৈতিক ঐক্য তা নয়। গ্যেটের কথা যদি তাঁর দেশ মনে রাখত তা হলে তার আজ এ দশা হতো না। কিন্তু তখনকার দিনের জার্মানরা তাঁর কথা শুনে তাঁকে গালমন্দ দিয়েছিল, তার পরেও তাঁকে ঠিক বোঝে নি, এখনো ভুল বোঝে। তিনি তাঁর দেশকে, তাঁর জাতিকে কারো চেয়ে কম ভালোবাসতেন না। কিন্তু তাঁর নেশনবিরোধিতার কদর্থ করা হলো এই বলে যে তিনি বিশ্বপ্রেমিক, তাই আর সকলের মঙ্গল চান, স্বদেশের চান না। তিনি নেপোলিয়নের ভক্ত, তাই স্বদেশের বিপদে সাড়া দেন না, ছেলেকে যুদ্ধে পাঠান না। তিনি ফরাসী জাতির গুণমুগ্ধ, জার্মান জাতির নিন্দা ছাড়া প্রশংসা করেন না। অর্থাৎ তিনি পোয়েট, কিন্তু পেট্রিয়ট নন।

গ্যেটের শেষজীবন তাই অবিমিশ্র শান্তিময় ছিল না। শিলারকে তাঁর দেশবাসী মাথায় তুলে নিয়েছিল। শিলারের জনপ্রিয়তার একাংশও গ্যেটের ভাগ্যে জোটে নি। তিনি জানতেন যে তাঁর লেখা সকলের জন্যে নয়। সকলে যেদিন বুঝবে সেদিন অবশ্য সকলের হবে, তার দেরি আছে। সেইজন্যে জনপ্রিয়তার প্রত্যাশা রাখেননি। কিন্তু যশ তিনি আজীবন পেয়েছিলেন। স্বদেশে বিদেশে—সব দেশে। নেপোলিয়ন তাঁকে দেখে বলেছিলেন, একটা মানুষ বটে। দিগ্বিজয়ী তাঁর 'ভের্টর' পড়েছিলেন সাত বার। যুদ্ধযাত্রার সময় যেসব বই নেপোলিয়নের সঙ্গে যেত 'ভের্টর' তার একটি।

গ্যেটের মৃত্যুর পর এক শতাব্দীর উপর কেটে গেছে। এখনো তিনি জনপ্রিয় হতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর যশ তাঁকে অলিম্পস পর্বতের গ্রীক

দেবতাদের সঙ্গে আসন দিয়েছে। আর কোনো জার্মান সাহিত্যিক এ সম্মান লাভ করেননি। দান্তে ও শেক্স্পীয়ারের পরবর্তী ও টলস্টয়ের পূর্ববর্তী আর-কোনো ইউরোপীয় সাহিত্যিক তাঁর সঙ্গে এক সারিতে বসার যোগ্য নন। ইউরোপের বাইরে একালে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর তুল্য। হাজার বছরে সারা পৃথিবীতে যে পাঁচ জন অমর সাহিত্যিক অবতীর্ণ হয়েছেন গ্যেটে তাঁদের মধ্যমণি। মধ্যম পাণ্ডবের মতো তিনি সব্যসাচী ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'ফাউস্ট', শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ভিল্হেল্ম মাইস্টার' ও অজস্র প্রেমের কবিতা বিশ্বসাহিত্যে চিরস্মরণীয়।

কিন্তু তাঁকে যে অলিম্পিয়ান বলা হয় এ শুধু তাঁর সাহিত্যসাধনার জন্যে নয়। এ তাঁর জীবনদর্শনের জন্যেও। জীবনকে তিনি দেখেছিলেন বাহির থেকে, ভিতর থেকে, উপর থেকে, তল থেকে। দেখেছিলেন মানুষের চোখে, প্রকৃতির চোখে, দেবতাদের চোখে। তন্নতন্ন করে দেখেছিলেন, নেতি নেতি করে দেখেছিলেন। যেটি যেখানকার সেটিকে সেখানে রেখে দেখেছিলেন, তার আশে-পাশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিলেন, সমগ্রের মধ্যে স্থাপন করে দেখেছিলেন। দৃষ্টির তপস্যা তাঁর মতো আর কেউ করেননি সর্বতোভাবে। গাছ পাতা ফুল প্রজাপতি হাড় দাঁত কঙ্কাল করোটি গ্রহ তারা মেঘ বাষ্প রং রেখা রূপ স্পর্শ কিছুই তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষার বাইরে ছিল না। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, নারীর সঙ্গে নরের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, এমনি কত রকম সম্পর্ক তাঁর দৃষ্টির বিষয় ছিল। তাঁর ধ্যানের বিষয় ছিল অন্তহীন প্রগতি, যার মূলে অবিরাম পরিশ্রম পরীক্ষা ও পরিত্যাগ। কোনো কিছুতে আসক্ত হয়ে থাকলে প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তা সে যতই পুরাতন, যতই পরিচিত, যতই প্রিয় হোক। মনে হবে হৃদয়হীনতা, আসলে বেদনার পর বেদনার অভিজ্ঞতা।

আজ কি তাঁকে আমাদের দরকার আছে, এই উন্মত্ত পৃথিবীতে? প্রগতির পথ ধরে ধ্বংসের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা সভ্য মানব। বিজ্ঞান আমাদের বন্ধু নয়, যেমন ফাউস্টের বন্ধু নয় মেফিস্টোফেলিস। গ্যেটে পাঠ করে কী আমাদের সান্ত্বনা?

এর উত্তর নানা পাঠক নানা ভাবে দেবেন। একজন পাঠক হিসাবে আমার উত্তর দিই। ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ের মতো রুশ বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায় এখন চলছে। এ অধ্যায় কবে শেষ হবে, কে হারবে, কে জিতবে, গ্যেটের মতো আমাদেরও অজানা। তাঁর দৃষ্টান্ত যদি অনুসরণ করি তা হলে বাইরের শত অশান্তি সত্ত্বে আমরা প্রকৃতিস্থ থাকব, আত্মস্থ থাকব, ধ্যানস্থ থাকব। এ অধ্যায় এক দিন শেষ হবেই। তত দিন যদি বেঁচে থাকি তা হলে বাইরেও শান্তি আসবে। যত দিন বেঁচে আছি তত দিন সাধ্যমতো বাইরের শান্তির জন্যেও চেষ্টা করব। গ্যেটের হৃদয়ে জাতিপ্রেম ছিল। কিন্তু জাতিভেদ তিনি মানতেন না। তাঁর জন্ম উচ্চ শ্রেণীতে, কিন্তু বিবাহ নিম্ন শ্রেণীতে। স্বয়ং অভিজাত হয়েও জনগণের সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য। মানুষে মানুষে হিংসা দ্বেষ

এক দিনের জন্যেও তাঁর মনে ঠাঁই পায়নি। তাঁর কোনো শত্রু ছিল না। না ব্যক্তিগত জীবনে, না সমষ্টিগত জীবনে। বহু অত্যাচার তাঁর জীবদ্দশায় ঘটেছে। তার দরুন তিনি বেদনাবোধ করেছেন। কিন্তু মানুষকে তার জন্যে ঘৃণা করেননি। হিংসার বদলে হিংসার কথা ভাবেননি। তাঁর মতো আমাদের অন্তঃকরণ নির্মল হোক, নির্বিষ হোক। তাঁর স্বাস্থ্য যেন আমরাও পাই। মত্ততার যুগে তিনি ছিলেন অপ্রমত্ত। আমরাও যেন থাকি।

অপ্রমাদের জন্যে তাঁকে করতে হয়েছিল এক হাতে বিজ্ঞানচর্চা, আর-এক হাতে ক্লাসিকচর্চা। একসঙ্গে প্রকৃতির আরাধনা তথা শাশ্বত সৌন্দর্যের উপাসনা। এই দুই ডিসিপ্লিন এখনো আমাদের পরম প্রশান্তি প্রদান করতে পারে। তা হলেও আধুনিক সাহিত্যিকের চিত্ত সান্ত্বনা মানে না। দিনের পর দিন যে প্রশ্ন তাকে অস্থির করে তুলেছে সে প্রশ্ন কি গ্যেটের মতো অলিম্পিয়ানকেও আকুল করেনি ? আমরা কি কেবল নীরব সাক্ষীর মতো দেখে যাব, পরে সাক্ষ্য দেব ? আমরা কি কোনো অবস্থায় হস্তক্ষেপ করব না, কণ্ঠক্ষেপ করব না ? এই নিষ্ক্রিয় স্তব্ধতা কি পুরুষোচিত ? এ কি অমানুষিক নয় ?

গ্যেটের কাছে এর উত্তর আশা করা বৃথা। তার জন্যে যেতে হবে টলস্টয়ের কাছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে।

(১৯৫০)

প্রমথ চৌধুরীর কবিতা

ইটালীয় তেরজা রিমা ছন্দে রচিত 'কৈফিয়ৎ' কবিতায় প্রমথ চৌধুরী তাঁর কবি হওয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

"যৌবনে বাসনা ছিল, দুনিয়ার ছবি
আঁকিতে উজ্জ্বল করে সাহিত্যের পত্রে,—
বর্ণের স্বর্ণের লাগি পূজিতাম রবি।
ফলাতে সংকল্প ছিল মোর প্রতি ছত্রে,
আকাশের নীল আর অরুণের লাল,—
এ দুটি বিরোধী বর্ণ মিলিয়ে একত্রে।
দলিত অঞ্জন কিম্বা আবির গুলাল
অথচ ছিল না বেশী অন্তরের ঘটে—
এ কবি ছিল না কভু বাণীর দুলাল।
তাইতে আঁকিতে ছবি কাব্য-চিত্রপটে,
বুঝিলাম শিক্ষা বিনা হইব নাকাল।
চলিনু শিখিতে বিদ্যা গুরুর নিকটে।
হেথায় হয় না কভু গুরুর আকাল।

পড়িনু কত-না-জানি বিজ্ঞান দর্শন,
ভক্ষণ করিনু শত কাব্যের মাকাল।
সে কথা পড়িলে মনে রোমের হর্ষণ
আজিও ভয়েতে হয় সর্ব অঙ্গ জুড়ে,—
এ ভবসিন্ধুর সেই সৈকত-কর্ষণ।
বন্ধ হল গতিবিধি কল্পনায় উড়ে
গড়িনু জ্ঞানেতে-ঘেরা শান্তির আলয়,—
সহসা পড়িল বালি সে শান্তির গুড়ে।
নেত্রপথে এসে দুটি সুবর্ণ বলয়
সোনার রঙেতে দিল দশদিক ছেয়ে—
সুশাসিত মনোরাজ্যে ঘটিল প্রলয়।
বলা মিছে এ বিষয়ে বেশী এর চেয়ে,
ছন্দেতে যায় না পোরা মনের হাঁপানি,—
এ সত্য সহজে বোঝে দুনিয়ার মেয়ে।
ফল কথা, কালক্রমে ত্যজি বীণাপাণি,
ছাড়িনু হবার আশা সাহিত্যে অমর।
হেথায় বাঁচিতে কিন্তু চাই দানাপানি।
পূজাপাঠ ছেড়ে তাই বাঁধিয়া কোমর,
সমাজের কর্মক্ষেত্রে করিনু প্রবেশ,—
শুরু হল সেই হতে সংসার-সমর।
পরিনু সবারি মত সামাজিক বেশ,
কিন্তু তাহা বসিল না স্বভাবের অঙ্গে।
সে বেশ-পরশে এল তন্দ্রার আবেশ।
কি ভাবে কাটিল দিন সংসারের রঙ্গে,
স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায়, জানে হৃষীকেশ।
কর্মক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র এক নয় বঙ্গে।
এদিকে রূপালি হল মস্তকের কেশ,
সেই সঙ্গে ক্ষীণ হল আত্মার আলোক,—
হইল মনের দফা প্রায়শ নিকেশ।
দেখিলাম হতে গিয়ে সাংসারিক লোক,
বাহিরের লোভে শুধু হারিয়ে ভিতর,
চরিত্রে হইনু বৃদ্ধ, বুদ্ধিতে বালক।
এসব লক্ষণ দেখে হইনু কাতর,
না জানি কখন আসে বুজে চোখ কান,
সেই ভয়ে দূরে গেল ভাবনা ইতর।
হারানো প্রাণের ফের করিতে সন্ধান,
সভয়ে চলিনু ফিরে বাণীর ভবনে,

যেথায় উঠিছে চির আনন্দের গান।
আবার ফুটিল ফুল হৃদয়ের বনে,
সে দেশে প্রবেশি, গেল মনের আক্ষেপ,
করিলাম পদার্পণ দ্বিতীয় যৌবনে।"

প্রমথ চৌধুরীর কবিতা এই দ্বিতীয় যৌবনের কবিতা। এই দ্বিতীয় যৌবনও তাঁর দীর্ঘ দিন ছিল না। বোধ হয় সাত আট বছরের বেশী নয়। তার পরে তাঁর হাতে আর কবিতা হয়নি। কেন হয়নি তার কৈফিয়ৎ তিনি দিয়ে গেছেন ইতস্তত ছড়ানো ভাবে। 'কবিতা লেখা' নামে তাঁর একটি কবিতা আছে, সেটি তাঁর দ্বিতীয় কৈফিয়তের কাজ করবে।

"এ যুগে কঠিন কবিতা লেখা
কবিরা পায় না নিজের দেখা।
ঢাকা চাপা দিয়ে মনটি রাখি,
নিজ ধনে পড়ে নিজেই ফাঁকি।
গলা চেপে গায় প্রেমের গান,
ভয়ে ভয়ে ছাড়ে প্রাণের তান।
ভাব-মদে হলে নয়ন লাল,
দশে মিলে দেয় দুচোখা গাল।
সুরুচি সুনীতি যুগল চেড়ী
কল্পনা-চরণে পরায় বেড়ি।
কবিতা কয়েদী, রাধার মত
দায়ে পড়ে করে গৃহিণী-ব্রত।
বাঁশী বাজে বনে বসন্ত রাগে,
জটিলা কুটিলা দুয়ারে জাগে।"

এই কথাটি আর একটু স্পষ্ট হয়েছে 'প্রেমের খেয়াল' কবিতায়।

"প্রেমের দু'চার কবিতা লিখেছি
লিখিনি গান।
প্রেমের রাগের আলাপ শিখেছি
শিখিনি তান।
কত না শুনেছি প্রণয় কাহিনী
কত না শুনেছি প্রেমের রাগিণী
পাতিয়া কান।
আপন মনের কখনো গাহিনি
কাঁপানো গান।"

বস্তুত বয়স হলে মানুষ নিজেই নিজের গলা চেপে ধরে সুরুচি সুনীতির ভয়ে। সমাজ তো চেপে ধরেই। সেইজন্যে প্রথম যৌবনেই সুরুচি সুনীতির শাসন উপেক্ষা করে গলা ছেড়ে গাইতে হয় "কাঁপানো গান"। যাঁরা প্রথম যৌবনে ও-কাজ করেননি তাঁরা দ্বিতীয় যৌবনে পারেন না। যদি কেউ পারেন

তো তিনি ব্যতিক্রম। আমাদের কবি গলা চেপে গাইতে গিয়ে দেখলেন সে যেন সোনার খাঁচার পাখির গান। এতে তাঁর আন্তরিক আপত্তি। ঐ কবিতায় আছে—

"প্রেমের খেয়াল সহজে মানে না
তাল ও মান।
ছোটা বই আর নিয়ম মানে না
ফুলের বাণ।
প্রেম নাহি মানে আচার বিচার,
গীত নহে তার, সোনার খাঁচার
পাখীর গান।
প্রেম জানে নাকো দুবেলা মিছার
করিতে ভান।"

দুবেলা মিছার ভান করার চেয়ে না লেখাই ভালো। বোধ হয় সেই কারণে তাঁর প্রেমের কবিতা আপনা-আপনি থেমে গেল। এই প্রসঙ্গে 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয়কে লেখা তাঁর 'পত্র' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য॥

"কল্পনা কম্বোজ-ঘোড়া, বয়েসে হয়েছে খোঁড়া,
চলে তিন পায়ে।
ভোঁতা হল পঞ্চ বাণ, প্রেমের উজান বান
নাহি ডাকে মনে।
সমাজের পোষা পাখী, সমাজ খাঁচায় থাকি,
ভুলে গেছি বনে।"

আবার সেই সমাজের কথাই উঠল। সমাজের উপর কবিমাত্রেরই অভিমান থাকে। এই কবিরও ছিল। এবং কিছু বেশী পরিমাণেই ছিল। সেইজন্যে তিনি সমাজকে সবুজ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সমাজকে সবুজ করতে গিয়ে প্রবন্ধকার ও গল্পলেখকরূপে আপনাকে আবিষ্কার করলেন। নিজের যা শ্রেষ্ঠ তার সন্ধান পেলেন। কবিতা লেখা আর হলো না। অথচ ক্ষমতা ও পাথেয় তাঁর ছিল।

ক্ষমতা যে ছিল তার প্রমাণ উপরের উদ্ধৃতিগুলি। ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন বলে তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল সনেট। অথচ সনেটও তিনি ষাট সত্তরটির বেশী লেখেননি, অন্তত ছাপেননি। পঞ্চাশটি সনেট নিয়ে 'সনেট পঞ্চাশৎ'। আরো কয়েকটি সনেট, তেরজা রিমা, তেপাটি বা ট্রায়োলেট, পয়ার, ত্রিপদী, ছড়া প্রভৃতি নিয়ে 'পদচারণ'। দ্বিতীয় পুস্তিকাটি আকারে বড়ো না হলেও প্রকারে বিচিত্র। চেষ্টা করলে এই কবি বিভিন্ন রূপকর্মে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করতেন, কিন্তু তাঁর চেষ্টার ক্ষেত্র হলো

চলিত ভাষায় গদ্য এবং সাধনার লক্ষ্য হলো ছোটগল্প ও প্রবন্ধ। তাই তিনি ক্ষমতার নমুনা দিয়েই পদ্যরচনায় ক্ষান্তি দিলেন। হয়তো তাঁর মনের কোণে এমন কোনো চিন্তা ছিল যে, কবিতা আমি যতই লিখি না কেন রবীন্দ্রনাথের তুলনায় মাইনর পোয়েট হয়ে থাকতে হবে। ছোটগল্পে ও প্রবন্ধে আমি মেজর। সুতরাং ছোটগল্প ও প্রবন্ধই আমার ক্ষমতার ক্ষেত্র।

কিন্তু সনেট লিখেই তিনি সবচেয়ে খুশি হতেন আমার এ অনুমান অযথা নয়। 'কৈফিয়ৎ' কবিতাটির শেষাংশ উদ্ধার করা যাক—

"এদিকে সুমুখে হেরি সময় সংক্ষেপ,
রচিতে বসিনু আমি ছোটখাট তান,
বর্ণ সুর একাধারে করিয়া নিক্ষেপ।
আনিনু সংগ্রহ করি বিঘৎ প্রমাণ
ইতালির পিতলের ক্ষুদ্র কর্ণেট,
তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধ প্রাণ।
এ হাতে মুরতি ধরে আজি যে সনেট,
কবিতা না হতে পারে কিন্তু পাকা পদ্য,—
প্রকৃতি যাহার 'জেঠ', আকৃতি 'কনেঠ'।
অন্তরে যদিচ নাহি যৌবনের মদ্য
রূপেতে সনেট কিন্তু নবীনা কিশোরী,
বারো কিম্বা তেরো নয়, পুরোপুরি চোদ্দ।"

পাথেয় তাঁর ছিল তার প্রকৃষ্ট পরিচয় 'চার-ইয়ারী কথা'। প্রেমের উপলব্ধি রসের উপলব্ধি তাঁর জীবনে ঘটেছিল, এবং সাংসারিক জীবনের অকৃতকার্যতাকে মধুর করেছিল। এর চিহ্ন রয়ে গেছে এখানে ওখানে এক একটি টুকরোয়। যেমন,—

"নিভানো আগুন জানি জ্বলিবে না আর,
মনে কিন্তু থেকে যায় স্মৃতিরেখা তার,—
হৃদিলগ্ন আমরণ পারিজাত-হার।
হৃদয়ের ভুল শুধু জীবনের সার।"

'ভুল'

ক্ষমতা ছিল, পাথেয় ছিল, অথচ কোনোটির সম্যক ব্যবহার হলো না, কাব্যসাধনা অর্ধপথেই থেমে গেল। মন চলে গেল ছোটগল্পের রাজ্যে, প্রবন্ধের রণক্ষেত্রে। হয়তো ভালোই হলো। একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির চেয়ে একজন প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধকারের, প্রথম শ্রেণীর গল্পলেখকের মর্যাদা বেশী। তিনি তাঁর নিজের পথ নির্ভুলভাবে বেছে নিয়েছিলেন। কার জীবন কেমন করে সার্থক হয় গোড়ার দিকে সে নিজেই তা জানে না, আঁধারে ঢিল ছোঁড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রও তো প্রথম বয়সে কবিতা লিখতেন। অভ্যাস রাখলে হেম-নবীনকে অতিক্রম করতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে হেরে যেতেন। কবিতায় ক্ষান্তি

দিয়ে বঙ্কিম ভুল করেননি, শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের পর রবীন্দ্রনাথেরও উপন্যাস রচনায় উৎসাহ ছিল বলে মনে হয় না। পীড়াপীড়ি না করলে তিনি 'যোগাযোগ' আরম্ভ করতেন কি না সন্দেহ। আরম্ভ করলেন, কিন্তু শেষ করতে বল পেলেন না। এই রকমই হয়। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, প্রমথ চৌধুরীর কবিতা কেন তাঁর প্রবন্ধ ও গল্পের তুলনায় নিষ্প্রভ, এর যথার্থ উত্তর—গল্প ও প্রবন্ধ তার প্রভা হরণ করেছে। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের। অথচ কে একথা অস্বীকার করবে যে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপ্রতিভা উচ্চকোটির ছিল! বন্দেমাতরম্ তার সাক্ষী।

তেমন সাক্ষী প্রমথ চৌধুরীরও আছে। যদিও তেমন প্রসিদ্ধ নয়, প্রসিদ্ধ হবার যোগ্যতা রাখে না। উদ্ধৃতির প্রলোভন সংবরণ করতে পারছি না বলে একটিমাত্র দিচ্ছি। এটি যে তাঁর শ্রেষ্ঠ সনেট তা নয়। হতে পারে এটি তাঁর বিশিষ্ট সনেট। আর কারো হাতে এমনটি হতো না।

"কখনো অন্তরে মোর গভীর বিরাগ,
হেমন্তের রাত্রিহেন থাকে গো জড়িয়ে,
—যাহার সর্বাঙ্গে যায় নীরবে ছড়িয়ে
কামিনী ফুলের শুভ্র অতনু পরাগ॥
বাসনা যখন করে হৃদয় সরাগ,
শিশিরে হারানো বর্ণ, লীলায় কুড়িয়ে,
চিদাকাশে দেয় জেবলে, বসন্ত গড়িয়ে
কাঞ্চন ফুলের রক্ত চঞ্চল চিরাগ॥
কভু টানি, কভু ছাড়ি, মনের নিঃশ্বাস।
পক্ষে পক্ষে ঘুরে আসে সংশয় বিশ্বাস॥
বসন্তের দিবা, আর হেমন্ত-যামিনী,
উভয়ের দ্বন্দ্বে মেলে জীবনের ছন্দ।
দিবাগাত্রে রঙ আছে, নিশাবক্ষে গন্ধ,—
সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত সার কাঞ্চন কামিনী॥"

'রূপক'

প্রমথ চৌধুরীর কবিতা কি টিকবে? বলা যায় না। কবিতার ইতিহাসে দেখা যায় মহাকাব্যের ভরাডুবি ঘটছে, ভেসে থাকছে ছড়া কিংবা পদাবলী জাতীর খণ্ড কবিতা। তিনি যাকে বলতেন চুট্‌কি। টলস্টয় ছিলেন চুট্‌কির পক্ষপাতী। সব যাবে, চুট্‌কি থাকবে, কেননা মানুষের পক্ষে চুট্‌কি তৈরি করা যেমন সহজ মনে রাখাও তেমনি। মানুষের মন যাকে রাখে সেই থাকে। চুট্‌কির উপর আমাদের কবির কতখানি ভরসা ছিল তার প্রমাণ নিচে দিলুম—

"আমি চাই টেনে নিয়ে ছড়ানো প্রক্ষিপ্ত,
অন্তরে সঞ্চিত করি আঁধার আলোক,

প্রতীক রচনা করি চিত্রিত সংক্ষিপ্ত,—
চতুর্দশ পদে বন্ধ চতুর্দশ লোক।”
'বিশ্বরূপ'

এটা সংস্কৃতকবিদেরও উচ্চাভিলাষ ছিল।

“আজ তাই ছাড়ি যত ধ্রুপদ ধামার,
চুটকিতে রাখি সব আশা ভালোবাসা।
দরদ ঈষৎ আছে এ গীতে আমার,—
সুরে ভাবে মিল আছে, দুই ভাসা ভাসা।”
'গজল'

এটি এপিটাফের কাজ করে।

পরিশেষে, আর একটি প্রশ্ন। তাঁর কবিতার উপর কার কার প্রভাব পড়েছে? আমার উত্তর—ইটালীয় কবি পেত্রাকার, পারসিক কবি ওমর খৈয়ামের, ভারতীয় কবি ভাসের, বঙ্গীয় কবি ভারতচন্দ্রের। 'কৈফিয়ৎ' কবিতায় রবি-পূজার কথা আছে। কিন্তু ওটা যেন দক্ষিণমেরুর উপর লক্তরমেরুর প্রভাব। বিপরীতের উপর বিপরীতের।

(১৯৪৭)

প্রমথ চৌধুরী, সবুজ পত্র ও আমি

কিছুকাল থেকে লক্ষ করছি চিঠির পর চিঠি আসছে আমার কাছে। আসছে একজনের কাছ থেকে নয়। বিভিন্ন স্থল থেকে। পত্রলেখকদের ধারণা প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আমার গুরু, আমি তাঁর শিষ্য, তাঁর উত্তরসাধক। এঁদের কেউ জানতে চান তাঁর জীবনকাহিনী, কেউ বা তাঁর জীবনদর্শন। এঁদের বিশ্বাস আমি তাঁর জীবনেরও সন্ধান রাখি।

তাঁর সম্বন্ধে এই যে জিজ্ঞাসা এটা সুলক্ষণ। ইউরোপ হলে এত দিনে তাঁর মতো উচ্চ কোটির লেখকের পাঁচ-সাতখানা জীবনচরিত লেখা হয়ে যেত। কিন্তু কী জানি কেন, আমাদের এ দেশে জীবনচরিতের বাজার মন্দা। বিশেষত আজকাল। বোধ হয় সেই কারণে এক ভদ্রলোক চৌধুরী মহাশয়ের জীবনী লিখবেন বলে স্বেচ্ছায় শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও তাঁর কাছ থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে আর অগ্রসর হতে পারছেন না। উপরে যে সুলক্ষণের কথা বলেছি সেটা যদি তাঁর কাছে স্পষ্ট হয় তা হলে তিনি হয়তো সক্রিয় হবেন ও বহুজনের জিজ্ঞাসার উত্তর দেবেন। যত দিন না চৌধুরী মহাশয়ের পুরোমাপের জীবনচরিত লেখা হচ্ছে তত দিন আমাদের একমাত্র ভরসা তাঁর স্বলিখিত 'আত্মকথা'। স্বলিখিত? না, স্বকথিত। বৃদ্ধ

বয়সে তাঁর হাত কাঁপত, তাঁর সহধর্মিণী তাঁর বক্তব্য লিখে নিতেন। একটানা নয়, প্রতিদিন একটুখানি করে। 'আত্মকথা'র কতক অংশ এখনো অপ্রকাশিত। প্রকাশের ব্যবস্থা হচ্ছে। কয়েক পৃষ্ঠা খোয়া গেছে বলে চৌধুরানী মহাশয়া ইতস্তত করছেন। তাঁর অসীম আফসোস। আমাদেরও। যদি কোনো শখের ডিটেকটিভ ঐ পৃষ্ঠাগুলি উদ্ধার করার ভার নিতে উদ্যত হন তবে এখনো আশা আছে। তাতে নাকি সেকালের বিলেতের বৃত্তান্ত ছিল। চৌধুরী মহাশয়ের চোখে দেখা বিলেতের।

এখন আমার নিজের কথা বলি। আমি লোকটা গুরুবাদী নই। বরং গুরুবাদবিরোধী। গুরু যদি আমার কেউ থাকেন তবে তাঁদের সংখ্যা এক বা দুই নয়, জীবনের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন নারী ও পুরুষের কাছে আমি বিভিন্ন সংকেত পেয়েছি। তাঁদের অনেকের নাম সাধারণের অজানা। জানিয়ে কাজ নেই। যাঁদের সকলে চেনে তেমন কয়েকজনের নাম বাঙালীর মধ্যে চণ্ডীদাস, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী। ভারতীয়ের মধ্যে গান্ধীজী। মানব-জাতীয়ের মধ্যে টলস্টয়, রম্যা রলাঁ, এলেন কেই, গ্যেটে, চেখভ। আমি যদি উত্তরসাধক হয়ে থাকি তবে শুধু একজনের কেন? আর আমার একার কি কোনো সাধনা থাকতে নেই? যা একান্তই আমার? যারা দুদিন পরে জন্মেছে তারা কি একজনের না একজনের উত্তরসাধক হতেই জন্মেছে? কাল যখন অনাদি ও অনন্ত তখন একদল বসন্তের ফলকে আর-এক দল বসন্তের ফুলের উত্তরসাধক বা উত্তরসূরী বলে নামাঙ্কিত করা ভুল।

তা হলেও আমি স্বীকার করি যে টলস্টয় যে কাজ অসমাপ্ত রেখে গেছেন বা যে কাজে ফাঁক রেখে গেছেন সে কাজ আমার উপরেও বর্তেছে। তেমনি রবীন্দ্রনাথ যে কাজ সারা করে যেতে পারলেন না, যে কাজে হাত দিতে সময় পেলেন না, সে কাজ আমার উপরেও পড়েছে। তেমনি প্রমথ চৌধুরী যে কাজে বাধা পেলেন, যে কাজে ভঙ্গ দিলেন সে কাজ আমার উপরেও চেপেছে। আমি পালাতে চাইলেও পালাতে দিচ্ছে কে? স্বভাবত আমি পলাতক। কিন্তু কর্তব্য থেকে পালিয়ে কেউ কখনো সুখী হয়নি।

এর মানে এ নয় যে আমি এসব কাজ পারব। খুব সম্ভব পারব না। কিন্তু সেই না পারাটা সমসাময়িকদের বা পরবর্তীদের পারার সোপান হবে। যে সৈনিক লড়তে লড়তে পড়ে যায় সেও আর দশজনকে এগোবার পথ করে দেয়। তার শরীরের উপর দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার। পারব কি পারব না এটা একটা প্রশ্নই নয়। হাত দেব কি দেব না এইটেই প্রশ্ন। এর উত্তর, হাঁ, হাত দেব। তবে একসঙ্গে নয়। এক এক করে। এক জীবনে যতটা হয় তার বেশী হওয়াতে গেলে হবে কেন?

এখন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কাজটা কী ছিল ভেবে দেখা যাক। এই সেদিন বিশ্বভারতী থেকে তাঁর 'প্রবন্ধসংগ্রহ ঃ প্রথম খণ্ড' প্রকাশিত হয়েছে। তার পরে বই হয়ে বেরিয়েছে তাঁর একদা সহকর্মী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 'চলমান জীবন ঃ প্রথম পর্ব'। তাতে চৌধুরী মহাশয়ের জীবনের

সেই অধ্যায়টি আছে যেটির নাম বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে সবুজপত্রের যুগ। পবিত্রবাবুকে ধন্যবাদ যে তিনি এ যুগের বিশিষ্ট লেখকদের ঘরোয়া কথা ফলাও করে বলেছেন। তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানতেন কি না সন্দেহ। জানলেও বলতেন না হয়তো।

পবিত্রবাবুর বই থেকে নিচে কিছু উদ্ধার করে দিচ্ছি—

"পঁচিশ সালের শেষাশেষি চৌধুরী মহাশয়কে একদিন বেশ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন লক্ষ্য করলাম। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, অথচ আমি উপস্থিত হওয়ার পরও তিনি নীরবে সিগারেটের পর সিগারেট টেনে যাচ্ছেন। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে। তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পারছি, মনের মধ্যে প্রবল আলোড়ন চলছে। বেশ খানিকক্ষণ পরে মুখ খুললেন, 'সবুজপত্র বন্ধ করে দেব ভাবছি, পবিত্র।'...

"আর একটা সিগারেট ধরিয়ে চৌধুরী মহাশয় আবার বলতে শুরু করলেন, 'আমি আজ পাঁচ বছর ধরে আমার প্রকৃতির অপ্রবৃত্তির সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে আসছি। ফলে একেবারে শ্রান্ত ক্লান্ত বিষণ্ণ অবসন্ন হয়ে পড়েছি। আলস্য যখন দেহকে আর অবসাদ যখন মনকে একসঙ্গে পেয়ে বসে তখন লেখকমাত্রেরই অন্তত কিছুদিনের জন্য ছুটি নেওয়া দরকার। তাতে শুধু লেখকের নয়, সাহিত্যেরও উপকার হয়। আমার কি মনে হচ্ছে জান, পবিত্র? Vanity of Vanities, all is Vanity'—আবার চুপ করে সিগারেট টানতে লাগলেন। আমি তাকিয়ে দেখতে লাগলাম সোডার গ্লাসের বুদবুদগুলো কেমন করে মিলিয়ে যাচ্ছে।...

'মাসখানেক বাদে চৌধুরী মহাশয় একদিন বললেন, 'না, পবিত্র, সবুজপত্র বন্ধ করা গেল না। দেখ, কবি কি জবাব দিয়েছেন।'...

"চিঠিখানা হাতে নিয়ে বেশী দূর পড়তে হল না। সবুজপত্র চালিয়ে যাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের আদেশ প্রত্যক্ষ ভাবেই ধ্বনিত দেখলাম। কবি লিখেছেন :

'...সবুজপত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে বই-কি। দেশের তরুণদের মনে সবুজ রংকে বেশ পাকা করে দেবার পূর্বে তোমার ত নিষ্কৃতি নেই—প্রবীণতার বর্ণহীন রসহীন চাঞ্চল্যহীন পবিত্র মরুভূমির মাঝে মাঝে অন্তত একটা আধটা এমন ওয়েসিস থাকা চাই যাতে সর্বব্যাপী জ্যাঠামির মারী হাওয়াতে মেরে ফেলতে না পারে। অন্তহীন বালুকারাশির মধ্যে তোমার নিত্যমুখর সবুজপত্রের দোদুল্যমান ছায়াটুকু যৌবনের চির উৎসধারার পাশে অক্ষয় হয়ে থাক। প্রাণের বৈচিত্র্য আপন বিদ্রোহের সবুজ জয়পতাকাটি শুভ্র একাকারত্বের [illegible] [illegible] [illegible]ড়ে দিয়ে অমর হয়ে দাঁড়াক...' "

উপরের উদ্ধৃতি থেকে [illegible] যাচ্ছে, পাঁচ বছরে [illegible] 'সবুজপত্র' সম্পাদক শ্রান্ত ক্লান্ত বিষণ্ণ অবসন্ন হয়ে [illegible]ড়েছিলেন। একে [illegible] তাঁর প্রকৃতি অলস গ্রন্থকীটের, তার উপর দেশের মতি[illegible] বিরুদ্ধে উজান [illegible]য়ে চলা। আপোস

করার কৌশল জানা থাকলে এ দশা হতো না। কিন্তু বিজ্ঞাপন তিনি নেবেন না, মন-রাখা কথা বলবেন না, মনোরঞ্জন করবেন না। রবীন্দ্রনাথের মতো একদিন চলতি ভাষায়, তার পরের দিন সাধু ভাষায় লিখবেন না। রবীন্দ্রনাথের মতো উপন্যাসের শুরুতে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে শেষটা আত্মসমর্পণ করবেন না। এ কথা বলছি সেদিন এক ভদ্রলোকের মুখে 'ঘরে বাইরে'র ভিতরের খবর শুনে। 'ঘরে বাইরে' যখন আরম্ভ হয় তখন কবিকে যাঁরা পত্রাঘাত করেন এই ভদ্রলোকও তাঁদের অন্যতম। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে কবি তাঁর কাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে দেন। ফলে 'ঘরে বাইরে' যে জিনিস হতে যাচ্ছিল সে জিনিস হলো না। সমাজের ভালোর কাছে আর্টের ভালোকে খাটো করে কবিগুরু যা করলেন তার দ্বারা না হলো সমাজের ভালো, অর্থাৎ সংস্কার, না হলো আর্টের ভালো, অর্থাৎ সত্যকথন।

'সবুজপত্র' বন্ধ হয়ে গেল। বিজ্ঞাপন নিয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করল বটে, কিন্তু সেও আত্মবিলোপের আগে দপ করে জ্বলে ওঠার মতো। 'সবুজপত্র'-বিরহিত প্রমথ চৌধুরী যেন গাণ্ডীববিরহিত অর্জুন। নিরস্ত্রীকৃত বীরবরকে বীরবল বলে কে আর চিনবে, ভয় করবে, মারবে! যুদ্ধফেরৎ জেনারলের মতো নির্বিরোধ তাঁর অবশিষ্ট জীবন। আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি তখন (১৯২৯) তিনি রণছোড় সিভিলিয়ান। তখন আমার বয়স পঁচিশ, তাঁর বয়স একষট্টি। দেখাসাক্ষাতের ফলে তাঁর কাছে আমি নতুন কিছু পেলুম তা নয়। পাবার যা তা পেয়েছিলুম বারো তেরো বছর আগে, বারো তেরো বছর বয়সে 'সবুজপত্র' পড়ে।

নতুনের মধ্যে যদি কিছু পেয়ে থাকি তবে তা অকপট প্রশংসা ও স্নেহ। একদিন তিনি সকলের সামনে বললেন, প্রথমটা বুঝতে পারিনি কাকে লক্ষ্য করে। বললেন, আকবর বাদশার দরবারে একবার এক গুণী এলেন। এমন গান শোনালেন যে বড়ো বড়ো ওস্তাদেরা তাঁদের শির থেকে শিরোপা খুলে তাঁর দিকে ফেলে দিলেন। আকবর জানতে চাইলেন, ব্যাপার কী। তাঁরা নিবেদন করলেন, জাঁহাপনা, এখন থেকে ইনিই শোনাবেন, আমরা শুনব।

আমার দিকে চেয়ে বললেন, "এখন থেকে তুমি লিখবে, আমরা পড়ব।"

এর পরে তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কালেভদ্রে হতো। কলকাতার বাইরে আমার বদলির চাকরি। কয়েক বার কলকাতায়, এক বার কি দু বার রাঁচীতে, তিন চার বার শান্তিনিকেতনে, আঠারো বছরে মোট আঠারো বারও হবে না। চিঠিপত্র মাঝে মাঝে দিয়েছি ও পেয়েছি। তার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়। এক বার তিনি আমার একটা গুরুতর সিদ্ধান্তে গুরুর কাজ করেছিলেন। 'সত্যাসত্য' যখন আরম্ভ করি তখন সংলাপ অংশটা কথ্যভাষায় লিখে বাকিটা লিখতুম সাধুভাষায়। তিনি বললেন, কেন? সবটাই কথ্যভাষায় লিখলে ক্ষতি কী? লিখে ফেল। আমি যদি তখন তাঁর সঙ্গে দেখা না করতুম, তাঁর উপদেশ না চাইতুম তা হলে পরে আমাকে পশতাতে হতো। সমগ্র ছয় খণ্ড সাধুভাষায় লিখতে আমি হাঁফিয়ে উঠতুম। মাঝখানে রীতিবদল করতেই

হতো। সেটা হতো একান্ত অশোভন।

কিন্তু কথ্যভাষা সম্বন্ধে তাঁর মনে খেদ ছিল। এক বার তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি যে কথ্যভাষায় লিখেছি সেটা কাদের কথ্যভাষা ? শিক্ষিত স্তরের। কিন্তু তারাই কি সারা দেশ ? সাধারণের কথ্যভাষা আমার লেখনীতে ফোটেনি। আমার এ ভাষাও কৃত্রিম।

এ কথায় আমি দুঃখ পেয়েছি। নিজের কীর্তিকেও তিনি যথেষ্ট মনে করেননি। সাধ্য থাকলে তিনি তাকে ছাড়িয়ে যেতেন, অতিক্রম করতেন। সেই ছাড়িয়ে যাওয়ার, অতিক্রম করার দায়টা আমাদেরই ঘাড়ে তুলে দিয়েছেন নীরবে।

কিন্তু আসল দায়টা ভাষাগত নয়, ভাবগত। সবুজপত্র কেবল ভাষা নিয়ে লড়াই করেনি, করেছে ভাব নিয়ে। প্রধানত ভাব নিয়ে। সবুজপত্রের একটা ইডিয়োলজী ছিল। সেটা 'প্রবন্ধসংগ্রহ'-এর পাতায় পাতায় ব্যক্ত হয়েছে। উদ্ধার করতে হলে অনেকখানি করতে হয়। তবু উদ্ধার না করে পারছিনে।

> "যদি আমাদের দশজনের মধ্যে মনের চৌদ্দ আনা মিল থাকে, তা হলে প্রতি জনে বাকি দু আনা বাদ দিয়ে, একত্র হয়ে সকলের পক্ষে সমান বাঞ্ছিত কোনো ফললাভের জন্য চেষ্টা করতে পারি। এক দেশের এক যুগের এক সমাজের বহু লোকের ভিতর মনের এই চৌদ্দ আনা মিল থাকলেই সামাজিক কার্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়, নচেৎ নয়। কিন্তু সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ। সুতরাং সাহিত্যের পক্ষে মনের ঐ পড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনার চাইতে ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব দু আনার মূল্য ঢের বেশী। কেননা ঐ দু আনা হতেই তার সৃষ্টি ও স্থিতি, বাকি চৌদ্দ আনায় তার লয়। যার সমাজের সঙ্গে ষোলো আনা মনের মিল আছে, তার কিছু বক্তব্য নেই। মন পদার্থটি মিলনের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আর বিরোধের স্পর্শে জেগে ওঠে। এবং মনের এই জাগ্রত ভাব থেকেই সকল কাব্য সকল দর্শন সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি।
>
> "একথা শুনে অনেকে হয়ত বলবেন যে, যে দেশে এত দিকে এত অভাব সে দেশে যে লেখা তার একটি অভাবও পূরণ না করতে পারে, সে লেখা সাহিত্য নয়—শখ, ও তো কল্পনার আকাশে রঙিন কাগজের ঘুড়ি ওড়ানো, এবং সে ঘুড়ি যত শীঘ্র কাটা পড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ততই ভালো। অবশ্য ঘুড়ি ওড়াবারও একটা সার্থকতা আছে। ঘুড়ি মানুষকে অন্ততঃ উপরের দিকে চেয়ে দেখতে শেখায়। তবুও এ কথা সত্য যে, মানবজীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা সাহিত্য নয়, তা শুধু বাক্-ছল। জীবন অবলম্বন করেই সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টি লাভ করে, কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈনিক জীবন নয়। সাহিত্য হাতে-হাতে মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দিতে পারে না। কোনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিন্তু কোনো কোনো কথায় মন ভেজে, এবং সেই জাতির কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য। শব্দের শক্তি অপরিসীম।

রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে মশার গুনগুনানি মানুষকে ঘুম পাড়ায় —অবশ্য যদি মশারির ভিতর শোওয়া যায়, আর দিনের আলোর সঙ্গে কাক-কোকিলের ডাক মানুষকে জাগিয়ে তোলে। প্রাণ পদার্থটির গূঢ় তত্ত্ব আমরা না জানলেও তার প্রধান লক্ষণটি এতই ব্যক্ত এবং এতই স্পষ্ট যে তা সকলেই জানেন। সে হচ্ছে তার জাগ্রত ভাব। অপরদিকে নিদ্রা হচ্ছে মৃত্যুর সহোদরা। কথায় হয় আমাদের জাগিয়ে তোলে, নয় ঘুম পাড়িয়ে দেয়—তাই আমরা কথায় মরি কথায় বাঁচি। মন্ত্র সাপকে মুগ্ধ করতে পারে কি না জানিনে, কিন্তু মানুষকে যে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গোটা ভারতবর্ষ। সংস্কৃত শব্দ যে সংস্কারকে বাধা দিতে পারে তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্য। মানুষ মাত্রেরই মন কতক সুপ্ত আর কতক জাগ্রত। আমাদের মনের যে অংশটুকু জেগে আছে সেই অংশটুকুকেই আমরা সমগ্র মন বলে ভুল করি—নিদ্রিত অংশটুকুর অস্তিত্ব আমরা মানিনে, কেননা জানিনে। সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা।"

'সবুজপত্রের মুখপত্র'

সবুজপত্রের মতবাদ কেবল ঐ একটি উদ্ধৃতি থেকে সম্পূর্ণ জানা যাবে না, কিন্তু মূল সুরটি ধরতে কষ্টে হবার কথা নয়। সাহিত্য মানুষকে অন্ন দিতে পারে না, কিন্তু চেতনা দিতে পারে। সেই চেতনা থেকে বঞ্চিত ছিল আমাদের দেশ, সংস্কৃত শব্দ তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। 'সবুজপত্র' চেতনা-সঞ্চারের ভার নিল। সংস্কৃত শব্দ যে সংস্কারকে বাধা দিতে পারে এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার পর সংস্কৃত শব্দকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না, প্রশ্রয় দিলে সংস্কারের আশা ছাড়তে হয়। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে কেবল সাধুভাষা কথ্যভাষার প্রশ্ন নয়, সংস্কার ও সংস্কারবিরোধিতার প্রশ্নও আছে। বাংলা ভাষা, বিশেষত ইংরেজী শিক্ষার ফলে জেগে ওঠা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বাঙালীকে অচলায়তনের হাত থেকে বাঁচতে শিখিয়েছে। 'সবুজপত্রে'র ভরসা সেইজন্যে বাংলা ভাষার উপরে—যে ভাষা অকৃত্রিম বাংলা-ভাষা, বাঙালীর মুখের বাংলাভাষা। তাতে অন্যান্য ভাষার শব্দ থাকবে না তা নয়। ইংরেজীও থাকবে, ফরাসীও থাকবে, আরবীও থাকবে, ফারসীও থাকবে, তেমনি সংস্কৃতও থাকবে। কিন্তু প্রধানত থাকবে দেশজ। থাকবে প্রাকৃত।

'সবুজপত্র' যা চেয়েছিল তা পুরাতনের সংস্কার, অন্য কথায় সংস্কার-মুক্তি। অতীত সম্বন্ধে তার মোহ ছিল না, যদিও অতীতকে সে অস্বীকার করতে চায়নি। বাইরের বিশ্বকে সে প্রাণভরে স্বাগত করেছিল, যদিও ফিরিঙ্গিয়ানার সে পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু তার পায়ের তলায় ছিল

বাংলাদেশের মাটি। বাঙালীয়ানা। বাঙালীত্বের বনিয়াদের উপরে সে গড়তে ইচ্ছা করেছিল নতুন ধরনের ইমারত। তার মালমশলা অতীত থেকে ও বিদেশ থেকে নিতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু তার স্বপ্ন, তার ধ্যান, তার পরিকল্পনা ও কারুকর্ম আধুনিক ও বাঙালী। অবশ্য এমন একটি ইমারত পাঁচ বছরে গড়া যায় না, পঞ্চাশ বছরেও না। যারা গড়বে তারা জমিদারবংশীয় বালিগঞ্জ-বাসী ব্যারিস্টার নয়। শেষ বয়সে একটু ব্রাহ্মণ্যভাবও লক্ষ করেছি। সরষের ভিতরে যদি ভূত থাকে তা হলে ভূত ছাড়াবে কে!

এখনো আমাদের মনোজীবনে অতীতের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া বাকি। যা পুরাতন তা যদি সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন হয়ে থাকে তবে তা পুরাতন বলে নয়, চিরন্তন বলে গ্রাহ্য। কিন্তু পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে তা চিরন্তন নয়, নিছক পুরাতন, তা হলে তাকে যাদুঘরে পাঠিয়ে দেওয়াই শ্রেয়। ঠাকুরঘরে তাকে স্থান দিলে ঠাকুরকে স্থান দেব কোথায়? পুরাতন যে জায়গাটা জুড়েছে সে জায়গা থেকে তাকে না হটালে নতুনকে জায়গা দেওয়া অসম্ভব। অথচ মমতা কিছুতেই কাটছে না, মোহ দূর হচ্ছে না। প্রাচীন ও আধুনিকের একটা অবাস্তব ও অলীক সমন্বয়ের চেষ্টাই দেখছি।

তখনকার দিনে 'সবুজপত্র' যে একশ্চন্দ্র ছিল তা নয়। মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিস কথাটা অত্যুক্তি। বাংলা মাসিকপত্রের সেইটেই ছিল অষ্টবজ্রসম্মিলন। এতগুলি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা একই সময়ে প্রকাশিত হয়নি তার আগে কিংবা পরে। এতগুলি প্রথম শ্রেণীর লেখকেরও একই সময়ে আবির্ভাব হয়নি। 'সবুজপত্রে'র যুগ কেবল 'সবুজপত্রে'রই নয়, আরো পাঁচ-সাতখানা আদর্শ-বাদী মাসিকের। তাদের সকলের আদর্শ অবশ্য এক ছিল না, কতকটা পরস্পর-বিরোধী ছিল। কিন্তু বিরোধ যদি আন্তরিক হয়ে থাকে তবে তাতেও প্রগতির সাহায্য হয়। আমি তখন নগণ্য বালক মাত্র। কিন্তু আমারও সাধ যেত বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে। 'সবুজপত্রে', 'প্রবাসী'তে, 'ভারতী'তে লিখতে। বিশেষ করে 'সবুজপত্রে'। পরে আমার লেখা 'প্রবাসী'তে, 'ভারতী'তে ছাপা হয়েছে। কিন্তু 'সবুজপত্রে' হয়নি, 'সবুজপত্র' আমার নজরে পড়েনি। 'সবুজপত্রে'র লেখক হবার সাধ আমার মেটেনি, তবু আমি 'সবুজপত্রে'রই একজন। আর কোনো পত্রিকার সঙ্গে আমার মনের মিল, প্রাণের মিল, দিলের মিল এতখানি হয়নি। এমন কি 'বিচিত্রা'র সঙ্গে, 'পরিচয়ে'র সঙ্গেও না। 'কল্লোলে'র সঙ্গে তো নয়ই। অথচ এদের সঙ্গেই আমার লেখকসম্পর্ক। এরাই আমাকে লেখক-হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেয়। এদের গোষ্ঠীর সঙ্গে আমি একসূত্রে বাঁধা। 'বিচিত্রা'য় 'পথে প্রবাসে' পড়ে চৌধুরী মহাশয়ের ভালো লাগে। সেই প্রথম আমার অস্তিত্ব তাঁর নজরে এল। তার আগে তিনি আমাকে চিনতেন না। তারও দু'বছর পরে প্রথম দেখা।

পিছন ফিরে তাকাচ্ছি আর মনে হচ্ছে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য যেটা সেটা হচ্ছে স্টাইল। আমাকে আকর্ষণ করেছিল 'সবুজপত্রে'র লেখক বীরবলের তথা প্রমথ চৌধুরীর লিখনশৈলী। এঁরা যে দুই নন এক, এ তথ্য তখন আমার

জানা ছিল না। তার পর সুরেশ চক্রবর্তীর স্টাইল। বলা বাহুল্য স্টাইল হচ্ছে মানুষটা। এঁরা আমাকে অলক্ষে সাহায্য করেছেন। আমার নিজের স্টাইল তৈরি হয়েছে এঁদের সঙ্গে সংগত রেখে। এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। যে রবীন্দ্রনাথ 'পলাতকা'র লেখক, 'লিপিকা'র লেখক। আরো কারো কারো নাম করা উচিত। তাঁদের সবাই কিছু 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর নন। স্টাইল বলতে আমি বুঝি প্রসাদগুণ। মাত্রাজ্ঞান। বাক্‌সংক্ষেপ। লক্ষ্যভেদ। মাধুর্য। কিন্তু ধ্বনির খাতিরে ধ্বনি নয়। বীরবলের, সুরেশ চক্রবর্তীর, এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও এ বিষয়ে একটু দুর্বলতা ছিল। বাক্যকে সুভাষিত করতে গিয়ে অর্থবিচ্যুতি বা অর্থান্তর ঘটত। শ্রুতিকে সন্তুষ্ট বা আকৃষ্ট করতে গিয়ে বুদ্ধিকে বঞ্চিত করা হতো। যথার্থতা বোধ হয় এঁদের কাছে মহামূল্য ছিল না। তার জন্যে আমাকে গান্ধীজীর কাছে পাঠ নিতে হয়েছে। এবং বহু বিদেশী লেখকের কাছে। উপরে যাকে লক্ষ্যভেদ বলেছি যথার্থতা বা প্রিসিসন না হলে তা অসম্ভব। কিন্তু কেবলমাত্র যথার্থতা থাকলেই যে লক্ষ্যভেদ হয় তাও নয়। সাহিত্য তো বিজ্ঞান নয়।

স্টাইলের জন্যে আমাকে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কাছে শিক্ষানবীশী করতে হয়েছে। তাঁর অজ্ঞাতে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা আর্ট সম্বন্ধে আমার যে ধারণা সে ধারণা আমি তাঁর কাছেই পেয়েছি। এবং তিনি পেয়েছেন যত দূর বুঝি ক্রোচের কাছে। 'প্রবন্ধসংগ্রহ' থেকে আবার খানিকটে তুলে দিই।

> "সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্যে খেলনা তৈরী করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙা লাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক—এই সব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না।…আমি জানি যে, পাঠকসমাজকে আনন্দ দিতে গেলে তাঁরা প্রায়শঃই বেদনাবোধ করে থাকেন। কিন্তু এতে ভয় পাবার কিছুই নেই, কারণ কাব্যজগতে যার নাম আনন্দ, তারই নাম বেদনা।…বিদ্যাসুন্দর খেলনা হলেও রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা—সুবর্ণে গঠিত, সুগঠিত এবং মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত। তাই আজও তার যথেষ্ট মূল্য আছে, অন্ততঃ জহুরীর কাছে। অপর পক্ষে এ যুগের পাঠক হচ্ছে জনসাধারণ, সুতরাং তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হলে আমাদের অতি সস্তা খেলনা গড়তে হবে, নইলে তা বাজারে কাটবে না। এবং সস্তা করার অর্থ খেলো করা। বৈশ্য লেখকের পক্ষেই শূদ্র পাঠকের মনোরঞ্জন করা সংগত। অতএব

সাহিত্যে আর যাই কর না কেন, পাঠকসমাজের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা কোরো না।

"তবে কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া ?—অবশ্য নয়। কেননা কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত। স্কুল বন্ধ না হলে যে খেলার সময় আসে না, এ তো সকলেরই জানা কথা। কিন্তু সাহিত্যরচনা যে আত্মার লীলা, এ কথা শিক্ষকেরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। সুতরাং শিক্ষা ও সাহিত্যের ধর্মকর্ম যে এক নয়, এ সত্যটি একটু স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু যা লোকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়, অপর পক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয় সানন্দে পান করে, কেননা শাস্ত্রমতে সে রস অমৃত। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবের মনকে বিশ্বের খবর জানানো, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো, কাব্য যে সংবাদপত্র নয়, এ কথা সকলেই জানেন। তৃতীয়তঃ অপরের মনের অভাব পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যেই শিক্ষকের হস্তে শিক্ষা জন্মলাভ করেছে, কিন্তু কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি।...

"এইসব কথা শুনে আমার জনৈক শিক্ষাব্রতী বন্ধু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সাহিত্য খেলাচ্ছলে শিক্ষা দেয়। এ কথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে সরস্বতীকে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষয়িত্রীতে পরিণত করবার জন্যে যত দূর শিক্ষাবাতিকগ্রস্ত হওয়া দরকার আমি আজও ততদূর হতে পারিনি।"

'সাহিত্যে খেলা'

আমিও।

বারো তেরো বছর বয়সে আমার মনে মুদ্রিত হয়ে যায় এ ধারণা। এর পরে অনেক বই পড়েছি, অনেক ভেবেছি, হাতে কলমে কাজ করতে করতে ঠেকে শিখেছি অনেক। কিন্তু এখনো আমার স্থির বিশ্বাস সাহিত্য হচ্ছে আত্মার লীলা। সৃষ্টিমাত্রেই তাই। নয়তো বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে তার মিলবে কেন ? মিলবে কী সূত্রে ?

প্রমথ চৌধুরী স্বয়ং কোনো দিন এই ক্ষুরধার পন্থা থেকে বিচ্যুত হননি। শিক্ষা দেননি। মনোরঞ্জন করেননি। এর পরে তিনি আরো ত্রিশ বছর ধরে কলম চালিয়েছিলেন। প্রায় বাহাত্তর বছর বয়সে লেখা 'সীতাপতি রায়' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা লক্ষ করেছেন গাণ্ডীববিরহিত অর্জুনও সেই অর্জুন। 'সবুজপত্র' ছিল না, কিন্তু সবুজ রং ছিল।

'সবুজপত্র' নেই, কিন্তু সবুজ রং আছে। থাকবে।

(১৯৫২)

দুঃসময়ের কবিতা

এই দুর্দিনেও যে বাংলার কবিরা নিরস্ত হননি, সমান উৎসাহে লেখনী চালনা করছেন, এ দৃশ্য আমাকে আনন্দ দেয়। ঢাল তরোয়াল কাস্তে কোদাল যাঁদের আছে তাঁদের আছে। যাঁদের নেই তাঁরা অকারণে হল্লা না করে কলম দিয়ে যেটুকু করা সম্ভব সেটুকু করলেও অনেক হয়। সেকাজ হয়তো আজকের কাজ নয়, হয়তো কালকের কাজ। এক দিন আগে করা হয়েছে বলে যে সেটা অকাজ, তা তো নয়। সুতরাং আনন্দের হেতু আছে। বিশেষ করে এইজন্যে যে এটা দুঃসময়।

আশ্চর্য এই যে দুঃসময়ের ছাপ তেমন করে এঁদের কারো কবিতায় পড়েনি, যদিও ছায়া পড়েছে এখানে ওখানে। জগৎ জুড়ে খণ্ডপ্রলয় চলেছে, এ দেশও তার সর্বব্যাপী কবলের বাইরে নয়। মানুষের জীবনে, জীবিকায়, বংশরক্ষায়, সঞ্চয়ে, সভ্যতায় কেমন একটা অনিশ্চিত থমথমে ভাব। যত রকম শিল্প সৃষ্টি আছে তাদের মধ্যে একমাত্র লিরিক কবিতাতেই এই ভাবটি ধরে রাখা যায়। কেননা লিরিক হচ্ছে যখনকার তখনকার। নাটক বা নভেল লিখতে বছর ঘুরে যায়। তত দিনে ঝড় এসে ঝড়ের পূর্বের তটস্থ ভাবটিকে চুরমার করে দিয়েছে দেখা যায়। তখন স্মৃতির সাহায্যে আজকের দিনটিকে পুনর্গঠন করা সহজ হবে না। সুতরাং আমাদের কবিরা যদি সাড়া দিতে চান তবে এখনকার কথা এখনি বলতে হবে।

কিন্তু কবিদের কাছে নিছক সাময়িকতা প্রত্যাশা করতে নেই। তাঁরা স্বভাবত অন্যমনস্ক। যে লোকে তাঁরা বাস করেন তার অর্ধেকটাই কল্পনা। সেখানে কালগণনার প্রথা নেই। তাঁরা যদি তাঁদের কল্পলোকের প্রতি সত্যাচরণ করেন তা হলেই যথেষ্ট। উপরন্তু যদি বাস্তববোধের পরিচয় দেন তা হলে আরো ভালো। ১৯৪১ সালে লেখা কবিতায় কেন ১৯৪১ সালের দেশ বা কাল অনুপস্থিত এ নিয়ে কবিদের সঙ্গে কোঁদল করা বৃথা। কবির মানসলীলা থাকলেই অনেক থাকল।

বলেছি, দুঃসময়ের ছাপ না পড়লেও ছায়া পড়েছে। এদিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিমলচন্দ্র ঘোষের 'দক্ষিণায়ন'। এই কবি বর্তমানের প্রতি বীতরাগ হয়ে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় দিনপাত করছেন।

> "আজ তাই দেখা যায় পৃথিবীর বিদীর্ণ গহ্বরে
> বিশুষ্ক শস্যের ক্ষেতে, শ্রমশিল্প যন্ত্রের ঘর্ঘরে
> অর্ণবে বিমানপোতে বন্দীবাসে বিচারশালায়
> নগরে পল্লীতে দুর্গে প্রাসাদে কুটীরে বনচ্ছায়
> সন্দিগ্ধ মানবমন···   ···   ···   ···
> আজ তাই শোনা যায় পৃথিবীর বিশাল আহত

ভয়াবহ বর্তমানে আতঙ্কিত অসংখ্যের মন
রণোন্মত্ত কাল করে ভীমবেগে মহানিষ্ক্রমণ।"
'বর্ষশেষ'

বইখানির বহুস্থলেই সন্দেহের, ষড়যন্ত্রের, বন্দীশালার পুনরুক্তি আছে। মানুষের মন যে বর্তমান ব্যবস্থায় তিক্ত বিরক্ত হয়ে চারি দিকে বিভীষিকা কল্পনা করছে তা এই কবিতাগুলিকেও কেমন একরকম ভয়ংকর গাম্ভীর্য দিয়েছে। এগুলি মোটেই হাল্‌কা জাতের নয়, যদিও স্থলে স্থলে হাল্‌কা হাতের।

বিষ্ণু দে-র 'পূর্বলেখ' সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলে রেখেছেন যে কবিতা-গুলির অধিকাংশই সামাজিক উপলক্ষে বা ফরমায়েসে লিখিত। তা হলেও সেগুলি সামাজিকতার ধার ধারে না। বরং গাঢ়তর সমাজভাবনার গুরুভার। শ্লেষ দিয়ে কবি তাঁর ক্লেশ ভুলতে চেয়েছেন। ক্লেশ এই দুঃসহ সমাজ ব্যবস্থার।

"গণ্ডেরির মহারাজা পার্টি দেয়, মুঠি মুঠি প্রাচুর্য ছড়ায়,
বাগানবাড়ীতে আসে নির্মন্ত্রিত ছলে বলে এবং কৌশলে...
রাজা শুধু ম্রিয়মাণ, বিলাতী কুকুর তার পড়ে গেছে খাদে,
নর্তকীর সঙ্গীত ও গায়িকার নৃত্যশোভা তাই তোলপাড়
করে না বুঝি বা শুধু বনিয়াদী তারই চিত্ত। বেলোয়ারী ঝাড়
একে একে নিভে যায়। বমনবিধুর সেই ঘরের কোণায়
অন্ধকার ছিঁড়ে যায়। পাহাড়ের সূর্য ওঠে রক্তাক্ত সোনায়॥"
'পার্টির শেষ'

ক্ষয়িষ্ণু ঊর্ধ্ব শ্রেণীর হাস্যকর অন্ত্য দশা বিষ্ণুবাবুকে আগের চেয়ে অনেকটা হাল্‌কা করেছে, যদিও তিনি তাঁর কমরেডদের মতো নিঃসংশয় নন যে,

"মার্ক্‌স্‌ না মথি শুনেছি নাকি বলে,
কল্কি যবে বৃহন্নলা বেশে
চালাবে রথ, মাড়াবে দলে দলে,
শুনিবি তাতে ইতিহাসেরই হ্রেষা।"
'মুদ্রারাক্ষস'

দুর্যোগের ছায়া ফিকে হয়ে এসেছে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'শিবির' গ্রন্থে। তবু স্থানে স্থানে জমাট বেঁধেছেও।

"বারুদের গোলা, ক্ষেত, শূন্য এ খামার।
গুণ্ঠনের অন্য পাশে চোখের বিদ্যুতে
কি ছায়া চমকালো।
আসন্ন ঝড়ের দিকে রাত জমকালো।"
'হাট'

বিষ্ণুবাবুর শ্লেষ যেমন উপভোগ্য কামাক্ষীপ্রসাদের তেমনি এক একটি

ইমেজ। তাঁর এই গুণটির বিকাশ হলে বহু অনাবশ্যক ভঙ্গি অন্তর্হিত হবে। এ কথা বলা চলে অশোকবিজয় রাহার বেলাতেও। এঁর কবিতাও ইমেজ-প্রধান। অর্থাৎ ইনিও ছবি আঁকেন বা আভাসিত করেন।

"নদীর ও পারে আকাশে আবির ঝড়
আল্‌তা গলেছে জলে,
হাওয়া-জানালায় চোখে মুখে কাঁপে ঝিকিমিকি আবছায়া,
ধু ধু হাওয়া এলোচুলে—
দূরে এক কোণে পলাশের ডালে আগুন লেগেছে চাঁদে।"
'ফাগুন'

এমন সুন্দর বর্ণনা বহুকাল চোখে পড়েনি। অশোকবিজয় রূপরসিক। জগদীশ ভট্টাচার্যেরও রসবোধ সুপরিণত। তাঁর লিপি-কুশলতা স্থলে স্থলে মাত্রাতিরিক্ত না হলে আরো খুশি হওয়া যেত। ক্ষমতাকে সংযত না করলে তা অক্ষমতায় দাঁড়ায়। তাঁর রচনা অনুভূতিপ্রধান।

"চির চঞ্চল পথে তুমি চলো ওগো চপলাক্ষী
যারা যেতে পারে তারা কি বুঝিবে না-পারার বেদনা,
নিজেরি রচিত নীড়ে যে হয়েছে প্রলয়ের সাক্ষী
দুঃসহ তার জ্বালা সহিবার আছে কার সাধনা।"
'ত্রিশঙ্কু'

প্রজেশকুমার রায়ের লেখা আন্তরিকতায় ভরা। সবগুলি হয়তো কবিতা হয়ে ওঠেনি, উচ্ছ্বাস থেকে গেছে। কিন্তু যে কয়টি উৎরেছে সে কয়টি আদরণীয়।

"চিন্তার রেখা দেখা দেয় ভালে অকালেই আসে টাক,
রাজবেশই বটে, জামায় জুতায় তালি—
আগাগোড়া এই কাহিনীটা যেন পরিহাস লাগে খালি,
রাজার পুত্র ঘরে কথা শোনে, আপিসেতে খায় গালি।"
'কাহিনী'

হরগোপাল বিশ্বাস আপনাকে রাজার পুত্র বলে কল্পনা করেননি, তাই নিরাশ হননি। তিনি মাটির ছেলে, চাষীর ঘরে মানুষ। এত দিন পরে এই একজনকে পাওয়া গেল যিনি সত্যি সত্যি 'গণসাহিত্যিক'। অর্থাৎ সহানুভূতি-সূত্রে না, জন্মসূত্রে। তাঁর বইখানি পাড়াগাঁয়ের হালচালে সরস, মৃত্তিকার সৌরভ লেগে রয়েছে তার গায়ে।

"জাল লয়ে কোলে যারা গিয়েছিল সবাই পেয়েছে কিছু
খালি পলো হাতে ফিরে কেহ বাড়ি মনোদুখে মাথা নীচু।
দোঁড়া ও পলোতে ধরেছি বোয়াল মৃগেল নওলা ফলি
হাতকে কাৎলা দুটি বাদে আর গেছে দোঁড়া ছিঁড়ে চলি।

বাটা পুঁটি ফ্যাঁসা খলসে খয়রা বেশালে পড়েছে চেলা
কোলের মাছের গল্পে ক'দিন কাটে অবসর বেলা।"
'কোলের মাছ ধরা'

মাছের গল্প শুনে কেউ কিন্তু ভাববেন না যে মাছের দর 'এক পয়সায় একটি'। বুদ্ধদেব বসু পরীক্ষা করতে চান ষোলটি কবিতা ষোল পয়সায় দিলে জনগণের পাতে পড়ে কি না। এই প্রচেষ্টা আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। উপরে যে সব এক টাকা দেড় টাকার কবিতার বইয়ের নাম করেছি বুদ্ধদেবের এ বই তাদের কোনোটির চেয়ে কম দামী নয়, যদিও কমদামী। একটি নমুনা দিই।

"পাপের প্রাচীর দিকে দিকে হবে ভগ্ন
আবার আসবে শিল্পীর শুভ লগ্ন।—
পুঁথিতে রুদ্ধ ক্ষুব্ধ প্রাণের স্বপ্ন রচনা করে
আমাদের দিন যায়
পুঁথি ফেলে দিয়ে তাকালে আপন গোপন মর্মতলে,
ফিরে গেলে তুমি মাটিতে, আকাশে, জলে।
স্বপ্ন আলসে অলস আমরা তোমার পুণ্যবলে
ধন্য, যামিনী রায়।"
'যামিনী রায়কে'

(১৯৪১)

তিনটি পল্লীগাথা

জনসাধারণকে আমরা মৌন মূক ম্লান করে রেখেছি। তারা যে কী ভাবে কী বলে আমরা কোনোদিন শুনতে যাইনে। তারা যদি আপনি এসে শোনাতে চায় আমরা শুনতে চাইনে। আমাদের ব্যবহার দেখে মনে হয় আমরাই দেশ, আমরা যা ভাবব তাই দেশের ভাবনা, আমরা যা বলব তাই দেশের বক্তব্য। এই যখন আমাদের মনোবৃত্তি তখন আমাদের কানে পল্লীকবিতা অরুচিকর তো হবেই। কানকেও আমরা তৈরি করেছি সংস্কৃত এবং ইংরেজী ছাঁদে। খাঁটি দেশজ শব্দ সেখানে শ্রদ্ধা পায় না, খাঁটি দেশী সুর তেমন সাড়া তোলে না। আধুনিক বাংলা কবিতার এক কান ইংরেজী, আর-এক কান সংস্কৃত। আসল বাংলার জন্যে আধুনিকদের কান নেই।

গৌরীহর মিত্রের 'বীরভূমের ইতিহাসে' অনেকগুলি পল্লীগীতি সংগৃহীত হয়েছে। তাদের থেকে তিনটির নমুনা আমি নিচে দিচ্ছি। তিনটিরই ছন্দ এক। বিষয় অবশ্য আলাদা। এ ধরনের ছন্দ আমি আগে কোথাও দেখিনি বা শুনিনি বলে আরো মুগ্ধ হয়েছি।

১। শ্রীকৃষ্ণের ফল ভক্ষণ

অবধান কর কিছু নিবেদন করি
গোকুলে আনিল ফল এক মাগী বুড়ী।
একটা ঝুড়ি মাথে,
একটা ঝুড়ি মাথে, বসলো পথে, লঞা একটা ঢেলে।
ডেকে বলে—ফল নাওসে, যত গোপের ছেলে।
বাপু সব দৌড়ে আয়,
বাপু সব দৌড়ে আয়, ডাকছে তায়, ডাকছে ঘনে ঘনে।
শ্রীদাম বলে—ও ভাই কানাই, বুড়ী ডাকছে কেনে।
ইহার সব বৃত্তান্ত,
ইহার সব বৃত্তান্ত, কিছু অন্ত, জান তো গুণের ভাই।
ডাকছে, বুড়ী, ধীরি ধীরি, চল কেন্নে যাই।······

২। বানভাসীর গান

নদী সে দামোদরে বড়াকরে, করছে আনাগোনা
দু' ধার মিশায়ে ভাঙ্গে শেরগড় পরগণা।
এল বান পঞ্চকোটে,—
এল বান পঞ্চকোটে, নিলেক লুটে, ভাঙ্গলো রাজার গড়।
দুড়্ দুড়্ শবদে ভাঙ্গে পর্বত পাথর।
মিশায়ে নালা খোলা—
মিশায়ে নালা খোলা, বানের খেলা, নদীর হলো বল।
দামোদরে জড়ো হ'ল চৌদ্দ তাল জল।
নদীতে আঁটিবে কত,—
নদীতে আঁটিবে কত, শত শত, নৌকা ভাসে জলে।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে।······

৩। অথ বিদ্রোহী সাঁওতালগণের কবিতা

শুন ভাই, বলি তাই, সভাজনের কাছে
শুভবাবুর হুকুম পেয়ে সাঁওতাল ঝুকেছে।
বেটারা কোক ছাড়িল—
বেটারা কোক ছাড়িল, জড় হইল, হাজারে হাজারে
কখন এসে কখন লোটে থাকা হল্য ভার।

হলো সব দুভ্যাবনা—
হলো সব দুভ্যাবনা, রাড় কান্দনা, সবাই ভাবে বসে
ঘড়া ঘটি মাটিতে পোতে কখন লিবে এসে।······

করিয়া বহু দম্ফ—
করিয়া বহু দম্ফ, দিল ঝম্ফ, পড়িল নদির জলে
সাতারিয়া পার হইল হাজার সাঁওতালে।

বলে সব মার মার -
বলে সব মার মার, ধর ধর এই মার্ত্ত রব
আজি সিহুড়ি জেলা লোটব গিয়ে করে পরাভব।
জাব সব জেহালখানা—
জাব সব জেহালখানা, দিব থানা, মুক্ত করিব চোরে
শুভবাবু রাজা হবেন জ্যজ সাহেবকে মেরে।… ··

ঐ গ্রাম নিবাস—
ঐ গ্রাম নিবাস, সাধু দাস, তার সঙ্গে জনা চারি
সিহুড়ি আসি জজ্যের কাছে বলেছ বিনয় করি।
আরত্য প্রাণ বাঁচে না—
আরত্য প্রাণ বাঁচে না, কি মন্তনা, কছ্যেন হুজর বস্যে
ঘর কর্ণ্যা পুড়ায়ে আমার ভাইকে কাটলে সেষে।……

শেষের কবিতাটির রচয়িতা রাইকৃষ্ণ দাশ। ঘটনাটি ১২৬২ সালের। কবির নিবাস কুলকুড়ি গ্রাম লুট হয় ২৩শে শ্রাবণে। ভনিতায় সেসব কথা আছে। মাঝের গীতিকাটি নফর দাসের। ঘটনাকাল ১২৩০ সাল। প্রথম গাথাটির কবি দ্বিজ বলরাম। তাঁর বাড়ি গোবিন্দপুর। দ্বাপরযুগের ঘটনা, রচনা কবেকার উল্লেখ নেই।

সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করে গীতিকা বা কবিতা লেখার রেওয়াজ লোকসাহিত্যেও ছিল, তার প্রমাণ গৌরীহরবাবুর বই থেকে পাওয়া গেল। এ রেওয়াজ কি লোপ পেয়ে গেছে ? যদি না পেয়ে থাকে তো এই যুদ্ধ সম্বন্ধে পল্লীকবিরা কী লিখেছেন বা রচেছেন তা জানতে ইচ্ছা করে।

(১৯৪৪)

‘হারামণি’

রসনির্ঝরে দুটি ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে আসছে যুগের পর যুগ। একটির নাম সাহিত্য, অপরটির লোকসাহিত্য। ধারা দুটি কখনো ভিন্ন, কখনো অভিন্ন। কখনো বিচ্ছিন্ন কখনো অবিচ্ছিন্ন।

সাহিত্যের গৌরবময় যুগে দেখা যায় লোকসাহিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিগূঢ়। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী লোকসাহিত্যরূপে শুরু, সাহিত্যরূপে শেষ। কানু বিনা গীত নেই। সেই কানুর গীত লোকসাহিত্য থেকে সাহিত্যে এসেছে। হোমরের ইলিয়াড, কালিদাসের শকুন্তলা, শেক্‌স্‌পীয়ারের হ্যামলেট, গ্যেটের ফাউস্ট লোকসাহিত্যনির্ভর।

লোকসাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্র ক্ষীণ হলে সাহিত্যের রসসঞ্চয় ক্ষয়ে আসে, এর জন্যে আমাদের বেশী দূর যেতে হবে না। এ কালের বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই চলবে। বই লেখা হচ্ছে বিস্তর, বইয়ের কাটতিও দেদার। কিন্তু লোকসাহিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক লুপ্তপ্রায়। সেইজন্যে রসের ভাণ্ডারও নিঃশেষিত হয়ে আসছে। এ কথা কবিতার বেলা বিশেষ করে খাটে।

আমাদের অহংকার আমাদের প্রধান শত্রু। যারা লেখাপড়া জানে না, গ্রামে গ্রামে ঘোরে, ভিক্ষা করে খায় তারাও যে সাধ্যমতো রসসৃষ্টি করছে এ আমরা জানিনে বা মানিনে। তারা যদি কলাবিদ্যা জানত তা হলে তাদের রচনা সাহিত্য বলেই গণ্য হতো, কলাবিদ্যা জানে না বলে তাদের দ্বারা যা হচ্ছে তা লোকসাহিত্য। তবু তার মূল্য আছে। দেশের অগণিত নরনারীর তৃষা মিটছে তাতে।

বাংলার লোকসাহিত্যের ধারা কোনো দিন শুকিয়ে যায়নি, যাবেও না কোনো দিন। দেশবিভাগ সত্ত্বেও সে ধারা তার প্রবাহ রক্ষা করবে। এর প্রমাণ জনাব মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত 'হারামণি'। এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে দেশ বিভাগের পরে ঢাকায়। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাত বছর আগে। প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করে কলকাতায় উনিশ বছর আগে। দেখা যাচ্ছে দেশ দ্বিধাবিভক্ত হলেও লোকসাহিত্য তেমনি অবিভক্ত। তার মানে লোকচিত্ত এক ও অবিভাজ্য।

'হারামণি' হচ্ছে লোকসংগীত সংগ্রহ। লোকসংগীতকে আমি লোকসাহিত্য বলছি সেই কারণে, যে কারণে পদাবলীকে বলা হয় কাব্য। বাউলের গান, মেয়েলি গান, বারমাসী, জাগ গান, সারি গান, দেহতত্ত্ব যেখানে যা পাওয়া গেছে লিখে নেওয়া হয়েছে। রাজশাহী, পাবনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল ও নোয়াখালী এই কয়েকটি জেলার উল্লেখ আছে। কোনো একটি গান রাজসাহী জেলায় শোনা গেছে বলে যে তা রাজশাহী জেলার গান, মালদহের বা দিনাজপুরের নয়, কেউ এ কথা হলফ করে বলতে পারে না। কোন গানের বয়স কত বলবার উপায় নেই। বিশ পঁচিশ বছরও হতে পারে, দু-এক শ বছরও হতে পারে। ভাষা থেকে খুব প্রাচীন বলে মনে হয় না, তবে এমনো হতে পারে যে মুখে মুখে ঘুরতে ঘুরতে ভাষা বদলে আধুনিক হয়েছে।

এই তিনটি খণ্ডের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ লালন ফকিরের গান। লালনের বাড়ি কুষ্টিয়ার কাছে। তাঁর জন্ম হিন্দুর বংশে। এক মুসলমান মহিলা তাঁর

প্রাণরক্ষা করেন। পরে তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর সাধনা তাঁকে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মর্মস্থলে নিয়ে যায়। তিনি ছিলেন মরমী সাধক। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। 'হারামণি' থেকে তাঁর গানের অংশ তুলে দিচ্ছি।

"চাতক স্বভাব না হলে
অমৃত মেঘের বারি কথায় কি মিলে ?
চাতকের এমনি ধারা
তৃষ্ণায় জীবন যাবে রে মারা
তবুও অন্য বারি খায় না তারা মেঘের জল বিনে।"

"অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়
ভজন সাধন মুখের কর্ম !
ও দেখো তার সাক্ষী চাতক হে
অন্য বারি খায় না সে।"...

"সাঁইজীর লীলা বুঝবি ক্ষ্যাপা কেমন করে
লীলাতে নাইরে সীমা কোন সময় কোন রূপ ধরে !
গোসাঁই গঙ্গা গেলে গঙ্গাজল হয়
গোসাঁই গর্তে গেলে কূপজল হয়
গোসাঁই অমনি করে ভিন্ন জনায় সাধুর বেশ বিচারে।
গোসাঁই আপনার ঘরে আপনি ঘুরি
গোসাঁই সদা করে রস চুরি জীবের ঘরে ঘরে।"

"যে রূপে সাঁই আছে মানুষে
তালার উপর তালা
তাহার ভিতর কালা
মানুষ ঝলক দেয় সে দিনের বেলা শুধু রসেতে।"...

কেবল লালন ফকিরের গানে নয়, অন্যান্য বাউল ফকিরের গানেও আমরা এই একই সুর, একই তত্ত্ব পাই। এঁরা ভগবানের অন্বেষণ করেন মানুষের মধ্যে, আপনার মধ্যে। "এই মানুষে আছে সেই মানুষ।" জীবাত্মার অন্তরে পরমাত্মা। এই কথাটি বলা হয়েছে নানা ভাবে ও নানা ভঙ্গিতে। নমুনা দিচ্ছি ঃ

"আমি মন পাইলাম মনের মানুষ
পাইলাম না
আমি তার মধ্যে আছি মানুষ
তাহা চিনল না।"...

"মানুষ হাওয়ায় চলে হাওয়ায় ফিরে,
মানুষ হাওয়ার সনে রয়
দেহের মাঝে আছে রে সোনার মানুষ
ডাকলে কথা কয়।
তোমার মনের মধ্যে আছে আর এক মন গো
তুমি মন মিশাও সেই মনের সাথে।"...

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখী
কেমনে আসে যায়।"...

এসব গান একটা বিশিষ্ট সাধনমার্গের বার্তা বহন করে আনে। রচয়িতারা সাধক। শ্রোতারা সাধনায় বিশ্বাসী। সুতরাং এসব গান ঠিক জনসাধারণের নয়। তা হলেও সাহিত্যের বিচারে উত্তীর্ণ হবার মতো পদ বহু স্থলে বিকীর্ণ। এই যেমন—

"প্রেম করো মন প্রেমের তত্ত্ব জেনে।
প্রেম করা কি কথার কথা,
গুরু ধরো চিনে।
প্রেমেতে এই জগৎ বাঁধা
মোহম্মদ আর আপনে খোদা
হায় গো প্রেম করো মন প্রেমতত্ত্ব জেনে।
চণ্ডীদাস আর রজকিনী
প্রেম করেছিল তারাই শুনি
আর এক মরণে দু'জন মলো প্রেম-সুধা পানে।"

এগুলিকে লোকসংগীত বলাতে যদি কারো আপত্তি থাকে তাঁকে বারমাসী পড়তে বলি। বারমাসী কোনো ব্যক্তির রচনা নয়, হলেও সে ব্যক্তি বিরহিণী নারী মাত্রেরই মুখপাত্র। বাংলা সাহিত্যে বারমাসীর বয়সের গাছপাথর নেই। আদিকাল থেকে এ সব গান মুখে মুখে ফিরছে। কিছু উদ্ধৃত হলো ঃ

'মাসে মাসে পত্র লিখি সাধু জলদি আর,
জলদি আয়, জলদি আয়।
কত পাষাণ বেধেছে সাধু বৈদাশে,
বৈদাশে, বৈদাশে।
ফাগুন মাসে রোদের জ্বালা,
চৈত্র মাসে নারীর শরীর কালা
বৈশাখ মাসে গেল নারীর অঙ্গে বায়,
রঙ্গে বায়, রঙ্গে বায়।

ঘরের সাধু দূরে যায়, মন লাগে
মোর উদাস হয়,
মাসে মাসে পত্র লিখি সাধু জলদি আয়,
জলদি আয়, জলদি আয়।
কত পাষাণ বেধেছে সাধু বৈদাশে,
বৈদাশে, বৈদাশে।"

"যৌবনজ্বালা বড়ই জ্বালা
সইতে না পারি
যৌবনজ্বালা তেজ্য করে
জলে ডুবে মরি।
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।
ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া সাদু
বান্দিও লাওয়ের গুড়া
তুমি সাদু না যাইও বাণিজ্যে
যাবে তোমার খুড়া।
ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া সাদু
বান্দিও লায়ের বাতা
তুমি সাদু না যাইও বাণিজ্যে
যাবে তোমার দাদা!
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।"...

সারি গান এর চেয়ে আরো সরস। তবে সব সময় শ্লীল নয়। একটু শোনা যাক—

"ওহে যে পুষ্করিণী নাইকো জল
কি করিবে কূপে
যে নারীর সোয়ামী নাই
তার কি করিবে রূপে!
জামাই আজকে পরবের দিনে
মান্য কোথাও রবে না।
ওহে দায়ের মিঠা বালু রে
কুড়ালের মিঠা শিল
ভাল মানুষের জবান মিঠা
কামিনীর মিঠা কিল।
জামাই আজকে পরবের দিনে
মান্য কোথাও রবে না।"...

মেয়েলি গানের লেখাজোখা নেই। বেশীর ভাগই মুসলমানের ঘরের। তবে হিন্দুর ঘরের সঙ্গে খুব বেশী তফাৎ নেই। একটু কান পেতে শোনা যাক—

“হলদি কোটা কোটা জামাই মোটা মোটা
সেও হলদি কোটব না, সেও বিয়ে দেব না।
কাঁচা মেয়ে দুধের সর
কেমনি করবি পরের ঘর।
পরে ধরে মারবি, থাম ধরিয়া কাঁদবি।
কান্‌ছি কোনা ছিট্‌কির ডাল,
ডাল দিয়া উঠাবি পিঠের খাল।”…

আর একটি মেয়েলি গান ভারি মজার! সেটি চুপি চুপি শোনা যাক—

“কুন বা ঘরে সুতিব গো বিমা হুঁ হুঁ হুঁ
সুতগা সুতগা শ্বশুরের ঘরে।
শ্বশুর তো ড্যারা কাটিছে গো বিমা
হুঁ হুঁ হুঁ।
সুতনা ভাসুরের ঘরে।
ভাসুর তো কোরান পড়িছে গো বিমা
হুঁ হুঁ হুঁ।
সুতনা নন্দের ঘরে।
নন্দ তো ঘুম পাড়িছে গো বিমা হুঁ।
তো সুতগা গরুর ঘরে।
গরু তো হামবা হামবা করিছে গো
বিমা হুঁ হুঁ।
সুতনা ভেড়ীর ঘরে।”…

আর না। প্রলোভন সংবরণ করতেই হলো। প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে পড়ছে। জনাব মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন তাঁর বিশ বছরের অধ্যবসায়ে যে মধুচক্র রচনা করেছেন “গৌড়জন তাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।” দেশ তাঁর কাছে ঋণী।

(১৯৪৯)

বাংলা উপন্যাস

বছর দশ বারো আগে আমি বাংলা উপন্যাস পড়া বন্ধ করে দিয়েছিলুম। বুর্জোয়ারা লিখছে বুর্জোয়াদের জন্যে বুর্জোয়াদের কথা। ও আর কী পড়ব! তাও যদি সত্য ঘটনা সুন্দর করে লিখতে জানত। লেখা যে একটা আর্ট

এটাও তারা শিখবে না। লেখা হয়েছে একটা ইন্‌ডাস্‌ট্রি। যুগটা ইন্‌ডাস্‌ট্রির যুগ। আর্টের যুগ তো নয়।

তার পরে ভেবে দেখলুম ও ছাড়া আর কী হতে পারত! আমার এক নম্বর অভিযোগ তো এই যে লিখছে বুর্জোয়ারা। কিন্তু বুর্জোয়ারা না লিখলে কি মজুরচাষীরা লিখত? মজুরচাষীরা লিখতে চাইলে কি কেউ কোনো দিন তাদের বাধা দিয়েছে? ওরাও লিখবে না, এরাও লিখবে না। তা হলে লিখবে কে? জানি এক দিন সূর্য উঠবে, কিন্তু তত দিন চন্দ্র অতন্দ্র থাকলে ক্ষতি কী? চন্দ্র অস্ত গেলেই কি সূর্য তৎক্ষণাৎ উঠবে? একাদশীর চন্দ্রাস্তের পর কি অবিলম্বে সূর্যোদয় ঘটে? না, তা ঘটে না। যত দিন সাহিত্যের ভার চাষীমজুরদের হাতে পড়েনি ততদিন সে ভার বুর্জোয়াদের হাতেই থাকবে। উপায় নেই।

তা না হয় হলো। কিন্তু বুর্জোয়ারা কেন সর্বসাধারণের জন্যে লেখে না? কেন লেখে শুধু বুর্জোয়াদের জন্যে? এই আত্মকেন্দ্রিকতার হেতু কী? হেতু অস্পষ্ট নয়। বই লিখে ছাপাতে যে খরচটা হয় সেটা সর্বসাধারণ দেয় না। দেয় বুর্জোয়ারাই। লেখকদের যদি জমিদারি থাকত তা হলে বই লিখে জমিদারির টাকায় ছাপানো যেত। বুর্জোয়াদের কাছে হাত পাততে হতো না। কিন্তু সে দিন কি আর আছে? এখন বুর্জোয়ারা কিনবে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত না হয়ে কোনো প্রকাশক বই ছাপেন না। ক্রেতার মুখ চেয়ে লিখতে হয়। উপায় নেই।

বেশ। কিন্তু বিষয়টা কেন সেই থোড় বড়ি খাড়া? যে দেশে তরিতরকারির অভাব নেই, বিচিত্র শাক সবজি, সে দেশে কেন খাড়া বড়ি থোড়? এত বড়ো কৃষক সমাজ আর কোনো দেশে আছে কি? শ্রমিক বলতে যদি গ্রাম্য কারিগরকেও বোঝায় তো এত বড়ো শ্রমিক সমাজ আর কোন দেশে আছে? কামার কুমোর তাঁতী ছুতোর গয়লা নাপিত মুচি কসাই দর্জি মেথর ডোম এমনি হাজারো নাম। ইউরোপ হলে এদের এক একটা ট্রেড ইউনিয়ন বা সিণ্ডিকেট থাকত। ভারতবর্ষ বলে এদের এক একটা জাত। এদের কথা কি লেখা যায় না?

লেখা যায়। কিন্তু যারা লিখবে তারা ওদের সঙ্গে মিলেমিশে একাত্ম হবে অভিন্ন হবে, তবে তো ওরা মন খুলবে। ওদের মুখের ভাষা শিখে নেওয়া শক্ত নয়, কিন্তু মনের ভাষার বর্ণপরিচয় বড়ো কঠিন। আমরা ইংরেজী জানি, কিন্তু ইংরেজকে জানিনে। তেমনি ফিরিওয়ালার বুলি জানি, কিন্তু ফিরিওয়ালাকে জানিনে। বহু ভাগ্যে একজন কাবুলিওয়ালা রবীন্দ্রনাথের কাছে মন খুলেছিল। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় বুর্জোয়া লেখকদের মজুরচাষীরা বুলিওয়ালা। ওরা সত্যিকার মজুরচাষী নয়, বুর্জোয়াদের চোখে মজুরকে চাষীকে যেমন দেখায় ওরা তেমনি। অর্থাৎ অর্ধেক বুর্জোয়া।

বুর্জোয়ারা লিখবে বুর্জোয়াদের জন্যে, অথচ প্রোলিটারিয়ানদের সম্বন্ধে, এটা আমার প্রত্যাশা করাই অন্যায় হয়েছিল। যারা লেখে তারা যদি-বা ও

বিষয়ে লেখে যারা পড়ে তারা কদ্দিন আগ্রহের সঙ্গে পড়বে! পরের ব্যাপারে আগ্রহ বেশী দিন থাকে না। কিছু দিন পরে ক্লান্তি আসে। সেইজন্যে ‘কল্লোল’ কাগজে যাঁরা সমাজের নিচের তলার কথা লিখতেন তাঁরাই তাঁদের পাঠকদের উৎসাহ না পেয়ে উপরের তলার কথা লিখতে লাগলেন। এ রকম আরো ঘটেছে। ঘটবেও। পরের বিষয়ে কৌতূহল সহজেই বাসি হয়ে যায়, যদি না পরকে আপন করার কৌশল জানা থাকে। তার মানে প্রোলিটারিয়ানের অন্তরে যে শাশ্বত ও সার্বদেশিক মানুষটি আছে তার সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই। এ ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের ছিল বলেই কাবুলিওয়ালা বাঙালীর আপন লোক হয়েছে। এ ক্ষমতা যাঁদের নেই তাঁরা হয়তো কাবুলিকে বাঙালী করে তুলবেন, কিন্তু কাবুলিকে কাবুলি রেখে বাঙালীর ঘরের লোক করতে পারবেন না। তেমনি চাষীকে ভদ্রলোক করে বসবেন, কিন্তু চাষীকে চাষা রেখে আত্মীয় করতে অক্ষম হবেন।

এই দশ বারো বছরে আমি অনেক ধারণা বিসর্জন দিয়েছি। তাই বাংলা উপন্যাসের কাছে আমার প্রত্যাশা অল্প। এখন আমার প্রত্যাশা অল্প বলে যখন যা হাতে পাই পড়ি বা পড়বার অবসর খুঁজি। যিনি যা জানেন তিনি তাই নিয়ে লিখুন। ফাঁকি না দিলেই হলো। যদি মানবহৃদয়ের ঠিক সুরটি বাজে তা হলে বুর্জোয়ার জন্যে বুর্জোয়ার বিষয়ে বুর্জোয়ার লেখা বলে না-মঞ্জুর হবে না। শাশ্বত ও সার্বদেশিক মানুষের কাহিনী যদি হয় তো ভাবী কালের প্রোলিটারিয়ান পাঠকও আপনার করে নেবে।

(১৯৪৭)

উপন্যাসের ভবিষ্যৎ

আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি উপন্যাসের উপর পাঠক সাধারণের পক্ষপাত কমবে না। উপন্যাস লোকে চাইবেই, তাদের চাহিদা মেটানোর জন্যে উপন্যাস আমরা লিখবই। তা হলে ভাবনা কী নিয়ে?

ভাবনা এই নিয়ে যে উপন্যাস তো কেবল কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে নয়। উপন্যাস হচ্ছে আর্ট। আর্ট হচ্ছে সভ্যতার ফুল। যে দেশে সভ্যতা নেই সে দেশেও রাশি রাশি উপন্যাস লেখা হতে পারে, লক্ষ লক্ষ পাঠক দিনে একখানা করে পড়তে পারে, কিন্তু “বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলিল এক।”

দক্ষিণ আফ্রিকা এত বড়ো দেশ। ও দেশের একখানিমাত্র উপন্যাস সব দেশে আদর পেয়েছে, অলিভ শ্রাইনার প্রণীত ‘আফ্রিকার একটি গোলাবাড়ির গল্প’। তাও সত্তর বছর আগে লেখা। কই, আর কোনো উপন্যাসের নাম তো শোনা যায় না। এর কারণ কি উপন্যাসের অভাব, ঔপন্যাসিকের অভাব?

না, সভ্যতার অভাব। সভ্যতা মানে লেখাপড়া জানা নয়, আদবকায়দা জানা নয়। সভ্যতা হচ্ছে ভালো মন্দ যাচাই করার ক্ষমতা, সভ্যতা হচ্ছে ধর্মাধর্ম জ্ঞান, নীতি-অনীতি বোধ, রুচি-অরুচি বিচার। যেখানে সভ্যতা নেই সেখানে সত্যিকারের ভালো জিনিসের কদর নেই, তেমন জিনিস যদি বা কেউ লেখে তবে প্রকাশক জোটে না কিংবা রাষ্ট্র বিরূপ হয়।

আমাদের দেশে সভ্যতার অভাব ঘটবে কি না জোর করে বলা যায় না। ভবিষ্যদ্বাণী করা আমার সাধ্য নয়। অনেক সময় মনে হয় গ্রীস রোমের বেলা যা হয়েছে, জার্মানীর বেলায় যা হচ্ছে, আমাদের বেলাও তাই হতে পারে। অর্থাৎ সভ্যতা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসবে। বই লেখা হবে বিস্তর, কিন্তু তৃপ্তি দিতে পারে এমন বই মিলবে না একটিও। কারণ আমরা দিন দিন অবোধ হয়ে উঠছি। বর্বরতাই আমাদের চোখে শক্তিমত্তা বলে প্রতিভাত হচ্ছে। যা কিছু কোমল, যা কিছু কমনীয়, যা কিছু সুন্দর ও সত্য তা আমাদের কাছে দুর্বলতার ছদ্মবেশ বোধ হচ্ছে।

তা ছাড়া আর একটি শক্তিও কাজ করছে। যে শক্তি রাশিয়ার রূপান্তর ঘটিয়েছে, চীনের রূপান্তর ঘটাচ্ছে সে যদি ভারতকে হাতে পায় তা হলে তার রূপান্তর ঘটানোর জন্যে উপন্যাসকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করবে। তার সঙ্গে তর্ক বৃথা, কারণ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের জন্যে সে বদ্ধপরিকর। উপন্যাস যেহেতু জনগণের প্রিয় সেহেতু যন্ত্রহিসাবে সার্থক।

এইসব কারণে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করব না। তবে যে কোনো ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত থাকব।

(১৯৫০)

উপন্যাসের সাধনা

আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস পড়ে আমার বিদগ্ধ বন্ধু বললেন, প্রত্যেকের জীবনে এমন কিছু ঘটে যা নিয়ে একখানা উপন্যাস অনায়াসে লেখা যায়।

কথাটা আমার মনে ধরেনি। তিনি বোধ হয় বলতে চেয়েছিলেন যে ঐ একখানাই আমার দ্বারা হবার ছিল। তার বেশী হবার নয়। ইতিমধ্যে আমি কিন্তু আরো একখানা উপন্যাস লিখে বসে আছি ও বিরাট এপিক উপন্যাসের ভিৎ গাঁথছি। বস্তুত আমার প্রথম-প্রকাশিত উপন্যাস আমার প্রথম-লিখিত উপন্যাস নয়। বন্ধুর কথা সত্য হলে আমার প্রথম জাতকের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

সেখানি যখন প্রকাশিত হবে—আমি মনে মনে ভাবি—তখন দেশময় সাড়া পড়ে যাবে। তেমন উপন্যাস কেউ কোনোদিন পড়েনি, কারণ তেমন অভিজ্ঞতা আর কোনো লেখকের হয়নি। কিন্তু সে বই প্রকাশ করার পর দেখা গেল

সমাদর নয়, অনাদর তার পাওনা। আমার বন্ধুও বিশেষ কোনো মন্তব্য করলেন না। মনে লাগল।

কেন এমন হলো? নিজেকে প্রশ্ন করবার সময় এল পাঁচ বছর অপেক্ষা করার পরে। কেন একখানা বই জনপ্রিয় হলো, আর একখানা—সেইখানাই প্রাণ দিয়ে লেখা—উপেক্ষিত হলো? তবে কি সেটা এতই উচ্চাঙ্গের যে এ যুগের লোক তার কদর বুঝবে না, বুঝবে পরবর্তী যুগ? কিংবা এ দেশের মানুষ তার জন্যে প্রস্তুত নয়, অনুবাদ করে বিলেতে ছাপাতে হবে?

শুরু হলো কঠোর আত্মপরীক্ষা। এক এক করে অনেকগুলো কারণ আবিষ্কার করা গেল। এক এক করে লিপিবন্ধ করা যাক। প্রথমত, তোমার মনে রাখা উচিত ছিল যে আর সব বিষয়ের মতো উপন্যাসেরও একটা সাধনা আছে। তোমার হয়তো জীবনের অভিজ্ঞতা আছে, তা বলে লিখনের অভিজ্ঞতা আছে তা তো নয়। লিখেছ তো গোটা কয়েক প্রবন্ধ আর কবিতা। তার দরুন হয়তো কিছু লিপিকুশলতা লাভ করেছ। কিন্তু আয়ত্ত করনি কেমন করে উপন্যাস গড়তে হয়। হাঁ, গড়তে হয়। উপন্যাস এক প্রকার গঠনকর্ম। কবিতার মতো স্বতঃসৃজন নয়। প্রবন্ধের মতো এক ঝোঁকে লেখা নয়। ভ্রমণ-কাহিনীর মতো স্মৃতিলিখন নয়। গড়তে যদি না শিখে থাক তবে তা শেখ। আর গড়তে যদি ভালো না লাগে তবে উপন্যাস লেখা ছেড়ে দাও। গঠনের কাজ দিনের পর দিন করে যেতে হয়। ধৈর্য যার নেই, ছয় সপ্তাহের মধ্যে যে উপন্যাস লিখে শেষ করতে চায় তার হাত দিয়ে দৈবাৎ একখানা উতরে গেছে বলে আর একখানাও উত্তীর্ণ হবে এর মতো ভ্রান্তি আর নাই।

দ্বিতীয়ত, কবিতার সঙ্গে উপন্যাসের মস্ত বড়ো পার্থক্য কবিতা লিখতে হয় অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে, বেশী দেরি করা উচিত নয়। করলে অনুভূতি ঠাণ্ডা হয়ে আসে। উত্তাপ হারায়। কবিতা হচ্ছে তপ্ত লুচি। উপন্যাসের বেলা সে নিয়ম খাটে না। উপন্যাসের বেলা জুড়িয়ে যাওয়াই নিয়ম। কাল তোমার জীবনে একটা বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছে বলে আজ তুমি উপন্যাস লিখতে বসে যাবে এটা হবার নয়। লিখতে গেলে দেখবে উপন্যাস হয়ে উঠছে না, হয়ে উঠছে রিপোর্ট। মহাযুদ্ধের পর বহু দশক অতিক্রান্ত হলে তার সম্বন্ধে সার্থক উপন্যাস রচিত হয়। বিপ্লব সম্বন্ধেও। কালের ব্যবধান উপন্যাসের বেলা অপরিহার্য প্রয়োজন। তার ফলে রস তেমন ঘন হয় না, অনুভূতি তীব্রতা হারায়। কিন্তু উপন্যাস তো কবিতা নয়। কবিতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা তার কাজ নয়। তুমি যদি অপেক্ষা করতে না চাও তবে কবিতা লেখ। আর যদি মনে হয় উপন্যাস না লিখে তোমার শান্তি নেই তবে দীর্ঘ জীবনের জন্যে প্রার্থনা করো। হয়তো শেষ দেখে যেতে পারবে না, তবু ঘোড়দৌড়ের মতো কলম চালিয়ে যেয়ো না। উপন্যাসের বেলা খরগোশদের জিৎ নয়, কচ্ছপদের জিৎ।

তৃতীয়ত, উপন্যাসের চরিত্রসংখ্যা এক নয়, দুই কিংবা তার বেশী। মানব চরিত্রের অভিজ্ঞতা না থাকলে শুধুমাত্র ঘটনার অভিজ্ঞতা বা পরিস্থিতির

অভিজ্ঞতা নিয়ে উপন্যাসের আসরে নামা ঠিক নয়। কবিতার পক্ষে নিজের মন জানাই যথেষ্ট। উপন্যাসের পক্ষে পরের মন জানাও অত্যাবশ্যক। এর জন্যে চাই অন্তর্দৃষ্টি, চাই দরদ, চাই একাত্ম হবার ক্ষমতা। বহুদর্শিতারও প্রয়োজন আছে। কল্পনা দিয়ে বহুদর্শিতার অভাব পূরণ করা যায় না। কল্পনারও স্থান আছে। সামগ্রিক ভাবে উপন্যাস হচ্ছে কল্পনারই রাজ্য। তা বলে রানি তো তাঁর রাজত্বের সবখানি নন।

তার পর চতুর্থ ও চরম কথা এই যে, উপন্যাসের জীবন লেখকের ব্যক্তিগত জীবন নয় বা তার পরিপূরণ নয় বা তার ক্ষতিপূরণ নয় বা তার সম্প্রসারণ নয়। উপন্যাসের জীবন তার আপনার জীবন, তার নায়ক নায়িকার জীবন, নায়ক নায়িকার সঙ্গে যুক্ত বহু মানব মানবীর জীবন, জীবনের আভ্যন্তরীণ নিয়ম বা নিয়তি, জীবনের বৃহত্তম পটভূমি, জাগতিক ব্যাপার রিয়ালিটি। উপন্যাসের সীমান্ত গিয়ে ঠেকেছে দর্শনের সীমানায়। ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে যেতে বা ঊর্ধ্বে উঠতে না জানলে কবিতা লেখা চলে, উপন্যাস লেখা চলে না। ব্যক্তিগত কথাটি এখানে পার্সনাল অর্থে ব্যবহার করেছি।

এই আত্মপরীক্ষার ফলে আমার প্রথম লিখিত উপন্যাস আমার নিজেরই অনুমোদন পেল না। দ্বিতীয় সংস্করণে ওর অন্তঃসারটুকু রেখে বাকিটা বাদ দিয়ে দিলুম। তাতে তার উত্তীর্ণ হওয়ার পথ সুগম হলো না আরো দুর্গম হলো জানিনে। তবে বইখানা ঠিক উপন্যাস রইল না, হলো বড়ো গল্প। আমাদের সাহিত্যের অধিকাংশ উপন্যাসই প্রকৃতপক্ষে বড়ো গল্প। পাঠক পাকড়াবার জন্যে উপন্যাসের আকার নেয়। ফুলতে ফুলতে ঢোল হয়। তাতে নগদ বিদায়ের দিক থেকে সুবিধে, কিন্তু উত্তীর্ণ হওয়া দুষ্কর।

আমার বন্ধু বলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে একমত যে উপন্যাস হবে অন্তত এক হাজার পৃষ্ঠা। ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে নয়, নিজের অন্তর্নিহিত নিয়মে। তার কমে জীবনকে ধরাছোঁয়া যায় না। ব্যক্তিগত জীবনের কথা হচ্ছে না, বৃহত্তর জীবনের কথা হচ্ছে। কিন্তু এর জন্যে প্রস্তুতি ক'জন লেখকের আছে? অধিকাংশ লেখকের প্রস্তুতি বড়ো গল্পের উপযোগী। যদিও সে বড়ো গল্প মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে উপন্যাস নামে পরিচিত হয়। বড়ো গল্পের সাধনা উপন্যাসের সাধনার মতো বিপুল নয়। প্রত্যেকের জীবনে এমন কিছু ঘটে যা নিয়ে একটা বড়ো গল্প অনায়াসে লেখা যায়, যদি লেখার হাত থাকে। বড়ো গল্প বলতে উপন্যাস বলেছিলুম আমি ও আমার বন্ধু, বলেছিলুম উপন্যাস কথাটির চলতি অর্থে। এই বিশ বছরে আমাদের দু'জনেরই ধারণা আরো পরিষ্কার হয়েছে। এখন আমরা বুঝতে পারি উপন্যাস কখনো তিন শ পৃষ্ঠায় হতে পারে না। কিন্তু এখনো আমরা বুঝতে পারিনে তিন শ পৃষ্ঠাই যদি লোকমতের দ্বারা বরাদ্দ হয় তা হলে কী করে তার শিল্পসম্মত ব্যবহার করা যায়। বড়ো গল্পের পক্ষে তিন শ পৃষ্ঠা বাহুল্য। উপন্যাসের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। এ সমস্যার সমাধান বোধহয় তিন শ পৃষ্ঠায় খণ্ড উপন্যাস লেখা। প্রত্যেকটি খণ্ড হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, চার পাঁচ খণ্ড মিলে হবে পূর্ণাঙ্গ।

কিন্তু এই বা ক'জন পারবেন ?

যাঁরা পারবেন তাঁরা তাই নিয়ে থাকবেন। যাঁরা পারবেন না তাঁদের যদি শিল্পানুরাগ থাকে তা হলে তাঁরা দেড় শ পৃষ্ঠার বড়ো গল্প লিখবেন, নয়তো তার সঙ্গে আরো দেড় শ পৃষ্ঠা জুড়ে তথাকথিত উপন্যাস লিখবেন। সেটা আর্ট নয়, ইন্‌ডাস্ট্রি। বলা যেতে পারে আর্ট ইন ইন্‌ডাস্ট্রি।

সত্যিকারের উপন্যাসের সাধনা এত বিরাট যে একজনের আয়ুষ্কালে এক খানার বেশী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কম। জোর দু'খানা হতে পারে। টলস্টয় তার সম্যক দৃষ্টান্ত। একদা আমার দুরভিলাষ ছিল সে রকম মহাগ্রন্থ আমি চারখানা লিখব। কিন্তু একখানা লিখতেই বারো বছর লেগে গেল। আর একখানা লিখতে সাত বছরের এস্টিমেট করেছি। হয়তো দশ বছর লাগবে। মানুষের পরমায়ু, বলবীর্য, অন্নসংস্থান ইত্যাদি গণনার মধ্যে আনতে হবে। তা যদি আনা হয় তা হলে দেখা যাবে দু'খানাই তার সাধ্যের সীমা। তার বেশী তার সাধ্যের বাইরে। বই লেখা তো কেবল কলম চালানো না। দেখতে শুনতে মিলতে মিশতে জীবনের সব রকম সুখদুঃখ পোহাতে ঝড়ঝাপটায় টিকে থাকতে শুধুমাত্র সংসার করতে যে আয়োজনটা লাগে সেটাও বই লেখার অঙ্গ। না, দু'খানাও নয়। একখানাই যথেষ্ট। অদৃষ্ট সহায় না হলে একখানাও হয়ে ওঠে না। আমার বহু ভাগ্য যে আমি আর একখানার জন্যে প্রস্তুত হতে পেরেছি।

ভারতের জাতীয় সংগ্রামকে মহাভারতে রূপায়িত করার যে কল্পনা ছিল আমার আমি সেটা যোগ্যতরের জন্যে রেখে যাব। 'সম্পত্তি ও সন্তান' শীর্ষক অপর উদ্যোগটা তার চেয়েও কঠিন। কারণ এ দুটো হলো মানব জীবনের এলিমেণ্টাল ব্যাপার। এ কাজ আমার সময় থাকলেও আমার দ্বারা হতো না। বোধ হয় কোনো মধ্যবিত্তের দ্বারা সম্ভব নয়। বোধ হয় হিন্দুর হাত দিয়ে হবার নয়। এ ভূমিকা একজন চাষী মুসলমানের জন্যে নির্দিষ্ট বলে মনে হয়। সাহিত্য তাঁর জন্যে অপেক্ষা করবে।

বড়ো উপন্যাসের জন্যে আমি আর কোনো বড়ো বিষয়বস্তু দেখছিনে। ছোট উপন্যাসের জন্যে অর্থাৎ তিন খণ্ডে সমাপ্ত প্রায় হাজার পৃষ্ঠার পুঁথির জন্যে বিষয়বস্তুর অসদ্‌ভাব হবে না। কৌলিক বা পারিবারিক জীবন অবলম্বন করে অমন বহু উপন্যাস লেখা যায়। শ্রেণীবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন থেকেও অমন অনেক উপন্যাস আসবে। বাংলাদেশের পাঠকরাও ক্রমে তার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। তবে লেখকরা তৈরি নন। তাঁরা এখনো তিন শ পৃষ্ঠা খরচ করে দেড় শ পৃষ্ঠার বড়ো গল্প লেখার পক্ষপাতী। নাই বা হলো আর্ট। আমি এই জাতের নভেলের সমঝদার নই। ইন্‌ডাস্ট্রি হিসেবে এর একটা মূল্য আছে। যেমন সিনেমার। কিন্তু এর মধ্যে আর্ট খুঁজতে যাওয়া ঝকমারি। আমি হলে বিশুদ্ধ বড়ো গল্প লিখতুম। এবং তার স্বপক্ষে পাঠকদের রুচি গঠন করতুম। এটাও লেখকদের কাজ।

বড়ো গল্পের উপাদান আমাদের চার দিকে ছড়ানো রয়েছে। হাত বাড়ালেই

হাতে উঠে আসে। এর জন্যে খুব বেশী প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। তবে এর জন্যে যেটা সব চেয়ে দরকারী সেটা হচ্ছে মাত্রাবোধ। ঐ দেড় শ পৃষ্ঠার দৌড়। সীমার ভিতর অসীমকে পুরতে জানাই আর্টের বর্ণপরিচয়। ছোট গল্প যেমন নিজের স্বল্প আয়তনের শাসন মেনে নিয়ে রসোত্তীর্ণ হয় বড়ো গল্পও তেমনি নিজের স্বাভাবিক পরিসরের পরিধি লঙ্ঘন না করেই সার্থক। কিন্তু তার সার্থক হওয়ার পক্ষে প্রধান অন্তরায় লেখকের অর্থাভাব ও পাঠকের অসন্তোষ।

আমি আজ ছোট গল্প সম্বন্ধে কিছু বলব না ভেবেছি। বাংলার পাঠকেরা ছোট গল্পের মর্যাদা বোঝেন। যদিও দাম দেন না মাসিকপত্রের বাইরে গ্রন্থাকারে। লেখকরাও ছোট গল্পে অসামান্য কৃতিত্ব লাভ করেছেন। বাংলার সাহিত্য জগতে এটা একটা বিপ্লব। একটা বাচাল জাতির পক্ষে বাক্‌সংযম কি বিপ্লবধর্মী নয়?

তবে মেজ গল্প সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। মেজ গল্প হচ্ছে বড়ো গল্প ও ছোট গল্পের মাঝামাঝি একটা আর্ট ফর্ম। জীবনের অনেক খুঁটিনাটি ছোট গল্পের সীমানা ছাড়িয়ে যায়, অথচ বড়ো গল্পের আমলে আসে না। বিশেষ করে মনোজীবনের ব্যাপার মেজ গল্পের বিস্তার চায়। চল্লিশ পঞ্চাশ পৃষ্ঠার কমে রস জমে না। মেজ গল্পকে সাধারণত ছোট গল্পের কোঠায় ফেলা হয়। তার জন্যে আলাদা কোঠা বানাতে হবে। আমাদের মনোজীবন যেমন জটিল হয়ে উঠেছে তা দেখে মেজ গল্পের হাত গুণে বলা যায় এই জাতক স্বনামধন্য হবে।

(১৯৫১)

বাংলা সাহিত্যের গতি

এত কাল বাংলা ভাষাকে আমরা প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে গণ্য করে এসেছি। এখন আর তাকে প্রাদেশিক ভাষা রূপে গ্রহণ করলে চলবে না। ইতিমধ্যে সে তার প্রাদেশিক গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়েছে। ভারতের আরো কয়েকটি ভাষা সম্বন্ধেও এ কথা বলতে পারা যায়। বাংলা, মারাঠী, গুজরাতী, তামিল, উর্দু—এগুলির সাহিত্যসম্পদ এত বেশী যে, এগুলিকে প্রাদেশিক ভাষা বলে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। হিন্দীর চেয়ে এরা কম সমৃদ্ধ নয়। এদের বিস্তৃতিও বহুদূরব্যাপী। মাথা গুনতি ছাড়া হিন্দীর চেয়ে কিসে এরা ছোট? এদের সমৃদ্ধি দিন দিন বাড়ছে।

বর্তমান অধিকাংশ বাঙালী সাহিত্যিক বাংলা ভাষার মাধ্যমে লিখলেও সমগ্র ভারতকে সম্মুখে রেখে লেখেন। সমগ্র দেশের সমস্যা, দশের সমস্যাই তাঁদের সাহিত্য রচনার উপজীব্য। তাই বাংলা সাহিত্যকে ন্যাশনাল

লিটেরেচার অনায়াসে বলা চলে। 'জনগণমন' এখন সারা ভারতের জাতীয় সংগীত। বাংলা বই এখন সর্বত্র অনুবাদ করা হয়। রাষ্ট্রভাষা না হলে কি জাতীয় ভাষা হয় না? আমি তো মনে করি বাংলা এখন ভারতের অন্যতম জাতীয় ভাষা। আর রাষ্ট্রভাষাই বা একটিমাত্র হতে যায় কেন? সুইটজার-ল্যাণ্ডের মতো ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে ফরাসী, জার্মান ও ইটালিয়ান এই তিনটি ভাষারই তুল্য মূল্য। তিনটিই রাষ্ট্রভাষা। কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি ভাষাতেই কাজকর্ম করেন। কোনটির সর্বাধিক প্রচার তাতে কিছু আসে যায় না। তিনটিই সমান সমৃদ্ধ। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই তিনটির সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত। তিনটিই জাতীয় সম্পদ। তাই যদি হয়, তবে ভারতের মতো বিরাট ভূখণ্ডে একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা পর্যাপ্ত নয়। পাঁচটি ছয়টি রাষ্ট্রভাষা থাকাই সংগত। উন্নত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মানুষ অন্তরের তাগিদে আকৃষ্ট হয়। ভাষাপ্রীতি প্রচার-কার্যের দ্বারা সম্ভব নয়। কবিগুরুর বাংলা গান যেমন জাতীয় সম্পদ সুরদাস বা মীরার ভজনও তেমনি জাতীয় সম্পদ। বাঙালী অবাঙালী সকলেই গান-গুলির অনুপম রসে সমভাবে আকৃষ্ট ও আপ্লুত হয়। সুন্দরের কোনো জাত নেই। তা সকলের। সেকালে এ দেশে এমন বিষাক্ত প্রাদেশিকতা ছিল না। ভারতকে একটি ইউনিট হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক ক্ষেত্রে একতা যদি এখনি সম্ভব না-ও হয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটু চেষ্টা করলেই সম্ভব হতে পারে। সম্ভব হবে একটিমাত্র ভাষার একাধিপত্যের দ্বারা নয়। প্রধান প্রধান ভাষাগুলির সর্বস্বীকৃতির দ্বারা। রাষ্ট্রভাষা না হয় একটিই হলো, কিন্তু জাতীয় ভাষা হবে পাঁচটি ছয়টি। এগুলিকে প্রাদেশিক মর্যাদার ঊর্ধ্বে জাতীয় মর্যাদা দিতে হবে। বাংলা ভারতের অন্যতম জাতীয় ভাষা।

বাংলার বর্তমান সাহিত্যসৃষ্টিতে আমি আস্থাশীল। বাংলা ভাষার লিখনশৈলী অনেক উন্নত হয়েছে। অনেকেই বেল্ লেৎর (belles lettres) বা রম্য রচনায় মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। এর চাহিদাও সুস্পষ্ট। পাঠকগোষ্ঠীর উপর সাহিত্যসৃষ্টি অনেকটা নির্ভর করে। সেই পাঠকগোষ্ঠী বর্তমান সংখ্যায় অধিক, সুতরাং পুস্তকের ক্রেতাও অধিক এবং প্রচারও অধিক। পূব বাংলা—যা এখন পাকিস্তানের অন্তর্গত—সেখানেও বাংলা কেতাবের চাহিদা কিছু কম নয়। কলকাতায় প্রকাশিত বাংলা বই সেখানকার চাহিদা মতো সরবরাহ করতে হলে কলকাতার পাঠক সম্প্র-দায়কে পুস্তকপাঠে বঞ্চিত হতে হয়। বাংলা ভাষার প্রতি তাদের ভালাবাসা পূর্ববৎ রয়েছে। ঢাকা চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহরে বাংলা পুস্তকের প্রকাশ-কেন্দ্র খুলেছে। কলকাতার ভাষাকেই তারা সাহিত্যিক ভাষার মান হিসাবে নিয়েছে। মাতৃভাষার প্রতি তাদের গভীর অনুরাগ এই সেদিনও প্রাণ বলি দিয়ে প্রমাণ করেছে।

দেশের মানচিত্র যত সহজে বদলানো যায় মনের মানচিত্র তত সহজে যায় না। তাই দেশ বিভক্ত হলেও মন বিভক্ত হয়নি। পাকিস্তানী কর্তারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ও বাংলাকে উর্দুতরো করবার যতই প্রয়াস পান-না কেন, কোনো

দিনই সফল হবেন না। গাধা পিটিয়ে যেমন ঘোড়া হয় না, তেমনি বাংলা পিটিয়ে উর্দু হবে না। বছর পাঁচেকের মধ্যে বাংলা ভাষাই সেখানকার সরকারী ভাষা হবে। গত ছয় মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্থানের গণমনোবৃত্তির অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে।

এসব তো হলো আলোর কথা। এই আলোর নিচেই আছে অন্ধকার। মানুষের মনে যেন আশা নেই, ভাষা নেই, আনন্দ নেই। কোনো আদর্শের প্রতি বিশ্বাস নেই। মানুষ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন বলেই মনুষ্যজীবন তার কাছে তুচ্ছ বলে বোধ হচ্ছে। তাই সে নিজের প্রাণ রাখবার জন্যে অন্যের প্রাণ নিতে দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করে না। প্রাণের এই অসাড়তা, এই হৃদয়-হীনতা, এই প্রেমহীনতা একান্তভাবে বর্জনীয়। বর্তমান সাহিত্যের সাধারণ সুর হচ্ছে মরবিড (morbid) বা অসুস্থ। তাই চোখে পড়ে নিকৃষ্ট গল্প উপন্যাস গোয়েন্দা কাহিনীর প্রবল চাহিদা। শিশুপাঠ্য পুস্তকেও খুনজখমের ছড়াছড়ি। এমন কি মাঝে মাঝে রাজনীতিও আলোচিত হয়ে থাকে। এই ভারসাম্য বা ব্যালান্সের অভাব সর্বত্র লক্ষিত হয়। এর প্রত্যক্ষ হেতু হয়তো গত মহাযুদ্ধ, গৃহবিবাদ ইত্যাদি।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাপুরুষেরা ছিলেন স্থিতধী অর্থাৎ ব্যালান্সড ব্যক্তি। এই ব্যালান্সের অভাব দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। সাহিত্যেও তার অন্ধকার ছায়া পড়ছে। সবই যেন টলমল করছে, এখনি ভেঙে পড়বে। এর মূলে রয়েছে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। আত্মপ্রত্যয়ের শূন্যতা না ভরলে বেঁচে সুখ নেই। বাঁচার মতো বাঁচতে হলে থামলে চলবে না। দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। অগ্রসর হতে হলে চাই আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। অস্বাস্থ্যকর ক্ষীণজীবী বা ক্ষণজীবী সাহিত্য সে আনন্দোজ্জ্বল প্রাচুর্যের পথ দেখাতে অক্ষম। নতুন কিছু করলেই ভালো কিছু করা হয় না বা 'প্রগতিশীল' হওয়া যায় না। 'প্রগতি' যেখানে অগ্রগতি বা প্রোগ্রেস অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেখানে শাশ্বতের সন্ধান থাকবে, থাকবে অমৃতের আস্বাদ। অফুরন্ত পুস্তক প্রকাশ করলেই প্রোগ্রেস হয় না। প্রকৃত উন্নত বৃহৎ সৃষ্টির মধ্যে পরমা তৃপ্তির সুধা লুকানো থাকে। বাইবেলের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় বৃহৎ সাহিত্য হবে Waters of Life যা না হলে জীবনধারণ প্রায় অসম্ভব মনে হবে। এমন সৃষ্টি এযুগে কোথায়!

মানুষকে শান্ত সাধনশীল হতে হবে। চিত্তবিক্ষেপের নানা কারণকে আয়ত্তের মধ্যে এনে তার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। তবেই বৃহৎ সৃষ্টি সম্ভবপর হবে। বর্তমান মানুষ মগ্ন হতে ভুলেছে। কোনো কিছুতে মগ্ন না হলে সত্য আবিষ্কার করা যায় না। তবু আশ্বাসের কথা এই যে, আমরা যেন ক্রমেই নিজেদের ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছি। পূর্বাপেক্ষা আত্মস্থ হয়েছি। আমরা মোড় ঘুরেছি। এই সামান্য পরিবর্তনের মধ্যে বিরাট সম্ভাবনার বীজ নিহিত রয়েছে। এই ক্ষীণ আশার রশ্মিটুকু আমার ক্ষুব্ধ হতাশ চিত্তে আনন্দ ও উৎসাহের বাণী বহন করে এনেছে। আমি আবার নতুন উদ্যমে রসসৃষ্টির

কর্মে নিমগ্ন হবার প্রেরণা পাচ্ছি।

নিরানন্দ, রসহীন সংসার, বন্ধ্যা সংসার। রসধারায় স্নাত করে তাকে শ্যামল সুন্দর আনন্দময় করতে হবে। তাই তো শিল্পী সাহিত্যিক সংগীতজ্ঞ প্রভৃতি রসস্রষ্টার এত প্রয়োজন। দেহের ক্ষুধাকে যেমন আমরা উপেক্ষা করতে পারিনে, মনের ক্ষুধাকেও তেমনি অতৃপ্ত রাখলে চলবে না। যদি রাখি তো মানুষের মতো বাঁচতে শিখব না। Man does not live by bread alone—বাইবেলের এই মহার্ঘ বাণীটি মানুষের শাশ্বত পিপাসার ইঙ্গিত বহন করছে। (১৯৫২)

(গত ৫ই আশ্বিন রবিবার সন্ধ্যায় পাটনা সুহৃৎ পরিষদ ও হেমচন্দ্র লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভায় অধিবেশনে আমি অতিথিরূপে যে ভাষণ দিই শ্রীযুক্ত প্রীতীশ মিত্র তার সারাংশ লিখে আমাকে দেখতে দেন। তাঁর অনুরোধে আমি সেটি সংশোধন করে ছাপতে দিচ্ছি। স্মৃতির সাহায্য নিতে হয়েছে বলে মৌখিক ভাষণের সঙ্গে অসংগতি থাকা সম্ভবপর।)

বাংলা বনাম হিন্দী বনাম উর্দু

সেদিন দার্জিলিঙে এক ইংরেজ ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি দিল্লীতে বহুকাল ছিলেন। সেই সূত্রে উর্দুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও পরিচয় থেকে প্রীতি। স্বাধীন ভারত হিন্দীকে তার রাষ্ট্রভাষা করেছে, উর্দুকে করেনি বলে তাঁর সে কী আফসোস! রেডিয়োতে হিন্দুস্থানী চলে না, তাই তিনি হিন্দী খবর শোনা ছেড়ে দিয়েছেন। হিন্দী তিনি ভালোবাসেন না। সংস্কৃত-ভাঙা গুরুগম্ভীর হিন্দী তিনি বুঝতে পারেন না। উর্দুর মতো রসও নেই তাতে।

"আচ্ছা, স্বাধীন ভারত কি উর্দুকে বাঁচিয়ে রাখবে না? অমন সুন্দর ভাষা ধীরে ধীরে মৃত ভাষা হবে?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"না, না, তা কেন ভাবছেন?" আমি উত্তরে বললুম, "রাষ্ট্রভাষা হওয়া না হওয়ার উপর কি ভাষার জীবনমরণ নির্ভর করে? রাষ্ট্রভাষা না হলেই মরণ? হলেই বাঁচন?" তারপর তাঁকে অভয় দিলুম এই বলে যে উর্দুর অনুরাগী হিন্দুদের মধ্যেও অজস্র। তারা কখনো উর্দুর ক্ষতি করবে না, ক্ষতি হতে দেবে না। উর্দু যদি মুসলমান সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক ভাষা হয়ে বাঁচতে চায় তবে অবশ্য অন্য কথা, কিন্তু যদি আর পাঁচটা ভাষার মতো সার্বজনীন হতে রাজি থাকে তা হলে সর্বজন তাকে রক্ষা করবে। এমন কি আমি স্বয়ং উর্দুর পক্ষে। তবে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে নয়। রাষ্ট্রভাষা হবে হিন্দী।

তা বলে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ আমরা সহ্য করব না। রাষ্ট্রভাষা হবে বলে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব সারা দেশের আবহাওয়ায় মিশিয়ে দেবে সে অধিকার তার নেই। তাকে হতে হবে বাংলার মতো প্রগতিশীল, উর্দুর

মতো নাগরিক, ইংরেজীর মতো উদার, ফরাসীর মতো সভ্য। নয়তো গায়ের জোরে বা মাথা গুনতির জোরে একটা বিশাল ভূখণ্ডের লিংগুআ ফ্রাঙ্কা (lingua franca) হওয়া যায় না। ঐ রেডিয়ো পর্যন্ত ওর দৌড়। এর পরে সরকারী কাগজপত্রে ওর নির্বাণ।

হিন্দীকে তার নতুন দায়িত্বের উপযুক্ত করে গড়তে হবে। তেমন লোক সরকারী দপ্তরখানায় বা কাশীর টোলে জন্মায় না। জন্মায় মাঠে ঘাটে দোকানে বাজারে কারখানায় কাফিখানায় বন্দরে শিবিরে। এরা যদি সময়মতো না জন্মায় তবে পনেরো বছর পরে ইংরেজী কি সাধে যাচ্ছে? হিন্দীর সমস্যা হচ্ছে পনেরো বছরের মধ্যে এই সব লোকের জন্ম দেওয়া। হিন্দী যখন এদের হাতে পড়বে তখন তার রূপ হবে কতকটা ইংরেজীর মতো, কতকটা উর্দুর মতো, কতকটা বাংলার মতো। নিশ্চয় সংস্কৃতের মতো নয়। পণ্ডিতেরা চুল ছিঁড়বেন। বলবেন, এ রকম তো কথা ছিল না। কিন্তু কে শুনছে তাঁদের কথা!

সম্প্রতি আমার এক পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু আমাকে লিখেছেন,

"বাংলার ভবিষ্যৎ মেঘে ঢাকা। হিন্দীর তরুণ অরুণ বাংলায় আলো দিতে শুরু করেছে। গতকাল লাটগৃহে হিন্দী কনভোকেশনে গিয়ে, লাট মহোদয়, শিক্ষামন্ত্রী, ডাঃ সুনীতিবাবু···প্রভৃতির ভাষণ (প্রথমোক্ত দুইজনের ছাপা এবং তাহা পাঠ) শুনে আশ্বস্ত হয়েছি যে হিন্দীর ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে সমুজ্জ্বল। অসংখ্য বাঙালী ছেলেমেয়ে (বৃদ্ধের সংখ্যাও ১৫। ২০ জন হবে) পাস সার্টিফিকেট, পুরস্কার ইত্যাদি পেলেন।···"

সেই ইংরেজ ভদ্রমহিলার মতো আমার বন্ধুও বোধ হয় ভাবছেন যে রাষ্ট্রভাষা হওয়া না হওয়ার উপর ভাষার জীবনমরণ নির্ভর করছে। লাট বেলাটের পৃষ্ঠপোষকতা যদি ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির শর্ত হয় তবে বাংলার ভবিষ্যৎ মেঘে ঢাকা বই-কি। কিন্তু এ ভাষা এত দিনে লাটবাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে জনসাধারণের ময়দানে পৌঁছে গেছে। এর পৃষ্ঠপোষক এখন হাজার হাজার বাজে লোক, যারা দাম দিয়ে বই কাগজ কেনে বা লাইব্রেরীর চাঁদা দেয়। আমরা তো আশা করছি যে লক্ষ লক্ষ বাজে লোকের পৃষ্ঠপোষকতা পাব যখন বাংলা নাটক ও তার অভিনয় জীবনধর্মী হবে। আমাদের কনভোকেশন বসবে কেন্দুলির মেলায় বা নান্নুরের মাঠে। লাট-বাড়িতে নয়। আর আমাদের আচার্য হবেন আউল বাউল ফকির দরবেশ বোষ্টমী ভৈরবী, যাঁরা এ দেশের প্রাণরহস্য আয়ত্ত করেছেন, যাঁরা পুঁথির পাতায় সবুজ পাতার বাণী খুঁজে যৌবন অপচয় করেননি। ইতিমধ্যে বাংলা গান লক্ষ লক্ষ বাজে লোকের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। শুধু বাংলা দেশে নয়, সারা ভারতে। 'জনগণমন' কোন ভাষার গান? এ গান গাওয়া হচ্ছে, এর সুর বাজছে পৃথিবীর বড়ো বড়ো রাজধানীতে। হিন্দীর এখনো এমন মহান সৌভাগ্য হয়নি। হবেও না সে যদি লাট বেলাটের আশীর্বাদ কুড়োতে ব্যস্ত থাকে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের আসল কাজ জনগণকে নিয়ে, তাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটিয়ে। অন্নের মতো অমৃতের জন্যেও তারা ক্ষুধিত তৃষিত। অমৃত দিতে পারি কেবল আমরাই। আর কেউ নয়। মন্ত্রীমণ্ডলের ঝুলিতে অন্ন থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু অমৃত বলে তাঁদের কোনো পোর্টফোলিও নেই। কাজেই জনগণ তাঁদের কাছে ও বস্তু আশা করবে না। হিন্দী যদি জনগণের অমৃত জোগানোর জন্যে সরকারী দপ্তরের উপর বরাত দিয়ে বসে থাকে তবে তারা এক দিন নিরাশ হবে। নিরাশ হয়ে বাংলা পড়বে, বাংলা বইয়ের তর্জমা পড়বে। বাংলার ভবিষ্যৎ মেঘে ঢাকা হবে কেবল তখনি যখন বাঙালী সাহিত্যিকরা জনগণকে অমৃত জোগানোর দায়িত্ব অস্বীকার করে যে কোনো উপায়ে টাকা রোজগার করে নাম-যশ জোগাড় করে কলকাতার প্রাসাদে শুয়ে চোখ বুজবেন। মনে হয় তার দেরি আছে।

না, হিন্দী আমাদের হানি করবে না। রাষ্ট্রভাষার দৌড় রাষ্ট্র পর্যন্ত। জনভাষার দৌড় অসীম।

(১৯৫২)

রবীন্দ্রনাথ ও আমরা

দশ বৎসর আগে যখন রবীন্দ্রনাথ বেঁচে ছিলেন তখন আমাদের দায়িত্ব বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। বাপ বেঁচে থাকলে ছেলে যেমন থাকে আমরা তেমনি ছিলুম। এখন তিনি নেই, আমরা আছি। দায়িত্বের কথা আমাদের কাছে এখন প্রধান প্রশ্ন। তিনি যখন ছিলেন, প্রশ্ন করার প্রয়োজন হলে তাঁর কাছে যেতুম এবং প্রশ্নের উত্তর পেতুম। এখন আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার কেউ নেই। তাঁর অবর্তমানে সে সব প্রশ্ন আমাদের কাছে আসে। আমাদেরকে প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করতে হয়। অনেক প্রশ্ন জমে গেছে। তার উত্তরের চেষ্টা বহুদিন থেকে চলছে। সে সব প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে আজ বলব না। মোটামুটিভাবে বলব—রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী লেখক আমরা, আমরা তাঁর কাছে কী পেয়েছি, তাঁর অবর্তমানে আমরা কী করেছি এবং আমাদের কী করা উচিত।

সাধারণত দেখা যায়, বাপ যদি বড়লোক হয়, ছেলেদের সুবিধা হয়, তাদের খাটতে হয় না, সংগ্রাম করতে হয় না। তারা হাতের কাছে সব পায়। বাপ বেচারাকে খাটতে হয়, সংগ্রাম করতে হয়, সব-কিছু তাঁর নিজের হাতে গড়তে হয়। আমরা দেখছি, রবীন্দ্রনাথ আমাদের খাটুনি বহু পরিমাণে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তিনি সংগ্রাম করেছেন—আমরা তার ফল ভোগ করছি।

বাংলা সাহিত্যে যখন তিনি প্রথম প্রবেশ করেন বাংলা ভাষা তখন কী ছিল আপনারা জানেন। এই ভাষাকে কী রকম অসাধারণ রূপদান তিনি করেছেন আপনারা জানেন। এজন্যে সারা জীবন তাঁকে সাধনা করতে হয়েছে।

সাধনা কী কঠিন কাজ তার অল্পস্বল্প অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। তাঁর কাজ ছিল মাটি কেটে শহর তৈরি করা, জঙ্গলের পর জঙ্গল কেটে রাস্তা তৈরি করা। আর আমরা ভালো জমি পেয়ে বাড়ি তৈরি করেছি। কলম ধরলেই আমাদের লেখা আসে, আমরা লিখে যাই। যা আমাদের কাছে এত সহজ হয়েছে সেই কঠিন কাজ তিনি করেছেন। আমরা পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করছি। সময় সময় মনে প্রশ্ন জাগে—আমরা তাতে কী যোগ করেছি, যাতে পরে যারা আসছে তাদের পক্ষে এ-কাজ সহজ হয়। আমাদেরকে চিন্তা করতে হয় তাঁর অবর্তমানে আমরা যেসব কাজ করছি সেসব কি এমন কিছু কাজ যাতে ভবিষ্যতে যারা আসছে তাদের সাহিত্য-সাধনা অনায়াসসাধ্য হবে? সে-প্রশ্ন আমাদের কাছে বড়ো প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা যদি ঋণী হয়ে থাকি, এবং সে-ঋণ যদি শোধ না করি, তাহলে ভবিষ্যৎ পুরুষরা আমাদের কী বলবে? ভবিষ্যতের সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে, আমাদের বলতে হবে, আরো কিছু যোগ করেছি, আমরাও কিছু দিয়েছি। কিন্তু সেটাও চূড়ান্ত নয়। পরে যারা আসবে, তাদেরও কিছু দিতে হবে।

আমাদের উপর যে ভার এসেছে তা কী পরিমাণে পালন করছি সেটা ভেবে দেখতে হবে। ভাষা সম্বন্ধে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে অসাধারণ রূপলাবণ্যমণ্ডিত করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন তার উপর আর কিছু করবার নেই, কারিগরী ফলাতে চেষ্টা করা আমাদের উচিত নয়, করলে কোনো ফল হবে না। তা ঠিক নয়। আমাদের অনেক কিছু করবার আছে। আমরা যারা ভাষা নিয়ে কাজ করি, আমরা অনুভব করেছি, এই ভাষাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, যেখানে গেলে সাধারণ লোকের পক্ষে এটা বোঝা সহজ হবে, তাদের এটা প্রাণের ভাষা হবে। যেমন কাব্যে তেমনি নাটকে, উপন্যাসে, গল্পে—সাহিত্যের সব ক্ষেত্রে ভাষা যেন সর্বসাধারণের ভাষা হয়, তারা যেন এটাকে নিজেদের ভাষা বলে স্বীকার করে, সেটা দেখতে হবে। আমরা এখনো সেখানে পৌঁছতে পারি নি, বার বার একটা বাধা অনুভব করছি। আমরা যেটা লিখছি সেটা জনসাধারণ প্রাণের ভাষা বলে গ্রহণ করছে কিনা সাহিত্যিকের পক্ষে ভাবনার বিষয়। সেটাকে সম্ভব করার ভার সাহিত্যিকদের উপর।

রবীন্দ্রনাথ আর-একটা কাজ করেছেন—পাঠক তৈরি করার কাজ। পাঠক তৈরি না করলে আমরা যা লিখছি, অনেকে তার মর্ম গ্রহণ করতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথ নিজের পাঠক নিজেই তৈরি করেছেন। প্রথমে তাঁকে কেউ স্বীকার করতে চায়নি, বাংলা সাহিত্যে তিনি যেন অনধিকার প্রবেশ করেছেন। আস্তে আস্তে দেখা গেল, তিনি অনেক পাঠক তৈরি করেছেন, সংখ্যা ক্রমে বেড়ে গেছে। এখন সকলে তাঁকে সহজ ভাবে গ্রহণ করছে। চল্লিশ বৎসর আগে তাঁকে এভাবে গ্রহণ করা সহজ ছিল না। এত বেশী লোক তাঁর নিন্দা করেছে যে আমরা তা কল্পনা করতে পারিনে। শিক্ষিত লোকেরা পর্যন্ত বলতেন, রবীন্দ্রনাথের কথা তাঁরা বুঝতে পারেন না, তাঁর কাব্য বোঝা যায় না। আমরা তখন ছেলেমানুষ

ছিলুম, আমরা কিন্তু বুঝতে পারতুম। গুরুজনেরা বলতেন, রবীন্দ্রনাথ কী লিখছেন তাঁরা বুঝতে পারেন না। লেখাপড়া-জানা লায়েক ব্যক্তিরাও বলতেন, বুঝতে পারেন না। আমরা ছেলেমানুষেরা তাঁর খুব তারিফ করতুম। এমন কতকগুলি শিক্ষা মানুষের আছে, যা অ-শিক্ষা করা দরকার। মানুষ যা শেখে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেটা না ভুললে মানুষ নতুন জিনিস শিখতে পারে না। শিক্ষিত লোককে খানিকটা অ-শিক্ষিত করা দরকার। যে শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন, সেটা তাঁদের ভোলাতে হবে এবং নতুন জিনিস শেখাতে হবে। এটা সহজ কাজ নয়। কঠিন কাজ। রবীন্দ্রনাথ এই কঠিন কাজ করে গেছেন। আমাদেরও তা করতে হবে। না করলে আমাদের প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। অনেক জিনিস আছে যা লোকের ভুলে যাওয়া উচিত। ভোলানো মস্ত কথা। আমি উদাহরণ দিতে পারব না, হাতের কাছে আসছে না। অনেকদিন থেকে আমি অনুভব করছি, আমাদের শিক্ষা এমনভাবে হয়েছে যে রস জিনিসটা আমরা গ্রহণ করতে পারিনে। বরং সাধারণ লোক, যাদের শিক্ষাদীক্ষা নেই, তাদের মধ্যে রস গ্রহণের ক্ষমতা বেশী। তাদের কাছে সরাসরি যাওয়া সহজ। তারা সহজে নেবে। Sophisticatedরা দূরে সরিয়ে দেবে। এদের নতুন করে শেখানো কঠিন ব্যাপার, তাতে আমাদের বিপদ।

রবীন্দ্রনাথ যে ঐতিহ্য রেখে গেছেন তাকে রক্ষা করাও অত্যন্ত শক্ত কাজ। তিনি যে মহান ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন, সে-ঐতিহ্য আগে যা ছিল, তার সঙ্গে বেশী মেলে না। একজন সাহিত্যিক বন্ধু বলেছেন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ একটি দ্বীপ, তাঁর চারদিকে কিছু নেই, শুধু সমুদ্র। তাঁর আগে কিছু ছিল না, পরেও কিছু হয়নি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা আগে পাওয়া যায় না, পরেও পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তীও নেই, পরবর্তীও নেই। কেন তিনি (সাহিত্যিক বন্ধু) একথা বলেছেন? কারণ রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করলে পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে এমন কিছু পাওয়া যায় না, যার ক্রমবিকাশের ধারার মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়ে। পরেও কিছু নেই—একথা তিনি বলেছেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিণতির সঙ্গে তুলনা করে। সহসা মনে হয় —তা বুঝি সত্য। হয়তো সত্য, হয়তো সত্য নয়। আগে কিছু থাক না-থাক, পরে কিছু থাকা দরকার। সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদেরও যোগ-বিয়োগ করতে হবে। সেই ঐতিহ্যকে চলমান করতে হবে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলা সাহিত্যের মান নেমে গেছে। সেজন্য আমরা হা-হুতাশ করছি। আজকাল ভালো বাংলা দেখা যায় না। ভালো প্রবন্ধ, ভালো কবিতা পাওয়া যায় না। লোকে আমাদের গালাগাল দেয়। আমরা সেটা নিঃশব্দে পরিপাক করি। আমরা কিছু করছি, এটা দেখাতে হবে। অন্ধকারের প্রতিকার হচ্ছে আলো। সত্যিকার ভালো লেখা যদি আমরা দেখাতে পারি, তা হলে বলতে পারব, বাংলা সাহিত্যের মান আমরা রাখতে পারছি, রবীন্দ্রনাথের পতাকা আমরা বহন করছি, আমরা তাঁর যোগ্য। সেটা যদি না করতে পারি, শুধু তর্ক করে কিছু হবেনা। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে উত্তীর্ণ হতে পারে,

এমন ক'খানা বই লেখা হয়েছে ? হয়নি তা নয়, তবে তার সংখ্যা খুব কম। পূর্বপুরুষদের উপযুক্ত বংশধর এখনো আমরা হতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করা যায়, এমন কীর্তি আমাদের হয়নি। যা হয়েছে, তা উল্লেখ-যোগ্য নয় বলে তুলনায় দাঁড়াতে পারে না। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে কিছু কিছু হয়েছে। যেসব বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে অশান্তি ছিল, অতৃপ্তি ছিল, সেটা তিনি কারো কারো কাছে ব্যক্ত করেছেন। তিনি খুব বড়ো একটা solid জিনিস করে যেতে পারেননি, যেমন ডনকুইকসোটের মতো বই যা সর্ব দেশের লোক পড়বে। সেজন্যে তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল। সত্যিকারের drama যাকে বলে তেমন নাটক দিয়ে যেতে পারেননি বলেও তাঁর মনে দুঃখ ছিল। তাঁর দুঃখ ছিল, তিনি মহাকাব্য লিখে যেতে পারেননি। মহাভারত থেকে বিষয় বেছে নিয়ে নাটক লিখতে পারেননি বলেও তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল। তিনি বলতেন, তোমরা লেখ। শেষ বয়সেও তাঁর মন সম্পূর্ণ সতেজ ছিল।

তাঁর মধ্যে আশ্চর্য দুঃসাহস ছিল। এমন বিষর ছিল, যা পড়ে লোকে হয়তো মারতে আসবে, তিনি বলতেন, এসব করতে হবে, এসব করার সাহস তোমাদের থাকা উচিত। মহাভারত সম্বন্ধে তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তা করলে দেখতেন, পুরনো জিনিস হলেও তাকে কী রকম আধুনিক ছাঁচে গড়ে তোলা যায়। সেটা দুঃসাহসিক কাজ হতো। আমরা সেরূপ কাজ করতে পারব কি না জানি না। দেশ থেকে দাবি না উঠলে আমাদের পক্ষে করা কঠিন। সাধারণত পাঠকদের কাছ থেকে চাহিদা আসে, আমরা লেখকরা জোগান দেই। চাহিদা না থাকলে লেখক জোগান দেবে কী। পাঠক আগে আগে যায়, লেখক যায় তার পিছনে। কিন্তু এমনো হয়েছে—লেখক আগে আগে চলে, পাঠক পিছন পিছন চলে। পাঠক চাক বা না-চাক, রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন, বহু বছর পর লোকে তাঁর কথা বুঝতে পেরেছে। প্রায় প'চিশ বছর লাগল 'চিত্রাঙ্গদা'র দ্বিতীর সংস্করণ হতে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশে সে-কাব্যের কত আদর হয়েছে, অনুবাদ হয়েছে। তার মানে এদেশে পাঠক তৈরি হয়নি। অল্প লেখকই পাঠকের অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারে। লেখক পঁচিশ বছর ধরে অপেক্ষা করবে, এ-ধৈর্য অল্প লেখকেরই আছে। বাঙালী লেখক হয়তো মনে করে, পঁচিশ বছর সে বাঁচবেই না। পাঠক তৈরি না হলেও আমার যা দেবার দিয়ে গেলুম, রবীন্দ্রনাথের জীবনে এ বহুবার ঘটেছে।

যেসব বিষয়ে তাঁর অতৃপ্তি ছিল, যা করা উচিত ছিল, কিন্তু করা হয়নি—। তার কিছু আইডিয়া তিনি আমাদের দিয়েছেন। ছড়ায় কিছু কাজ করা দরকার Ballad বা গাথা বাংলা সাহিত্যে নেই বললেও চলে, এসব বিষয়ে লোকের মনে মস্ত ক্ষুধা জেগেছে। পাঠক যেন বলছে—তোমরা লেখ, আমরা চাই। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, এ সকল বিষয়ে তাঁর কাছে লোকের অলিখিত দাবি আছে। একদিন না একদিন আমাদেরকে Ballad লিখতে হবে। সাধারণ লোক এগুলি আওড়াবে। আরো জিনিস আছে। মজলিসী গান—একজন গাইলে পাঁচজনে লুফে নেয়। পাঠক যদি এ-জিনিসটি পায়, নিশ্চয়ই আনন্দের

সঙ্গে গ্রহণ করবে। কিন্তু এগুলি কে দেবে? এর সম্ভাব্যতা অনেকে জানে না। যা পোষাকী নয়, তার দিকে আমাদের মন যায় না। 'ক্ষণিকা' লেখা হয়েছে পঞ্চাশ বছর আগে। যেমন হালকা ভাব, তেমনি লঘু ছন্দ। এর সমকক্ষ হতে পারে, এমন কোনো জিনিস এখন পর্যন্ত হয়নি, এসব লাইনে কাজ করা হয়নি। করা উচিত। এমন কিছু আমাদেরকে দিতে হবে, যেটা লোকে মজলিশে, সমাবেশে, পাঁচজনে মিলে আওড়াতে বা গাইতে পারবে। আমাদের আছে ভজন কীর্তন। লঘু জিনিস নেই। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু করে গেছেন। উদাহরণ দিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে গেছেন। তিনি অবসর পাননি। কত লোকের দাবি তাঁর উপর এসেছে। ব্রাহ্মসমাজ চেয়েছে তাঁকে আচার্য করতে। রাজনীতিকরা চেয়েছেন স্বদেশী আন্দোলনে এসে পরে লড়াই করতে। অনেক জিনিস আরম্ভ করে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। কেউ আসেনি তার সমাপ্তি করতে। 'ক্ষণিকা'য় যে সুর তিনি ধরিয়ে দিয়ে গেলেন, নিজেও না, অন্যেও না, কেউ তার অনুসরণ করেনি। এসব কাজ পড়ে আছে, করতে হবে। তারপর classic হবার মতো পুস্তক রচনা করা দরকার। এ বিষয়েও আমরা বিশেষ কিছু করতে পারিনি। যা করেছি সমসাময়িকদের জন্যে করেছি। ভাবী কালের জন্যে করা হয়নি। স্পৃহাও নেই, দৃষ্টিও নেই। 'গোরা'র মতো জিনিস আর হলো না। ঐখানেই শেষ হয়ে গেল। 'যোগাযোগে' চেষ্টা তিনি করেছেন, কিন্তু শরীরে কুলোল না। এগুলি করবার মতো কাজ।

রবীন্দ্রনাথের আর একটা সাধ ছিল—চিরকাল মনে রাখবার মতো করে চরিত্র সৃষ্টি। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে যা করা হয়েছে। এমন চরিত্র সৃষ্টি করা দরকার, যা হয়তো এক শ দু শ পাঁচ শ বছর থাকবে। তাঁর খেদ ছিল এ বিষয়ে তেমন কিছু করতে পারেন নি। তাঁর অসমাপ্ত কাজ আমাদের সমাপ্ত করতে হবে। চেষ্টা করলে পারব—এমন কথা কেউ সাহস করে বলতে পারে না। তবে কী কী কাজ করা উচিত, সে সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে চেষ্টা সফল হতে পারে।

গতানুগতিক ধারায় আমরা নতুন কিছু করতে পারব না। সে বিষয়ে চূড়ান্ত হয়ে গেছে। করলে পুনরাবৃত্তি হবে। যেসব কাজ হয়নি, মহাজাতি সদনের মতো যেসব কাজ অসমাপ্ত রয়েছে, তাকে সমাপ্ত করতে হবে। যা আরম্ভ হয়নি, তাকে আরম্ভ করতে হবে। বহু চেষ্টা করেও যা করতে পারলুম না, পরবর্তী যারা আসবে, তাদের বলব, তোমরা কর। কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হতে হবে।

প্রত্যেক বছর যখন রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব আসবে, তিনি যে ঐশ্বর্য রেখে গেছেন, সেটা যখন আমরা স্মরণ করব, তখন সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে—আমাদের কাজ আমরা এখনো শেষ করতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।" যে-কাজ করা দরকার, সে-কাজ যেন আমরা ভুলে না যাই, শয়নে স্বপনে যেন আমরা সেজন্যে বেদনা অনুভব করি। হতাশ হলে কিছু হবে না। পরবর্তী যারা আসছে তাদের

উপর ভার দিয়ে যাব। দশ বৎসরে বাংলা সাহিত্যের অভাব কিছু মিটেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয় এখনো আমাদের অনেক জিনিস করতে বাকী আছে। তার জন্যে যেন আমরা বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।

যে-কাজ তিনি নিজে করতে চেয়েছিলেন, করতে পারেননি, যে-কাজ আমাদের করা উচিত ছিল, আমরা করতে পারিনি, সে সম্বন্ধে পাঠক সচেতনভাবে দাবি না জানালেও অচেতনভাবে দাবি জানাচ্ছে, তারা বলছে, আমাদের যা দরকার তোমরা দিতে পারছ না কেন? সেজন্যে একটা আত্ম-নিবেদনের ভাব থাকা উচিত। রবীন্দ্রনাথের সেই ভাব ছিল। আমরাও যেন তার অধিকারী হতে পারি।

(১৯৫১)

নিজের কথা

কিছু দিন থেকে চিঠির পর চিঠি আসছে আমার জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা নিয়ে। একসঙ্গে সকলের চিঠির উত্তর দিলে সময় বাঁচে। সময় মানে আয়ু। সেইজন্যে এই প্রবন্ধ।

আমার পূর্বপুরুষের নিবাস ছিল হুগলী জেলার কোতরং। আকবর বাদশার আমলে তোডর মল্লের সঙ্গে তাঁরা ওড়িশায় যান ভূমি রাজস্ব নির্ণয় করতে। বালেশ্বর জেলায় ভূসম্পত্তি লাভ করে বসবাস করেন। তাঁরা দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ ঘোষ, কিন্তু বংশপদবী খান্। হুগলী জেলার সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে যায়। একে একে অন্যান্য পদবী আমাদের বংশগত হয়। এখনো আমরা মহাশয় বংশ বলেই পরিচিত। মহাশয়েরা বালেশ্বর জেলার নানা স্থানে শাখা স্থাপন করেন, কটক জেলাতেও। যে শাখাটি রামেশ্বরপুর গ্রামের নামে পরিচিত সেই শাখায় আমার জন্ম। জ্ঞাতিবিবাদে নিঃস্ব হয়ে আমার পিতামহ শ্রীনাথ রায় দেশান্তরী হন। আমার পিতা নিমাইচরণ রায় স্কুলের পড়া শেষ করার আগে ব্রিটিশ সরকারের চাকরি নিয়ে অনুগোল যান, সেখান থেকে যান ঢেঙ্কানাল রাজ্যে রাজ সরকারের চাকরি নিয়ে।

ঢেঙ্কানাল রাজ্যের রাজধানী ঢেঙ্কানাল গড়ে আমার জন্ম। তখন সেখানে রেল স্টেশন ছিল না, চারিদিকে পাহাড় ও জঙ্গল। নিকটবর্তী শহরের নাম কটক। তখনকার দিনে কটক যেতে হলে গোরুর গাড়িতে করে বাঘ ভালুকের দৃষ্টি এড়িয়ে বিশ বাইশ মাইল যেতে হতো, তার পরে খেয়া নৌকায় মহানদী পার হতে হতো। কটকে আমার মামাবাড়ি। আমার মা হেমনলিনী কটকের প্রসিদ্ধ পালিত বংশের মেয়ে। পালিতরা কটকে আসেন ব্রিটিশ আমলে, আমি

(রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবসে মহাজাতি সদনে প্রদত্ত বক্তৃতা। ইন্দ্রকুমার চৌধুরী কর্তৃক অনুলিখিত ও আমার দ্বারা সংশোধিত।)

যতদূর জানি। বাংলা দেশের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক রায় বংশের চেয়ে ঘনিষ্ঠ। রায়েরা যেমন সেকেলে পালিতরা তেমনি একেলে। আমার মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিকের সমাবেশ এভাবেই ঘটেছে।

আমার জন্মদিন ইংরেজী মতে ১৫ই মার্চ ১৯০৪। শাক্তবংশের মধ্যে যদিও বৈষ্ণব প্রভাব প্রবেশ করেছিল তবু আমাদের পাঁচ ভাইবোনের নামকরণ শাক্ত পদ্ধতিতে, কেবল ছোট বোনের নাম বৈষ্ণব পদ্ধতিতে। শাক্ত ও বৈষ্ণব দুই ধর্মের আওতায় আমি মানুষ হয়েছি। ঢেঙ্কানাল রাজ সরকারে তখন নানা দিগ্‌দেশ থেকে কর্মচারী সংগ্রহ করা হতো, অতিথি অভ্যাগত আসতেন নানা অঞ্চল থেকে। মুসলমান ক্রিশ্চান ও ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে আমার পিতা ও পিতৃব্যরা আমাকে শৈশবাবধি পরিচিত হতে দেওয়ায় ধর্ম সম্বন্ধে আমার গোঁড়ামি ক্ষয়ে যায়।

আমার জীবনের প্রথম সতেরো বছর কেটেছে ঢেঙ্কানালে। ইতিমধ্যে পুরী ও কটকে বার কয়েক গেছি। কিন্তু বাংলাদেশে আসিনি। ছোট একটা জায়গায় সতেরো বছর কাটলে যা হয়—আমার মধ্যে শেষের দিকে পলাতক ভাব প্রবল হয়েছিল। আমেরিকায় পালাব স্থির করে বেরিয়েছিলুম। কিন্তু কলকাতা থেকে ফিরে গিয়ে কটক কলেজে ভর্তি হই। কটকে দু বছর থেকে আবার সেই পলায়নী বৃত্তির প্রেরণায় পাটনা যাই। পাটনায় চার বছর কাটিয়ে আবার সেই পলায়নপ্রবণতা বশত বিলেত যাই, বিলেতের দু বছর নামে লণ্ডনে থাকলেও কার্যত ইউরোপের দেশে দেশে বেড়াই। বিলেত থেকে ফিরে বাংলা দেশে নিযুক্ত হই, কিন্তু এমনি আমার বরাত যে কোথাও বেশীদিন থাকতে পাইনে। দেড় বছর কি দু বছর যেতে না যেতেই বদলি।

আমার ভ্রমণের রসদ আমাকেই রোজগার করতে হয়েছে। কী করে রোজগার করতুম যদি না পড়াশুনায় মন দিয়ে জলপানি পেতুম। সেইজন্যে পড়াশুনায় মন দিতে বাধ্য হয়েছি, নইলে পড়াশুনায় আমার মন লাগত না। শৈশব থেকে আমি যা খুঁজেছি তার নাম রস। যে যা চায় সে তা পায়, যদি দাম দেয়, যদি কষ্ট সয়, যদি দুঃখের জন্যে প্রস্তুত হয়। রস চেয়েছি, রস পেয়েছি বলেই একদিন রস দিতে পেরেছি। রসের লেখনী ধরে রস ছিটিয়েছি। সেদিন আমাকে একজন বাঙালী নর্তক বলছিলেন, ওড়িশায় যেমন রস আসে ভারতের আর কোথাও তেমন নেই। আমি সে কথা স্বীকার করি। রসের শিক্ষা আমি অনেকের কাছে নিয়েছি, কিন্তু রসের দীক্ষা পেয়েছি ওড়িশার কাছে। জীবনের প্রথম উনিশ বছরে। এবং তার পরেও। একদা আমি ওড়িয়া ভাষার কবি ছিলুম। আমার কবিতা "উৎকল সাহিত্যে" মাসে মাসে বেরোত।

বিলেত থেকে ফিরে আসার এক বছর পরে আকস্মিক ভাবে আমার বিবাহ। আমার পত্নীর নাম য়্যালিস ভার্জিনিয়া অর্নডর্ফ। তিনি আমেরিকার টেক্‌সাস প্রদেশের কন্যা। সংগীতের সন্ধানে ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৯৩০ সালে। কিছুদিন পরে ফিরে যেতেন। আমি তাঁকে বন্দী করলুম। ছেলে-বেলায় আমেরিকায় পালিয়ে যাবার কল্পনা ছিল। কল্পনা ছিল সে দেশে

গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করব। তা তো হলো না। অবশেষে আমেরিকা এলো আমার ঘর করতে। যে যাকে চায় সে তাকে পায়, এক ভাবে না হোক আরেক ভাবে। আমাদের তিন পুত্র, দুই কন্যা। মধ্যম পুত্রটিকে অকালে হারিয়েছি।

আমার সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় দীর্ঘকালের। আমার বয়স যখন ষোলো সেই সময় "প্রবাসী"তে আমার একটি রচনা ছাপা হয়। টলস্টয়ের একটি কাহিনীর অনুবাদ। সেই বোধ হয় আমার প্রথম প্রকাশিত রচনা। তার পরে ওড়িয়া ও বাংলা দুই ভাষায়, এমন কি ইংরেজিতেও, আমার প্রথম বয়সের বহু রচনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু নাম হয় যেদিন "বিচিত্রা"য় "পথে প্রবাসে" নামাঙ্কিত ভ্রমণকাহিনীর আরম্ভ। তার পর থেকে একাদিক্রমে এই উনিশ বছরে ছোট বড়ো উনিশ কুড়ি খানা বই লিখেছি। কিন্তু বই লেখা আমার পেশা নয়। নেশাও নয়। মাঝখানে কয়েক বছর লেখা ছেড়ে দিয়ে দেখেছি—না লিখলেও চলে। কোনো রকম লেবল গায়ে আঁটতে আমার ভালো লাগে না। আমি যে একজন লেখক এটাও তো একটা লেবেল। সেইজন্যে মাঝে মাঝে এটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলি। দেখি এর কতটুকু লেগে থাকে। বার বার টানা ছেঁড়ার পর বুঝতে পেরেছি যে আমি অনিবার্য রূপে লেখক। অর্থাৎ চেষ্টা করলেও আমি লেখা বন্ধ করতে পারব না; কিন্তু লেখা কমাতে পারব। সেই চেষ্টাই করছি। লেখা নিয়ে উনিশ বছর ধরে যে পরীক্ষা করেছি তার বিবরণ দিতে হলে আস্ত একখানা বই লিখতে হয়। একদিন লিখব। আজ শুধু এই বলে শেষ করি যে আমি প্রথমত জীবনশিল্পী, দ্বিতীয়ত লিখনশিল্পী। লেখাকে আমি দ্বিতীয় স্থান দিই। তা বলে অবহেলা করিনে। যথাসম্ভব যত্ন করেই লিখি।

(১৯৪৭)

আত্মস্মৃতি

একটা হাসির গল্প বলে আরম্ভ করি। বছর বাইশ তেইশ আগে যখন লণ্ডনে ছিলুম তখন সেখানে এক বোর্ডিং হাউসে কে একজন সান্যাল আত্মহত্যা করেন। এই নিয়ে আমরা জটলা করছি, এমন সময় এলেন শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল। আমরা জিজ্ঞাসা করলুম. এত বিমর্ষ কেন? মুখে নাই হর্ষ কেন? তিনি উত্তর দিলেন, কে একজন সান্যাল আত্মহত্যা করেছে। কালকের খবরের কাগজ পড়ে দেশের লোক ধরে নেবে আমিই সেই সান্যাল। কাজেই গাঁটের কড়ি খরচ করে খানকয়েক তার করে দিতে হলো, আমি নই সেই সান্যাল যে আত্মহত্যা করেছে

আমিও তেমনি জানিয়ে রাখছি যে, আমি স্বনামধন্য কিরণশঙ্কর রায় মহাশয়ের আত্মীয় নই, তেওতার জমিদার বংশে আমার জন্ম নয়, আমরা বৈদ্য নই, এমন কি উপবীতধারীও নই। বিশ বছর আগে নওগাঁ মহাকুমার ভার

পেয়েছি, এক সাবরেজিস্ট্রার এলেন সাক্ষাৎ করতে। মুখে হাসি ধরে না। বললেন, আপনিও বৈদ্য, আমিও বৈদ্য, অমুক অমুক অমুক অমুক অমুক বৈদ্য। আমরা এখানে অনেকগুলি বৈদ্য।···নারায়ণগঞ্জের এক জনসভায় এক বক্তা আমার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন আঠারো বছর আগে, এঁর আর পরিচয় কী দেব! কে না জানে এঁরা এই জেলার বিখ্যাত জমিদার বংশ।··· সতেরো বছর আগে বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও আমি সোনামুখীর বিদ্যালয় দেখতে গেছি। তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে সেক্রেটারি বললেন, ইনি ব্রাহ্মণ। আর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ইনিও উপবীতধারী।···এই রকম অজস্র গল্প আছে আমার ঝুলিতে। কলকাতায় মাস কয়েক আগেও এরূপ ঘটেছে। আর একটা বলে বিষয় পরিবর্তন করি।

পাঁচ বছর আগে ময়মনসিংহের সাহিত্যসভায় এক ভদ্রলোক আমার সম্বন্ধে বললেন, হবে না কেন! যত বড়ো বড়ো সাহিত্যিক সকলেই জমিদার। জমিদার না হলে সাহিত্যিক হয় কখনো! শ্রীনলিনাক্ষ সান্যালের মতো আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হলো, আমরা তেওতার রায় নই। আমাদের জমিদারি অনেক দিন গেছে।

মোগলরা যখন পাঠানদের হারিয়ে দিয়ে ওড়িশার মালিক হয় তখন সুবে ওড়িশা জরিপ করতে যান তোডর মল্লের সহকর্মী খান্ পদবীধারী হুগলী জেলার কোতরংনিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ঘোষ। জাহাঙ্গীর বাদশাহ এঁকে একখানা তালুক দেন। সেই জাহাঙ্গীরী তালুক পেয়ে ইনি ওড়িশায় বসবাস করেন। খান্ থেকে কবে এঁরা রায় হলেন, চৌধুরী হলেন, মহাশয় হলেন সে সব আমার জানা নেই। বালেশ্বর ও কটক জেলার সাত-আটটি জায়গায় সাত-আট জন মহাশয় আছেন। বড়ো তরফের বড়ো কর্তাকে বলা হয় মহাশয়। আমরা হচ্ছি রামেশ্বরপুরের মহাশয় বংশ। অন্যান্য শাখায় এখনো কিছু কিছু জমিদারি আছে। আমরা কিন্তু নির্ভূম মহাশয়। থাকবার মধ্যে আছে কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি। তাও শরিকদের দখলে।

আমার ঠাকুরদাদা শ্রীনাথ রায় অত্যন্ত নিরীহ ও নির্বিরোধ ছিলেন। জ্ঞাতিদের দৌরাত্ম্য সহ্য করতে না পেরে চিরকালের মতো রামেশ্বরপুর ত্যাগ করেন। আমার বাবা নিমাইচরণ রায় অল্প বয়সে পড়াশুনা ছেড়ে চাকরি করতে বাধ্য হন। বাপ-মা, ভাই-বোন সকলের ভার তাঁর একার উপরে। সরকারী চাকরি, উন্নতির আশা ছিল, কিন্তু নিকটভবিষ্যতে বদলির আশা ছিল না। অনুগোল তখনকার দিনে পাণ্ডববর্জিত জেলা। শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা বঞ্চিত। তার তুলনায় ঢেঙ্কানাল দেশীয় রাজ্য হলেও সব রকমে অগ্রসর। সেখানকার হাই স্কুলে পড়তে অনুগোল থেকে ও আশেপাশের দেশীয় রাজ্য থেকে বহু ছাত্র আসত। বাবা ভেবে দেখলেন ভাইগুলিকে মানুষ করতে হলে ঢেঙ্কানালে বাস করা ভালো। তিনি সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রাজদরবারে চাকরি নিলেন। আর্থিক সুবিধা কিছুমাত্র হলো না, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ যা পাওয়া গেল তা আশাতীত। রাজা সাহেব ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির

গুণগ্রাহী সজ্জন। তাঁর আহবানে নানা প্রদেশ থেকে জ্ঞানী-গুণীরা আসতেন কাজ-কর্ম নিয়ে কিছু দিন থাকতে, স্বাস্থ্য ফিরে পেতে। বাঙালীই বেশী। স্কুলের জন্যে যথেষ্ট খরচ করা হতো, অথচ ছেলেদের বেতন লাগত যৎসামান্য। লাইব্রেরীতে রাশি রাশি বাংলা, ওড়িয়া, ইংরেজী বই ছিল। স্থানীয় অফিসারদের কারো কারো ঘরোয়া লাইব্রেরী ছিল। রাজবাড়িতে ছিল থিয়েটার ও চিড়িয়াখানা। রাজার ছিল হাতীশাল, ঘোড়াশাল। প্রায় প্রত্যেক বছর হাতী ধরা হয়ে আসত। বিস্তীর্ণ খেলার মাঠ। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস খেলা হতো। অনেকগুলো দীঘি। সাঁতার কাটতে, নৌকায় করে বেড়াতে সুযোগ পেত সকলে। পাহাড়ী জায়গা, চারিদিকে জঙ্গল। রেললাইন নেই। সেটা হয়েছিল শাপে বর।

ঢেঙ্কানালের রাজধানী নিজগড়ে আমার জন্ম। জন্মদিন ১৫ই মার্চ, ১৯০৪। সেদিন ছিল বারুণী। বংশের বড়ো ছেলে। আদরে দুলাল। যে দেখে সেই একটা করে নাম রাখে। বারুণীয়া, বৃন্দাবনচন্দ্র, গদাধর, এমনি কত নাম! আমরা শাক্ত, সেইজন্যে অন্নপ্রাশনের সময় নামকরণ হলো অন্নদাশঙ্কর। আমার ঠাকুরদা যতদিন ছিলেন নামকরণের ধরন ছিল শাক্ত। এক এক করে নাম রাখা হয় চার ভাইবোনের—অন্নদাশঙ্কর, অভয়াশঙ্কর, রাজরাজেশ্বরী, অজয়াশঙ্কর। ঠাকুরদার মৃত্যুর পর বাবা বৈষ্ণব গুরুর কাছে দীক্ষা নেন। সেইজন্যে ছোট বোনের নাম রাখা হলো ব্রজেন্দ্রমোহিনী। রাজবাড়ির উপর বাবার কিছু প্রভাব ছিল। বাবার কথায় রাজা সাহেব তাঁর এক ছেলের নাম রাখেন গৌরেন্দ্রপ্রতাপ। আমাদের বাড়িতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হলো শ্রীশ্রীগৌরগোপাল।

আমার মা হেমনলিনী রায় কটকের প্রসিদ্ধ পালিত বংশের মেয়ে। পালিত বংশ বাংলাদেশ থেকে ওড়িশায় গেছেন উনিশ শতকে। তাঁদের চলাচলন হাল ফ্যাশনের। একে তো তাঁরা শহুরে লোক, তার উপর তাঁরা কলকাতার সঙ্গে নিত্য সংযুক্ত। তাঁদের মুখের ভাষা কলকাতার চলতি বাংলা। আর আমাদের মুখের ভাষা অনেকটা মেদিনীপুরের আঞ্চলিক বাংলার মতো ওড়িয়া প্রভাবিত। আমরা কথায় কথায় বলতুম "কেরে।" অর্থাৎ "করিয়া।" একটা নমুনা দিচ্ছি। চলতি বাংলা : আমি খেয়ে এসেছি। আমাদের বাংলা : আমি খায়ে কেরে আসেছি। এখানে এই "কেরে" শব্দটি সম্পূর্ণ বাহুল্য। কিন্তু বাঁকুড়ায়, মেদিনীপুরে, ওড়িশায় এই শব্দ বা এর অনুরূপ শব্দ লক্ষ করা যায়। সাধু ভাষায় দাঁড়াবে, আমি খাইয়া করিয়া আসিয়াছি। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যে আমাদের মুখের ভাষাকে পরিহাসছলে বলা হয় কেরা বাংলা। আমাদের ঠাট্টা করে বলা হয় কেরা বাঙালী। আমরাও পাল্টা হাসতে জানি। মামাদের বলি বাংলাবালা। এই অর্থে আমার মা ছিলেন বাংলাবালী।

দশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি ঠাকুমার কোলে মানুষ হয়েছি। ঠাকুমাকে বলতুম মা। মাকে বলতুম খোকার মা। খোকা আর কেউ নয়, আমি নিজে। এসব আবিষ্কার করতে আমার অনেক দিন লেগেছিল। মাকে, বাবাকে, বরাবরই একটু পর পর মনে হতো। আমার ঠাকুমা দুর্গামণি রায় জাজপুরের সম্ভ্রান্ত

সেন বংশের মেয়ে। যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি শক্তিমতী। সেকালের পক্ষে তিনি বেশ শিক্ষিতা ছিলেন। বাংলা ওড়িয়া দুটো ভাষার প্রাচীন আধুনিক অনেক বই তাঁর পড়া ছিল, কিংবা জানা ছিল। রামায়ণ, মহাভারত ও কবিকঙ্কণ চণ্ডী ছিল তাঁর নখদর্পণে। দেশী বিদেশী অনেক রূপকথা, কাহিনী, কিংবদন্তী, গুজব ও খবর ছিল তাঁর ঝুলিতে। তাঁর কাছে রাত্রে ও দুপুরে শুয়ে শুয়ে আমি যা শিখেছি পরে বই পড়ে তার চেয়ে এমন কী বেশী শিখেছি? তিনি আমাকে মানুষ করেছিলেন, এর চেয়ে বড়ো কথা তিনি আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। অল্পবয়সী রুগ্ণ মায়ের প্রথম সন্তান, আমার নাকি সম্বলের মধ্যে ছিল একটি মাথা ও কয়েকখানি হাড়। মাংস লাগল ঠাকুমার অবিশ্রান্ত যত্নে। তেল-হলুদ মাখিয়ে শুইয়ে রাখতেন। খাওয়াতেন দুধ আর নরম ভাত। অনেক বয়স পর্যন্ত আমার জন্যে আলাদা রান্না হতো। উঠোনে একটা তোলা উনুনে ছোট একটা হাঁড়িতে সিদ্ধ হতো পুরোনো সরু চাল। তার সঙ্গে আলু। গলা ভাত, আলু ভাতে, কাগজী লেবু ও চিনি, হয়তো এক ফোঁটা ঘি এই ছিল আমার নিয়মিত পথ্য। এ ছাড়া দুধ সর ননী। খুব কম বয়সেই চা ধরি। ঠাকুরদা চা খেতে বসলে আমাদের ডেকে খাওয়াতেন। এই ভাবে ছ'সাত বছর কাটলে পর আমি সব কিছু খেতে শুরু করি, সাধারণত ঠাকুমাকে না বলে। আমার এই অনিয়মের প্রশ্রয় দিতেন আমার মা। লুকিয়ে একটা কিছু আমার হাতে মুখে গুঁজে দিতেন। প্রতিবেশীরাও আমাকে এটা-ওটা খাইয়ে খুশি হতেন। ফলে আমি হয়ে উঠি যেমন পেটুক তেমনি পেটরোগা। গায়ে গত্তি লাগছে না বলে মা আমার দুঃখ করতেন। কথা নেই বার্তা নেই এক গ্লাস দুধ এনে ঢক ঢক করে গিলিয়ে দিতেন। উল্টো ফল হতো।

দশ বছর বয়সের সময় আমাদের বাড়িতে আগুন লাগে। সব সঞ্চয় ছাই হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ঠাকুরদার মৃত্যু হয়েছিল। এর পরে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যায়। ঠাকুমা চলে যান বড়োকাকার সঙ্গে। মাকে আর বাবাকে নতুন করে পাই। মা ছিলেন অত্যন্ত সরল স্নেহপ্রবণ, শাসন করতে একেবারেই জানতেন না, কাঁদতেন, গৌরগোপালের কাছে প্রার্থনা করতেন। সংসারের কাজ তাঁর ভালো লাগত না, ভালো লাগত গৌরগোপালের সেবা আর পুজো আর নামকীর্তন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। ঝি-চাকর চলে যায়। মাকেই সমস্ত কাজ করতে হতো। শাশুড়ী থাকতে কম কষ্ট পাননি, কিন্তু সেটা কায়িক নয়, মানসিক। এবার পেতে হলো কায়িক কষ্ট। বৈষ্ণব দীক্ষার পর থেকে মাছ-মাংস বারণ। নিরামিষও দুর্মূল্য। বাবার পদোন্নতি হয়েছিল, কিন্তু আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী। একদিন চা বন্ধ করে দিলেন। বাবা একবার যা স্থির করতেন তার আর নড়-চড় হতো না। রাজ্যের লোক জানত তাঁর যে কথা সেই কাজ। সেইজন্যে রাজা-প্রজা সকলে তাঁকে বিশ্বাস করত। তেজস্বী লোক ছিলেন। কোনো দিন তাঁর সাহসের অভাব দেখিনি। মহাযুদ্ধের পেষণে আমরা প্রত্যেকেই গুঁড়িয়ে যেতে লাগলুম। কিন্তু সব চেয়ে ক্ষতি হলো মায়ের। যুদ্ধের পর দেশে শান্তি এলো,

কিন্তু আমাদের ঘর গেল ভেঙে। সামান্য কয়েক দিনের জ্বরে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মায়ের মৃত্যু হয়। তার কয়েক দিন আগে পলিটিক্যাল এজেন্টের সঙ্গে ঝগড়া করে বাবা ইস্তফা দিয়েছিলেন। দেওয়ানের অনুরোধে ইস্তফা প্রত্যাহার করেন। নইলে আমরা পথে বসতুম। আমাদের সেই সদাশয় রাজা সাহেব তখন বেঁচে নেই। তিনিও সামান্য অসুখে হঠাৎ দেহত্যাগ করেন। তাঁরও তখন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়স।

বলতে গেলে মাকে আমি ছ'সাত বছরের বেশী পাইনি। তাঁর মৃত্যুর সময় আমি ছিলুম না। গেছলুম ম্যাট্রিক দিতে কটকে। তিনি আমাকে ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে। আমি কিন্তু বরাবরই একটু উদাসীন ছিলুম। আমি বাস করতুম মনোজগতে। আমার একখানা হাতে-লেখা মাসিকপত্র ছিল। সেটা ওড়িয়া ভাষায়। কিন্তু আমার প্রধান পাঠ্য ছিল যত রাজ্যের বাংলা বই ও বাংলা মাসিকপত্র। আমার হেডমাস্টার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয় আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। সেকালের একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম লেখক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাড়িতেও আমার গতিবিধি ছিল। রায় বাহাদুর দ্বারকানাথ সরকার মহাশয়ের নাতিরা আমার বন্ধু। সুতরাং আমি ঢেঙ্কানালে বসেই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন-আধুনিক অসংখ্য বই পড়তে পেয়েছিলুম, আর মাসে মাসে পড়তে পেতুম "প্রবাসী", "ভারতবর্ষ", "ভারতী", "সবুজপত্র", "মানসী ও মর্মবাণী" "নারায়ণ", "গৃহস্থ", "শিশু" "সন্দেশ", "মৌচাক"। এ ছাড়া ইংরেজী মাসিকের অপ্রতুল ছিল না। এমনি করে আমার সাহিত্যিক রুচি গড়ে ওঠে। একবার স্কুলের পরীক্ষায় প্রাইজ পাই টলস্টয়ের ছোট গল্পের ইংরেজী অনুবাদ। তার থেকে একটার বাংলা অনুবাদ করে "প্রবাসী"তে পাঠিয়ে দিই। তখনো আমি স্কুলের ছাত্র। বয়স বোধ হয় ষোলো। অবিলম্বে উত্তর এলো লেখাটি "প্রবাসী"তে ছাপা হতে যাচ্ছে। উত্তরদাতা চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। "তিনটি প্রশ্ন" সেই গল্পটির নাম।

"তিনটি প্রশ্ন" আমার প্রথম প্রকাশিত বাংলা রচনা। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার আগেই আমি স্থির করে ফেলেছিলুম যে আমেরিকায় পালিয়ে গিয়ে সাংবাদিক হব ও ভারতের স্বাধীনতার জন্যে লিখব। ঢেঙ্কানালের সারঙ্গধার দাস ছিলেন আমেরিকায়। তিনি যখন সে দেশ থেকে ফিরলেন আমি ওড়িয়াতে একটা গান লিখলুম ও সেই গান গেয়ে তাঁকে প্রকাশ্যে সম্বর্ধনা করা হলো। তাঁর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছি শুনে মায়ের মনে সন্দেহ হলো আমিও আমেরিকা যাচ্ছি। তিনি আমাকে চোখে চোখে রাখলেন। আমার কাছে কথা আদায় করে নিলেন যে, আমি পালাব না। কিন্তু ম্যাট্রিক দেবার জন্যে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কটক যাবার পর আমার প্ল্যান হলো কাউকে কিছু না বলে কলকাতায় পালানো, কলকাতা থেকে আমেরিকায়। কটকে বসে ছোট কাকাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেছিলুম যে, সাত দিনের মধ্যে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে। কিন্তু সাত দিনের মধ্যে যা ঘটল তা আমার পরিকল্পিত আশ্চর্য ঘটনা নয়, বিধাতার পরিকল্পিত আশ্চর্য ঘটনা। মাকে বেশ ভালো দেখে এসেছিলুম,

খবর এলো তিনি নেই। কোথায় আমি চলে যাব আমেরিকায় না তিনি চলে গেলেন স্বর্গে। আমার আমেরিকা যাওয়া হলো না, কিন্তু আমেরিকা এলেন আমার ঘরে আমার বধূরূপে প্রায় দশ বছর পরে।

ছোট কাকাকে বলার ফল হলো এই যে, বাবা আমাকে অনুমতি দিলেন কলকাতা গিয়ে খবরের কাগজের সম্পাদনা শিখতে। ইতিমধ্যে আমি জর্নালিজমের উপর বইপত্র পড়েছিলুম। কিন্তু আমি রিপোর্টার হতে চাইনি, প্রুফরীডার হতে চাইনি, সাব-এডিটার হতে চাইনি, চেয়েছিলুম ফ্রীলান্স হতে। নয়তো লীডার রাইটার হতে। আমার পরমহিতৈষী দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আমাকে পরিচয়পত্র দিলেন, দেখা করলুম "বসুমতী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি আমাকে কিছু অনুবাদ করতে দিলেন। তার পর উপদেশ দিলেন শর্টহ্যান্ড টাইপরাইটিং শিখতে। ঘোষ-মিত্তিরের ওখানে গ্রেগ শর্টহ্যান্ড আরম্ভ করে দিলুম, সঙ্গে সঙ্গে টাইপরাইটিং। সওদাগরি আপিসের বাবু তৈরি হচ্ছিল সেখানে। আমার ভালো লাগল না। "সার্ভ্যান্ট" সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি আমাকে বললেন প্রুফরীডিং শিখতে। তাঁর দপ্তরের এক ভদ্রলোক আমাকে শেখালেন বটে, কিন্তু এ কথাও বললেন যে আমি তাঁর দানা মারতে এসেছি। শুনে দুঃখ হলো। দেখলুম এঁরা কেউ আমাকে চিনলেন না।

সম্পাদনা শেখবার এই হয়তো সনাতন পদ্ধতি। কিন্তু এর জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলুম না। আধপেটা খেয়ে অসুস্থ হয়ে কী করব ভাবছি এমন সময় ছোট কাকা শ্রীহরিশচন্দ্র রায় লিখলেন, তুমি আমাদের বংশের বড়ো ছেলে, তোমার কাছে আমরা এর চেয়ে বড়ো কিছু আশা করেছিলুম। ফিরে এসো, কটক কলেজে আমি তোমাকে ভর্তি করে দেব। আমার কাছে থাকবে। ছোট কাকার কথামতো কাজ হলো। কিন্তু জর্নালিজমের নেশা গেল না। স্থির রইল ঐ হবে আমার পেশা।

সেটা অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। সরকারী কলেজে পড়তে হলো এই যথেষ্ট লজ্জা। সরকারী চাকরি তো অভাবনীয়। আই. এ. পরীক্ষার পর আবার কলকাতা গিয়ে সম্পাদকী ভাগ্যপরীক্ষায় নামব, এমন সময় খবর পাওয়া গেল আমি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছি। স্কলারশিপ পাব নিশ্চয়। মোড় ঘুরে গেল। চললুম পাটনা। স্থির হলো বি. এ. পরীক্ষার পর আবার কলকাতা গিয়ে সম্পাদনার সুযোগ খুঁজব। কিন্তু এবারেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করি। স্কলারশিপও পাই। এম. এ. পড়তে পড়তে আই. সি. এস. প্রতিযোগিতায় যোগ দিই। প্রথম বারে সারা ভারতে পঞ্চম হই। সেবার মাত্র তিন জন নেওয়া হয়। আমাকে আরেকবার পরীক্ষা দিতে হলো। এবার আমি সারা ভারতে প্রথম হই ও পূর্ববর্তীদের রেকর্ড ভঙ্গ করি। এর পরে তো আর সম্পাদক হওয়ার কথা ওঠে না। দু'বছরের জন্যে সরকারী খরচে বিলেতে চলে যাই। মনকে বোঝালুম, আচ্ছা, ফিরে এসে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সম্পাদক হওয়া

যাবে। তখন আমি স্বাধীন। হায়! পুরুষের ভাগ্য দেবতারও অজানা।

ইতিমধ্যে আমার সাহিত্যচর্চা ধীরে ধীরে চলছিল। কলেজে আমরা জন-কয়েক বন্ধু মিলে একটা ক্লাব করি। তার নাম নন্‌সেন্স ক্লাব। তার একটা হাতে লেখা পত্রিকা ছিল। তাতে যে যা খুশি লিখত। যে কোনো ভাষায়। আমি লিখতুম ইংরেজী বাংলা ওড়িয়া তিন তিনটে ভাষায়। মাঝে মাঝে "প্রবাসী" প্রভৃতি মাসিকপত্রে লেখা দিতুম। "প্রবাসী"তে একবার আমার একটি বড়ো কবিতা গোড়ার দিকে ছাপা হয়। "ভারতী"তে ছাপা হয় আমার সমাজ-ধ্বংসী রচনা "পারিবারিক নারী-সমস্যা"। লেখকের বয়স মাত্র আঠারো বছর, এ কথা জানা থাকলে "বঙ্গনারী" তার একটা উত্তেজিত প্রতিবাদ লিখে ছাপাতেন না। কত বার তাঁকে আমি পুরীর সমুদ্রতীরে দেখেছি, ভেবেছি নিজের পরিচয় দিয়ে বলি আমিই সেই কালাপাহাড়। কিন্তু আমার সাহস যা কিছু ঐ কাগজে কলমে। মোকাবিলায় আমি একটি ভিজেবেড়াল। "ভারতী" আমার প্রতি সদয় দেখে শরৎচন্দ্রের "নারীর মূল্যে"র উপর একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দিই। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি। "ভারতী" তার সমস্তটাই ছাপলেন। শরৎচন্দ্রের এই নির্জলা প্রশংসা তখনকার দিনে নতুন ছিল। তিনি লক্ষ করেছিলেন কি না জানিনে। দীর্ঘকাল পরে যখন তাঁর "শেষ প্রশ্নে"র বিরূপ সমালোচনা করি তিনি মনে করলেন আমি তাঁর নিন্দুক। তাঁর সঙ্গে আমার বোঝাপড়ার অবসর হয়নি।

সঙ্গে সঙ্গে ওড়িয়াতেও আমার সাহিত্যের কাজ চলছিল। উৎকলের শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র "উৎকল সাহিত্য" ইবসেনের "ডল্‌স হাউস" নিয়ে লেখা আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সম্পাদকপ্রবর ব্রাহ্মনেতা বিশবনাথ কর মহাশয় আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে স্নেহ করতেন। আমার আরো অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা তাঁর আনুকূল্যে ছাপা হয়। সাধারণত তিনি আমাকে প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান দিতেন। আমার বন্ধুরাও তাঁর স্নেহ আকর্ষণ করেন।

আমাদের সেই ননসেন্স ক্লাবের দলটি কর মহাশয়ের মাসিকপত্রে স্থায়ী আসন পেয়ে সবুজ দল বলে সুপরিচিত হয়। অন্নদাশঙ্কর রায়, বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হরিহর মহাপাত্র মিলে "সবুজ কবিতা" নামে একখানি বই বার করেন। নন্‌সেন্স ক্লাবের মেম্বর নন এমন কয়েকজন লেখক ও লেখিকা পরে এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে "বাসন্তী" নামে একখানি বারোয়ারি উপন্যাস সংরচন করেন। কর মহাশয় তাঁর মাসিকপত্রে এই উপন্যাসটিকেও আশ্রয় দেন। সবুজ দল বলতে এঁদের সবাইকে বোঝায়। বাংলায় যেমন "কল্লোল যুগ" ওড়িয়াতে তেমনি "সবুজ যুগ"। বন্ধুরা আশা করেছিলেন যে, আমি তাঁদের সঙ্গে থেকে নব নব উদ্যমের দ্বারা সবুজ সাহিত্যের খ্যাতি বর্ধন করব। কিন্তু কিছু দিন থেকে আমি চিন্তা করছিলুম যে, বাংলা ওড়িয়া দুটো ভাষায় দুই নৌকায় পা রেখে আমি কালপারাবার পাড়ি দিতে পারব না। কেউ কোনো দিন দুই ভাষায় অমর হয়নি। আমাকে দুটোর একটা বেছে নিতে হবে, যেমন নিয়েছিলেন বঙ্কিম,

যেমন নিয়েছিলেন মাইকেল। ঠিক এই রকম একটা সন্ধিক্ষণ এসেছিল কবিবর রাধানাথ রায়ের জীবনে। তিনিও লিখতেন বাংলায়, ওড়িয়ায়। দুই ভাষায়। নামও হয়েছিল বেশ। এমন সময় তিনি বাংলা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র ওড়িয়ায় লেখেন। অক্লান্ত সাধনার ফলে আধুনিক উৎকলের শ্রেষ্ঠ কবি বলে গণ্য হন।

আমি কিন্তু রাধানাথের বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। আমি বেছে নিই বাংলা। এর পরে আমি যখন ওড়িয়া লেখায় হঠাৎ ক্ষান্তি দিই আমার বন্ধুরা অবাক হন। সম্পাদক হন বিস্মিত। পাঠকেরা হন ক্ষুণ্ণ। অথচ আমি নিজেও নিশ্চিত ছিলুম না যে একদিন আমি বাংলা সাহিত্যে যশস্বী হব। আমার পক্ষে ওটা কূল ছেড়ে অকূলে ভাসা। তখনো আমি "পথে প্রবাসে" লিখিনি। বাংলা দেশে কেউ আমাকে চেনে না। "কল্লোল" আপিসের সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করেছি, সাহস হয়নি ঢুকতে। শান্তিনিকেতনে কবিসন্দর্শন করেছি, বলিনি যে আমি একজন সাহিত্যিক। দেখতে দেবার মতো যা আমার ছিল তা "প্রবাসী"র গুটিকয়েক কবিতা, "ভারতী"র গুটিদুয়েক প্রবন্ধ। অপর পক্ষে ওড়িশায় তখন আমি প্রথম পৃষ্ঠার অধিকারী।

বাংলায় লিখব, এই সিদ্ধান্তের পরের ধাপ বাংলা দেশে বাস করব। বিলেতে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হয়ে আমি কোন প্রদেশে কাজ করতে চাই আমি উত্তর দিলুম, বাংলা দেশে। তাঁরা ইচ্ছা করলে আমাকে আর কোথাও পাঠাতে পারতেন, কিন্তু দেখা গেল আমার ইচ্ছা তাঁরা মেনে নিলেন। বাংলা দেশে আমি আই. সি. এস. হয়ে আসি ১৯২৯ সালের শেষ ভাগে। তার আগে মাঝে মাঝে কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে এসেছি। সতেরো বছর বয়েসের আগে বাংলা দেশ দেখিনি। পঁচিশ বছর বয়সের পর থেকে বাংলা দেশ দেখে বেড়াচ্ছি। বাবা যতদিন ছিলেন ঢেঙ্কানালের বাড়িতে কালেভদ্রে যেতুম। তাঁর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধের জন্য যাই। পরে একবার দক্ষিণ ভারত দেখে ঢেংকানাল হয়ে ফিরছি, এমন সময় আমার মেজ ছেলের অসুখ করে ও চিকিৎসা-বিভ্রাটে কটক হাসপাতালে মৃত্যু হয়। বারো বছর আগে ঘটে এ ঘটনা। তার পর থেকে আর ও-মুখো হইনি। পুত্রশোকের মতো শোক নেই। আমার জীবনের প্রথম উনিশ বছর কেটেছে ওড়িশায়, প্রধানত ঢেংকানালে, পুরীতে ও কটকে। তার পরের ছয় বছর কেটেছে বিহারে ও বিলেতে। তার পরের একুশ বাইশ বছর কাটল বাংলা দেশে। আর দু'মাস পরে আমার সরকারী কর্মজীবন শেষ হয়ে যাবে। আমি অকালে অবসর নিয়ে সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করব। শান্তিনিকেতনে স্থির হয়ে বসব।

সাংবাদিকতার নেশা অনেকদিন ছুটে গেছে। আমি বুঝতে পেরেছি যে সাহিত্যের কাজই আমার আসল কাজ। এ কাজ শেষ না করে আমার ছুটি নেই। কিন্তু শেষ হবে কী, ভালো করে আরম্ভই হয়নি। যিনি আমাকে এত দূর নিয়ে এসেছেন তিনি আমাকে বাকিটুকু এগিয়ে দেবেন, এই আমার বিশ্বাস। জীবন বড়ো বিচিত্র ব্যাপার। কেমন করে কী যে হয় কেউ বলতে পারে না। সিভিল সার্ভিসের শিক্ষানবীশ হয়ে দু'ছরের জন্যে বিলেত যাচ্ছি,

এমন সময় "বিচিত্রা" বেরোয়। আমার বন্ধু শ্রীকৃপানাথ মিশ্র ভাগলপুরের লোক। সেই সূত্রে "বিচিত্রা" সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কৃপানাথের কথায় "বিচিত্রা"য় ছাপতে দিই "রক্তকরবীর তিন জন"। সম্পাদক আরো লেখা চেয়ে পাঠান। তখন বলি, আচ্ছা, আমি আমার ভ্রমণকাহিনী লিখে পাঠাব মাসে মাসে কিস্তিতে কিস্তিতে। "পথে প্রবাসে" শুরু হলো বম্বেতে জাহাজ ধরতে গিয়ে। তিন চার কিস্তি ছাপা হবার পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ ভালো লাগে। তেরো চোদ্দ বছর বয়সে এঁরাই ছিলেন আমার আদর্শ কবি, আদর্শ প্রবন্ধকার। চৌধুরী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভূমিকা লিখে দিলেন। আর যা বললেন তা একজন তরুণ সাহিত্যিকের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। আকবর বাদশাহের দরবারে এক দিন এক নবীন গুণী এলেন। তাঁর আলাপ শুনে বড়ো বড়ো ওস্তাদরা মাথা থেকে পাগড়ি খুলে ফেলে দিলেন। এখন থেকে ইনিই শোনাবেন, আমরা শুনব।

হ্যাঁ, জীবন অতি বিচিত্র ব্যাপার। তন্ময় হয়ে পড়ছি দেখলেই মা ধরে নিতেন উপন্যাস পড়ছি। বলতেন, হুঁ! নভেল পড়া হচ্ছে! ছেলে তাঁর নভেল লিখছে দেখলে কী মনে করতেন জানিনে। হয়তো বলতেন, হুঁ! নভেল লেখা হচ্ছে!

(১৯৫১)

ভ্রমণবিরতি

ছেলেবেলায় দেশভ্রমণের শখ ছিল ষোল আনা, কিন্তু পকেটে এক আনাও ছিল না। সম্বলের মধ্যে ছিল একখানা য়্যাটলাস। সেখানকার সবটা ছিল আমার নখদর্পণে। য়্যাটলাস খুলে বসে আমি অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো দিগ্বিজয় করে আসতুম। বড়ো হয়ে অনেক দেশ বেড়িয়েছি, দেশভ্রমণের সাধ ষোল আনা না হোক পাঁচ আনা মিটেছে। বাকী এগারো আনাও কে জানে কবে মিটবে! কিন্তু ততঃ কিম!

ততঃ কিম শুনে আপনারা হয়তো অবাক হবেন। আমিও এক কাল অবাক হতুম যদি কেউ বলত, কী হবে এত দেশ বেড়িয়ে। গণেশ তার জননীর চতুর্দিক পরিক্রমা করে বিশ্বপরিক্রমার ফল পেয়েছিলেন। কার্তিক সারা জগৎ ঘুরে মিছে হয়রান হলেন। যা ঘরে বসেই পাওয়া যায় তার জন্যে কে-ই বা যায় বাইরে টো-টো করতে! এ ধরনের কথা শুনলে কেবল যে অবাক হতুম তাই নয়, হতাশ হতুম এ দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে বিদেশীরা আসত এ দেশে বাণিজ্য করতে, এ দেশের ধন-দৌলত লুঠ করতে। ঘরে বসেই যদি এসব মিলত তবে কেন তারা এতদূর আসত? আর আমাদের পূর্বপুরুষরাই কি একদা সাত সমুদ্রে সপ্ত ডিঙ্গা ভাসাননি? ধরণীর

ঐশ্বর্য হরণ করে আনেননি ?

ততঃ কিম্‌কে তখনকার দিনে আমি উপহাস করেছি, ধিক্কার দিয়েছি তারুণের অভাব বলে। কিন্তু আমার নিজেরই মন এখন প্রশ্ন করছে, ততঃ কিম্‌ ? ততঃ কিম্‌ ? তবে কি আমার নিজেরই তারুণ্যের অভাব ঘটল ? বয়স বাড়তে বাড়তে চল্লিশ পার হয়েছে, পাকা চুল দেখা দিয়েছে মাথায়। জরার জয়ধ্বজা শীর্ষে বহন করে আমিও কি এখন গণেশের মতো স্থবির হয়েছি ?

তা নয়। ইংরেজীতে বলে, ফার্স্ট থিঙ্গস ফার্স্ট। প্রথম কাজটি প্রথমে। যতক্ষণ না প্রথম কাজটি শেষ হয়েছে ততক্ষণ দ্বিতীয় কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়। মহাত্মা গান্ধীর প্রথম কাজ দেশকে স্বাধীন করা। এর জন্যে তাঁকে সমস্ত-ক্ষণ ভারতবর্ষেই থাকতে হচ্ছে। নানা দেশের আমন্ত্রণ তিনি বার বার প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হচ্ছেন। গত পঁচিশ বছরে তিনি একবার মাত্র বিদেশে গেছলেন রাউণ্ড টেবল কন্‌ফারেন্সে স্বাধীনতার দাবি পেশ করতে। স্বাস্থ্যের জন্যে সিংহলে যাওয়াটা বাদ দিচ্ছি। অথচ এই গান্ধীই এক কালে ভারতের বাইরে সারাটা যৌবন অতিপাত করেছেন। তখন তাঁর হাতের কাজ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠা। সে কাজ শেষ না করে অন্য কাজ হাতে নিলে অন্যায় করতেন।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমি যে কাজ হাতে নিয়েছি সেটি শেষ না করে আমার ছুটি নেই। সেই কাজটির খাতিরে আমাকে আপাতত সমস্ত যৌবন অতিবাহিত করতে হবে। আমার কর্মক্ষেত্র বাংলা দেশ। কারণ আমি বাঙালী সাহিত্যিক। এখন আর আমি প্রবাসী বাঙালী নই। মাঝে মাঝে পরিবর্তনের জন্যে আমি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যাব, ভারতের বাইরেও যেতে পারি। কিন্তু মন পড়ে থাকবে এখানে। এই বাংলা দেশে। কারণ এ যে আমার কর্মক্ষেত্র। আমার সাহিত্যের কাজ আমার প্রথম কর্ম। সাহিত্যের মধ্যে একটা সহিতের ভাব আছে। সকলের সহিত একাত্ম না হলে সাহিত্য হয় না। কী করে একাত্ম হব, যদি একত্র না থাকি ? বাংলার সাহিত্যিককে তাই বাঙালীর সঙ্গে একত্র বাস করে একাত্ম হতে হবে। সেইজন্যে আমাকে দীর্ঘকাল দেশ-ভ্রমণের আশা ত্যাগ করতে হবে।

(১৯৪৫)

উপলব্ধি

পঁয়তাল্লিশ বছর আগে

১। স্রষ্টার চোখে সব মানুষ সমান। শিল্পীর চোখও স্রষ্টার চোখ।

২। সব ভালো জিনিস সব মানুষের জন্যে। শিল্পও ভালো জিনিস। তাকে গ্রহণ করতে আজ হয়তো সব মানুষ তৈরী নয়, তা বলে তার সার্বজনীনতায় বাধে না। আপাতত একজন মানুষও যদি গ্রহণ করে তা হলেও যথেষ্ট।

৩। সুন্দর জিনিসে চির দিন আনন্দ। শিল্পও সুন্দর জিনিস। তার সামনে পড়ে রয়েছে নিরবধি কাল। যুগ যুগ ধরে সে অপেক্ষা করতে পারে গৃহীত

হবার জন্যে।
৪। শিল্পের কাজ প্রেমের কাজও বটে। প্রেম হতে পারে সর্বব্যাপী, হতে পারে একনিবিষ্ট। পরিধি করতে পারে নিখিল মানবকে, নিখিল প্রাণকে, নিখিল সৃষ্টিকে। একই সময়ে কেন্দ্রিত হতে পারে একমাত্র প্রিয়জনে।
৫। প্রেমিক ও তার প্রিয়জনের ভিতর দিয়ে ভগবান আপনাকে ভালোবাসেন। তনু, মন ও আত্মার মাঝখানে কোনো ভেদরেখা নেই, তবে প্রভেদ আছে বইকি।
৬। সব জিনিস এক। এক-কেই বলি ভগবান।
৭। তাঁর ইচ্ছা সর্বত্র সক্রিয়। যেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না সেখানেও। কী তাঁর ইচ্ছা, জানতে হবে। সেই অনুসারে কাজ করতে হবে। করতে গিয়ে যদি হারাতে হয় যা কিছু প্রিয়, যদি না থাকে পুরস্কারের আশা, তা হলেও করতে হবে তাঁর ইচ্ছাপূরণ।
৮। ইতিহাসের দিক থেকে আমরা এসে পৌঁছেছি এক অচল অবস্থায়। না শান্তি, না প্রগতি, না সভ্যতা, না সংস্কৃতি, না শিল্প কোনো কিছুই হবার নয়, যত দিন না বৃহৎ একটা পদক্ষেপ ঘটছে সামাজিক সুবিচারের অভিমুখে।
(৮ই মে, ১৯৪৯)

পুনশ্চ—আটচল্লিশ বছর বয়সে

৯। এ যুগটা বিরোধের যুগ। আমি যদি পক্ষভুক্ত না-ও হই, যদি শুধু মধ্যস্থ হিসেবে শান্তির জন্যে হস্তক্ষেপ করি, তা হলেও আমাকে ঝুঁকি নিতে হয় যন্ত্রণার, ঝুঁকি নিতে হয় মৃত্যুর। এটা গায়ে পড়ে ডেকে আনা উচিত নয়। বরং এড়াতে পারলে ভালো হয়। কারণ আমি শিল্পী। আমার হাতে এক রাশ সৃষ্টির কাজ। যদি স্পষ্ট বুঝতে পারি যে এটা ভগবানের ইচ্ছা তা হলে অবশ্য হস্তক্ষেপ করব, নয়তো আমি হস্তক্ষেপ করব না বাইরের ব্যাপারে। তন্ময় থাকব সৃষ্টির কাজে। মৌন অবলম্বন করব আর সব বিষয়ে।
১০। যেমন বাইরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করব না, তেমনি ঘরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ সইব না। আমার সৃষ্টির দুর্গ রক্ষা করতে আমি সমস্তক্ষণ প্রস্তুত থাকব। রক্ষা করতে হবে তাদের হাত থেকে যারা বলবে আমাকে পক্ষভুক্ত হতে, যারা বলবে মধ্যস্থ হয়ে হস্তক্ষেপ করতে, যারা বলবে ফরমায়েস মাফিক লিখতে, যারা বলবে স্বাধীনভাবে না লিখতে। যন্ত্রণা যদি পেতেই হয়, প্রাণ যদি দিতেই হয় আমাকে তবে তা হোক মুক্ত-শিল্পীরূপে, শিল্পীর মুক্তি সংরক্ষণ করতে। আর কোনো কারণে নয়, যদি না বিধাতার ইচ্ছা হয় অন্যবিধ। আত্মার অসিতে শান্ দিতে থাকব প্রতিনিয়ত, কিন্তু সে অসি কোষমুক্ত হবে না কদাপি, যদি হয় তবে তা কদাচিৎ।
১১। আমার কর্মে অনুক্ষণ থাকবে আনন্দের সত্তা, জীবনের রস। দুঃখ-মোচন করতে না পারি, সুখবর্ধন করে যাব।
(২১শে মার্চ, ১৯৫২)

খোলা মন খোলা দরজা

ভূমিকা

চৈনিক আক্রমণের সময় বন্ধুবর মণীশ ঘটক আমাকে চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করেন, "সবাই কি কিছু কোথাও ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি?"

তাঁরই মতো আমিও তো সেই প্রশ্নই করছি। তাঁকে লিখি—

Right and Wrongs নিয়ে আমি আযৌবন পীড়িত। গায়ের জোরে কোন বড়ো সমস্যার সমাধান হবে না, হতে পারে না। ন্যায়ের জোর চাই। গায়ের জোর থাকুক, একেবারে দুর্বল হওয়া কোনো কাজের কথা নয়। কিন্তু শুধু গায়ের জোরই থাকবে, তার উপর ন্যায়ের জোর অঙ্কুশ চালনা করবে না, এর পরিণাম আমরা বার বার জার্মানীর ইতিহাসে দেখেছি।

ইংলণ্ডকে যে আমার অত ভালো লাগে তার কারণ ইংলণ্ডে অগণিত লোক আছে যারা ন্যায়ের জোরে বিশ্বাস করে, ন্যায়ের জোরকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেয়, ন্যায়ের জোর সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে গায়ের জোর খাটাতে চায় না।

মুশকিল হচ্ছে চীনে বা পাকিস্তানে সে রকম লোক নেই। থাকলে তাদের কথা শোনা যায় না। আমার ধারণা ছিল ভারতে আছে। কিন্তু দেখে শুনে হতভম্ব বনে যাচ্ছি।

তা হলে ডেমোক্রেসী রাখবে কে? ডেমোক্রেসী কি শুধু ভোট দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার? এর পিছনে আছে মহৎ একটা তত্ত্ব। এক একটি ব্যক্তি এক একটি বিবেক। যতক্ষণ না তুমি তার বিবেকের কাছে আবেদন করতে পারছ ততক্ষণ তুমি তার সম্মতি নিয়ে রাজত্ব করার হক্‌দার নও। একদল বিবেকী ব্যক্তি যদি তোমার আবেদনে সাড়া দেন তা হলে সেই অল্পসংখ্যকই অধিকসংখ্যক। গান্ধী তো একটি ভোটেরই অধিকারী ছিলেন। তবু তিনি একাই একশ' লাখ।

আমার বড় ছেলে পুণ্যশ্লোক এখন আমেরিকায় অধ্যাপনা করে। সে লিখেছে—"নেহেরুর জীবনে এই tragic climax, গান্ধীজীর জীবনে দেশ বিভাগ যেমন। সেবার দেশের চতুর্থাংশ গেল, এবার দেশের জায়গা সামান্যই যাবে, স্বাধীনতার চতুর্থাংশের বেশীই চলে গেছে। দুটোই ঘটল, খানিকটা, পুরোটা নয়, nationalismটা আমাদের parochialism ছাড়িয়ে যথেষ্ট উঠতে পারেনি বলে। পরকে আপন কর, না পারলে তার চরিত্র ও কীর্তি অধ্যয়ন অন্তত কর, এতে এখনকার হিন্দু ঐতিহ্যে এ অনাগ্রহ কেন বল তো? গুপ্ত-যুগের হিন্দুদের তো ছিল না। দারিদ্র্য দোষে।"

আমিও নেহেরুর জীবনের এই "tragic climax" সম্বন্ধে ভাবি। স্বাধীনতার চতুর্থাংশের বেশীই চলে গেছে, এটা এদেশে থেকে বোঝা যায় না। বাইরে গেলে বোঝা যায় গান্ধী-নেহেরু সৃষ্ট সে প্রেস্টিজ আর নেই। ভারত এখন একজন litigant. হতে পারে তার কেস্‌টাই ঠিক, তবু সে এখন litigant বা client. অন্যে বিচার করবে তার মামলা।

যাক, বেঁচে থাকো ও ভালো থাকো। মরতে ইচ্ছা করাটা পাগলামি। দেশের আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এ কর্তব্য তোমার, আমার, প্রত্যেকেরই।

এর পরে তাঁর আর একখানি চিঠি পাই। তেমনি অশান্ত মানস। উত্তরে বলি—

তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দিত ও ব্যথিত হয়েছি। কীই বা আমি দিয়েছি, দিতে পেরেছি! ভিতরে যা রয়ে গেল তার তুলনায় বাইরে যা দেওয়া গেল তা অল্পই।

কিন্তু অন্য দিক থেকে যখন ভাবি তখন আমার কোনো আপসোস থাকে না। বিধাতা আমাকে মুক্ত হস্তে দিয়েছেন, আমার মুঠি ভরিয়ে দিয়েছেন। এত ভালোবাসা, এত স্নেহপ্রীতি, এত বন্ধুবাৎসল্য—এ সমস্ত আমার প্রত্যাশাতীত। আমার পাওনার চেয়ে অনেক বেশী।

Frustration-এর কথা তুলেছ। Frustration আমার জীবনের পদে পদে। কিন্তু তোমাকে একটা উপমা দিই। নদী যখন তীরের মতো সোজা চলতে চায় তখন দেখে সামনে চড়াই, তখন তাকে এঁকে বেঁকে চলতে হয়। তারপর দেখে সামনে পাহাড়, তখন তাকে মোড় নিতে হয়। তারপর দেখে ভূমিকম্পে সামনের সমস্তটাই মালভূমিতে পরিণত হয়েছে, তখন সে ২০০ মাইল দূরে গিয়ে খাত বদলায়, অন্য খাতে প্রবাহিত হয়। তারপর দেখে তার সামনে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, তখন সে ফুলতে ফুলতে উঁচু হয়ে বাঁধ ডিঙিয়ে যায় বা প্রবল তোড়ে বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে যায়। কিংবা slow action-এর দ্বারা বাঁধকে ফাঁসায়।

আবার এমনও হয়। কোনো দিকে কোনো প্রগতি নেই দেখলে নদী বহুভাগ হয়ে বিভিন্ন ধারায় এগিয়ে চলে। নদী পেছিয়ে গেছে কখনো শুনেছ কি? তবে হাঁ, নদী শুকিয়ে যেতে পারে। মরুভূমির বুক দিয়ে বেশীদূরে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু যেটুকু যাওয়া যায় সেটুকুও ব্যর্থ নয়। নদী মরুভূমিকেও উর্বর করে তোলে, যতক্ষণ না নিজে মিলিয়ে যায়। এটাও তার পক্ষে পরাজয় নয়। মোটকথা নদীর জীবনে frustration নেই।

নদীর উপমা দিলুম। প্রকৃতির রাজ্য থেকে যে কোনো গতিশীল শক্তির উপমা দিতে পারতুম। মানুষও তো তেজ দিয়ে গড়া। আগুন ছিল এই পৃথিবীর মাটি, যার থেকে মানুষের উদ্ভব। আগুনকে কি কেউ সবরকমে নিষ্ফল করতে পারে?

ক্লৈব্যং মাস্ম গম, পার্থ। আর কিছু না পারো বই পড়ো। আমি তো এই ক'মাস কেবল পড়েছি। বেশীর ভাগই ইতিহাস। চীন সম্বন্ধে, তিব্বত সম্বন্ধে, NEFA সম্বন্ধেও প্রচুর পড়লুম। এখন উপন্যাসে মন যাচ্ছে।

একটা কথা বলি। পড়াশুনা না করলে intellectual হয় না। অধিকাংশ intellectual সেই কবে কলেজে পড়েছিলেন। তারপর সরকারী বা দরকারী বই ছাড়া আর কিছু পড়েননি। এই বিদ্যা দিয়ে জগতের অর্থ দূরের কথা সমসাময়িক ঘটনার অর্থভেদ হয় না। আমরা যে যুগে বাস করছি সে যুগকে বুঝতে হলে খবরের কাগজই যথেষ্ট নয়। বরং খবরের কাগজ মানুষকে ভুল শেখায়।

"They also serve who stand and wait", বলেছিলেন মিলটন, যিনি সারা যৌবনটাই actionকে দিয়ে poetryকে বঞ্চিত করেছিলেন। শেষ বয়সটা poetryকে দিয়ে পুষিয়ে দিলেন। অন্ধ না হলে বোধ হয় তাও ঘটত না। সুতরাং তাঁর অন্ধত্বই তাঁর পক্ষে আশীর্বাদ। Frustration নয়।

তুমিও আবার কবিতায় ফিরে যাও। কবিতা লিখলেই তোমার ক্লান্তি কেটে যাবে। আমিও কবিতায় ফিরে যেতে চাই, কিন্তু তার আগে কয়েকখানা উপন্যাস আমাকে লিখতেই হবে, সরস্বতীর কাছে অঙ্গীকার। জল আর আগুন আর বিদ্যুতের মতো শব্দ আর ছন্দ আর ধ্বনিও এক একটি নৈসর্গিক শক্তি। কবিতা লিখতে বসলে তোমার sense of power ফিরবে। রাজনীতিকরা আজ আছেন কাল নেই। কতটুকু শক্তি তাঁদের হাতে? কবিদের শক্তি আরও বেশী। তবে তার অলিখিত শর্ত কবিকে সত্যভাষী ও সৌন্দর্যরসিক হতে হবে। নইলে সে তল্পিবাহক বা প্রচারক।

ওই দু'খানি চিঠিই আমার এই প্রবন্ধপরম্পরার ভূমিকায় কাজ করবে।

শান্তিনিকেতন

বিষয়সূচী

প্রথম পর্যায়

দ্বিতীয় পর্যায়

তৃতীয় পর্যায়

তোমার চিঠির উত্তরে চিঠিই লিখছি। ভেবেছিলুম নীরবে থাকব। কিন্তু যেখানে আর সবাই সরব সেখানে একজন নীরব থাকলে তারও একটা কদর্থ হবে।

মনে পড়ে গেল বিশ বছর আগের একটা ঘটনা। আমার এক প্রতিবেশীর পুত্রের যায়-যায় অবস্থা। শহরের সব কয়েকজন গণ্যমান্য ডাক্তার বাইরে বসে পরামর্শ করছেন। কেসটা যাঁর তিনিই সিদ্ধান্ত নেবার মালিক। তিনি যদি অপরের পরামর্শ নেন ভালো। তখন দায়িত্বটা তাঁর। একমাত্র তাঁর। তখন তাঁকেই তাঁর বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। সে-সময় তিনি বলতে পারবেন না যে, অপর পাঁচজনের পরামর্শে কাজ করেছেন। দোষ তাঁর একার নয়।

আমার স্পষ্ট মনে আছে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলে। কিন্তু ডাক্তার গুপ্ত একটিও কথা বলেন না। তাঁর কেস নয় বলে কি? আমার ভাবতে খারাপ লাগছিল যে তিনি উদাসীন। রাত তখন অনেক। সিদ্ধান্ত একটা কিছু না নিলেই নয়। অথচ ডাক্তারে ডাক্তারে মতভেদ। একজন তো একেবারেই নীরব। তাঁর কেস নয় বলে কি তার দয়ামায়া নেই? আমি তো তাঁকে ভালো করেই চিনি। মানুষ হিসাবেও সমান ভালো।

শেষে ডাক্তার গুপ্ত উঠলেন। বারান্দা থেকে কয়েক ধাপ নামলেন। ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় বললে, "এই দুর্গাদাস! উঠলে কেন? তুমি কী করতে বল?" গুপ্ত ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, "আমি হলে এই ওষুধটি দিয়ে দেখতুম।" এই বলে একটা ওষুধের নাম করলেন। তখন তাঁকে ধরে নিয়ে আসা হলো। আবার চলল আলোচনা। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। গাড়ী তৈরি ছিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং এসে পেট্রোল কুপন দিয়ে গেছলেন। লোক ছুটল ওষুধ কিনতে। ওষুধ এলো। ওষুধ দেওয়া হলো। ছেলে বাঁচল। আমরা বাঁচলুম।

তা হলে দেখছি নীরব থাকা মানে উদাসীন থাকা নয়। এর অন্য অর্থ থাকতে পারে। এই পরিস্থিতিতে কে না চিন্তিত, কে না উদ্বিগ্ন? আজ আমরা সবাই তো গৃহকর্তা। তা বলে আমরা সবাই কি ডাক্তার? এ ক্ষেত্রে ডাক্তারের সংখ্যা সারাদেশে তিনজন কি চারজন। তাঁদের মধ্যে একমাত্র জবাহরলালের উপরেই সিদ্ধান্তের ভার। গৃহকর্তা কোন্ সাহসে তাঁকে বিদায় দিয়ে তাঁর জায়গায় আরেকজনকে বসাবেন? আরেকজন কোন্ সাহসে বসবেন? ভোজ রাজা যখন বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসতে যান তখন বত্রিশটি পুত্তলিকা তাঁকে বত্রিশটি উপাখ্যান শুনিয়ে নিরস্ত করেছিল। নইলে ভোজ রাজাই অপদস্থ হতেন। তাঁর প্রজাদেরও অমঙ্গল হতো। এ ক্ষেত্রে জবাহরলালকে তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর কারো পরামর্শ যদি তিনি চান, যাঁর যা বক্তব্য আছে পেশ করতে পারেন। তিনি যদি সে পরামর্শ গ্রহণ করেন উত্তম। কিন্তু দায়িত্বটা তাঁরই।

নিশ্চয় লক্ষ করে থাকবে যে বিনোবাজী নীরব। অর্থাৎ যেটুকু না বললে নয় কেবল সেইটুকুই তিনি বলেছেন। দেশরক্ষা করতে হবে। তার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ভূদান গ্রামদান গ্রামসংগঠন শান্তিসেনা গঠন। সেই পুরোনো কথাই নূতন অবস্থায় বলেছেন।

বিনোবাজীর শিক্ষা গান্ধীর কাছে। জবাহরলালজীর শিক্ষাও গান্ধীর কাছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন যখন শুরু করতে হলো তখন গান্ধীজী বললেন বিনোবাজী হবেন প্রথম সত্যাগ্রহী। কারণ বিনোবাজী সর্ব অবস্থায় অহিংস। তাঁর প্রতিরোধ পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে অহিংস। দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী কে হবেন তা নিয়ে গান্ধীজী অনেক চিন্তা করেন। উদ্বেগজনক বিশ্বপরিস্থিতিতে ভারতভাগ্য হয়তো একদিন ভারতীয়দের হাতেই আসবে। তখন কি দেশ সম্পূর্ণ অহিংসভাবে আত্মরক্ষা করতে পারবে? গান্ধীজী যদি বেঁচে না থাকেন বিনোবাজী কি সেইভাবে দেশরক্ষা করতে পারবেন? আদর্শবাদী গান্ধীজী বাস্তববাদীও ছিলেন। তাই দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী বলে মনোনয়ন দিলেন জবাহরলালজীকে।

তখন থেকেই দেখা যাচ্ছে দেশের জনমত দুইভাগে বিভক্ত। এক ভাগের প্রতিনিধি বিনোবা। অপর ভাগের প্রতিনিধি জবাহরলাল। মাথা-গুনতিতে কার ভাগে লোক বেশী তা জানবার উপায় নেই। কারণ কোন্ পদ্ধতিতে দেশরক্ষা করা সমীচীন এ প্রশ্নের উপর ভোট নেওয়া হয়নি। ভোটে বিনোবার জিৎ হলে তিনি কি প্রধানমন্ত্রী পদের দায়িত্ব নেবেন? সশস্ত্র প্রতিরোধের পরিবর্তে নিরস্ত্র প্রতিরোধের আদেশ দেবেন? জওয়ানদের বদলে শান্তি-সৈনিকদের লডাখে ও নেফায় পাঠাবেন? না। তিনি চাইলেও দেশবাসী তা চাইবে না। সে সাহস আমাদের নেই। দেশ তার জন্যে প্রস্তুত নয়। কোনো কালেই ছিল না। গান্ধীজীই বাধ্য হলেন কাশ্মীর রক্ষার জন্যে সশস্ত্র সৈনিক পাঠানোর প্রস্তাবে সায় দিতে। শান্তিসৈনিক পাঠালে হয়তো আদর্শ রক্ষা হতো, কিন্তু কাশ্মীর রক্ষা হতো না। উদ্দেশ্য যদি হয় কাশ্মীর রক্ষা তবে তখনকার পরিস্থিতিতে একমাত্র কার্যকর উপায় ছিল সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ। গান্ধীজী সেটা জানতেন ও বুঝতেন। তাই দুঃখের সঙ্গে মেনে নিলেন।

আজকের পরিস্থিতিতে বিনোবাজীকেও মেনে নিতে হচ্ছে দেশরক্ষার চিরকেলে উপায়। কিন্তু ইতিহাসের কাছে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে দেশরক্ষার অহিংস উপায়ও উদ্ভাবন করতে হবে, প্রয়োগ করতে হবে। ভারতই একমাত্র ভূমি যেখানে তার সাফল্যের লেশমাত্র সম্ভাবনা আছে। আদৌ যদি না থাকত তবে তিনি প্রথম সত্যাগ্রহী বলে মনোনয়ন পেতেন না, পেলেও নিতেন না। গান্ধীজীও তাঁর চেয়ে যোগ্যপাত্র না পেলে অমন একটা পরীক্ষার কথা বিশ্ব-বাসীকে শোনাতেন না, শুনিয়ে হাস্যাস্পদ হতেন না। ইতিহাস গতানুগতিক পন্থায় চলত। গান্ধী টলস্টয় অরণ্যে রোদন করতেন। বিনোবাজী যদি তাঁর বিশ্বাসে দৃঢ় থাকেন তা হলে ইতিহাস তাঁকেও একটা সুযোগ দিতে পারে। ভারতের মরা হাড়ে ভেলকি আছে গান্ধী নেতৃত্বের আগে কেউ কি তা বিশ্বাস

করত ? আমি একবার করেছি একবার করিনি আবার করেছি আবার করিনি। মহাত্মাজীর সঙ্গে যেবার মালিকান্দায় সাক্ষাৎ করি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ তখনো আরম্ভ হয়নি। ওদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। দেখি তিনি গভীরভাবে চিন্তিত। অত বড় পরীক্ষা তাঁর জীবনে আসেনি। বললুম, "আপনি করে দেখান, আমি বিশ্বাস করব।"

ভারত কি একদিন করে দেখাতে পারবে ? আমার যুক্তিবাদী মন বলে "খেপেছ! অহিংস দেশরক্ষা! সোনার পাথরবাটি! এ শতাব্দীতে নয়।" কিন্তু আমার মধ্যে একজন সৃষ্টিবাদী আছে। সে বলে, "প্রকৃতি নিত্য নূতন সৃষ্টি করে চলেছে। মানুষও নিত্য নূতন সৃষ্টি করতে করতে সভ্য হয়েছে, সভ্যতর হয়েছে। চেষ্টা করলে সে সভ্যতম হতে পারে। হাইড্রোজেন বোমার পরে কী ? হয় প্রলয়, নয় সৃষ্টি। সৃষ্টির পথই মানুষকে ধরতে হবে। যদি না সে ডাইনোসরের মতো নিশ্চিহ্ন হতে চায়। তাকে পথ দেখাবে কে ? ওই গান্ধী। ওই বিনোবা। ওই আধখানা ভারত, যে আজ পদব্রজে তপস্যা করে চলেছে, যার মনে লেশমাত্র ভয় নেই, যার অন্তর বিশ্বপ্রেমে উদ্বেল।"

সারা ভারত আজ দেশরক্ষার সংকল্প নিয়েছে। এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু দেশরক্ষার পদ্ধতি কী হবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। দুটো মতই সমান সত্য। জবাহরলালকে যেমন তাঁর নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে কাজ করতে দিতে হবে তেমনি বিনোবাকে তাঁর বিশ্বাস ও সামর্থ্য অনুসারে। কেউ কাউকে বাধা না দিলেই হলো। এই ভারত সামান্য দেশ নয়। তিন হাজার বছরের ইতিহাস পাওয়া গেছে, আরো দু'হাজার বছরের নিদর্শন খুঁজলে পাওয়া যাবে। এদেশে কত রকম পরীক্ষা নিরীক্ষাই না হয়েছে। গোমাংস যাদের ঋষিদেরও প্রিয়খাদ্য ছিল তারা এখন গোমাংসের ধার দিয়েও যায় না। তাদের একটা বড় অংশ আমিষ পর্যন্ত খায় না। আমরা এই পাঁচ হাজার বছর ঘাস কাটিনি। অহিংসায় অনেক দূর এগিয়েছি। রামায়ণ মহাভারতের বনিয়াদের উপর আমাদের জনগণ দাঁড়িয়ে আছে। দুই মহাকাব্যেরই প্রধান প্রতিপাদ্য সত্যের মহিমা, দুই নায়কই সত্যসন্ধ। কবে কোন দেশে সত্যের উপর এই পরিমাণ জোর দেওয়া হয়েছে যে, যুধিষ্ঠির যুদ্ধকালে অর্ধসত্য বলেছিলেন বলে তাঁকে সেই পাপে নরকদর্শন করতে হলো ?

দেশের আধখানা মন হিংসায়, আধখানা অহিংসায়। এ হয়েছে আমাদের ট্র্যাজেডী। ষোলো আনা হিংসার প্রস্তুতি নেই, ষোলো আনা অহিংসারও প্রস্তুতি নেই। বলা বাহুল্য অহিংসার প্রস্তুতির প্রথম কথাটি অহিংসা নয়, সত্য। মহাত্মাজী বার-বার সত্যের উপর সবচেয়ে জোর দিয়েছেন। সত্যই ভগবান। হিংসা কোনো কোনো অবস্থায় সমর্থন করা যায়। অসত্য কোনো অবস্থায় নয়। দেশরক্ষার জন্য অসত্য উচ্চারণ করতে হবে, অসত্য আচরণ করতে হবে, এমনতর দাবি যদি কেউ করে ভারতের অন্তরাত্মা পীড়িত হবে। যুদ্ধে জয়লাভ হয়তো হলো, কিন্তু তার পরে তো মহাপ্রস্থান ও নরকবাস। ও ছাড়া আর কোনো পরিণাম সম্ভব হলে ব্যাসদেব তা দেখাতেন। অথচ

যুদ্ধের দাবি এমন সর্বগ্রাসী যে সত্যই হয় তার প্রথম বলি। সব দেশেই সব কালেই এটা দেখা গেছে যে হিংসার সঙ্গে থাকে অসত্য। অহিংসার সঙ্গে থাকে সত্য। যেখানে এক পক্ষ হিংসার আশ্রয় নেয়, অপর পক্ষ নেয় অহিংসার আশ্রয় সেখানে সত্যই হয় নারায়ণ, আর অসত্য হয় নারায়ণী সেনা। তবে সাধারণত যা ঘটে তা হিংসা বনাম অহিংসা নয়, হিংসা বনাম হিংসা। সেইজন্য দুই দিকেই থাকে কিছু সত্য, কিছু অসত্য।

যেখানে দুই পক্ষেই কিছু কিছু সত্য আছে সেখানেও কম বেশীর প্রশ্ন আছে। সেই কম বেশীর উপরেও যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করে। ইতিহাসে নিছক গায়ের জোর বহুক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে, সেইজন্য নিছক গায়ের জোরের প্রেস্টিজ এখনো প্রচুর। কিন্তু মানুষ ইতিমধ্যে এক ধাপ উপরে উঠেছে। তাই প্রত্যেকবার যুদ্ধকালে তর্ক করে কোন্ পক্ষে ন্যায়ের জোর বেশী। ন্যায় অন্যায় বিনিশ্চয়ও আধুনিক যুদ্ধের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যারা যুদ্ধ করতে যায় তাদের মধ্যে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। তারা জানতে চায় কোন পক্ষে কতখানি ন্যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসীদের অধিনায়ক ছিলেন মার্শাল ফশ। পরে তিনি মিত্রপক্ষের সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন। যুদ্ধ-জয়ের পর তিনি লিখেছিলেন—

"To sum up, whether we are dealing with the soldier, the high command, the nation or the Government, in each of these divisions war demands an ever-increasing share of the moral forces whose close union and wise combination are alone capable of producing victory. It is to the insufficiency of certain of these forces, or to the lack of cohesion between them, that we must look to grasp and explain the collapse, in the course of the last war, of certain Great Powers, and likewise of armies of formidable repute, which in so far as they themselves are concerned certainly did not fall short of that repute." (Encyclopaedia Britannica 14th Edition, Vol 2, **Army : Morale in War,** page 415).

যারা যুদ্ধে লিপ্ত নয় তারাও তো দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করেছে যুধ্যমান দুই নেশনকে। তারাও জানতে চায় কার দিকে ন্যায়, কার দিকে সত্য। তাদের নৈতিক সমর্থনও যুদ্ধকালে মূল্যবান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা ইংলন্ডের পক্ষে নামবে কি না সে নিয়ে মার্কিন জনমন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু ক্রমেই জনমত জার্মানীর বিপক্ষে গেল। অন্যান্য কারণের মধ্যে এটাও একটা কারণ যে জার্মানরা মার্কিনদের ন্যায়বোধকে আঘাত করে। ইংরেজদের সঙ্গে মার্কিনদের এমন কোন চুক্তি ছিল না যে একের বিপদে অপরকে অস্ত্র ধরতে হবে। স্বার্থের বন্ধন যেমন ছিল তেমনি অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাও ছিল। রক্তের বন্ধন তো উভয় পক্ষেরই সঙ্গে। এই যেমন একট উদাহরণ দিলুম তেমনি আরও

দিতে পারতুম। আধুনিক যুদ্ধে ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন ঘটনার গতি বদলে দিতে পারে। সুয়েজ নিয়ে কী হলো? ইংরেজ ফরাসীরা দুনিয়ার লোককে বোঝাতে পারল না যে তাদের কেসটাই ঠিক। এমন কি স্বদেশের লোকও একবাক্যে সায় দিল না। বিশ ত্রিশ বছর আগে হলে সুয়েজ যুদ্ধ অমন ঝড় তুলত না। ইংরেজ ফরাসী ইসরায়েলীরা কেল্লা ফতে করত। গায়ের জোর তো তাদেরি বেশী। কিন্তু এই বিশ বছরে দুনিয়ার লোক গায়ের জোরকে সন্দেহ করতে শিখেছে। তাদের প্রথম প্রশ্ন হলো, কে ঠিক? কে বেঠিক?

ইতিমধ্যে ইউনাইটেড নেশনস বলে একটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে বিশ্বের অধিকাংশ নেশন উপস্থিত। কয়েকটা ঝগড়া তারা মিটিয়ে দিয়েছে। নইলে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেত। কয়েকটা মেটাতে পারেনি। তাই বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হয়নি। ভারত সেই মহৎ প্রতিষ্ঠানের সদস্য। চীন বলেও সেখানে এক সদস্য আছে। কিন্তু সেই চীনের সঙ্গে ভারতের কোনো সংস্রব নেই। সে চীন তার কয়েকটি দ্বীপে দ্বীপান্তরিত। যার সঙ্গে আমাদের কারবার সে লাল চীন বা নয়া চীন। চীনের অধিকাংশ জায়গা জমি তারই দখলে। ইউনাইটেড নেশনস তাকে স্বীকার না করলে সে চীনের জন্যে সংরক্ষিত আসনটি অধিকার করতে পারছে না। অথচ সে আসন তাকে দিলে সে ফরমোজার দখল চাইবে, তখন যদি ঝগড়া বাধে সেটা হবে চীনাদের ঘরোয়া ঝগড়া। সে ঝগড়া মেটানোর জন্যে ইউনাটেড নেশনস ছুটে যেতে পারবে না। কঙ্গোয় ছুটে গেছে, কারণ কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকার তাকে ডেকেছে। চীনের কেন্দ্রীয় সরকার তো তাকে ডাকবে না। তা হলে লাল চীনকে আসন দিতে ইউনাইটেড নেশনসের কী এমন তাড়া? লাভ হতে পারত আমাদের ও আমাদেরই মতো কয়েকটি প্রতিবেশীর। কারণ আমাদের সঙ্গে সীমানা নিয়ে ঝগড়া বাধলে সেটাকে আমরা ইউনাইটেড নেশনসে তুলতে পারতুম। লাল চীন সেখানে উপস্থিত থাকলে বিশ্বের অন্যান্য শক্তিরা তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্তিরক্ষা করত, আর সে যদি অবুঝ হতো, তাকে না করে আমাদের সাহায্য করত। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও লাল চীনকে আমরা তার প্রাপ্য আসন পাইয়ে দিতে পারিনি।

ঝগড়া যে বাধতে পারে এ চেতনা আমাদের অনেকেরই ছিল সেই ১৯৪৯ সাল থেকেই। কারণ ওদের মানচিত্র আর আমাদের মানচিত্র মিলিয়ে দেখলে বেশ খানিকটে জায়গা চোখে পড়ে যেটা আমাদের মতে আমাদের, কিন্তু ওদের সেকথা বললে ওরা গা করে না, ঝুলিয়ে রাখে। মানচিত্র সংশোধন করতে সময় নেই, হচ্ছে, হবে, দাঁড়াও দেখি। আগে তো আমাদের সোভরেন্‌টি স্বীকার কর। আমরা যদি তিব্বতের উপর সোভরেন না হয়ে থাকি তো আমাদের স্বাক্ষরের দাম কী? স্বাক্ষরটি না পেলে তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারছ না তো একবার প্রাণ খুলে বল, ভাই চীন, তিব্বতের উপর তুমি সোভরেন। উল্লেখ করতে ভুলে গেছি যে জায়গাগুলি তিব্বতের সীমানাসংলগ্ন।

চু এন-লাই যেবার শান্তিনিকেতনে আসেন আমি তাঁর সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজে যোগ দিয়েছি ও মানুষটির উপর নজর রেখেছি। তাঁর নামের প্রকৃত উচ্চারণ আমাদের তিনি বলেন। ভোজের শেষে হঠাৎ আওয়াজ তুললেন, "হিন্দী চীনী ভাই ভাই।" আমার কান খারাপ না হয়ে থাকলে আমি শুনলুম, "বহাই বহাই।" হতে পারে বেহাই বেহাই। আমার দুই বন্ধু তান য়ুন-শান ও সুধীর খাস্তগীর বেহাই বেহাই হয়েছেন। চৈনিকদের সঙ্গে ভারতীয়দের দু হাজার বছরের উপর চেনাশোনা। রেশম এসেছে তাদের দেশ থেকে, চা চিনি এসেছে তাদের দেশ থেকে। রেশম সড়ক দিয়ে ওরাও যেমন আসত আমরাও তেমনি যেতুম। আমরা যেতুম বৌদ্ধধর্ম নিয়ে। অজন্তার চিত্রকলা নিয়ে। চীনের পথ দিয়ে সে সব দান জাপানেও পেঁছিয়। সমুদ্রপথ দিয়েও। কেউ কোনো দিন কল্পনাও করতে পারেনি যে চীনে ভারতে সংঘর্ষ বাধবে। রবীন্দ্রনাথ চীন দেশে গিয়ে বিপুল সম্মান পান। আমার কাছে তিনি চীন দেশের জ্ঞানীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। শান্তিনিকেতনের চীন ভবন দুই দেশের মাঝখানের সেতু। চিয়াং কাই শেক কবিতীর্থে এসে বহু টাকা দান করে যান। চু এন-লাই এসে আরো টাকা দেন।

এই যে শাশ্বত চীন, যার বৌদ্ধদের কাছে ভারত হচ্ছে হোলি ল্যান্ড, এর সঙ্গে কি শাশ্বত ভারতের কোনো দিন বিবাদ ছিল যে আমরা অমন একটা অশুভ সম্ভাবনার জন্যে সামরিক অর্থে বা অন্য কোনো অর্থে প্রস্তুত হব? আমরা জানতুম যে সীমানা নিয়ে বিরোধ একদিন আপসে নিষ্পত্তি হবে। এ ধরনের বিবাদ বহু দেশে বহু বার হয়েছে। এমনি একটা বিবাদ ছিল পারস্য ও আফগানিস্থানের সীমানা নিয়ে। জায়গাটার নাম সেইস্তান, প্রাচীন নাম শকস্থান। দু পক্ষ সালিশ মানে ইংরেজ সরকারকে। গোল্ডস্মিড কমিশন গিয়ে ১৮৭২ সালে সীমানা-রেখা টেনে দেন। কিন্তু গোলমাল তা সত্ত্বেও থামে না। কাগজে কলমে একটা লাইন টেনে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, সরেজমিনে গিয়ে জরীপ করে পিলার পুঁতে পাকাপাকি করাও দরকার। ত্রিশ বছর পরে আবার দুই পক্ষ ইংরেজকেই সালিশ মানে। তখন ভারতের ইংরেজ সরকার ম্যাকমহোন কমিশন পাঠান। ম্যাকমহোন ছিলেন বড়ঘরের ছেলে, স্যান্ডহার্স্ট থেকে পাস করা মিলিটারি অফিসার। পরে হন পলিটিক্যাল অফিসার। পারস্য ও আফগানিস্থানের সীমানা জরীপ করে তিনি দু পক্ষকেই সন্তুষ্ট করেন। এর জন্যে তাঁকে খাটতে হয়েছিল দু তিন বছর ধরে, ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ সাল।

সেই যে ম্যাকমহোন তিনি প্রমোশন পেতে পেতে একদিন ভারতের ইংরেজ সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারি হন। তখনকার দিনে আর সব বিভাগের সেক্রেটারির উপরে একজন করে এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর থাকতেন। কিন্তু পররাষ্ট্র বিভাগ ছিল বড়লাটের খাস দপ্তর। তাই তখনকার দিনে ফরেন সেক্রেটারি যিনি হতেন তিনি বাছা বাছা লোকদের মধ্যেও বাছা লোক। বলতে গেলে তিনি বড়লাটের সচিব-স্থানীয়। প্রথম

মহাযুদ্ধ যখন বাধে তখন লর্ড কিচেনারকে ইজিপ্ট থেকে নিয়ে যাওয়া হয় ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায়। ইজিপ্ট হয়ে যায় ব্রিটিশ প্রোটেক্টোরেট। সেখানে একজন হাই কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। কাকে জানো? ম্যাকমহোনকে। তিনি ভারত ছাড়ার আগে একটি কাজ করে যান। তিব্বত, চীন ও ভারত এই তিন পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে একটি বৈঠক করেন। মানচিত্রের উপর দুটি লাইন নির্দেশ করেন। একটি হলো ভারত ও তিব্বতের সীমানাসূচক। অপরটি তিব্বত ও চীনের সীমানাসূচক। প্রথমটিতে চীনা প্রতিনিধির তেমন আপত্তি ছিল না, দ্বিতীয়টিতে ছিল। উপরওয়ালার হুকুম না নিয়ে তিনি স্বাক্ষর করতে পারবেন না বলে চীন দেশের কেন্দ্রীয় সরকারে কাগজপত্র পাঠানো হলো। চীন সরকার মঞ্জুরি দিলেন না।

না দেওয়ার কী কী কারণ ছিল সব আমার জানা নেই। তবে একটা কারণ কিছু কিছু জানি। চীনের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্ক নিয়ে বহুকালের একটা বিবাদ ছিল। ভারত যেমন বলছে কাশ্মীরের প্রশ্নটা আন্তর্জাতিক প্রশ্ন হতে পারে না, কাশ্মীরের উপর ভারতের সোভরেন্টি, চীনও তেমনি বলত তিব্বতের প্রশ্নটা আন্তর্জাতিক প্রশ্ন হতে পারে না, তিব্বতের উপর চীনের সোভরেন্টি। তিব্বতের উপর রাশিয়ারও নজর ছিল, ইংরেজেরও নজর ছিল। তাই নিয়ে একটা সিংহ ভালুকের লড়াই বাধতে পারত। ইংরেজ ও রুশ মিলে ১৯০৭ সালে একটা কনভেনশন করে। তাতে স্থির হয় যে, তিব্বতের উপর চীনের সোভরেন্টি। তাই যদি হয় ১৯০৭ সালের পোজিশন তবে ১৯১৪ সালে সে পোজিশন বদলে যেতে পারে না। চীন তখনো সোভরেন্। তৎকালীন চীন সরকার যদিও ইংরেজ সরকারের বন্ধু ও যুদ্ধকালীন মিত্র তবু তাঁরা সীমানার প্রশ্নটিকে অমীমাংসিতই রেখে দেন। সম্ভবত এই কারণে যে দলিলটিতে সই করলে তিব্বতকেও চীনের মতো একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলে স্বীকার করা হয়ে যায়। তা হলে সোভরেন্টির দাবী টেকে না। নিজের স্বাক্ষরই তার বিরুদ্ধে যায়।

ম্যাকমহোন ভারত তিব্বত চীনের বেলা হিমালয় ভূখণ্ডে সেই কাজটি করেন যে কাজটি করেছিলেন গোল্ডস্মিড পারস্য ও আফগানিস্থানের বেলা সেইস্তানে বা শকস্থানে। অর্থাৎ একটি লাইন নির্দেশ করেছিলেন। গোল্ডস্মিড লাইনের পরে ত্রিশ বছর কেটে গেল, তবু মিটমাট হলো না। তার কারণ কাগজে কলমে একটা লাইন টেনে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। সরেজমিনে গিয়ে জরীপ করতে হয়, পিলার বসাতে হয়। তার জন্যে আলাদা একটা কমিশন দরকার। ম্যাকমহোন লাইনের বেলা সেটা কোনো দিন হয়নি, এখনো বাকি। চীন সরকার মঞ্জুরি দিলে সেটা জাতীয়তাবাদী আমলেই হয়ে চুকত। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে চীন সরকারের যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। কিন্তু কী জানি কেন ইংরেজ সরকারও গরজ দেখায়নি। ওরা এমন নির্বিকার ছিল যে মানচিত্রেও ম্যাকমহোন লাইন দেখাতে পঁচিশ বছর দেরি করেছে। ততদিনে চীন জড়িয়ে পড়েছে জাপানী যুদ্ধে।

মনে কর দুজন জমিদার নিজেদের মধ্যে একটা সীমানার প্রশ্ন অমীমাংসিত রেখে জমিদারি হস্তান্তরিত করে বা হারিয়ে দূরে সরে গেল। তাদের স্থান নিল আরো দুজন জমিদার। আগেকার জমিদারদের মাঝখানে যেটুকু সমঝোতা ছিল সেটুকু পরবর্তী জমিদারদের মধ্যে নেই। কাজিয়া তো বাধবেই। স্বাধীন ভারত বলছে, ব্রিটিশ ভারতের আমিই এখন উত্তরাধিকারী। ইংরেজরা শেষ মানচিত্রখানা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। তাতে দেখছি এ সব জায়গা আমার। আমি দখলও করছি। তুমি যদি আমার সত্যিকারের বন্ধু হয়ে থাক তবে তুমি আমাকে আমার তালুক মুলুক নির্বিবাদে ভোগ করতে দাও। লাল চীন বলছে, এ সম্পত্তি আমি চিয়াং কাইশেকের অধিকার থেকে জয় করে নিয়েছি, তিব্বত যাকে বলছ সেটা আমাদের তিব্বত অঞ্চল। ইংরেজ তাকে হাত করেছিল, তার স্বাক্ষরের কোনো দাম নেই, কাঁচা দলিল। বেআইনী লাইন। এসো, আবার কথাবার্তা চালাই। আমাকে তুমি কিছু দাও, তোমাকে আমি কিছু দিই। আপসে নিষ্পত্তি হোক। তার পরে পাকা দলিল হবে। কমিশন বসবে। জরীপ হবে। পিলার দেওয়া হবে।

ম্যাকমহোন লাইন নিয়ে যেটুকু জানি বললুম। লডাখ সম্বন্ধে পড়াশুনা করিনি। জানিনে। তবে সেখানেও কমিশন বসেনি, জরীপ হয়নি, পিলার বসানো হয়নি। এ সব না করলে বিবাদের জড় থেকে যায়। একশো বছর বাধেনি বলে পরে বাধবে না, এটা যুক্তি নয়, এটা বিশ্বাস। ইংরেজ জানত সে কোনো দিন নড়বে না। যাবৎ চন্দ্র-সূর্য তাবৎ ইংরেজ-রাজ। তিব্বতের লামাতন্ত্র জানত সে ইতিহাসের ধার ধারে না। ধর্মগ্রন্থই তাকে চিরকালের ইজারা দিয়েছে। তেমনি চীন দেশের শাসকরাও মনে করতেন কনফিউসীয় সমাজব্যবস্থা যখন আড়াই হাজার বছর টিকে আছে তখন আরো আড়াই হাজার বছর টিকবে। বিপ্লবের জন্যে, পরিবর্তনের জন্যে যদি কেউ কোথাও কোনো অবকাশ না রাখে তা হলে একদিন সাম্রাজ্য যায়, গদি যায়, সব কিছু নূতন করে মীমাংসা করতে হয়। নয়তো কাজিয়া বাধে।

এই মামলাটি আমরা হস্তান্তরসূত্রে ইংরেজের কাছ থেকে পেয়েছি। আর লাল চীন পেয়েছে দ্বীপান্তরসূত্রে জাতীয়তাবাদী চীনের কাছ থেকে। ইংরেজরা যে আমাদের পক্ষ নেবে এটা স্বাভাবিক। তেমনি ফরমোজা সরকারও পিকিং সরকারের পক্ষে কথা বলছেন। মার্কিন সরকার যখন ঘোষণা করলেন যে, ম্যাকমহোন লাইন তাঁরাও স্বীকার করেন তখন চিয়াং কাইশেকের গভর্নমেণ্ট প্রতিবাদ করে জানালেন যে ম্যাকমহোন লাইন অবৈধ। বেশ বোঝা যাচ্ছে এই প্রশ্নে লাল চীন নীল চীন দুই চীনেরই এক রা। এটা ওদের পৈতৃক দাবী। ওরা কেউ তিব্বতকে স্বাধীন বা স্বতন্ত্র বলে আমল দিতে চায় না। ওদের দৃষ্টিতে তিব্বত একটি অঞ্চল বা প্রদেশ। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায় চীন-তিব্বতের সম্পর্ক এক এক যুগে এক এক রকম। আগেই বলেছি ১৯০৭ সালের অ্যাংলো-রাশিয়ান কনভেনশনে মেনে নেওয়া হয়েছে যে, তিব্বতের উপরে চীনের সোভরেনটি। অথচ ১৯১৪ সালে তিব্বতকে নিমন্ত্রণ

করা হয়েছে ব্রিটিশ ভারত ও মাঞ্চু শাসন থেকে সদ্যমুক্ত প্রজাতন্ত্রী চীনের বৈঠকে। তাকে সমান আসন দেওয়া হয়েছে। এর কারণ কী ? কারণ এই যে তিব্বতের উপরে যেটা ছিল সেটা চীনজাতির ছত্র নয়, মাঞ্চু সম্রাটের বা সম্রাজ্ঞীর ছত্র। চীনজাতি যেমন মাঞ্চু শাসন থেকে মুক্ত হয় তিব্বতী জাতিও তেমনি মাঞ্চু ছত্রাধীনতা থেকে মুক্ত হয়। তিব্বতীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নি, কিন্তু স্বাধীন জাতির মতো ব্যবহার করেছে আর ইংরেজরাও সেটাকে প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছে। তা বলে চীন সরকার মেনে নেননি।

আমাদের মোকাবিলা করতে হবে শুধু চীনের সঙ্গে নয়, তিব্বতের সঙ্গেও। সে বলবে, আমি ১৯১৪ সালে পক্ষভুক্ত ছিলুম, আমার স্বাক্ষর না থাকলে ভারত-চীন চুক্তি অসিদ্ধ। আগে আমাকে স্বাধীন করে দাও, তার পরে আমার স্বাক্ষর নাও। সুতরাং চীনের স্বাক্ষর যেমন দরকারী তিব্বতের স্বাক্ষরও তেমনি দরকারী। নইলে বিশ ত্রিশ বছর পরে শোনা যাবে তিব্বত স্বাধীন হয়েছে, সে বলছে, চীন-ভারত চুক্তির দ্বারা সে বাধ্য নয়, ওসব জায়গার উপর তার দাবী সে ছাড়েনি, তাকে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে না দিলে সেও হাঁকবে, লড়কে লেঙ্গে। তার পিছনে কোনো এক শক্তি দাঁড়াবে। হয়তো রাশিয়া। যে মামলাটি আমরা হস্তান্তরসূত্রে লাভ করেছি সেটি ১৯১৪ সালেই মিটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল তিন পক্ষের। অবশ্য লডাখের ব্যাপারটা আরো পুরনো। সাক্ষাৎ ভাবে ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব ছিল না।

তার পর মনে রাখতে হবে যে ১৯১৪ সালে তিব্বত যখন তার স্বাক্ষর দিয়েছিল তখন সে পূর্ব সীমানায় কিছু পেয়েছিল বলেই দক্ষিণ সীমানায় কিছু ছেড়েছিল। অর্থাৎ চীনের কাছ থেকে কিছু ফেরত পেয়েছিল বা ফেরত পাবে আশা করেছিল বলেই ব্রিটিশ সরকারকে কিছু ছেড়ে দিয়েছিল বা ইংরেজরা আগে থেকে দখল করে থাকলে দখলটাকে মেনে নিয়েছিল। ভবিষ্যতে তিব্বতের স্বাক্ষর দরকার হলে সে বলবে. চীনের কাছ থেকে আমার পূর্ব সীমানার জমি আদায় করে দিলে তো স্বাক্ষর করব। নইলে আমার কী স্বার্থ ? বরং আমার স্বার্থ আমার নিজের জন্যে কতক জায়গা দাবী করা। পুরনো মানচিত্র আমার পক্ষে যায়।

এটা একটা জবর মামলা। গায়ের জোরে এর নিষ্পত্তি হলে সে নিষ্পত্তি ধোপে টিকবে না। স্টালিন পোলাণ্ডের খানিকটা অংশ কেটে নিয়ে রাশিয়ার শামিল করে গেছেন। পোলাণ্ডকে ধরিয়ে দিয়েছেন জার্মানীর কাটা অংশ। সেখান থেকে পোলরা ভাগিয়ে দিয়েছে জার্মানদের। এটা নিছক গায়ের জোরে সমাধান। এ ব্যবস্থা একদিন না একদিন রদ হবে। যেমন রদ হলো অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া মিলে পোলাণ্ড ভাগাভাগি। ইতিহাসে দুই এক শতাব্দী খুব বেশী সময় নয়। তিব্বত একদিন স্বাধিকার ফিরে পাবেই। সে কি তার জাতীয় দাবী অমনি ছেড়ে দেবে ? তার পূর্ব সীমান্ত ও দক্ষিণ সীমান্ত দুই সীমান্ত ঠিক করে দিয়েছিলেন ম্যাকমহোন। পরে আবার দুই সীমান্ত ঠিক করে দিতে হবে, কমিশন বসাতে হবে, জরীপ করতে হবে, পিলার পুঁততে হবে।

এ সব কবে হবে কেউ বলতে পারে না। কিন্তু হবে একদিন। হতেই হবে। ম্যাকমহোন যেখানে থেমেছিলেন সেইখান থেকেই পুনরায় আরম্ভ করতে হবে। ভারত স্বাক্ষর করেছে, তিব্বত স্বাক্ষর করেছে, চীন স্বাক্ষর করেনি। তার স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে। সে এখন লাল হয়েছে, তা হলেও কমিউনিজম এক্ষেত্রে একটা ইস্যু নয়। ইস্যু হচ্ছে চীনের সোভরেন্‌টির সঙ্গে খাপ খায় তিব্বতের এমন এক স্টেটাস। চীনের সোভরেন্‌টি অস্বীকার করে তিব্বতকে একই এলাকার উপর সোভরেন স্টেটাস দিতে ১৯০৭ সালে ব্রিটেনের সাহস হয়নি, রাশিয়ার সাহস হয়নি। নিদ্রিত মাঞ্চু রাজবংশকে তার সার্বভৌমত্ব থেকে বঞ্চিত করতে তিব্বতেরও সাহস হয়নি। নবজাগ্রত প্রজাতন্ত্রী চীনকে বঞ্চিত করা ম্যাকমহোন বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল না। মহাযুদ্ধ আসন্ন দেখে তিনি বহুকালের একটা পুরনো বিরোধ মিটিয়ে দিতে যত্নবান হন। বিরোধটা মুখ্যত চীনে তিব্বতে। চীন-তিব্বতের মাঝখানকার সীমান্তটা ঠিক করাই ছিল আসল কাজ। গৌণত তিব্বতে ভারতে। তিব্বত-ভারতের সীমান্ত নিয়েও দ্বিমত ছিল। তিব্বতীদের জিজ্ঞাসা কর, এখনো তাদের মত আমাদের থেকে পৃথক। ম্যাকমহোন বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য ঘটাতে চেয়েছিলেন। বহু পরিমাণে সফলও হয়েছিলেন। আবার চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু আবার চেষ্টা করবে কে? কী করে? ম্যাকমহোন এখন আর বেঁচে নেই। কিন্তু খোঁজ করলে সে-রকম যোগ্য ব্যক্তির অভাব হবে না। তার পরের ধাপটা হচ্ছে চীনকে ও তিব্বতকে ভারতের সঙ্গে মিলে বৈঠক করতে ডাকা। চীনের নামে নিমন্ত্রণ পিকিং সরকারকে পাঠালে চলবে। কিন্তু তিব্বতের নামে নিমন্ত্রণ কোন্ সরকারকে পাঠানো উচিত হবে? তিব্বত সরকার বলে এখন কেউ নেই। ছিল তিন বছর আগে। ইতিমধ্যে ছেদ পড়ে গেছে। বিদেশে বসে দালাই লামা একটা প্রবাসী তিব্বত সরকার গঠন করতে চাইলে আন্তর্জাতিক আইনের বাধা আছে। ভারত তাঁকে অ্যাসাইলাম দিয়েছে দয়াপরবশ হয়ে। রাজনীতি করতে চাইলে তাঁকে অন্যত্র যেতে হবে। তাঁর প্রবাসী তিব্বত সরকারকে লাল চীন কখনোই স্বীকার করবে না। নীল চীনও করবে না, করলে চীন দেশের সোভরেন্‌টি খর্ব হয়। লাল ও নীল চীন না করলে তাদের সঙ্গে যাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক তারাও করবে না। ভারত যদি করে ভারতই কোণঠাসা হবে। সবাই বলবে প্রবাসী তিব্বত সরকার হচ্ছে ভারতেরই পুত্তলিকা। সে-রকম একটা সরকার গঠিত হতে লাল চীন তৎক্ষণাৎ ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করবে। তা হলে নূতন ম্যাকমহোন বৈঠকে যোগ দিচ্ছে কে কে?

নিকট ভবিষ্যতে সে-রকম কোনো বৈঠকের সম্ভাবনা নেই। সুদূর ভবিষ্যতে সুদূর পরাহত। লাল চীনকে যুদ্ধে হারিয়ে দিলে নীল চীন তার স্থান নেবে। সেও তিব্বতকে স্বাধীনতা দিতে নারাজ হবে। তা হলে তাকেও যুদ্ধে হারিয়ে দিতে হয়। যার পিছনে আমেরিকা তাকে হারিয়ে দেওয়া কি ভারতের কর্ম? তাহলে তিব্বতের একমাত্র ভরসা গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহ। সশস্ত্র

বিদ্রোহ কোনো কাজে লাগবে না। তিব্বতকে মিথ্যা আশা দেওয়া অন্যায়। পরের সাহায্যের আশায় সে যদি সশস্ত্র বিদ্রোহ করে তবে সে একেবারে পথে বসবে। গান্ধীবাদী গণ-সত্যাগ্রহই তার একমাত্র আশা। ভারতে সেটা সফল হতে প্রায় ত্রিশ বছর লাগল। তিব্বতে তার চেয়েও বেশী দিন লাগবে।

আপাতত ভারত-চীন-তিব্বত বৈঠকের আশা নেই। আশা আছে ভারত-চীন বৈঠকের, যদি চীনের সম্মতি হয়, যদি সে ভারতের প্রস্তাব মেনে নিয়ে ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্বের লাইনে ফিরে যায়। হামলা করে চীন তার দরাদরি করার ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়েছে। সে কি তার সেই বাড়তি ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজী হবে? সে যদি নারাজ হয় তবে ভারতই বা তার শর্তে রাজী হবে কেন? মধ্যস্থরা উদ্যোগী হয়ে কলম্বোতে পঞ্চায়েত বসিয়েছিলেন। পঞ্চায়েতের প্রয়াস সফল হলে ভারত-চীন সাক্ষাৎ আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা একবার আরম্ভ হলে একটার পর আরেকটা প্রশ্ন উঠবেই। কথায় কথায় তিব্বত প্রসঙ্গও উঠবে। যদি দশটা প্রশ্নের মধ্যে সাতটা প্রশ্নের নিষ্পত্তি হয়ে যায় তা হলে কোনো সভ্য দেশ বাকি কয়েকটার জন্যে রক্তক্ষয় করে না, আরো কিছুকাল ধৈর্য করে। কঠিনতম প্রশ্নগুলিই শেষের দিকে থাকে। আবার এমনও হয় যে কঠিনতমগুলিকে আগে মিটিয়ে নিতে হয়। তা হলে বাকিগুলি অপেক্ষা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে কঠিন হলো তিব্বতের স্টেটাস। ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্যকে কমনওয়েলথ নাম দিয়ে রানীকে কমনওয়েলথের সর্দার করেছে। ফলে ভারত, পাকিস্থান, সিংহল প্রভৃতি দেশগুলি স্বাধীন হয়েও স্বেচ্ছায় কমনওয়েলথের সভ্য। তাতে উভয় পক্ষেরই লাভ। চীনারা যদি তেমনি কৌশলী হতো তাহলে তিব্বতকেও সেইভাবে সন্তুষ্ট করত।

কঠিনতম না হলেও তার কাছাকাছি যায় তিব্বত থেকে সিনকিয়াং যাতায়াত করার জন্যে নবনির্মিত সড়কের প্রশ্ন। এই সড়ক লডাখ ভেদ করে গেছে। ভারতের আপত্তি স্বাভাবিক। আপত্তিটা শুধু এইজন্যে নয় যে অতখানি জমি বেদখল হয়েছে। গুরুতর কারণ আছে। ভবিষ্যতে যদি কোনো দিন রাশিয়ার সঙ্গে চীনের যুদ্ধ বাধে তা হলে সিনকিয়াং চলে যাবে রাশিয়ার কবলে। তখন চীন যদি ঐ সড়ক দিয়ে রাশিয়াকে তাড়াতে যায় রাশিয়া বলবে, ভারত, তুমি কেন চীনকে তোমার জমির উপর দিয়ে আমাকে আঘাত করতে আসতে দিচ্ছ? আজ থেকে তুমি আমার শত্রু। কিংবা এমনও হতে পারে যে ওই সড়ক দিয়ে চীনের সমরোপকরণ যাবে প্রকাশ্যে সিনকিয়াং অঞ্চলে। সেখান থেকে গোপনে আজাদ কাশ্মীর হয়ে পাকিস্তানে। আমারই শিল আমারই নোড়া আমারই ভাঙে দাঁতের গোড়া। চীন যদি ও-সড়ক হাতে রাখতে চায় তা হলে মিটমাট বড়ই কঠিন। অথচ চীন ও-সড়ক অকারণে বানায়নি। বানিয়েছে গুরুতর কারণে। সে আশঙ্কা করে যে ফরমোজা থেকে তার উপর একদিন বহুমুখী আক্রমণ হবে। সেই ভয়ে সে তার পূর্ব উপকূল থেকে কল-কারখানা শ্রমিক ইঞ্জিনীয়ার চালান করে দিচ্ছে সিনকিয়াং ও তিব্বতে, শহরকে শহর খালি করে দিচ্ছে। বেশীর ভাগ লোকই ফিরে যাচ্ছে

গ্রামের ক্ষেত-খামারে। কতককে পাঠানো হচ্ছে পাহাড় আবাদ করতে। তিব্বত আর সিনকিয়াং হলো চীনের সাইবেরিয়া। সড়কটা তার প্রাণ।

আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হলে আগুন ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে জ্বলে ওঠে। ঘরের কোন্ দিকের চালে লাগে সেটা সব সময়ই একটা চমক। কেউ কি জানত জাপানীরা পার্ল হারবারে হঠাৎ হানা দেবে? প্রথম মহাযুদ্ধের ইতিহাস পড়েছি। পদে পদে চমক। চীনারা বিশ্বাসঘাতকতা করল, এই সত্যটার আগে আর একটা সত্য বোধ হয় অনেকের নজরে পড়েনি। আলাপ আলোচনা চড়ায় ঠেকে বন্ধ হয়ে গেছল। আলাপ আলোচনার অচল অবস্থা হচ্ছে যুদ্ধের পূর্বাবস্থা। তখনি বোঝা উচিত ছিল যে চীনাদের হাতে আর কোন তাস নেই, এবার ওরা খেলবে আক্রমণের তাস। এবং আক্রমণটা ওরা ওদের সুবিধামতো এলাকায় করবে, আমাদের সুবিধামতো নয়। এখন তো আমরা ঠেকে শিখলুম, এর পরে আর সে ভুল করব না। যুদ্ধ চাই কি চাইনে এইটে আগে ভালো করে ভেবে নেওয়া যাক। যুদ্ধ চাইনে, এই যদি হয় মনের কথা, তবে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে, বন্ধ করলে চলবে না। যুদ্ধ চাই, এই যদি হয় অন্তরবাসনা, তবে সব রকম চমকের জন্যে তৈরি থাকতে হবে। আলাপ আলোচনায় ছেদ পড়া মাত্রই বুঝতে হবে আর-একটা চমক আসছে।

আলাপ আলোচনা যে ব্যর্থ হবেই এমন অলুক্ষণে কথা আমি মুখে ধরব না। কিন্তু দুই দেশের মেজাজ যা দেখছি তার ফলে আমার ভাবনা এখন অন্য খাতে বইছে। চীন ও ভারত এই দুই প্রাচীন ও প্রতিবেশী দেশের সত্যকার ট্র্যাজেডী হচ্ছে এইখানে যে, এরা পরস্পরকে বাঁচতে সাহায্য করছে না, মরতে সাহায্য করছে। এদের মধ্যে বাণিজ্য নেই, লোক চলাচল নেই, ভাব বিনিময় নেই, সাংস্কৃতিক আদান প্রদান বহুদিন স্তব্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে ভীম পরিচয় ঘটে যুদ্ধক্ষেত্রে। ঘটায় অঘটনঘটন পটীয়সী প্রকৃতি। মারতে মারতে মরতে মরতে মানুষ পরস্পরকে চেনে। তা ছাড়া, এদের জনসংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সীমায় ফিরিয়ে আনার আর কোনো উপায় যদি না থাকে তবে প্রকৃতিই মন্ত্রণা দেবে উভয়ের কানে, "ওরা অসুর, তোমরা দেবতা। ওদের মারলে পাপ হবে না। ওদের মারো।"

আমি দিনরাত চিন্তা করেছি। আমার কর্তব্য কী? নাগরিক হিসাবে আমার কর্তব্য আমার রাষ্ট্রকে সাহায্য করা। আমার স্ত্রী জওয়ানদের জন্যে পশমের দস্তানা বুনছেন, আমার মেয়েরা ফার্স্ট এড শিখছে, আমিও চাঁদা দিচ্ছি, ট্যাক্স দিচ্ছি। ডাক পড়লে সিভিল ডিফেন্সে যোগ দিতেও রাজী। কিন্তু লেখক বা শিল্পী হিসাবে আমার নিজেরও তো একটা যোগসাধনা আছে। সৃষ্টিযোগে স্রষ্টার সঙ্গে ও তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে যোগসাধন। আমাকে যোগভ্রষ্ট করে কার কী লাভ? কতটুকু লাভ? আমি যদি আমার সাধনায় নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অতন্দ্র থাকি কার কী ক্ষতি? কতটুকু ক্ষতি? আমিও তো একটা দিক সামলাচ্ছি। সংস্কৃতির দিক। বিশুদ্ধ সঙ্গীত, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, বিশুদ্ধ সত্য, বিশুদ্ধ প্রেম এসব সূত্র থেকেও প্রতিরোধশক্তি

আহরণ করা যায়। যেকাজে আমি হাত দিয়েছি সেটাও একটা করবার মতো কাজ। তার জন্যে আমি জীবিকা ত্যাগ করেছি। এখন যদি তাকেও ত্যাগ করি তবে আমার জীবনের সম্বল আর কী রইল?

কবি বা শিল্পী যেন গর্ভিণী নারী। তাকে তার গর্ভ রক্ষা করতে হবে অতি যত্নে, অতি সাবধানে। সেই তার দেশরক্ষা। দেশ কি কেবল দেশের মাটি? দেশের আদর্শ, দেশের ধ্যান, দেশের স্বপ্ন, দেশের রস, দেশের রূপ এসবও দেশ। চিন্ময় ভারতকে মৃন্ময় ভারতেরই মতো রক্ষা করতে হবে। একাজ করবে কে, যার কাজ সে যদি না করে? সবাইকে সব কাজে ডাকতে নেই। দেশমাতার চল্লিশ কোটি সন্তান রয়েছে। প্রবণতা ও যোগ্যতা অনুসারে কাজ ভাগ করে দিলেই হয়। তা হলে কোনো কিছুর জন্যে লোকের অনটন হবে না। আমাকেও লিখতে হবে না এমন কোনো রচনা যার জন্যে আমার সৃষ্টি হয়নি, যা আমার সৃষ্টি নয়। যেটা আমি লিখছি সেটা যদি ঠিকমতো লিখতে পারি দেশ তার থেকেও প্রতিরোধশক্তি পেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলি। প্যারিসে আমার এক বন্ধু ছিলেন। বাঙালী। আমার প্রথম প্রকাশিত বই "তারুণ্য" তাঁকে উপহার দিই ১৯২৮ কি ১৯২৯ সালে। তার পর আমি দেশে ফিরে আসি। তিনি থেকে যান। অনেকবার তাঁর কথা জানতে চেয়েছি, কিন্তু কোথাও কোনো সন্ধান পাইনি। সেই নিরুদ্দেশ বন্ধুকে হঠাৎ দেখতে পাই কলকাতায় বিনয় সরকার মহাশয়ের ওখানে ১৯৪৭ সালে। আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। তিনিই আমাকে চিনলেন। আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর গৃহিণীর সঙ্গে। অস্ট্রিয়ান কাউন্টেস। মহাযুদ্ধের সময় তাঁরা ছিলেন হলাণ্ডে। সে সময় কালো মানুষ বলে তাঁকে কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়। তাঁর স্ত্রীকে ভয় দেখানো হয় এই বলে যে, তোমার স্বামীকে তুমি ডিভোর্স কর, নইলে তার প্রাণসংশয়। স্বামীর মত নিয়ে স্ত্রী তাই করলেন। কিন্তু কাছাকাছি এক জায়গায় থাকলেন।

"সেই দুর্দিনে", বন্ধু আমাকে বললেন, "আপনার বই আমাকে মনের জোর জুগিয়েছে। আমাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে। নাৎসীদের কবলে যে কয় বছর ছিলুম আপনার বই ছিল আমার সঙ্গী ও আপনার বাণী ছিল আমার সহায়।"

আমি অভিভূত হলুম। অত বড় পুরস্কার কেউ কোনো দিন আমাকে দেয়নি। আমিও মনে জোর পেলুম। আমার বন্ধু আমাকে বাঁচতে সাহায্য করলেন। দেশ বিভক্ত, হিন্দু মুসলমান লাখে লাখে মরছে ও পালাচ্ছে, গান্ধীজীর স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে, প্রাণও গেল কিছুদিন বাদে। বাঁচতে কে চায়? কিসের জন্যে বাঁচবে? তবু বাঁচতে হলো আমাকে। আমার অর্জুন-বিষাদ দূর হলো। দেখলুম সত্যের শক্তি অসীম। নাৎসীর বিরুদ্ধেও সে প্রতিরোধশক্তি জোগায়। সাহিত্যকে যদি আমি রক্ষা করি সে অপরকে রক্ষা করবে।

(শ্রীসাগরময় ঘোষকে লিখিত)

পর্বতো বহ্নিমান্

পাহাড়ে আগুন লেগেছে শুনে মনে পড়ল, পাহাড়ে আগুন লেগেছে। আমাদের বাড়ীর সদর দরজার ঠিক সামনে। গড়পর্বতে। দিনের বেলা বোঝা যায় গরম বাতাস গায়ে লেগে। সন্ধ্যাবেলা চোখে পড়ে রাঙা আলোর লহর পাহাড়ের গলার এধার থেকে ওধারে। কী তার বাহার! সারা রাত জুড়ে রোশনাই লেগে আছে, আমরা যখন ঘুমিয়ে তখনো সে জেগে। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায় তৃপ্ত হাওয়ায়।

আমরাই পালাতে পারিনে। তাহলে ভেবে দেখ পশুপাখী গাছপালার কথা। পশুপাখী পালাবার সময় পায় না, পালাতে গিয়ে দেখে চারিদিকে আগুন। গাছপালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলে যায়। যে পাহাড় ছিল প্রাণের আশ্রয়ভূমি সেই হলো মরণের ফাঁদ। সেইসব প্রাণীর জন্যে আমরাও কাঁদি। কিন্তু তখনো আমি অসহায় শিশু। আমি নিজেকেই বাঁচাতে পারিনে। ওদের বাঁচাব কী করে? এমন বছর যায় না যে বছর একটা না একটা পাহাড়ে আগুন লাগে না। গড়পর্বতে নয় তো মেঘা পাহাড়ে, মেঘা পাহাড়ে নয় তো কুটুনিয়া পাহাড়ে। কোরিয়া পাহাড়ে। এগুলো অত কাছে নয় বলে গায়ে আঁচ লাগে না, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা চেয়ে দেখি রাঙা আলোর রোশনাই লেগে আছে। নীরো হলে বেহালা বাজিয়ে সঙ্গত রাখতেন প্রকৃতির ওই পরম রমণীয়তার সঙ্গে।

প্রকৃতির? একটু বড় হয়ে জিজ্ঞাসা জাগল, আগুন কে লাগায়? প্রকৃতি না মানুষ? ওটা কি তুফান ভূমিকম্পের মতো নৈসর্গিক ব্যাপার না আমাদের পাড়ার 'ঘরপুড়ি'র মতো মানবিক? উত্তর পেলুম, কাঠ কাটতে বা কুড়োতে যারা যায় তারা হয়তো অনবধান হয়ে আধপোড়া বিড়ি বা পিকা বা ধুঁয়াপত্র ফেলে দিয়ে আসে। শুকনো পাতার উপরে। শুকনো পাতা হাওয়ায় আগুন ধরিয়ে বেড়ায়। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। একটি বোকা মানুষ এক মুহূর্তের একটা ভুলে আস্ত একটা পাহাড়ের অগণিত পশুপাখী ও গাছপালাকে বিনা নোটিশে পুড়িয়ে মারে। তার পরে মরা হরিণ মরা পাখী নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কারো সর্বনাশ কারো পৌষমাস।

বড়দের জিজ্ঞাসা করি, আগুন কেন কেউ নেবায় না?

উত্তর পাই, ওটা রাজার পাহাড়। যার পাহাড় সেই নেবাবে। রাজা তো স্বয়ং নেবাতে যাবেন না, হুকুম দেন দেওয়ানকে। দেওয়ান হুকুম দেন ফরেস্ট অফিসারকে। ফরেস্ট অফিসার অবশ্য ঘটনাস্থলে যান, কিন্তু হুকুম দেন রেঞ্জারদের। রেঞ্জাররা ছুটোছুটি করেন, কিন্তু হুকুম দেন ফরেস্ট গার্ডদের। গার্ডরা হৈ চৈ বাধায়, কিন্তু হুকুম দেয় চৌকিদারদের। চৌকিদাররা ধরে নিয়ে আসে গাঁয়ের গরিব লোকদের। তারা রাজার জন্যে বেগার খাটতে বাধ্য। তাদের বলা হয় বেঠিয়া। একটা পয়সাও পাবে না। হরিণটা বনমোরগটা পেলেও উপরওয়ালাদের নৈবেদ্য দিতে হবে। তারা বলে, যাচ্ছি, যাব, হচ্ছে, হবে। আগে জল জোগাড় করি, বালি জোগাড় করি। আগুন যত সুলভ জল

তত সুলভ নয়। অনেক মেহনত করে সারা গাঁয়ের একমাত্র ইঁদারা থেকে জল তুলতে হয়। রাজপুরুষরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখেন আর গালমন্দ দেন। আর মারধোর করেন, কিন্তু কাজ এগোয় না। আগুন ততক্ষণে মানুষেরও আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। সে তার খুশিমতো জায়গায় থামবে। দিন কয়েক বাদে আপনাআপনি নিববে।

ফী বছর আগুন লাগে। তা হলে আগে থেকে তারা তৈরি হয় না কেন? ফায়ার ব্রিগেড বানায় না কেন? ফায়ার ড্রিল করে না কেন? জিজ্ঞাসা করি আরো বয়স হলে। উত্তর পাই, সবই সম্ভব, অথচ কিছুই সম্ভব নয়। কারণ রাজার আয় মোটে তিন লাখ টাকা। রাজপরিবারকে রাজার হালে রাখতে খরচ হয় দেড় লাখ। অফিসারদের পুষতে এক লাখ। বাদবাকী যা থাকে তা দিয়ে রাস্তাঘাট, ইস্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি সব কিছুই টিকিয়ে রাখতে হয়। একটা জেলখানাও আছে। কিন্তু কয়েদী বেশী নেই। অতগুলো লোককে খাওয়াবে কে?

একটু একটু করে বড় হই আর একটু একটু করে বুঝি যে, আগুন নেবানো অসম্ভব নয়, সম্ভবও নয়। তা না হয় হলো, কিন্তু আগুন যে লাগবেই এমন কী কথা আছে! চেষ্টা করলে নিবারণ তো করা যায়। কেউ কেন নিবারণ করে না? এর উত্তর শুনি, পাহাড়ে যদি কেউ না যায় তা হলে আগুন লাগার কোন হেতু নেই। সব পাহাড়ে লাগে না। কিন্তু কাঠ কাটতে বা কুড়োতে যারা যাবে তারা কেউ কোনোদিন বিড়ি খাবে না, পিকা টানবে না, ধুঁয়াপত্র নেবে না এমন ফারমান জারি করাও যা, না করাও তাই। দিনমান যারা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটবে তামাক তাদের কাছে ডালভাতের মতোই দরকারী।

নিবারণ অসম্ভবও নয়, সম্ভবও নয়। আরো বড় হয়ে আরো জিজ্ঞাসা করি। এবার শুধু ঘরের বড়দের নয় বাইরের বড়দেরও। উত্তর পাই, পাহাড়টা রাজার নয় প্রজাদের। তার সংরক্ষণ প্রজাদের প্রত্যেকেরই ভাবনা। সে ভাবনা রাজপুরুষদের উপর ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। যেখানে নিবারণ সম্ভব সেখানে নিবারণ করতে হয়। যেখানে নিবারণ সম্ভব নয় সেখানে নির্বাপণ করতে হয়। যেখানে পূর্ণ নির্বাপণ সম্ভব নয়, কিন্তু আংশিক সম্ভব, সেখানে আংশিক করতে হয়। প্রাণপণ চেষ্টায় নারী ও শিশুকে বাঁচানো যায়।

সমবেদনা

প্রত্যেকবার পূজার লেখা চুকিয়ে দিয়ে আমি কিছুদিন দম নিই। এবার কিন্তু অবিশ্রাম কলম চালিয়েছি। রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে কয়েকটি প্রবন্ধ না লিখলে নয়। সময়মতো প্রকাশ করাও চাই। এ যেন ট্রেন ধরার

জন্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা। ফল হলো স্বাস্থ্যভঙ্গ। বাধ্য হয়ে বিশ্রাম নিতে হলো। অবশ্য নির্জলা বিশ্রাম আমার বরাতে নেই। ধাতেও নেই। তবু যথাসম্ভব লেখার কাজ এড়িয়েছি। আপনার অনুরোধের উত্তরে গল্প কেন গেল না, প্রবন্ধ কেন বিকল্প হলো না, এই তার কৈফিয়ৎ।

নীরব থাকতেই আমার ইচ্ছা। কিন্তু সম্প্রতি এমন একটি ব্যাপার ঘটে গেছে যা আমাকে নিশিদিন ভাবিয়েছে। এই ভাবনার কোথাও একটা রেকর্ড থাকলে ভালো হয়। মনে হলো আপনাকে লেখা চিঠিখানিকে আর একটু বড় করলে আলোচনার অবকাশ মেলে। কারণ আপনিও নিশ্চয় ভাবছেন। হাঁ, পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে।

ইতিহাসে কোনোদিন দেখা যায় নি যে সামরিক আইন সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বলবৎ রয়েছে। সাড়ে তিন বছর পরেও কেউ বলতে পারছে না আরো কতকাল বহাল থাকবে। ইংরেজ আমলে সামরিক আইন আমাদের ছেলেবেলায় একবার জারি হয়েছিল মনে আছে। সেও কেবলমাত্র পাঞ্জাবে। তার মেয়াদ বোধহয় দিন পনেরো কি এক মাস। মাথার উপরে হাইকোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিল থাকতে বড়লাট বা জঙ্গীলাটের সাহস ছিল না যে সামরিক আইন জারি করে নাগরিকদের দেওয়ানী ফৌজদারী আদালতে যাবার অধিকার হরণ করেন বা খর্ব করেন। তখনকার দিনে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসী ছিল না। কিন্তু লাটসাহেবরা হাইকোর্টকে জুজুর মতো ডরাতেন। প্রিভি কাউন্সিলকে যমের মতো ভয় করতেন। দেশের আভ্যন্তরিক বিষয়ে জঙ্গীলাটের হস্তক্ষেপ অচিন্ত্যনীয় ছিল। সেনাবিভাগের প্রকৃত কাজ ছিল বাইরের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। শাসন ও শৃঙ্খলা ছিল সেনাবিভাগের নাগালের বাইরে। গুরুতর শান্তিভঙ্গের সময় পুলিশ হার মানলেই সৈন্যদের তলব করা হতো।

এ ব্যবস্থা ইংরেজ আমলে গোড়া থেকেই প্রবর্তিত হয়। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসীর সঙ্গে এর সম্পর্ক সেকালে ছিল না। আমাদের জীবনকালেই ইংরেজরা পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসীর ভিত্তিপাত করে। আমাদের নেতাদেরই নির্বন্ধে ও জনগণের চাপে। আমরা নিষ্ক্রিয় থাকলে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসীর নামগন্ধ থাকত না। হাইকোর্ট থাকত, প্রিভি কাউন্সিল থাকত, সেখানে গিয়ে বিচার চাইবার অধিকার থাকত। স্বল্পকালের জন্যে বা বিশেষ কোনো অঞ্চলে সে অধিকার খর্ব হতে পারত, কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে সেই অধিকারটাই ছিল ব্রিটিশ প্রজার প্রজাস্বত্ব। যার জন্যে লোকে দেশীয় রাজ্য ছেড়ে চলে এসে ব্রিটিশ এলাকায় বসত করত। ইংরেজরা যদি এইটুকুও না দিত তা হলে দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে কোম্পানীর রাজ্যের বা মহারানীর রাজ্যের তফাৎ থাকত না। লোকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আন্দোলন বাধিয়ে দিত অষ্টাদশ শতাব্দীতেই।

যে কোন শাসন ব্যবস্থার তিনটি অঙ্গ। একজিকিউটিভ। জুডিসিয়াল। লেজিস্‌লেটিভ। ইংরেজরা বড় সহজে এক্‌জিকিউটিভ ক্ষমতা ছাড়তে চায়

নি। ছাড়তে বাধ্য হয় ১৯৪৭ সালে। আরো চার দশক আগে লেজিসলেটিভ ক্ষমতা ছাড়তে আরম্ভ করে। পার্লামেণ্টের অনুকরণে একটা কিছু খাড়া হয়। সেখানে বাজেট পেশ করা হয়। প্রজাপ্রতিনিধিরা সেখানে তর্ক-বিতর্ক করেন। ভোট দেন। অবশ্য ভোট দিয়ে সরকারকে হারিয়ে দেওয়া চলত না। হারিয়ে দিলেও সরকার নাছোড়বান্দা। তবু জানিয়ে দেওয়া যেত যে প্রজাদের সম্মতি নেই। এইভাবে একটা অপোজিশন গড়ে ওঠে। শাসন করেন রাজপ্রতিনিধি, অপোজ করেন প্রজাপ্রতিনিধি। এটাও বড় সামান্য অধিকার নয়। এটাও আদায় করতে হয়েছে বহু জনের বহু তপস্যায়। কিন্তু জুডিসিয়াল নিয়ে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসকদের মনোভাব বরাবরই অনুকূল ছিল। যেখানে স্থানীয় শাসকরা প্রতিকূল সেখানে বিলেতের পার্লামেণ্ট অনুকূল। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বা স্বল্পকালের জন্যে সামরিক বা আধা-সামরিক আইন প্রবর্তন করার ক্ষমতা শাসকসম্প্রদায়ের ছিল, কিন্তু সব সময়ের জন্যে সারা দেশ সামরিক আইনের আমলে আসবে এ কথা রাজা প্রজা কেউ কোনো দিন ভাবতেই পারেন নি। এ ক্ষমতা দাবি করলে ইংরেজ অনেক আগেই বিদায় হতো। ইংরেজ রাজত্ব নিরঙ্কুশ পুলিস রাজত্ব বা মিলিটারি রাজত্ব ছিল না।

বহুকাল আমরা পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসী বিনা বাস করেছি। পাকিস্তান থেকে ও জিনিস উঠে যাওয়া দুঃখের কথা, কিন্তু ওর অভাব আমাদের অজানা নয়। অজানা হচ্ছে নিরঙ্কুশ মিলিটারি শাসন, সামরিক আইন, সামরিক আদালত। কোর্ট মার্শাল শুনলেই বুকটা কেঁপে ওঠে। বিচার করবেন যাঁরা তাঁরা পেশাদার সৈনিক। তাঁদের কাছে সব চেয়ে বড় কথা প্রজার অধিকার নয়, তাঁদেরি অধিকৃত ক্ষমতা। সে ক্ষমতা তাঁরা স্বেচ্ছায় ছাড়বেন না। সুতরাং হাইকোর্ট সুপ্রীমকোর্ট অসহায়। আপীল করতে হলে মিলিটারির বিরুদ্ধে মিলিটারির কাছেই করতে হয়। এ যেন বাঁ হাতের বিরুদ্ধে আপীল ডান হাতের কাছে। কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে মিলিটারিকে শত্রু করবে! যদি জেতে তা হলে তো শত্রুতা আরো বাড়বে। এমন রাজত্বে চুরি ডাকাতি হয়তো বন্ধ, কিন্তু প্রজামাত্রেই চোরের মতো চুপি চুপি বাস করে। লাভ হয়তো অনেক দিক থেকে হয়, কিন্তু খোয়া যায় মানুষের সৎসাহস।

ঢাকার ছাত্ররা যা করেছে তা সুরাবর্দীর জন্যে নয়, তা যে-কোনো একজন বন্দী নাগরিকের জন্যে। একজন নরঘাতকেরও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হবার অধিকার আছে, একজন রাজদ্রোহীরও হেবিয়াস কর্পাসের অধিকার আছে। অন্তত ছিল কিছুদিন আগেও। এসব অধিকার বাজেয়াপ্ত হলে বা তামাদি হলে কেউ নিরাপদ নয়। সুতরাং ছাত্রদের আন্দোলনটা রাজনৈতিক আন্দোলনের কোটায় পড়ে না। এ হলো যে-কোনো সভ্য দেশের মূলনীতির প্রশ্ন। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসী স্বতন্ত্র এক ইসু। পাকিস্তান হয়তো পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসীর উপযুক্ত নয়। কিন্তু যে কোনো ব্যক্তিই হেবিয়াস কর্পাসের উপযুক্ত, গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির

হওয়ার যোগ্য। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসীর বদলে শুনছি বেসিক ডেমোক্রেসী প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বেশ তো। বেসিক ডেমোক্রেসীই সই। কিন্তু তার চেয়েও যা বেসিক তার পত্তন হবে কবে? সামরিক আইন রহিত হবে কবে? বলা বাহুল্য সামরিক আইনকে অর্ডিনান্স বা রেগুলেশন ইত্যাদির ছদ্মবেশ পরালেও তা সামরিক আইনই থাকে। প্রথম কথা হলো লোকের মৌল অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। লোকে যদি দাবি করতে সাহস না পায় তবে সাহস যাদের আছে তারাই লোকের হয়ে দাবি করবে। তারা হয়তো জনাকয়েক নাবালক ছাত্র, তবু তাদের দিকেই ন্যায়। জনসাধারণের সহানুভূতি তাদেরই প্রতি। জোর করে তাদের কণ্ঠ রোধ করলে কী হবে, তাদের কণ্ঠস্বর অপ্রতিরোধ্য। পৃথিবীর মানুষ ইতিমধ্যে সে স্বর শুনে ফেলেছে। পাকিস্তানে যে সর্বাধিনায়কের স্বর ভিন্ন আর একটি স্বরও আছে এটা এতদিন কারো জানা ছিল না। এখন জানা গেল যে সামরিক শাসনের আতঙ্ক কেটে গেছে। মানুষ আর চায় না চোরের মতো চুপি চুপি বাঁচতে। বেসিক ডেমোক্রেসীকেও মানুষের এই পরিবর্তিত মনোভাবের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। নয়তো বেসিক ডেমোক্রেসীও ধোপে টিকবে না। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসীর মতোই ডিকটেটরশিপকে পথ ছেড়ে দেবে। তখন ডিকটেটরশিপকে জনগণের সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলা করতে হবে। মাঝখানে কোনো প্রকার প্রতিনিধিমণ্ডলী থাকবে না।

বেসিক ডেমোক্রেসী বস্তুটা কী তা ইতিহাসের পাঠকদের অজ্ঞাত। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের প্রকাশিত সারাংশ পাঠ করে আমার মনে হলো তার মধ্যে ডেমোক্রেসীর মূলসূত্রটাই নিখোঁজ। এক একটি মানুষের এক একটি ভোট—এই যদি হয় গণতন্ত্রের মূলসূত্র তা হলেও পূর্ব পাকিস্তানের ভোটার সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের ভোটার সংখ্যার চেয়ে বেশী হতে বাধ্য, কারণ জনসংখ্যা বেশী। সুতরাং পরোক্ষভাবে নির্বাচিত "বেসিক ডেমোক্রাট"দের সংখ্যাও বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু জোর করে তাদের সংখ্যা সমান রাখা হয়েছে। এর মানে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা বেশী হলেও মূল্য বেশী নয়। এক একটি পশ্চিম পাকিস্তানীর মূল্য একাধিক পূর্ব পাকিস্তানীর সমান। এক একটি পশ্চিম পাকিস্তানী ভোটের মূল্য একাধিক পূর্ব পাকিস্তানী ভোটের সমান। এ রকম রাজনৈতিক ভারসাম্যের অন্য নাম থাকতে পারে, কিন্তু একে ডেমোক্রেসী বলে চালানো কি ঠিক? তা হলে ইংরেজী অভিধানে ডেমোক্রেসী কথাটার অর্থ বদলে দিতে হয়। কিংবা তার সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়—পাকিস্তানে এই শব্দের অর্থ, এক একটি পশ্চিম পাকিস্তানী ভোটের দাম এক একটি পূর্ব পাকিস্তানী ভোটের চেয়ে বেশী। ছলে বলে কৌশলে সংখ্যাগুরুকে সমসংখ্যকে পরিণত করার নাম বেসিক ডেমোক্রেসী।

বলা বাহুল্য পূর্ব পাকিস্তানীদের চোখে এ ফাঁকি ধরা পড়ে যেতে একটা নির্বাচনই যথেষ্ট। দ্বিতীয় নির্বাচনের পূর্বেই এ শাসনতন্ত্র রদবদল করতে হবে, তাদের মতামতের যদি লেশমাত্র ওজন থাকে। কিন্তু রদবদল করলে

আবার উলটো বিপত্তি। পশ্চিম পাকিস্তানীরা সংখ্যালঘু হতে নারাজ হবে। প্যাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে অচল অবস্থা ঘটার আসল কারণই তো এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা সংখ্যায় লঘু হয়েও সমান হতে চায়, শেষকালে পূর্ব পাকিস্তানীরা হাল ছেড়ে দিয়ে বলে, আচ্ছা, তাই হোক, কিন্তু যৌথ নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন করা চাই। তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকেই রাজী, কিন্তু মুসলিম লীগ নারাজ। ভয়ানক একটা মারামারির আয়োজন চলছিল, ডিকটেটর এসে থামিয়ে দেন। এখন ডিকটেটর ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানী ভোটকে অসমান করে দিলেন। প্রত্যেকটি নাগরিক হয়ে গেল মাথায় খাটো। মাথা হেঁট করে চলতে হবে তাকে। তবে যতদূর বুঝতে পারছি যৌথ নির্বাচন পদ্ধতিই মেনে নেওয়া হলো। অর্থাৎ ধর্ম অনুসারে পৃথক তালিকা হবে না। আমার অনুমান যদি সত্য হয় তবে আয়ুব খান্ ধন্য। তিনি অসাধ্যসাধন করেছেন। পাকিস্তানের হাওয়া বদলে যাবে এর ফলে। আমি ডিকটেটরশিপ পছন্দ করিনে। কিন্তু ডিকটেটর যদি এমন একটি মহৎ কর্ম করেন যা আর কেউ করতে পারতেন না তবে আমি একশোবার তাঁর প্রশংসা করব।

পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে ছেড়ে টিকতে পারবে না। কারণ তার পরের দিনই পাঠানিস্তানের রব উঠবে। ভাঙন একবার একদিকে ধরলে আবার আরেক দিকে ধরবে। পাকিস্তানের অস্তিত্বই নির্ভর করছে পূর্ব-পশ্চিম ঐক্যের উপর। অথচ ঐক্য কখনো অবিশ্বাসের উপর দাঁড়াতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তানীর মনে যদি সন্দেহ জাগে যে সে অসমান বা খর্ব তা হলে সে পৃথক রাষ্ট্রের ধ্যান করবেই। যে যুগে আমরা বাস করছি সে যুগে কোনো মানুষই অসমান বা খর্ব হতে চায় না। নাগরিকত্বের মূল সূত্র হলো, কেউ কারো চেয়ে কম মূল্যবান নয়। যে কম মূল্যবান তাকে বলা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। পূর্ব পাকিস্তানী হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক আর পশ্চিম পাকিস্তানী হবে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক এ কখনো হতে পারে না। সুতরাং এই শাসনতন্ত্রের যদি রদবদল করা না হয় তবে পৃথক রাষ্ট্রের চিন্তা উদয় হবেই। পৃথক রাষ্ট্র হয়তো অকেজো হবে, খারাপ হবে, ধ্বসে পড়বে। কিন্তু সেই ভয়ে লোকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে রাজী হবে না। আয়ুব খান্ যদি আরেক কদম এগিয়ে গিয়ে ঘোষণা করেন যে, এক একটি মানুষ এক একটি ভোট তা হলে আমি ধন্য ধন্য করব। তার মানে সারা পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানীরাই সংখ্যাগুরু বলে স্বীকৃত হবে। পার্লামেণ্টে তাদের আসনসংখ্যা অধিকতর হবে। তা হলে আর তারা পৃথক রাষ্ট্রের কথা মনেও আনবে না। কিন্তু তখন হয়তো শোনা যাবে বেসিক ডেমোক্রেসীও পাকিস্তানের জন্যে নয়। তাকেও খারিজ করতে হবে। পাকিস্তানের পক্ষে নির্জলা ডিকটেটরশিপই শ্রেয়। তখন হয়তো আয়ুবের দিন যাবে। তাঁর জায়গা নেবেন তাঁর চেয়েও জাঁদরেল এক পাঞ্জাবী সেনানায়ক।

আয়ুবের কাছ থেকে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট একটা শাসনতন্ত্র প্রত্যাশা করাই

অত্যাশা। তিনি তাঁর সাধ্য হিসাব করে কাজ করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের অসন্তোষ যদি দূর না হয় তবে পশ্চিম পাকিস্তানের জনমতের উপরেই নির্ভর করবে ভবিষ্যৎ। সেখানকার জনমত যদি একবাক্যে বলে যে পূর্ব পাকিস্তানী ভাইদের খাতিরে শাসনতন্ত্র রদবদল করতে হবে আয়ুব খান্ অন্তরায় হবেন না। এ সমস্যার স্রষ্টা তিনি নন। এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তানের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে। সেদিন কারো মাথায় আসেনি যে সমস্যার মীমাংসা না হলে পাকিস্তান তার শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারবে না, দরকার হবে একজন ডিকটেটরের, সেই নেপোলিয়নই দেবেন তাকে তার প্রথম শাসনতন্ত্র। কিন্তু প্রথম শাসনতন্ত্রই শেষ শাসনতন্ত্র নয়। বেসিক ডেমোক্রেসীও পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসীর মতো বানচাল হতে পারে। তখন আবার ঘুরে ফিরে নির্জলা ডিকটেটরশিপ। তার পরে কী?

পরোক্ষ নির্বাচনের উপর আমারও এক কালে আস্থা ছিল। তাতে খরচ ঢের কম। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে একে তো টাকার শ্রাদ্ধ, তার উপর সাম্প্রদায়িক বা অন্যবিধ উত্তেজনা। যারা টাকা বেশী খরচ করতে পারে না তারা এমন এক উত্তেজনা জাগিয়ে তোলে যার নেশায় মানুষ আপনি ভোট দিয়ে যায়। মুসলিম লীগ যে পাকিস্তানের জিগীর তুলে সস্তায় ভোট পেল সেটা প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির জন্যেই। কিন্তু আমিও ক্রমে ক্রমে পরোক্ষ নির্বাচনে আস্থা হারিয়েছি। প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রত্যক্ষ শিক্ষাপ্রদ। লোকে যদি ভুল করে ভোট দিয়ে থাকে, তবে ভুল বুঝতে পেরে নিজের কান মলে। দ্বিতীয় বার ভুল করে না। দ্বিতীয় বার যদি নতুন একটা ভুল করে তো তৃতীয় বার সতর্ক হয়। ভুল করতে করতে মানুষ ঠিক করতে শেখে। এই শিক্ষাটা ব্যয়সাপেক্ষ। এর থেকে বিভ্রাটও ঘটতে পারে। যেমন ঘটল দেশবিভাজন। কিন্তু মানুষকে রাজনীতি শেখানোর আর কোনো সরল উপায় নেই। অবশ্য যদি স্বীকার করেন যে রাজনীতি একটা শিক্ষণীয় বিষয়। তা যদি না হয়ে থাকে তবে সব মানুষকে ভোটার বানাতে যান কেন? নাগরিকমাত্রেরই যদি ভোট দেবার অধিকার ও দায়িত্ব থাকে তবে রাজনীতি শিক্ষারও প্রয়োজন থাকে।

তা ছাড়া প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পক্ষে মোক্ষম যুক্তি হলো নির্বাচকের সঙ্গে নির্বাচিতের সাক্ষাৎ যোগাযোগ। প্রার্থী স্বয়ং আমার ঘরে এসে বলেন, "আমাকে ভোট দিন। আমি আপনার প্রতিনিধি।" কে যে আমার প্রতিনিধি তা আমি জানতে পারি। তাঁর ঘরে গিয়ে বলতে পারি, "আসছে বার আপনাকে ভোট দিচ্ছিনে। আপনি কথা রাখেন নি।" পরোক্ষ নির্বাচনে এই সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঘটে না। একটা উদাহরণ দিই। আমাদের বিধানসভায় আমরা যাঁদের ভোট দিয়ে পাঠাই তাঁরা আরেক দফা ভোট দিয়ে আরো কয়েকজনকে রাজ্যসভায় পাঠান। রাজ্যসভার এইসব সদস্য পরোক্ষভাবে আপনার আমারও প্রতিনিধি। কিন্তু এঁদের এক একজনের কাজ হাসিল হয়ে যায় বিধানসভার চল্লিশজন কি পঞ্চাশজন সভ্যকে ধরলে। সেই চল্লিশটি কি পঞ্চাশটি ভোট হাত করতে পারলে এঁরা অক্লেশে বৈতরণী পার হয়ে যান। বৃহৎ নির্বাচক-

মণ্ডলীর দিকে ফিরেও তাকান না। কে যে কোন্ জেলা থেকে বা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হলেন, কেউ তা জানেন না। না আমরা, না এঁরা। এই ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ বলেই রক্ষা। ব্যাপক হলে নির্বাচিতরা জনসাধারণের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন না, জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতিফলন করতেন না, অল্প কয়েকজনকে কোনো রকমে বশ করতে পারলেই তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো। পরোক্ষ নির্বাচন দায়িত্বহীনতার প্রশ্রয় দেয়। ফলে রাজনীতি শিক্ষা হয় না। আয়ুব খান্ রাজনীতিকদের শত হস্ত দূরে রাখতে চান বলেই এর পক্ষপাতী। কিন্তু লোকে তাদের প্রতিনিধিদের চিনতে পারবে না।

রাজনীতিকদের কাণ্ডকারখানা দেখে তাঁদের উপর বিরাগ জন্মানো অস্বাভাবিক নয়। পাকিস্তানের বাইরেও তো রাজনীতিকদের গদিচ্যুত করে কয়েদ করে সৈনিকরাই ক্ষমতা দখল করছেন। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসী ফ্রান্সের মতো উন্নত দেশেও ঠিকমতো চালানো গেল না। সেখানেও তার একটা বিকল্প সংস্করণ প্রবর্তিত হয়েছে। দ্য গলের পরে কী হবে কেউ জানে না। বিচিত্র নয় যে সেনাপতিমণ্ডলী দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা আত্মসাৎ করবে। যেখানে অগণ্য দল, অগণ্য দলপতি সেখানে ফী বছর একটা করে গবর্নমেণ্ট গঠন করে নূতনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়, কিন্তু পলিসির স্থায়িত্ব থাকে না, প্রশাসনও লণ্ডভণ্ড হয়। সেই জন্যে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসীর অলিখিত শর্ত হচ্ছে দুটি মাত্র প্রধান দল রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। এক দল ব্যাট ধরবে, অপর দল বল করবে। দেখা যাচ্ছে সব দেশ রাজনৈতিক ক্রিকেটের উপযুক্ত নয়। আরো একটা অলিখিত শর্ত হচ্ছে দেশের লীডারশিপ নেবার মতো সর্বজনমান্য ব্যক্তি থাকবেন। অন্ততপক্ষে তাঁর নিজের দলের সকলে তাঁকে মানবে। যেখানে এ দুটি অলিখিত শর্ত পূরণ করা সম্ভব নয়, সেখানে শুধু একটা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করলেই পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসী আপনা-আপনি চলে না। পাকিস্তানে পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রেসীর পুনঃ-প্রতিষ্ঠা একান্ত দুরূহ। সেখানে বহু দল, বহু দলপতি। লীডারশিপ নেবার মতো সর্বজনমান্য ব্যক্তি হয়তো ফজলুল হক, কিন্তু তিনি এখন স্থবির। তা ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর প্রভাব নেই। সেইজন্যে আপাতত পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসী পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি তুলে লাভ নেই। ও জিনিস আবার ভেঙে পড়বে। তা হলে কি বেসিক ডেমোক্রেসীই শিরোধার্য করতে হবে? না, তাই বা কেমন করে সম্ভব? ওটা অন্তঃসারশূন্য। রাজনীতিকদের বাদ দিতে গিয়ে ওর থেকে সারবস্তুই বাদ দেওয়া হয়েছে। লেজিস্লেটিভ অঙ্গটা সম্পূর্ণ দুর্বল। আর জুডিসিয়াল অঙ্গটাও বিকল। ওর সর্বত্র এক্জিকিউটিভের জয়জয়কার। তা হলে ওকে শাসনতন্ত্র বলা হবে কেন? শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্যই হলো নিরঙ্কুশকে অঙ্কুশের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ। না, এ শাসনতন্ত্র মাথা পেতে মেনে নেওয়া যায় না।

রাজনীতিকদেরকে ঘর ঠিক করার দায় নিতে হবে। দলসংখ্যা কমাতে হবে। দলপতি সংখ্যা কমাতে হবে। লীডারশিপ নেবার মতো ব্যক্তি খুঁজে

বার করতে হবে। গঠনমূলক কাজ করে জনগণের চিত্তজয় করতে হবে। পাকিস্তানের নেতারা গঠনমূলক কর্মের জন্য বিখ্যাত নন। রাজনীতির খেলা খেলতে গিয়ে মাৎ হয়েছেন। সামনে দীর্ঘ তপস্যা।

(শ্রীরমাপদ চৌধুরীকে লিখিত

আলোকপাত

এক একটা ঘটনার মূল কোথায় জানতে হলে বিশ ত্রিশ বছর উজিয়ে যেতে হয়। নইলে যা পাওয়া যায় তা নিতান্তই একটা সাংবাদিক বা সরকারী রিপোর্ট। কী করে ঘটল তা না হয় গোচর হলো, কিন্তু কেন ঘটল তা তো বোঝা গেল না।

সম্প্রতি মালদহ, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় যে সব মর্মন্তুদ ঘটনা সংঘটিত হলো তার আনুপূর্বিক বিবরণ কোথাও প্রকাশিত হয়নি। সংক্ষিপ্ত সমাচার পড়েছি আর পড়ে স্তম্ভিত হয়েছি "নিউইয়র্ক টাইমসে"র সংবাদদাতা ট্রাম-বুলের রিপোর্ট। রাজশাহী থেকে তিনি ওটি পাঠিয়েছিলেন শরণার্থীদের উক্তি শুনে। বলা বাহুল্য তিনি দোভাষীর সাহায্য নিয়েছিলেন। মালদহে এসে যাচাইও করেননি। জানিনে তিনি রাজশাহী, পাবনা প্রভৃতি জেলায় সংঘটিত ঘটনার রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন কি না। মালদহ থেকে পাঠালে হয়তো সেটা অন্যরকম হতো।

কিন্তু ততঃ কিম্! কেউ যদি ভারতের মুখে চুনকালি মাখায় তো সে চুনকালি পাকিস্তানের মুখেও লাগে। যদি পাকিস্তানের মুখে মাখায় তা হলে ভারতের মুখেও লাগে। সীমান্তের এপারে যে জাতি সীমান্তের ওপারেও সেই জাতি। বাইরের লোক চেহারা দেখে চিনতে পারে না কে ভারতীয় আর কে পাকিস্তানী। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপায়। ইংলণ্ডের পাকিস্তানীদের ব্যবহারের জন্যে জবাবদিহি করতে হয় সেখানকার ভারতীয়দের। ট্রাম্‌বুলের রিপোর্ট পড়ে আমেরিকার সাধারণ মানুষ যদি ভারতীয়দের উপর রাগ করে তো সে রাগটা পড়বে পাকিস্তানীদের ঘাড়েও। হিন্দু ও মুসলমান এত বেশি একই রকম দেখতে যে আমরাই চিনতে পারিনে, যদি পোষাক অভিন্ন হয়। আমেরিকানরা চিনবে কী করে?

নিজেদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত আগেও ছিল। কিন্তু তখন তার জন্যে লজ্জাবোধ ছিল। তার জন্যে দায়ী করা হতো তৃতীয় পক্ষকে। ইংরেজ সরকারকে। এখন আর সে সম্ভাবনা নেই। এখন তৃতীয় পক্ষ আসে রিপোর্ট পাঠাতে। তাতে যে পক্ষেরই বদনাম হোক না কেন আখেরে সেটা অপর পক্ষেরও বদনাম। অবিচ্ছেদ্যভাবে ভারতীয়-পাকিস্তানী জনগণেরই কলঙ্ক।

রাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলে জনগণ তো বিচ্ছিন্ন হয়নি। হবে না। চুনকালি সকলের মুখে লাগে। হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে। ভারতের নাম খারাপ হলে ভারতীয় মুসলমানেরও কি নাম খারাপ হয় না? তেমনি পাকিস্তানের নাম খারাপ হলে সেখানকার হিন্দুরেও ?

মার্কিন সংবাদদাতা সাঁওতালদের উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য বিবরণেও সাঁওতালদের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এপারে পালিয়ে এসেছে যারা তারা প্রধানত সাঁওতাল। তাই যদি হয়ে থাকে, এবারকার হাঙ্গামা ঠিক সাম্প্রদায়িক বা ধর্মগত নয়। ঘটনা ঘটেছে প্রথমত মালদহ-রাজশাহী সীমান্তে। এটারও একটা তাৎপর্য আছে। আমার মনে হয় আমি এমন কিছু জানি যা এর উপর আলোকপাত করবে। সেই জন্যেই লেখা।

ত্রিশ বছর আগে আমি রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট ছিলুম। আমার মহকুমার সবচেয়ে পশ্চিমের থানা ছিল নিয়ামৎপুর। সেটা রাজশাহী জেলার উত্তর-পশ্চিমে। অবশ্য সেকালকার বিচারে। ইতিমধ্যে অনেক অদলবদল হয়েছে। মালদহের এক অংশ রাজশাহীর শামিল হয়ে গেছে। কিন্তু যখনকার কথা হচ্ছে তখন নিয়ামৎপুরের পশ্চিমে ছিল মালদহের নাচোল ও রোহনপুর থানা। মালদহের কোনো কোনো গ্রাম নিয়ামৎপুরের চৌহদ্দি ভেদ করেছিল। তখনকার দিনে রাস্তাঘাটের এমন দুর্দশা ছিল যে নওগাঁ থেকে নিয়ামৎপুরের অধিকাংশ জায়গায় যেতে হলে শীতকালের অপেক্ষায় বসে থাকতে হতো। তার পরে যাওয়া যেত হাতীর পিঠে বা পায়ে হেঁটে। হঠাৎ দরকার পড়লে যেতে হতো রেলপথে রাজশাহী ও নাচোল ঘুরে। বাকীটা গোরুর গাড়ি করে বা পায়ে হেঁটে।

এমন দুর্গম যে থানা সেখানে কে-ই বা সাধ করে যায়? মহকুমা হাকিমরা বছরে একদিন গিয়ে বন্দুকের লাইসেন্স দেখে আসতেন। কেউ কেউ নিজের অসুবিধে বাঁচাতে গিয়ে বন্দুকধারীদের বলতেন মান্দা থানায় হাজিরা দিতে। শুনলুম বিশ বছর কোনো মহকুমা হাকিম নিয়ামৎপুর থানায় সফর করেননি। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা তো আরো দূরে থাকতেন। তাঁদের আরো কষ্ট হতো সেই পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে ক্যাম্প করতে। অথচ প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে অমন রত্নভাণ্ডার আর নেই। হাজার বছরের পুরনো আমলের ইট দেখে মালুম হয় শহর ছিল, রাস্তা ছিল। অসংখ্য মূর্তি দেখে অনুমান হয় মন্দির ছিল। ভাঙা মসজিদের গাঁথনিও বোধহয় গৌড়ীয় সুলতানী আমলের। মানুষের বসতি বিরল। জঙ্গল চার দিকে। উঁচু নিচু মাটি। মাঝে মাঝে গভীর খাদ। এক কথায় ভদ্রলোকের বাসযোগ্য নয়। ডাকঘর একটি কি দুটি। টেলিগ্রাফ অফিস একটিও নেই। রেলস্টেশন অনেক দূরে। হাটবাজার দুর্লভ। ডাক্তার বদ্দি দুষ্প্রাপ্য। থানায় বদলি হওয়া একরকম শাস্তি। বন্দুক দেখতে গিয়ে নিয়ামৎপুর আবিষ্কার করে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। ফিরে এসে তারপরে একদিন খবর পাই সাঁওতালেরা ক্ষেপেছে। খবরটা রাজশাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কানেও পৌঁছয়। ততদিনে মহাত্মা গান্ধী রাউণ্ড টেবিল

কন্‌ফারেন্স থেকে ফিরেছেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়ে গেছে। এবার সরকারপক্ষ ঘোরতর প্রস্তুত। নতুন আন্দোলন দমন করার জন্যে দারুণ অর্ডিনান্স জারি হয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে কল্পনাতীত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতা তিনি খাটাবেন যে, তেমন বিক্ষোভ কোথায়! কী জানি কেন আন্দোলনটা ভিজে দেশলাই কাঠির মতো ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে নিবে গেল। ভালো করে জ্বললই না। ইংরেজরাও অপ্রস্তুত হলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন ভীষণ ব্যাপার হবে।

সাঁওতালরা ক্ষেপেছে শুনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ধরে নিলেন এটা নিশ্চয় আইন অমান্যকারীদের চাল। নিজেরা তো যুদ্ধে নামলেন না, সাঁওতালদের ঠেলছেন। তিনি চাইলেন সরেজমিনে গিয়ে সাঁওতালদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। আমারও তাই ইচ্ছা। দু'জনে মিলে একটা জয়েণ্ট টুর ফেলা গেল। তিনি গেলেন রাজশাহী সদর থেকে। আমি গেলুম নওগাঁ সদর থেকে। আমরা একত্র হলুম মান্দা থানায়। সেখান থেকে নিয়ামৎপুর থানায় যেতে হলে পথে পড়ে হরিপুরের খাড়ি। মাইল দেড়েক রাস্তা জলে ডুবে রয়েছে। সেই জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী মাসেও। অথচ জল এত গভীর নয় যে নৌকা চলবে। হাতীর পিঠেই খাড়ি পাড়ি দেওয়া গেল। তারপর তিনি হাতীর পিঠ থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করে দিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। দুজনেই ইংরেজ। আমি তাঁদের সঙ্গে হাঁটতে গিয়ে তাল রাখতে পারিনে।

অবশেষে একজায়গায় সাঁওতালদের সঙ্গে ভেট। খবর পেয়ে তারাও এসেছিল। তাদের সঙ্গে ছিল মধ্যবয়সী একটি সাঁওতাল মেয়ে। বিধবা বলেই মনে হলো। পুরুষেরা তেমন বুঝিয়ে বলতে পারে না, বাংলা তাদের ভালো করে জানা নেই। মেয়েটিই বার বার তাদের মুখের থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলে। এমন হাত পা নেড়ে এমন উচ্চস্বরে এমন উত্তেজনাভরে যে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বিশ্বাস, সে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছে। বাংলা তিনি বেশ ভালো বলতেন ও বুঝতেন, কিন্তু কেমন করে তাঁর ধারণা জন্মায় যে সাঁওতালদের কেসটা কাঁচা। যত দোষ ঐ মেয়েটার। "অমন একটি নারী যদি প্রেরণা যোগায়," তিনি পরে আমাকে বললেন, "যদি রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয় তবে এমন অপরাধ নেই যা পুরুষমানুষে না করবে।"

সাঁওতালদের বক্তব্যটা সংক্ষেপে এইরকম। নিয়ামৎপুর অঞ্চল তো জঙ্গল হয়ে পড়ে রয়েছিল। জঙ্গল কেটে সাফ করল কারা? বুনোজানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করল কারা? জ্বরজারিতে সাপের কামড়ে মরল কারা? জমিতে প্রথম হাল দিল কারা? আবাদ করল কারা? এই সাঁওতালদের পূর্বপুরুষরাই। দু'তিন পুরুষ ধরে তারা এখানকার জমিকে চাষের যোগ্য করে এসেছে। কিন্তু জোতদার শ্রেণীর লোকেরা তাদের ছলে বলে কৌশলে বেদখল করেছে। সাঁওতালরা খাজনা দিয়ে প্রজা হতেও রাজী। কিন্তু খাজনা ওরা চায় না। প্রজা ওরা চায় না। ওরা খাটিয়ে নেয়, ফসল গোলায় তোলে, ফসলের একটা

ভাগ দিয়ে ভাগিয়ে দেয়। জমিদারের কাছে গেলে জমিদার চড়া সেলামী হাঁকে। সাঁওতালরা কোথায় অত টাকা পাবে! মুসলমানরা দেয়। তারাই জমি দখল করে নেয়।

জোতদার পক্ষের লোকও হাজির ছিল। তারা সাঁওতালদের দাবী স্বীকার করে না। তাদের দিকেই আইন আদালত সেটেলমেণ্টের জরীপ কাগজপত্র দেখায়। কাগজপত্রে সাঁওতালদের অস্তিত্ব নেই। থাকবে কী করে? ওরা আইন আদালতের ধার ধারে না। সেটেলমেণ্ট যে কী জন্তু তাও তারা জানে না। কোথায় যেতে হয়, কাকে কী দিতে হয়, এসব তো শেখেনি, শেখেনি তদ্বির তদারক করতেও। মুশকিলে পড়লে তীর ধনুক নিয়ে মার-মূর্তি ধরেছে। শেষে পুলিশের ভয়ে পালিয়েছে।

সব দেখে শুনে আমার প্রত্যয় হলো যে, অভিযোগের যথেষ্ট কারণ আছে। অপর পক্ষে জোতদারও তো মোটা সেলামী দিয়েছে। এসব জটিল ব্যাপার আপোসে মেটাতে হয়। মেটাতে অনেক দিন লাগে। আমার সাহায্য চাইলে আমি তাতে রাজী। আপাতত কিছুই করবার নেই। দু'পক্ষকে বললুম শান্তি রক্ষা করতে। তারপর স্বস্থানে ফিরে গেলুম।

পরে একদিন শুনে অবাক হলুম যে, সেই সাঁওতাল মেয়েটিকে জেলা থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। দিয়েছেন অর্ডিনান্স অনুসারে। যে অর্ডিনান্স জারি হয়েছে আইন অমান্য আন্দোলন দমন করতে। কেউ হয়তো তাঁর কানে মন্ত্র দিয়েছে যে, সাঁওতালেরা কংগ্রেসওয়ালাদের কথায় নাচছে। কিন্তু সাঁওতালদের সেই রণরঙ্গিণীকে কংগ্রেসের সঙ্গে জড়ানো সম্পূর্ণ অবিশ্বাসযোগ্য। সম্ভবত তিনি ভেবেছেন ও মেয়ে ফরাসীদের জোন অফ আর্ক আর তিনি ইংলণ্ডের রাজা। সাঁওতাল বিক্ষোভ সত্যি থেমে গেল।

এর পরে যা লিখছি সেটা খুব সম্ভব পাঁচ বছর পরের কথা। যখন আমি রাজশাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আবার স জেলায় যাই। একদিন এক রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। খুব অস্পষ্ট মনে পড়ছে তাঁর মুখ, তাঁর কথা। আন্দাজে লিখছি, তিনি সাঁওতালদের নিয়ে কাজ করতেন। নিয়ামৎপুরেও তাঁর যাতায়াত। সাঁওতালদের অভিযোগ তখনো মেটেনি।

তার পর কেটে গেছে পঁচিশ বছর। দেশ কেটে দু'খানা হয়েছে। জানিনে সেই সাঁওতালদের অভিযোগ এতদিনে মিটেছে কি না। যদি না মিটে থাকে তবে তার থেকে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয়।

বিনোবাজী: পূর্ব পাকিস্তানে

বিনোবাজীর পূর্ব পাকিস্তান পদযাত্রা কাল শুরু হয়ে গেছে। রংপুর ও দিনাজপুর জেলার ভিতর দিয়ে তিনি যাবেন। মাত্র দুই সপ্তাহের প্রোগ্রাম। আপাতদৃষ্টিতে সামান্য ঘটনা, তবু অসামান্য। গান্ধীজীর নোয়াখালি যাত্রার পর এর মতো মহৎ ঘটনা আর ঘটেনি। মাঝখানে কেটে গেছে ষোলটি বছর। ষোলটি বছর না এক-আধ শতাব্দী?

রংপুরে আমার এক ডাক্তার বন্ধু বাস করতেন। প্রত্যেক বছর বারুণী তিথিতে তিনি আমাকে স্মরণ করতেন ও চিঠি লিখতেন। সেই তিথিতে আমার জন্ম। বছর কয়েক হলো আর চিঠি আসছে না। তিনি ইহলোকে নেই। কিন্তু যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন রংপুর ছাড়েননি। সেখানকার মুসলমানরা তাঁকে ছাড়বে না। তিনিও তাদের ছাড়বেন না। তিনি জীবিত থাকলে কত সুখী হতেন বিনোবাজীকে দেখে। আর বিনোবাজীও কি সুখী হতেন না তাঁকে দেখে!

শুধু জ্ঞানদানন্দ দাশগুপ্ত নন, তাঁর মতো আরো অনেকের নাম জানি যাঁরা পূর্ব পাকিস্তান ছাড়েননি। যদিও অতি সহজেই পারতেন। তাঁরা থেকে গেছেন মাটির টানে, মানুষের টানে। তাঁরা কোন দিন হিন্দু মুসলমানের বিরোধকে ধ্রুবসত্য মনে করেননি। ধ্রুবসত্য হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের মিলন। কোথায় ছিল আরব, কোথায় ছিল ইরানী, কোথায় ছিল তাতার আর তুর্ক, হাবসী আর পাঠান, মঙ্গোল তথা মুঘল! আর কোথায় ছিল আর্য, দ্রাবিড় ইত্যাদি বহু জাতির সংমিশ্রণে গঠিত হিন্দু! ইতিহাস এদের এমন বেমালুম মিলিয়েছে যে, বিদেশী পোশাক পরলে ও দাড়ি গোঁপ ছাঁটলে কে যে হিন্দু আর কে যে মুসলমান তা চেনা যায় না।

আমার এক বহুদর্শী পাঞ্জাবী মুসলমান বন্ধু বলতেন প্রত্যেক প্রদেশেই সেখানকার হিন্দু আর সেখানকার মুসলমান একই রকম দেখতে শুনতে। ধর্মগত বৈষম্যটা মর্মগত বা চর্মগত নয়। পাঠানরাও মুসলমান, পাঞ্জাবী মুসলমানরাও মুসলমান। তবু মুসলমানে মুসলমানে বিয়ে সাদী নেই। কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদ জেলার এক মুসলমান লেখক আমার সঙ্গে দেখা করে তাঁর উপন্যাসখানির পাণ্ডুলিপি পড়তে দেন। বাঙালী মুসলমান বিহারে গেলে বিহারী মুসলমান বনে যান। লেখক এই নিয়ে পরিহাস করেছেন। এক জায়গায় লিখেছেন বাংলা ভুলে গেলে কী হবে, কাঁদেন যখন তখন বাংলাতেই কাঁদেন। একবার লেখক বিহারে এক উকিলের বাড়ী অতিথি হন। উকিলটি বিহারে থেকে বাংলা ভুলে গেছেন। উর্দুতেই কথাবার্তা বলতে হয়। কিন্তু হঠাৎ অন্তঃপুর থেকে কান্নার রোল শোনা যায়। উকিলও কেঁদে ওঠেন। কোন্ ভাষায়, জানেন? বাংলাতে।

পাকিস্তানী পলেস্তরাসত্ত্বেও বাঙালী মুসলমান বাঙালীই রয়ে গেছে। তার পোশাকী ভাষা হয়তো উর্দু। কিন্তু কান্নার ভাষা তো বাংলা। বিপদে

আপদে শোকে দুঃখে বাঙালী মুসলমানদের কান্না কার বুকে বাজবে? কার অন্তর স্পর্শ করবে? সিন্ধির নয়, পাঞ্জাবীর নয়, পাঠানের নয়। যাকে ব্যাকুল করবে সে বাঙালী হিন্দু। ইতিহাস তো পনেরো বিশ বছরে শেষ হয়ে যায় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে। কান্নার রোল কি কোন দিন উঠবে না? যদি কোনো দিন ওঠে সেদিন বাঙালী মুসলমান বাংলাতেই কাঁদবে আর সে কান্না করাচীতে পৌঁছনোর আগে কলকাতায় পৌঁছবে। আরো আগে পৌঁছবে ঢাকাতে রাজসাহীতে চাটগাঁয় বরিশালে খুলনায় যেখানে এখনো কিছু কিছু বাঙালী রয়ে গেছে।

সত্যিকারের বন্ধু তারাই যারা রাজনীতির সুদিনের বন্ধু নয়। যারা সাধারণ জীবনযাত্রার দুর্দিনের বন্ধু। সে রকম বন্ধু ধর্মের দ্বারা চিহ্নিত নয়। দাশগুপ্ত একজন ডাক্তার। আরো বড় কথা, দাশগুপ্ত একজন হৃদয়বান প্রতিবেশী। একই কথা বলা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের সম্বন্ধে। বিপদে আপদে তাদের কাছে সাহায্য পেয়েছি। ধর্ম নিয়ে তাদের ব্যবহারে তারতম্য হয়নি। আমার জন্মস্থান ওড়িশায়। আমাদের বাড়ীর পিছনের বাগানের বেড়ার ওপারেই মুসলমান। জন্মে অবধি তাদের দেখে এসেছি। আপদে বিপদে আমরাই তাদের বন্ধু, তারাই আমাদের। দুই বাড়ীর দুই কর্তাকে দেখেছি ধর্মালাপ করতে। যদিও একজন ঘোর বৈষ্ণব ও অপরজন ঘোর মুসলমান। কাফের বা যবন কথাটা কখনো মাথায় আসেনি। আমার ছেলেবেলার সবচেয়ে পুরোনো ফটোগ্রাফ তোলা হয় যাঁর কোলে তিনি মুসলমান শিক্ষক। কাকাদের একজন বলেই তাঁকে জানতুম। তখনো হিন্দু মুসলমান ভেদজ্ঞান জন্মায়নি।

ভেদ তা বলে মায়া নয়। ভেদ একটা ছিলই। কিন্তু মানুষ বরাবর চেষ্টা করেছিল তার ঊর্ধ্বে উঠতে মুসলমানের সঙ্গে মুসলমানের যুদ্ধ হচ্ছে। মুসলমান নবাব তাঁর ছেলেকে রেখে যাচ্ছেন যাঁর আশ্রমে তিনি তাঁর বন্ধু হিন্দু মোহন্ত। হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর যুদ্ধেও হিন্দুর ভরসা মুসলমান মাহুত বা অশ্বারোহী। আমাদের সাত শ' বছরের ইতিহাসে কত হিন্দু রাজা মসজিদ গড়িয়ে দিয়েছেন। কত মুসলমান শাসক মন্দির গড়তে সাহায্য করেছেন। বাংলা রামায়ণ মহাভারত রচনা কাদের উৎসাহে হয়েছে? মালিক মুহম্মদ জ্যায়সী ও আমীর খসরু না হলে হিন্দী সাহিত্যের কী হতো?

ভেদের ঊর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা অনেকেই করেছেন, কিন্তু সকলে করেননি। আমাদের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভেদনীতির উদাহরণও রয়েছে। একজন সুলতান কি বাদশাহ অভেদনীতি অনুসরণ করে হিন্দু মুসলমান সবাইকে সমান চোখে দেখলেন। তাঁর পরে একজন এলেন, তিনি ভুলে গেলেন যে তিনি রাজা, তিনি মনে রাখলেন যে তিনি মুসলমান। ভেদনীতির পরিণাম ফলতে সময় লাগে, তিনি হয়তো সে পরিণামের সাক্ষী হলেন না, কিন্তু পরবর্তীরা ভুগলেন। তার পরে আবার দেখা গেল একজন সুলতানকে বা সম্রাটকে অভেদনীতি অনুসরণ করতে। হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী হতে। আমাদের ইতিহাস কেবল

একটিমাত্র ইতিবৃত্ত নয়। মুসলমান বলতে কেবল ভেদনীতিপ্রবণ মুসলমান বোঝায় না। আমার সহকর্মীদের মধ্যে আমি বহু মুসলমানকে জানি যাঁরা অভেদনীতিতে বিশ্বাসী। আর এমন হিন্দুকেও দেখেছি যিনি হাড়ে হাড়ে ভেদনীতিপরায়ণ। এক হাতে তালি বাজে না। এঁরা সেই দ্বিতীয় হাত।

রাজাকে মনে রাখতে হবে যে তিনি রাজা, তিনি হিন্দু কি মুসলমান সেটা পরের কথা। পরের কথাটা আগের কথা হলে সর্বনাশ। রাজপুরুষদের অনেকেরই সেটা মনে থাকে না। কেবল পাকিস্তানে নয়, ভারতেও। সেকুলার স্টেট যখন বলি তখন এই কথাটাই বলতে চাই যে, সবার উপরে মানুষ সত্য। কার্যকালে অসত্য আচরণও কি লক্ষ্য করিনে? দৃষ্টান্তটা ভারতের দিক থেকে যদি আসে পাকিস্তানও একদিন সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। পাকিস্তানের যাঁরা রাজা ও রাজপুরুষ শ্রেণীর লোক তাঁরাও মনে রাখবেন না যে, তাঁরা রাজা। রাজার চোখে সব প্রজাই সমান। এ যদি না হয় তবে পাকিস্তানের ইতিহাসে পরে একদল আসবেন যাঁরা অভেদনীতিতে বিশ্বাসী। তাঁদেরও দিন আসবে। সেই শুভ দিনটির জন্যে ধৈর্য ধরতে হবে পাকিস্তানের হিন্দুদের ও প্রগতিশীল মুসলমানদের।

বিনোবাজীর মিশন রাজরাজড়াদের দরবারে নয়। প্রজা বা নাগরিকদের মেলায়। যেখানেই তিনি গেছেন সেখানেই তিনি শান্তির বাণী, সাম্যের বাণী, অভয়ের বাণী শুনিয়েছেন। এবারেও তাই শোনাবেন। এর ফলে হয়তো দু'পাঁচজন মুসলমানের মনে হবে যে, তারা আগে নাগরিক, পরে মুসলমান, বা আগে মানুষ, পরে হিন্দু। সব সময় নিজেকে হিন্দু ভাবাটা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। সব সময় নিজেকে মুসলমান ভাবাটাও স্বাস্থ্যকর নয়। অস্বাস্থ্যের ব্যাপারীরা এতে আতঙ্কিত হবেন। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের কতক লোক বিনোবার বিরুদ্ধে চিৎকার জুড়ে দিয়েছেন। এদিকেও সেরকম লোক আছেন। হিন্দুদের মধ্যে। কিন্তু তার দরুন বিনোবার পদযাত্রা একদিনও থামবে না। তিনি হাওয়ায় বুনে যাবেন বীজ। ফল ধরবে কবে ও কেমন করে তার মালিক আরেক জন।

শান্তিনিকেতন, ৬ই সেপ্টেম্বর

('জয়শ্রী' সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লীলা রায়কে লিখিত পত্র)

সভ্যতার সংকট ঃ ঘরে

লেখা চেয়েছেন। কিন্তু কী লিখব? এই শুধু জানি যে আমাকে আমার নিজের সাধনায় অতন্দ্র হতে হবে। আজকের দুর্যোগে হয়তো এর কোনো ইউটিলিটি নেই। কিন্তু অসভ্যতার দিনে অন্তত কয়েকজনকে করে যেতে হবে সভ্যতার ফুল ফোটানোর কাজ। বিউটি নিয়ে থাকাটাই তাদের ডিউটি।

এ কথা বলার পর যা বলতে ইচ্ছা করছে তা বলি। আজকের দিনে

কোনো দেশেই কেউ নিরাপদ নয়। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যে নিরাপদ নয় তা তো প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরাই কি নিরাপদ? গুণ্ডার হাতে ধনপ্রাণ হারানোটাই কি একমাত্র বিপদ? যদি দেখেন বাজার বসছে না, বাজারে চাল পাওয়া যাচ্ছে না, শিশুর জন্যে দুধ নেই, ব্যাঙ্ক খুলছে না, টাকা নেই, আপিস খুলছে না, মাইনে নেই, ডাক্তার ডাকা দরকার, ট্রাম বাস টেলিফোন নেই, এমন কি ডাকঘর পর্যন্ত কাজ করছে না, কলে জল আসছে না, ড্রেনে মল নিকাশ হচ্ছে না, মহামারীর বিশেষ দেরি নেই—তা হলে সেটাও কি বিপদ নয়?

তার পর চীনের মনে কী আছে তা চীনের মিতে রাশিয়াও জানে না। ভারত জানবে কী করে! চীন যদি হিমালয় দিয়ে নেমে আসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিরাট এক জনপ্রবাহ যাত্রা করবে উৎকলে ও মধ্যপ্রদেশে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা এলে তাদের নিরাপত্তা বিধান করবে কে? সৈন্যদলের কাজ কি শত্রুর হাত থেকে দেশরক্ষা না আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষা? এর মধ্যে গৌরবের কী আছে যে, কলকাতাকে প্রকৃতিস্থ করার জন্যে মিলিটারিকে ডাক দিতে হলো? একজন মহাত্মা যা করেছিলেন!

তার পর পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবে না এমন কোনো নিশ্চয়তা কোথায়? যদি বাধে তা হলে যুদ্ধের ফুটবল কখনো গড়িয়ে যাবে ওদিকে, কখনো গড়িয়ে আসবে এদিকে। সেই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদেরই অদ্যভক্ষ অবস্থা হবে। বাড়ীতে বাড়ীতে স্বদেশের সৈনিক এসে বসবে। সে যদি সাময়িকভাবে হটে যায় বিদেশের সৈনিক এসে বসবে। কে কাকে বলবে, পশ্চিমবঙ্গে চলে এসো, তাহলেই তুমি নিরাপদ?

ওপারের প্রতিশোধ এপারে নেওয়া যায় না। যাদের উপর নেওয়া যাবে তারা গুণ্ডা নয়। তারা সম্পূর্ণ নিরপরাধ। রহিম খুন করছে বলে করিমের ফাঁসী হবে এটা রামরাজ্যে বিচার নয়। রহিম আর করিম দু'জনের ধর্ম এক বলে যদি রহিমের বদলে করিমকে সাজা দিতে হয় তবে উদোর অপরাধের জন্যে বুদোর শাস্তিটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়াবে। বামুন মেরেছে নমঃশূদ্রকে, সুতরাং যে কোনো নমঃশূদ্র মারবে যে কোনো বামুনকে। অসমীয়া মেরেছে বাঙালীকে অতএব যে কোনো বাঙালী মারবে যে কোনো অসমীয়াকে। বলা বাহুল্য মারটা যখন দেওয়া হয় তখন আত্মরক্ষার সুযোগটুকুও দেওয়া হয় না। আদালতে খুনের আসামীরও আত্মরক্ষার সুযোগ থাকে, কিন্তু জনপথে গরিব ফেরিওয়ালার সে সুযোগ নেই। যে রাজ্যে এ জিনিস চলে সে রাজ্যে আইন কানুন টিকতে পারে না। দেশ অরাজক হয়।

আমরা ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিজম গড়তে যাচ্ছি। কিন্তু বনিয়াদটাই কাঁচা। সমাজতন্ত্র হবে যে, সমাজ কোথায়? সমাজ বলতে বোঝায় শৃঙ্খলা। যেখানে শৃঙ্খলার অভাব সেখানে সমাজেরই অভাব। মানুষ তো বেশীদিন ওভাবে বাঁচতে পারে না, তাই মিলিটারিকে ডাকে, ডিকটেটরকে মসনদে বসায়। আমরা যদি আরো বর্বর হই ডিকটেটরশিপ আছে আমাদের বরাতে।

পাকিস্তানে তো অনেক আগেই ও জিনিস হয়েছে। এখনো তার জের চলেছে গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে। ওদের ওটা সত্যিকার গণতন্ত্রই নয়।

অন্যান্য বারের মতো এবারেও শুনছি, লোকবিনিময় করা হোক। তার মানে দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নেওয়া হোক। কার হার হলো তাতে? কার জিৎ হলো? এরূপ পরাজিত মনোভাব যাদের তারা স্বাধীনতা রক্ষা করবে কী করে? তৃতীয় পক্ষ এসে আবার দেড় শ' বছর রাজত্ব করবে। আর দ্বিজাতিতত্ত্বই যদি মেনে নিলে তবে কাশ্মীর রাখতে চাও কেন? কাশ্মীর ছেড়ে দিলেই তো সব গোলমাল থেমে যায়।

আমরা সবাই জানি যে হিন্দু হিসাবে কাশ্মীরের উপরে আমাদের দাবী নেই, দাবী আমাদের ভারতীয় হিসাবে। আর ভারতীয় বলতে বোঝায় আবহমানকাল থেকে যারা ভারতে বাস করছে। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে বলে তারা তাদের ভারতীয়ত্ব ত্যাগ করেনি। তাদের কতক যদি নিজেদের ভিন্ন জাতি ভাবে তবে সেই অবোধদের জন্যে সুবোধদের পাকিস্তানে পাঠানো যায় না বা তাদের জন্মভূমি কাশ্মীরকে পাকিস্তানের পাতে তুলে দেওয়া যায় না। কাশ্মীর রাখতেই হবে। মুসলমানকেও রাখতেই হবে। নইলে আমরা ভারতীয় নামের অযোগ্য হব।

প্রতিকার কী? প্রতিকার আর যাই হোক ভারতীয় মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ নয়। কিংবা ভারতমাতাকে তাঁর মুসলমান সন্তানদের থেকে বঞ্চিত করা নয়। পাকিস্তান সেদিন হয়েছে, কতদিন টিকবে বলা যায় না। সাময়িক একটা উৎপাতের হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় চিরকালের প্রতিবেশীকে পর করে দেওয়া যায় না। পাকিস্তানও আমাদেরই দেশ। সে যদি স্বেচ্ছায় পর হয়ে থাকে আমরা তার জন্যে দ্বার খোলা রাখব। আমরা যখন বলি সেকুলার স্টেট তখন আমরা এই কথাই বোঝাতে চাই যে আমাদের দরজা খোলা। পাকিস্তান, তুমি যদি কোনো দিন ফিরে আসতে ইচ্ছা কর তা হলে দেখবে ভারতীয় ইউনিয়নে তোমারও স্থান আছে। শুধু কাশ্মীরের নয়। তোমাকে আমরা সাধতে যাব না, কিন্তু তোমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেব না।

ভারতবর্ষ বার বার খণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু লোকবিনিময় কখনো হয়নি। লোকবিনিময় হলে সেই খণ্ডন চূড়ান্ত। আর তাকে জোড়া দেওয়া যায় না। কতক ধর্মান্ধ মুসলমান ভুল করে পৃথক রাষ্ট্র পত্তন করেছে বলে আমরাও ভুল করে সেই রাষ্ট্রকে আফগানিস্থান বা ইরানের মতো সর্বতোভাবে মুসলিম হতে দেব না। এখনো সেখানে এক কোটির মতো হিন্দু রয়েছে। সেইজন্যে তার চারিত্র্য আফগানিস্থান বা ইরানের মতো অমিশ্র নয়! ভারতের মতো বিমিশ্র। সংস্কৃতি কি ধর্মের চেয়ে কম সত্য? ভাষা কি ধর্মের চেয়ে কম সত্য? একদিন এসব সত্যও কথা কইবে। ধর্ম একাই এতদিন কথা কয়ে এসেছে। অন্যেরা সুযোগ পায়নি। তারাও সুযোগ পাবে। পেতে আরম্ভ করেছে। বাংলাভাষার জন্যে বাঙালী মুসলমান জান দিয়েছে। বাংলা এখন

পাকিস্তানের দুটি রাষ্ট্রভাষার একটি। উর্দুর সঙ্গে তার সমান মর্যাদা। ডাকটিকিটে বাংলা দেখতে চান তো পাকিস্তানের ডাকটিকিট দেখুন। ভারতে আমাদের ভাষা এখনো ন্যাশনাল হতে পারল না, রয়ে গেল আঞ্চলিক।

অর্থ কি ধর্মের চেয়ে কম সত্য? অর্থনীতিও একদিন কথা কইবে। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য করে লাভবান হবে না, হবে ভারতের সঙ্গে বর্মার সঙ্গে বাণিজ্য করে। সেই সূত্রে কাছে আসবে। কমন মার্কেট করবে। পশ্চিম পাকিস্তান বাধা দিতে গেলে বাধা মানবে না। তার পর ভূগোলও একদিন কথা কইবে। ভূগোলের সঙ্গে চাতুরী খাটে না। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের দেড় হাজার মাইল ব্যবধান। প্রধানত এই কারণেই বেশীদিন এক রাষ্ট্রের শরিক হওয়া চলবে না। পৃথক হতেই হবে। মানুষের ইতিহাসে ষোল সতেরো বছর কিছুই নয়। আমরা ধৈর্য ধরব। প্রতিকার কি আজ এখনি না হলে নয়?

("বসুমতী" সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র)

পাণ্ডববর্জিত দেশ

ভাবছি বইকি। না ভেবে উপায় আছে? হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত। বাংলাদেশের দুই প্রান্তে সাম্প্রদায়িক প্রাণহানি। লুটতরাজ। গৃহদাহ। লক্ষ লক্ষ টাকার বই ও লক্ষ লক্ষ মণ ধান অগ্নিসাৎ। সেই সঙ্গে সংস্কৃতি ও সভ্যতা ধূলিসাৎ। যথারীতি লোকবিনিময়ের উদ্যোগ। পূর্ববঙ্গ ত্যাগের জন্যে আকুলিবিকুলি। জনস্রোত।

কাশ্মীর নিয়ে যুদ্ধ, কিন্তু কাশ্মীরের মাটিতে হচ্ছে না। হচ্ছে বাংলা-দেশের শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে, বন্দরে বন্দরে। অন্তরে অন্তরে। এর ফলে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কতটুকু নিকটতর হলো জানিনে, কিন্তু বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের জীবন আরো দুর্বহ হলো। জাতি হিসাবে আমরা আরো দুর্বল, আরো দীনহীন, আরো পরনির্ভর হলুম। যা নিয়ে আমাদের গর্ব— সাহিত্য ও শিল্প—তার আধারটাই আমরা নিজেরাই ধ্বংস করে দিলুম।

সরকার যথাসাধ্য ক্ষতিপূরণ করবেন। কিন্তু কিসের ক্ষতিপূরণ? এমন ক্ষতি আছে যার পূরণ নেই। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে বিশ্বাস করে একরাষ্ট্রে থাকতে পারবে কি? তার জন্যে লাগবে শুধু পুলিশের লাঠি নয়, মিলিটারির সঙীন। এক পাড়ায় বাস করার সাহস ক'জনের হবে! এ যেন নদীর তীরে বাস ভাবনা বারো মাস। বিশ্বাস বা আস্থা হচ্ছে অত্যন্ত ভঙ্গুর একটি পাত্র। ফুটো হলে বা ফেটে গেলে সহজে জোড়া লাগে না।

মানুষের হৃদয়ও তেমনি ভঙ্গুর। কেমন করে মানুষ ভালোবাসবে মানুষকে, যদি সে পরকে আপন ভেবে আপনার লোককে পর করে দেয়? সাত শ' বছর

যে তোমার সুখদুঃখের সাথী, হয়তো আরো সাত শ' বছর সাথী হতে পারত, তাকেই তুমি পর করে দিলে রাওলপিণ্ডির বা করাচীর ইঙ্গিতে। তোমার দুর্দিন কি কোনোদিন আসবে না? সেদিন কে তোমার প্রকৃত বন্ধু হবে? বাঙালী হিন্দু না পশ্চিমা মুসলমান?

তেমনি বাঙালী হিন্দুরও প্রকৃত বন্ধু বাঙালী মুসলমান। কী করে আমি এদের বোঝাব যে ইতিহাস যোল-সতেরো বছরে শেষ হয়ে যায় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী রয়েছে সামনে। হিন্দুও থাকবে, মুসলমানও থাকবে। একটাই জাতি, একই নিয়তি। সাময়িকভাবে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে, তার পরিণাম হাড়ে হাড়ে অনুভব করে বিচ্ছেদেও একদিন অনিচ্ছা আসবে। বই পড়ে শেখে ক'জন! অধিকাংশ লোক শেখে হাতে-কলমে। আগুনে হাত দিয়েই শেখে যে আগুনে হাত দিতে নেই।

অন্তত কয়েকজন থাকবেন যাঁরা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ও মুসলমানের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁরা হাজার আঘাত পেলেও ভবিষ্যতের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। বর্তমান থেকেই ভবিষ্যতের উদ্ভব। সুতরাং বর্তমানের উপরেও এক চোখ রাখতে হবে বইকি। তা বলে তারা একচোখো হবেন না। রাজনীতিকদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ যিনি বর্তমানের প্রতি মনোযোগী হয়েও ভবিষ্যতের ধ্যাননিমগ্ন। তেমনি সাংবাদিকদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ যিনি বর্তমানের প্রতি সতর্ক, অথচ ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর। সাহিত্যিকদেরও তেমনি বর্তমান আর ভবিষ্যৎ দুই দিকে নজর রাখতে হবে।

এ কখনো সত্য হতে পারে না যে পূর্ববঙ্গের সকলেই উন্মত্ত বা সকলেই হিন্দুবিদ্বেষী। এই তো কয়েকজন প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন যে তাঁরাই পূর্ববঙ্গের হৃদয়। সে হৃদয় হিন্দুকেও ভালোবাসে, হিন্দুকেও বাঁচাতে চায়। বিজ্ঞাপনটা কিন্তু পাষণ্ডরাই একচেটে করল। পশ্চিমবঙ্গেও তাই। আমি বন্দনা করি পূর্ব ও পশ্চিমের দরাজ হৃদয়কে। বন্দনা করি আমীর হোসেন চৌধুরীকে, মিশ্রীলালকে, আরো কয়েকজন অনামা শহীদকে। আমি বন্দনা করি সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়কে। উৎপল দত্তকে। তাঁদেরই মতো মানবপ্রেমিকদের।

এ যদি সত্য হয়ে থাকে যে বাংলাদেশ এক ও অবিভাজ্য তাহলে একদিন না একদিন সেই সত্যের জয় হবে। আমরা হয়তো দেখে যেতে পারব না সে দৃশ্য। তবু তার ধ্যান করব। সেই যে আমাদের চিরকালের বাংলাদেশ তাতে হিন্দুও থাকবে, মুসলমানও থাকবে, খ্রীস্টান বৌদ্ধরাও বাদ যাবে না। তাই যদি হয় তবে আজকের এই ছিন্নমস্তা দেবীকে আপনার রক্ত আপনি পান করতে দেখে উদ্‌ভ্রান্ত হব না। এটা সত্যরূপ নয়।

তবে এটাও ঠিক যে দেশটা ক্রমে পাণ্ডববর্জিত হয়ে উঠছে। যেমন পূর্ববঙ্গ তেমনি পশ্চিমবঙ্গ। বাঙালীকেই বাঙালীর হাত ধরে তুলতে হবে। মুসলমানকে হিন্দুর হাত। হিন্দুকে মুসলমানের হাত। এপারের সাহিত্যিকরা যে যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন সেটি এই ধরনের কাজ। তেমনি

ওপারের সম্পাদকরা যে যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন সেটিও। দুই প্রান্তের লেখকদের দিয়ে কি মিলিতভাবে কিছু করা যায় না? নিশ্চয়ই করা যায়, কিন্তু করতে গেলে পূর্ব পাকিস্তান সরকার বাধা দেবেন। একসঙ্গে মিলে মিশে কিছু করা তাঁদের মূলনীতিবিরুদ্ধ। অমন করলে দুই 'জাতি' এক হয়ে যাবে। এদিকেও বাধা পাওয়া যাবে সরকারের কাছ থেকে নয়। বিক্ষুব্ধ জনমতের কাছ থেকে। পূর্ব পাকিস্তান যে অন্যায় করেছে তার বেলা কী হবে?

এই পরিস্থিতি যদি বেশীদিন গড়ায় তাহলে একদিকে অন্যায়বোধ তীব্রতর হবে। আর ওদিকে যারা অসহায় বোধ করছে তাদের অসহায়তাবোধ হবে গভীরতর। আমরা লেখকরা এর কী করতে পারি? আমরা এমন কোনো মন্ত্র জানিনে যা দিয়ে অন্যায়ের হাতে হাতে প্রতিকার হয়। আর অসহায় অসহায়াদের উদ্ধার হয়। আমাদের হাতে যা আছে তার নাম তলোয়ার নয়, তার নাম কলম। শোনা যায় কলম নাকি তলোয়ারের চেয়ে প্রবল! হতে পারে, কিন্তু এই অবস্থায় নয়। আর তলোয়ারও কি এ ক্ষেত্রে কাজে লাগবে? যুদ্ধঘোষণা করলে সৈনিকরা চলে যাবে সীমান্ত রক্ষা করতে। শহর রক্ষা করার ভার পড়বে পুলিশের উপর। গ্রাম রক্ষার ভার চৌকিদারের উপর। এরা কি সংখ্যালঘুদের ধনেপ্রাণে বাঁচাতে পারবে? পূর্ব বা পশ্চিমবঙ্গের কোনোখানেই যথেষ্ট পুলিশ বা চৌকিদার নেই।

সংখ্যালঘুদের একমাত্র ভরসা সংখ্যাগুরুদের শুভবুদ্ধি। যেমন এখানে তেমনি ওখানে। বাঙালী হিন্দু-মুসলমান যদি পরস্পরকে মেরে সাবাড় করতে চায় তবে কে বাঁচবে? যদি সীমানা পার করে দিতে চায় তবে কে ঠেকাবে? শান্তির সময়েও দেখা গেল পুলিশ পেরে উঠছে না, মিলিটারি এসে না থামালে এপারে বা ওপারে কোনো পারেই থামত না। যুদ্ধকালে কে থামাবে? আমরা গান্ধীজীর কাছ থেকে শিখিনি। কেমন করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলবানের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করতে হয় তা জানিনে। শান্তিসেনা যদি বা গঠন করা গেল তাকে ঠিক সময়টিতে ঠিক জায়গাটিতে পাওয়া গেল না। এত বড় একটা দায় দু'চারজন আদর্শবাদীর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। রাজনীতিকদের এ দায় নিতে এগিয়ে আসা উচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা আসেন না।

সুতরাং যা হবার তা হবেই। মানুষ মরবে, ঘর পুড়বে, সম্পত্তি লুট হবে। আমার ধারণা ছিল এটা শুধু গুণ্ডাদেরই কাজ। কিন্তু ইতিমধ্যে নানা সূত্রে জানতে পেরেছি ভদ্রলোকের ছেলেরা, এমন কি বড়রাও এতে লিপ্ত। এ জাতিকে বাঁচাবে কে? গুণ্ডাকে কেমন করে দমন করতে হয়, সেটা জানা। কিন্তু এই শ্রেণীর অপরাধীদের শাসন করার কৌশল অজানা। আমরা লেখকরা দমন বা শাসন কর্মে অক্ষম। উদ্ধার কর্মে অসমর্থ। আমরা বড়জোর লিখতে পারি, লিখে অপ্রিয় হতে পারি। তাই বা ক'জন হতে রাজী? লেখকদের হাতে অন্য কাজ। সৃষ্টির কাজও তো কাউকে না কাউকে করতে হবে। শিল্পী

যেন গর্ভিণী নারী। তাকে গর্ভ রক্ষা করতে হবে। যেখানে ঘোরতর অন্যায় সেখানে সে নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকলে তারও বিবেকে বাধে, কিন্তু সে যদি তার গর্ভ রক্ষা না করে সেটাও কি কম ভাবনার কথা!

৫ই ফেব্রুয়ারি

(শ্রীসিদ্ধেশ্বর সেনকে লিখিত পত্র)

নক্ষত্রের আলো

প্রথমে শ্রীনগরে, তার পরে খুলনায়, তার পরে কলকাতায় ও তার পরে ঢাকায় যেসব ঘটনা ঝড়ের বেগে ঘটে গেল তাদের পূর্ণাঙ্গ চিত্র এখনো আমি পাইনি। নানাজনের মুখে যা শুনেছি আর চিঠিতে যা পড়েছি তার সঙ্গে খবরের কাগজের বিবরণ ও রেডিওর সমাচার জুড়ে মোটামুটি একটা নকশা এঁকে নিচ্ছি। আপনি তাতে আরো এক পোঁচ কালি বুলিয়ে দিলেন। এ কালি কোনোরকম চুনকামেই মুছতে পারে না।

দাঙ্গা যারা করেছে তারা গবর্ণমেণ্টের মুখ চেয়ে করেনি। দাঙ্গা যারা থামাতে গেছে তারাও গবর্ণমেণ্টের মুখ চেয়ে যায়নি। যে যার অশুভবুদ্ধি বা শুভবুদ্ধির প্রেরণায় চালিত হয়েছে। অসহায় বোধ করেছে কেবল তারাই যাদের ধারণা নিজেদের একটা গবর্ণমেণ্ট হয়েছে বলে সে গবর্ণমেণ্ট সর্বশক্তিমত্তার সনদ পেয়েছে। স্বরাজ মানে সর্বশক্তিমত্তা নয়। বার্লিন শহরের মাঝখানে একটা দেয়াল দেওয়া হয়েছে। নদীর মাঝখানেও একটা কাল্পনিক দেয়াল দিয়ে নৌকায় চড়ে পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র সীমান্তরক্ষী। চোখের সুমুখে যা ঘটে যাচ্ছে তা অসহায় হয়ে দেখছেন এ-পক্ষের বা ও-পক্ষের গবর্ণমেণ্ট। তারপর যথারীতি প্রতিবাদ। তার যথারীতি উত্তর প্রত্যুত্তর। ইতিমধ্যে নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। চোখের জলও কি শুকিয়ে যায়নি?

আগেকার দিনে আমরা যাকে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে জানতুম এ জিনিস সে জিনিস নয়। এখন দু'দিকে দু'টো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হয়েছে। পাকিস্তান ছোট বলে কম স্বাধীন বা সার্বভৌম নয়। তার মনে সমস্তক্ষণ সন্দেহ ভারত হয়তো তাকে কম স্বাধীন বা সার্বভৌম মনে করে। ভারত সরকার এটা জানেন বলেই তার সঙ্গে সাবধান হয়ে ব্যবহার করেন। কিন্তু ভারতীয় জননায়কদের ব্যবহার সব ক্ষেত্রে সাবধান নয়। তাঁদের অনেকের বিশ্বাস যে পাকিস্তান যখন ছোট তখন তার উপর চাপ দেওয়া সম্ভব ও সঙ্গত। ভারত সরকার চাপ দিতে পারতেন, দিচ্ছেন না তার কারণ তাঁদের তোষণনীতি বা মুসলিম-প্রীতি। ওদিকে পাকিস্তানী জননায়কদের অনেকের ধারণা ভারত যখন বড় তখন পাকিস্তানের উপর চাপ দেবার প্রলোভন সংবরণ

করতে পারবে না। তাকে সংযত করতে হলে চাই আরো মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। আরো জবরদস্ত মিত্র। মার্কিন জোগাবে অস্ত্রশস্ত্র। চীন হবে মিত্র।

এই যে চাপ দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার বা একে পাল্টা চাপ দিয়ে প্রতিহত করার প্রস্তাব এর কোনো শেষ নেই। সেইজন্যে গান্ধীজী প্রথমত চেয়েছিলেন একটাই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। সেটাও যখন সম্ভব হলো না তখন দ্বিতীয়ত চাইলেন দুই রাষ্ট্রের একটাই সৈন্যদল, কিংবা দুই সৈন্যদলের একটাই কমান্ড। সেটাও যখন সম্ভব হলো না তখন তৃতীয়ত চাইলেন যে ভারত পাকিস্তান যে যার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান করবে ও পাকিস্তানের জন্যে অপেক্ষা না করে ভারত তার আপন কর্তব্য অবিচলিতভাবে করে যাবে। ভারত সরকারকে যে নীতি নির্দেশ করা হলো সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হলো কি না দেখে তিনি নোয়াখালিতে ফিরে যাবেন ও সেখানকার কর্তৃপক্ষকে দিয়ে অনুরূপ নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়ে নেবেন এই ছিল তাঁর সংকল্প। বেঁচে থাকলে তিনি নোয়াখালিতেই 'করতেন কিংবা মরতেন'। করতে পারলে আজকের এই সমস্যার উদয় হতো না। মরলেও কিছু সুফল ফলত। পাকিস্তানের বিবেকীদের মনে একটা দাগ থেকে যেত। যেখানে বিবেক কাজ করছে না সেখানেও বিবেক সাড়া দিত।

গান্ধীজী যে নীতি নির্দেশ করেছিলেন তার চেয়ে ভালো কিংবা কার্যকর নীতি আমার জানা নেই। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করে আমিও সেই একই নীতিতে উপনীত হই। এদিকে ভারত সরকার ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যের সরকারকে দিয়ে সংখ্যালঘুদের ধন প্রাণ ও মান রক্ষা করবেন, পাকিস্তানের জন্যে অপেক্ষা করবেন না। ওদিকে গান্ধীজীর মতো কয়েকজন সত্যাগ্রহী নোয়াখালিতে তথা পূর্ববঙ্গের জেলাতে জেলাতে 'করবেন কিংবা মরবেন'। বুকে হাত দিয়ে বলবার সময় এসেছে, সত্যি কি ভারতের প্রত্যেকটি জায়গায় গান্ধী নির্দিষ্ট নীতি পালন করা হয়েছে এতদিন? না মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে? আর নোয়াখালিতে ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলায় গান্ধীজীর মতো সত্যাগ্রহীরা কি অনবরত কাজ করে যাচ্ছেন? মাঝে মাঝে প্রাণ বিপন্ন করেছেন কি?

পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে কয়েকজন এই সম্প্রতি হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে স্বধর্মীর হাতে মৃত্যু বরণ করেছেন। একজনের নাম জানতে পেরেছি। জনাব আমীর হোসেন চৌধুরী। সুপরিচিত লেখক ও সমাজ-সেবী। ঢাকার নবাবপুরে দিনেদুপুরে পশ্চিমা মুসলমান দাঙ্গাবাজের হাতে নিহত হন। ইনি অমর। শান্তি মিছিল বার করতে গিয়ে আরো কয়েকজনও অমর হয়েছেন। সবাই মুসলমান। এঁরাই প্রকৃত ধার্মিক। এঁরাই ইসলামকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচালেন। এদিকে হিন্দুত্বকেও কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করেছেন মিশ্রীলালের মত ধার্মিক তথা অমর। এই অন্ধকার মেঘলা রাত্রে আমরা পথ দেখতে পাচ্ছি এখানে ওখানে জ্বলতে থাকা এরকম সাত আটটি তারার আলোয়। এঁরাই সবচেয়ে সংখ্যালঘু। এঁরা অভয় দিয়ে গেলেন যে, সংখ্যালঘুদেরও সহায় আছে, তারা একেবারে অসহায় নয়।

পূর্ববঙ্গে আমি অনেক দিন কাজ করেছি। পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। এমন গ্রাম আছে যেখানে রাস্তাঘাট নেই। পুলিশ সহজে পৌঁছতে পারবে না। তা ছাড়া একটা থানায় ক'জনই বা কনস্টেবল। হাজার ঘর মুসলমানের মাঝখানে পাঁচ সাত ঘর হিন্দু বাস করছে কার উপর ভরসা করে? পুলিশের উপর না প্রতিবেশীর উপর? হিন্দুর বিপদে আপদে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানই সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তেমনি মুসলমানের আপদে বিপদে হিন্দু। এর মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক চুক্তি নেই। এটা মানুষের ধর্ম। তাছাড়া লৌকিক হিন্দুধর্মের সঙ্গে লৌকিক মুসলমান ধর্মের ঘরোয়া একটা রফা বহু শতক ধরে চলে এসেছে। নিরক্ষর হিন্দু মুসলমান এটা মানে। লেখাপড়া শিখলেই পুঁথিপত্র এসে সব গোলমাল করে দেয়। কিংবা মোল্লা এসে ভেদ-রিপু জাগিয়ে যায়। ধর্মের সঙ্গে যদি রাজনীতি যোগ দেয় তবে আর রক্ষা নেই।

রাজনীতি ঢুকল নির্বাচনের সূত্র ধরে। মুসলমানের আলাদা একটা নির্বাচকমণ্ডলী। তার থেকে যিনি নির্বাচিত হবেন তিনি যদি বলে বেড়ান ইসলামের মহাবিপদ তা হলে মুসলমানের মনে ভেদরিপু জাগবেই। কতক মুসলমান তা সত্ত্বেও মুসলিম লীগকে ভোট দেয় না। কৃষক প্রজা পার্টিকে দেয়। তখন পাকিস্তানের নামে ভোট চাওয়া হলো। নিজেদের নবাব বাদশারা ফিরে আসবেন, শুধু একটা ভোটের অপেক্ষা। ভোট না দেবে কোন্ মুসলমান? তার পরের ধাপটি ডাইরেক্ট অ্যাকশন। সাধারণ দাঙ্গা নয়। একপ্রকার যুদ্ধ। যুদ্ধের দ্বারা যেটা স্থির হবার কথা সেটা ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ফলে স্থির হলো। এক বছর যেতে না যেতেই দেশ ভাগ হয়ে গেল, প্রদেশ ভাগ হয়ে গেল।

ঐতিহাসিক ১৫ই আগস্টের দিন সাতেক আগে আমি পূর্ববঙ্গ থেকে বদলি হয়ে আসি। তখনো আমি সেখানকার হিন্দুদের মনে সন্ত্রাস দেখিনি। পাঞ্জাবের সঙ্গে বাংলার তুলনাই হয় না। তবে একথাও আমি শুনে আসি যে কলকাতায় যদি মুসলমানদের উপর আক্রমণ হয় তবে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। কলকাতার হিন্দুরা নাকি ১৫ই আগস্টের দিন ভেবেছে যে সারা বছরের শোধ নেবে। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতাদের আপ্রাণ প্রয়াস সার্থক হলো। সেদিন যা ঘটল তা বিজয়ার কোলাকুলি। কলকাতায় শান্তি, সুতরাং পূর্ববঙ্গেও শান্তি। শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেন যিনি তিনি গৃহবিবাদের উপর যবনিকা টেনে দিলেন। সেদিন গান্ধীজীও চান নি, কোনো পক্ষের কোনো নেতাই চাননি যে, সব হিন্দু এপারে চলে আসে ও সব মুসলমান ওপারে চলে যায়। তাই যদি হত তবে তার উপযোগী লগ্ন ছিল ১৫ই আগস্ট। সেদিন যদি কলকাতায় হিন্দুরা উন্মত্ত হয়ে দলবদ্ধভাবে হানা দিত তা হলে পুলিশের এত জোর ছিল না যে বাধা দেবে, মুসলমানদেরও এত জোর ছিল না যে রুখবে। হাজার হাজার মুসলমান কাটা পড়ত, যারা বাঁচত তারা পালাত, যারা পালাত তারা নাচাত, সঙ্গে সঙ্গে ওপারেও শুরু

হয়ে যেত হিন্দু নিধন ও বিতাড়ন। এক মাসের মধ্যেই এক কোটি লোক এসে পঞ্চাশ লাখ লোকের ঘরবাড়ি মসজিদ দখল করে বসত। কোথায় মিলিটারি যে বাংলার হিন্দু-মুসলমানকে সে সংকটে ত্রাণ করত! তার বদলে ছিলেন এক মহাত্মা। তিনি একাই এক ডিভিজন সৈন্য। মাউণ্টব্যাটেন বলেন, 'ওয়ান-ম্যান বাউণ্ডারি ফোর্স।'

সেই যুগসন্ধি চিরকালের মতো উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সরকারের উদ্যোগে প্ল্যান করে লোকবিনিময় হয় না। হতে পারে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে কতক লোককে সীমান্ত পার করে দেওয়া। ওদিক থেকে আসবে এক দল। এদিক থেকে যাবে আরেক দল। কিন্তু তার ফলে কোনো স্থায়ী সমাধান হবে না। দু'দিকেই থেকে যাবে অধিকাংশ সংখ্যালঘু। মাঝখান থেকে পঙ্গু হবে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সামাজিক অর্থনৈতিক সংগঠন। মানুষ তো রাক্ষস হয়ে যাবেই, শহরে ও গ্রামে প্রবর্তিত হবে জঙ্গল আইন। আর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এমন এক জাতিবৈর সৃষ্টি হবে, যার জের চলবে পুরুষানুক্রমে। প্রতি দশ বিশ বছর অন্তর দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধবে, দফায় দফায় লোকবিনিময় হবে। পাঞ্জাবের যা হবার তা এক দফাতেই হয়ে চুকেছে। বাংলার যা হবার তা সাত দফাতেও সারা হবে না।

কিন্তু কেন? সত্যি কি এর কোনো দরকার আছে? দেশভাগ হয়েছে বলে কি লোকবিনিময়ও ঘটা উচিত? অনেকের মনে এখনো এই যুক্তি কাজ করছে। মুসলমানরা কেন এ রাষ্ট্রে বাস করবে? এটা তো ওদের স্থান নয়। এ মনোভাব এখনো সক্রিয়। বলা বাহুল্য এঁরা শিক্ষিত সজ্জন। এঁদের সঙ্গে তর্ক করতে গেলেই এঁরা প্রশ্ন করেন, তা হলে দেশ ভাগ হলো কেন? ইতি-মধ্যেই এঁরা ভুলে গেছেন যে, দেশ ভাগ না হলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস রাজত্বে বাস করতে হতো না। হতো নিখিল বঙ্গে মুসলিম লীগ রাজত্বে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে কতবার রাজায় রাজায় দেশ ভাগ হয়েছে। কই, লোকবিনিময় তো হয়নি? এই প্রথমবার আমরা দেখতে পেলুম পাঞ্জাবে ও সিন্ধুপ্রদেশে সে রকম একটা অনর্থ ঘটে গেল। সেটা রাজায় রাজায় একমত হয়ে লোকবিনিময় নয়। সেটা আপনা-আপনি ঘটে যাওয়া একটা ব্যাপার। তাতে করে প্রমাণ হলো না যে ভারতে মুসলমানের স্থান নেই। তাই যদি হবে তো কাশ্মীরের উপরে আমাদের কিসের দাবী? ভারতের সংবিধান হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান ভেদ স্বীকার করে না। সমাজে এসব থাকতে পারে, রাষ্ট্রে এসব নেই। সংবিধান রচনার চোদ্দ বছর বাদে হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটেছে বলে কি আমরা সংবিধানের নির্দেশ উপেক্ষা করব?

মুসলমানকে বিদায় করা চলতে পারে না, এটা এখন স্বতঃসিদ্ধ। তা হলে লোকবিনিময় কথাটার কোনো অর্থ হয় না। যাবে না একজনও, আসবে এক কোটির মতো লোক। এতগুলি পাকিস্তানী ন্যাশনালকে তাদের রাষ্ট্র আসতে দেবে কি না সন্দেহ। একবার একটা রাষ্ট্রের নাগরিক হবার পর সহজে নিষ্কৃতি নেই। ভারতীয়দের অনেকে ইংলণ্ডের নাগরিক হয়েছেন। ভবিষ্যতে

যদি আবার যুদ্ধ বাধে তো কনস্ক্রিপশন থেকে অব্যাহতি পাবার আশায় তাঁরাও হয়তো চাইবেন ভারতে পালিয়ে আসতে। সে সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি রাজী হবেন তাঁদের ছাড়তে? পাকিস্তানের সঙ্গে আগে থেকে বন্দোবস্ত হয়েছে যে বিশেষ বিশেষ স্থলে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দিতে ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের এক্তিয়ার থাকবে। সেটা কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্যে নয়। একটা রাষ্ট্রের অর্থনীতি নষ্ট করে দেবার জন্যেও নয়। তার উপক্রম দেখলে পাকিস্তান নিশ্চয় প্রতিবাদ করবে। কতক লোক যেমন করে হোক চলে আসবেই। কেউ তাদের আটকাতে পারবে না। আটকাতে হলে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। সেটা পাকিস্তান সরকারের কর্তব্য।

ঘটনাপরম্পরার আরম্ভ পূর্ববঙ্গে নয়, কাশ্মীরে। বিনা অপরাধে শাস্তি পেলো পূর্ববঙ্গের হিন্দু। পাকিস্তান সরকার যদি হিন্দুর আস্থা হারান তা হলে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে সরকারকে সরানোর ক্ষমতা সংখ্যালঘুর নেই। কিন্তু হিন্দুদের অনাস্থা ক্রমে মুসলমান প্রতিবেশীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হবে। কর্তাদের আসন টলবে। এটা যদি তাঁরা বুঝে থাকেন তাঁরাই আস্থাভাজন হতে যত্নবান হবেন।

অনেকদিন আগে লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় একটা বিজ্ঞাপন দেখতুম। 'জামাকাপড় পরে সবাই তৈরি, কিন্তু যাবার নেই কোথাও।' ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে খেলাধূলা করার জায়গা নেই ধারে কাছে। পাকিস্তানী লড়নেওয়ালাদের দশা কতকটা লণ্ডনের খেলনেওয়ালাদের মতো। সর্বাঙ্গে হাতিয়ার। মুখে রণহুঙ্কার। চোখে কাশ্মীরের ভূস্বর্গের মৃগতৃষ্ণা। কিন্তু রাওলপিণ্ডি থেকে শ্রীনগর দূর অস্ত। খেলার মাঠে পা বাড়াবার জো নেই। ভারত বলে দিয়েছে কাশ্মীর আক্রমণ মানে ভারত আক্রমণ। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানও আক্রান্ত হবে।

জনসাধারণকে যদি দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর যুদ্ধের জন্যে তাতিয়ে তোলা হয় তা হলে একদিন তাদের কতক বেপরোয়া হয়ে সামনে যাকে পায় তারই উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধের স্বাদ দাঙ্গায় মেটায়। এ হলো স্নায়ুযুদ্ধের পরিণাম। মানুষকে যদি যুদ্ধের জন্যে উত্তেজিত করে যুদ্ধ না দেওয়া হয় তবে সে তার সেই উত্তেজনা নিয়ে করবে কী? ভিতরকার গরম বাইরে বেরোতে না পেলে মানুষ যে ছটফট করে বুক ফেটে মারা যাবে। পাকিস্তানের মতো দেশে বিপ্লব হয় না। হয় দাঙ্গা। দাঙ্গার অবকাশ মাঝে মাঝে পশ্চিম পাকিস্তানেও মেলে। বছর দশেক আগে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায়। বড়লাট গুলাম মহম্মদ প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত করেন। কিছুদিন আগেও শিয়াদের উপর হামলা হয় শুনেছি। ঠিক মনে পড়ছে না সব কথা। পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দু থাকলে আর মুসলমান মারতে হতো না। পূর্ব পাকিস্তান যখন হিন্দুশূন্য হবে তখন মোহাম্মদীরা হানাফিদের মেরে হাতের সুখ পাবে। ইসলামী রাষ্ট্রের ইহাই নিয়ম।

তবে ইতিহাস এখন বিংশ শতকের তৃতীয় পাদে পৌঁছেছে। ইসলামী দেশগুলোও লাল হয়ে যাচ্ছে। চীনের কুমীরকে যাঁরা খাল কেটে ঘরে ডেকে আনছেন তাঁদের কি খেয়াল নেই যে একদিন তাঁদের প্রিয় দাঙ্গাবাজরাও লাল হয়ে যাবে? সেদিনকার দাঙ্গার নাম হবে বিপ্লব, রূপ হবে বৈপ্লবিক। সেদিন হয়তো এমন দৃশ্যও দেখা যাবে যে দমদমের বিমানবন্দরে অবতীর্ণ হয়েছেন ঢাকার পলাতক মুহম্মদ তুঘলক সম্প্রদায়। মানুষ শিকারে যাঁদের আনন্দ। আর একদল রিফিউজীকে আশ্রয় দিয়ে বাঁচাতে হবে।

পাকিস্তান কবে ভাঙবে, জানিনে। কিন্তু বাঙালী জাতি যে চোখের সামনে ভেঙে যাচ্ছে। গ্রামছাড়া শহরছাড়া রাজ্যছাড়া হয়ে যারা দিগ্‌বিদিক ছুটছে তারা হিন্দু কি মুসলমান সেটার চেয়ে বড় কথা তারা বাঙালী। ইসলামের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর থেকে সাত শ' বছর কেটে গেছে, বাঙালী চিরটাকাল তার ভিটেমাটি কামড়ে পড়ে আছে। যাদের জীবিকার জন্যে দূর দেশে যেতে হয়েছে তারাও বছরে একবার পূজোর সময় ঘরে ফিরেছে। এমন ঘরমুখো জাতি আর নেই। সেই জাতিরই কপালে ছিল এই দুঃখ। কিন্তু কেন? কোথায় এর মধ্যে ঐতিহাসিক অনিবার্যতা? এটা কি ধর্মযুদ্ধের শতাব্দী? ক্রুসেড বা জেহাদ কি দুনিয়ার আর কোনো দেশে আজকের দিনে ঘটেছে।

না। এর পিছনে ঐতিহাসিক অনিবার্যতা নেই। সেটা হয়তো ছিল লক্ষ্মণসেনের আমলে। সেকালেও বাঙালী জাতি ভেঙে যায় নি। তার সমাজবিন্যাস, তার জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয় নি। কতক বাঙালী ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে, কিন্তু ভাষা বা সংস্কৃতি বর্জন করে নি। ধীরে ধীরে ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা ও অনুপাত বেড়েছে, কিন্তু বাঙালীর বাসভূমি ও বাংলার আবহাওয়া বদলায় নি। সুলতানী আমলে যা ঘটল না, নবাবী আমলে যা ঘটল না, ইংরেজ আমলে যা ঘটল না তাই ঘটে চলেছে পাকিস্তানী আমলে। দাঙ্গা যে সব সময় ওপারেই শুরু হয়েছে তা নয়। কোনো কোনো বার এপারেও আগে বেধেছে। পশ্চিমবঙ্গে না হোক উত্তরপ্রদেশে বা মধ্যপ্রদেশে। সেসব অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যে অনর্থের বীজ বুনে যাচ্ছে তার ফসল কাটার সময় ডাক পড়েছে পূর্ববঙ্গের হিন্দুকে। উত্তরপ্রদেশে গোহত্যা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার উত্তর দিতে হচ্ছে পূর্ববঙ্গের হিন্দুকে। পূর্ববঙ্গের ঘটনাগুলোর জন্যে হিন্দীওয়ালারও দায়ী। স্বাধীনতার পর থেকে উত্তরপ্রদেশে উর্দুর উপর যে জুলুম চলেছে সেটার জবাবও দিতে হচ্ছে পূর্ববঙ্গের হিন্দুকে। আসাম থেকে অনধিকার প্রবেশের জন্যে যেসব মুসলমানকে পূর্ব পাকিস্তানে ফেরৎ পাঠানো হচ্ছে তাদের জন্যেও জবাবদিহি করতে হচ্ছে পূর্ববঙ্গের হিন্দুকে। এর পিছনে যা আছে তার নাম ঐতিহাসিক অনিবার্যতা নয়, গায়ের ঝাল ঝাড়া। ঐ করতে গিয়ে গাঁ উজাড়, শহর উজাড়, চাষবাস ব্যবসা-বাণিজ্য বানচাল।

কবে শিক্ষা হবে, জানিনে। শিক্ষাটা এই যে হিন্দুর ক্ষতিতে মুসলমানেরও

ক্ষতি। তেমনি মুসলমানের ক্ষতিতে হিন্দুরও ক্ষতি। এবার সে ক্ষতি চরমে উঠেছে দেখে আশা হয় এ অধ্যায়টা শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু বার বার আশাভঙ্গের পর বাজী রেখে বলতে পারছিনে যে এই শেষ। তবে এটা আমি জোর করে বলতে পারি যে একের সর্বনাশে অপরের সর্বনাশ। পূর্ববঙ্গের এক কোটি হিন্দু যদি চলে আসে পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ হবে আর পশ্চিমবঙ্গে চালের মণ হবে এক শ' টাকা। প্রাণে বাঁচবে ক'জন। হিন্দুরা মরিয়া হয়ে হিন্দুর ঘরেই হানা দেবে, মুসলমানের ঘরে আর কতটুকুই বা পাবে! ওপারেও দেখা যাবে একই দৃশ্য। মুসলমান লুট করছে মুসলমানের দোকান, মুসলমানের গোলা। সেবারকার মন্বন্তরের মতো রাস্তার ধারে খাবারের দোকান আস্ত রেখে মরবে না কেউ। পুলিশের বন্দুকে ক'টা গুলী আছে যে লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষুকে মারবে!

রম্যা রলাঁর উক্তি মনে পড়েছে। 'পথে প্রবাসে'র থেকে তুলে দিচ্ছি।

প্রতীতির সহিত বললেন, "নেশনরা যতদিন না ঠেকে শিখছে যে এক নেশনের ক্ষতিতে সব নেশনের ক্ষতি যুদ্ধ ততদিন থাকবেই। কাতর স্বরে বললেন, মানুষের ইতিহাসে দেখছি যুদ্ধের অবসান হলো না। তবু অসীম ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখলে আশার আমেজ থাকে। উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, আলো জ্বালান, আলো জ্বালান, দিকে দিকে আলো জ্বালিয়ে তুলুন। যুদ্ধের প্রতিষেধ—শিক্ষা।"

দাঙ্গাও এক জাতের যুদ্ধ। হিন্দু মুসলমান যতদিন না ঠেকে শিখছে যে এক সম্প্রদায়ের ক্ষতিতে সব সম্প্রদায়ের ক্ষতি, দাঙ্গা ততদিন থাকবেই। ভারত পাকিস্তানের ইতিহাসে দেখছি দাঙ্গার অবসান হলো না। তবু অসীম ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখলে আশার আমেজ থাকে। আলো জ্বালাতে হবে। আলো জ্বালাতে হবে। দিকে দিকে আলো জ্বালিয়ে তুলতে হবে। যেমন করে জ্বালিয়ে গেছেন আমীর হোসেন চৌধুরী, মিশ্রীলাল ও আরো কয়েকজন তেমনি করে। তা যদি না পারি তো রম্যা রলাঁ যেভাবে জ্বালাতে বলেছিলেন সেই ভাবে। দাঙ্গার প্রতিষেধ—শিক্ষা।

(মৈনাককে লিখিত পত্র)

৩০শে জানুয়ারী

মানুষ মৃগয়া

স্টেটসম্যান পত্রিকায় আপনি যে বিবৃতিটি পড়েছেন সেটি সর্বোদয় কর্মীদের বিবৃতি। তাঁদের কয়েকজন হচ্ছেন আমার আত্মীয়তুল্য বন্ধু। তাঁদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে হংসো মধ্যে বকো যথা আমিও স্বাক্ষর করেছি। অন্য কারণও ছিল। তাঁদের ও আমার বিবেকে আগুন ধরিয়েছে

ওড়িশায় ও বিহারে অনুষ্ঠিত পৈশাচিক ঘটনাবলী। আমারও তো ওড়িশায় জন্ম ও বিহারে পড়াশুনা।

হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা আমাদের জীবনে এই নতুন নয়। কিন্তু এখন যা দেখছি তা অন্য জিনিস। এটার প্রকৃত নাম দাঙ্গা নয়, মানুষ মৃগয়া। ম্যান হান্ট। কতকগুলি নিরস্ত্র সংখ্যালঘু নাগরিক কারো কোনো ক্ষতি করল না, অথচ কোথায় কী হয়েছে বলে তাদের দশগুণ কি বিশগুণ সংখ্যাগুরু প্রতিবেশী তাদের চারদিক থেকে ঘেরাও করে কোণঠাসা করে আনল ও ধনে-প্রাণে মারল। এ দৃশ্য যদি কেবল পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকত তা হলে আমরা ডাক্তার সেজে রোগীকে সারাতে চেষ্টা করতুম। কিন্তু ভারতেও এ দৃশ্য প্রসারিত হয়েছে। আমরাও রোগী। কে কার রোগ সারাবে?

আপনার প্রবন্ধ পড়বার সময় মনে হচ্ছিল ১৯৩০ সালের জার্মানীতে বাস করছি। হিটলার যে পরিস্থিতিতে ডাক্তার সেজে এলো। হিটলারের ডাক্তারির পরিণাম তো দেখা গেল। কে তার পুনরাবৃত্তি চায়? জার্মানীর মতো এখানেও ফাসিস্ট বনাম কমিউনিস্ট শক্তি কাজ করছে। মাঝখানে থেকে সাম্য রক্ষা করছে সোশ্যাল ডেমোক্রাট শক্তি। আমরা যদি সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মূল্য না বুঝি, তারা যদি ঘটনার উপর কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলে, তা হলে আমাদেরও ভাগ্যে আছে ফাসিস্টদের পাল্লায় পড়া। তার পরে কমিউনিস্টদের সঙ্গে ফাসিস্টদের সংঘর্ষ। তার পরে কতক অঞ্চল কমিউনিস্টদের হাতে যাওয়া। হয়তো পূর্ববঙ্গ ও আসাম লাল হয়ে যাবে। সোশ্যাল ডেমোক্রাসী দুর্বল হলে দ্বিতীয় পার্টিশন অবশ্যম্ভাবী।

আমরা এ পরিস্থিতিতে কী করতে পারি? সাহিত্যিক হিসাবে আমি আমার সৃষ্টির কাজ সময় থাকতে শেষ করতে চাই। সময় এত কম আর সৃষ্টি এত শ্রমসাধ্য যে এমনিতেই আমি কাতর। তার উপর আর কোনো বোঝা চাপালে উট মুখ থুবড়ে পড়বে। আমি আমার সীমা সম্বন্ধে সজ্ঞান। জনাব আমীর হোসেন চৌধুরীর মতো আমি প্রাণ দিতে পারব না। কিন্তু কেউ যদি প্রাণ দেন তবে আমি তাঁর জয়গান করব। পূর্ববঙ্গে ত্রিশ জনের উপর মুসলমান ও পশ্চিমবঙ্গে অন্তত একজন হিন্দু প্রাণ দিয়েছেন, নিজেদের প্রাণ দিয়ে এঁরা শত শত মানুষকে প্রাণ দিয়েছেন। সাহিত্যিক যদি এত বড় মহত্ত্বের সাক্ষ্য দিয়ে না যান তা হলে এঁদের কী! সাহিত্যিকেরই ক্ষুদ্রতা।

এই রকম অনেক কাজ আছে যা আমরা সাহিত্যসৃষ্টির কাজে ফাঁকি না দিয়ে করতে পারি। আপনি কোন্‌টা করবেন সেটা নির্ভর করবে আপনার প্রকৃতির উপর, রুচির উপর। সকলের জন্যে একই কর্ম নয়। পাঁচজনে মিলে চিন্তা করাও একটা করবার মতো কাজ। তাই বা ক'জন করছেন! বেশীর ভাগ দেশবাসী যেখানে যা পড়ছেন বা যা শুনছেন তাই বিশ্বাস করে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। অন্ধেন নীয়মানা যথান্ধাঃ। এঁদের ভার ঈশ্বরের উপরে ছেড়ে দিয়ে পাঁচজনে বসে চিন্তা করা যাক। মণ্ডলী করুন। মাঝে মাঝে একত্র হোন। নানা দিক থেকে ভাববার আছে। কিন্তু তার আগে তথ্য সংগ্রহ করা দর-

কার। খবরের কাগজে যাই বেরোয় তাই তথ্য নয়। তথ্যের জন্যে যদি ক্ষুধা না থাকে তবে চিন্তা কিসের দ্বারা পুষ্ট হবে ? কতকগুলো অসত্য ও অর্ধ-সত্যের ধারা চিন্তার পুষ্টি হয় না। পশ্চিমবঙ্গে কেবল যে চালের বা মাছের আকাল তাই নয়, প্রকৃত তথ্যেরও আকাল। আমাদের ইন্‌টেলেকচুয়ালদের সত্যের উপর গ্রিপ নেই। তাঁদের লেখা লক্ষ্য ভেদ করে না। ফসকে যায়।

সকলের সব ত্রুটি আপনি একা মেটাতে পারবেন না। কার কোথায় গলদ ঘটল সেটা নিয়ে আকাশ ফাটালেও গলদ সারবে না। যারা জেগে ঘুমায় তাদের ঘুম ভাঙানো অসম্ভব। অন্ধকারের সঙ্গে ডন কুইকসোটের মতো লড়াই করতে না গিয়ে ছোট একটি মোমবাতি জ্বালানোই ভালো। সেটাও একপ্রকার যুদ্ধ। যদিও তার মধ্যে যুদ্ধের নামগন্ধ নেই। যদি কেউ প্রেমের কবিতা লেখেন তবে তাঁর সেই প্রেমের কবিতাও প্রকারান্তরে অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই। তাতেও অন্ধকার এক পা হটে যায়। ইনটেলেকচুয়ালদের সম্মুখ সমরে নামতেই হবে এমন কোনো মাথার দিব্যি নেই। তাঁরা যদি একভাবে না একভাবে মধ্যযুগের প্রভাব খর্ব করেন তা হলে সেটাও একপ্রকার যুদ্ধজয়। মধ্যযুগ এদেশ থেকে বিদায় নিতে বড় বেশী বিলম্ব করছে। এইসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার উদ্বর্তন। আলো জ্বালানোই এদের মৃত্যুবাণ।

২৯শে এপ্রিল (শ্রীঅচিন্ত্যেশ ঘোষকে লিখিত পত্র)

দুষ্ট বৃত্ত

স্টেটসম্যান পত্রিকায় ইংরেজীতে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ 'সমাজ-কর্মী'দের যে বিবৃতিটি পড়েছেন সেটি সর্বোদয়কর্মীদের রচনা। আমাকে স্বাক্ষর দিতে অনুরোধ করা হয়। অপরের রচনায় আমি কখনো স্বাক্ষর দিইনে। যদি না আমার সঙ্গে পরামর্শ করে রচিত হয়ে থাকে। কিন্তু এবারকার পরিস্থিতিতে আমার এই রীতির দু'বার ব্যতিক্রম ঘটল। জানুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গের লেখক শিল্পী অভিনেতাদের যে সমবেত আবেদন ওই স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার গোড়াতেই আমার নাম দেখে আমি চমকে উঠি। পরে জানা গেল যে আমার বন্ধুরা আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দাঙ্গার মাঝখানে যোগাযোগ দুঃসাধ্য ছিল। তাঁদের সঙ্গে আমি একমত ছিলুম, সুতরাং তাঁদের কাজ সমর্থন করেছি।

এক্ষেত্রেও আমি সর্বোদয়কর্মীদের সঙ্গে একমত। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আমার আত্মীয়তুল্য বন্ধু নবকৃষ্ণ ও মালতী চৌধুরী। এঁরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এঁদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত করুণ। এঁদের করুণা, এঁদের সত্যনিষ্ঠা, এঁদের শুভবুদ্ধি এঁদের স্থির থাকতে দেয়নি। এঁরা ও এঁদের সহকর্মীরা কর্তব্যের অনুরোধে যে বিবৃতি দিয়েছেন তার প্রত্যেকটি কথা

আমার পছন্দসই না হলেও মোটের উপর সেটি সমর্থনযোগ্য। ওড়িশায় ও বিহারে যা ঘটেছে তা দু'চারটে খুচরো খুনজখম নয়। তার ব্যাপকতা, তার বীভৎসতা, তার নৃশংসতা প্রায় পাকিস্তানের কাছাকাছি যায়।

এই দুষ্ট বৃত্ত যদি কোথাও এক জায়গায় না থামে, কেউ যদি এর ছেদ না ঘটায় তবে ভারতীয় বলে আমাদের গর্ব করবার কিছু থাকবে না। লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যাবে। আমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা কোন্ উত্তরাধিকার দিয়ে যাব? আমাদের ওরা শ্রদ্ধা করবে কেন? ভাবীকাল ছি ছি করবে! সেই ধিক্কারের হাত থেকে বাঁচতে হলে বর্তমান মুহূর্তেই অবহিত হতে হবে। সর্বোদয় কর্মীরা বলেছেন সত্যকে জানতে, তার সম্মুখীন হতে, তার জন্যে অনুতাপ করতে। তাকে অস্বীকার করে বা ধামাচাপা দিয়ে পরিত্রাণ নেই। তাকে পাকিস্তানের অন্যায়ের দোহাই দিয়ে চুনকাম করেও নিস্তার নেই। ভয়ঙ্কর তার পরিণাম।

আমার বিচারে তাঁরা যদি চুপ করে থাকতেন তা হলে সেইটেই হতো অভারতীয় ও অমানবিক। গান্ধীজী বেঁচে থাকলে চুপ করে থাকতেন না। কথাও বলতেন, কথার সঙ্গে মিলিয়ে কাজও করতেন। তার কমে তিনি শান্ত হতেন না। তাঁর কাছে বাইরের অশান্তি কিছু নয়। ভিতরের অশান্তিই আসল। দুটো একটা খুচরো খুনজখম নয়, পাইকারী হারে প্রত্যেকটি অপরাধ পাকিস্তানের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে করা হচ্ছে দেখলে তিনি অন্তরের অশান্তিতে অস্থির হয়ে বলতেন, মা ধরণী, দ্বিধা হও।

বিশ বাইশ বছর আগে আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মায় যে ইংরেজদের চলে যাওয়ার পর একদিন না একদিন গৃহযুদ্ধ বাধবে। জানতুম না যে আমাদের নেতারা হঠাৎ দেশভাগে রাজী হয়ে গিয়ে গৃহযুদ্ধ এড়াবেন। কিন্তু গৃহযুদ্ধের ভবী অত সহজে ভোলে না। তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়, কিন্তু চিরকালের মতো নয়। সম্প্রতি যেসব ঘটনা ঘটে গেল সেসবও একপ্রকার গৃহযুদ্ধ। এক রাউণ্ড গৃহযুদ্ধ। সৈনিকে সৈনিকে হলে বীরোচিত হতো, তা না হয়ে যা হয়েছে তা বর্বরোচিত। এর মধ্যে এইটুকুই গৌরবের যে পূর্ব পাকিস্তানে ত্রিশ জনের উপর মুসলমান তাঁদের অসহায় প্রতিবেশীদের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে স্বধর্মীর হাতে নিহত হয়েছেন। এদিকেও অন্তত একজন হিন্দু প্রাণ দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছেন। এঁরাই এই যুদ্ধের বীর। এঁদের সঙ্গে এপারের এক বেলজিয়ান পাদ্রীর উল্লেখ করতে হয়। খ্রীস্টের মতো ইনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন। আরো দুটি একটি খ্রীস্টান ধার্মিকের খোঁজ পাওয়া যায়নি ওপারে।

গৃহযুদ্ধ যে এইবারেই শেষ হয়ে গেল তা নয়। কাশ্মীরে আবার গোল-যোগ বাধলে পূর্ব পাকিস্তানেও আবার দাঙ্গা বাধতে পারে। তার প্রতিক্রিয়ায় ভারতের কোনো কোনো রাজ্যেও আবার হাঙ্গামা বাধতে পারে। তখন আবার আমাদের বিবেকের পরীক্ষা হবে। এই দুষ্ট বৃত্ত থেকে উদ্ধার কোথায়? সেই পরিমাণ অহিংসা যে নেই। সর্বোদয়কর্মীরাও হালে পানী পাচ্ছেন না। আমি কোন্ ছার! যখন গৃহযুদ্ধের দুঃস্বপ্ন দেখেছিলুম তখন সেটা ছিল

সৈনিকে সৈনিকে। জানতুম না যে সৈনিকদের লড়তে না পাঠিয়ে গুণ্ডাদের দেওয়া হবে নারী ও শিশুর সঙ্গে লড়তে। বল পরীক্ষা যদি অনিবার্য হয় তবে সৈনিকে সৈনিকে হোক। গুণ্ডায় গুণ্ডায় হোক। কিন্তু এ ভাবে কেন!

শান্তিনিকেতন, ১লা মে (শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশকে লিখিত পত্র)

বিষাদসিন্ধু

কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে, পাকিস্তান তার সংখ্যালঘুদের তাড়িয়ে দিতে চায়, পূর্ব পাকিস্তানকেও পশ্চিম পাকিস্তানের মতো হিন্দুশূন্য করতে চায়। ঠিক এই জিনিসটি আমাদের লোকবিনিময়বাদীদেরও অন্তরের প্রার্থনা। পূর্ববঙ্গ হিন্দুশূন্য হলেই এঁরা নিঃশঙ্ক হন। পশ্চিমবঙ্গ মুসলিমশূন্য হলে তো সোনায় সোহাগা। ষোল বছর ধরে এঁদের সঙ্গে তর্ক করতে করতে আমি ক্লান্ত। এই সেদিনও লোকবিনিময়ের বিরুদ্ধে লিখেছি। কিন্তু এই ক'দিনের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। হিন্দুদের তাড়িয়ে দেওয়া দূরে থাক আটকে রাখা হচ্ছে। যেখানে দশ লাখ হিন্দু চলে আসার কথা সেখানে এক লাখও আসতে পারে কিনা সন্দেহ। পালাচ্ছে খ্রীস্টানরা। আসামের দিকে। তাদের পথেও কাঁটা দেওয়া হবে। পাকিস্তান লোকবিনিময় চায় না। সে সর্বতোভাবে দ্বার রোধ করবে।

এমনি একটা ব্যাপার ঘটেছিল জার্মানীতে। পূর্ব জার্মানী ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে। পূর্ব বার্লিন ও পশ্চিম বার্লিনের মধ্যে। দেশ ভাগ ও নগর ভাগ হয়ে যাবার পর দেখা গেল, মানুষ ক্রমাগত পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছুটেছে। কেউ চায় নিরাপত্তা, কেউ চায় স্বাধীনতা, কেউ চায় আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলন, কেউ চায় অধিক স্বাচ্ছন্দ্য। লোকে লোকারণ্য হলো পশ্চিম জার্মানী ও পশ্চিম বার্লিন। শেষে পূর্ব জার্মানীর টনক নড়ল। সে সব দরজা বন্ধ করে দিল। বার্লিন শহরের দরজা অত সহজে বন্ধ করা যায় না। একদিন তাও হলো। আঁকাবাঁকা প্রাচীর উঠল বার্লিনের মাঝখান দিয়ে। নদীতে প্রাচীর দেওয়া যায় না। প্রাচীরের স্থান নিয়েছে নৌকার সার। পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র সিপাহী। পার হতে গেছ কি মরেছ। সেটা এমন একটা দৃশ্য যে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আমরাও সেই অভিমুখে চলেছি। লোকবিনিময় বন্ধ না হলে পাকিস্তান সরকারও প্রাচীর তুলবে, জলপথে পাহারা বসাবে। ওধার থেকে একটি মশাও আসতে পারবে না, এধার থেকে একটি মাছিও যেতে পারবে না। অবশ্য পাশপোর্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে।

মনটা অশান্ত হয় যখন ওপারের হিন্দু ও খ্রীস্টানদের দশা অনুমান করি।

আমরা না পারি সেখানে যেতে, না পারি সেখান থেকে কাউকে বার করে নিয়ে আসতে, শুধু রকমারি ফরমায়েস করতে পারি নিজেদের সরকারের কাছে। যেন এই সরকার সর্বশক্তিমান। ভেবে দেখিনি যে পূর্ব জার্মানীর পিছনে যেমন সোভিয়েট ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তানের পিছনে তেমন সেন্টো, সীয়াটো, চীন। পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে দেবার সময় বোঝা উচিত ছিল যে, পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চলবে না। আর সংখ্যালঘু সমস্যাটা যে-কোন রাষ্ট্রেরই ঘরোয়া সমস্যা। শুধু পাকিস্তানের নয়। সংখ্যালঘুকে যদি ওরা তাড়িয়ে দেয় তবে তাদের আশ্রয় দেবার দায় আমাদের, সুতরাং তা নিয়ে নালিশ করার অধিকারও আমাদের। কিন্তু যদি চারিদিকে দেয়াল তুলে বন্দী করে রাখে তা হলে আমরা হস্তক্ষেপ করতে যাই কোন্ অধিকারে? আন্তর্জাতিক আইন কি এক রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের জন্যে অপর রাষ্ট্রের দায়িত্ব সমর্থন করে? ভারত যদি দায়িত্ব দাবী করে পাকিস্তান আরো দায়িত্বহীনের মতো ব্যবহার করবে। এ দায়িত্ব এক ও অবিভাজ্য। দুই বা দ্বিভাজ্য নয়। ভারত দায়ী হলে পাকিস্তান দায়ী নয়। পাকিস্তান দায়ী হলে ভারত দায়ী নয়। ওরা যে পাকিস্তানী নাগরিক এটাই মুখ্য। ওরা যে হিন্দু বা খ্রীস্টান এটা গৌণ।

হিটলারী আমলের কথা আশা করি ভুলে যাননি। জার্মানীতে লাখ-ছয়েক ইহুদী ছিল। তারা সেখানকার সংখ্যালঘু জার্মান নাগরিক। তাদের জন্যে দায়িত্ব কার? জার্মানীর না ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকার? এসব দেশের ইহুদীরা এমন হৈ চৈ বাধিয়ে দিল যে মনে হলো ওটা জার্মানীর ঘরোয়া ব্যাপার নয়, ওতে বাইরের হস্তক্ষেপ চলে। হিটলারেরও রাগ বেড়ে যায়, ঘরের ইহুদীরা অপরাধ করছে বলে নয়, বাইরের ইহুদীরা অপরাপর রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করতে প্রবর্তনা দিচ্ছে বলে। মহাত্মা গান্ধী সেসময় ইহুদীদের সং পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইহুদীরা অহিংস প্রতিরোধ করে জেলে যেত, প্রাণে মরত, কিন্তু জার্মানদের হৃদয় গলত, অন্তঃপরিবর্তন হতো। অধিকাংশ জার্মান তাদের পক্ষে দাঁড়ালে সেটা হতো নতুন একটা জিনিস। সেটাকে বাইরের হস্তক্ষেপ মনে করে আগুন হওয়া চলত না। যে দায়িত্বটা সৎ জার্মানদের, যেটা জার্মান রাষ্ট্রের, সেটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বাইরের ইহুদী ও তাদের মিত্ররা পারলেন কি হিটলারের হাত থেকে জার্মানীর ইহুদীদের বাঁচাতে?

আরো ভয়ের কথা আমাদের এদিকেও একদল ফাসিস্ট দেখা দিয়েছে। এরা যদি পারে তো এখানকার গণেশকেই ওলটাবে। আর নয়তো গণেশকে সাক্ষীগোপাল করে সংখ্যালঘুদের উপর সুদে আসলে শোধ তুলবে। সংখ্যা-লঘু সমস্যার সমাধান বলতে এরা বোঝে দাবাখেলায় দু'পক্ষের বোড়েগুলো মেরে নিকাশ করা। এই আসুরিক সমাধানের পিছনেও একপ্রকার লজিক আছে। এরা মাথাওয়ালা লোক। গুণ্ডা কিম্বা পাগল নয়। উত্তেজনাপ্রবণ ছেলেছোকরাও নয়। আমরা যদি এদের নিরস্ত করতে না পারি তবে এক

অনর্থের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরেক অনর্থ ঘটবে। অনর্থের প্রতিযোগিতায় যেই জিতুক না কেন, মোট হতাহতের সংখ্যা বাঙালী জাতিকে ভারতে ও পাকিস্তানে দুর্বলতম করে রাখবে।

"মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা।" আমার একমাত্র ভরসা এখন বাংলাভাষার ঐক্য, সুতরাং বঙ্গভাষীর ঐক্য। বাঙালী হিন্দু মুসলমান সর্বপ্রথমে বাঙালী তারপরে হিন্দু বা মুসলমান। এই সত্য আজ যদি আত্মপ্রকাশ না করে তবে কবে করবে ? সময় কোথায় ? দেশ ভাগের পর থেকে আমার ভাঙা হৃদয়কে আমি এই বলে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছি যে, বাঙালী যদি একজাতি হয়ে থাকে তবে সে সত্য একদিন সূর্যের আলোর মতো ফুটে বেরোবে, পার্টিশন তাকে আড়াল করতে পারবে না। দেশ ভাগ হয়েছে, বেশ। কিন্তু জাতি তো ভাগ হয়ে যায়নি। জনগণ তো ভাগ হয়ে যায়নি। দেশ ভাগ হয়তো একদিন রদ করতে পারা যাবে, কিন্তু জাতি যদি ভাগ হয়ে থাকে, জনগণ যদি ভাগ হয়ে থাকে, তবে আর রদ-বদল নেই। তৃতীয় পক্ষ সে কাজ করে দিয়ে যায়নি, আমরাই বা কেন করতে যাই ? তা হলে মিথ্যে এতকাল বলে এসেছি যে হিন্দু মুসলমানের বিবাদ তৃতীয় পক্ষের সৃষ্টি।

না, সবটা দোষ নন্দঘোষের নয়। ব্রিটিশ সরকারের নয়। আমাদেরও দোষ ছিল। কিন্তু সেসব কথার চর্বিত চর্বণ করে আজ আর সময় নষ্ট করব না। আগেই তো বলেছি, সময় কোথায় ? ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক এখন যতদূর সম্ভব তিক্ত। ভারত বা পাকিস্তান যদি বুদ্ধির দোষে বা অধৈর্য হয়ে একটা ভুল চাল চালে তা হলে পরে চাল ফিরিয়ে নিতে পারবে না। সর্বনাশ হয়ে যাবে। পাকিস্তান আমাদের প্ররোচনা দিলেও আমরা তাকে প্ররোচনা দেব না। "কাশ্মীর" "কাশ্মীর" করে সে এখন হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। কখন কাকে কামড়ায় তার ঠিক নেই। তার মনের বাসনা এই যে কোনো এক তৃতীয় পক্ষ এসে কাশ্মীরটা তাকে পাইয়ে দেয়। তৃতীয় পক্ষকে আর আমাদের বিশ্বাস নেই। তা হলে এ অচল অবস্থার অবসান হবে কী করে ? যুদ্ধ-বিগ্রহে ? না সংখ্যালঘু নিধনে ? কোনটাই আমাদের কাম্য নয়। আক্রান্ত না হলে আমরা যুদ্ধে নামব না। প্ররোচিত হলেও আমরা সংখ্যালঘুর অনিষ্ট করব না।

তা হলে এ অচল অবস্থার অবসান হবে কী করে ? হবে কী করে ? কাতর হয়ে প্রশ্ন করি ইতিহাসবিধাতাকে। উত্তর পাই, হবে একভাবে না একভাবে। পাকিস্তান যদি ভারতের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে রাজী হয় তা হলে দু'পক্ষের যাবতীয় বিরোধ আলাপ আলোচনা ও আদান-প্রদানের দ্বারা নিষ্পত্তি হবে। তা যদি না হয় তবে গণতন্ত্রের দাবীতে পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হয়ে যাবে ও ভারতের সঙ্গে পৃথকভাবে নিষ্পত্তি করবে। নিষ্পত্তির জন্যে পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান পারে না। তার আর্থিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। প্রাচীর তুললে তার নিজের ক্ষতি হবে। তার স্বার্থ ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

উপরে আমি ধরে নিয়েছি যে পৃথক না হলে গণতন্ত্র হবার নয়। পূর্ব পাকিস্তানীদের বিশ্বাস, ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে গণতন্ত্র খাপ খেতে পারে। জিন্নাসাহেবেরও সে বিশ্বাস ছিল। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল গোঁজামিল চলে না। গণতন্ত্র শুধু ভোটাধিকার বা প্রত্যক্ষ নির্বাচন নয়। তার পেছনে আছে এক জীবনদর্শন। মানবিকবাদ। হিন্দুত্ব বা ইসলাম বা খ্রীস্টধর্ম নিয়ে যদি মানুষ সন্তুষ্ট থাকত তা হলে মানব বিবর্তন সেইখানে শেষ হয়ে যেত। সেই শেষ নয়। তাই মানবিকবাদের উদয় হয়। মানবিকবাদ মানব থেকে আরম্ভ করে, ঈশ্বর থেকে আরম্ভ করে না। পাকিস্তানের সংবিধান যা করেছে। আয়ুব খান্ তার কতখানি রেখেছেন, জানিনে। কিন্তু তার গোড়া যদি সেই রকমই থাকে তবে তার গোড়াশুদ্ধ তুলে ফেলতে হবে। নইলে গণতন্ত্র গজাবে না। আবার গজাবে প্রচ্ছন্ন স্বৈরতন্ত্র। পূর্ব পাকিস্তানের গণতন্ত্রীরা ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করবেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের ভিতরে সত্যিকার গণতন্ত্র সম্ভব নয়। সেকুলার রাষ্ট্রই তাঁদের প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার সুযোগ দিতে পারে। এর জন্যে চাই সংগ্রাম। সে সংগ্রাম অহিংস হতে পারে।

গণতন্ত্র যেদিন জীবন-মরণের প্রশ্ন হবে, পূর্ববঙ্গ সেদিন ইসলামী রাষ্ট্রের মোহ কাটিয়ে গণতন্ত্র লাভ করবে। নয়তো গণতন্ত্র তার কপালে নেই। তাকে ওই "বেসিক ডেমোক্রেসী" নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সে সন্তোষ মরণ সমান। আমার মনে হয় না যে পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক চেতনা বেশীদিন ও জিনিস সহ্য করবে।

পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এক কথা, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হওয়া আরেক কথা। পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যে ভারতীয় ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্য হয়েছে। ভারতীয় ইউনিয়নের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে তার লেশমাত্র ইচ্ছা নেই। সে গণতন্ত্র লাভ করেছে। সেদিক থেকে সে ভাগ্যবান। ভারত সরকারের উপর অসন্তোষ থাকতে পারে, কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের উপর অসন্তোষ নেই। ওর চেয়ে সন্তোষজনক সংবিধান কারো কল্পনায় নেই। তাই পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান ছাড়লেও পশ্চিমবঙ্গ ভারত ছাড়বে না। পূর্ববঙ্গ যদি পাকিস্তান ছেড়ে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে চায় তা হলে অবশ্য একই ইউনিয়নের দুই অঙ্গরাজ্য হিসাবে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ আবার এক হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি তার সম্ভাবনা দেখিনে।

উপরে আমি বলেছি যে বাঙালী হিন্দু মুসলমান সর্বপ্রথমে বাঙালী। এটা সত্য, কিন্তু এর চেয়ে আরো বড় সত্য ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দেবার পর থেকে আমরা যারা যোগ দিয়েছি তারা সর্বপ্রথমে ভারতীয়। ষোল বছর আগে যদি গান্ধী, শরৎচন্দ্র বসু ও সুহরাবর্দির পরামর্শে বাংলাদেশ অবিভক্ত থেকে তৃতীয় এক রাষ্ট্র গঠন করত তা হলে আমরা সকলেই সর্বপ্রথমে বাঙালী বলে পরিচয় দিতুম। এখন আমরা যারা ভারতীয় ইউনিয়নের সামিল হয়েছি তারা সর্বপ্রথমে ভারতীয় বলে পরিচয় দিই। পূর্ববঙ্গের মুসলমান কি কোন

দিন এ ভাবে পরিচয় দিতে প্রস্তুত হবে ? আমি তার সম্ভাবনা দেখিনে। তবে তার জন্যে দ্বার খোলা রইল।

ষোল বছর আগে সব বাঙালীর মন ছিল ঐককেন্দ্রিক। সেই কেন্দ্রটির নাম কলকাতা। ইতিমধ্যে বাঙালী জাতির মন দ্বিকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কেন্দ্রটির নাম ঢাকা। অধিকাংশ বঙ্গভাষী এখন ঢাকাকেন্দ্রিক। অল্পাংশ এখনো কলকাতাকেন্দ্রিক। ঢাকা যে কেবল পূর্ব বাংলার রাজধানী তাই নয়, সে এখন পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী। অনেকে আশা করেছেন সে একদিন প্রথম রাজধানী হবে। যুক্তবঙ্গ কি কোনদিন ঢাকাকেন্দ্রিক হবে ? অধিকাংশ বঙ্গভাষী কি কোনদিন কলকাতাকেন্দ্রিক হবে ? এই ষোল বছরে একটা কেন্দ্রদ্বৈধ ঘটে গেছে। সেটার মূলে কি কেবল ধর্ম ? আঞ্চলিকতা নয় ? জার্মান জাতি যে ভিয়েনাকেন্দ্রিক থেকে বার্লিনকেন্দ্রিক তথা ভিয়েনাকেন্দ্রিক হলো তার কারণ কি কেবল ক্যাথলিক বনাম প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মমত ? জাতির জীবনে ধর্ম ব্যতীত আরো একটা শক্তিও সক্রিয়। তাকে বলতে পারি আঞ্চলিকতা। পূর্ববঙ্গ বরাবরই একটু পৃথক। কলকাতা তার স্বাভাবিক কেন্দ্র নয়। কলকাতার গৌরব বেড়ে যায় সে যখন সারা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হয়। এখন তার সে গৌরব অস্ত গেছে। এখন বরং ঢাকা হয়ে উঠেছে সারা পাকিস্তানের রাজধানী। তার গৌরব এখন উদয়ের পথে।

আমরা কলকাতায় বসে ঐক্যবদ্ধ বাঙালী জাতির নিয়তি নির্দেশ করব, আর সকলে সে নির্দেশ মেনে নেবে, এ কি কখনও সম্ভব ? আমার তো মনে হয় না যে, কলকাতার নেতৃত্ব অধিকাংশ বাঙালী আর কোনোদিন স্বীকার করবে। দিল্লী সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। পূর্ব বাংলার মন দিল্লীর থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তবে সরে গিয়ে করাচীতে বা রাওয়ালপিণ্ডিতে আশ্রয় পেয়েছে বলা চলে না। সে ওই ঢাকাতেই আশ্রয় রচনা করতে চায়। পাকিস্তান যদি লক্ষণ দেখে ঢাকাতেই তার রাজধানী স্থানান্তরিত করে তা হলে স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ববাংলার দাবী আর উঠবে না। তবে অমন কিছু নিকট ভবিষ্যতে সম্ভবপর নয়। কারণ পাকিস্তানের সামরিক কেন্দ্র রাওয়ালপিণ্ডি। সেটা কাশ্মীরের নাকের কাছে। সেখানে বা তার সংলগ্ন ইসলামাবাদে বসে এক চোখ সৈন্যদলের উপরে ও আরেক চোখ কাশ্মীরের উপর রাখাই আয়ুব খানের বিশেষ কাজ। যেমন ইংরেজ বড়লাট ও জঙ্গী-লাটের বিশেষ কাজ ছিল সিমলায় বসে আফগানিস্তান ও রাশিয়ার উপর নজর রাখা।

আমরা কলকাতাকেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গে বাস করে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে একটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছি। ঢাকা-কেন্দ্রিক পূর্ব পাকিস্তানে সেই ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়েছে। অথচ নতুন কোনো ধারাবাহিকতা ধরাছোঁয়া দিচ্ছে না। মানুষের মন এমনিতেই দিশেহারা। ইসলামকে অবলম্বন করে যা হয়েছে তা তো গণতন্ত্রের অন্তর্ধান। লোকে যদি গণতন্ত্রকে অবলম্বন করে একটা স্থিতি পায় তা হলে তার থেকে উদ্ভব হবে নূতন শৃঙ্খলার। নয়তো

নিরুপায় হয়ে একদিন কমিউনিস্ট হয়ে যাবে। তখন আর হিটলারী আমল নয়, স্টালিনী আমল।

আমার এই পত্র-প্রবন্ধে পূর্ববঙ্গকে জার্মানীর সঙ্গে ও সেখানকার শাসনকে নাট্‌সী শাসনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তুলনা বোধহয় ঠিক হয়নি, হিন্দুরাও ইহুদী নয়। আয়ুব খানও হিটলার নন। আর ওই যে সব দরজা বন্ধ করে দেওয়া ওটাও সাময়িক একটা ব্যাপার। ওটা না করলে ওপার থেকে লাখে লাখে শরণার্থী পালিয়ে আসত। তার ফলে ওপারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হতো, মুসলমানের পক্ষে তো হতোই। তা ছাড়া লক্ষ লক্ষ লোক চলে এলে লক্ষ লক্ষ লোকের চলে যাবার জন্যেও চাপ দেওয়া হতো। ভারত বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিতেন না। দিত বেসরকারী জনমত।

প্রাচীর উঠবে না। নাট্‌সী শাসন জোর পাবে না। তাকে সংশোধন করার চেষ্টা ভিতর থেকেই হবে। ওখানকার সংবাদপত্রগুলি সেই চেষ্টার সাক্ষী। তাদের আমি সাধুবাদ দিই। সফল তারা হবেই। আর ছাত্ররা? তারা জিতবেই। সব শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই মনুষ্যত্বের জয় হবে। আমীর হোসেন চৌধুরী প্রভৃতির আত্মদান ব্যর্থ হবে না।

(শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্তকে লিখিত পত্র)

পদভোট

ইউরোপ থেকে ন্যাশনালিজম নামক তত্ত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমদানী হয়। হিন্দুরাই সর্বপ্রথমে ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে বলতে আরম্ভ করেন, "আমরা হিন্দুরা একটি নেশন।" পরে শোনা গেল ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে মুসলমানরাও বলছেন, "আমরা মুসলমানরা একটি নেশন।" আরো পরে বোঝা গেল যে ধর্ম অনুসারে বা সম্প্রদায় অনুসারে নেশন হয় না, নেশন হয় দেশ অনুসারে। দেশ যখন একটাই তখন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই ভারতীয়। ভারতীয়রা একটা নেশন। ইংরেজরাও এটা মেনে নেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ইংরেজদের চোখে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঠেকে। বলতে গেলে কোনো কোনো ইংরেজই তার উদ্যোক্তা।

মুসলমানরা একটা সম্প্রদায় না একটা নেশন এই তর্কের উত্তরে সার সৈয়দ আহমদ বলেন, "হিন্দু ও মুসলমান ভারতমাতার দুটি চক্ষু। তারা এক একটি নেশন নয়।" অথচ সার সৈয়দ মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান অনুচিত মনে করেন। মুসলমানদের যেটা প্রাপ্য সেটা তাঁরা ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া করে পাবেন না। পাবেন ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করে। অবশ্য কংগ্রেসও গোড়ার দিকে ঝগড়া করতে চায়নি। কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় যে ইংরেজরা তার পক্ষে ছিলেন তাঁরাই তার উপর ক্রমে বিরূপ হন। কংগ্রেসের

দাবীগুলোকে খাটো করার আর কোন উপায় না পেয়ে তাঁরা বলতে আরম্ভ করেন, "কংগ্রেসই ভারতবর্ষের একমাত্র মুখপাত্র নয়। কই, কংগ্রেসে মুসলমান কোথায়?"

কংগ্রেসে মুসলমান অল্পই ছিলেন। সার সৈয়দের পরামর্শে তাঁরা স্বতন্ত্রপন্থী। দেশ তাঁদের কাছে বড় কথা নয়। সম্প্রদায়ই বড় কথা। তাঁদের অনেকের বক্তব্য হলো, "দেশ স্বাধীন হলে তো হিন্দুরাই সর্বেসর্বা হবে। ওরা কি আমাদের বখরা দেবে? আমরা তখন যে তিমিরে সেই তিমিরে। খামখা ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাই কেন? তার চেয়ে ইংরেজের কাছ থেকে আমাদের বখরা বুঝে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। হিন্দুরা যদি লড়তে চায় লড়ুক। আমরা দর্শক মাত্র। কিন্তু ওরা যদি কিছু আদায় করে আমরাও ভাগ বসাব।"

পরে মুসলিম লীগ বলে স্বতন্ত্র একটা প্রতিষ্ঠান গঠিত হলে ইংরেজরা সেটাকে কংগ্রেসের সমান মর্যাদা দেন ও তাকে দিয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী হাজির করিয়ে সে দাবী মঞ্জুর করেন। ইংরেজের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের শিবির থেকে সরিয়ে নেওয়া। তা হলে আর কংগ্রেস বলতে পারবে না যে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সব ভারতবাসীর সে প্রতিনিধি। কংগ্রেস যদি স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি অগ্রাহ্য করত তা হলে সত্যি সত্যি মুসলিমশূন্য হতো। সেটা সে করেনি। তার ফলে কতক মুসলমান কংগ্রেসেই রয়ে গেলেন। তাঁদের চেষ্টায় মুসলিম লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের একটা সমঝোতা হয়। এই স্থির হয় যে মুসলিম লীগ শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যাপারে কথা বলবে আর কংগ্রেস কথা বলবে ভারতবর্ষের ব্যাপারে। একই ব্যক্তি উভয় দলের সদস্য হতে পারবেন। যেমন জিন্নাসাহেব। সমঝোতার প্রধান উদ্যোক্তা তিনি। তখনকার দিনে তিনি অগ্রগণ্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট। অথচ মুসলিম লীগেরও একজন রথী।

এর পরে কংগ্রেসের গান্ধীনেতৃত্ব শুরু হলে মুসলমানরা দলে দলে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হন। ইংরেজের তা দেখে চক্ষুস্থির। কী করে মুসলমানদের কংগ্রেসের শিবির থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়? এর উত্তর কমিউনাল এওয়ার্ড। কংগ্রেস যদি ওটাকে সরাসরি খারিজ করত তা হলে মুসলমানশূন্য হতো। কংগ্রেসের পলিসি হলো "না গ্রহণ, না বর্জন"। দেখা গেল স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি সত্ত্বেও বহু প্রদেশে কংগ্রেসী মুসলমানরা লীগ-পন্থী মুসলমানদের হারিয়ে দিয়েছেন ও কংগ্রেসী মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছেন। ইংরেজের চাল ব্যর্থ হলো। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের সেই যে শত্রুতা শুরু হলো তা মোটেই মিটল না। জিন্নাসাহেব ইতিমধ্যে কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন। তিনিই হয়ে দাঁড়ালেন প্রধান শত্রু। গোড়ায় তাঁর অভিপ্রায় ছিল আর একবার কংগ্রেস লীগ সমঝোতা ঘটাবেন। কিন্তু এবার তাঁর শর্ত হলো লীগকেই মুসলিমদের একমাত্র প্রতিনিধি বলে মেনে নিতে হবে। তার মানে লীগই সব ক'টা মুসলিম আসন পাবে, কংগ্রেস একটাও পাবে না।

কংগ্রেসী মুসলিমরা বাধ্য হয়ে কংগ্রেস থেকে সরে যাবেন। তখন কংগ্রেস হবে মুসলিমশূন্য হিন্দু প্রতিষ্ঠান। তখন আর সে বলতে পারবে না যে সে ধর্মনির্বিশেষে ভারতের জনগণের প্রতিনিধি। প্রকারান্তরে ইংরেজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। জিন্নার শর্ত মেনে নেওয়া মানে ইংরেজকে তার খেলায় জিতিয়ে দেওয়া। কংগ্রেস কখনো এতে রাজী হতে পারে না। ফলে মুসলিম লীগের সঙ্গে পূর্ব সম্পর্ক ছিন্ন হলো। মুসলিম লীগ বহু মুসলমানকে কংগ্রেস থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে গেল।

এর পরের নির্বাচনে মুসলিম লীগের জিগীর হলো, পাকিস্তান চাই। মুসলমানরা এক নেশন, হিন্দুরা এক নেশন, মুসলমানদের জন্যে পাকিস্তান, হিন্দুদের জন্যে হিন্দুস্তান, দুই জাতি, দুই দেশ, দুই রাষ্ট্র, দুই কেন্দ্রীয় সরকার। এটা এমন এক বাদশাহী প্রলোভন যে মুসলমান ভোটদাতারা লীগ প্রার্থীকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিতিয়ে দিল। কংগ্রেসের পক্ষে যাঁরা রইলেন তাঁরা মুষ্টিমেয়। তাঁদের হাতে তখনো উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সরকার।

কংগ্রেসের সন্তান জিন্না কংগ্রেসকে নির্মুসলমান না করে ছাড়বেন না। পরশুরাম যেমন সমাজকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। সমঝোতার সব সম্ভাবনা যখন তিরোহিত হলো তখন শত্রুতাটা আর নির্বাচনক্ষেত্রে বা আইনসভায় নিবদ্ধ রইল না। দেখা গেল মাঠে ময়দানে রাস্তায় ঘাটে হাটে বাজারে রেলগাড়ীতে মানুষ মানুষকে খুন করছে, জখম করছে, ধর্ষণ করছে, ঘরে ঢুকে লুট করছে, ঘরে আগুন দিচ্ছে। ধরে নিয়ে ধর্মান্তরিত করছে। এ এক আজব লড়াই। মাথার উপরে লীগ সরকার বা কংগ্রেস সরকার। আরো উপরে ইংরেজ। তা সত্ত্বেও কেউ নিরাপদ নয়।

কংগ্রেস যদি নির্মুসলমান হতে রাজী হতো তা হলে লীগের সঙ্গে সমঝোতা হয়তো বা সম্ভব হতো। তখন কোয়ালিশন হতো। পার্টিশন দরকার হতো না। কিন্তু তা হলে আর কংগ্রেস বলতে পারত না যে সে ভারতবর্ষ নামক দেশের ধর্মনির্বিশেষে প্রতিনিধি। কংগ্রেসের কাছে এটা নিঃশ্বাসবায়ুর মতো। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় জাতির প্রতিনিধিত্ব হারালে তার সংগ্রামটাই ব্যর্থ হতো। আর মুসলিম লীগ যদি হয় মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি তা হলে কংগ্রেসও হয়ে দাঁড়ায় একটা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। ভারতীয়রা তা হলে একটা জাতি নয়, কতকগুলো সম্প্রদায়ের সমষ্টি। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ ধুয়ো ধরেছিল যে মুসলমানেরা একাই একটা নেশন। শুধু তাই নয়, হিন্দুরাও একটা নেশন। ভারতবর্ষ দু'ভাগ করে মুসলিম নেশনকে পাকিস্তান ও হিন্দু নেশনকে হিন্দুস্থান দিতে হবে। মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতা করলে দুই-নেশন তত্ত্ব মেনে নিতে হতো।

কংগ্রেসের সংগ্রামটা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে। মুসলিম লীগের সঙ্গে নয়। মুসলিম লীগের সংগ্রামটা কংগ্রেসের সঙ্গে। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে নয়। কিন্তু ঘটনার গতি যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে যেতে দিলে দেখা যেত ইংরেজের

সঙ্গে কেউ সংগ্রাম করছে না, ইংরেজ সাক্ষীগোপাল। সংগ্রাম চলেছে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের এবং সেটা দিন দিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের। ওটাকে চলতে দিলে একটিও মুসলমান কংগ্রেসে থাকত না আর মুসলমানেরা সবাই লীগের পক্ষ নিত। কংগ্রেস হতো হিন্দু নেশনের মুখপাত্র। লীগ হতো মুসলিম নেশনের মুখপাত্র। সেই অবস্থায় পেঁছানোর আগেই কংগ্রেস পার্টিশন মেনে নেয়। কিন্তু হিন্দু নেশনের মুখপাত্র হিসাবে নয়। পার্টিশন হচ্ছে দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। তার একটির নাম হিন্দুস্থান নয়, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন, যাতে পাকিস্তানও একদিন যোগ দিতে পারে। সেটা সেকুলার স্টেট, সুতরাং কে হিন্দু কে মুসলমান তা সে গণনার মধ্যে আনে না। মুসলিমপ্রধান কাশ্মীরও তার অঙ্গীভূত হতে পারে। খ্রীস্টানপ্রধান নাগাল্যাণ্ডও। ইণ্ডিয়ান যারা সবাই সেখানে স্বাগত। হিন্দু বলে কারো কোন বিশেষ দাবী নেই। হিন্দু রাষ্ট্র হলে নেপালকেও কোলে টানত। মুসলিম নেশন যেমন কাশ্মীর দাবী করছে হিন্দু নেশন তেমনি নেপাল দাবী করত। ভারতীয় নেশন হিন্দু নেশন নয়। সব হিন্দুর এখানে স্থান নেই। যারা মাইগ্রেট করে চলে আসবে তাদের কথা আলাদা।

ভারতীয় ইউনিয়ন হচ্ছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্প্রসারণ। কংগ্রেসে যতদিন সব ধর্মের লোক থাকবে ভারতেও ততদিন সব সম্প্রদায়ের লোক থাকবে। কাউকেই তাড়িয়ে দেওয়া, সরিয়ে দেওয়া, ফিরিয়ে দেওয়া চলবে না, যদি না সে আইনের বিচারে ভারতে বাস করার অযোগ্য হয়। আইন নিজের হাতে নিয়ে কেউ যে কাউকে ভারতের মাটি থেকে উচ্ছেদ করবে এটা একটা দণ্ডনীয় অপরাধ। হাজার হাজার লোক যদি এই অপরাধে অপরাধী হয়, অথচ তাদের অপরাধের জন্যে দণ্ডিত না হয় তা হলে বুঝতে হবে যে ভারতীয় ইউনিয়নের দণ্ডশক্তি দুর্বল। রাজদণ্ড দুর্বল হলে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে।

অপর পক্ষে পাকিস্তান হচ্ছে মুসলিম লীগের সম্প্রসারণ। মুসলিম লীগে মুসলিম ভিন্ন আর কারো স্থান নেই। সুতরাং পাকিস্তানে মুসলিম ভিন্ন আর কেউ প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হতে পারে না। মুসলিম নেশন বা ইসলামিক স্টেট কোনোটাই হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টানদের জন্যে নয়। অথচ কলমের এক খোঁচায় দু'কোটির উপর মানুষকে এলিয়েন (alien) বলে ঘোষণা করা যায় না। জিন্না সাহেব দয়া করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় পতাকায় তাদের জন্যে একাংশ শ্বেতবর্ণে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু যে রাষ্ট্র সোজাসুজি দুই-নেশন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সে রাষ্ট্রে বাস করা যেন পরের মর্জির উপর নির্ভর করে পরের জমি চাষ করা। পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দু শিখরা ভিটেমাটির মায়া কাটিয়ে একযোগে ও এককালে বিদায় নেয়। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা কিন্তু কোনোদিনই এ বিষয়ে একমত ছিল না। এখনো নয়। তাই পূর্ব পাকিস্তান থেকে এই সতেরো বছরে যত লোক এসেছে তার দুগুণ লোক সেখানে রয়ে গেছে।

চলে আসা বা থেকে যাওয়া কোনোটাই কোনোকালে অস্বাভাবিক ছিল না। চিরকালই পূর্ববাংলার লোক পশ্চিম বাংলায় এসেছে, পশ্চিম বাংলার লোক পূর্ববাংলায় গেছে। কিন্তু দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর থেকে দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিক চলাচল বন্ধ, তার বদলে ঘটে যাচ্ছে একপ্রকার লোক-বিনিময়। হাঁ, বিনিময়, কারণ এদিক থেকেও কতক লোক শরণার্থী হয়ে ওদিকে যাচ্ছে। তাদের কথা খবরের কাগজে লেখে না। সেইজন্য আমরা ধরে নিই যে ট্র্যাফিকটা ওয়ান-ওয়ে।

এতদিন এসব আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছল, কিন্তু এবারকার ব্যাপার অন্যরূপ। এবার মনে হচ্ছে যারা চলে আসছে তারা পা দিয়ে ভোট দিয়ে আসছে। এটা একপ্রকার পদভোট। তারা যেন বলে আসছে যে, পাকিস্তান যদি শুধু মুসলমানদের হোমল্যাণ্ড হয়ে থাকে তবে অন্যান্যরা সেখানে প্রক্ষিপ্ত। অন্যান্যরা মানে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান। এবার এটা আর হিন্দু মুসলিম সমস্যা নয়। পাকিস্তান অতি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়মাত্রেই অবাঞ্ছিত। যেহেতু পাকিস্তান হচ্ছে মুসলিম নেশন তথা ইসলামিক স্টেট। এই পদভোট শুধু নিরাপত্তার জন্যে নয়। এবার একটা হেস্তনেস্ত চাই। শেষবারের মতো জানা চাই পাকিস্তান কি মুসলিম নেশনের হোমল্যাণ্ড না মিশ্র নেশনের মাতৃভূমি? পাকিস্তান যদি মিশ্র নেশনের মাতৃভূমি হয় তবে ইসলামিক স্টেট হয় কী করে? তবে কি মুসলমানরাই আসল নেশন, আর সকলে জিম্মি? পাকিস্তান যদি ধর্ম অনুসারে নেশন হতে চায় তা হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্য ধর্মের লোক সমস্তক্ষণ পালাই পালাই করবে ও কোথাও একটা কিছু ঘটলে অমনি দৌড় দেবে। হয় দেশ অনুসারে নেশন হতে হবে, নয় সংখ্যালঘুদের আশা ছাড়তে হবে।

এই দুর্যোগ পাকিস্তানী মুসলমানদের মনঃস্থির করতে সাহায্য করবে। ইসলামিক স্টেট যেকালের ও যেদেশের আদর্শ সেকালে ও সেদেশে জিম্মি বলা হতো শুধু ইহুদী ও খ্রীস্টানদের, মূর্তিপূজকরা জিম্মি হওয়ারও অযোগ্য। তাদের জন্যে ব্যবস্থা ধর্মান্তরীকরণ কিংবা বিতাড়ন কিংবা সরাসরি কোতল। ভারতের মাটিতে মুসলমান সুলতানরাও বিশুদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্র প্রবর্তন করতে সাহস পাননি। পাকিস্তানীদের স্পর্ধা দেখে অবাক হতে হয়। এঁদের মতিগতি দেখে মনে হয় না যে ইতিহাস থেকে এঁরা কিছু শিখেছেন। ঘড়ির কাঁটাকে তের শ' বছর পেছিয়ে দেওয়া যায় না। দেশটাকেও আরব্য উপন্যাসের ম্যাজিক কার্পেটে করে আরব সাগর পার করিয়ে আরব দেশে নিয়ে যাওয়া যায় না। এই উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্যে নিজস্ব একটা স্থান চাই বলে সাত শ' বছরের ঐতিহাসিক বিবর্তনকে চোখ বুজে অস্বীকার করা যায় না। বিবর্তনসূত্রে হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান একখানি শাড়ীর নানা রঙের সুতোর মতো বোনা হয়ে গেছে। শাড়ীখানিকে কেটে দু'খানি করা যায়, কিন্তু একরঙা করতে গেলে শাড়ীর শাড়ীত্ব থাকে না। পাকিস্তান

শুধু মুসলমানের দেশ নয়, সকলের দেশ। পাকিস্তান শুধু মুসলমানদের নেশন নয়। সকলের নেশন। পাকিস্তান ইসমালিক স্টেট হলে মুসলমান ভিন্ন আর-কেউ সেখানে টিকতে পারবে না। আর-সকলের থাকাটাই যদি কাম্য হয় তবে সেকুলার স্টেট পত্তন করতে হবে।

পাকিস্তানীরা তাদের দুর্মতির জন্যে গণতন্ত্র হারিয়েছে। পাকিস্তান এখন গণতন্ত্রের গোরস্থান। সেই গোরস্থান যাঁরা মানবিকতার চেরাগ জ্বালিয়ে রেখেছেন, যাঁরা তার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের উপরেই নির্ভর করছে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক বিবর্তন। সে বিবর্তন ভারতের মতো পাকিস্তানেও প্রতিষ্ঠা করবে সেকুলার স্টেট। সেকুলার স্টেট ডিঙিয়ে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসী সফল হয় না। তাই জিন্নার মতো পরম অভিজ্ঞ পার্লামেণ্টারিয়ানের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। গণতন্ত্রকে যাঁরা পুনরুজ্জীবিত করতে চান তাঁদের প্রথম কাজ হবে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান নির্বিশেষে সব রকম লোকের জন্যে, সব রকম লোকের দ্বারা, সব রকম লোকের পার্টি গঠন। পরে পার্লামেণ্ট গঠন। আরো পরে গবর্ণমেণ্ট গঠন। বলা বাহুল্যে তার উপযুক্ত সংবিধান রচন। দেশ বিভক্ত করেও যারা ক্ষান্ত হয়নি, জনগণকেও বিভক্ত রাখতে চায় ও তাদের একভাগের স্বার্থে অন্যান্য ভাগের উপর বাদশাহী করতে চায় তারা গণতন্ত্রীই নয়, তাদের সুবিধার জন্যে গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন গণতন্ত্রকে আবার কবরে পাঠাবার প্রস্তাব। বাদশাহীই যদি হবে তো আয়ুবশাহী নয় কেন? জনগণ এক ও অবিভাজ্য। এ শিক্ষা পাকিস্তানে বাকী আছে।

পাকিস্তানের মূঢ় ধারণা যে এ জগতে ভারত ভিন্ন তার আর কোনো শত্রু নেই আর হিন্দু যদিবা পাকিস্তানে থাকবে তবু পাকিস্তানকে সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করবে না। পাকিস্তানের পরীক্ষার দিন কি আসবে না? নিশ্চয় আসবে। একচক্ষু হরিণকে আঘাত করবে ভারত ভিন্ন অপর এক শক্তি। সেদিন পাকিস্তানী হিন্দুর দুর্বলতা পাকিস্তানেরও দুর্বলতা। ওপারের হিন্দুকে বা এপারের মুসলমানকে মেরে ভয় দেখিয়ে ডিমরালাইজ করা মানে নিজ নিজ নেশনকেই ডিমরালাইজ করা। পাকিস্তান বেশী দূর দেখতে পায় না। অদূরদর্শী জননায়কদের হটিয়ে দিয়ে তার মসনদে বসেছেন অদূরদর্শী সেনানায়ক। তা বলে গান্ধী নেহেরুর দেশ কি দেখতে পাচ্ছে না যে আন্তর্জাতিক বলপরীক্ষার দিন মাজা ভাঙা মুসলমান তার হয়ে লড়তে পারবে না, ফেরারী মুসলমানকে ডাক দিলে ফিরে পাওয়া যাবে না? লড়াই কি শুধু রণক্ষেত্রে হয়? লড়াই হয় ধানক্ষেতে, যেখানে খাদ্য উৎপাদন হয়। লড়াই হয় তাঁতঘরে আর ওয়ার্কশপে আর কারখানায়, যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপন্ন হয়। মুসলমান না থাকলে লড়াই জোর পাবে না আর সে যদি ভগ্নমনোবল হয় তবে তো লড়াই কমজোরী হয়। ভারতের মুসলমানকে সমান অধিকার দিয়ে ভারতে রাখতে হবে। যাকে রাখ সেই

রাখে। ভারতের মুসলমানকে আজ অভয় দিতে হবে। তার ধন মান প্রাণ রক্ষা করতে হবে।

শান্তিনিকেতন, ২৬শে মে,

('অতএব' গোষ্ঠীর জনৈক সদস্যকে লিখিত পত্র)

নববর্ষের কামনা

যেসব দাবী দেশভাগের আগে সমর্থন বা সহানুভূতির যোগ্য ছিল সেসব দাবী এখন দেশভাগের সতেরো বছর পরে তামাদি হয়ে গেছে। সেসব দাবী তুলে কারো কোনো লাভ নেই। অকারণে স্বপ্ন দেখা। যারা পাকিস্তান চেয়েছিলেন তাঁদের আমি পূর্বেই সাবধান করে দিয়েছিলুম যে ওতে সংখ্যালঘু মুসলমানের সমস্যা মিটবে না। পাকিস্তান সংখ্যাগুরু মুসলমানের পক্ষে ভালো কি না সে বিষয়েও আমার সংশয় ছিল ও আছে। কিন্তু সব মুসলমানের পক্ষে যে ভালো নয় তা তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভালো যদি হতো তবে সব মুসলমানই সেখানে গিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করত। ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানই থাকত না। সুতরাং তাদের কোনো সমস্যাই থাকত না। সেইসব পুরাতন দাবী এতকাল পরে আবার উঠত না।

দেশভাগের আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারলে এসব দাবী নিশ্চয় বিবেচনা করা যেত। হিন্দু মুসলমানে একসঙ্গে বসে ফয়সালাও করা যেত। আমি তো বরাবর সেই আশাই পোষণ করেছিলুম। সংখ্যালঘু মুসলমানকে বঞ্চিত করে সংখ্যাগুরু হিন্দু সবকিছু ভোগ করবে এর নাম স্বরাজ নয়। এর নাম স্বরাজ হলে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, খান্ আবদুল গফ্ফর খান্ প্রভৃতি ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান কখনো কংগ্রেসে যোগ দিতেন না। আর গান্ধীজীর মতো ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু কখনো এরকম স্বরাজের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন না। প্রথম থেকেই সকলে জানতেন যে দেশ অখণ্ড থাকবে ও অখণ্ড দেশের ভিত্তিতে তৃতীয় পক্ষের অনুপস্থিতিতে দেশের লোক পরস্পরের দাবী মিটিয়ে দিয়ে পরস্পরকে চিরকালের জন্যে কাছে টেনে নেবে।

সে স্বপ্ন ১৯৪৭ সালে ভেঙে গেছে। সে ভাঙনের জের এখনো মেটেনি। এখনো পশ্চিম পাকিস্তানের এক কোটির মতো হিন্দু শিখ তাদের পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন বাসভূমি থেকে উৎপাটিত। কেউ তাদের একবার একটু সহানুভূতির সঙ্গে ডেকে বলছে না যে, যা হবার তা হয়ে গেছে, তোমরা ফিরে এসো, আবার একসঙ্গে ভাইয়ে ভাইয়ে মিলে মিশে বাস করা যাবে। তেমনি পূর্ব পাকিস্তানের পঞ্চাশ লক্ষের মতো হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান তাদের আদিকালের বাসভূমি থেকে বিতাড়িত। বেসরকারী সহানুভূতির অভাব নেই, এটা আশার কথা। কিন্তু সরকারী আশ্বাসে আস্থা থাকলে এত বেশী লোক পালিয়ে আসত না। তাদের আশঙ্কা আবার দাঙ্গা বাধবে। একই কারণে

এদিক থেকেও বহু মুসলমান ওদিকে চলে গেছে। তারা তাদের পূর্বপুরুষের বাসভূমি থেকে উৎপাটিত বা বিতাড়িত। তাদেরও মোট সংখ্যা সমগ্র পাকিস্তানের হিসাবে এক আধ কোটি হবে। এর পরেও এক দল সাম্প্রদায়িক হিন্দু জেদ ধরেছে যে পুরোপুরি লোকবিনিময় চাই। তাহলে নাকি পাকিস্তানের হিন্দুরা বরাবরের মতো নিরাপদ হবে। এদিকের মুসলমানরাও ওদিকে গিয়ে চিরকালের মতো নিরাপদ হবে। আর কোন সমস্যাও থাকবে না, দাবীদাওয়াও থাকবে না। মাথা নেই আর মাথাব্যথা।

ভারত যদি সেকুলার স্টেট না হতো, কংগ্রেসে যদি মুসলমান খ্রীস্টান প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক না থাকতেন, শাসনভার যদি কংগ্রেসের হাতে না থাকত তাহলে লোকবিনিময় এতদিনে চরমে উঠে থাকত। কংগ্রেসের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেলে, সাম্প্রদায়িক দলগুলির হাতে শাসনভার পড়লে সেকুলার স্টেট উঠে গিয়ে হিন্দুরাষ্ট্র প্রবর্তিত হলে লোকবিনিময় অবশ্যম্ভাবী। গান্ধী নেহরু নেই, এখন যাঁরা আছেন তাঁরা বুড়ো হয়ে একে একে বিদায় নেবেন। তাঁদের পরে কী হবে তা কি একবার কেউ ভেবে দেখেছেন? পাকিস্তানের হিন্দুরা যদি সেখানে টিকতে না পারে তাদের চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার মুসলমানদেরও চলে যাওয়ার হিড়িক পড়ে যাবে। কংগ্রেসের অবর্তমানে ঠেকাবে কে? সেকুলার স্টেটের অভাবে দায়িত্ব নেবে কে?

আমার ধারণা ছিল হিন্দু মুসলমানের বিরোধ গোটাকতক চাকরি-বাকরি নিয়ে, গোহত্যা ও মসজিদের সামনে বাজনা নিয়ে। একসঙ্গে বসলে উভয়ের গ্রহণযোগ্য একটা মীমাংসা অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু ঝগড়া এখন যেখানে গিয়ে পোঁছেছে সেখানে ফয়সালা অত সহজ নয়। মুসলমান বা হিন্দু সমষ্টিকে দেয়াল তুলে দু'ভাগ করা যায় না। যেমন গঙ্গা বা ব্রহ্ম-পুত্রকে বাঁধ দিয়ে দু'ভাগ করা যায় না। লোকবিনিময় সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অন্যায়। আরো লোকবিনিময় না করে বরং বিপরীতটাই করতে হবে। সবাইকে ডাক দিয়ে বলতে হবে, ভাই, ভুলে যাও, ক্ষমা কর, ফিরে এস। আবার আমরা মিলে মিশে বাস করব। তোমরা যদি না থাক আমরা একা কখনো সুখী হতে পারব না। তোমাদের মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল।

হিন্দুর মঙ্গল আর মুসলমানের মঙ্গল বলে দুটো আলাদা মঙ্গল নেই। একের অমঙ্গলে অপরের মঙ্গল নয়। ভাগ বাঁটোয়ারা করতে করতে আমরা মূল সত্যটা ভুলে যাচ্ছি যে মঙ্গল আমাদের এক ও অবিভাজ্য। দাঙ্গাহাঙ্গামা করতে করতে বর্বর হয়ে যাচ্ছি, রাক্ষস হয়ে যাচ্ছি, সত্যিকার বীরত্বের ও সাধুত্বের অযোগ্য হয়ে উঠছি। গোটাকতক অস্ত্র বেশী হলেই বল বাড়ে না। বল বাড়ে সব নাগরিক পরস্পরকে বিশ্বাস করলে, পরস্পরের হাত ধরলে। দেশ দু'ভাগ হয়েছে। সেটা রদ করবার দরকার নেই। কিন্তু যাদের বাড়ী ঘর পাকিস্তানে পড়েছে তারা যেন সংখ্যালঘু বলে সর্বহারা না হয়। তেমনি যাদের বাড়ী ঘর ভারতে পড়েছে তারা যেন সংখ্যালঘু বলে সর্বস্বান্ত না হয়।

দাঙ্গাহাঙ্গামার অধ্যায় বরাবরের মতো শেষ হোক। চোখের জল মুছিয়ে দেবার অধ্যায় শুরু হোক। রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলা হোক। দাবী আদায়ের এসব পন্থা বর্জন করা হোক। ভারত পাকিস্তানের নেতাদের গোল টেবিল বৈঠক বসুক। গোলযোগ আপোসে মিটুক। নববর্ষে এই আমার কামনা।

স্ববিরোধ

সাম্প্রদায়িক সমস্যা এক এক দেশে এক এক ভাবে মিটেছে। ইংলণ্ড রাতারাতি ক্যাথলিক থেকে প্রোটেস্টাণ্ট বনে যায়। ক্যাথলিক সংখ্যালঘুদের সম্পূর্ণ-রূপে দমন করে। ফ্রান্স ক্যাথলিক থেকে প্রোটেস্টাণ্ট বনতে বনতে বনে না, প্রোটেস্টাণ্টদের নির্মমভাবে বধ কিংবা বিতাড়ন করে। জার্মানী ত্রিশ বছর সাম্প্রদায়িক যুদ্ধে জড়িত থেকে তার থেকে মুক্ত হয় এই শর্তে যে কতকগুলো রাজ্য ক্যাথলিকদের দখলে থাকবে, কতকগুলো থাকবে প্রোটেস্টাণ্টদের দখলে। আর উভয়ের মাথার উপরে থাকবেন সম্রাট, তিনি ক্যাথলিক, কিন্তু তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। নেদারল্যাণ্ডস্ তো সোজাসুজি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রোটেস্টাণ্টদের হলান্ড, ক্যাথলিকদের বেলজিয়াম।

দেখছি আমরাও বেলজিয়াম হলাণ্ডের মতো দুই রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছি। যারা এপারে সংখ্যাগুরু তারা ওপারে সংখ্যালঘু। তেমনি যারা ওপারে সংখ্যাগুরু তারা এপারে সংখ্যালঘু। কিন্তু হলাণ্ড-বেলজিয়ামের সঙ্গে মস্ত বড়ো একটা প্রভেদ আছে। রাষ্ট্রের চরিত্র হিন্দুরাষ্ট্র নয়। এটা হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীষ্টান বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের আপনার রাষ্ট্র। এখানে কারো সংখ্যা বেশী, কারো সংখ্যা কম। কিন্তু অধিকার তা বলে বেশী কম নয়। সকলেই সমান অধিকারী। হিন্দুরা ইচ্ছা করলেই এটাকে হিন্দুস্থান বানাতে পারত, এর সংবিধানে হিন্দুদেরই অগ্রাধিকার দিত, আর সকলে পড়ে থাকত দ্বিতীয় শ্রেণীতে। সেটা করা হয়নি। না করার কারণ ইংরেজদের সঙ্গে সংগ্রাম যারা করেছিল তারা হিন্দু হিসাবে করেনি, করেছিল ভারতীয় হিসাবে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে। সংগ্রামের শেষে তারা তাদের সংগ্রামী ঐক্যের ঐতিহ্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে চায়নি, দেশ যদিও দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। ভারতীয় ইউনিয়ন আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটসের মতো সেকুলার স্টেট।

অপর পক্ষে পাকিস্তান একটি ইসলামিক স্টেট। ইসলামী আদর্শ ত্যাগ করলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝখানে কোনো যোগসূত্র থাকে না। সুতরাং সেখানকার রাজনীতি ধর্মগত বিভেদকে জীইয়ে রেখেছে ও রাখবে। কেউ যদি মনে করে থাকেন যে কাশ্মীর হাতে পেলেই পাকিস্তান তার ধর্মমূলক রাজনীতি ভুলে গিয়ে সেকুলার রাজনীতি অবলম্বন করবে তবে তিনি ঐ যোগসূত্রটিকে রক্ষা করবেন কী উপায়ে? এইখানেই স্ববিরোধ।

পাকিস্তান যদি সেকুলার হয় তবে আর একসূত্রে গ্রথিত থাকে না। সেকুলার যদি না হয় তবে কাশ্মীর হাতে পেলে সে কাশ্মীরের সেকুলার ঐতিহ্য নাশ করবে, সেখানে ধর্মমূলক রাজনীতি প্রবর্তন করবে। সেখানকার হিন্দু শিখ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবে কিংবা পলায়নের দ্বারা আত্মরক্ষা করবে।

পাকিস্তানের ঐক্য পাকিস্তানীদের কাছে নিশ্চয়ই খুব প্রিয়। যেমন ভারতের ঐক্য ভারতীয়দের কাছে। পাকিস্তানের ঐক্য খণ্ডিত হোক এটা আমাদেরও কাম্য নয়। কারণ ভারতবর্ষের বল্কানীকরণ কারো পক্ষে কল্যাণকর নয়। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হলে নানা দেশের চক্রান্তবাজদের খর্পরে পড়বে। যেমন কাশ্মীর স্বাধীন হলে নানা দেশের চক্রান্তবাজদের খর্পরে পড়ত। ভারত পাকিস্তান এই দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রই যথেষ্ট। আর সংখ্যা বাড়িয়ে কাজ নেই। অথচ পাকিস্তান যদি সেকুলার রাজনীতি অবলম্বন না করে তবে ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে তার সম্পর্কের উন্নতি সুদূরপরাহত। কেউ যদি মনে করে থাকেন যে সেকুলার ভারত ও ইসলামী পাকিস্তান মনের সুখে বাস করবে ও বাস করতে দেবে তবে তিনি পরে নিরাশ হবেন। লক্ষ লক্ষ হিন্দু শিখ কখনো তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ও সম্পত্তির মায়া কাটাতে পারবে না। তেমনি লক্ষ লক্ষ মুসলমান। শরণার্থী সমস্যার স্থায়ী সমাধান যার যার নিজের জায়গায় প্রত্যাবর্তন ও সসম্মানে পুনর্বাসন। আর সব সমাধান সাময়িক। ইতিহাসে সতেরো আঠারো বছর কিছুই নয়। একদিন না একদিন শরণার্থীদের স্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবেই। কিন্তু ধর্মমূলক রাজনীতি থাকতে তা অসম্ভব। তা হলে কি বুঝতে হবে যে ধর্মমূলক রাজনীতি যাবে, পাকিস্তান সেকুলার স্টেট হবে, পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের সঙ্গে কন্‌ফেডারেশন গঠন করবে?

কাশ্মীর প্রসঙ্গে

অন্যের তৈরি বিবৃতিতে স্বাক্ষর যোগ করা আমার রীতি নয়। বন্ধুদের অনুরোধে সেদিন রাউরকেলা ও জামশেদপুরের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি উপলক্ষে যে বিবৃতিটিতে স্বাক্ষর যোগ করি তার উদ্যোক্তারা সকলেই সর্বোদয়-কর্মী। তার থেকে এরকম একটা ধারণা জন্মাতে পারে যে আমিও তাঁদের একজন। তাতে এমন কিছু এসে যেত না, কিন্তু পরে দেখা গেল কাশ্মীর নিয়ে সর্বোদয়কর্মীদের কয়েকজন বিশেষ একপ্রকার সমাধানের উদ্যোগ করছেন ও শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁদেরকেও ছাড়িয়ে গেছেন। এর থেকে যদি কেউ মনে করেন যে আমিও তাঁদের সঙ্গে একমত তা হলে আমার উপর অবিচার করবেন।

গণতন্ত্রে কেউ কারো হাত পা বেঁধে রাখতে পারে না। স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার যে কোনো ব্যক্তির আছে। জয়প্রকাশ যা ভালো মনে করেন তা করতে গেলে তাঁকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। সকলে সব বিষয়ে একমত হতে বাধ্য এটা ডিকটেটরশিপের দাবী। গণতন্ত্র নানা বিচিত্র মতামতের বিরোধ ও সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। রামের পক্ষে অধিকাংশ লোক বলে শ্যাম তার ব্যক্তিসত্তা বিসর্জন দেবে এর নাম গণতন্ত্র নয়। এটাও এক রকম আজ্ঞাতন্ত্র।

জয়প্রকাশের অন্তরের ইচ্ছা পাকিস্তানের সঙ্গে একটা সম্মানজনক মিটমাট। মিটমাটের প্রধান অন্তরায় তাঁর মতে কাশ্মীর। পাকিস্তানীরাও এই কথা বলেন। অর্থাৎ আগে কাশ্মীর, তার পরে অন্য কথা।

আন্তর্জাতিক ব্যাপারে কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে, এ নিয়ে তর্ক করতে করতে দশ বিশ বছর কেটে যায়। তবু কেউ কারো পোজিশন ছাড়ে না। রাশিয়া বলছে, আগে বার্লিন। আমেরিকা বলছে, না। বছরের পর বছর গড়িয়ে যাচ্ছে। মিটমাট হচ্ছে না। যে কোনো দিন মহাযুদ্ধ বেধে যেতে পারত। এখনো বাধেনি। তেমনি লাল চীন বলছে, আগে ফরমোজা, আমেরিকা বলছে, না। বছরের পর বছর বয়ে যাচ্ছে। মিটমাটের নামগন্ধ নেই। যে কোনো দিন মহাযুদ্ধ বেধে যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক ব্যাপারে কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে, এ নিয়ে তর্কের হেতু নিশ্চয় আছে। রাশিয়া বা লাল চীন বা আমেরিকা কেউ অনর্থক তর্ক করছে না। অকারণে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকছে না। তবে এটাও ঠিক যে যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে কেউ অধীর নয়। লাল চীনও না। এটা ধৈর্যের খেলা।

ভারত ও পাকিস্তান বলে দুটো 'জাতি' যখন সৃষ্টি হয়েছে তখন কাশ্মীর নিয়ে কলহটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ব্যাপার। সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রাজনীতির যা কেতা তাই খাটবে. কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে এ নিয়ে তর্ক অনন্তকাল চলবে। যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকারও অন্ত নেই। তা বলে যুদ্ধের জন্যে অধীর হলেও চলবে না। পাকিস্তান যদি যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চায় নিতে পারে। এটাও ধৈর্যের খেলা।

তাহলে কাশ্মীর সমস্যার মিটমাটের জন্যে এই ব্যাকুলতা কেন? এটা কি জয়প্রকাশের মতো আদর্শবাদীদের হৃদয়দৌর্বল্য? না, এর পিছনে মার্কিনী চাল আছে? এটা কি ভারতের স্বার্থে নয়, বিদেশীদের স্বার্থে?

ব্যাপারটা অত সরল নয়। কারণ ব্যাপারটা বিশুদ্ধ আন্তর্জাতিক নয়। পাকিস্তানীরা আইনের দৃষ্টিতে 'এলিয়েন' হতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিতে আমাদেরি ভাই। আমরাও তাদের। তাই যদি না হতো তবে গান্ধীজী কেন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত 'একজাতি তত্ত্বে' বিশ্বাস করতেন ও বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে প্রাণ দিতেন? 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' একটা মিথ্যা। ইতিহাসের বিবর্তন ওকে কবে অতিক্রম করেছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওর পুনরাবর্তন একটা পরিহাস। একটা করুণ পরিহাস। একদিন

না একদিন পাকিস্তানীদের অন্তরের পরিবর্তন হবে। ওরাও মানবে যে ওরা আর আমরা দুই জাতি নই এক জাতি। রাষ্ট্র আলাদা হতে পারে, কিন্তু হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান শিখ নির্বিশেষে সব ভারতীয় যেমন একজাতি, হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান বৌদ্ধ নির্বিশেষে সব পাকিস্তানী তেমনি একজাতি। তাই যদি হয় তবে সব ভারতীয় ও সব পাকিস্তানী মিলে একজাতি।

এইটেই বৃহত্তর ও চিরস্থায়ী সত্য। এই সত্যের অনুরোধে সমস্তক্ষণ মিটমাটের চেষ্টা করতে হবে। গান্ধীজী বেঁচে থাকলে ব্যক্তিগত দায়িত্বে পাকিস্তানে যেতেন ও মিটমাটের জন্যে আপ্রাণ করতেন। তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজ যদি আর কেউ মাথায় তুলে নেন তবে তাঁকে সন্দেহ করাটাই অন্যায়। বড়জোর এইটুকু বলতে পারা যায় যে সম্মানজনক মিটমাট আমরাও চাই, কিন্তু কাশ্মীরই প্রধান বা প্রথম অন্তরায় নয়। কাশ্মীর আগে নয়। দুই পক্ষের নেতারা বৈঠকে বসুন, তৃতীয় পক্ষকে বাদ দিন, কাশ্মীর প্রভৃতি যাবতীয় বিরোধের ফয়সালা একই সঙ্গে করুন, সন্ধিপত্র একটাই হোক। বরাবরের মতো। কুকুরের ল্যাজ একটু একটু করে কাটার মতো আজ কাশ্মীর, পাঁচ বছর পরে আসাম, দশ বছর পরে করিডর, পনেরো বছর পরে স্বতন্ত্র নির্বাচন, এ রকম যেন না হয়। নয়তো কাশ্মীর নিয়ে এখন যা হচ্ছে আসাম নিয়ে পরে তা হবে, সেখানেও দাঁড়ি টানা যাবে না।

সবক'টা বিরোধের এককালীন নিষ্পত্তি যদি কোনদিন হয় তবে ১৫ই আগস্টের মতো সেও হবে চিরকাল মনে রাখবার মতো সুদিন। সেদিন আমরা সবাই মিলে কোলাকুলি করব। অতীতের ভ্রাতৃহত্যা ভুলে যাব ও ক্ষমা করব। দুটো রাষ্ট্র যেমন আছে তেমনি থাকবে, কিন্তু দুটো হাত যেমন মিলে মিশে কাজ করে তেমনি পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করবে। সেদিন-কার সেই পরিবর্তিত পটভূমিকায় কাশ্মীর হবে না বিদেশীদের চক্রান্তের কেন্দ্র বা ঘাঁটি। সেখানকার সংবিধান হবে ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার। সেখানকার হিন্দু ও শিখদের অধিকার কোনো অংশে খর্ব হবে না। সেখানে যাতায়াত করা ও বাণিজ্য করা ভারতীয় মাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক হবে। সেখানকার প্রতিরক্ষার উপর ভারতেরও কর্তৃত্ব থাকবে। বলা বাহুল্য কাশ্মীর বলতে গিলগিট প্রভৃতি পাকিস্তান অধিকৃত অঞ্চলও বোঝাবে।

মোটকথা, অবিভক্ত কাশ্মীরে পাকিস্তানীরা যেসব অধিকার পাবে ভারতীয়রাও সেইসব অধিকার পাবে। ভারতীয়রা যেসব অধিকার পাবে পাকিস্তানীরাও সেইসব অধিকার পাবে। সম্প্রদায় অনুসারে কাউকেই কোনো বিশেষ অধিকার দেওয়া হবে না। স্বতন্ত্র নির্বাচন বা নির্দিষ্টসংখ্যক চাকরি কোনো সম্প্রদায়কে ভোগ করতে দেওয়া হবে না। তবে কাশ্মীরের যারা স্থায়ী অধিবাসী তারা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক তাদের জন্যে যদি কিছু সংরক্ষণ করতে হয় তো সেটা নিয়ে কেউ কোন আপত্তি করবে না।

কাশ্মীর অবিকল পশ্চিমবঙ্গের বা মহারাষ্ট্রের মতো একটি 'রাজ্য' হবে.

এটা বাড়াবাড়ি। প্যারামাউণ্ট পাওয়ার ভারত ত্যাগ করার সময় এই স্থির হয়েছিল যে দেশীয় রাজ্যগুলি ইচ্ছামতো ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেবে। যোগ দেবার অর্থ সেসময় ছিল তিন চারটি বড়ো বড়ো বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারকে ছেড়ে দিয়ে বাকী সব নিজের জন্যে রাখা। এই ব্যবস্থা অনুসারে ভারতভুক্ত দেশীয় রাজ্য হতো পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন। পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশীয় রাজ্যকে ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশের সঙ্গে সমান করে দিয়ে সবাইকে 'স্টেট' আখ্যা দেওয়া হয়েছে বলে কাশ্মীরকেও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 'স্টেট' বলে বর্ণিত একটি বর্ণচোরা প্রদেশে পরিণত করা উচিত নয়। শেখ আবদুল্লার ভুলভ্রান্তি যাই ঘটে থাকুক তাঁর ব্যথা এইখানে যে কাশ্মীরকে তার প্রাপ্য ক্ষমতার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। মৈশুরকেও। মৈশুরের তাতে আপত্তি না থাকতে পারে, কাশ্মীরের আপত্তি আছে। অন্তত তাঁর মতো অনেকের আপত্তি আছে। এটা হিন্দু বনাম মুসলিম নয়। এটা কেন্দ্র বনাম দেশীয় রাজ্য। মৈশুরে যদি কংগ্রেস না হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি প্রবল হতো সেখানেও এ প্রকার আপত্তি উঠত।

কোন্‌টা সত্যি সত্যি সাম্প্রদায়িক, কোন্‌টা আঞ্চলিক বা প্রান্তিক এ বিষয়ে পরিচ্ছন্ন চিন্তার অভাব। শেখ আবদুল্লা মুসলমান ও তাঁর অনুগামীরা প্রায় সবাই মুসলমান বলে তাঁর কেসটা কেঁচে যায় না। তিনি পাকিস্তানকে চটাতে চান না বলে তাঁর কেসটা পাকিস্তানের কেস হয়ে যায় না। কাশ্মীর পাকিস্তানের সামিল হওয়া তাঁর পক্ষে বিভীষিকা। ভারত কাশ্মীরকে এখন পর্যন্ত প্রদেশে পরিণত করেনি। করলেও তার ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে বেশী থাকবে। কিন্তু পাকিস্তান যদি একবার কাশ্মীর হাতে পায় তবে তাকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মতো একটি কমিশনার শাসিত বিভাগে পর্যবসিত করবে। এখনো হাতে পায়নি বলে মিঠি মিঠি বুলি শোনাচ্ছে। তাতে আর যেই ভুলুক শেখ আবদুল্লা ভুলবেন না। পাকিস্তান যা চায় আর শেখ সাহেব যা চান তা একই জিনিস তো নয়ই, তা দুই স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিরোধী বস্তু।

শেখ আবদুল্লাকে সন্তুষ্ট করবে তাঁর আদি ক্ষমতা। যে ক্ষমতা তাঁর ছিল ভারতভুক্তির অব্যবহিত পরে। কিংবা তার চেয়ে কিছু কম ক্ষমতা। যে ক্ষমতা তাঁর ছিল পদচ্যুতির কিছুকাল পূর্বে। আয়ুব খানকে কাশ্মীর পাইয়ে দিয়ে তাঁর সে ক্ষমতা তিনি ফিরে পাবেন না। পরন্তু তাঁর দশা হবে খান আবদুল গফর খানের মতো। আয়ুব খানকে কাশ্মীর পাইয়ে দেওয়া মানে আপনাকে বঞ্চিত করা। কাশ্মীরী মুসলমানদেরই বা তাতে লাভ এমন কী হলো? গণতন্ত্রের অনেকখানি তারা ভোগ করছে। সেটা তো তারা হারাবে। আয়ুব কি তাদের গণতন্ত্রের দাবী মেটাবেন? আয়ুব অন্যান্য মুসলমানদের যে সংবিধান দিয়েছেন কাশ্মীরী মুসলমানদেরও সে সংবিধান দেবেন। তাতে পূর্ব পাকিস্তানীরাই সন্তুষ্ট নয়। কাশ্মীরীরা হবে কী করে? হিন্দুর জায়গায় পাঞ্জাবী মুসলমান গিয়ে বসবে। তাতে যদি সাধ মেটে তো আশ্চর্য হতে হবে।

সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের মূলনীতি নয়। মূলনীতি লঙ্ঘন করে যে মিটমাট তা ধোপে টিকবে না। মিটমাটের চেষ্টা চলছে, চলুক। বার বার ব্যর্থ হবে, বার বার আরম্ভ হবে। আমি পরাজয়বাদী নই। আমি স্বীকার করব না যে হিন্দু মুসলমানের মিটমাট বা ভারত পাকিস্তানের মিট-মাট কস্মিনকালে হবার নয়। সবাই হাল ছেড়ে দিলেও আমি হাল ধরে থাকব। সাম্প্রদায়িকতা অন্যান্য দেশেও ছিল, এখনো আছে। মিটে গেছে বা মিটে যাচ্ছে। আধুনিক যুগের সঙ্গে যা খাপ খায় না তার পরমায়ু বড়জোর ত্রিশ চল্লিশ বছর। এই তো দেখছি মিশরের মুসলমানরা সাইপ্রাসের গ্রীক খ্রীস্টানদের পক্ষে, স্বধর্মী তুর্কদের বিপক্ষে। ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরা মালয়েশিয়ার মুসলমানদের বিপক্ষে, ভিন্নধর্মী চীনাদের পক্ষে। ধর্মকে রাজ-নীতির মূলধন করে পাকিস্তানীরা কন্দিন চালাবে।

(শ্রীশান্তিকুমার মিত্রকে লিখিত পত্র)

'ক' অক্ষরের লড়াই

কী নিয়ে লড়াই?

'ক' নিয়ে লড়াই।

পুরাণে লিখেছে পাঠশালায় গিয়ে প্রহ্লাদ 'ক' দেখে অজ্ঞান। তার মনে পড়ে 'ক' থেকে 'কৃষ্ণ' নাম। সে কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে। চোখের জল ফেলে। ভাবাবেশে মূর্ছা যায়। তার পড়াশুনা আর এগোয় না। ক অক্ষরের পর খ অক্ষর আছে, গ অক্ষর আছে, ঘ অক্ষর আছে, কিন্তু ওকথা ওকে বোঝাবে কে? ক অক্ষর হচ্ছে কৃষ্ণ নামের আদ্য অক্ষর। কৃষ্ণ নামের পর আর কী শেখবার আছে? কৃষ্ণই মানবজ্ঞানের শেষ কথা।

ছেলেবেলায় আমরা ওয়ার্ড মেকিং খেলা খেলতুম। অক্ষর জুড়ে জুড়ে শব্দ বানাতুম। কিন্তু সেসব শব্দ ইংরেজী অভিধানের শব্দ। মনগড়া শব্দ নয়। কিন্তু একটু বেশী বয়সে এক পাঞ্জাবী ছাত্র একটি মনগড়া শব্দ বানিয়ে ফেললেন। 'পাকিস্তান'। ইংরেজী বর্ণমালার যেসব শব্দ জুড়ে জুড়ে এই কাল্পনিক শব্দটি হলো তার তৃতীয়টি হচ্ছে 'কে' অর্থাৎ 'ক'। কাশ্মীরের আদ্য অক্ষর। সেই থেকে পাকিস্তান নামক কল্পনার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ হলো কাশ্মীর। কাশ্মীরকে বাদ দিলে পাকিস্তান হয়ে যায় 'পাইস্তান'। তাহলে পাকিস্তানের অধিবাসীরা আর নিজেদের 'পাক' অর্থাৎ পবিত্র বলে দাবী করতে হক্‌দার হয় না। তারা হয়ে যায় 'পাই'। দুর্বোধ্য শব্দ।

সত্যি সত্যি যে একদিন পাকিস্তান বলে একটি রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হবে এটা ইতিহাসের বিস্ময়। কিন্তু ইতিহাসে যে কেবল বিস্ময় জোগায় তাই নয়, কৌতুকও জোগায়। মানুষকে নিয়ে কৌতুক তো ইতিহাসদেবতার সর্বদিনের

খেলা। পাকিস্তান মঞ্জুর হলো, অথচ কাশ্মীর তার সামিল হলো না। হলো কিনা বঙ্গের একাঙ্গ।

কিন্তু ওই যে ছাত্রটি ওয়ার্ড মেকিং খেলায় 'ক' অক্ষর ব্যবহার করেছেন ওটা তো আর ভোলা যায় না। বঙ্গের একাঙ্গ থাক আর নাই থাক, কাশ্মীর চাইই চাই। ওটা একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ। কাশ্মীর বাদ গেলে পাকিস্তানের কেবল অঙ্গহানি নয়, ভাবহানি হয়। পাকিস্তানের পেছনে একটা ইডিওলজি আছে। তাতে বলে হিন্দু ও মুসলমান এক নেশন নয়। দুই নেশন। দুই নেশনের দুই বাসভূমি। পাকিস্তান আর হিন্দুস্তান। কাশ্মীরের অধিকাংশ লোক যখন মুসলমান তখন কাশ্মীর কেমন করে হিন্দুস্তানে পড়বে? কাশ্মীর পড়বে পাকিস্তানে।

এখন এই ধরনের যুক্তি যদি সত্য হতো তাহলে নেশন তৈরি করা কত সহজ হয়ে যেত। নেপাল এসে যেতো ভারতে, যেহেতু সে হিন্দুপ্রধান। ভুটান চলে যেতো তিব্বতে, যেহেতু সে বৌদ্ধপ্রধান। আফগানিস্তান মিশে যেতো পাকিস্তানে, যেহেতু সে মুসলমানপ্রধান। পাকিস্তান যোগ দিত ইরান ইরাক তুরস্কের সঙ্গে, যেহেতু সে মুসলমানপ্রধান। এ যুক্তির সার্থকতা আমরা কোথাও দেখছিনে। দুই মুসলমানপ্রধান দেশ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া এখন পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধরত। ইন্দোনেশিয়া নাকি পরমাণু বোমা নির্মাণ করছে সিঙ্গাপুর আর কুয়ালালামপুরের উপর ফেলবার জন্যে। তার মানে স্বধর্মী নিধনের জন্যে।

খ্রীস্টান দেশগুলির গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস আমরা সকলেই জানি। খ্রীস্টান জার্মানীর পরম মিত্র হলো বৌদ্ধ জাপান, আর পরম শত্রু খ্রীস্টান ফ্রান্স, খ্রীস্টান ব্রিটেন। ওদিকে বৌদ্ধ জাপানের পরম শত্রু হলো বৌদ্ধ চীন, আর পরম মিত্র হলো খ্রীস্টান জার্মানী। এই বিচিত্র জগতে ধর্মের যুক্তিই একমাত্র যুক্তি নয়। ইউরোপের ইতিহাসের পাতা ওলটাতে গিয়ে দেখেছি ভিয়েনা যখন তুর্কদের আক্রমণের মুখে বিপন্ন, ভিয়েনা গেলে পশ্চিম ইউরোপ যায়-যায়, সেরকম দিনেও তুর্কদের সঙ্গে তলে তলে হাত মিলিয়েছেন ফ্রান্সের রাজা। পরম ধার্মিক খ্রীস্টান। অস্ট্রিয়ার রাজশক্তি তাঁর চক্ষুশূল।

কাশ্মীর যে মুসলমানপ্রধান এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সিন্‌কিয়াংও তো মুসলমানপ্রধান। পাকিস্তান কেন চীনের কাছে সিন্‌কিয়াং দাবী করে না? পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান যতদূর সিন্‌কিয়াং ততদূর নয়। আকাশপথে রাওলপিণ্ডি থেকে ঢাকা যেতে যত সময় লাগে কাশগড় যেতে তত সময় লাগে না। চট্টগ্রাম থেকে কুয়ালালামপুরও তো এমন কিছু বেশী দূর নয়। পাকিস্তান কেন মালয় দাবী করে না? পামীরের ওপারেই সোভিয়েট শাসিত বাদাকশান। ওটা দাবী করলে তো ইসলামী সংহতি আরো জোর পেতো।

আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন একটা উপাদেয় প্রশ্ন। কিন্তু কই, পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে তো আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে গণভোট নেওয়া হয়নি। গণভোট নিলে

বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান মিশ্র নির্বাচন পদ্ধতিতেই দিত, স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতিতে নয়। মুসলিম লীগের বাইরে বহু মুসলমান ছিল, তারা পাকিস্তান চায়নি। পাকিস্তান হলে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হবে, একথা পরিষ্কার জানা থাকলে মুসলিম লীগের ভিতরে যারা ছিল তারাও দ্বিমত হতো। ইংরেজ রাজত্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে, চারিদিকে অরাজকতার লক্ষণ, গৃহযুদ্ধের চেয়ে পার্টিশন ভালো, এই চিন্তার থেকে যে সিদ্ধান্তের উদ্ভব সেটার পেছনে ছিল ইংরেজ নামক একটি তৃতীয় পক্ষ, যে এতকাল শান্তিরক্ষা করেছিল, যার উপরে বরাত দিয়ে লোকে নিশ্চিন্ত ছিল। তৃতীয় পক্ষকে বাদ দিলে বাকী থাকে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ। সেই দুই পক্ষে একতা ছিল না বলেই এক এক পক্ষকে এক এক ভাগ দিয়ে শান্তির ব্যবস্থা করতে হলো।

কিন্তু ইংরেজ বিদায়ের পর তো আর সে পরিস্থিতি নেই। কাশ্মীরের উপর যদি পাকিস্তানের দাবী থাকে তো ভারতেরও দাবী আছে। ভারত এককালে সৈন্য পাঠিয়ে তাকে রক্ষা করেছে। এখনো করছে। কাশ্মীর মুসলমানপ্রধান বলে ভারতের দাবী অন্যায় বা অযৌক্তিক হয়ে যায় না। ভারত যদি হিন্দু রাষ্ট্র হতো তাহলে অবশ্য কথা উঠত যে কাশ্মীরী মুসলমানদের উপর ভারতের কোনো নৈতিক দাবী নেই। কিন্তু ভারত একটি সেকুলার স্টেট। সকলের উপরই এর নৈতিক দাবী আছে। যেমন খ্রীস্টান-প্রধান নাগাল্যাণ্ডের উপরে তেমনি বৌদ্ধপ্রধান নেফার উপরে, সিকিমের উপরে। পাকিস্তানীদের এ তত্ত্ব বোঝানো মুশকিল। কারণ তাদের ঐতিহ্যে সেকুলার স্টেট বলে কিছু নেই। তারা ভাবতেই পারে না কোনো একটা রাষ্ট্র সত্যি সত্যি সেকুলার হতে পারে। তাদের বিশ্বাস ভারতের ওটা একটা চাল। ভারত আসলে একটা হিন্দু রাষ্ট্র। সেকুলার বলে মিথ্যা পরিচয় দিচ্ছে। তাই যদি হতো তবে ওই ছলনাটার আরম্ভ ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মদিন থেকে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউম, দাদাভাই, ডব্লিউ সি বনার্জি এঁরাও সেই ছলনার নাটের গুরু। ব্রিটিশ লেবার পার্টির অধিকাংশ সদস্য খ্রীস্টান বলে ওটা ওর সেকুলার চারিত্র্য হারায় কি? লেবার শাসিত ইংলণ্ডও রাজনৈতিক ব্যাপারে তার সেকুলার প্রকৃতি থেকে ভ্রষ্ট হয় কি?

এই বিবাদের মূলে সত্যিকারের যুক্তি বলে একটিই আছে। সেটি কাশ্মীরের অ্যাকসেসনের সময় নেহরুর প্রতিশ্রুতি যে কাশ্মীরের অধিবাসীদের গণভোট নিয়ে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হবে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে একটি অলিখিত শর্ত ছিল। কাশ্মীরীরা ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেকুলার গণনার দ্বারা পরিচালিত হবে। অর্থাৎ মুসলমান বলেই পাকিস্তানে যাবে, এমন নয়। রাজনৈতিক হিতাহিত অর্থনৈতিক সুবিধা অসুবিধা বিচার করবে। কাশ্মীরী মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই সেণ্টো সীআটো প্রভৃতি শক্তি জোটে যোগ দেওয়া পছন্দ করে না। কেন তারা বহিঃশক্তির ক্রীড়নক হবে? অনেকে চীনের উপর প্রসন্ন নয়। কেন তারা পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতিতে সায় দেবে? অনেকে গণতন্ত্র চায়, প্রত্যক্ষ

নির্বাচন চায়, মিশ্র নির্বাচন চায়। কেন তারা পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক সংবিধান মেনে নেবে? সব দিক বিবেচনা করার মতো বিদ্যাবুদ্ধি যদি নাগরিকমাত্রের থাকত তাহলে গণভোট অনুষ্ঠিত হলে ওরা সেকুলার রাষ্ট্রের পক্ষেই ভোট দিত। কিন্তু এমনভাবে ওদের ধর্মান্ধতা জাগিয়ে তোলা হবে যে ওরা চোখ বুজে ইসলামের পক্ষেই ভোট দেবে ও গণভোটের প্রকৃত উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করবে। আয়ুব খান্ বলেন যে পাকিস্তানীরা গণতন্ত্রের উপযুক্ত হয়নি, যখন হবে তখন গণতন্ত্র পাবে। তাই যদি হয় তবে কাশ্মীরীরা পাকিস্তানে যোগ দিলে গণতন্ত্র হারাবে। তা সত্ত্বেও যদি পাকিস্তানে যোগ দিতে চায় তবে বুঝতে হবে যে ওরা গণভোটের উপযুক্ত হয়নি। নেহরুর প্রতিশ্রুতির অলিখিত শর্ত পালন করবার সময় আসেনি। তার আগে পাকিস্তান গণতন্ত্রের উপযুক্ত হোক, বহিঃশক্তির শিবির থেকে বেরিয়ে আসুক, সেকুলার হোক।

গণভোট হলে কাশ্মীর যে পাকিস্তানের 'ক' হতে চাইবে এটা পাকিস্তান ছাড়া আর কে ধরে নিচ্ছে? শেখ আবদুল্লা বরঞ্চ ভারত পাকিস্তান উভয়ের বাইরে এক স্বাধীন কাশ্মীর রাষ্ট্র পত্তন করতে পারলেই তুষ্ট হন। তাই যদি হয়ে থাকে তবে গণভোটের দ্বিতীয় এক শর্ত লঙ্ঘিত হয়। সেটি এই যে কাশ্মীরকে হয় ভারতে নয় পাকিস্তানে যোগ দিতে হবে। সে তৃতীয় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হতে পারবে না। এটা ১৯৪৭ সালে ইংরেজ বিদায়ের পূর্বেই স্থির হয়ে যায়। কাশ্মীরের জননায়করাও সে সময় স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব চাননি। এসব পরবর্তীকালের ভাবনা। দুর্বল একটি রাজ্য হঠাৎ স্বাধীন এক রাষ্ট্র হয়ে উঠলে তাকে তার শত্রুদের হাত থেকে বাঁচাবে কে? ভারত না বাঁচালে পাকিস্তান গ্রাস করবে যে!

কাশ্মীরের একখণ্ড এখনো পাকিস্তানের অধিকারে রয়েছে। সুতরাং পাকিস্তান যে 'ক' অক্ষরের কিঞ্চিৎ পায়নি তা নয়। সবটার জন্যে লড়তে গেলে সবটা হারাতেও পারে। যুদ্ধে কে জিতবে কে হারবে তা আগে থেকে জোর করে বলা যায় না। হিটলারকেও তো গোড়ার দিকে জিততে দেখা গেল। কিন্তু জার্মানরা এমন হারান হারাল যে স্টালিনগ্রাড থেকে হটতে হটতে রাশিয়ানদের ডেকে নিয়ে এল বার্লিনে। এখনো তারা সেখানে রয়েছে। লাভের মধ্যে জার্মানীই ভাগ হয়ে গেছে। তেমনি পাকিস্তান যে যুদ্ধে জয়লাভ করবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। শ্রীনগর থেকে হটতে হটতে ভারতীয়দের হয়তো ডেকে নিয়ে যাবে ঘরে। যদি না কোনো এক তৃতীয় পক্ষ এসে তাকে রক্ষা করে। করা সম্ভবপর। পশ্চিমা শক্তিদের সঙ্গে এখনো তার মিত্রভেদ হয়নি। ওদিকে চীনের সঙ্গেও তার সীমান্তচুক্তি হয়েছে। তাতেও কী যেন একটা গুপ্ত ধারা আছে। অন্যান্য শক্তিরা যদি পাকিস্তানের রক্ষক হবার জন্যে এগিয়ে আসে তবে ভারতকে ঢের বেশী সাবধান হতে হবে।

আমরা পাকিস্তানের ক্ষয়ক্ষতি চাইনে। কাশ্মীরের খানিকটে সে বারো বছরের উপর বেআইনীভাবে দখল করে আছে। বলতে গেলে ওটা এখন ওরই হয়ে গেছে। ইচ্ছা করলে ওখানে একটা গণভোটের অনুষ্ঠান করে ওটাকে ও

পাকাপাকিভাবে নিজের অঙ্গীভূত করতে পারে। কিন্তু ওর আকাঙ্ক্ষা ওইখানেই সীমাবদ্ধ নয়। সংঘাত অনিবার্য। শুধু যে ভারতের সঙ্গে তাই নয়, কাশ্মীরের নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশের ভোটে প্রতিষ্ঠিত কাশ্মীর সরকারের সঙ্গেও। পাকিস্তান স্বয়ং গণতন্ত্র মানে না, যেটুকু ছিল সেটুকুকে ধ্বংস করেছে। সুতরাং সে তো কাশ্মীর সরকারের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে হেসে উড়িয়ে দেবেই। সম্প্রতি কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ যারা করেছে তাদের হয়ে পাকিস্তান প্রচার করছে যে তারা কাশ্মীরী বিপ্লববাদী। বিপ্লব যারা ঘটায় তারা পরের স্বার্থে ঘটায় না, তারা পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রকে কাশ্মীর নামক একটি ভূখণ্ড পাইয়ে দেবার জন্যে তাদের আপনার শক্তি নিয়োগ করতে যায় না। আর বিপ্লবীদের ধর্ম ইসলাম নয়, বিপ্লবীদের ধর্ম আজকাল কমিউনিজম। কাশ্মীরে যদি যথার্থই একটা বিপ্লব ঘটে তবে কাশ্মীর ঝুঁকবে চীনের দিকে। পাকিস্তানের দিকে নয়। এটা হচ্ছে বিপ্লব শব্দটাকে নিয়ে আরেক রকম ওয়ার্ড মেকিং খেলা। বিপ্লব যাকে বলা হচ্ছে সেটা ঘোরতর রক্ষণশীল একটি রাষ্ট্রের বেনামী অনুপ্রবেশ ও আক্রমণ।

এ খেলা ভারতও খেলতে পারত, কিন্তু খেলবে না, খেলা উচিত নয়। পাকিস্তান যদি সরাসরি যুদ্ধে নামতে সাহসী না হয় তবে এই অভিযাত্রীদের দম ফুরিয়ে যাবে। এরা ধরা পড়বে, মার খাবে, পালাবে। বহু শতাব্দী পরে এ এক বর্গীর হাঙ্গামা। একে বিপ্লব বললে সত্যের অপলাপ হয়। আর যুদ্ধ বললে বাড়িয়ে বলা হয়। তবে এটা যুদ্ধের ভূমিকা হতে পারে। এই অভিযান ব্যর্থ হলে পাকিস্তানের কর্তাদের প্রেস্টিজ খাটো হবে, সেটা তাঁদের বিরোধীপক্ষের গণতান্ত্রিক দাবীকে জোরদার করবে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরেই এমন এক গণআন্দোলন আরম্ভ হবে যে কর্তাদের আসন টলবে। সেসব এড়াবার ক্লাসিকাল উপায় হচ্ছে যুদ্ধের পথে পা বাড়ানো। আয়ুব খান কি তাই করবেন, না মিটমাটের জন্যে হাত বাড়িয়ে দেবেন ? আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে অক্ষম। তবে আমার মনে হয় পাকিস্তানের যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা মার্কিনদের নেই, ইংরেজদেরও নেই। যাতে জড়িয়ে পড়তে না হয় সেইজন্যে ওরাই পাকিস্তানকে নিবৃত্ত করতে তৎপর হবে। তার মানে যুদ্ধ না করে সন্ধি করতে পরামর্শ দেবে।

মিটমাটের সম্ভাবনা অনেকদিন আগেই ছিল, হতে যাচ্ছে এমন সময় পাকিস্তানকে অস্ত্রসাহায্য করে আইজেনহাওয়ার তার দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়িয়ে দেন। সে পিস্তল দেখিয়ে কাশ্মীর আদায় করবে এই ব্ল্যাকমেলে নেহরু বেঁকে বসেন। কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। কথাবার্তা যখন অবশেষে শুরু হয় তখন পাকিস্তানে শাসক বদল হয়েছে। নতুন শাসকদের পলিসি চীনের সঙ্গে দহরমমহরম। কতকটা মার্কিনদের সমঝিয়ে দিতে যে তাঁরা মার্কিনদের হাতের পুতুল নন। কতকটা ভারতকে সমঝিয়ে দিতে যে তাঁদের আরেক মুরুব্বি আছেন, দরকার হলে তিনি ভারতকে শিক্ষা দেবেন। কথাবার্তা ফেঁসে যায়। ইতিমধ্যে আরো একদফা চেষ্টা হয়েছে, এগোয়নি।

না হবার কারণ ভারত কাশ্মীরকে পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি অঙ্গরাজ্যে পরিণত করে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিয়েছে যে কাশ্মীর নিয়ে আর কথাবার্তার অবকাশ নেই। এটা বিজ্ঞতা কি অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে।

অনেকের মতে কাশ্মীর সংক্রান্ত কথাবার্তার দরজা একেবারে বন্ধ করা উচিত নয়। যদিও আমাদের প্রহ্লাদ 'ক' অক্ষরেই আটকে থাকবে, খ অক্ষরে যাবে না, গ অক্ষরে যাবে না তবু আমাদের বর্ণমালায় খ অক্ষর আছে, গ অক্ষর আছে। তার মানে ভারত পাকিস্তানের মাঝখানে একশোটা মামলা আছে। সব ক'টা মামলা একে একে মেটাতে হবে। এটা উভয় রাষ্ট্রের স্বার্থ। উভয় রাষ্ট্রের উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ। কাশ্মীর 'ক' অক্ষর না হতে পারে, কিন্তু 'ক্ষ' অক্ষর তো বটেই। ভারত পাকিস্তানের মামলার তালিকার গোড়ার দিকে না হোক শেষের দিকে তো কাশ্মীরের মামলা থাকবেই। মামলার তালিকার থেকে ওটার নাম খারিজ করা যায় কি? বরঞ্চ বলতে পারা যায় সব মামলার শেষে কাশ্মীরের মামলা উঠবে। তখন আমরা দু'ভাই কাশ্মীর নিয়েও আপোসে পৌঁছব।

সুতরাং পাকিস্তানকে হিংসার থেকে নিবৃত্ত হতে বলার সঙ্গে সঙ্গে ভারতকেও বলতে হয় চরম সিদ্ধান্তের থেকে নিরস্ত হতে। দরজা খোলা রাখাই সুবুদ্ধি।

আমাদের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে কমন মার্কেট, কমন ডিফেন্স, কমন ফরেন অ্যাফেয়ার্স। পাকিস্তান আপাতত এতে রাজী নয়। এতে তার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক অবস্থার চাপে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মতো ভারত পাকিস্তান নেপাল সিংহলকেও কমন মার্কেট, কমন ডিফেন্স ইত্যাদির প্রস্তাবে রাজী হতে হবে। কবে, কতদিন পরে সেটা আমার কল্পনার বাইরে। কিন্তু এটা আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে জনগণের বাঁচবার পথ পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয় পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। দশ বিশ বছরের মধ্যে যদি আমরা সবাই মিলে একজোট না হই তবে কমিউনিজম প্রবল হবে। চীনের সঙ্গে দহরমমহরম করে তাকে ভারতের গায়ে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে বুদ্ধিভ্রংশ। পাকিস্তানের বর্তমান শাসকদের পলিসি ভুল।

যা বলছিলুম, অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে কমন মার্কেট, ইকনমিক কমিউনিটি, কমন ডিফেন্স, ডিফেন্স কমিউনিটি ইত্যাদি। এর জন্যে ভারতকেও কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। ভারত তার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দিয়ে আর সবাইকে কোণঠাসা করবে এটা কাম্য নয়। আবার পাকিস্তান তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবকে ব্ল্যাকমেল দিয়ে পূরণ করবে এটাও অন্যায়। কাকে কতখানি ছাড়তে হবে, মেনে নিতে হবে, এসব এই মুহূর্তে আমার মানসে নেই। কিন্তু আমি বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে একদিন না একদিন ভারত পাকিস্তান নেপাল সিংহলকে একজোট হয়ে তাদের সব সমস্যার সমাধান করতে হবে।

সেই অন্তিম লক্ষ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলে আমরা এমন কোনো ভুল

করব না যার ফলে সেই লক্ষ্য আরো বেশীদূর পেছিয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই পেছিয়ে গেছে। ভারত পাকিস্তানের সৈনিকরা কোনো কালে পরস্পরের উপর গুলী ছোঁড়েনি। বরাবরই তারা কমরেড। কিন্তু দেশবিভাজনের পর কাশ্মীরকে উপলক্ষ করে মাঝে মাঝে তারা জ্ঞাতিবধ করেছে। এখন পর্যন্ত এটা অল্পক্ষেত্রেই ঘটেছে। এখন থেকেই একে সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে হবে। যাকে রাখ সেই রাখে। ভারত পাকিস্তানের সত্যিকার সম্পর্ক পরস্পরকে রক্ষা করা। আঠারো বছরে এ সম্পর্ক রদ হয়নি। কিন্তু বড়োরকম একটা যুদ্ধ যদি বেধে যায়, হাজার হাজার সৈনিক যদি মরে তবে ওরা পরস্পরের এমন শত্রু হয়ে উঠবে যে উভয়ের সাধারণ শত্রুর সঙ্গে কোনোদিন একজোট হয়ে লড়বে না। বরং শত্রুর হয়ে লড়বে। তেমন যদি হয় তবে ভবিষ্যৎ ভয়াবহ।

এ আগুন অবিলম্বে নিবিয়ে ফেলা কর্তব্য।

পটভূমিকা

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে যে সমস্যা পাকিস্তানীদের কিছুতেই একমত হতে দিচ্ছে না সেটি হলো একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান। যদি প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্ক নাগরিককে একটি করে ভোটের অধিকারী করা হয় তাহলে বাঙালীদের ভোট অ-বাঙালীদের ভোটকে ছাড়িয়ে যায়। তার ফলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে বাঙালী সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয়। সেইসূত্রে পাকিস্তানী সৈন্যদলে, সিভিল সার্ভিসে, কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য বিভাগে। স্বধর্মী হলেও অ-বাঙালীরা বাঙালীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সহ্য করতে রাজী নয়। বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়, মূলনীতি নির্ধারণ আর কিছুতেই হয় না। শেষে সাব্যস্ত হলো যে দেশটাকে পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত করতে হবে ও লোকসংখ্যা কম বেশী হওয়া সত্ত্বেও উভয় প্রদেশকে প্যারিটি দেওয়া হবে।

এই "প্যারিটি" শব্দটি অবশেষে মুশকিল আসানের কাজ করে। ভোটার সংখ্যা যত বেশী আর যত কম হোক না কেন প্রতিনিধি সংখ্যা ফিফটি ফিফটি। সেকালের বি সি চ্যাটার্জির ফরমুলার নাম ছিল ফিফটি ফিফটি। তাঁর ডাকনামও দাঁড়িয়ে যায় ফিফটি ফিফটি চ্যাটার্জি। কিন্তু একালের এই প্যারিটিতে বাঙালীদের জনসংখ্যাকে তার উপযুক্ত ওজন দেওয়া হয় না। প্রকারন্তরে অ-বাঙালীরাই ওয়েটেজ পায়। তখন বাঙালীরা দাবী করে বসে মিশ্র নির্বাচন পদ্ধতি। হ্যাঁ, বাঙালী মুসলমানরাই হঠাৎ মিশ্র নির্বাচনের ভক্ত হয়ে পড়ে। তারা হিসাব করে দেখে যে পশ্চিম পাকিস্তানের ফিফটিতে একটিও অমুসলমান থাকবে না, অথচ পূর্ব পাকিস্তানের ফিফটিতে থাকবে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির দৌলতে কয়েকজন অমুসলমান। ফলে কেন্দ্রীয়

পার্লামেন্টে পশ্চিমা মুসলমান ও বাঙালী মুসলমান সমান সমান হবে না, বাঙালী মুসলমানরাই সংখ্যায় কম হবে। তাহলে প্যারিটিতে রাজী হয়ে তাদের লাভ কী হলো? সেইজন্যে তারা দাবী করে যে প্যারিটি যদি হয় তবে মিশ্র নির্বাচনও হবে। মিশ্র নির্বাচন যদি না হয় প্যারিটিও হবে না। নানা ওজর আপত্তির পর পশ্চিমারাও এ দাবী মেনে নেয়, কিন্তু সকলে নয়। মুসলিম লীগ হুমকি ছাড়ে যে মিশ্র নির্বাচন পদ্ধতি সে প্রাণ থাকতে মানবে না। লীগের পক্ষে ওটা প্রাণদণ্ডের সামিল। ওই মই বেয়েই সে গাছে উঠেছে। মই কেড়ে নিলে সে ফল পেড়ে খাবে কী করে? অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করে আবার এক ডাইরেকট অ্যাকশনের দ্বারা সাধারণ নির্বাচন পণ্ড করতে উদ্যত হয় লীগ। এমন সময় ইস্কান্দর মির্জা ও আয়ুব খান্ মিলে "বিপ্লব" করেন।

এরপর আয়ুব খান্ দেশবাসীকে একটি সংবিধান উপহার দেন। অর্থাৎ উপর থেকে চাপিয়ে দেন। তাতে প্যারিটি রইল, মিশ্র নির্বাচন রইল, রইল না কিন্তু প্রত্যক্ষ নির্বাচন। পরোক্ষ নির্বাচনে যাঁরা প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন তাঁদের হাতে ক্ষমতা রইল অতি সামান্য। প্রেসিডেণ্ট অনেকটা সেকালের বড়লাটের মতো সর্বশক্তিমান হয়ে তাঁর মনের মতো মন্ত্রীদের, গভর্নরদের নিয়ে দেশ শাসন করতে লাগলেন। পরে উপর থেকে একটা দলও চাপানো হয়। সরকারী মুসলিম লীগ। পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিক অর্থে মর্লি-মিণ্টোর যুগে ফিরে যায়। এটা একটা প্রচ্ছন্ন বড়লাটতন্ত্র। জঙ্গীলাটতন্ত্র বললেও চলে। কারণ আয়ুব খান্ শুধু প্রেসিডেণ্ট নন, তিনি ফীল্ড মার্শাল।

বহু শতাব্দীর পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে ইংলণ্ডে বিবর্তিত হয়েছিল মিলিটারীর উপর সিভিল কণ্ট্রোল। দুশো বছর ধরে ইংলণ্ডের কাছে শিক্ষা নিয়ে আমরাও হয়েছিলুম তার উত্তরাধিকারী। কিন্তু পাকিস্তান সেটা হারিয়ে বসেছে। কবে ফিরে পাবে খোদা জানেন। তেমনি বহু শতাব্দীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে ইংলণ্ডে বিবর্তিত হয়েছিল গভর্ণমেণ্টের উপর পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব। আমরাও তার উত্তরাধিকারী হয়েছিলুম। কিন্তু পাকিস্তান জল মিশিয়ে যা বানিয়েছে তার স্বাদ অন্যরকম। এখন পাকিস্তানীরা উঠে পড়ে লেগেছে ভারতের মতো একটি সংবিধান পেতে। তারা চায় পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসী তথা মিলিটারির উপর সিভিল কণ্ট্রোল। পাকিস্তানের দুই প্রান্তের মানুষ এই দুটি ক্ষেত্রে একমত। তা ছাড়া আরো একটি ক্ষেত্রেও তারা একমত যে প্রদেশগুলি আগেকার মতো বহুসংখ্যক হবে ও আগেকার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। উপরন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অনেকের ইচ্ছা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যে ক্ষমতা থাকবে সেটা যেন আরো সীমাবদ্ধ হয়, বাড়তি ক্ষমতা যেন বিকেন্দ্রীকৃত হয়। পূর্ব পশ্চিম পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়েও যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় এটাও তাঁদের ইচ্ছা। নতুন সংবিধানে এর জন্যে জায়গা থাকবে।

কিন্তু এখনো কয়েকটি দল আছে তারা মিশ্র নির্বাচনে নারাজ, সুতরাং

নতুন সংবিধান রচনার সময় যখন আসবে তখন তারা আবার একটা লড়াই বাধাতে যাবে। তাদের কথা মেনে নিলে প্যারিটিতে পূর্ব পাকিস্তানীদের লাভ হয় না, সুতরাং সংবিধান রচনার সময় যখন আসবে তখন এরাও আবার একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করবে। এরা বলবে এক একটি মানুষ এক একটি ভোট। বাঙালী যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় তবে বাঙালীই পার্লামেণ্ট ও কেন্দ্রীয় সরকারে সংখ্যাগুরু হবে।

প্রথম দিকের ইসলামিক স্টেট আজকের দিনে খুব একটা জবরদস্ত আইডিয়া নয়। কিন্তু এখনো ওর যথেষ্ট শক্তি আছে। পূর্ব পশ্চিমকে একজোট করার বেলা ও যদি না থাকে আর কোনো সিমেণ্ট থাকে না। তেমনি ওর দরকার পড়ে কাশ্মীরকে কব্জা করার জন্যে। ও যদি যায় তবে কাশ্মীরের উপর দাবী খাটে না। তেমনি ওর প্রয়োজন হয় পাঠানিস্তান অস্বীকার করার সময়। ও যদি যায় পাঠানদের ধরে রাখা দায় হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা মুসলিম লীগ প্রমুখ সাম্প্রদায়িক দলগুলির অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে ইসলামিক স্টেট বলে একটি আইডিয়া চাই। যদিও প্রত্যেকদিন মানুষের মন ওকে পিছনে ফেলে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসী ও সিভিল কাণ্ট্রোলের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। অপরপক্ষে সোশিয়ালিজমের স্বপ্নও মানুষের মন অধিকার করছে। ভারতের মতো পাকিস্তানেও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ধুম পড়েছে।

পাকিস্তানের আত্মা এখন পুরোপুরি ইসলামের কৌটায় ভরা নয়। তার দুই হাত ধরে তাকে দুই দিকে টানছে আমেরিকা ও চীন। সে যদি আর পাঁচ দশ বছরের মধ্যে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসী, প্রত্যক্ষ নির্বাচন, সিভিল কণ্ট্রোল ইত্যাদি না পায় তবে হতাশ হয়ে চীন কিংবা বর্মার মার্গ ধরবে। সেরকম সময় যখন আসবে তখন পাকিস্তান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে এক ভাগ সোশিয়ালিস্ট ও অপর ভাগ ক্যাপিটালিস্ট শিবিরে যেতে পারে। আয়ুব খান্ একটা ব্যালান্স রক্ষার চেষ্টা করছেন। যাতে পাকিস্তান দুই দিকে চলতে গিয়ে ছিন্নভিন্ন না হয়ে যায়। পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা এখন পূর্বপশ্চিম সমস্যা। পূর্ব বনাম পশ্চিম পাকিস্তান। আমেরিকা বনাম চীন। পূর্ব বনাম পশ্চিম শিবির।

পাকিস্তান তার নিজের সমস্যা নিয়ে এমন জর্জরিত যে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ক্ষমতা তার নেই। ইচ্ছাও যে আছে তাই বা কেমন করে বলি? সরকার ও জনগণ তো এক নয়। বিশেষত পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি থাকতে। পাকিস্তান যুদ্ধ করে পাবেই বা কী! আক্রমণ করে একদিন যেটা পাবে প্রতি-আক্রমণে আরেকদিন সেটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। ভারতীয় সেনাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত না করলে কোন দখলই পাকা হবে না। সামরিক দখল জাপানীরাও তো যুদ্ধকালে নানা দেশে করেছিল। দখল বজায় রাখতে পারল কি?

আমার মনে হয় পাকিস্তানের আসল অভিপ্রায় যুদ্ধ জিতে কাশ্মীর লাভ নয়, কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করে কাশ্মীরীদের মধ্যে বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলে তাদের

সঙ্গে হাত মিলিয়ে এমন এক বিপর্যয় সৃষ্টি করা যা দেখে দুনিয়ার লোক বলবে, ভারতকে কেউ চায় না, ভারত গায়ের জোরে চেপে বসেছে। বিদ্রোহ যদি সফল হয় তবে তো কেল্লা ফতে, বিফল হলেও চারদিকে সাড়া পড়ে যাবে যে, কাশ্মীরীরা ভারতবিরোধী, তারা ভারতীয়ই নয়। ফলে ইউনাইটেড নেশনসের দুই তৃতীয়াংশ সভ্য পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেবে। সিকিউরিটি কাউন্সিলে রাশিয়া ভীটো প্রয়োগ করলেও জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে পাকিস্তান ভোটে জিতবে। কত সহজ খেলা !

কিন্তু গোড়ায় গলদ কাশ্মীরীরা যদি বিদ্রোহ না করে তাহলে কী উপায় ? "যে পথ দিয়ে মোগল এসেছিল সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো আর।" আর যদি ফেরেও তবে দ্বিতীয়বার অনুপ্রবেশ করা শক্ত হবে।

গৃহযুদ্ধের সূচনা

উনিশ বছর আগে এমনি এক আগস্ট মাসে শুরু হয়ে যায় মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট য়্যাক্শন। দেখতে দেখতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। যে উত্তাপটা সঞ্চিত হচ্ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আর্থিক পেষণে সেটা ইংরেজের অভিমুখে পরিচালিত হলে বিপ্লব ঘটাত। কিন্তু হলো হিন্দুর বিরুদ্ধে, তার থেকে মুসলমানের বিরুদ্ধে। সেসময় গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হয়, "এটা কি গৃহযুদ্ধ ?" তিনি উত্তর দেন, "না, গৃহযুদ্ধ নয়, তবে গৃহযুদ্ধের সূচনা।" কথাগুলি ঠিক মনে নেই, কিন্তু ভাবার্থ ওই।

তার পরে কী হলো তা সকলের মনে আছে। গৃহযুদ্ধ ইংরেজ থাকতে হতে পারত না, কিন্তু ইংরেজ চলে গেলে হতোই হতো, যদি না মুসলিম লীগকে দেশের একাংশ ইংরেজের হাত দিয়ে ভাগ করে দেওয়া হতো। অন্য যেসব বিকল্প ছিল সেসব ইংরেজ অবর্তমানে ধোপে টিকত না। আর ইংরেজকে ধরে রাখাও সম্ভব বা সঙ্গত হতো না। আসল ক্ষমতা অপরকে দিয়ে কেনই বা ওরা সাক্ষীগোপাল হয়ে থাকবে !

চাকা আবার ঘুরতে ঘুরতে অবিকল সেই জায়গাটিতে এসে পৌঁছেছে। মহাযুদ্ধের আর্থিক পেষণ ইতিমধ্যে হালকা হওয়া দূরের কথা আরো গুরুভার হয়েছে। জীবনযাত্রা দুর্বহ। যেমন ভারতে তেমনি পাকিস্তানে। পাকিস্তান ইতিমধ্যে সামরিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে গায়ের জোরে জনতাকে দাবিয়ে রেখেছে, কিন্তু লোকের রাগটাকে পাত্রান্তরিত না করলে গায়ের জোর নিয়ে বেশী দিন চালানো যাবে না। আর রাগটাকে পাত্রান্তরিত করার সহজ উপায় হচ্ছে কাশ্মীরের দাবীতে ভারতের সঙ্গে সংগ্রাম। আপাতত এটা বেনামীতে আরম্ভ করা হয়েছে। এমন ভাব দেখানো হচ্ছে যেন কাশ্মীরীরাই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। পরে ওটুকু ঘোমটার বালাই

থাকবে না। পরিস্থিতিটা মোটের উপর ভিয়েৎনামের অনুরূপ হবে।

যুদ্ধ বলতে বোঝায় নেশনে নেশনে যুদ্ধ। কিন্তু আমরা দুই-নেশন তত্ত্ব স্বীকার করিনি। সুতরাং যেমন গত শতাব্দীর আমেরিকার বেলা ওটা ছিল গৃহযুদ্ধ তেমনি এই শতাব্দীর ভারত পাকিস্তানের বেলাও এটা হবে গৃহযুদ্ধ। অর্থাৎ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ। এই ভ্রাতৃঘাতী সমর কে জানে কতকাল চলবে, কতদূর গড়াবে! কী হবে এর শেষ ফল? হয়তো ভারত পাকিস্তান একাকার হয়ে একপ্রকার কন্‌ফেডারেশন রচনা করবে। হয়তো কাশ্মীর পাকাপাকি-ভাবে পার্টিশন হবে। কিন্তু যেটাই হোক না কেন, নিজেদের মধ্যে সন্ধিসূত্রে বা কথাবার্তাসূত্রে হওয়া চাই। তৃতীয় পক্ষকে দ্বিতীয়বার মধ্যস্থ মানতে যাওয়া ভুল।

গান্ধীজী যেই শুনলেন যে নেতাদের সম্মতিক্রমে দেশ ভাগ করে যাবেন মাউণ্টব্যাটেন, অমনি জ্বলে উঠলেন। বললেন, "তৃতীয় পক্ষের হাত দিয়ে পাকিস্তান নৈব নৈব চ।" অর্থাৎ পাকিস্তান যদি হয় দুই পক্ষের কথাবার্তার ফলে হবে, বন্ধুভাবে হবে। ডাইরেক্‌ট য়্যাক্‌শনের পিস্তল দেখিয়ে বিদেশী কাজীর বিচারফলে নয়।

ভারত পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করা তৃতীয় পক্ষের কর্ম নয়। সে তৃতীয় পক্ষ যেই হোক না কেন। ইংরেজ বা মার্কিন বা চীন বা রুশ বা ইউনাইটেড নেশনস। দুই পক্ষকেই এক টেবিলে বসতে হবে। কোনো পক্ষের হাতে পিস্তল থাকবে না। বহুকালের জমে থাকা মামলা একে একে মেটাতে হবে। কাশ্মীরই একমাত্র মামলা নয়, সর্বপ্রথম মামলা নয়। কাশ্মীরের আরো আগে পাঠানিস্থানের মামলা রুজু হয়েছে। তার বাদী একদা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের নেতা। গোলটেবিল বৈঠকে খান্ আবদুল গফ্‌ফর খান্‌কেও ডাকতে হবে। যেমন শেখ আবদুল্লাকে। স্থায়ী সমাধানের জন্যে জনচিত্ত আকুল হলে সেই আকুলতাই শান্তির উপায় খুঁজবে। যুদ্ধবিগ্রহ চিরন্তন নয়।

আর যুদ্ধবিগ্রহের সত্যিকার কোনো প্রয়োজনও নেই। এটা কখনো হতে পারে না যে মুসলমানকে বাদ দিয়ে হিন্দু বাঁচতে পারে বা বড়ো হতে পারে। অথবা হিন্দুকে বাদ দিয়ে মুসলমান বাঁচতে পারে বা বড়ো হতে পরে। ইতিহাসবিরোধী বিবর্তনবিরোধী, এ মতবাদ আমাদের অগ্রগতিকে অতি দীর্ঘকাল ব্যাহত করেছে। হয়তো আরো কিছুকাল করবে। কিন্তু বরাবর করবে না, করতে পারে না। এটা ভূগোলবিরোধীও বটে।

ভারত পাকিস্তানের সর্বত্র এখন আর্থিক দুর্গতি। ঢাকার পত্রিকাতেও কলকাতার পত্রিকার মতো আর্থিক দুরবস্থার চিত্র ও বিলাপ। যুদ্ধ এই দুরবস্থার প্রতিকার নয়। শান্তি ও সহযোগিতা ভিন্ন আর কোনো প্রতিকার নেই। পার্টিশনের পর থেকে দুই রাষ্ট্রেরই খরচ অনর্থক বেড়ে গেছে। ইংরেজরা ঢের কমে চালাতে পারত। যে শোষণটা ওরা বণিক হিসাবে করছিল সেটা এখনো পুরোপুরি থামেনি। বিভিন্ন খাতে ভারত পাকিস্তান

পশ্চিমকে নজর জোগাচ্ছে। কিন্তু যে ইকনমি ওরা শাসকহিসাবে পোষণ করছিল সেটা পার্টিশনের দুই নৌকায় পা দিয়ে তলিয়ে গেছে।

গৃহযুদ্ধের পরিণাম কারো অজানা নেই। সময়ে অন্তঃপরিবর্তন ঘটলেই রক্ষা।

অন্তঃপরিবর্তন কেবল যে পাকিস্তানী মুসলমানদেরই হওয়া উচিত তাই নয়, ভারতীয় হিন্দুদেরও হওয়া উচিত। কোন একটা দেশে কোন একটা সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেই সে দেশটা তাদের একচেটে সম্পত্তি হয়ে যায় না। দেশ মাত্রেই দেশবাসী মাত্রের মাতৃভূমি। প্রত্যেকেরই তাকে ভালোবাসবার, তাকে স্বাধীন করবার, তার স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দেবার অধিকার আছে। কাশ্মীর রক্ষা করতে গিয়ে সেবার ব্রিগেডিয়ার ওসমান প্রাণ দিয়েছিলেন। এবার দিয়েছেন ব্রিগেডিয়ার বৈরাম মাস্টার। দেশের জন্য যারা প্রাণ দেয়, দেশ তাদের না হয়ে হবে কিনা কতকগুলো ধর্মান্ধ ব্যক্তির বা দলের, যাদের নিত্যকর্ম হলো ধর্মের নাম করে দেশের উপর প্রভুত্ব দাবী করা! অপরাপর সম্প্রদায়ের উপর প্রাধান্য দাবী করা!

ভারত যদি প্রধানত হিন্দুর দেশ হয়ে থাকে তবে কাশ্মীরের উপর তার কোনো নৈতিক দাবী নেই। কারণ কাশ্মীর হচ্ছে মুসলমানপ্রধান। ভারত যদি শুধুমাত্র রাজনৈতিক দাবীর উপর জোর দেয় তা হলে দীর্ঘ সংগ্রামের পর ইংরেজের মতো অপসরণ করতে হবে। ভারতকে কাশ্মীরে থাকবার সনদ দিয়েছে তার সেকুলার স্টেট নীতি। এ নীতি যদি একটা লোকদেখানো ভান হয়ে থাকে তবে আসন্ন অগ্নিপরীক্ষায় ভান দিয়ে কাজ হবে না। চাই সত্যরক্ষা।

প্রতিশ্রুত গণভোট হলে সত্যরক্ষা হতো। সেটা যখন হচ্ছে না তখন সেকুলার স্টেট নীতি রক্ষাই সত্যরক্ষা। ওটাও যদি না হয় তবে আর একটা ভিয়েৎনামের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। সেটার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া পূর্ব পাকিস্তানে ও পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও লোকবিনিময়। কিন্তু সময় থাকতে যদি অন্তঃপরিবর্তন হয় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অন্ধদের, তা হলেই আমরা মহতী বিনষ্টির হাত থেকে ত্রাণ পেয়ে মহৎ ভবিষ্যতের জন্যে বাঁচব।

অহিংসা তো গেছেই। বাকী আছে সত্য। সত্যও যদি যায় তবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে রক্ষা করবে কে? বাহুবল ও ছলচাতুরী? ধর্ম এর নাম নয়। অগ্নিপরীক্ষার দিন এই যথেষ্ট নয়। ভারতের সত্যিকার জোর এইখানে যে ভারত হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান পার্শী নির্বিশেষে সকলের। পাকিস্তান শুধু মুসলমানের।

সমর ও শান্তি

দেশ যখন চোখের সমুখে দু'ভাগ হয়ে যায় তখন আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করি নি। কী করে সে অঘটন সম্ভব হলো তা নিয়ে গবেষণা করেছি। মূঢ়ের মতো ঘোষণাও করেছি যে পাকিস্তান দু'বছর বাদে ফেল করে যাবে। আমার ভবিষ্যদ্‌বাণী যখন ফলি ফলি করছে তখন হঠাৎ শুনি আমেরিকা প্যাকিস্তানকে কোলে টেনে নিয়েছে। পাকিস্তান হয়েছে মার্কিন জোটবন্দী। এতদিন তৃতীয় পক্ষ বলতে বোঝাত ইংরেজ। এর পর থেকে বুঝতে হলো মার্কিন তথা ইংরেজ।

এটা তেমন কল্পনাতীত ছিল না। কিন্তু কল্পনাও পরাস্ত হলো যখন শুনলুম পাকিস্তান হঠাৎ বাঁদিকে মোড় নিয়ে চীনের সঙ্গে মেলামেশা করছে। আমেরিকা এতে খুশি হয় নি। বাধা দিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান সে বাধা অগ্রাহ্য করেছে। এত জোর সে পায় কোথায় যে আমেরিকাকে এক হাতে সরিয়ে চীনের দিকে আরেক হাত বাড়িয়ে দেয়! আমেরিকা রাগ করে ঠিকই কিন্তু তার শাসন যেন মায়ের শাসন। গায়ে লাগে না। দেখা যায় চড়টা-চাপড়টা যেমন পিঠে পড়ছে তেমনি মেঠাই-মোণ্ডা পেটে পড়ছে। পেটে খেলে পিঠে সয়। আর ওদিকে চীনের আদর যেন মাসীর আদর। পাকিস্তানকে মাসীই যেন পেটে ধরেছে। আমেরিকাকে দেখিয়ে দেখিয়ে চীনা কর্তারা পাকিস্তানে আনাগোনা করেন। সম্বর্ধনা পান। চীনকে দেখিয়ে দেখিয়ে মার্কিনদের অপমান করা হয়। এত অপমান ভারত যদি কোনো দিন করত তা হলে ভারতের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি ঘটে যেত। কিন্তু রাজার নন্দিনী প্যারী যা করে তা শোভা পায়।

এর পিছনে কী আছে তা অন্বেষণ করেছি। আছে ভারতের জোট নিরপেক্ষ নীতি। ভারত জোট নিরপেক্ষ হয় এই জন্যে যে ভাবী বিশ্বযুদ্ধকে সে ঘরে ডেকে আনবে না, ঘরের বাইরে সে সৈন্য পাঠাবে না। পাকিস্তান ঘরে ডেকে আনতেও রাজী ছিল, বাইরে সৈন্য পাঠাতেও নারাজ ছিল না। ভারতের দায় যেমন স্বাধীনতা রক্ষা, পাকিস্তানের দায় তেমনি পরের টাকায় ও পরের হাতিয়ারে মস্ত এক সৈন্যদল রক্ষা। অতবড়ো একটি শ্বেতহস্তীকে সে পুষবে ও সাজাবে কী করে! অথচ ওর চেয়ে ছোটখাটো একটা একটি হাতী হলেও তার চলে না। জন্মদিন থেকেই সে সংকল্প নিয়ে বসে আছে যে ভারতের সঙ্গে সে একদিন লড়বে। লড়তে হলে সৈন্য চাই, প্রভূত সৈন্য চাই। আত্মরক্ষার জন্যে লড়াই নয়, লড়কে লেঙ্গের দাবীতে লড়াই। সেই জন্যে তার সৈন্যদলকে ব্যাঙের মতো ফুলতে ফুলতে হাতি হতে হয়। ছোট একটি দেশ। সে চায় বড়ো একটি দেশের সমান বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ও সাঁজোয়াবাহিনী। এর জন্যে যদি জোটবন্দী হতে হয় তবে সে জোটবন্দী হবে। যদি বিশ্বযুদ্ধ ডেকে আনতে হয় তবে সে ডেকে আনবে। যদি বাইরে সৈন্য পাঠাতে হয় তবে সে বাইরে সৈন্য পাঠাবে। তারপর একদিন সে

ভারতের সঙ্গে য়্যায়সা লড়াই লড়বে যে চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে হেরে হিন্দুস্থান কত কী সমর্পণ করবে। শুধু কি কাশ্মীর? আসাম, কলকাতা, দিল্লী। ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন, মন্ত্রিমণ্ডলীতে নির্দিষ্টসংখ্যক আসন, চাকরিবাকরিতে নির্দিষ্ট বখরা ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরে দেখা গেল জোটবন্দী হয়ে পাকিস্তান যা পাচ্ছে জোটবন্দী না হয়ে ভারতও তার চেয়ে কিছু কম পাচ্ছে না। অথচ ভারতের তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাকে বিদেশীদের স্বার্থে সৈন্য সরবরাহ করতে হচ্ছে না। বিদেশীদের স্বার্থে আন্তর্জাতিক সভায় ভোট দিতে হচ্ছে না। ঘরের মধ্যে বিদেশীদের ঘাঁটি জোগাতে হচ্ছে না। পাকিস্তান এসব করে তার মানসম্মান এমনভাবে খুইয়েছে যে মুসলিম দেশগুলিতেও তার অনাদর, ভারতের সমাদর। আর রাশিয়া তো ভীটো প্রয়োগ করে ইঙ্গমার্কিন প্রস্তাবগুলোকে বানচাল করছে। কাশ্মীর প্রাপ্তির আশা সুদূর থেকে সুদূরতর।

ওদিকে ঘরের ভিতরেও অনর্থ কম নয়। পাখতুনরা চায় পাখতুনিস্তান, তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে আস্ত উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশটাকেই বিলুপ্ত করে দিতে হলো। এই কর্মটিকে ঢাকা দিতে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশগুলিকেও মুছে ফেলতে হলো। অমন যে প্রাচীন প্রদেশ পাঞ্জাব আর সিন্ধু তাদের নাম পর্যন্ত রইল না। ওরা সব কটি মিলে হলো এক ইউনিট। আর একা পূর্ববঙ্গ হলো অপর ইউনিট। দুই ইউনিটের লোক-সংখ্যা যদিও সমান সমান নয় তবু প্রতিনিধিসংখ্যা হলো সমান সমান। এতে পূর্ব পাকিস্তানকে খাটো করা হলো। একজন পশ্চিমার ওজন একজন পুরবিয়ার চেয়ে হলো বেশী। দুজনেই প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হতে পারে না। এটা গলাধঃকরণ করতে গিয়ে পুরবিয়াবা চেয়ে বসল যৌথ নির্বাচন পদ্ধতি। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে একই নির্বাচকমণ্ডলী। পশ্চিমারা অনেকেই এটা মেনে নিতে রাজী হয়, কিন্তু মুসলিম লীগ বাদ সাধে। তা হলে যে দ্বিজাতি তত্ত্ব টেকে না। পাকিস্তানের মূল ভিত্তি টলে যায়। সাধারণ নির্বাচনের মুখে মুসলিম লীগের হিংস্র আয়োজন, তা দমন করতে ইস্কান্দর মির্জা ও আয়ুব খান্ কর্তৃক ক্ষমতা দখল, তারপরে আয়ুব খানের একচ্ছত্র শাসন, তারপর নতুন সংবিধান প্রবর্তন। নতুন সংবিধানে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আইনসভা পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত, প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলী গভর্নরের দ্বারা মনোনীত ও তাঁর কাছেই দায়ী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-মণ্ডলী প্রেসিডেণ্টের দ্বারা মনোনীত ও তাঁর কাছেই দায়ী, গভর্নর প্রেসিডেণ্টের দ্বারা মনোনীত ও তাঁর কাছেই দায়ী। কোথাও কোনো প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী নেই।

এইভাবে যে সরকার গঠিত হলো সেটা ভূতপূর্ব ইংরেজ সরকারেরই দেশী সংস্করণ। তফাতের মধ্যে জঙ্গীলাটই বড়লাট, বড়লাটই জঙ্গীলাট। আয়ুব যতদিন নির্দলীয় ছিলেন ততদিন এটা সহনীয় ছিল। কিন্তু একদিন দেখা গেল তিনি মুসলিম লীগকে নতুন জীবন দিয়েছেন ও আপনি তার সভাপতি

হয়েছেন। স্বয়ং জিন্না সাহেব বড়লাট হয়ে মুসলিম লীগের সভাপতিত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু আয়ুব সাহেব দুই নৌকায় পা রাখলেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা ভারতীয় সৈন্যদের মতো রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে ছিল, আয়ুব তাদের এমন এক কুদৃষ্টান্ত দেখালেন যে তারাও এখন থেকে রাজনীতিক্ষেত্রে পদক্ষেপ করবে। বিচারবিভাগকেও দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে। জুডিসিয়ারি তথা লেজিস্‌লেচার দুই বাহু শক্তিহীন। সমস্ত শক্তি এক্‌জিকিউটিভের মুঠোয়। তাও আর্মির কবলে। পাকিস্তান বলবান ও সুপরিচালিত হতে পারে কিন্তু গণতন্ত্র তথা সিভিল পাওয়ার বর্জিত। সৈন্যদলের কবল থেকে সে নিকট ভবিষ্যতে গণতন্ত্র ফিরে পাবে না, সিভিল পাওয়ার ফিরে পাবে না। ব্রিটিশ শাসনও এর চেয়ে ভালো ছিল, কারণ ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার আইনে ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে ঢের বেশী ক্ষমতা দিয়েছিল।

কিন্তু আয়ুব খান একদিক থেকে যেমন হরণ করেছেন অন্যদিক থেকে তেমনি দানও করেছেন। সেই যে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি সেটা আর বলবৎ নেই। আজকাল যেসব নির্বাচন হয় সেসব যৌথ পদ্ধতির নির্বাচন। হিন্দু মুসলমানের একই নির্বাচকমণ্ডলী। পাকিস্তান একটু একটু করে সেকুলার হয়ে উঠছে। আয়ুব খানের মুসলিম লীগ হিন্দুর ভোটনির্ভর। জিন্না সাহেবের মুসলিম লীগ হিন্দুর ভোটনির্ভর ছিল না। হলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যরূপ হতো। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমানের যে সম্প্রীতি আজ লক্ষিত হচ্ছে তার মূলে যৌথ নির্বাচন পদ্ধতিও কাজ করছে।

তারপর আয়ুব খান পাকিস্তানের সত্যিকার স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছেন। পূর্ববর্তী পাকিস্তানী নেতারা যা করেন নি। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি এখন মার্কিনরা নিয়ন্ত্রণ করছে না, ইংরেজরা নিয়ন্ত্রণ করছে না। ওদের ব্যালান্স করার জন্যে তিনি চীনকে ডাক দিয়েছেন। ব্যালান্স অফ পাওয়ার এখন আর ইঙ্গ-মার্কিনের হাতে আছে কি না সন্দেহ। এক এক সময় মনে হয় ওটা পাকিস্তানের হাতে। আয়ুব খানের হাতে। এ নীতির শেষ না দেখে জোর করে কিছু বলা যায় না। তবে জোর করে বলতে পারি যে পাকিস্তানী সৈন্যদল আর পরের স্বার্থে লড়বার জন্যে ভিয়েৎনামে বা বোর্নিও দ্বীপে যাবে না। তারা ভারতীয় সৈন্যদের মতো স্বদেশের জন্যেই লড়বে। আমেরিকা তার হয়ে লড়বার জন্যে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সৈন্য নিয়ে আসছে, ফিলিপাইন থেকে সৈন্য নিয়ে আসছে, অস্ট্রেলিয়া থেকে সৈন্য নিয়ে আসছে, কিন্তু পাকিস্তান থেকে সৈন্য নিয়ে যেতে পারছে না। খাস আমেরিকা থেকে মার্কিন যুবকদের কন্‌স্‌ক্রিপ্ট করে নিয়ে আসতে হচ্ছে বলে সে-দেশের জনমত পাকিস্তানের উপর রুষ্ট। পাকিস্তানই তো বশংবদের মতো সৈন্য জোগাত। তা তো সে করছে না! তবে সে কেমনতর বন্ধু!

পাকিস্তানকে দোষ দেবার আগেই সে মুখ বেঁধে দিয়েছে। কাশ্মীরের দাবীতে বাধিয়ে বসেছে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ। তার কাছে সৈন্যের জন্যে হাত

পাতলে সে বলবে, "হায় বন্ধু, তোমাকে সৈন্য দিতে পারি সে সুখ কি আমার কপালে আছে! দেখছ না হিন্দুস্তানীরা আমার দেশ আক্রমণ করে আমাকেই পরাধীন করতে উদ্যত! আমার ঐ কাশ্মীরের দাবীটি মিটিয়ে দাও। আর নয়তো চীন এসে মেটাক।"

যতদূর বোঝা যায় পাকিস্তান অর্থাৎ আয়ুব খান এই যুদ্ধকে বছরের পর বছর চালিয়ে যাবেন যাতে আমেরিকাকে সৈনা সরবরাহ করতে না হয়। মরুক গে আমেরিকানরা ভিয়েৎনামের ময়দানে, পাকিস্তানীরা পরের জন্যে মরবে না। তারা মরবে কাশ্মীরের দাবীতে খাস পাকিস্তানের জন্য। তাদের একমাত্র শত্রু হিন্দুস্তান। পাকিস্তান কি আমেরিকার জন্যে না পাকিস্তানের জন্যে? ন্যাশনালিজমের মূলকথা হলো যার দেশ তার নিজের জন্যে। পাকিস্তানের এতদিনে সাবালক দশা হয়েছে। সে নেশন হয়েছে। রেডিওতে সে আর "হিন্দু" কথাটা উচ্চারণ করে না। তার বদলে করে "ইণ্ডিয়ান" বা "হিন্দুস্তানী" কথাটি। আয়ুব খান একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান। পাকিস্তানী মুসলমানদের তিনি জাতীয়তাবাদী মুসলমান করে তুলছেন। তবে তাঁর জাতীয়তাবাদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নয়। তিনি আমাদের একজন নন।

দেশবিভাগের আগে হিন্দু মুসলমানের ক্রমবর্ধমান কলহ দেখে আমি প্রায়ই ভাবতুম এর চেয়ে যুদ্ধ ভালো। যারা যুদ্ধ করে, তার পরে একসময় সন্ধি করে, সেইভাবে নিষ্পত্তি হয়। আমার ধারণা ছিল ইংরেজ যেতে না যেতে গৃহযুদ্ধ বাধবেই। দেখলুম সেটা যাতে না বাধে তার জন্যে দেশটাকেই ভাগ করে দেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা প্রদেশকেও। যুদ্ধ যখন হলো না সন্ধিও তখন হলো না। স্বাধীনতার পরে কাশ্মীর নিয়ে যুদ্ধ বাধি বাধি হয়েছিল কিন্তু সেটাও মাঝপথে থেমে গেল। বিবাদটা গেল আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে। জাতিপুঞ্জের বৈঠকে।

দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ পরে অবশেষে উপস্থিত সেই যুদ্ধ। কেউ রোধ করতে পারল না নিয়তির গতি। যেটা বাধবার সেটা বাধলই। কাশ্মীর একটা উপলক্ষ মাত্র। স্বাধীনতার আগে কেউ তার কথা ভাবে নি। কিন্তু যেসব মূলগত প্রশ্ন সে সময় ছিল সেসব প্রশ্ন আজকেও রয়েছে। দেশবিভাগ বা প্রদেশবিভাগ সেসব প্রশ্নের গোড়া ঘেঁষে উত্তর দেয় নি। ভারত পাকিস্তানের হিন্দুসমাজ একটাই সমাজ। একাধিক নয়। একাধিক হতে পারে না। তেমনি ভারত পাকিস্তানের মুসলমান সমাজ একটাই সমাজ। একাধিক নয়। একাধিক হতে পারে না। কলকাতার হিন্দু ঢাকার হিন্দুর জন্যে ভাববেই। করাচীর মুসলমান দিল্লীর মুসলমানের জন্যে ভাববেই। নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি অবশ্য মস্ত জিনিস। তবু সেই সব নয়। পরিপূর্ণ জীবনের গ্যারাণ্টি কে দিচ্ছে বা দিতে পারে? একটা সমাজ যদি এগিয়ে যায় ও আরেকটা সমাজ পেছিয়ে থাকে তা হলে গাত্রদাহ অবশ্যম্ভাবী। কী করে এরা পায়ে পা মিলিয়ে চলবে এর ইঙ্গিত সংবিধানে নেই। পার্লামেণ্টারি রাজনীতিতেও নেই। সেই

জন্যে এক দেশের সংখ্যালঘু অপর দেশের সংখ্যাগুরুর উপর নির্ভর করবে ও ফলে extra-territorial হবে। এই নির্ভরতা দূর করতে হলে দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা চাই।

চাই বোঝাপড়া, চাই যাবতীয় বিরোধের মীমাংসা ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। রাষ্ট্র দুটো হতে পারে, নেশন দুটো হতে পারে, সমাজ দুটো বা তার বেশী হতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণ জীবন সকলের জন্মস্বত্ব। ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ চলতে থাকলে সব সম্পদ বারুদের ধোঁয়া হয়ে আকাশে মিলিয়ে যাবে। স্বাচ্ছন্দ্যের মান উন্নয়ন তো হবেই না, যেটুকু হয়েছে সেটুকুও নেমে যাবে। এই দীনদরিদ্র দেশদ্বয়ের অগণিত নরনারী যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা কোনো মতেই লাভবান হতে পারে না। তাদের যে প্রকৃত বল তা কৃষি ও শিল্পের সুষ্ঠু উৎপাদনে ও বণ্টনে, শিক্ষার উৎকর্ষে ও বিস্তারে, সামাজিক ন্যায়ে, সাংস্কৃতিক সৃষ্টিতে, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে, রাজনৈতিক স্বাধীনচিত্ততায়, শাসনগত সুপরিচালনায়।

দুই পক্ষকেই একদিন না একদিন একসঙ্গে বসতে হবে একশ'টা মামলার মিটমাটের ইচ্ছা নিয়ে। ইচ্ছা থাকলেই উপায় থাকে। আমাদের দিক থেকে ইচ্ছার অভাব নেই, আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধপর্ব মিটিয়ে দিয়ে মিলনপর্ব আরম্ভ করতে পারলেই বাঁচি। এ ইচ্ছা গান্ধীজীর ছিল, এ ইচ্ছা জবাহরলালের ছিল, এ ইচ্ছা লালবাহাদুরেরও আছে। কিন্তু অপর পক্ষের আচরণ থেকে বোঝা যায় না যে অপর পক্ষ কোথাও এক জায়গায় দাঁড়ি টানতে চান। কাশ্মীর সমস্যাকে তাঁরা জীইয়ে রাখবেন যতদিন না তাঁরা গোটা কাশ্মীরটা পাচ্ছেন। কী করে তাঁরা পাবেন, না অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে বিদ্রোহ জাগিয়ে পাবেন। তা করতে গিয়ে যদি যুদ্ধ বেধে যায় তবে চীনের সহায়তায় পাবেন। চীন যোগ দিলে যদি বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায় তা হলে কী হবে সে ভাবনা তাঁদের নয়, সে ভাবনা নিরাপত্তা পরিষদের। সেই জন্যে নিরাপত্তা পরিষদ থেকে যুদ্ধবিরতি নির্দেশ এসেছে।

আমার বিশ্বাস, বিলম্বে হলেও এ নির্দেশ রক্ষিত হবেই। না হলে পাকিস্তানকে জাতিপুঞ্জ ত্যাগ করতে হয়। সেটা অভিমানের কথা, মনের কথা নয়। নিরাপত্তা পরিষদ অগ্রণী হয়ে বা মধ্যস্থ হয়ে মিটমাট করে দিক এটা পাকিস্তানের নতুন দাবী নয়, তৃতীয়পক্ষের মধ্যস্থতায় তার বহুকালের আস্থা। কিন্তু প্রত্যেকবারেই দেখা গেছে নিরাপত্তা পরিষদে ইঙ্গ-মার্কিন জোটই সংখ্যাধিক ও তাঁদের প্রস্তাব পক্ষপাতদুষ্ট। তাই প্রত্যেকবারই ভারত আপত্তি করে ও রাশিয়া ভীটো দেয়। কেবল শেষের কয়েকবার তার দরকার হয় নি। নিরাপত্তা পরিষদ আর একতরফা প্রস্তাব পাশ করবে না, করলে করবে রুশ-মার্কিন মিলিত প্রস্তাব। ক্ষেত্র এর জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছে। এতে হতাশ হলে পাকিস্তানকে যেতে হবে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সংসদে। সেখানে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট হস্তগত করা আদৌ সহজ নয়। মোহভঙ্গের পর পাকিস্তান কী করবে সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। আয়ুব খান যদি প্রাচীরের লিখন

পাঠ করে থাকেন তো নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে দেশবাসীর কাছে শান্তির আবেদন করবেন। আর নয়তো জাতিপুঞ্জ বর্জন করে চীনের সঙ্গে মিলে অ্যাডভেঞ্চারে নামবেন। যেমন নেমেছেন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ।

এইমাত্র যা বললুম তার থেকে মনে হতে পারে যে চীন, পাকিস্তান ও ভারত তিনজনে মিলে লড়বে আর রুশ, মার্কিন ও ইংরেজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে। আজকের দুনিয়াতে যে-কোনো যুদ্ধই বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হতে পারে। সেইজন্য সুয়েজ নিয়ে ইংরেজ, ফরাসী, ইসরাইল ও ইজিপ্টের যুদ্ধ অন্যান্য শক্তিরা শশব্যস্ত হয়ে থামিয়ে দেয়। ইংলণ্ডের পরম মিত্র আমেরিকাই ইংলণ্ডকে কঠোরভাবে নিবৃত্ত করে। নয়তো সুয়েজের ইসুতে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেত। সকলেই জড়িয়ে পড়ত। হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহার করা হতো। লক্ষ লক্ষ মানুষ অকারণে মরত। সুয়েজ কি সত্যি এত গুরুত্বপূর্ণ যে তার জন্যে দুনিয়া পুড়ে ছারখার হবে?

তেমনি কাশ্মীর কি সত্যি এত গুরুত্বপূর্ণ যে তার জন্যে বিশ্বযুদ্ধ বাধবে, আর সকলে জড়িয়ে পড়বে, হাইড্রোজেন বোমা ও অন্যান্য মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হবে, দুনিয়ার লোক লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে কীটপতঙ্গের মতো প্রাণ দেবে? পাকিস্তানের কাছে কাশ্মীর জীবনমরণের ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু তার মিত্রদের পক্ষে তা নয়। এমন কি চীনের পক্ষেও তা নয়। চীন পাকিস্তানকে মার্কিনের বাহুপাশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একটি শত্রু কম করতে চায়, তারপর তাকে আরেক শত্রুর বিরুদ্ধে খেলিয়ে লড়িয়ে কাঁটা দিয়ে কাঁটা উদ্ধার করতে চায়। চীনের বদ্ধমূল ধারণা যে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের যোগসাজস আছে। ক্যাপিটালিস্ট যখন, তখন ওরা মাসতুত ভাই। গণতন্ত্রী যখন, তখন ওরা পরস্পরের বন্ধু। আমেরিকার সঙ্গে লড়তে হলে ভারতের সঙ্গেও লড়তে হয়। কাশ্মীর ইসুতে লড়লে আফ্রিকার ও এশিয়ার মুসলিম দেশগুলির সহানুভূতি পাওয়া যায়।

চীন পাকিস্তান যাই ভাবুক আর যাই করুক, পৃথিবী এখন যুদ্ধবিরোধী। ওই যে ভিয়েৎনামে সীমাবদ্ধ আকারে লড়াই চলেছে, দুনিয়ার লোক ওর জন্যে বিরক্ত। বিরক্তিটা মার্কিনদের ঘরেও সক্রিয়। পাকিস্তান ও চীন যুদ্ধের আকার সীমাবদ্ধ রাখতে সমর্থ হবে কি? যদি হয় তবে এ যুদ্ধ ততকাল চলতে পারে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ যতকাল। কিন্তু একে সীমার মধ্যে রাখা তাদের হাতে নয়। এমন কি পাকিস্তান যদি জাতিপুঞ্জ ত্যাগ করে তা হলেও তার হাতে ও চীনের হাতে নয়। দেখতে দেখতে এ যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে ও অন্যান্য দেশের মানুষ জড়িয়ে পড়বে। সেই ভয়েই নিরাপত্তা পরিষদে রুশ মার্কিন একমত হয়ে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ জারি করেছে। সে ভয় যদি পাঁচ বছর স্থায়ী হয় তবে যুদ্ধবিরতি পাঁচ বছর স্থায়ী হবে। যদি না পাকিস্তান জাতিপুঞ্জের নির্দেশ অমান্য করবার মানসে সদস্যপদ ত্যাগ করে। অথবা যদি না নিরাপত্তা পরিষদ একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানে উপনীত হয়।

পাকিস্তানকে যুদ্ধে জিতিয়ে দেবার জন্যে বা কাশ্মীর পাইয়ে দেবার জন্যে ইংরেজ, মার্কিন, চীন সবাই ভারতের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধবে ও বছরের পর বছর লড়বে এতখানি পরহিতৈষিতা মানবচরিত্রে নেই। আর পাকিস্তানই বা হাজার বছর লড়বার মতো দম খুঁজে পাবে কোথায়? ইসলামে? গণতন্ত্রে? সাম্যবাদে? তার সেই হাজার বছর লড়বার মতো মতবাদের জোর কোথায়? থাকবার মধ্যে আছে খুঁটির জোর ও উৎকট হিন্দুবিদ্বেষ তথা ভারতবিদ্বেষ। নিছক বিদ্বেষ কোনো দেশের জনগণকে বা সৈন্যদলকে শেষ পর্যন্ত জিতিয়ে দিতে পারে না, দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো ত্যাগ বরণ করতে প্রেরণা দিতে পারে না। খুঁটির জোর কমতে কমতে শূন্যে ঠেকলেই পাকিস্তান সন্ধি করবে। সুতরাং খুঁটিগুলিকে এক এক করে সরানোই হবে আমাদের পলিসি। যতদূর মনে হয় আমেরিকাই সরে যাবে সকলের আগে। তার পরে বোধহয় ব্রিটেন। 'বোধহয়' বলছি এই জন্যে যে ব্রিটেন স্বেচ্ছায় তার সৈন্যবল অপসরণ করে কীর্তি রাখলেও পাকিস্তানের সৈন্যবলের উপর তার ভরসা সহজে যাবে না। ওরা এই উপমহাদেশের তথা পারস্য উপসাগরের ব্রিটিশ স্বার্থের রক্ষী। ওরা মার খেলে ব্রিটেনের গায়ে লাগে। ওরা হটে গেলে ব্রিটেনের বুকে বাজে।

ইরান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়াকে আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনিনে। তা হলে বাকী থাকে চীন। চীনের অন্তঃপরিবর্তন না ঘটা অবধি পাকিস্তানের অন্তঃপরিবর্তন ঘটবে বলে মনে হয় না। তার মানে আরো দু'তিন বছর। যদি না ইতিমধ্যে রুশ মার্কিন একমত হয়ে নিরাপত্তা পরিষদের মারফত কাশ্মীর সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করে। এবং সে নিষ্পত্তি বলবৎ হয়। তিন মাসে কি ছ' মাসে এটাও কি সম্ভবপর! এই দ্বন্দ্ব অনেকদিন গড়াবে। পশ্চিম পাকিস্তান ততদিন সবুর করতে পারে। পূর্ব পাকিস্তান কি পারবে? পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র সংযোজক হচ্ছে ভারতের আকাশ। সেই পথ দিয়ে বিমান চলাচল বন্ধ। বিমান আজকাল নাকি কলম্বো ঘুরে যায়। তা ছাড়া রেলপথও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে; রেলপথে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে যাতায়াত এখন আর সম্ভব নয়। সমুদ্রপথ সিংহল ঘুরে যায়। করাচী থেকে সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম যেতে তত সময় লাগে ইউরোপ যেতে যত সময় লাগে। খরচও তেমনি। এভাবে বেশী দিন চলতে পারে না। তারপর পূর্ব পাকিস্তানের তিন দিকে ভারত। সীমান্ত যদি সত্যি সত্যি সীল করে দেওয়া হয় তবে পূর্ব পাকিস্তানে তেল নুন চালের দুর্ভিক্ষ হবে। সমুদ্রপথে ওরা বাইরে থেকে যা পাবে তাতে ওদের কুলোবে না। পাটের বাজার পড়ে গেলে ক্রয়শক্তিও কমে যাবে। অর্থনৈতিক বিপর্যয় সম্ভবপর। তবে এপার থেকে ওপারে বা ওপার থেকে এপারে মাল পাচার বন্ধ থাকবে না। সে জলতরঙ্গ রোধিবে কে! রাজা ক্যানিউটের মতো আমিও এককালে সমুদ্রকে হুকুম দিয়েছি, সমুদ্র, হটে যাও। সমুদ্র আমার হুকুম শোনেনি, আমাকেই হটতে হয়েছে। সেই জন্যে আমি জোর করে বলতে

পারব না যে মাল পাচার বন্ধ হবার দরুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব কাশ্মীরকে নিয়ে। সেই জন্যে কাশ্মীরের কথাই সকলের আগে। কিন্তু আমরা বাঙালী। পূর্ব পাকিস্তানই আমাদের সবচেয়ে কাছে। প্রতি মুহূর্তেই আমরা আমাদের প্রিয়জনদের কথা ভাবছি যারা এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এ বিচ্ছিন্নতা কবে শেষ হবে কেউ বলতে পারে না। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ মানেই দীর্ঘস্থায়ী বিচ্ছেদ। স্বভাবতই আমরা শর্টকাটের স্বপ্ন দেখছি। ওপারে যাঁরা আছেন তাঁদেরও সেই স্বপ্ন। তাঁরাও চান আশু অবসান। কাশ্মীরের ফয়সালার জন্যে অপেক্ষা করতে হলে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়। ততকাল অপেক্ষা করতে তাঁদেরও ধৈর্য থাকবে না। এমনি করে স্বায়ত্তশাসনের কথা, স্বাধীনতার কথা উঠছে। এটা কেউ কাউকে শিখিয়ে দিচ্ছে না। পরিস্থিতিই মন্ত্রণা দিচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে পরিচ্ছন্ন চিন্তার প্রয়োজন আছে। প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে পূর্ব পাকিস্তান বাঙালী মুসলমানের জন্যেই শুধু নয়। তার সৃষ্টি হয়েছিল উপমহাদেশের অর্ধেক মুসলমানের জন্যে। বাকী অর্ধেকের জন্যে পশ্চিম পাকিস্তান। ইতিমধ্যেই বহু অবাঙালী মুসলমান সেখানে গিয়ে বাস করছে। আরো যেতে পারত, আমরা যেতে দিই নি। আমাদের সংবিধান যদি পাকিস্তানের সংবিধানের মতো হতো, আমাদের রাষ্ট্র যদি দ্বিজাতি তত্ত্বের দ্বারা শাসিত হতো তা হলে পূর্ব পাকিস্তান এতদিনে অবাঙালী মুসলমানে ভরে যেত, বাঙালী মুসলমানরাই হতো সংখ্যালঘু। আমরা আমাদের সুকৃতির দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানকে সম্ভাব্য অবাঙালী সংখ্যাপ্রাধান্যের হাত থেকে বাঁচিয়েছি। কিন্তু এর দরুণ পাকিস্তানের দ্বিজাতি তত্ত্ব অচল হয়ে যায় নি, পাকিস্তান এখনো সেই তত্ত্বের দ্বারা শাসিত। পূর্ব পাকিস্তান বাঙালীস্থান নয়। বাংলাভাষার দরুণ বাঙালীস্থান বলে ধরে নেওয়াটাই ভুল। তার আগে দ্বিজাতি তত্ত্বের দাগ মুছে ফেলতে হবে। পূর্ব পাকিস্তান নামটাকেই পূর্ববঙ্গে নামান্তরিত করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তার ভিত্তিটাকেও রূপান্তরিত করতে হবে। যাতে সেটা উপমহাদেশের মুসলমানের হোমল্যাণ্ড না হয়ে বাঙালী হিন্দু মুসলমানের হোমল্যাণ্ড হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা যেদিন দ্বিজাতি তত্ত্বের মোহ থেকে মুক্ত হবেন সেদিন তাঁদের মুক্তিদিবস। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন তার পরের কথা। পূর্ব পাকিস্তান কাদের হোমল্যাণ্ড সেইটেই আগে ঠিক হোক। যদি বাঙালী হিন্দু মুসলমানের হোমল্যাণ্ড হয় তবে ইতিহাসের চাকা আবার ঘুরে যাবে। নয়তো যেটা হবে সেটা একটা ডাহা মিথ্যার চেয়ে কিছু কম মিথ্যা। তেমন স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন বা গণতন্ত্র কি টিকবে? করাচীর জাহাজ এসে চট্টগ্রামে ভিড়বে যে! সংঘাত অনিবার্য।

এই অনিবার্য সংঘাতের জন্যে কৃতসংকল্প হবে যারা তাদের মনের অগোচরে একটি দ্বিধা আছে। সে দ্বিধা যতদিন থাকবে ততদিন তারা

পাকিস্তানের সঙ্গে লড়তে বল পাবে না, বরং পাকিস্তানের হয়ে লড়বে। দ্বিধাটি আসাম নিয়ে। বহুকাল থেকে আসামের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেখানে গিয়ে চাষবাস করছে বহু পুরুষ ধরে পূর্ববঙ্গের মুসলমান। পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে যেমন কাশ্মীরের প্রলোভন পূর্ব পাকিস্তানের কাছে তেমনি আসামের। লড়কে লেঙ্গে কাশ্মীর যদি সম্ভব হয় তবে লড়কে লেঙ্গে আসামও সম্ভব হবে। সেরকম একটা সম্ভাবনা থাকতে পাকিস্তান ছেড়ে স্বাধীন হতে চাইবে কোন্ নির্বোধ! বিশেষত চীন যখন আসামের অপর প্রান্তে ওৎ পেতে বসে আছে। যে-কোন দিন ঝাঁপ দিয়ে ঘাড়ে পড়বে আসামের। তখন পাকিস্তানের ধ্বজা বয়ে আসাম আক্রমণ করবে না কোন্ মূঢ়! অত বড়ো মওকা কি আর কখনো মিলবে! স্বাধীন হয়ে পূর্ব পাকিস্তান এমন কী বলবান হবে যে ভারতের হাত থেকে আসাম ছিনিয়ে নিতে পারবে! স্বাধীনতা পূর্ব পাকিস্তানকে সীমাবন্ধ করবে। প্রসারিত হতে দেবে না। তবে কি আসাম চিরকালের মতো তার নাগালের বাইরে থেকে যাবে ?

আয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের নাড়ি টিপে দেখছেন যে সে আসামের জন্যে সব কিছু সহ্য করতে রাজী। মার্শাল ল, মিলিটারি ডিকটেটরশিপ, বেসিক ডেমোক্রাসী, পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশরূপে অবস্থান, অবাঙালী মুসলিম প্রভুত্ব। চীনের সঙ্গে দোস্তি করে আয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিলুব্ধ সর্বহারাদের কামরূপের সম্মোহনে ভেড়া বানিয়ে রেখেছেন। মোহভঙ্গের দেরি আছে। কাশ্মীরের জন্যে মুজাহিদবাহিনী গঠন করা হচ্ছে শুনছি। তার মানে আসামের জন্যে। একদিন শোনা যাবে আসামে অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ভারতের নেতাদের সাধুবাদ যে পূর্ব পাকিস্তানে তাঁরা ফৌজ পাঠান নি, বোমা ফেলেন নি। ভরসা করি সেখানকার অধিবাসীদের উপর এই আত্ম-সংবরণের ক্রিয়া শুভ হবে। জানুক তারা যে তাদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নেই। তা সত্ত্বেও যদি তারা আয়ুবের সম্মোহনে বা চীনের প্রলোভনে ভোলে তবে তারা স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রের যোগ্য নয়। তবে তাদের মধ্যেও চক্ষুষ্মান ও চিন্তাশীল আছেন। দ্বিধাহীন বীরত্বের পরিচয় দিলে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁদের পরম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবেন। এই যে দুর্যোগ এই তাঁদের সুযোগ। একটা তাঁদের "finest hour"। এটা কিন্তু তাঁদেরই ব্যাপার। আমাদের নয়।

এই যুদ্ধ বা যুদ্ধবিরতি যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে পাকিস্তানের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতা ক্রমেই পরিস্ফুট হবে। সে যদি মার্কিনের তাঁবেদারি থেকে সত্যি সত্যি পরিত্রাণ চায় তবে চীনের দিকে আরো বেশী করে ঝুঁকবে। যদি চীনের দিকে আরো বেশী করে ঝুঁকতে ভয় পায় তবে ভারতের সঙ্গে মিটমাটের জন্যে ব্যাকুল হবে। যদি তাতেও তার অন্তরে বাধা থাকে তবে পাকিস্তানের দুই অঙ্গ জরাসন্ধের মতো দুই ভাগ হবে। পূর্ব পাকিস্তান ফারাক হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই সেখানে ভারতবিরোধী মনোভাবের চেয়ে যুদ্ধবিরোধী

মনোভাব দানা বাঁধছে। এ মনোভাব যদি ব্যাপক ও গভীর হয় তা হলে পূর্ব পাকিস্তানের শাসকদের পক্ষে উটপাখির মতো বালুতে মুখ গুঁজে থাকা বেশী দিন চলবে না। বাস্তবের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিয়ে মন্ত্রিমণ্ডলী সম্প্রসারণ করতে হবে, তাতেও যদি লোকের সন্তোষ না হয় তবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করতে হবে। তাতেও যদি আলোড়ন না থামে, গণতন্ত্র প্রবর্তন করতে হবে। হ্যাঁ, এমনি করে একদিন নতুন সংবিধান রচনার সময় আসবে। সেটা যদি সমগ্র পাকিস্তানের সংবিধান হয় তবে পাকিস্তান দু'ভাগ হবে না। যদি কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের সংবিধান হয় তবে পাকিস্তান দ্বিধাবিভক্ত হবে।

ভারত যদি সংযোজক না হয় তবে পাকিস্তান এক নেশন হতে পারে না। ভারতকে হিসাবের মধ্যে না ধরলে পাকিস্তান দুই নেশন। ভারতের সৌজন্যই এতদিন পাকিস্তানকে একাধারে বিধৃত করেছে। পাকিস্তানের নেতাদের মতে ভারতবিদ্বেষই তাঁদের একতার সিমেণ্ট। ওটা আপাত সত্য। পাকিস্তান ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বাই-প্রোডাক্ট। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সংঘাত যদিও তার জননী তবু জনক তার ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বাধীনতা লাভ। পাকিস্তান সমান স্বাধীন হতে পারে কিন্তু সব সম্পর্ক ছেদ করে কখনো তার সংহতি রক্ষা করতে পারবে না। এর সত্য-মিথ্যা যাচাই করবার সময় এতদিন পরে এসেছে। এই সেই বহুদিন প্রতীক্ষিত সংকট যাতে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অগ্নিপরীক্ষা ঘটবে। অগ্নিপরীক্ষার পর পাকিস্তান যদি অবিভক্ত থাকে তবে বুঝতে হবে যে ভারতের সঙ্গে তার একটা চিরস্থায়ী সেটলমেণ্ট ঘটেছে। আর নয়তো পাকিস্তানের পশ্চিমের সঙ্গে পাকিস্তানের পূর্বের নাড়ীর বাঁধন কেটে যাবে। সে বাঁধন দৃশ্যত ইসলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারত।

পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিকরা না পারুক পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের এবার মনঃস্থির করতে হবে, ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী হবে। কেউ তাকে বলবে না যে ভারতীয় ইউনিয়নের দুয়ার খোলা রয়েছে, ইচ্ছা করলেই প্রবেশ করা যায়। সে সিংহলের মতো, নেপালের মতো, বর্মার মতো ভারতের প্রতিবেশী হতে পারে। তার পররাষ্ট্রনীতি তার নিজস্ব হতে পারে। সে যতদিন না ভারতের শত্রুদের খাল কেটে ডেকে আনছে ততদিন কেউ তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে না। যুদ্ধবিগ্রহ বাধাবে না। কেউ তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। অনায়াসেই শান্তিচুক্তির দ্বারা পূর্বে পাকিস্তানকে অভয় দেওয়া যায়। সে যদি কমনওয়েলথের সদস্য হয় তবে কমনওয়েলথের দিক থেকেও ভরসা পাবে। যদি জাতিপুঞ্জের সদস্য হয় তবে সেদিক থেকেও আশ্বাস পাবে। আজকের দিনে এক নেশন অপর নেশনকে গ্রাস করতে পারে না। করলে দুনিয়া ছুটে আসবে। পূর্ব পাকিস্তান যদি সাহসপূর্বক স্বাধীনতা ঘোষণা করে তবে তার স্বাধীনতা ভারতের দ্বারা বিপন্ন হবে না।

একদা আমি উভয় বঙ্গের পুনর্মিলনের স্বপ্ন দেখেছি। এখন আর দেখিনে।

কারণ আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি যে পুনর্মিলন একপক্ষের ইচ্ছায় হয় না। তার জন্যে চাই উভয় পক্ষের ইচ্ছা। সে রকম ইচ্ছা দশ বিশ বছরে হয় না, হলে হয় শতাব্দীকাল পরে। দুই বঙ্গ যদি দুই স্বাধীন দেশ হতো তা হলে হয়তো পুনর্মিলন নিকটতর হতো, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে ভারতীয় ইউনিয়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তার সঙ্গে মিলিত হতে হলে সারা ভারতের সঙ্গে হতে হবে। তাতে পূর্ব পাকিস্তানের আন্তরিক আপত্তি। কারণ দুই বঙ্গ এক হলে স্বাধীন হলে মুসলমানরা হতো সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, কিন্তু ভারত ও পূর্ব পাকিস্তান এক হলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হয় না। তা সত্ত্বেও যদি পূর্ব পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত হয় তবে বুঝতে হবে যে সেকুলারিজম তার মনে বসেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এর কোনো পাকা প্রমাণ মেলেনি। হিন্দু মুসলমান মিলে মিশে থাকা খুব ভালো কথা, কিন্তু শুধু তাই হলেই সেকুলারিজম হয় না। আমরাও যে পুরোপুরি সেকুলার মনোভাবে অভ্যস্ত হয়েছি তাও নয়। আরো অনেকদিন লাগবে এর মর্ম উপলব্ধি করতে। ততদিন পূর্ব পাকিস্তান বাইরেই থাকুক। তাকে ভিতরে ডাকলে আবার সেই সব পুরোনো প্রশ্ন উঠবে। চাকরি-বাকরিতে নির্দিষ্ট হার, মন্ত্রিমণ্ডলীতে নির্দিষ্টসংখ্যক আসন ইত্যাদি। আমরা আর সেসব প্রশ্ন শুনতে চাইনে।

আমার নিজের ধারণা এই যে, চীনের সঙ্গে মিটমাট না হলে পাকিস্তানের সঙ্গে মিটমাট হবে না, পাকিস্তানের সঙ্গে মিটমাট না হলে চীনের সঙ্গে মিটমাট হবে না। অবস্থা আগে এমন জটিল ছিল না এখন যেমন হয়েছে। জটিলকে সরল করতে নিরাপত্তা পরিষদও কি পারবে! নিরাপত্তা পরিষদে লাল চীন নেই। তার অনুপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিলে সে পাকিস্তানকে তেমন সিদ্ধান্ত মানতে দেবে না। রুশ মার্কিনের উপর এক হাত নেবার জন্যে সে পাকিস্তানকে ওদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করার প্রবর্তনা দেবে। চীনও তার সঙ্গে মিটমাটের কথা উঠলে পাকিস্তানের সঙ্গে মিটমাটের কথা তুলবে। বলা বাহুল্য পাকিস্তানের শর্তে। কেই বা তাতে রাজী হবে! ভারত কখনো নয়।

সঙ্কট দীর্ঘস্থায়ী হবে বলেই আমার ধারণা। এই দীর্ঘকালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান তার আপনাকে আবিষ্কার করবে বলেও আমার বিশ্বাস। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন বা গণতন্ত্র এমন একটা মঙ্গলময় ঘটনা যে তার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের উপরও পড়বে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ পুনরায় স্বাভাবিক হবে। গত আঠারো বছরের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ছায়ার মতো মিলিয়ে যাবে। বাংলাদেশ যদিও ফিরবে না তবু বাঙালী স্বস্থানে ফিরবে। শরণার্থীর স্রোত ফিরবে। দুই প্রান্তের বা দুই রাষ্ট্রের বাঙালী ধর্মের কথা অত বেশী ভাববে না, ধর্মভেদকে অত বেশী প্রাধান্য দেবে না। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা অতীতের বিষয় হবে।

এই গেল একটা সম্ভাবনা। আর একটা সম্ভাবনা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটার আগেই পাকিস্তানের কর্ণধারগণ ভারতের সঙ্গে গোল

টেবিল বৈঠকে মিলিত হবেন, এক এক করে প্রত্যেকটি বিবাদ মিটিয়ে ফেলবেন ও পরে চীনকেও টেনে আনবেন সেই টেবিলে। এখন এটা অবাস্তব আশাবাদের মতো শোনাবে, কিন্তু ইতিহাসে অলৌকিক ঘটনাও ঘটে। গান্ধী নেহেরু যেসব সদ্‌ভাবনা ভেবে গেছেন, যেসব সৎকর্ম করে গেছেন সেসব তো কেবল ভারতের জন্যে বা হিন্দুর জন্যে নয়। সেসব বীজ থেকেও একদিন সুফল ফলবে।

এ ছাড়া আরো একটা সম্ভাবনা আছে। সেটা কিন্তু আশাপ্রদ নয়, আশঙ্কাজনক। যুদ্ধবিগ্রহ থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণতন্ত্র গজায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাধীনতা। তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিপ্লব। পূর্ব পাকিস্তানের জমিন কিসের উপযুক্ত তা কি আমরা এতদূর থেকে পরখ করে বলতে পারি? যদি বিপ্লবের উপযুক্ত হয়ে থাকে বা হয়ে ওঠে তা হলে আমরা হয়তো আশ্চর্য হব, কিন্তু সেখানকার লোক হয়তো হবে না। চীনের সঙ্গে অত বেশী মাখামাখি করলে মনের অগোচরে বিপ্লবের প্রতি অনুরাগ উদয় হওয়া বিচিত্র নয়। জীবনযাত্রা যদি দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়ায় তা হলে রাগ থেকেও বিপ্লবের আবির্ভাব হয়। মুসলিম দেশগুলিতে বিপ্লব অসম্ভব বলে সেই যে একটা কিংবদন্তী ছিল, গত বারো-তেরো বছরের ইতিহাস সেটা অপ্রমাণ করেছে। খোদ আয়ুব কর্তা নাকি বিপ্লব ঘটিয়ে ক্ষমতা করায়ত্ত করেছেন। বিপ্লবের প্রতিপত্তি তিনিই বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথা সত্য হলে কাশ্মীরের কোনখানে যেন বিপ্লবী কাউন্সিল গঠিত হয়েছে।

"বাঘ" "বাঘ" বলে বার বার চেঁচালে সত্যি সত্যি একদিন বাঘ এসে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানে একদিন বাঘের উপদ্রব হতে পারে। আমাদের রেডিওতে বলছে ইতিমধ্যে সেখানে নাকি বিপ্লবী কাউন্সিল কাজ করছে। কথাটা অবিশ্বাস্য নয়। গণতন্ত্রের সব আশা নির্মূল হলে মানুষের মন অগত্যা বিপ্লবের দিকে যায়। যুদ্ধবিগ্রহের বিশৃঙ্খলায় বুভুক্ষু জনতা বিপ্লবের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা খোঁজে। এশিয়া আফ্রিকার ছোট বড়ো মাঝারি নানান দেশ এখন ক্ষুধার চাপে বা সামাজিক অবিচারের দায়ে গণতন্ত্র ছেড়ে বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। সবাই যে রুশপন্থী বা চীনপন্থী কমিউনিস্ট তা নয়। কিন্তু সকলেই দ্রুত পরিবর্তনের জন্যে আবশ্যক হলে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আস্থাবান। পূর্ব পাকিস্তানও কি তাদের অন্যতম হবে?

আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানে অনুসৃত হলে আমাদেরই নৈতিক জয়। তা যদি না হয় তবে আমাদের গর্বের কারণ নেই। ইংলণ্ড আমেরিকারও না। তখন নৈতিক জয় হবে চীনের কিংবা রাশিয়ার। ইসলাম কি পারবে তাকে প্রাণপণে ঠেকাতে? কোথাও কি পেরেছে? মুসলিম লীগ যখন প্রবল হয় নি তখন কৃষক প্রজা দলের মুসলমান নেতাদের কারো কারো সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় ছিল। ইসলামে নিষ্ঠাবান হয়েও এঁরা সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে।

এঁদের কথাবার্তায় হিন্দু মুসলিম ভেদবুদ্ধির গন্ধ পর্যন্ত পাই নি। ইসলাম সামাজিক পরিবর্তনের অন্তরায় নয়। গণতন্ত্রের অন্তরায় নয়। হিন্দু মুসলিম সহযোগিতার অন্তরায় নয়। মুসলিম লীগের দাপটের দিনেও আমি কোনো কোনো লীগ দলপতির মধ্যে বিস্ময়কর হিন্দুপ্রীতি লক্ষ্য করেছি। তারা হাড়ে হাড়ে বাঙালী। যদিও মনেপ্রাণে মুসলিম।

পাঞ্জাবী মুসলমান বন্ধুও তো পেয়েছি। পরম উপকারী ও বন্ধুবৎসল। ভেদনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। জিন্নার সঙ্গে একমত নন। কিন্তু কেমন করে কী যে ঘটে গেল! মনে হয় ব্যক্তি এক্ষেত্রে মালিক নয়। সমষ্টিই মালিক। কিংবা ইতিহাসই মালিক। ঘটনার চাকা ব্যক্তির হাত দিয়ে ঘোরে বটে, তবে যে ঘোরায় সে নৈর্ব্যক্তিক বা বহুব্যক্তিক কোনো শক্তি। আমরা তাকে চিনতে না পেরে তার বাহনকেই চালক বলে ভ্রম করি। চার্চিল বা গান্ধী বা জিন্না। হিটলার বা স্টালিন বা মাও সে-তুং। আরো গভীরে যাবার চেষ্টা করলে দেখব এঁদের হাত পা বাঁধা। যেটা ঘটবার সেটাই ঘটে। এমন সব কারণে ঘটে যা দৃষ্টির অগোচর, মনের অগোচর।

আমার এক বিদেশী অধ্যাপক বলতেন, মানবিক ব্যাপারের নিয়ামক হচ্ছে স্বার্থ। কিন্তু এমন ব্যক্তিও তো দেখেছি যাঁর স্বার্থ বলতে কিছু নেই। যিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। সেইজন্যে অধ্যাপক হর্নের উক্তি ব্যক্তির বেলায় খাটে না। কিন্তু এখনো আমি এমন একটিও দেশ বা নেশন বা শ্রেণী বা দল দেখিনি যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। তার বেলা প্রত্যাশা করতে হয় বুদ্ধিদীপ্ত স্বার্থ। এন্‌লাইটেন্‌ড সেল্‌ফ-ইণ্টারেস্ট। ওই বিশেষণটি যদি অনুপস্থিত থাকে বা ওলটানো হয় তবে একজন অন্ধ রাখাল একপাল অন্ধ ভেড়াকে গহ্বরের সীমায় নিয়ে যায়। সেটাও কি ইতিহাসের চালনা? নিয়তি কি মানুষকে অন্ধ করে দেয়, ভেড়া বানায়?

একটা বলপরীক্ষার জন্যে পাকিস্তান তার সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছিল। সে যা চেয়েছিল সে তা পেয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধ। কিন্তু সে যা চায় সে তা পাবে না। কাশ্মীর। এই যুদ্ধের হারজিত পূর্ব প্রান্তে নির্ধারিত হবে না। হবে পশ্চিম প্রান্তে। পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পাকিস্তান হীনবল হবে নিশ্চয়, কিন্তু তেমন বিচ্ছেদের জন্যেও সে মনে মনে প্রস্তুত আছে। তার বিশ্বাস সে যদি কাশ্মীর কেড়ে নিতে পারে তা হলে তার প্রেস্‌টিজ এত প্রবল হবে যে সে যা চাইবে তাই পাবে। আবার পূর্ব পাকিস্তান ফিরে পেতে কতক্ষণ! আসল কথা কোন্ পক্ষ বেশী বলবান? পাকিস্তানী পক্ষ না ভারতীয় পক্ষ? পাকিস্তানী পক্ষে চীন সশরীরে বিদ্যমান, ব্রিটেন অশরীরে বিরাজমান, আমেরিকারও অধিষ্ঠানের আভাস। এ ছাড়া কয়েকটি মুসলিম দেশও আছে। ভারতীয় পক্ষে কে কে? গণতন্ত্র, সেকুলারিজম, জোট-নিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্রী ধাঁচ। এরা একালের চার মহাশক্তি। এদের শক্তিমত্তার পরিচয় অতগুলো ট্যাঙ্ক বা এতগুলো বিমান দিয়ে হয় না। এমন কি কতগুলো পরমাণু বোমা দিয়েও হয় না। এদের শক্তিমত্তা সূক্ষ্মতর স্তরের ব্যাপার।

যুদ্ধের হারজিত নির্ভর করে নৈতিক শক্তি কী পরিমাণে অংশ নেয় তার উপরে। নৈতিক শক্তি যার যত দুর্বল তার "morale" তত ভঙ্গুর। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে সে খাড়া থাকতে পারে না। তার মাজা ভেঙে যায়। এই বাইশ দিনের যুদ্ধ অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ নয়। কোন্ পক্ষের মাজার জোর কত সেটা এত কম সময়ের যুদ্ধে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা শক্ত। কোন্ পক্ষ কত জমি দখল করেছে এটা দিয়েও মাজার জোর মাপা যায় না।

আমাদের পক্ষের নৈতিক শক্তি চতুষ্টয়ের নাম করেছি। পাকিস্তানের পক্ষে যদি সেরকম কোনো নৈতিক শক্তি থাকত তা হলে পাকিস্তানকে হারানো ঢের বেশী কঠিন হতো। কিন্তু তার গণতন্ত্রও নেই, সে ধর্ম-নিরপেক্ষতায়ও বিশ্বাস করে না, সোজাসুজি ইসলামের দোহাই দিয়ে জেহাদ চালায়। সে জোটনিরপেক্ষ হবে কী, দুই জোটে বন্দী হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ বলতে কী বোঝায় তাও সে জানে না। কাশ্মীরীদের অধিকাংশ মুসলমান, তাই তারা পাকিস্তানকেই চায়, এই প্রতীতি তার নৈতিক শক্তি। দীর্ঘস্থায়ী বলপরীক্ষার বেলা এই পরিমাণ নৈতিক শক্তি যথেষ্ট নয়। এটা সে হাড়ে হাড়ে বোঝে তাই চীনের সঙ্গে আপনাকে জড়িয়েছে। চীনের নৈতিক শক্তি বিপ্লবসঞ্জাত ও বিপুল। এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে প্রধানত চীনের সঙ্গেই ভারতকে লড়তে হবে। সেক্ষেত্রে চীনের নৈতিক শক্তির সঙ্গেই আমাদের মোকাবিলা করতে হবে।

আমরা যেন সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের উপর আরো ঝোঁক দিই। আর ফাঁকি নয়। গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্র যে খাপ খায় তার দৃষ্টান্ত ব্রিটেন। শ্রমিকরা এখন সে দেশ শাসন করছে। সেখানে কেউ কর্মহীন নয়, কেউ অভুক্ত নয়। বাসস্থানের সমস্যা যদিও তীব্র। আমাদের এদেশে এখন অনেক কিছুর অভাব, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। এই যুদ্ধে সেটার অবসান হোক। লক্ষণ শুভ।

এই প্রসঙ্গে চীনের রেকর্ড অপূর্ব। সে যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটাত তা হলে সবাই তাকে শিরোপা দিত। কিন্তু সে তা করে নি। তাই তাকে শিরোপা দিতে পারছিনে। তা বলে তাকে আমি লঘু করব না। সম্প্রতি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপিকা জোন রবিনসন চীন ঘুরে এসে বই লিখেছেন। তিনি অহেতুক প্রশংসা করেন নি। দুঃখের বিষয় আমরা চীনের গঠনমূলক কার্যকলাপ সম্বন্ধে খুব কমই খবর রাখি। সে যেন শুধু পরমাণু বোমা তৈরি করছে আর সর্বত্র চক্রান্ত করে বেড়াচ্ছে। সে যে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছে এটা সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে সে এশিয়া ভূখণ্ডে নিজেকে শক্তিশালী দেশরূপে গড়ে তুলেছে। তার এই গঠনশক্তি তো কই পনেরো ষোল বছর আগে ছিল না। এ শক্তি সে পেলো কোথায়? কার কাছ থেকে?

এই চীনের সঙ্গে কি কেউ শতবর্ষের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চায়? সুতরাং এর সঙ্গে সন্ধির কথাও চিন্তা করতে হবে। ইতিমধ্যে চীন আমাদের

প্রতিবেশী পূর্ব পাকিস্তানীদের হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করেছে। তাদের পত্রিকায় চীনের স্থানই পাকিস্তানের ঠিক পরে। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হলেও চৈনিক অনুপ্রবেশ অতিক্রম করতে পারবে না। একটি অধঃপতিত দুর্বল দেশ স্বল্প সময়ের মধ্যে কী করে এত সবল ও অগ্রসর হলো আর একটি অনুন্নত দুর্বল দেশ নিশ্চয় সেটা জানতে চাইবে, জেনে অনুসরণ করতে চাইবে। পূর্ব পাকিস্তানকে আমরা যদি আরো মহৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমাদের পন্থায় আকর্ষণ করতে না পারি তবে সে ত্বরিত প্রগতির আশায় চীনের পিছনেই ছুটবে। যেমন ছুটছে বর্মা, আমাদের অপর প্রতিবেশী। দুর্ভাগ্য, আমরা বর্মার হৃদয় পাই নি। যদিও ওর হৃদয় বুদ্ধের রাজধানী।

ভুল আমাদের দিক থেকেও হয়েছে। নতুন কোনো ভুল যেন না হয়, যার ফলে পূর্ব পাকিস্তান ইসলামের ব্যূহ থেকে ছাড়া পেয়ে চৈনিক কমিউনিজমের ব্যূহে ভর্তি হয়। তা যদি হয় তবে সে আমাদেরও সেই দিকে টানবে। আমরা তাকে টানব, না সে আমাদের টানবে, এটাই হবে আগামীকালের প্রশ্ন।

চিরন্তন ত্রিভুজ

যুদ্ধের কথা ভাববার জন্যে অনেক লোক আছেন, শান্তির কথা ভাববার জন্যে লোক বেশী নেই। যদি বা কেউ থাকেন তিনিও ঠিক জানেন না কিসে শান্তি হবে। বলা বাহুল্য যুদ্ধবিরতি ও শান্তি একই জিনিস নয়।

কাশ্মীরে একপ্রকার যুদ্ধবিরতি হয়েছিল ষোল বছর আগে। এই সেদিন যুদ্ধবিরতি রেখা লঙ্ঘিত হয়েছে ও এখনো সে লঙ্ঘনকার্য চলছে। হয়তো আবার সেই রেখা সুরক্ষিত হবে। হয়তো আর কোনো দিন সে রেখা সুরক্ষিত হবে না। কে জানে ইতিহাসের মনে কী আছে! আমরা শুধু অনুমান করতে পারি ও আমাদের অভিমত ব্যক্ত করতে পারি। যাতে শান্তির কিছু সুরাহা হয়।

কাশ্মীরে কাজ করছে একটা নয়, দুটো নয়, তিন-তিনটে মতবাদ বা মনোভাব। কাশ্মীর যেন তিন শক্তির তাণ্ডবক্ষেত্র। এই শক্তির মধ্যে সমন্বয় না হলে, অন্ততপক্ষে সমঝোতা না হলে কাশ্মীর শান্ত হবে না। হতে পারে না।

এখন এই তিন শক্তির এক শক্তি হচ্ছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, যার কাছে হিন্দু মুসলমান ভেদ নেই, যার চোখে কাশ্মীরীরাও ভারতীয়, কাশ্মীরীমাত্রেই ভারতীয়। এই শক্তি দীর্ঘকাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়েছে, ব্রিটিশ সরকার মানে মানে সরে না গেলে আরো দীর্ঘকাল লড়তে তৈরি ছিল, কাশ্মীরের ব্রিটিশ আশ্রিত মহারাজা হিন্দু বলে যে তাঁর সঙ্গে

সংগ্রাম করত না তা নয়। এই শক্তিকেই এখন কাশ্মীর রক্ষা করতে হচ্ছে যাতে সে ছলে বলে কৌশলে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরভুক্ত না হয়। তেমন শিবিরভুক্তি যদি ঘটে তবে ভারতের স্বাধীনতা কমজোর হবে। কাশ্মীর হারানো মানে স্বাধীনতা হারানোর দিকে প্রথম পদক্ষেপ।

দ্বিতীয় শক্তি হলো মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ, যার প্রতিমূর্তি পাকিস্তান। এ শক্তি বিনা দ্বন্দ্বে পৃথক রাষ্ট্র পায়নি। যুদ্ধবিগ্রহে এর অনাগ্রহ নেই। "লড়কে লেঙ্গে" এর প্রাণের কথা। কার কাছ থেকে লড়কে লেঙ্গে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে নয়। পাশ্চাত্ত্য শিবিরের বাইরে এসে নয়। এর শত্রুসম্পর্ক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে, ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে, বলতে গেলে ভারতবাসীর স্বাধীনতার সঙ্গে। সবকিছুই এর চোখে হিন্দু। আর হিন্দু হলেই মুসলমানের দুশমন হতে হবে। হিন্দু মুসলমানে মৈত্রী হতে পারে না, হিন্দু মুসলমানকে গ্রাস করার জন্যে হাঁ করে রয়েছে। আর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যেন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার নামান্তর। কাশ্মীরের উপর তার যেন কোনো নৈতিক দাবী নেই, সেটা যেন তার উপনিবেশ।

একথা সত্য যে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্যান্য রাজ্য যেমন হিন্দুপ্রধান কাশ্মীর তেমন নয়। কাশ্মীর এককালে হিন্দুপ্রধান ছিল, কিন্তু বেশীর ভাগ হিন্দু মুসলমান হয়ে যাওয়ায় কাশ্মীর এখন মুসলমানপ্রধান। তা বলে তাদের ভাষা বা সংস্কৃতি বা প্রাদেশিক স্বকীয়তা লুপ্ত হয়নি। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে তারা কাশ্মীরী। ভারতবর্ষ যদি এক রাষ্ট্র হতো, ভারত পাকিস্তান যদি দুই রাষ্ট্র না হতো, তা হলে তারা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে একরাষ্ট্র-ভুক্ত হতো। কিন্তু ভারত পাকিস্তান দুই রাষ্ট্র হয়েছে ও কাশ্মীর কার্যত দুই শক্তির মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে। কাশ্মীরীদেরও অগত্যা দুই ভাগ হতে হয়েছে। এতে যাঁদের আন্তরিক আপত্তি, যাঁরা কাশ্মীরের ঐক্য চান ও তাকেই সব চেয়ে বেশী মূল্য দেন তাঁরা কাশ্মীর পেট্রিয়ট। যেমন বাঙালী পেট্রিয়ট ছিলেন স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসু। তিনি সুহ্‌রাবর্দি সাহেবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বতন্ত্র বঙ্গের কল্পনা করেছিলেন। যুক্ত বঙ্গ থাকত ভারত পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের বাইরে। যুক্ত বঙ্গ হতো তৃতীয় এক রাষ্ট্র। তার পিছনে যে মতবাদ বা সেণ্টিমেণ্ট ছিল সেটা তৃতীয় এক শক্তি।

স্বতন্ত্র বঙ্গের পিছনে তেমন জনমত ছিল না, নয়তো স্বতন্ত্র বঙ্গ বলে তৃতীয় এক রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হতো। গান্ধীজীও কতকটা সেইরূপ পরামর্শ দিয়েছিলেন, যাতে গৃহযুদ্ধ না বাধে। এখনো পূর্ববঙ্গে বহু মুসলমান আছেন যাঁরা পাকিস্তান ছেড়ে দিতে রাজী আছেন, যদি স্বতন্ত্র বঙ্গ বলে তৃতীয় এক রাষ্ট্র হয়। স্বতন্ত্র বঙ্গ না হলে তাঁরা পাকিস্তানকেই ভারতের চেয়ে আরো আপনার মনে করেন। এঁদের জীবন সুখের নয়, কারণ এঁরা পাকিস্তানী হওয়ার চেয়ে বাঙালী হওয়া বেশী পছন্দ করেন, অথচ পাকিস্তানী না হয়েও গতি নেই। বাইরে থেকে আমরা এঁদের ভুল বুঝি। এঁদের সঙ্গে আমাদের শত্রুসম্পর্ক নয়। কিন্তু পাকিস্তান যদি শত্রুভাবাপন্ন হয়, যদি যুদ্ধঘোষণা করে, তবে

এঁদের সঙ্গে আমাদের ভ্রাতৃঘাতী সমর হবে। ট্র্যাজেডী আর কাকে বলে! যুক্ত বঙ্গে যাঁরা হতেন 'কমরেড', যুধ্যমান বঙ্গে তাঁরাই হবেন 'এনিমি'।

এখন কাশ্মীরীদের মনের ভাবও কতকটা সেইরকম। ভারতবর্ষ বলে একমাত্র রাষ্ট্র যদি থাকত তা হলে কোনো গোলমাল ছিল না, স্বতন্ত্র কাশ্মীর বলে তৃতীয় একটা রাষ্ট্র যদি হয় তা হলেও কোনো গোলমাল থাকে না, কিন্তু ভারত পাকিস্তান বলে দুই যুধ্যমান রাষ্ট্র হয়েই যত গোলমাল। সব কাশ্মীরী এক শিবিরে থাকতে পারছে না, থাকতে চায়ও না, অথচ বরাবরের মতো দুই শিবিরে থাকতে হবে এটাও তারা মেনে নিতে কুণ্ঠিত। বাঙালীরাও কি মেনে নিতে কুণ্ঠিত নয়? 'পার্টিশন জিন্দাবাদ' বলে জয়ধ্বনি করবে এমন বাঙালী খুব বেশী আছে কি? যারা করে তারা সেটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। 'পশ্চিমবঙ্গ জিন্দাবাদ'।

বঙ্গভঙ্গের যে বেদনা আমরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করছি সেই বেদনাই শেখ আবদুল্লা সাহেবের অন্তরে। বেদনা দিয়ে বেদনার পরিমাপ করলে মানুষকে বোঝা কঠিন নয়। ভারত যদি কাশ্মীরের সমস্তটা নিতে পারত, রাখতে পারত, তা হলে সব কাশ্মীরীকেই পাওয়া যেত এক নৌকায়। কিন্তু তার তো কোনো লক্ষণ নেই। কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ আমরা পাকিস্তানকে ছেড়ে দিয়েছি বললে সত্যের অপলাপ হয় না। সেইভাবেই যুদ্ধবিরতি হয়, সেইভাবেই যুদ্ধবিরতি আবার হবে। কাশ্মীর থেকে যারা বহুদূরে থাকে তাদের পক্ষে যুদ্ধবিরতিই আরামপ্রদ। যারা কাশ্মীরের দুই বিভক্ত অঞ্চলে থাকে তাদের পক্ষে তা নয়। তাদের পক্ষে ওটা একটা গর্ভযন্ত্রণা। ওর থেকে নিস্তারের উপায় খুঁজতে খুঁজতে তাদের কেউ কেউ সেটা পেয়েছে সংযুক্ত কাশ্মীর নামক আইডিয়াটির মধ্যে। যার অন্য নাম স্বতন্ত্র কাশ্মীর বা স্বাধীন কাশ্মীর।

এসব লোক মতবাদের দিক থেকে পাকিস্তানী নয়। অথবা স্বভাবত সাম্প্রদায়িক নয়। তবে তৃতীয় একটা রাষ্ট্রকে অবাস্তব বলে যদি নস্যাৎ করা হয়, যেমন করা হয়েছিল স্বতন্ত্র বঙ্গকে, তা হলে চিরকাল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে থাকার চেয়ে সব কাশ্মীরী মিলে পাকিস্তানে যাওয়াই ভালো, এই হলো হতাশ পেট্রিয়টদের যন্ত্রণামুক্তির উপায় উপলব্ধি। ভারতে কেন নয়? এর উত্তর, ভারত তো সমগ্র কাশ্মীর চাইছে না, নিচ্ছে না, নেবে না। পাকিস্তান অখণ্ড কাশ্মীর চাইছে, তার জন্যে দুনিয়া তোলপাড় করছে, চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, মার্কিনের সঙ্গেও। এদিকে গেরিলাযুদ্ধের জন্যেও তৈরি হচ্ছে। ভিয়েৎনামের মতো দীর্ঘকাল চালাতে পারে। এমন যে পাকিস্তান তারই আকর্ষণ ভারতের চেয়ে বেশী বলে মনে হচ্ছে এখন অনেকের কাছে।

কাশ্মীর তারই হবে যে তার সবটাই জয় করে নিতে পারবে। নয়তো তার এই দ্বিধাদীর্ণ দশা কতক লোককে হতাশ করে তুলবে, কতক লোককে মরীয়া করে তুলবে। তবে সাধারণ মানুষ যেভাবে আমাদের এদিকে পার্টিশন মেনে নিয়েছে ও তার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে, কাশ্মীরেও সেইভাবে

মেনে নেবে ও মানিয়ে নেবে, যদি কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি রেখাই পাকাপাকি ভাবে কায়েম হয়। অর্থাৎ কাশ্মীর যদি বাংলার মতো বরাবরের মতো পার্টিশন হয়ে যায়। "যদি" বলেছি, কারণ পাকিস্তানের মনোভাব দেখে মনে হয় না যে যুদ্ধবিরতি রেখাটাকে সে আন্তর্জাতিক সীমান্তে পরিণত করতে রাজী হবে। সুযোগ পেলেই সে আবার হামলা করবে। মামলাটাকে জীইয়ে রাখবে। কাশ্মীরীদেও আশা দেবে, লোভ দেখাবে, ইন্ধন জোগাবে।

কাশ্মীরের সবটা যে জয় করে নেবে কাশ্মীর তারই হবে, বলেছি। কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা কোন্ পক্ষের কতখানি? পাকিস্তান কাশ্মীরের সমস্তটা জয় করে নেবে আর ভারত তাকে জয় করে নিতে দেবে ভারত নিশ্চয়ই এতখানি দুর্বল নয়। অপরপক্ষে ভারত কাশ্মীরের সমস্তটা জয় করে নেবে আর পাকিস্তান তা জয় করে নিতে দেবে, পাকিস্তান যদি-বা এতখানি দুর্বল হয় তার মিত্ররা এত দুর্বল নয়। ইংরেজ মার্কিন চীন সবাই "হাঁ, হাঁ" করে ছুটে আসবে তার ডাক শুনে। ব্যালান্স অফ পাওয়ার ভারতের যায় এটা ইংরেজ মার্কিন চীনা কেউ মন থেকে চায় না। তেমনি পাবি অনুকূলে যায় এটাও চায় না রাশিয়া।

ব্যালান্স অফ পাওয়ার তত্ত্ব যদি সত্য হয় তবে কাশ্মীরী যুদ্ধে কোনো পক্ষই জিতবে না, কোনো পক্ষই হারবে না। যুদ্ধে এর ফয়সালা হতে পারে না। হলেই বা দশ বছর ধরে যুদ্ধ। যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে কাশ্মীরে গণবিদ্রোহ বা বিপ্লব। আয়ুব খানের শেষ তাস সেটাই। তবে তিনি যদি মনে করে থাকেন যে গণবিদ্রোহ বা বিপ্লব তিনি ও তাঁর ছদ্মবেশী সৈনিকরা ঘটাবেন সেটা তাঁর ভ্রম। সৈনিকে জনগণে তফাৎ আছে। আর সেনানায়কে ও জননায়কে তফাৎ আছে। কাশ্মীর যখন স্বৈরাচারী মহারাজার অধীনে ছিল তখনো সেখানে বিদ্রোহ বা বিপব ঘটেনি। এখন তো গণতান্ত্রিক মন্ত্রী-মণ্ডলীকে ভোট দিয়ে গদীতে বসানো গেছে, বিপক্ষে ভোট দিয়ে হটানো যায়। যেখানে সাধারণ নির্বাচন নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেখানে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে বিদ্রোহের বা বিপ্লবের প্রয়োজন হয় না। কাশ্মীরীরা ইচ্ছা করলে অন্য একটি দলকে ভোটে জিতিয়ে দিতে পারে। সেই দলটি ইচ্ছা করলে ভারতের সঙ্গে ১৯৪৭ সালে কাশ্মীরের যোগদানের সময় যে সব ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছিল সে সব ক্ষমতা বাদে আর সব ক্ষমতা একে একে ফেরৎ চাইতে পারে। সেই ইস্যুতে পদত্যাগ করতে পারে। বিকল্প মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা অসম্ভব হলে রাষ্ট্রপতির শাসন চিরকাল চলতে পারে না। সেরকম সংকট উপস্থিত হলে কাশ্মীরী নেতাদের সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের একটা সেটলমেণ্ট হবে। সেটা ভারতের ঘরোয়া সেটলমেণ্ট।

পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সেটলমেণ্ট অন্য জিনিস। এর মধ্যে কাশ্মীর আসে না। কিন্তু আসতে পারে যদি পার্টিশন সাব্যস্ত হয়, তা হলে সীমানা নির্ধারণের জন্যে। কিংবা যদি কন্‌ফেডারেশন স্থির হয় তবে দুই অংশের সংযুক্তির জন্যে। পাকিস্তানের নেতারা যেদিন ভারতের নেতাদের সঙ্গে

সেটলমেণ্ট চাইবেন সেদিন কাশ্মীরের নেতাদের মতামত নেওয়া হবে। কিন্তু পাকিস্তানে যোগদানের জন্যে নয়। তার দিন গেছে। কাশ্মীর সংযুক্ত হলে কন্‌ফেডারেশন। নতুবা পার্টিশন।

কোনো রাষ্ট্র যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ছদ্মবেশী সৈন্য পাঠিয়ে ক্ষমতা দখলের উপক্রম করে তা হলে যুদ্ধ অনিবার্য। যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব যতবার উঠবে ততবার ব্যর্থ হবে এইজন্যে যে পাকিস্তান তার হামলাদারদের ফিরিয়ে নিতে রাজী নয়, এর পরে আর কখনো হামলাদার পাঠাবে না এমন কোনো অঙ্গীকার করতে রাজী নয়। যুদ্ধবিরতির জন্যে চেষ্টা হচ্ছে, ইউনাইটেড নেশনস স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অগ্রণী হয়েছেন। আনন্দের কথা। যে রক্তপাত শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরের কোনোরকম এদিক ওদিক ঘটাতে পারবে না সে রক্তপাত অবিলম্বে বন্ধ হলেই মঙ্গল। কিন্তু পাকিস্তান যদি হামলাদার ফিরিয়ে না নেয়, যদি বার বার হামলাদার পাঠায়, যদি অঙ্গীকার করা দূরে থাক অধিকার দাবী করে তা হলে যুদ্ধবিরতির কোনো অর্থ হয় ?

না। পাকিস্তান যতদিন না স্বীকার করছে যে নিজের এলাকার বাইরে হামলাদার পাঠানোর অধিকার তার নেই ততদিন স্থায়ী যুদ্ধবিরতির কোনো আশা নেই। সিকিউরিটি কাউন্সিল এক্ষেত্রে অসহায়। তাঁরা বড়জোর এই বলতে পারেন যে কাজটা গর্হিত। কিন্তু শুধু সেটুকু বললেই পাকিস্তানকে নিবৃত্ত করা যাবে না। সে এখন ইউনাইটেড নেশনসের সদস্য নয় এমন দুটি রাষ্ট্রের সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে। যদিও গাঁটছড়া বাঁধেনি। লাল চীন ও ইন্দোনেশিয়া তার মিতা। এরা তাকে পরামর্শ দিচ্ছেন, তুমিও ইউনাইটেড নেশনস থেকে বেরিয়ে এস। পাকিস্তানের হাতে আরো একখানা তাস। সিকিউরিটি কাউন্সিল তাকে হামলাদারি থামানোর নির্দেশ দিলে সে হয়তো ইউনাইটেড নেশনস ত্যাগ করে বসবে। তার ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নৈতিক বল কমে যাবে। সেটাই তো তার সম্বল।

সত্যিকার আশা যদি থাকে তবে মার্কিন ইংরেজ রুশ এই তিন শক্তির মিলিত সংকল্পের উপরে। এঁরা যদি একবাক্যে বলেন যে পাকিস্তানের হামলাদারি অন্যায় ও অবৈধ ও পাকিস্তান যদি সেটা বন্ধ না করে এঁরা তাকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া বন্ধ করবেন তা হলে হয়তো তার টনক নড়বে। তাতেও যদি ফল না হয় তবে অর্থসাহায্য ও অপরাপর সাহায্য বন্ধ করতে হবে। কিন্তু গোড়ায় গলদ পাকিস্তানকে ইংরেজ মার্কিন প্রাণ ধরে কোলছাড়া করতে পারবেন না। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যালান্স অফ পাওয়ার রক্ষা করছে পাকিস্তান। পাকিস্তান হলো মাসীর আদুরে দুলাল বেণী। যতদিন না সে মাসীর কান কেটে নিচ্ছে ততদিন তার সাত খুন মাফ। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। তা ছাড়া পাকিস্তানের মতে এটা একটা স্বত্বের মামলা। সে তার স্বত্ব আদায় করতে চায়। তা হলে এ যুদ্ধ চলবে ? অগত্যা। যেমন চলেছিল ও চলছে চীনের সঙ্গে।

উপরের অংশ যখন লেখা হয় তখনো যুদ্ধ ছড়ায়নি, কাশ্মীরে সীমাবদ্ধ

রয়েছে। তারপর দেখতে দেখতে ছড়িয়ে যায়। তখন আর তাকে কাশ্মীরের লড়াই বলা চলে না। পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতীয় পাঞ্জাব ও রাজস্থান জড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গেও বোমা পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ করা আমাদের নীতি নয় এটা ঘোষণা করা হয়। যুদ্ধ আর ছড়ায় না। অতঃপর যুদ্ধবিরতি।

আর একদফা হবে নাকি? পাকিস্তানের কর্তারা শাসাচ্ছেন যে, হবে। হওয়া বিচিত্র নয়। কারণ নেপথ্যে আরেক অভিনেতা রয়েছেন। তিনি একটা চরমপত্রও দিয়েছিলেন, কিন্তু সহসা যুদ্ধবিরতি ঘটায় তাঁকে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করতে হয়নি। পরের বার হয়তো তিনিও আসরে নামবেন। তখন সেটা হবে একসঙ্গে দুই যুদ্ধ। ভারত পাকিস্তান। ভারত চীন।

বলা বাহুল্য, ভারত চীন যুদ্ধ নতুন করে বাধলে সেটাও সীমাবদ্ধ থাকবে না। কাশ্মীর থেকে যেমন পশ্চিম পাকিস্তান ও পশ্চিম ভারত তেমনি সিকিম বা নেফা বা লাদাখ থেকে তিব্বত ইত্যাদি। নেপথ্যে আর কে কে আছেন, জানিনে। আমেরিকাও ভারতের ভার লাঘব করার জন্যে চীনের সীমানা লঙ্ঘন করতে পারে। তখন রাশিয়াও যে না জড়িয়ে পড়বে অ নয়। তার মানে বিশ্বযুদ্ধ।

আগুন আর একবার লাগানোর আগে পাকিস্তানকে নিবৃত্ত করতে হবে। পরে দমকল পাঠিয়ে ফল নেই। ইতিমধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ্ থেকে যুদ্ধবিরতির ও পশ্চাদ অপসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা নিষ্পত্তির ইঙ্গিতও করা হয়েছে। নিষ্পত্তি মানে দু'পক্ষের সম্মতি নিয়ে নিষ্পত্তি। একপক্ষের অসম্মতি থাকলে নিষ্পত্তি কথাটার অর্থ হয় না।

যত বিলম্ব হোক না কেন সম্মতি লাভ করতে হবে। পাকিস্তানের সম্মতি তথা ভারতের সম্মতি। পাকিস্তান কি একথা জানে না? জানে ঠিকই, কিন্তু তার আশঙ্কা যত সময় যাবে ভারত কাশ্মীরে ততই শক্ত হয়ে জাঁকিয়ে বসবে। তখন তাকে যুদ্ধের দ্বারা হটানো যাবে না। তখন বাকী থাকবে একখানি মাত্র তাস। গণবিদ্রোহ বা বিপ্লব। যারা বিদ্রোহ বা বিপ্লব করে সফল হবে তারাই কাশ্মীরের মালিক হবে। পাকিস্তান নয়। আর চীনকেই বা বিশ্বাস কী? কাশ্মীরী বিপ্লবীরা যদি রাজা হয় চীনই তো হবে ওদের মন্ত্রী ও সেনাপতি। পাকিস্তানকে আমল দেবে কে?

সময় পাকিস্তানের দিকে নয়। সেইজন্যে সে সবুর করতে পারছে না। হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে! নিরাপত্তা পরিষদে আরো একবার ঘুরে আসা হলো। গায়ে পড়ে ভারতের বিরুদ্ধে, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে, আপনারি হিন্দু পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধে মুখখিস্তি করা হলো। গায়ের জ্বালা কি অত সহজে মেটে! এখন শোনা যাচ্ছে জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে যাবে। এবার চোদ্দ পুরুষ কানে আঙুল দেবে। সারা দুনিয়ার লোক কান পেতে শুনবে হাজার বছরের পুরানো কেচ্ছা কিন্তু নিষ্পত্তি ওভাবে হবে না। নিষ্পত্তির জন্যে চাই সম্মতি। সেটা ভারতের হাতে।

তা হলে কি সালিশ মেনে তার সহায়তায় নিষ্পত্তির চেষ্টা করতে হবে! সে চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। প্রথমে ইঙ্গ মার্কিন শিবিরের কোনো এক মহারথীকে সালিশ মানার প্রস্তাব উঠেছিল, কিন্তু পাকিস্তান সেই শিবিরে নাম লিখিয়ে তাদেরই একজন হয়ে যাওয়ায় তাদের কারো অপক্ষপাতের উপর ভারতের আস্থা থাকে না। তারপর তো স্পষ্ট দেখা গেল পাকিস্তান মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছে, নামে কমিউনিস্টদের রুখতে, কামে ভারতের উপর প্রয়োগ করতে। এবার তো হাতে হাতে ধরা পড়ে গেল যে প্যাটন ট্যাঙ্ক হিমালয় ভেদ করে চীনের গতিরোধ করার জন্যে নয়, কাশ্মীর সীমান্ত লঙ্ঘন করে ভারতীয় এলাকা দখল করার জন্যে। এর পরে আর ইঙ্গ-মার্কিন শিবিরের সালিশের কথা ওঠে না। ইতিমধ্যে ভারতীয় ফৌজের লাহোর অভিমুখে যাত্রায় বিচলিত হয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ভারতবিরোধী উক্তি এমন তিক্ততা সৃষ্টি করেছে যে কমনওয়েলথ ত্যাগের কথাই বরং শোনা যাচ্ছে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি যদিও ইঙ্গ-মার্কিন আঁচল বরাবরের মতো ছাড়েনি তবু আগের চেয়ে অনেকটা স্বাধীন হয়েছে। চীনের সঙ্গে গোপন শলাপরামর্শের পর এখন রুশের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপের উদ্যোগ লক্ষ করা যাচ্ছে। এবার হয়তো রুশকে বা রুশ শিবিরের কোনো মহারথীকে সালিশ মানার চেষ্টা হবে। কিন্তু ভারত ইতিমধ্যে মনঃস্থির করে ফেলেছে যে কাশ্মীর নিয়ে সে আর পাকিস্তানের সঙ্গে বাক্যালাপ করবে না। কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভারতের অঙ্গহানি না করে তো কাশ্মীরের কোনো অংশ হস্তান্তর করা যায় না। কোনো একজন তৃতীয় পক্ষ সদয় হয়ে কাশ্মীরের কিছু অংশ ভারতের হাতে দান করবেন আর বাকী অংশ পাকিস্তানের হাতে, এতে ভারতের মান বাড়বে না। পাকিস্তানেরও যে পেট ভরবে তাও নয়। সে আবার অনুপ্রবেশ করবে। আবার লড়াই বাধাবে।

নিষ্পত্তি বলতে কী বোঝায়? নিষ্পত্তি বলতে এই বোঝায় যে পাকিস্তান আর কোনোদিনই ভারতের সঙ্গে লড়বে না। লড়বার জন্যে তৈরি হবে না। লড়বার মত আর কোনো অজুহাত রাখবে না। দু'পক্ষের মধ্যে যতগুলো বিবাদ আছে সব একে একে মিটিয়ে ফেলবে। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করবে। বর্মা যেমন নিজের সীমানা নিয়ে সন্তুষ্ট আছে, ভারতের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে না, পাকিস্তানও তেমনি সন্তুষ্ট থাকবে ও হস্তক্ষেপ করবে না। তা ছাড়া এটাও চাই যে ভারতের সঙ্গে যার শত্রুতা পাকিস্তান তার সঙ্গে মিত্রতা করবে না, গোপন চুক্তি করবে না, তার দাবী সমর্থন করবে না, তার হয়ে লড়বে না। চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতের সঙ্গে হাত মেলানো আপাতত সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে যদি চীন ভারত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তা হলেই সম্ভব হবে। তার দেরি আছে।

কাশ্মীরকে সামনে রেখে পাকিস্তান বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে বিভিন্ন বন্দোবস্তের বেড়াজালে আপনাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। এ যেন বিভিন্ন মহাজনের কাছে একই সম্পত্তি বন্ধক রাখা। যে সম্পত্তি তার বলে সে দাবী করছে, কিন্তু

এখনো পায়নি। কাশ্মীরঘটিত নিষ্পত্তি যদি একা পাকিস্তানের সঙ্গেই হয়ে চুকে যেত তা হলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। কিন্তু ইংরেজ, মার্কিন, চীন ও বোধ হয় রুশ সেই নিষ্পত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেটা এককালে ছিল ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগবাঁটোয়ারা সেটা এখন আন্তর্জাতিক দলাদলির টানা-হ্যাঁচড়া। ভারত এদের মধ্যে ক'জনের সঙ্গে রফা করবে, কার কার সঙ্গে রফা করবে! কেনই বা করবে!

ভারত তার দরজা সতেরো বছর ধরে খোলা রেখেছিল। কিন্তু পাকিস্তানের নেতারা ধরাছোঁয়া দিচ্ছেন না, দেবার নামগন্ধ নেই দেখে দরজা বন্ধ করে দিল। কাশ্মীর যদিও ভারতের সামিল ছিল তবু অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় স্বতন্ত্র ছিল। তার সেই বিশেষত্বটুকু রদ হলো। এতে পাকিস্তানের কী? ক্ষতি যা হলো তা কাশ্মীরের স্বাতন্ত্র্যবাদীদের। তাঁদের দাবী ছিল কাশ্মীর পুরোপুরি অন্যান্য রাজ্যের মতো হবে না, তার বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে। পাকিস্তানের দাবী তা নয়। পাকিস্তানের দাবী কাশ্মীর পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হবে, পরে একসময় পাকিস্তানে বিলীন হবে। কাশ্মীরীদের দাবী ও পাকিস্তানীদের দাবী এক নয়। কিন্তু পাকিস্তান তাদের মনোভঙ্গের সুযোগ নিল। দেখল যে তাদের একাধিক দল ভারতের উপর ক্ষেপে রয়েছে। কাশ্মীর অনুপ্রবেশ ও বলপূর্বক ক্ষমতা অধিকার করতে গেলে তাদের সহায়তা পাওয়া যাবে। কার্যসিদ্ধির পর তাদের ধোঁকা দিলে চলবে। তারা হবে পা রাখার সিঁড়ি। ঘরে ঢুকে সিঁড়িটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দেওয়া যাবে।

এই নিয়ে যুদ্ধ বেধে যাবে এটা বোধহয় পাকিস্তানের হিসাবের বাইরে ছিল। কিন্তু বেধে যখন গেল তখন পাকিস্তান ধুয়ো ধরল যে কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্যেই তার মাথাব্যথা। তার নিজের স্বার্থের জন্যে সে লালায়িত নয়। কাশ্মীরীরা যদি প্লেবিসাইটে ভারতের পক্ষে ভোট দেয় তবে পাকিস্তান সেটা মেনে নেবে। কিন্তু তারা যদি স্বাধীন কাশ্মীরের জন্যে ভোট দেয় তা হলে? সে বিষয়ে পাকিস্তান নীরব। সকলেই জানে যে প্লেবিসাইটে দুটি মাত্র বিকল্প থাকবে। হয় পাকিস্তান নয় ভারত। তৃতীয় কোনো রাষ্ট্র নয়। কিন্তু এমনি প্রচারকার্যের প্রতারণা যে কাশ্মীরের বহু লোকের বিশ্বাস একবার যদি গণভোট অনুষ্ঠিত হয় তা হলে কাশ্মীর নেপালের মতো স্বাধীন হয়ে যাবে। সুতরাং গণভোট যাতে হয় সেই তাদের লক্ষ্য। তার জন্যে তারাও আন্দোলন করবে। সত্যাগ্রহ করবে অহিংস মতে। যে দিনটি সত্যাগ্রহের জন্যে ধার্য ছিল সেই দিনটিতেই পাকিস্তানীরা অনুপ্রবেশ করে হাঙ্গামা বাধিয়ে দেয়। তখন হিংসা এসে অহিংসাকে কোথায় ডুবিয়ে দেয়!

গোলমেলে ব্যাপার বইকি। পাকিস্তানের লক্ষ্য ও কাশ্মীরী স্বাতন্ত্র্য-বাদীদের লক্ষ্য এক নয়। পাকিস্তান চায় আর একটি অঙ্গরাজ্য। যেমন বেলুচিস্থান বা চিত্রাল। কাশ্মীরী স্বাতন্ত্র্যবাদীরা চায় আর একটি পাকিস্তান।

অথচ দুই কণ্ঠে একই ধ্বনি। আত্মনিয়ন্ত্রণ। গণভোট। পাকিস্তান সফল হলে কাশ্মীরী স্বাতন্ত্র্যবাদীদের কণ্ঠরোধ করবে। যেমন করছে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাখতুনদের কণ্ঠরোধ। কাশ্মীরী স্বাতন্ত্র্যবাদীরা কি জানে না যে পাকিস্তান কাশ্মীর হাতে পেলে পকেটে পুরবে, তখন হাজার সত্যাগ্রহ করলেও তার পকেট থেকে স্বাতন্ত্র্য আদায় করা যাবে না? তা হলে পাকিস্তানের সঙ্গে কণ্ঠ মেলানো কেন?

পাকিস্তানের ও কাশ্মীরী স্বাতন্ত্র্যবাদীদের লক্ষ্য এক নয়, এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। তেমনি লক্ষ্য ভেদ করার উপায় এক নয়, এটা অতটা পরিষ্কার না হলেও সত্য। কাশ্মীরী স্বান্ত্র্যবাদীরা সত্যাগ্রহী। আর পাকিস্তান সত্যাগ্রহের ধার কোনো কালেই ধারত না, এখনো ধারে না। সে সরাসরি হত্যাগ্রহী। "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" যেমন, "লড়কে লেঙ্গে কাশ্মীর"ও তেমনি রক্তপাতের পণ। কাশ্মীরের জনসাধারণ তাদের আচরণের দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছে যে তারা এর মধ্যে নেই। পাকিস্তানীরা তাদের কাছে প্রশ্রয় পায়নি। বরং তারাই খবর দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে। তারাও তো মুসলমান। কিন্তু তারা পাখতুনদের দশা দেখে সাবধান হয়েছে। আগেও তো উপজাতির আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে, ইজ্জৎ হারিয়েছে। সে সব কথা ভুলে যাবার মতো কথা নয়। ইসলামের নাম করে একপক্ষ মার দেবে ও আরেকপক্ষ মার খাবে, একপক্ষ নারীনিগ্রহ করবে ও আরেকপক্ষ সহ্য করবে পাকিস্তান তাদের কাছে কী করে যে এতটা প্রত্যাশা করেছিল ভেবে অবাক হতে হয়।

প্রথমবারের আক্রমণে আতঙ্কিত হয়ে যারা ভারতের কাছে সৈন্য সাহায্য চেয়েছিল ও পেয়ে কৃতজ্ঞ হয়েছিল তাদের সবাই কিছু ভারতবিদ্বেষী বা পাকিস্তানপ্রেমিক বনে যায়নি। তারা হয়তো বক্‌শী গোলাম মহম্মদের অপশাসনে বিক্ষুব্ধ অথবা ভারত যেভাবে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা লোপ করেছে তার দরুন বিক্ষুব্ধ, কিন্তু এ বিক্ষোভ সে আতঙ্কের তুলনায় কতটুকু? সে আতঙ্কের পুনরাবৃত্তি কেউ কখনো কামনা করতে পারে? বিক্ষোভ আছে বলে আতঙ্ক ডেকে আনবে কাশ্মীরীদের মধ্যে এমন নির্বোধ কেউ নেই, সেইজন্যে পাকিস্তান কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করে কারো কাছে ধন্যবাদ পায়নি। এখন সাধু সেজে আত্মনিয়ন্ত্রণের বুলি আওড়াচ্ছে। এতে অবশ্য কারো কারো কাছে সাধুবাদ পাচ্ছে। এটা তো আতঙ্কের ব্যাপার নয়। আত্মনিয়ন্ত্রণের একটা কুহক আছে। ডাকাত যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের কপট আশ্বাস দেয় তবে ডাকাতকেও লোকে বন্ধু ঠাওরায়। কিন্তু এই রবিনহুড নিঃস্বার্থ নন। ইতিমধ্যেই ইনি চীনকে কাশ্মীরের একখণ্ড দিয়ে তার কাছ থেকে বিনিময়ে একখণ্ড ভূমি পেয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে ইনিই কাশ্মীরের মালিকানায় হক্‌দার। তাকে ইনি কিনতেও পারেন, বেচতেও পারেন। স্বাতন্ত্র্যবাদীদেরও ইনি এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচবেন।

জবাহরলালজী বলতেন, শ' বছরের লড়াই। ভুট্টো সাহেব বলছেন,

হাজার বছরের লড়াই। এই এক জায়গায় দু'জনে একমত যে জীবদ্দশায় এর শেষ নেই।

কিন্তু কেন এই লড়াই ? কাশ্মীর এমন কী গুরুত্বপূর্ণ যে এর জন্যে দুটো দেশ লড়তে লড়তে ফতুর হয়ে যাবে, আর অন্যান্য দেশ ছাড়িয়ে দিতে পারবে না ? তবে কি তাদেরও স্বার্থ আছে ?

কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ বলা হয়। সশরীরে স্বর্গে যাবার জন্যেই কি এতগুলো দেশ উদ্গ্রীব ? না, তার জন্যে নয়। কাশ্মীর যদি ভুনরক হতো তা হলেও তার অবস্থান তাকে বিশেষ গুরুত্ব দান করত। তার অবস্থানঘটিত বিশেষ গুরুত্ব আছে বলেই তার জন্যে বিশেষ মর্যাদা দাবী করছেন শেখ আবদুল্লা প্রমুখ কাশ্মীরের সেই সব নেতা যারা পাঞ্জাব বা পশ্চিমবঙ্গের মতো আর একটি রাজ্যের সাধারণ মর্যাদায় সন্তুষ্ট নন।

কাশ্মীরের গুরুত্ব ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যের তুলনায় বেশী। তার গুরুত্বের কারণ এই শুধু নয় যে সেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। কাশ্মীরের একদিকে আফগানিস্থান, একদিকে রাশিয়া, একদিকে চীন, একদিকে ভারত ও একদিকে পাকিস্তান। এ ছাড়া ব্রিটেন ও আমেরিকা দূরে থেকেও নিকট। তারাই নিকটতম দুই সমুদ্রশক্তি। ভারত মহাসাগর তো তাদেরই পৈতৃক সম্পত্তি। একজন যদি-বা একটু হটে যায় আরেকজন এসে তার জায়গা নেয়। পাকিস্তানের ভূসর্গপ্রাপ্তির পর তারা যদি একবার কাশ্মীরে গিয়ে ঘাঁটি গাড়তে পারে তা হলে ব্যালান্স অফ পাওয়ার ভারত, চীন, রুশ, আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে যায়। সেরকম সম্ভাবনা আছে বলেই ভারত সেখানে সাবধান ও শক্ত হয়ে বসেছে। আর চীনও পাকিস্তানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ভারতকে বেদখল করে নিজের জন্যে জায়গা করে নিয়েছে। রাশিয়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ভারতের সঙ্গে বন্ধুতা করলে। তা বলে সে পাকিস্তানের সঙ্গে শত্রুতা করতেও চায় না। পাকিস্তানও যদি বন্ধু হয় তবে অধিকন্তু ন দোষায়। আফগানিস্থানের পলিসিও রাশিয়ার মতোই। ভারতের উপরেই তার ভরসা। যদিও সে মুসলমান।

ব্রিটিশ আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের যে গুরুত্ব ছিল এখন কাশ্মীরের সেই গুরুত্ব। বলতে গেলে কাশ্মীরই এখন ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ। সৈন্যদলকে সেখানকার পথঘাট আগলে থাকতে হয়, পাছে কেউ কোন ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে। আগেকার দিনে ভয় ছিল সব চেয়ে বেশী রাশিয়ার দিক থেকে। কিন্তু স্বাধীন ভারতের গোষ্ঠীনিরপেক্ষ পলিসি রাশিয়াকে ভারতের দিক থেকে নির্ভয় করেছে বলে রাশিয়াও ভারতকে অভয় দিয়েছে। চীনের বেলাও সেইরূপ হতে পারত, যদি না তিব্বত নিয়ে চীনের সঙ্গে ভারতের মনোমালিন্য ঘটত। ব্রিটিশ আমলে ভারত তিব্বতের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছেছিল। তিব্বত কার্যত স্বাধীন ছিল। চীন স্বাধীনতা কেড়ে নেয় ও তার সঙ্গে ভারতের দীর্ঘকালের বোঝাপড়া ধীরে ধীরে বানচাল করে। ইতিহাসে যা কোনোকালে হয়নি তাই হয়, চীনের সৈন্য

এসে হিমালয়ের উত্তর প্রান্ত জুড়ে বসে। যারা হাজার মাইল তফাতে ছিল তারা যদি হাজার মাইল এগিয়ে আসে তা হলে তাদের প্রতি শঙ্কা ও সন্দেহ স্বাভাবিক। চীন তার সৈন্যদের তিব্বত থেকে না হোক হিমালয় থেকে হটিয়ে না নিলে শঙ্কা ও সন্দেহ দূর হবে না। ভারতীয় সৈন্য নিজের এলাকায় পিছু হটতে পারে না, পিছু হটতে হলে হটতে হয় চীনকেই। কিন্তু চীনও বলছে যে হিমালয়ের ওপারে চীনেরই নিজের এলাকা। তিব্বতকে সে ঝেড়ে অস্বীকার করছে। তিব্বতের নাম রেখেছে চীনের তিব্বত অঞ্চল। ও দাবী সম্পূর্ণ ইতিহাস-বিরুদ্ধ। তিব্বত ছিল চৈনিক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। ভারতকে ব্রিটেনের ভারত অঞ্চল বলে দাবী করার মতোই উদ্ভট এ দাবী। তিব্বত সম্বন্ধে নতুন করে বোঝাপড়া না হলে চীন ভারত সম্পর্ক শোধরাবে না। এটা কেবল সীমানার বিরোধ নয়। তা যদি হতো অনেক আগেই মিটে যেতো।

এই উপমহাদেশের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা বরাবর একটাই ছিল। এমন কি মোগল আমলেও, দক্ষিণাঞ্চল বাদে। এতকালের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেশভাগের দরুন তছনছ হয়ে গেছে। চীনা সৈন্য যে শিয়রে বসে আছে এর জন্যে যা কিছু দুর্ভাবনা একমাত্র ভারতেরই। পাকিস্তান যেন সমান বিপন্ন নয়। একটা ঘরের মাঝখানে পার্টিশন তুলে দু'ভাগ করলে কি কোনো ভাগের বিপদ কোনো ভাগের চেয়ে কম হয়, যদি ঘরের এক কোণে আগুন লাগে? এক্ষেত্রে কমন ডিফেন্স চাই, ভারত পাকিস্তান যৌথ প্রতিরক্ষা আবশ্যক। কিন্তু এর জন্যে পাকিস্তানকে কাশ্মীর ঘুষ দিতে হবে, নইলে সে চীনের সঙ্গেই হাত মেলাবে? এক ভাই যেমন আরেক ভাইকে জব্দ করার জন্যে গুণ্ডা ডেকে আনে? অতীতে বহুবার এইভাবে এ দেশ পরাধীন হয়েছে। পাকিস্তানের যদি স্বাধীনতার জন্যে দরদ থাকত সে কখনো এত বড়ো একটা সর্বনাশকে ব্ল্যাকমেলের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করত না। কিন্তু লীগ তো স্বাধীনতার জন্যে ইংরেজের সঙ্গে লড়েনি। লড়াই বলতে সে বোঝে হিন্দুর সঙ্গে লড়াই। স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম যারা করেছে তারাই সে দায় বহন করবে। এবার চীনের হাত থেকে স্বাধীনতা রক্ষার দায়। কাশ্মীর থেকে সৈন্য সরালে চীন অনায়াসে ঢুকে পড়বে। পাকিস্তানের কতটুকু শক্তি! সে কি পারবে একহাতে চীনকে ঠেকাতে? সে কি চায় চীনকে ঠেকাতে? না আরো কিছু আদায়ের ফিকিরে চীনকে ভিতরে ডেকে আনাই তার মতলব? কাশ্মীর পেলেই তার সব দাবী মিটে যায় এমন তো নয়!

চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্বন্ধটা সেকালের মুসলিম লীগের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সম্বন্ধের অনুরূপ। লীগ কংগ্রেসের কাছ থেকে কিছু আদায় করবে, ইংরেজ কংগ্রেসের কাছ থেকে কিছু আদায় করে দেবে। লীগ চায় যে ইংরেজ থাকুক। ইংরেজ চায় যে লীগ তাকে থাকতে সাহায্য করুক। চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্বন্ধ ভারতের স্বাধীনতার পরিপন্থী। এ সম্বন্ধ যতদিন অটুট থাকবে ততদিন পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ নির্বৈর হবে না। আর বৈরভাব যতদিন অব্যাহত থাকবে কাশ্মীর নিয়ে মিটমাটেরও কোনো

আশা নেই। গায়ের জোরে যে যতটা দখল করেছে সে ততটা রাখবে। আর নয়তো ১৯৪৯ সালের যুদ্ধবিরতি রেখায় ফিরে যাবে। আর নয়তো আরো একদফা লড়ে গায়ের জোরে আরো কিছু দখল করবে। বলা বাহুল্য, সেটা একতরফা হবে না। বেশ বোঝা যাচ্ছে ওরা যদি জম্মু অধিকার করে এরা শিয়ালকোট অধিকার করবে। ওরা যদি শ্রীনগর অধিকার করে এরা লাহোর অধিকার করবে। ওরা যদি কাশ্মীরের সবটা নেয় এরা পশ্চিম পাকিস্তানের আধাআধি নেবে।

তার মানে সারা দেশটাই ইংরেজ যে ভাবে ভাগ করে দিয়ে গেছল সেভাবে ভাগ না হয়ে অন্যভাবে ভাগ হবে। এবার আর মধ্যস্থের সিদ্ধান্তে নয়। এবার মারামারি করে। বলপরীক্ষায় নেমে। এবারকার বাঁটোয়ারা বেয়োনেট দিয়ে। যদি না তৃতীয় পক্ষ এসে থামিয়ে দেয়। আমার বিশ্বাস নিরাপত্তা পরিষদ থামিয়ে দেবেই। তা ছাড়া পাকিস্তানের জনমতও কাশ্মীরের জন্যে লাহোর শিয়ালকোট হারাতে রাজী হবে না। বদলাবদলি করে লাভ নেই তাদের। লোকসান নেই আমাদের। শেষ পর্যন্ত ওই ১৯৪৭ সালের পার্টিশন ও ১৯৪৯ সালের যুদ্ধবিরতি রেখাই টিকে যাবে। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে একটু আধটু এদিক ওদিক হতে পারে, কিন্তু ভারতের সম্মতি বিনা পাকিস্তান কাশ্মীর উপত্যকা পেয়ে যাবে এ কখনো হতেই পারে না। যেই তাকে পাইয়ে দিতে যাবে সেই হবে ভারতের শত্রু। নিরাপত্তা পরিষদ যদি তেমন কোনো সিদ্ধান্ত করে তবে তার সঙ্গে ভারতের বিচ্ছেদ ঘটবে। সোভিয়েট ভীটো থাকতে সেরূপ কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে বলে মনে হয় না। যদি হয় তবে জাতিপুঞ্জ থেকে ভারতের বিদায় অবশ্যম্ভাবী। তখন তার দশা হবে লীগ অফ নেশনসের মতো।

না, তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। পাকিস্তান যদিও আলালের ঘরের দুলাল তবু মার্কিনরাও পাকিস্তানকে পাইয়ে দেবার জন্যে ব্যগ্র নয়। ইংরেজরা যদি ব্যগ্রতা দেখায় কমনওয়েলথ থেকে ভারতের প্রস্থান অনিবার্য। তখন কমনওয়েলথ ভেঙে যাবে। আমার মনে হয় রুশ, মার্কিন, ইংরেজ একমত হয়ে মিটমাটের সূত্র বার করবে। সেটা ভারত ও পাকিস্তান উভয়-পক্ষের গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই। যদি একপক্ষের গ্রহণযোগ্য হয়, অপরপক্ষের না হয়, তা হলে সে সূত্র অকেজো। বার বার চেষ্টা করেও যদি সেরকম কোনো সূত্র খুঁজে না পাওয়া যায় তবে নিরাপত্তা পরিষদ হাত জোড় করে বলবে, "ধন্য তোমাদের মামলা! আমরা তো হদ্দ হয়ে গেলুম। এখন তোমরা ঘরের ছেলে ঘরে যাও। নিজেরাই দয়া করে মিটিয়ে ফেল। খবরদার, আর কখনো আমাদের কাছে এসো না। নিরাপত্তা পরিষদ আর এই নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। তবে আবার যদি তোমরা ফৌজদারি বাধাও আমরা আবার যুদ্ধবিরতির নির্দেশ জারি করব। শেষে কি একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধাবে?"

তখন আর একটি মাত্র পথ খোলা থাকবে। যদি না পাকিস্তান জাতিপুঞ্জ

থেকে বেরিয়ে গিয়ে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ অমান্য করে! সেই পথটি হচ্ছে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সরাসরি আলাপ আলোচনা। কেবল কাশ্মীর নয়, যতগুলো বিষয়ে ঝগড়া ততগুলো বিষয়ে প্রাণখুলে বকবক করতে হবে। মাথা কাটাকাটির চেয়ে কথা কাটাকাটি ভালো। দশবার বৈঠক ভেস্তে যাবে, একবার সফল হবে। দু'পক্ষ মিলে সন্ধিপত্র সই করবে। তারপর সেই সন্ধিপত্র দৃঢ় করা হবে। দুই রাষ্ট্রের পার্লামেণ্ট তাকে স্বীকার করে নেবে। দরকার হলে নতুন নির্বাচনের দ্বারা তার উপর জনমত নেওয়া হবে। এরপর থেকে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু অত সহজে হবে কি! চীন কি চায় যে ভারত পাকিস্তান মিলে মিশে এই উপমহাদেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নেয়? মার্কিন কি তার ঘাঁটির মায়া কাটাতে পারবে? ইংরেজ কি তার "ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল" নীতির যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকুও ছাড়তে রাজী হবে? আর পাকিস্তানের মোগলরা কি তাদের প্রাক্তন প্রজাদের দিল্লীতে ও শ্রীনগরে কায়েম হয়ে সুখে শান্তিতে রাজত্ব করতে দেবে? এর জন্যে চাই গভীর অন্তঃপরিবর্তন। কিন্তু সেটা তো একদিনে হবার নয়। তার জন্যে চাই সময়। সময়ে সেটা সম্ভব।

তবে সময়কে এগিয়ে দিতে পারে বাহ্য ঘটনা। হঠাৎ যদি একটা বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায়—কাশ্মীর নিয়ে নয়, ভিয়েটনাম বা বার্লিন নিয়ে—তা হলে দশ বছরের সময় এক মাসে অতিক্রম করতে পারা যায়। কিংবা যদি পূর্ব পাকিস্তান বিদ্রোহ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তা হলেও সেই রকম সময় সংক্ষেপ হতে পারে। বলতে নেই, কাশ্মীরেও যদি অনুরূপ কোনো স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান ঘটে তা হলেও সময় দ্রুত এগিয়ে আসতে পারে। ইতিহাসে কখন কী হয় কেউ বলতে পারে না। সেইজন্য উটপাখীর মতো বালুতে মুখ গুঁজে যেটা অপ্রীতিকর সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া ভুল। যারা প্রাজ্ঞ তারা সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত।

ভারত কাশ্মীরকে যা দিয়েছে আর কেউ তাকে তা দেয়নি ও দেবে না। ভারত দিয়েছে গণতন্ত্র। ভারত তাকে রক্ষা করেছে পাকিস্তানের উৎপাত থেকে, রক্ষা করছে চীনের গ্রাস থেকে, ভবিষ্যতেও করবে। কাশ্মীরের ভারতভুক্তি ঠিকই হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস ঠিক হয়নি। কাশ্মীরের গুরুত্ব যেমন অদ্বিতীয় তার মর্যাদা তেমন নয়। তার বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া উচিত।

ভারতভুক্তির সময় সেই রকমই কথা ছিল। কিন্তু একটু একটু করে তার বিশেষ মর্যাদা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে! যেটুকু বাকী ছিল সেটুকুও জবাহরলালের মৃত্যুর পর গেল। এর হয়তো যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা তো ঠিক যে কাশ্মীর বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন রাজ্য। তাই যদি হয়ে থাকে তবে তাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়াটাই ন্যায়। না দেওয়াটাই অন্যায়। সুতরাং আগামী নির্বাচনের পূর্বে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে কাশ্মীরকে

অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হবে।

তারপর কাশ্মীরের রাজনীতি থেকে শেখ আবদুল্লার নির্বাসন আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে অপরিহার্য হতে পারে, কিন্তু জনগণের উপর তাঁর প্রভাব এতে কমবে না। বরং বাড়বে। একদিন না একদিন তাঁকে তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে রাজনীতিতে অংশ নিতে অনুমতি দিতে হবে। তখন যদি দেখা যায় যে অধিকাংশ লোক তাঁর দিকে তবে তাঁকে ক্ষমতার আসন ছেড়ে দিতে হবে। তিনি যদি বিশেষ মর্যাদা দাবী করেন তাঁর সে দাবী এক কথায় অগ্রাহ্য করলে চলবে না। আলাপ আলোচনা চালাতে হবে, বৈঠক বসাতে হবে। তাঁর রাজনৈতিক মতের জন্যে তিনি যতকাল ধরে দুর্ভোগ সহ্য করেছেন ততকাল আর কেউ করেননি। তাঁকে বন্ধুরূপে পেলে আমাদেরই নৈতিক জোর বাড়বে। বিদেশে আমাদের পক্ষের প্রচারকার্য সফল হচ্ছে না এই জন্যে যে আবদুল্লার সঙ্গেও আমাদের বনছে না, শুধু আয়ুব খানের সঙ্গেই নয়। ভারতের যাঁরা সত্যিকারের সুহৃদ তাঁরাও ভারতকে সমর্থন করতে পারছেন না, যদিও পাকিস্তানকে সমর্থন করতেও তাঁরা অনিচ্ছুক। নিরপেক্ষ জনমত ক্রমেই এইদিকে যাচ্ছে যে কাশ্মীরকে ভারত পাকিস্তানের থেকে পৃথক করে দেওয়া উচিত। যাঁরা ভারতের শত্রু বা পাকিস্তানের মিত্র নন তাঁরাও বুঝতে পারছেন না কাশ্মীর স্বাধীন হলে কার কী ক্ষতি! ওই তো কেমন আফগানিস্থান স্বাধীন। কেউ কেউ বলছেন কাশ্মীরকে আন্তর্জাতিক অধিকারে রাখতে। যেন সেটা বেওয়ারিশ সম্পত্তি।

ইতিহাস সতেরো আঠারো বছরে শেষ হয়ে যায় না। সামনের উনিশ বিশ বছরের কথাও ভাবতে হবে। কাশ্মীরের বর্তমান মর্যাদাই কি চূড়ান্ত? গুরুত্ব অনুসারে মর্যাদা, এই তত্ত্ব যদি সত্য হয় তবে আমার মতে কাশ্মীরের মর্যাদাবৃদ্ধি দূরদর্শিতার পরিচায়ক। তা বলে তাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়ে পাকিস্তানের হাতে সঁপে দিতে কেউ বলছে না। ভালো করে মনে রাখতে হবে যে ভারত ত্যাগের দাবী অন্যায়, কিন্তু বেশীর ভাগ লোক যদি বিশেষ মর্যাদা চায় সেটা অন্যায় নয়। সেটা একপ্রকার বিকেন্দ্রীকরণ। জার্মানীর সংবিধান বাভেরিয়াকে বরাবর একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। গুরুত্ব অনুসারে মর্যাদা।

শেখ আবদুল্লা যদি কাশ্মীরের জন্যে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দাবী করেন তবে তাঁর দলবলের সঙ্গে আপস কোনো কালে হবে না। কাশ্মীর পাঁচ সাতটি বিদেশী শক্তির কূটনীতির মধ্যচক্র হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হবে সেটা ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক। পাকিস্তান যে এতদূর অধঃপাতে যাবে এটা জানা থাকলে আমরা কি পাকিস্তান সৃষ্টিতে রাজী হতুম? তার চেয়ে গৃহযুদ্ধ ভালো। একবার যে ভুল করা হয়েছে আবার সেই ভুল আমরা করব না। করতে রাজী হব না। আন্তর্জাতিক জনমত যতই সেদিকে যাক। পাকিস্তান তৃতীয় একটা নেশন সৃষ্টির পক্ষপাতী নয়। আবদুল্লাকে নিয়ে সে তার নিজের খেলাই খেলেছে। আবদুল্লার খেলা খেলেনি। বলা যেতে

পারে প্লেবিসাইটের দাবী বা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী এমন একটা দাবী যে পাকিস্তানের মতে সেটা তার স্বার্থে, কাশ্মীরী স্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে সেটা তাদের স্বার্থে। এটা দুই পরস্পরবিরোধী স্বার্থের গোঁজামিল। পাকিস্তানের লক্ষ্য দ্বিতীয়বার ভারত বিভাগ। কাশ্মীর প্রাপ্তির পর সে আসাম প্রভৃতির জন্য হাত বাড়াবে। তখন তার লক্ষ্য তৃতীয়বার ভারত বিভাগ। আর কাশ্মীরী স্বাতন্ত্র্যবাদীদের লক্ষ্য আন্তর্জাতিক মর্যাদালাভ।

আন্তর্জাতিক মর্যাদা নয়, অথচ বিশেষ মর্যাদা, এর নজীর নানা দেশের সংবিধানে আছে। আয়ারলণ্ডের উত্তরাংশ ইংলণ্ডের সঙ্গে রয়ে যায়, কিন্তু সর্বতোভাবে মিশে যায় না। তখন আয়ারলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীই বলা হয়, মুখ্যমন্ত্রী নয়। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়তো শ্রমিক দলের, উত্তর আয়ারলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়তো রক্ষণশীল দলের, তা বলে বিরোধ বাধে না। কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদাহানি ঘটিয়ে লাভ কী হলো, জানিনে। কিন্তু লোকসান এই হলো যে শেখ আবদুল্লাকে কখনো মুখ্যমন্ত্রী পদে পাওয়া যাবে না। ভারতের নিজের স্বার্থেই একদিন তাঁকে প্রয়োজন হতে পারে। রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। আজ যে শত্রু কাল সে বন্ধু। যে কংগ্রেস নেতাদের আহমদনগর দুর্গে আবদ্ধ করা হয়েছিল তাঁদেরই আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া হলো। সেইজন্যে বনিবনার দরজা খোলা রাখতে হয়। বন্ধ করে দিতে নেই।

মানবিক ব্যাপার পুরোপুরি যুক্তির দ্বারা শাসিত নয়। ভাইটাল বলে আরো একটি কথা আছে যা মানুষকে যুদ্ধবিগ্রহের দিকে চালিয়ে নিয়ে যায়, বিদ্রোহ বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেয়। ভাইটালের সঙ্গে ভাইটালের সংঘর্ষে শেষ ফল নির্ধারিত হয়। কাশ্মীর ভারতের পক্ষে ভাইটাল, পাকিস্তানের পক্ষেও তাই, কাশ্মীরীদের পক্ষে তো বটেই। যুক্তিযুক্ত মীমাংসার জন্যে মন খোলা রাখতে হবে, দুয়ার খোলা রাখতে হবে এ যেমন ঠিক তেমনি এটাও ঠিক যে যুক্তিযুক্ত মীমাংসা না হলে সংঘর্ষ অবধারিত ও শেষ ফল অনিশ্চিত।

স্বাধীনতা দিবসে

আজ স্বাধীনতা দিবসে আপনার আরো একখানি পত্র পেয়ে সম্মানিত বোধ করছি।

সতেরো বছর আগে এই দিনটিতে আপনি পশ্চিমবঙ্গের ভার গ্রহণ করেন। আমিও সেদিন কলকাতায় আমার নূতন পদে যোগ দিই। আপনাদের সহকর্মীরূপে যে কয় মাস কলকাতায় ছিলুম সে কয় মাসের সরকারী কাজকে আমি দেশের কাজ বলেই মনে করেছি। একবারও মনে হয়নি যে আমি চাকুরে। আপনার অকালবিদায়ের পরে আমি মুর্শিদাবাদে বদলি হয়ে যাই। তখনো আমার মনে অনুরণন চলছিল যে আমি চাকরি করছিনে, দেশের কাজ করছি। কিন্তু আরো কয়েক মাস পরে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারি সে জোয়ার চলে গেছে, সে উদ্দীপনা আর নেই। আমি পুনর্মূষিক। আমি সরকারী চাকুরে। আমি কারো সহকর্মী নই। আমি এক বছরকাল একটা স্বপ্নের মধ্যে কাটিয়েছি। জীবনের সেই এক বছর ভোলবার নয়।

তার পরে আমি স্থির করি আর চাকরি করব না। পুনর্মূষিক হব না। সিদ্ধান্ত নিতে ও কাজে পরিণত করতে কয়েক বছর লাগল। সেটা আমার পায়চারি। আসলে আমার চাকরির বন্ধন খুলে যায় যেদিন ভারত স্বাধীন হয়। আগে থেকে সংকল্প ছিল যে দেশের যদি দরকার থাকে দেশকে আমি ছ'মাস কি এক বছর দেব। আপনাদের সহকর্মীরূপে। তার পরে আমি আমার সাহিত্যসৃষ্টিতে মনপ্রাণ সমর্পণ করব। দেশের কাজে প্রাণ দেবার প্রশ্ন একবার আমার সামনে হাজির হয়েছিল। আমার উত্তর হলো, প্রাণ যদি দিতে হয় তবে আমি দেব সাহিত্যের জন্যে বা প্রেমের জন্যে। আর-কিছুর জন্যে নয়। যার যেটা স্বধর্ম।

আমি যখন মুর্শিদাবাদে তখন মহাত্মা গান্ধী স্বধর্মে নিধন বরণ করেন। আমার সে সময় মনে হয় যে তাঁর অসমাপ্ত কাজ আর-পাঁচজনের মতো আমাকেও তুলে নিতে হবে। তাঁর অসমাপ্ত কাজ তো পর্বতপ্রমাণ আর শতবিধ। আমার সাধ্য কী যে সব রকম কাজে হাত দিই! সেইজন্যে আমি একটিই বেছে নিই। সেটি সাম্প্রদায়িক ঐক্য। এ বিষয়ে আমি দিনরাত ভেবেছি, যতবার পেরেছি ততবার লিখেছি। প্রধানত গান্ধীজীর শিক্ষাই অনুসরণ করেছি। এর জন্যে আমাকে বহু লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু এতে আমি বিরত হইনি। গান্ধীজীর প্রিয় কাজ করে যাচ্ছি বলে একপ্রকার তৃপ্তি লাভ করেছি।

যাঁরা চরকা খাদি বুনিয়াদী তালিম ইত্যাদি নিয়ে আছেন তাঁরা ঠিক পথেই আছেন। কিন্তু কতক লোককে নিষ্ঠার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের মার্গেও চলতে হবে। এ ব্রত হয়তো একদিন শত্রুকেও বন্ধু করবে, কিন্তু এই সতেরো বছরের অভিজ্ঞতার আলোয় দেখছি বন্ধুকেও শত্রু করেছে। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সতেরো বছর আগে যাঁদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ ছিল

তাঁরাও এখন বলতে আরম্ভ করেছেন যে ও-জিনিস হবার নয়। কিংবা তাঁরা এখন পাকিস্তানের সুমতির উপর বরাত দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পরামর্শ দিচ্ছেন। যেন পাকিস্তানই গান্ধীজীর উত্তরসাধক।

আজ কেবল স্বাধীনতা দিবস নয়। আজ পার্টিশন দিবস। এই দিনটিতেই দেশ ও প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়। আনন্দের সঙ্গে বিষাদও আজকের অনুভূতি। এই বিষাদের সঙ্গে খালি তিক্ততা মেশাতে চাইনে। ভারতের স্বাধীনতা যদি গান্ধীজীর সিদ্ধি হয়ে থাকে তবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা জিন্না সাহেবের সিদ্ধি। পাকিস্তানী যাদের বলা হয় তারাও ভারতমাতার সন্তান। সেই দশ কোটি লোকের আনন্দ কি আমার নিরানন্দ? আমি যদি তাদের সুখে সুখী হতে না পারি তবে এই বিচ্ছেদ কোনো কালেই দূর হবে না। আমি জানি যে পার্টিশন বিনা দ্বন্দ্বে হয়নি। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু রক্ত, বহু অশ্রু। বিষাদই এর স্বাভাবিক উপলব্ধি। কিন্তু কোটি কোটি মানুষের আনন্দ উপলব্ধির সঙ্গে নিজের উপলব্ধিকে মিলিয়ে নিতে পারাটাই মহত্ত্ব। আমরা যেন আমাদের স্বাভাবিক বিষাদকে অতিক্রম করতে পারি ও তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারি।

ইংরাজীতে বলে, ভুল করাটাই মানুষের স্বভাব। মানুষ স্বভাবতই ভুল করে। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও মানতে হবে যে মানুষ ভুল করতে করতে ঠিক করতে শেখে। পার্টিশন যদি ভুল হয়ে থাকে তবে একদিন তার সংশোধন হবে। কবে, তা আমি বলতে পারব না। কেমন করে, তাও পারব না বলতে। এইটুকুই শুধু বলব যে পার্টিশন যদি ভুল হয়ে থাকে তবে কালে তার সংশোধন হবে। আর তাই যদি হয় তবে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যই স্বতঃসিদ্ধ। এর বিপরীতটা অসিদ্ধ। আমরা ঠিক থাকব।

১৫ই আগস্ট

(ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে লিখিত পত্র)

খোলা মন খোলা দরজা

দেশ ভাগাভাগির সময় আমার এক ইংরেজ সহকর্মী বলেন, "দশ বছর এর মেয়াদ। তারপর দেশ আবার এক হয়ে যাবে।"

তা শুনে আমি সবজান্তার মতো হাসি। বলি, "দ-শ বছর! কিছুতেই না। দেখবেন তিন বছর এর স্থিতি।"

হায়! তখনকার সেই আশাবাদ গেল কোথায়! আমরা যারা এ দেশে বহুদিন প্রশাসন কার্যে নিযুক্ত ছিলুম তারা ইংরেজই হই আর ভারতীয়ই হই দেশ ভাগাভাগিকে সাময়িক একটা রফা বলেই ধরে নিয়েছিলুম। চিরস্থায়ী একটা মীমাংসা মনে করিনি। মীমাংসার একটা সন্তোষজনক সূত্র আবিষ্কার

করতে তিন বছরের বেশী লাগবার কথা নয়। বড়জোর দশ বছরই লাগ্নুক। সে সময় আমরা কেউ ভাবতেই পারিনি যে সতেরো বছর বাদেও মীমাংসার কোনো গ্রহণযোগ্য সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দুনিয়ার অন্যান্য দেশের দিকে চেয়ে দেখি একই সমস্যা দেশে দেশে। জার্মানীতে, কোরিয়াতে, ভিয়েৎনামে। আরো আগে থেকে আয়ারলণ্ডে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মানুষ আশা করেছে ভাগাভাগিটা দু'দিনের জন্যে। সব দিনের জন্যে নয়। কিন্তু অত বড় আশাবাদীর আশাবাদও বিরোধকে মীমাংসায় পরিণত করতে পারেনি। কবে করবে তাও জানে না। অনির্দিষ্ট-কাল পায়চারি করছে।

আশা যদি সুদীর্ঘকাল অপূর্ণ থাকে তা হলে মানুষ স্বভাবতই নৈরাশ্য-বাদী হয়। তখন তার মুখে শোনা যায়, "মীমাংসা হবার নয় বলেই হয়নি। কোনো কালেই হবে না। এই যা দেখছ এটাই চিরন্তন, যদি না একে বাহুবলে উল্টে দাও।"

বাহুবলে উল্টে দেওয়া মানে এক পক্ষ অপর পক্ষকে যুদ্ধে পরাস্ত করে নিজের সিদ্ধান্তটাকেই অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। সেটার নাম দু'পক্ষের মীমাংসা নয়। সেটা একতরফা একটা ব্যাপার। বলা বাহুল্য তাতে অপর পক্ষের আন্তরিক সম্মতি নেই। যেমন জাপানের আন্তরিক সম্মতি নেই মার্কিনের সঙ্গে সন্ধিব্যবস্থায়। পরে একদিন জাপান প্রবল হয়ে সন্ধিপত্র ছিঁড়তে চাইবে।

ভারত ও পাকিস্তান যদি বাহুবলের সাহায্যে সমাধান খোঁজে তা হলে ভুল করবে। সেটা বিপথ। যুদ্ধে সফল হয়েও নিশ্চিন্ত হবার জো নেই। পরে আবার বলপরীক্ষার সম্ভাবনা থাকবে। এক মাঘে শীত যায় না। ভারতের শত্রুদের শিবিরে যোগ দিয়ে পাকিস্তান যদি ভারতকে হারিয়ে দেয় তা হলে শেয়ালের হিস্‌সা হিসাবে সে যা পাবে ওটা সাময়িক লাভ। তেমনি পাকিস্তানকে পরাস্ত করে ভারত যা পাবে সেটাও সাময়িক।

যুদ্ধের পরিবর্তে দাঙ্গা বাধলে কি সমাধান আরো সুগম হবে? না, ওপথেও সমাধান নেই। ওটাও বিপথ। গত সতেরো বছরে আমরা বার বার একই দৃশ্য দেখলুম। তাতে ভারত বা পাকিস্তান কারো মূল পলিসির এদিক ওদিক হলো না। শুধু সংখ্যালঘুরাই ছুটল ওদিক থেকে এদিক, এদিক থেকে ওদিক। কয়েক লক্ষ নিরীহ নিরপরাধ উলুখাগড়াকে উন্মূল করে কার কী লাভ হলো বোঝা গেল না। যারা পালিয়ে এলো তারা অবশ্য নিরাপদ হলো, কিন্তু যারা তা পারল না তাদের বিপদ তো কাটল না। বরং তাদের মনোবল আরো কমল।

প্রত্যেকবারই লোকবিনিময়ের রব উঠেছে। বেসরকারীভাবে একপ্রকার লোকবিনিময় ঘটেও গেছে। সরকারীভাবে ঘটাতে হলে উভয় রাষ্ট্রের একমত হওয়া চাই। তার জন্যে দু'পক্ষের কর্তাদের একসঙ্গে বসা চাই। কিন্তু সেই জিনিসটিই সবচেয়ে শক্ত। কোনো মতে দু'জন মন্ত্রীকে যদি একত্র করা যায়

তাঁদের বৈঠকের আনাচে-কানাচে আড়ি পাতেন তৃতীয় পক্ষের রাষ্ট্রদূত। তৃতীয় পক্ষের অবিদ্যমানে ভারত-পাকিস্তান কথা বলবে ও একমত হবে সতেরো বছরে আমরা এতটুকুও এগোতে পারিনি। সুতরাং সরকারীভাবে লোকবিনিময়ের সম্ভাবনা নেই। সেটা সদ্ভাবনাও নয়।

সকলেই বুঝতে পারছেন যে, এরকম অবস্থা মানুষের অসহ্য। বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের অবস্থা সম্পূর্ণ দুর্বহ। কিন্তু তার প্রতিকার কি এই যে, ভারতের বা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের অবস্থাকেও সম্পূর্ণ দুর্বহ করে তুলতে হবে? তাও তো কেউ কেউ করে দেখছে। রক্ত ও অশ্রুর মহাসাগর পার হয়ে পাঞ্জাবের হিন্দু মুসলমান ও শিখ কি একজাতিত্বে উপনীত হয়েছে, না দ্বিজাতিতত্ত্বকে দৃঢ়তর করেছে? দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে চূড়ান্ত মীমাংসা কস্মিন্‌কালেই হবার নয়। হলে তাতে ভারতেরই পরাজয়। দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নিলে কাশ্মীর রাখতে পারা যাবে কি?

না যুদ্ধ, না শান্তি। এই গোধূলিকে সতেরো বছর কাল প্রসারিত করা গেছে, চাই কি আরো সতেরো বছর প্রসারণ করা যায়। ইউরোপেও তাই দেখছি। জার্মানরাও সহ্য করছে। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, যাকে আরোগ্য করতে পারা যায় না তাকে সহ্য করতেই হয়। তবে এমন একদিন আসবে যেদিন পাকিস্তানীদেরও অসহ্য বোধ হবে। ভারতীয় বা কাশ্মীরী মুসলমানদের উপর অত্যাচার হচ্ছে বলে নয়, সংকীর্ণ একটা এলাকায় চলাচলবিহীন অবরুদ্ধ জীবন পাকিস্তানী মুসলমানদের খর্ব করে রাখছে বলে। ওদের গণতন্ত্রের আশা যখন বিড়ম্বিত হবে তখন ওখানকার ঘটনা-প্রবাহ দ্রুত হবে। গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামে নেমে ওখানকার লোক ভারত-বিমুখ ও হিন্দুবিমুখ মনোভাব অতিক্রম করবে।

সেই শুভদিনটির জন্যে আমরা মন খোলা রাখব, দরজা খোলা রাখব। মীমাংসার ইচ্ছা দেখলেই হাত বাড়িয়ে দেব। মীমাংসা মানে দু'পক্ষের যাতে মন মানে। একপক্ষের মন না মানলে মীমাংসা হতে পারে না। যা হয় তার নাম একতরফা ডিক্‌টেশন। কিংবা তৃতীয় পক্ষের রোয়েদাদ। বলা বাহুল্য ডিক্‌টেশন বা রোয়েদাদ ভারত মেনে নিতে নারাজ। পাকিস্তান যদি মীমাংসার কথা ভাবে তবে ওসব বাদ দিয়েই ভাবতে হবে।

ভারত-পাকিস্তান বিরোধের পূর্ব অধ্যায় কংগ্রেস-লীগ বিরোধ। তারও পূর্ব অধ্যায় হিন্দু-মুসলিম বিরোধ। গোড়ার কথাটা হলো মুসলমানরা যদি কিছু পায় তবে সেটা যেন হিন্দুদের বঞ্চিত করে না পায়। পিটারের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে পল্‌কে দেওয়া, এই ছিল তৃতীয় পক্ষের নীতি। এইখানেই হিন্দুদের আপত্তি। মীমাংসা যদি কাম্য হয় তবে এ নীতির বদলে অন্য কোনো নীতি অবলম্বন করতে হবে। যাতে পিটারেরও ক্ষতি না হয়, পলেরও লাভ হয়। পিটারকে ক্ষতিস্বীকার করতে বাধ্য করা উচিত নয়, তবে সে যদি স্বেচ্ছায় ক্ষতি স্বীকার করে সেটা তার মহত্ত্ব। পল্ যদি মহত্ত্ব প্রত্যাশা করে তবে মহত্ত্ব দেখাতে প্রস্তুত হোক। শত্রুদের শিবিরে যোগ দেওয়া বন্ধ

করুক, চিরস্থায়ী বন্ধুতার জন্যে তৈরি হোক। বিশ্বাসী বন্ধুর জন্যে মানুষ অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে রাজী হয়। কিন্তু যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস নেই তার জন্যে কে কবে নিজের পাওনা ছেড়ে দেয়?

শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে, ভারত ও পাকিস্তান পরস্পর বন্ধু না শত্রু? শত্রু হয়ে থাকলে এতদিনে পুরোদস্তুর যুদ্ধ বেধে গিয়ে থাকত। না, শত্রু নয়। বন্ধু হয়ে থাকলে এতদিনে একসঙ্গে বসে মীমাংসা হয়ে থাকত। না, বন্ধুও নয়। ভবিষ্যতে কী হবে, বন্ধু না শত্রু? কেউ বলতে পারে না। তবে একটা কথা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে আসছে। পূর্ব পাকিস্তান আর বেশীদিন পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট তরফ হয়ে থাকতে ইচ্ছুক নয়। তার ভৌগোলিক অবস্থান, তার বৈষয়িক স্বার্থ, তার সাংস্কৃতিক প্রয়োজন তাকে ভারতের সঙ্গে মীমাংসা করতে বাধ্য করবে। তা হলে শত্রুতা করার জন্যে বাকী থাকবে পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান বেরিয়ে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তঃ-পরিবর্তন ত্বরান্বিত হবে। মীমাংসার দিন আগত হবে।

মীমাংসা যে সূত্রেই হোক না কেন, দেশভঙ্গ রদ হবে না। দুটো রাষ্ট্রই থাকবে। সুতরাং মাঝখানকার সীমারেখাও থাকবে। সতেরো বছর আগে আমরা যা আশা করেছিলুম তা পূর্ণ হবে না। দুই রাষ্ট্র এক হয়ে যাবে না। সে লাইনে চিন্তা করা নিষ্ফল। হলাণ্ড-বেলজিয়াম এখনো এক হয়নি। কেটে গেছে চারশ' বছর। কিন্তু ওরা অধিকাংশ ব্যাপারে একাত্ম।

কারো পৌষ মাস

"দেশের আজ চরম দুর্দিন", বললেন একজন বিখ্যাত নেতা ও কর্মযোগী, "আপনারা দেশের সাহিত্যিকরা কিছু করুন।" তিনি রুশোর দৃষ্টান্ত দিলেন।

আমরা সাহিত্যিকরা যে কিছুই করছিনে তা নয়। আমরা আমাদের আপনার আপনার চরকায় তেল দিচ্ছি। বলা বাহুল্য সেটা সরষের তেল নয়। আমরা গল্প উপন্যাসের সুতো কাটছি। কবিতার তুলো ধুনছি। প্রবন্ধের কাপড় বুনছি। আমরা কিছু না করে চুপ করে বসে থাকলে প্রকাশকরা দেউলে হতেন, সম্পাদকরা বেকার হতেন, মুদ্রাযন্ত্র অচল হতো, পাঠকরা পাঠ্যের অভাবে পড়াশুনা ভুলে যেতেন। আমরা দেশের সংস্কৃতিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, থামতে দিচ্ছিনে।

মানুষ কেবল রুটি দিয়ে বাঁচে না। অন্নের উপরেও আরো কিছু চাই। সেটার সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে সভ্যতা লোপ পেয়ে যায়। ইতিহাসে দেখা যায় মাঝে মাঝে সেরকম হয়েছে। সাহিত্যিকেরা সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, সঙ্গীতকারেরা সঙ্গীত সৃষ্টি করেননি, চিত্রকরেরা চিত্র সৃষ্টি করেননি। বাংলা

সাহিত্যের ইতিহাসে কয়েকটা শতাব্দী একেবারে ফাঁকা। সম্ভবত দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল না, কৃষি ও শিল্প সকলের অভাব পূরণ করছিল না, নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাচ্ছিল, পান্তা আনতে নুন। সাহিত্যিকরাও হা অন্ন হা অন্ন করে রাজারাজড়ার দরবারে কাঙালের মতো ঘুরছিলেন। ভাববেনই বা কখন, লিখবেনই বা কখন!

সাহিত্যিকরা যদি কোনো মতে সাহিত্যের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন তা হলে আর কিছু না হোক অন্তত এইটুকু হবে যে ইতিহাসের একটা অধ্যায়ের নাম করবার মতো কিছু সাহিত্যকীর্তি থাকবে। নয়তো একটা যুগ একেবারেই ফাঁকা যাবে। দেশের প্রাণশক্তি অত সহজে নিঃশেষ হবে না, লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেলেও কোটি কোটি মানুষ বেঁচে থাকবে। কিন্তু দেশের সৌন্দর্যসাধনা যদি সাধকের অভাবে স্তব্ধ হয় তা হলে এক পুরুষ কি দু'পুরুষ ধরে সাহিত্যের সঙ্গীতের ও অন্যান্য কলার বন্ধ্যাত্ব ঘটবে।

আমাদের প্রথম কর্তব্য সৌন্দর্যের প্রতি, সাহিত্যের প্রতি। জননীর প্রথম কর্তব্য যেমন সন্তানের প্রতি। একে অবহেলা করে আর কোনো কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়। হাত দিলেই যে সেকাজ ভালো হবে তাও নয়। সাহিত্য ছেড়ে দেশের কাজে যাঁরা ঝাঁপ দিয়েছেন দেশ তাঁদের ক'জনকেই বা মনে রেখেছে? ক'জনকেই বা মূল্য দিয়েছে? সাহিত্যে স্থির থাকলে হয়তো তাঁরা দেশের সাহিত্যিক সম্পদ বাড়িয়ে দিয়ে যেতে পারতেন।

তবে সাহিত্যিকরাও নাগরিক, নাগরিক হিসাবে আর সকলের মতো তাঁদেরও কিছু করণীয় আছে। দেশ বিপন্ন হলে দেশরক্ষার কাজে সবাইয়ের ডাক পড়ে। কে সাহিত্যিক কে সাহিত্যিক নন সেটা ক্ষণকালের জন্যে গৌণ হয়। আপৎকালে মুখ্য হয় সকলের নাগরিক কর্তব্য। এদিক থেকে বিচার করলে আপৎকালে সাহিত্যিককেও এমন কিছু করতে হয় যা ঠিক সাহিত্যের কাজ নয়।

কিন্তু সেটা যদি ক্ষণকালের না হয়ে দীর্ঘকালের হয় তা হলে সাহিত্যের ক্ষতি অনিবার্য। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সাহিত্যিক যদি সাহিত্যচর্চা না করে অন্য চর্চা করেন তা হলে তাঁর লেখার হাত নষ্ট হয়ে যায়। যেমন গাইয়ের গলা বা নাচিয়ের পা। যে সঙ্কট অল্পদিনের তার জন্যে নাচ গান কবিতা স্থগিত রাখা চলে, কিন্তু যে সংকট দীর্ঘমেয়াদী তার খাতিরে ওসব স্থগিত রাখা মানে সরস্বতীকে বঞ্চনা করা, দর্শক পাঠক সাধারণকে বঞ্চিত করা।

এখন কথা হচ্ছে আমাদের আজকের এই সঙ্কট কি ক্ষণকালের না দীর্ঘকালের? এটা যদি সাময়িক একটা উৎপাত হয়ে থাকে তবে সাহিত্যিক এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সমাজের উপকার করতে পারেন, তাতে তাঁর নিজেরও উপকার। কিন্তু এটা যদি দু'চার মাসের মধ্যে মিটে না যায় তা হলে তিনি কতকাল এই নিয়ে সময়ক্ষেপ করবেন! তাতে কার কী উপকার! আজকের

জগতে অর্থনীতির ঘোরপ্যাঁচ বোঝা সাধারণ সাহিত্যিকের কর্ম নয়। বড়ো বড়ো অর্থনীতিকরাই হালে পানী পাচ্ছেন না। তাঁদেরও নানা মুনির নানা মত। বিপরীত মতও দেখতে পাওয়া যায়। অর্থনীতি না হয় কোনো মতে আয়ত্ত করা গেল কিন্তু প্রশাসনের দোষত্রুটি সারানোর উপায় কি আমাদের হাতে? প্রশাসন এমন একটা যন্ত্র যাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হলে সব সময়ে তার পিছনে লেগে থাকতে হয়। বাইরের লোক তা পারে না। তাকে ভিতরে ঘেঁষতে দেওয়া হয় না।

বাইরে থেকে যতদূর অনুমান করতে পারি অর্থনীতির দিক থেকে ভুল-ভ্রান্তি ঘটেছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের দিক থেকে বিশৃঙ্খলা। যখন প্রশাসন ব্যবস্থার ভিতরে ছিলুম তখন দেখেছি কর্তারা চান ইয়েস-ম্যান। যে সব কথায় 'হাঁ-জী, হাঁ-জী' বলবে। যেটা সম্ভব নয় সেটাকেও বলবে সম্ভব। যেটা সঙ্গত নয় সেটাকেও বলবে সঙ্গত। যারা 'না-জী' বলবে তারা পাজী। তাদের যেমন করে হোক তাড়াতেই হবে। তারা যদি পদত্যাগ করে তা হলে আনন্দে হরির লুট পড়ে যায়। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর যেভাবে প্রশাসনকে বাস্তবতাবর্জিত করা হয়েছে তার প্রতিশোধ তুলছে বাস্তব। সেক্রেটারিয়াটের বাইরের বাস্তব। মন্ত্রীমণ্ডলীর বাইরের বাস্তব। রাজা ক্যানিউট ও তাঁর সভাসদদের হুকুম মানতে চাইছে না সমুদ্রের ঢেউ। সে তো কারো ইয়েস-ম্যান নয়।

বাস্তবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে হলে মফঃস্বলে বসবাস করতে হয়। কিন্তু মন্ত্রী হলে দিল্লী কিংবা কলকাতা হয় বারো মাসের কেন্দ্র। মাঝে মাঝে একবার বেড়িয়ে আসা ছাড়া জনগণের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ ঘটে না। অন্তত পাঁচটি বছর তো জনগণের কাছ থেকে অনুপস্থিত থাকা হয়ই. কারো কারো বেলা পাঁচ হয়ে দাঁড়ায় পনেরো। মন্ত্রীদের ওয়াকিবহাল করে রাখা যাঁদের কাজ তাঁরাও অনেক সময় কলকাতায় বা দিল্লীতে কাটান। কারো কারো অধিষ্ঠান রাজধানীতেই। নির্বাচনকেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু দরকারের সময় বা বিল তৈরির সময়। সরকারী কর্মচারীরাও যে বাস্তবনিষ্ঠ হবেন তারই বা অবসর কোথায়! আগেকার দিনে কোনো কর্মচারীকেই তিন বছরের বেশী কলকাতায় বা দিল্লীতে রাখা হতো না। আজকাল যিনি একবার কলকাতা বা দিল্লীতে বদলি হন তিনি সাধারণত সেখান থেকে বদলি হন না। মফঃস্বলে ফিরে যাবার রেওয়াজ উঠে গেছে। হয় বিমানযোগে নয় মোটরযোগে কয়েক ঘণ্টা চক্কর দিয়ে আসার নাম বাস্তবের নাড়ীতে হাত রাখা নয়। যেমন বিশ হাজার লোকের সভায় বক্তৃতা দেওয়া নয় জনতার নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা।

যাঁদের উপর ভার দিয়ে দেশের লোক নিশ্চিন্ত তাঁদের ক'জনেরই বা দেশের বাস্তব অবস্থার উপর 'গ্রিপ' আছে! স্বাধীনতার আগে ছিল। তারই জের চলেছে এতকাল। কামরাজ এই সমস্যার একটা সমাধান চেয়েছিলেন। কামরাজ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতিকদের বাস্তবের অভিমুখীন করা।

দিল্লীর বা কলকাতার অভিমুখীন যেন অল্প কয়েকজনই হন। আর সকলে মফঃস্বলের অভিমুখীন। ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কি? যাঁরা সরকার থেকে সরে গেছেন তাঁরাও সরকারকেই ঘিরে ঘিরে ঘুরছেন। জনগণকে নয়। পাঁচটা বছরও তাঁরা বাইরে থাকবেন না। তা হলে বাস্তবজ্ঞান হবে কী করে? বিমানে বা মোটরে ঘোরাফেরা করে?

আমরা আজ যা দেখছি তাকে বলতে পারি ক্রাইসিস অফ রিয়ালিটি। কলকাতা দিল্লী প্রভৃতি স্থানের বাতায়ন খুলে রিয়ালিটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাওয়া ও ব্যর্থ হওয়া। আঁধারে একটার পর একটা ঢিল ছোঁড়া চলেছে। লেগেও যেতে পারে এক আধটা। কিন্তু আঁধার তাতে যাবে না। ঢিল ছোঁড়াও থামবে না। কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ! এই যে পৌষমাস এটা দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে ভয় হয়। তা বলে যাঁরা মনে করেছেন এটা বিপ্লবের পূর্বলক্ষণ তাঁরা অকারণে আতঙ্কিত। গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। লোকের গায়ের জ্বালা জুড়োবার জন্যে নির্বাচনের বৈতরণী থাকতে লোকে কেন প্লাবন কামনা করবে? তার মাশুল তো বড়ো কম নয়।

বিপ্লব সেইসব দেশেই ঘটে যেসব দেশে গণতন্ত্র নেই কিংবা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। আমাদের দেশে গণতন্ত্র আছে। তা হলে প্রশ্ন উঠছে, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কি জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বা সেই পথে চলেছেন? তাই যদি হতো তবে জবাহরলাল যখনি যেখানে যেতেন তখনি তাঁকে দেখতে রথযাত্রার ভিড় হতো না। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণের পর কোটি কোটি মানুষ আত্মীয়বিয়োগের শোকে মুহ্যমান হতো না। তিনি নেই, কিন্তু তাঁর আসনে যিনি বসেছেন তিনিও জনগণের বিশ্বাসভাজন। যেখানে লোকপ্রতিনিধিদের উপর লোকের আস্থা আছে সেখানে বিপ্লবের কথা ওঠে না। আস্থা যদি চলে যায় তবে সময়মতো নির্বাচন করলে অপর একদল লোকপ্রতিনিধি অধিকসংখ্যকের ভোটে রাষ্ট্রপরিচালনার ভার নেন। জোর করে গদী দখল করতে হয় না।

কিন্তু সময়মতো নির্বাচন যদি না হয়, নির্বাচনকে যদি একটা না একটা অজুহাতে বার বার পিছিয়ে দেওয়া হয়, নির্বাচনের নিয়মগুলো যদি প্যাকিস্তানের মতো বদলে দেওয়া হয়, গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে যদি ভোট আদায় করা হয়, অন্যান্য দলের প্রার্থীদের যদি ধরে ধরে জেলে দেওয়া হয় তা হলে নির্বাচনের ফলাফলের উপর জনগণের কোনো আস্থ্য থাকে না। দক্ষিণ আমেরিকায় এর দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু বিপ্লব হলেই যে লোকে পরমার্থ পায় তাও নয়। বিপ্লবের পর ক্ষমতা যাদের হাতে পড়ে তারাও জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, এ রকম হামেশা দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে গণতন্ত্র যেমন একটা মুখোশ বিপ্লবও তেমনি একটা মুখোশ। জনগণ যে তিমিরে জনগণ সেই তিমিরে। সব চেয়ে ভালো গণতন্ত্রকে ঠিকমতো চালু রাখা ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা। অপক্ষপাত অবাধ নির্বাচন।

তার মানে যে-দলই ক্ষমতা লাভ করুন নির্বাচন যথাকালে ও বিধিমতো হবে। নতুন একদল ক্ষমতার আসনে বসে চিরস্থায়ী হবার জন্যে নির্বাচন প্রথাটাই রদ করবেন না, কিংবা তার নিয়ম কানুন বদলে দেবেন না। তা যদি তাঁরা করেন তবে সেটাও হবে বিশ্বাসঘাতকতা। অন্যান্য দেশের ইতিহাসে তারও নজীর আছে। ক্ষমতা একবার পেলে সহজে হাতছাড়া করতে কেউ চায় না। বলপরীক্ষার দরকার হয়। পরিস্থিতি বৈপ্লবিক আকার নেয়। পরিস্থিতির সুযোগ যে বামপন্থীরাই নেবেন এমন কোনো ঐতিহাসিক নিয়ম নেই। দক্ষিণপন্থীরাও নিতে পারেন। সামরিক নেতারাও। মিলিটারি ডিকটেটরশিপ একাধিক দেশে দেখা গেছে। বিপ্লবের উপর বরাত দিয়ে যাঁরা খোশমেজাজে আছেন তাঁরা জানেন না যে লাল বিপ্লব ঘটার আগেই হয়তো কালো বিপ্লব ঘটবে, আর নয়তো সামরিক একনায়কত্ব। সেটাও অভ্রান্ত অথবা নিখুঁৎ নয়। সেটাও অনন্ত অথচা চূড়ান্ত নয়। একদিন না একদিন গণতন্ত্রেই ফিরে আসতে হবে।

কিন্তু গণতন্ত্রেরও একটা প্রচ্ছন্ন শর্ত আছে। সে কেবল স্বশাসন নয়, সে সুশাসন। রাজতন্ত্রেরও প্রচ্ছন্ন শর্ত সুশাসন। মোগলরাজত্ব যে দু'শো বছর স্থায়ী হলো তার কারণ মোগল বাদশারা ছিলেন মোটের উপর সুশাসক। ইংরেজ রাজত্বও যে দু'শো বছর স্থায়ী হলো তার কারণ ইংরেজ বড়লাটরা ছিলেন মোটের উপর সুশাসক। তাঁরা ভালো করেই জানতেন যে তাঁরা লোকপ্রতিনিধি নন, লোকের সম্মতি পেতে হলে সুশাসনই তাঁদের একমাত্র নির্ভর। তাঁরা গায়ের জোরে ছিলেন বা ভেদনীতির সাহায্যে ছিলেন এটা স্থূল দৃষ্টির কথা। তাঁরা ভারতবর্ষকে ঐক্য দিয়েছিলেন, আইন আদালত দিয়েছিলেন, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা দিয়েছিলেন, বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরিক যুদ্ধবিগ্রহের হাত থেকে শান্তি দিয়েছিলেন ও আধুনিক জগতের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন বলেই এতকাল ছিলেন।

কিন্তু সুশাসনের চেয়ে বড়ো কথা হলো স্বশাসন। পরের ছেলে সাবালক হলে তাকে তার ইচ্ছামতো চলতে দেওয়াই ভালো। সে হয়তো বিপথে যাবে ও সম্পত্তি খোয়াবে। তবু তাকে সুশাসনের নামে নাবালক করে রাখতে নেই। ইংরেজরা এটা যথাসময়ে বুঝতে পারলে সত্যাগ্রহের আবশ্যক হতো না। ত্রিশ বছর লেগে গেল তাদের সত্যাগ্রহের দ্বারা বোঝাতে। আজকাল যার খুশি সেই সত্যাগ্রহ ঘোষণা করে, যেন ওটা সদ্যফলপ্রদ একটা মন্ত্র। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের পিছনে জীবনব্যাপী প্রস্তুতি ছিল। তার প্রথম পর্বটা দক্ষিণ আফ্রিকায়। অধিকাংশ ভারতীয় সে বিষয়ে অজ্ঞ। তার অনিবার্য আনুষঙ্গিক ছিল গঠনমূলক কর্ম। অধিকাংশ রাজনীতিক সে বিষয়ে উদাসীন। চরকা বললেই তাঁদের নাসিকা কুঞ্চিত হয়। অথচ সত্যাগ্রহ শুনলেই তাঁরা লাফিয়ে ওঠেন। চরকা হচ্ছে পায়ের তলার মাটি। মাটি তৈরি না হলে লাফ দেওয়া যায় না। শূন্যে লাফ দিলে হাতা-পা ভাঙে। বিনোবাজী কোনো দিন সত্যাগ্রহের ডাক দেবেন কি না বলতে পারব না। এইটুকু বলতে

পারি যে তিনি তার জন্যে মাটি তৈরি করে চলেছেন একমনে, অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে।

সুশাসন আমাদের জনসাধারণের জানা ছিল। তারা ওটা ভুলে যায়নি। ওটাও তারা চায়। না পেলে অশান্ত হয়। মাঝে মাঝে নির্বাচন দিয়ে তাদের সমঝানো হয় যে তাদের ভাগ্য তাদেরি হাতে। তারা সাবালক। তারা স্বশাসিত। কিন্তু সুশাসনের অভাব তাতে মেটে না। বরং বাড়ে। কারণ নাবালক যেমন অল্পে সন্তুষ্ট সাবালক তেমন নয়। আগেকার দিনে প্রশাসন ঢের সহজ ছিল, লোকে ধরে নিত যে অল্পই পরাধীনদের পাওনা। এখন তারা অধিকের ধ্যান করে। ফলে প্রশাসন ঢের কঠিন হয়েছে। সুশাসনের অভাব মেটানো দিন দিন জরুরি হয়ে উঠছে। শুধুমাত্র স্বশাসনই যথেষ্ট নয়। তা বলে স্বশাসনকে ধ্বংস করলেই যে সুশাসন আসমান থেকে পড়বে, এটা মূঢ়তা। স্বশাসন বহু কষ্টে অর্জন করা গেছে, তাকে ধ্বংস করলে আবার পরাধীনতা। তাকে অক্ষত রেখে তারই ভিত্তির উপর গড়তে হবে সুশাসন।

বিখ্যাত নেতা ও কর্মযোগী বললেন, "এ রকম যদি চলে তবে হয় মিলিটারি ডিকটেটরশিপ, নয় অরাজকতা ও কেওস, নয় বৈদেশিক অকুপেশন।" এমন কিছু নতুন কথা নয়। অনেকেই বলাবলি করছেন। জবাহরলাল চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ধান চাল গম আটা তেল নুন মাছ ইত্যাদি উধাও দেখে অনেকেরই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। কাল সন্ধ্যাবেলা গ্রামের লোক ভাদুর গান শুনিয়ে গেল। "স্বাধীন ভারতে. ভাদু, বড়ো কষ্ট হয়েছে।" গানের অন্যান্য কথাগুলি আমি রিপোর্ট করব না। সিডিশন আইন আছে কি না জানিনে, ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া আইন তো আছে। গ্রামের লোককে ধরিয়ে দিয়ে আমার কী লাভ! বেচারিদের কেউ শিখিয়ে দেয়নি। রুশপন্থী বা চীনপন্থী কমিউনিস্টরাও তাদের শেখায়নি। সমস্তটাই অশিক্ষিতপটুত্ব। সবাই ভুক্তভোগী, কেউ বা কম কেউ বা বেশী। কী দারুণ অনর্থের পটভূমি প্রস্তুত হচ্ছে!

বিখ্যাত নেতাকে আমি বললুম, "আপনি তিনটি বিকল্পের উল্লেখ করলেন। আরো একটির করেননি। সেটি হচ্ছে আবার ভারত বিভাজন।" তিনি চমকে উঠলেন। সকলেরই এটা মনে রাখা উচিত যে সারা ভারতের শাসনভার এখন একটিমাত্র পার্টির হাতে আছে। কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে তারাই সংখ্যাধিক। সুতরাং ক্ষমতা ও দায়িত্ব তাদের কাঁধেই ন্যস্ত। কিন্তু এমন যদি হয় যে কোনো পার্টিই কোনোখানে সংখ্যাধিক নয়। সর্বত্র গোঁজামিল, সর্বত্র কাঁধবদল। তখন ক্ষমতার সঙ্গে দায়িত্বের সমতা থাকবে না। গণতন্ত্রের বিচারে সেটা বেআইনী নয়। জনগণের প্রতি সেটা বিশ্বাসঘাতকতা নয়। অথচ অচল অবস্থা। কংগ্রেস ও লীগ গোঁজামিল দিয়ে দেশ শাসন করতে পারত না বলেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াকে দুটি কেন্দ্রের মধ্যে ভাগ করে দিতে হলো। এক ভাগ পুরোপুরি কংগ্রেসশাসিত। অপর ভাগ পুরোপুরি লীগশাসিত। ভবিষ্যতে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, স্বতন্ত্র, সোশিয়ালিস্ট, জনসঙ্ঘ

প্রভৃতি বারো রাজপুত যদি গোঁজামিল দিয়ে দেশ শাসন করতে না পারে তবে তেরো হাঁড়ির নজীর তো আমাদের ইতিহাসেই রয়েছে। এর জন্যে দাঙ্গাহাঙ্গামার দরকার করে না। অচল অবস্থাই যথেষ্ট।

রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। ভারত পাকিস্তানও একদিন জুড়ে যেতে পারে। তেমনি পাকিস্তান দু'ভাগ হয়ে যেতে পারে, ভারত তিন ভাগ হয়ে যেতে পারে। ভালো মন্দ বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত কত কী সম্ভবপর। যাঁরা প্রাজ্ঞ তাঁরা বাহ্য ঘটনার উপরে দেশের ভাগ্য ছেড়ে না দিয়ে নিজেরাই হাল ধরবেন ও প্রাণপণে দেশের ভাগ্যনির্ণয় করবেন। সরকারের বাইরে থেকেও হাল ধরা যায়। ভাগ্যনির্ণয় করা যায়। গান্ধীজী বাইরে থেকেও হাল ধরেছিলেন, বিনোবাজীও তাই করছেন। কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা কাম্য সেবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে একমনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যেতে হবে। বিভ্রান্ত জনতা তখন আলোর জন্যে সেইদিকেই তাকাবে।

আমরা সাহিত্যিকরাও শক্ত হাতে হাল ধরতে পারি। ঘটনার স্রোতে ভেসে না গিয়ে প্রাণপণে গতিনির্ণয় করতে পারি। কিন্তু তার আগে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে ভারতের জনগণের পক্ষে কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা কাম্য। যাঁরা এবিষয়ে নিশ্চিত নন তাঁরা যদি নিছক সাহিত্যসৃষ্টি নিয়ে থাকেন তবে তাঁদের দোষ দেওয়া উচিত নয়। অর্থনীতির এলাকায় নিয়ন্ত্রণ ভালো কি অনিয়ন্ত্রণ ভালো, পরিকল্পনা ভালো কি অপরিকল্পনা ভালো এ নিয়ে গুরুতর মতভেদ রয়েছে। অন্য কোনো কোনো দেশে এসব ইস্যুতে শ্রেণী-সংঘর্ষ বেধে গেছে। যে মূলধন জোগায় তার স্বার্থ আর যে শ্রম জোগায় তার স্বার্থ, আর যে উৎপাদন করে তার স্বার্থ ও যে উপভোগ করে তার স্বার্থ কেমন করে ব্যালান্স করা যায় এ নিয়ে গবর্ণমেণ্টের ভিতরেই গভীর মতানৈক্য। ব্যালান্স হারালে গবর্ণমেন্ট ভেঙে যেতে পারে, পার্টি ভেঙে যেতে পারে। এমন কি রাষ্ট্র ভেঙে যেতে পারে।

তারপর দুর্নীতি নিয়ে যদিও প্রত্যেকে ক্রুদ্ধ তবু সে ক্রোধকে হিংসাত্মক কার্যকলাপের পথ নির্দেশ করা যায় না। কেউ যদি দুর্নীতি দূরীকরণের কোনো অহিংস উপায় জানেন তো দেশবাসীকে জানাতে পারেন, নয়তো দুর্নীতি দমনের ভার সরকারের উপর ছেড়ে দিয়ে আপনি দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থাকতে পারলেই যথেষ্ট। ঈশ্বর সব মানুষের কাছে অসাধ্য সাধন দাবী করেন না। যিনি যেটুকু সাধন করতে পারেন সেইটুকুতেই ভগবানের সন্তোষ। যীশু বা গান্ধীর মতো প্রাণদান করা সকলের সাধ্য নয়। লিঙ্কন বা কেনেডির মতো মৃত্যুও সকলের জন্যে নয়। কিন্তু যাঁরা রাজনৈতিক দায়িত্ব নিয়েছেন বা প্রশাসনের উপর মহলে রয়েছেন তাঁদের কাছে সৎসাহস প্রত্যাশা করা অহেতুক নয়। শিরদার তো সরদার। কড়া কড়া আইন করে কঠোরভাবে প্রয়োগ না করলে দুর্নীতি দূর হবে না। আর দুর্নীতি যদি দূর না হয় তো লোকের মনোবল নষ্ট হবে। ডিমরালাইজেশনের উৎপত্তি হবে। জার্মানীতেও এই জিনিস হয়েছিল। জার্মান জাতিকে এর হাত থেকে উদ্ধার

করার জন্যে হিটলারের অভ্যুদয় হয়। সোশিয়াল ডেমক্রাটদের উপর লোকের অরুচি ধরে যায়। সোশিয়াল ডেমক্রাটরা নিজেরাই ডিমরালাইজড হন।

কিছুদিন থেকে ভারতেও ডেমক্রাটিক সোশিয়ালিজমের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অতি মিষ্টি আওয়াজ। কিন্তু কোমলের সঙ্গে সঙ্গে কড়িও চাই। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কাজও চাই। তবে দুর্নীতির কারণগুলো যদি থেকে যায় মানুষগুলোকে মারধর করে খুব বেশী ফল হবে না। প্রলোভন আজকের দিনে যত বৃহৎ হয়েছে কোনো কালেই এত বৃহৎ ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও না। দুর্নীতির উৎসমূলে যেতে হবে। প্রলোভন যাতে না ভোলায় তার উপায় বার করতে হবে। চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। বিড়ালের সামনে থেকে শিকে সরাতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে অত্যধিক প্রলোভন সেসব ক্ষেত্রে অত্যধিক সতর্ক হতে হবে। আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।

চক্রাবর্তন

বিশ একুশ বছর আগে যে মন্বন্তর হয় সে সময় খাদ্যসমস্যা নিয়ে নিবিড়-ভাবে চিন্তা করেছি। সরকারী পোড়ামাটি নীতি, বেসরকারী মজুতদারি ইত্যাদি সব রকম কারণ একে একে পরীক্ষা করে দেখার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছই যে কলকাতার লোকের ক্রয়শক্তির তুলনায় সাধারণ গ্রামবাসীর ক্রয়শক্তি অকিঞ্চিৎকর এবং কলকাতার বড়লোকদের ক্রয়শক্তির তুলনায় সাধারণ কলকাতাবাসীর ক্রয়শক্তি অতি অল্প। খাদ্যের জন্যে কাড়াকাড়ি পড়লে যার ক্রয়শক্তি যত বেশী সে তত বেশী পাবে, যার ক্রয়শক্তি যত কম তার ভাগে তত কম পড়বে। এক্ষেত্রে রেশন ব্যবস্থা ছাড়া গতি নেই। শেষ পর্যন্ত তাই হলো, কিন্তু ততদিনে ত্রিশ লক্ষের উপর মানুষ কিনে খেতে না পেরে মারা গেছে। ইংরেজ রাজত্বের এই অন্ধকূপ হত্যা আমার চোখে দেখা। কোথায় লাগে সিরাজউদ্দৌলা!

চাকা ঘুরতে ঘুরতে আবার ঠিক সেইখানটিতে এসে পৌঁছেছে। এবার জাপানী আক্রমণ নয়, এবার চীনা আক্রমণ। দিন দিন সৈন্যসংখ্যা বাড়ছে, তাদের জন্যে খোরাক চাই। কলকারখানা বাড়ছে, কলমজুরদের জন্যে খোরাক চাই। সেবার ছিল ছোট একটি কলকাতা, এবার বড় একটা কলকাতা, তার সঙ্গে আসানসোল অঞ্চলের পাঁচ ছয়টি শিল্পনগর। সেবার শুধু বাংলাদেশে অন্নাভাব, এবার সারা ভারত জুড়ে অন্নাভাব, কারণ ছোট ছোট শিল্পনগরের সংখ্যা ও সমস্যা সর্বত্র একই রকম। ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন জোর কদমে চলছে, মনে হয় আরো জোর কদমে চলবে। হলদিয়াতে বন্দর চাই, ফারাক্কাতে বাঁধ চাই, বোখারোতে ইস্পাত কারখানা চাই, এমনি কত জায়গায় কত কী চাই, সব জুড়লে যে ছবিখানি হয় সেখানি যেমন লোভনীয় তেমনি ভয়াবহ।

কারণ তার সঙ্গে বহু কোটি মানুষের অনাহার ও অল্পাহার জড়িয়ে রয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার দুর্ভিক্ষের কথা বোধহয় কারো কারো স্মরণ আছে। যার থেকে এলো কালেক্‌টিভাইজেশন। কুলাকদের লিকুইডেশন ইত্যাদির জন্যে দোষ দিতে হলে দিতে হয় রাতারাতি ইণ্ডাস্ট্রিয়াইজেশনকে ও তাল সামলাতে না পেরে রাতারাতি কালেক্‌টিভাইজেশনকে। চীনও সেই পথে চলেছে, কিন্তু সে বড়ো বড়ো শহরগুলোকে portable আকার দিচ্ছে।

ইংলণ্ডের একটা সাম্রাজ্য ছিল, সেখান থেকে সে সস্তায় খোরাক কিনে বা কেড়ে নিয়ে আসত ও তা দিয়ে কলকারখানার মজুরদের পেট ভরাত। ফলে আয়ারল্যাণ্ড উজাড় হতে বসল, ভারতের লোক আধপেটা খেয়ে বাঁচল। ইংলণ্ডের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন রাতারাতি হয়নি, হলে তার সাম্রাজ্যে মহামারী বেধে যেত, কিংবা তার নিজের ঘরেই মহামারী বাধত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধা এই যে তার লোকসংখ্যা কম, জমির পরিমাণ প্রচুর, সাম্রাজ্যের দরকার হয় না। তবু সেও ল্যাটিন আমেরিকায় প্রচ্ছন্নভাবে ক্ষমতাবিস্তার করেছে। সেও রাতারাতি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজ করেনি। অনেক সময় নিয়েছে।

জার্মানীর ও জাপানের হাতে অত সময় ছিল না। অত জায়গাজমিও ছিল না। সাম্রাজ্যের জন্যে তারা পাগল হয়ে ওঠে। কারণ খোরাক না হলে কলকারখানা চালু রাখা যাবে না। বাড়িয়ে তোলা যাবে না। জাপানী বা জার্মান কেউ স্বভাবত রাক্ষস নয়। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এমন এক প্রোসেস যাকে ত্বরান্বিত করতে গেলে সাম্রাজ্যের প্রয়োজন হয়। যুদ্ধ না করে সাম্রাজ্যলাভ হয় না, নিষ্ঠুর না হয়ে যুদ্ধ জেতা যায় না। মানবই দানব হয়ে ওঠে। অবশ্য দানব হয়ে যে শেষ পর্যন্ত জিতবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। হারতেও পারে, হারাতেও পারে। জার্মানী ও জাপান এখন মণিহারা ফণী। সাম্রাজ্য গেছে, কিন্তু প্রয়োজন যায়নি। তবে ইদানীং একটা সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পুঁজিবাদী দেশগুলো পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতায় লাভবান হচ্ছে। লাভের টাকা এত বেশী যে বাইরে থেকে বেশী দাম দিয়ে খোরাক কিনে নিয়ে আসতে তাদের বাধছে না। যে কিনে খেতে পারে সে লুট করবে কেন?

এখন ভারতের কথায় ফিরে আসি। ভারতের সাম্রাজ্য নেই, সে সস্তায় কিনে খেতে পারে না, লুট করে আনা তো অসম্ভব। তাকে কিনতে হচ্ছে চড়া দরে। আর নয়তো ধার করতে হচ্ছে, ভিক্ষা নিতে হচ্ছে। এভাবে কেউ কখনো রাতা-রাতি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজড হয়নি, হলে হয়েছে রয়ে সয়ে। সুতরাং রাতারাতি আলাদীনের প্রদীপ দিয়ে দেশকে কলকারখানায় ছেয়ে ফেলার তাগিদ থাকলে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কালেক্‌টিভাইজেশন। রুশ যে পথে গেছে, চীন যে পথে গেছে, ভারতও সেই পথে যাবে। অথবা জার্মানী বা জাপানের মতো ফাসিস্ট মার্গ ধরবে।

পার্লামেন্টারী ডেমোক্রাসী কাজ দেবে না। শাসন ইতিমধ্যেই যথেষ্ট

কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আরো কেন্দ্রীভূত হবে, যখন খাদ্য চলে যাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে।

এতে যদি লোকের আপত্তি থাকে তবে এর বিকল্প হচ্ছে সোজাসুজি কোনো একটা গোষ্ঠীতে ভর্তি হওয়া। বলা বাহুল্য সেটা চীনা গোষ্ঠী নয়। রুশ গোষ্ঠী নিজেই গম কিনে খাচ্ছে। কে কাকে খাওয়াবে? তা হলে বাকী থাকে —যাক, নাম করব না। চাকা ঘুরতে ঘুরতে আবার কি সেই গর্তেই পড়বে, যার থেকে উদ্ধার পেয়েছিল ১৯৪৭ সালে?

কন্‌ফেডারেশন

সেদিন এক সর্বোদয়বাদী বন্ধু এসেছিলেন নিমন্ত্রণ করতে। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, কন্‌ফেডারেশন যদি হয় তা হলে কাশ্মীরও তার অঙ্গ হবে, তখন আর কোনো বিরোধ থাকবে না।

আমি বললুম, কন্‌ফেডারেশন কোনো দেশেই সফল হয় নি। এ দেশে হবে কি?

একথা যখন বলি, তখন সুইটজারল্যান্ডের কথা আমার মনে ছিল। কন্‌ফেডারেশন সেদেশে সফল হয়েছে বইকি, ওটা কিন্তু নামেই কন্‌ফেডারেশন, আসলে ফেডারেশন। অর্থাৎ সুইটজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দুটি তিনটি বিভাগ নয়, প্রায় সবরকম বিভাগই আছে। যথা, পররাষ্ট্র, বিচার, স্বরাষ্ট্র, সৈন্য, অর্থ. পাবলিক ইকনমি, রেলওয়ে, পোস্ট অফিস।

ভারত সরকার কি এতগুলো এত রকম বিভাগ কন্‌ফেডারেশনের হাতে তুলে দিতে রাজী হবেন? পাকিস্তান সরকারও কি তুলে দিতে রাজী হবেন? অন্তত একটা বিভাগের নাম করা যাক, যা নিয়ে কন্‌ফেডারেশনের হাতেখড়ি হতে পারে। সেই বিভাগটি কি পোস্ট অফিস? সেটি কি রেলওয়ে? সেটি কি পাবলিক ইকনমি, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক ইন্সিওরান্স?

কন্‌ফেডারেশন যদি কোনো দিন কার্যকর হয় তবে যেটি সবচেয়ে নির্বিরোধ, সেই বিভাগ দিয়েই আরম্ভ করতে হবে। গোড়া থেকেই সৈন্য বা পররাষ্ট্র দিয়ে আরম্ভ করা যাবে না। তা যদি সম্ভব হতো তবে ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান গ্রহণ করে ১৯৪৭ সালেই কন্‌ফেডারেশন ভূমিষ্ঠ হতো। দেশ ভাগ, প্রদেশ ভাগ করতে হতো না।

কন্‌ফেডারেশন কথাটার সার হচ্ছে এই যে রাষ্ট্র একাধিক হলেও মাথার উপরে একটাই অথরিটি। সেই অথরিটিকে সবাই মিলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অন্তত একটি বিষয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়েছে। সে ক্ষমতা ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই। দরকার হলে সরকার বদল করতে পারা যাবে, কিন্তু হাকিম নড়লেও হুকুম নড়বে না। সরকার বদলালেও ক্ষমতা কম হবে না। তা যদি হয় তবে কন্‌ফেডারেশন টিকবে না।

ইতিহাসে দেখা যায় যে নিতান্ত বিপন্ন না হলে কোনো রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলে কন্‌ফেডারেশন রচনার জন্যে ক্ষমতার একাংশ ঊর্ধ্বতন অথরিটির হাতে তুলে দেয় না। বিপদটা বাইরের থেকেও আসতে পারে, ভিতরের থেকেও উঠতে পারে অর্থাৎ যুদ্ধ বা বিপ্লব বা বিদ্রোহ—এর কোনো একটা বিপদ দু'তিনটে রাষ্ট্রকে একজোট হতে বাধ্য করে। তখন ওরা সাধারণত সৈন্য ও পররাষ্ট্র বিভাগ সর্বস্বীকৃত ঊর্ধ্বতন অথরিটির হাতে তুলে দেয়। তারই নাম কন্‌ফেডারেশন কর্তৃপক্ষ।

কন্‌ফেডারেশন একবার সৃষ্টি হলে শুধু যে রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতার একাংশ উপরে চলে যায় তাই নয়, সোভরেনটিও খর্ব হয়। সোভরেনটি খর্ব হোক এটা কারো কাম্য নয়। সুতরাং পরবর্তীকালে এই নিয়ে ঝগড়া বাধে। ঝগড়া করতে করতে কন্‌ফেডারেশন ভেঙে যায়। আর নয়তো ফেডারেশনে রূপান্তরিত হয়। তখন ফেডারেশন কর্তৃপক্ষ তাঁদের বাহুবলে বা আদালতের আজ্ঞাবলে বিদ্রোহ দমন করেন।

ভারত-পাকিস্তানের সামনে এমন কোনো বিপদ আজ এই মুহূর্তে নেই যার ভয়ে যে যার ক্ষমতার একাংশ ছেড়ে দিয়ে মাথার উপরে একটা অথরিটি সৃষ্টি করবে। সেই অথরিটিকে সোভরেন বলে স্বীকার করবে। পরে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাইবে না। করলে তার হাতে বিদ্রোহ দমনের জন্যে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকবে।

না, এই মুহূর্তে তেমন কোনো বিপদের উপলব্ধি নেই। চৈনিক আক্রমণের ভয়ে ভারত এতদূর ভীত নয় যে পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কন্‌-ফেডারেশন গড়ে তার হাতে সোভরেনটি তুলে দেবে। পাকিস্তান চৈনিক আক্রমণের ভয়ে ততদূর ভীত নয়। তার কথা সত্য হলে সে একটুও ভীত নয়। বরং উল্লসিত।

ভারতে বিপ্লব ঘটলে পাকিস্তান প্রতিবিপ্লবের ঘাঁটি হবে, এটা অবধারিত। সুতরাং কেনই বা সে কন্‌ফেডারেশনে রাজী হবে? একই সময়ে দুই রাষ্ট্রে বিপ্লব ঘটলে অন্য কথা। তার নিকট সম্ভাবনা নেই, কারণ সাধারণত বিপ্লব আসে যুদ্ধের মাঝখানে বা পরাজয়ের পরে। ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধকে এড়িয়ে চলেছে। বাইরে থেকে একটা যুদ্ধ ভারতের ঘাড়ে চাপতে পারে, কিন্তু পাকিস্তানের ঘাড়ে চাপার লক্ষণ নেই। তার মিতারা তাকে যুদ্ধে জড়াতে পারে, তা ঠিক। কিন্তু তার নেতারা অত সহজে জড়িয়ে পড়তে চান না।

ভারত-পাকিস্তান কন্‌ফেডারেশনের সম্ভাবনা একান্ত সুদূর। যদি কোনদিন সে প্রশ্ন জরুরী হয় তবে সেই সঙ্গে আর একটা প্রশ্নও জরুরী হবে। ঊর্ধ্বতন শাসকমণ্ডলীতে অধিকাংশ ভোট কার আয়ত্তে থাকবে—ভারতের না পাকিস্তানের? পাকিস্তান ছোট, তাকে অধিকাংশ ভোট দেওয়া যায় না। কিন্তু পাকিস্তান কি ভারত বড় বলে ভারতের আয়ত্তে অধিকাংশ ভোট থাকতে দেবে?

পাকিস্তান সৃষ্টির মূলেও ছিল ওই প্রশ্ন। যে কোনো বিচারে অধিকাংশ ভোট কংগ্রেসের পাওনা। লীগ তাতে রাজী নয়। উভয়কে সমান সমান ভোটাধিকার দিতে হবে, কাস্টিং ভোট থাকবে বিদেশী বড়লাটের হাতে। ওভাবে মিটমাট হতে পারে না বলেই পাকিস্তান বলে আলাদা একটা রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে দিতে হলো। অবশ্য মিটমাট যা হলো তা ইংরেজের সঙ্গেই। লীগের সঙ্গেও হয়নি। পাকিস্তানের সঙ্গেও না। কন্ফেডারেশন সুদূরপরাহত।

স্বধর্ম ও স্বদেশ

মানুষের যেমন পিতার প্রতি কর্তব্য আছে তেমনি মাতার প্রতি কর্তব্য। যেমন ধর্মের প্রতি মমতা আছে তেমনি জন্মভূমির প্রতি মমতা। যে দেশে জন্ম সে দেশের সুখদুঃখের প্রতি উদাসীন হওয়া কি ধার্মিকের কাজ? তার স্বার্থের প্রতি বিমুখ হওয়া কি ধর্মপ্রাণতার পরিচায়ক? যে নৌকায় আমরা সকলে ভাসছি সে নৌকা যদি ডোবে তা হলে কি আপনি আপনার ধর্ম নিয়ে বাঁচবেন, না আমি আমার ধর্ম নিয়ে বাঁচব?

ধর্মকে তার প্রাপ্য দিতে হবে। এ বিষয়ে হিন্দু মুসলমান শিখ খৃস্টান সকলে একমত। আমাদের এ দেশে কেউ কম ধার্মিক নয়। ধর্মের উপর ভারতের সাধারণ লোকের আন্তরিক টান। সেকুলার স্টেট বলতে এ বোঝায় না যে মানুষ নিজের ধর্ম ভুলে যাবে। ধর্ম বিসর্জন দিয়ে শুধু রাজনীতি বা অর্থনীতি নিয়ে জীবনযাপন করা যায় না। কেউ যদি বলেন যে একতার খাতিরে সবাইকে আপন আপন ধর্ম ত্যাগ করতে হবে, নতুবা একতা হবে না, তবে তাঁর সেটা অসঙ্গত প্রত্যাশা। মাতার খাতিরে যেমন পিতাকে দূর করে দেওয়া যায় না তেমনি জন্মভূমির খাতিরে ধর্মকে।

অপর পক্ষে পিতার খাতিরে মাতাকে দূর করে দেওয়া অসঙ্গত প্রত্যাশা। সেকালের মুসলিম নেতাদের অনেকে বিশ্ব ইসলামের খাতিরে ভারতবর্ষকে তুচ্ছ মনে করতেন, তার স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামীদের এক কথায় উড়িয়ে দিতেন এই বলে যে ওরা হিন্দু। শেষে যখন দেখা গেল যে সংগ্রামীদের ত্যাগস্বীকারের ফলে দেশ স্বাধীন হবার মুখে তখন তাঁরাও বলতে আরম্ভ করলেন যে, "হাঁ, আমাদেরও একটা দেশ আছে, সেটা হিন্দুস্থান নয়, পাকিস্তান।"

হিন্দু মুসলমান শিখ খৃস্টান সকলের তপস্যার ফলে দেশ স্বাধীন হয়। সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ মুসলমানের ইচ্ছায় ও অধিকাংশ হিন্দুর সম্মতিতে দেশ দু'ভাগ হয়। এখন তো আর দেশকে অস্বীকার করে ধর্মকেই একমাত্র আপনার বলে ভাববার ও ভালোবাসবার হেতু নেই। হিন্দুস্থানকে যাঁরা স্বদেশ বলে

ভাবতে ও ভালোবাসতে নারাজ তাঁরা পাকিস্তানকে স্বদেশ বলে ভাবতে ও ভালোবাসতে পারেন। পাকিস্তানকে যাঁরা স্বদেশ বলে ভাবতে ও ভালোবাসতে নারাজ তাঁরা হিন্দুস্থানকে স্বদেশ বলে ভাবতে ও ভালোবাসতে পারেন। আমার মতো যাঁরা দুই দেশকেই স্বদেশ বলে ভাবতে ও ভালোবাসতে চান তাঁদের কর্তব্য হবে দুই দেশের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধন করা। ভুল বোঝাবুঝি যথেষ্ট হয়েছে। এবার সে অধ্যায়ের অবসান হোক। এক দেশকে আপনার মনে করলে আরেক দেশকে পর মনে করতে হবে এমন কোনো সুযুক্তি নেই।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাস্তববাদীও হতে হবে। পাকিস্তান একটি বৈদেশিক শক্তিজোটের সঙ্গে সামরিক চুক্তিবদ্ধ। তা ছাড়া চীনের সঙ্গে তার যে সীমান্ত চুক্তি হয়েছে তাতে একটি গোপনীয় ধারা আছে, সে ধারা ভারতবিরোধী। বার বার আহ্বান করা সত্ত্বেও পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিতে সই করতে রাজী হয়নি। বিশ্বযুদ্ধ বাধলে পাকিস্তান হবে এক পক্ষের ঘাঁটি। চীন-ভারত যুদ্ধ বাধলে পাকিস্তান হবে চীনের দোসর। কাশ্মীরকে উপলক্ষ করে পাক-ভারত যুদ্ধ বাধাও বিচিত্র নয়। যেখানে এতরকম দুঃসম্ভাবনা রয়েছে সেখানে দুই দেশের হিতৈষীদেরও সতর্ক থাকতে হয়। এমন লোকও আছে যারা আমাকে 'পাকিস্তানের দালাল' বলে গালাগালি দিয়ে চিঠি লেখে। আমারই যখন এই দশা তখন কাজী আবদুল ওদুদ বা হুমায়ুন কবিরের অবস্থা অনুমেয়।

ওদিকেও নিশ্চয় এমন লোক আছে যাদের চোখে আমরা 'হিন্দুস্থানের দালাল'। সেইজন্যে ইচ্ছা থাকলেও আমি পাকিস্তানে যাইনে। এবারেও যাবার প্রস্তাব উঠেছিল। আমি "না" বলে দিয়েছি। সেতুবন্ধনের চেষ্টা তা বলে ছেড়ে দিইনি। আপাতত আমার কাজ এই প্রান্তেই। সেতু তো প্রথমে এক প্রান্ত থেকেই আরম্ভ করতে হয়। ওদিকেও কেউ কেউ এক প্রান্ত থেকেই আরম্ভ করবেন। হয়তো ইতিমধ্যেই আরম্ভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের কাজ আরো শক্ত। পাকিস্তান গোড়া থেকেই একটা ইসলামিক স্টেট আর ইসলামের সঙ্গে হিন্দুত্বের নাকি চিরন্তন শত্রুতা। কাশ্মীর দান করলেও যে আমরা পাকিস্তানের শাসকচক্রের মন পাব তার উপায় নেই। ইসলামিক স্টেট তার পরেও তেমনি ইসলামিক রয়ে যাবে। ইসলামের সঙ্গে হিন্দুত্বের তথাকথিত শত্রুতাও তেমনি চিরস্থায়ী।

পাকিস্তানের চিত্ত পরিবর্তন তার ভিতর থেকেই ঘটবে। তার জন্যে ধৈর্য ধরতে হবে। ইতিমধ্যে এদিকটা সামলাতে হবে। যাতে শান্তি অব্যাহত থাকে। যাতে সদ্‌ভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ কাজ আগে যত কঠিন ছিল এখন তার চেয়ে আরো কঠিন হয়েছে। কারণ পাকিস্তান থেকে অবিরাম জনস্রোত বয়ে আসছে। তার প্রতিক্রিয়া কি সিকিভাগও হবে না? এবার তো পাশপোর্ট বা মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটেও বাগ মানছে না। এইভাবে যদি আরো কিছুদিন চলে তবে এসব বিধিনিষেধ আপনি উঠে যাবে। মাল পাচার

তো হামেশা চলছে। বাধ্য হয়ে দুই রাষ্ট্রকে একমত হতে হবে। সেটা বার বার পেছিয়ে যাচ্ছে বলে হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। সবুরে মেওয়া ফলে।

ঝগড়া বন্ধ করার জন্যেই দুটো দেশ মেনে নিতে হয়েছিল। ঝগড়া চালিয়ে যাবার জন্যে নয়। ঝগড়াটে মনোভাব সাধারণ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে নেই। জনগণ চায় শান্তি, মৈত্রী। ধর্ম নিয়ে শত্রুতার যুগ গেছে। রাজনীতি নিয়ে শত্রুতার যুগও যাবে। তার পরে আসবে অর্থনীতি নিয়ে সংহতির যুগ। নইলে কেউ সমৃদ্ধ হবে না। না পাকিস্তান, না ভারত।

॥ ২ ॥

"স্বধর্ম ও স্বদেশ" প্রবন্ধটিতে "হিন্দুস্থান" কথাটি উল্লেখ দেখে শ্রীরবীন্দ্র গুহ ব্যথিত হয়েছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, "ভারত" নয় কেন? তিনি যদি লেখাটি শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকেন তা হলে তাঁর উত্তর তিনি হাতে হাতে পেয়ে গেছেন। কারণ তাতে "ভারত"ই শেষ কথা। লেখকের নিজের উপর ছেড়ে দিলে লেখক "ভারত" কথাটিই ব্যবহার করে যেতেন। কিন্তু প্রবন্ধের এক জায়গায় কোটেশন আছে। তার পরের ধাপগুলো সেই কোটেশনের অনুবৃত্তি। "হিন্দুস্থান" কথাটি মুসলমান মহলে এখনো বহুল প্রচলিত।

এই সেদিন অবধি যার নাম ভারতবর্ষ তারই নাম ইণ্ডিয়া ও তারই নাম হিন্দুস্থান ছিল। এখনো এগুলি পরস্পরের প্রতিশব্দস্বরূপে ব্যবহার করা হয়। তার জন্যে গুহ মহাশয়কে ভিলাই থেকে বাঙ্গালোরে যেতে হবে না। হিন্দুস্থান স্টীল, হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট ইত্যাদি ছ'সাতটা সরকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কে না জানে? সরকারকেই প্রশ্ন করা যেতে পারে, ভারত নয় কেন? এর উত্তরে তাঁরা হয়তো বলবেন যে বার বার ইণ্ডিয়া ও ভারত ব্যবহার করে তাঁরা প্রমাণ দিয়েছেন যে তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। কিন্তু পাকিস্তানীরা যে শব্দটির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পাচ্ছে সে শব্দটি তা বলে তামাদি হয়ে যায়নি বা তার প্রকৃত অর্থ হারায়নি।

কাজী আবদুল ওদুদের "ব্যবহারিক শব্দকোষ" দেশ বিভাগের পরে প্রকাশিত। "হিন্দুস্থান" শব্দটির অর্থ কাজী সাহেবের মতে "ভারতবর্ষ, উত্তর-ভারত (হিন্দুস্থানী মওলানা, হিন্দুস্থানী মেয়ে)"। তাই যদি হয় তবে হিন্দুস্থানের একাংশ বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও শব্দটির বিলোপ বা অর্থান্তর ঘটেনি। ভারতের বাইরে এদেশের নাম হয় ইণ্ডিয়া নয় হিন্দুস্থান। ভারত নামটিই অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত। ইসলাম প্রবর্তনের পূর্বেও পারস্যের লোক এদেশকে বলতেন হিন্দুস্থান যেমন খ্রীস্টধর্ম প্রবর্তনের পূর্বেও গ্রীকরা বলতেন ইণ্ডিয়া। ধর্মের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। যাঁরা হঠাৎ সেদিন

এর মধ্যে ধর্মের গন্ধ আবিষ্কার করেন তাঁরা কি মহাকবি ইকবালের "হিন্দুস্তান হামারা" গানটিকেও সাম্প্রদায়িকতার অপরাধে খারিজ করবেন ?

তা ছাড়া আরো একটি কথা। এটি ব্যক্তিগত। আমি বাংলা সাহিত্যের লেখক। আমি যখন লিখি তখন আমার চোখের সামনে থাকে কেবল ভারতের বাংলা সাহিত্যের পাঠক নয়, পূর্ব পাকিস্তানেরও বাংলা সাহিত্যের পাঠক। কায়িক বিচ্ছেদ আমি মেনে নিয়েছি কিন্তু মানসিক বিচ্ছেদ আমি মেনে নিইনি। বাচনিক বিচ্ছেদ আমি মেনে নিতে পারিনে। কোন শব্দের ব্যবহারে কে অপ্রসন্ন হবে সেটা অবশ্য একটা মনে রাখবার মতো কথা, কিন্তু মনটাই আমার এই একটি বিষয়ে পরিবর্তন-বিমুখ। আমি তার উপর ভায়োলেন্স খাটাতে অনিচ্ছুক। অর্থাৎ দেশবিভাগ সত্ত্বেও আমি যেখানে ছিলাম সেইখানেই আছি। এই একটি বিষয়ে। ব্যংলা ও বাঙালীর সংজ্ঞা ও সীমা ইতিহাস ও ভূগোল যেভাবে নির্দেশ করে দিয়েছে আমার কাছে সেটা অপরিবর্তনীয়। বাস্তববাদ আমাকে স্বীকার করতে বাধ্য করছে যে ওটা এখন পাকিস্তান, কিন্তু ইতিহাসবোধ ও ভূগোলবোধ আমাকে স্থির থাকতে পরামর্শ দিচ্ছে। আমি স্থির আছি ও থাকব।

আমার মন বলে, এই বাস্তবটাই অবাস্তব। এর পিছনে অবশ্য দেদার শক্তি কাজ করছে। তাদের খবর রাখা দরকার। তাদের সঙ্গে পাঞ্জা কষারও দরকার আছে। সাহিত্য নিয়ে মগ্ন না থাকলে সেটাও আমি করতুম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হবে যেসব শক্তির সেসব শক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় এতকালের ও এত গভীর যে তাদের উপর বিশ্বাস হারালে আমি নিজেই বিড়ম্বিত হব। বাঙালী হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে রাজনীতি করতে পারল না এটা দুর্ভাগ্য। নিকট ভবিষ্যতে পারবেও না। কিন্তু একসঙ্গে সাহিত্য করতে পারবে না, সঙ্গীত করতে পারবে না, খেলাধূলা করতে পারবে না, এটা মিথ্যা। একসঙ্গে চাষবাস করতে পারবে না, লেনদেন করতে পারবে না, বসবাস করতে পারবে না, এসব মিথ্যার পরমায়ু হয়তো আরো পাঁচ দশ বছর। কিন্তু ইতিমধ্যে পঞ্চাশ ষাট লাখ লোকের জীবন এর দ্বারা দুর্বহ হয়েছে, তছনছ হয়েছে। আর কত হবে তাই ভাবি। যখন ভাবি তখন পূর্ব পাকিস্তানকেও জড়িয়ে ভাবি। সেখানকার হিন্দু মুসলমানকেও জড়িয়ে ভাবি। এখানকার হিন্দু মুসলমান কাউকে বাদ দিয়ে ভাবিনে।

আমার ইতিহাসবোধ আমাকে বলে যে হিন্দু মুসলমানের তত্ত্বের মামলা তিন চার শ' বছর আগেই মিটে গেছে। আলাওল প্রমুখ কবিদের রচনায় তার প্রমাণ রয়েছে। এখন যেটা আমরা দেখছি সেটা স্বত্বের মামলা। অর্থাৎ এটা পলিটিকস। পাওয়ার পলিটিকস। এটাও বহুদিন পূর্বে মিটে যেত, যদি না সুদূর কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তান বিক্ষুব্ধ হতো। নিকট ভবিষ্যতে সে বিক্ষোভ দূর হবে কি ? যদি না হয় তবে স্বত্বের মামলা বহুদূর গড়াবে।

গণতন্ত্রের মর্ম

গণতন্ত্রে যে দুটি জিনিস একান্ত আবশ্যক—যে দুটি না হলে ওটা গণতন্ত্রই নয়—সে দুটির একটি হচ্ছে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন, অপরটি নির্বিবাদে ক্ষমতা হস্তান্তর। এই সেদিন ইংলণ্ডে ওই দুটি জিনিস দেখা গেল।

এদেশেও দেখা যেতে পারে যদি বর্তমান সংবিধান অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। ইতিমধ্যে কয়েকবার সাধারণ নির্বাচন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে, কোনো কোনো রাজ্যে নির্বিবাদে ক্ষমতা হস্তান্তরও হয়েছে। যেমন কেরলে, নাগাল্যাণ্ডে, গোয়াতে। ভবিষ্যতে অন্যান্য রাজ্যেও হতে পারে। কেন্দ্রেও হতে পারে। লোকে যদি কংগ্রেসের চেয়ে অন্য কোনো দলকে বেশী বিশ্বাস করে ও ব্যালট বাক্সে গোপনে ভোট দেয় তাহলে অন্য দলটির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে কংগ্রেস বিরোধীপক্ষের ভূমিকা নেবে। কংগ্রেস যে কোনো দিন ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না এমন নয়। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন যে কোনো দিন আর অনুষ্ঠিত হবে না এমন নয়। বিরোধী পক্ষে যেতে কংগ্রেস যে অনিচ্ছুক এমনও নয়।

আসলে কংগ্রেসের দিক থেকে গণতন্ত্রের ভয় করবার কিছু নেই। দেশের লোক বিশ্বাস করে না যে কংগ্রেস একদিন গণতন্ত্রের পাট উঠিয়ে দিয়ে সরাসরি ডিক্টেটরশিপ কায়েম করবে, নাৎসী, ফাসিস্ট বা কমিউনিস্টদের মতো। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমতে জমতে পাহাড় হলে কংগ্রেস ভোটে হেরে গিয়ে বিরোধীদের আসনে বসবে, ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলের মতো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এদেশে লেবার পার্টির ভূমিকা নেবে কে? এমন দল কোথায় যার হাতে ক্ষমতা সঁপে দিয়ে দেশের লোক নিশ্চিন্ত হবে? এমন দল কোন্‌টি যে দল সিংহাসনে বসে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে, হেরে গেলে ভদ্রভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে? এখন পর্যন্ত আমরা দেখছি বেআইনীভাবে ক্ষমতা অধিকার করতে প্রায় সব ক'টি বামপন্থী তথা দক্ষিণপন্থী দল মনে মনে তৈরি। সম্পত্তির ওপর হাত পড়লে দক্ষিণপন্থীরা হাতিয়ার ধরবেন। আর বামপন্থীরা হাতিয়ার ধরবেন ভাতকাপড়ে বা মজুরিতে টান পড়লে।

গণতন্ত্রের দুর্বলতা হচ্ছে এইখানে যে সব ক'টা দল যদি খেলার নিয়ম না মানে, কয়েকটা দল যদি খেলায় ফাউল করতে বদ্ধপরিকর হয়, জনগণ যদি উদাসীন বা বিভ্রান্ত হয়, নির্বাচনে যদি জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত না হয়, অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যদি নির্বাচন স্থগিত থাকে, সাহসিক সিদ্ধান্ত নিতে যদি শাসক দল গড়িমসি করে, জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে যদি নেতারা ভুল নেতৃত্ব দেন, তাহলে মানুষ তিক্তবিরক্ত হয়ে বলে, কী হবে এমন গণতন্ত্র নিয়ে? ডিক্টেটরশিপও এর চেয়ে শ্রেয়। এমনি এক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল ফ্রান্সে। রাজনৈতিক দলগুলো বিশ বছর কোনো সাহসিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। শেষে দরকার হলো আলজিরিয়া সম্বন্ধে এক অসমসাহসিক সিদ্ধান্ত। সেটা

কেবল দ্যগলের মতো অসমসাহসী ব্যক্তিই নিতে পারেন। সৈন্যরা বিদ্রোহের ভয় দেখিয়ে দ্যগলকেই চাইল। রাজনীতিকরা মানে মানে তাঁর খাতিরে সরে গেলেন। তাঁর নিজের শর্তে তিনি কর্তা হয়ে বসলেন। গণতন্ত্রকে খুশিমতো শুধরে দিলেন। এখন বোঝা শক্ত সেটা গণতন্ত্র না কর্তৃতন্ত্র।

ফ্রান্সের মতো বনেদী গণতন্ত্রে যদি এরূপ ব্যাপার ঘটতে পারে, তবে আমাদের বেলা কী যে ঘটবে তা ইতিহাসবিধাতাই জানেন। সর্বপ্রকার ঘাতসহ গণতন্ত্র পৃথিবীতে দু'চারটি মাত্র আছে। এমন কি ইংলণ্ড সম্বন্ধেও ইংরেজদের অনেকের ভয় ছিল যে সেখানেও রক্তাক্ত বিপ্লব ঘটবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর লেবার পার্টি নির্বিবাদে যেসব সংস্কারমূলক পরিবর্তন ঘটায় সেসবও এক প্রকার বিপ্লব। সম্মতিসূত্রে বিপ্লব। পরবর্তী নির্বাচনে লেবার পার্টি পরাজিত হলেও শ্রমিক শ্রেণী পরাজিত হয়নি। ওদের শক্তি সেই যে বেড়ে যায় তার পর আর কমেনি। যখন পার্লামেণ্ট ওদের হাতে থাকে না তখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থাকে। আর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস একাই সৈন্যদলের মতো শক্তিশালী। রক্ষণশীলরা ওকে যমের মতো ভয় করে।

ইংলণ্ডের মতো ভারতে পোলারাইজেশন হয়নি। রক্ষণশীল দলও নেই, শ্রমিক দলও নেই। কংগ্রেস রক্ষণশীলদের দল নয়। কংগ্রেস বরং চেষ্টা করছে যাতে পোলারাইজেশন না হয়। গান্ধীজীর আগে যে কংগ্রেস ছিল সে কংগ্রেস থাকলে রক্ষণশীল না হোক উদারনৈতিক দলে পরিণত হতো। কিন্তু গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার অর্থনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেন। ঝোঁক পড়ে মিলের ওপর নয়, চরকার ওপর। বড়লোকের ওপর নয়, গরিব লোকের ওপর। চরকা একটা প্রতীক মাত্র। আসল কথাটা হলো ওদের হাতে শুধু একটা ভোট ধরিয়ে দিলেই ওদের পেট ভরবে না। একটা চরকাও ধরিয়ে দিতে হবে। যাতে ওরা নিজেদের পরিশ্রমের দ্বারা নিজেদের পেট ভরায়। মার্ক্সপন্থীদের যেমন কাস্তে হাতুড়ি, গান্ধীপন্থীদের তেমনি চরকা। আক্ষরিক অর্থে কেউ কাস্তে হাতুড়ি ধরে না। আক্ষরিক অর্থে কেউ হয়তো চরকাও ধরবে না। কিন্তু দীনতম মানুষটিকেও শ্রমের সুযোগ দিতে হবে। কেউ বেকার বসে থাকবে না। গান্ধীজীর এনে দেওয়া ভোট এখন কংগ্রেসকে রাজা করে দিয়েছে, কিন্তু গান্ধীজীর দিয়ে যাওয়া চরকা এখন মথুরাপতির ভুলে যাওয়া ব্রজগোপী।

কংগ্রেস এখনো দীনতম মানুষটিকে শ্রমের সুযোগ দেয়নি। শুধু তার ভোটটির জন্যে তার কাছে দৌড়াদৌড়ি করে। পাঁচ বছরে একবার, তবু তো একবার। কমিউনিস্ট দেশগুলিতে কেউ কি গরিবের দোরে একবারও যান? যেখানে ভোট নেওয়া হয় সেখানেও সরকারী দল ছাড়া আর কারো মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেবার স্বাধীনতা নেই। কমিউনিস্ট রাজ্যে শ্রমের সুযোগ মেলে, কিন্তু বেছে বেছে যার ওপর আস্থা আছে তাকে ভোট দেবার সুযোগ মেলে না। সে হয়তো সরকার গঠন করবে না, বিরোধী পক্ষে থাকবে। তার বিরোধিতাও মূল্যবান। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে বিরোধী পক্ষে যাওয়া বারণ,

বিরোধিতা করা বারণ, বিরোধী প্রার্থীকে ভোট দেওয়া অসম্ভব। শ্রমের সুযোগই সব নয়। মানুষের জন্মগত অধিকরে বলতে বিরোধী পক্ষকে ভোট দেবার অধিকারও বোঝায়। কংগ্রেস যাদের শ্রমের সুযোগ দেয় নি বা দিতে পারে নি তাদের শাসক নির্বাচনের তথা বিরোধী নির্বাচনের অধিকার দিয়েছে। একদিন বিরোধীও শাসক হতে পারে। সুতরাং উভয় পক্ষের রথের দড়ি লোকের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা জিতিয়ে দিতেও পারে, হারিয়ে দিতেও পারে।

দেশের পক্ষে যেমন স্বাধীনতা, ব্যক্তির পক্ষে তেমনি ভোট। এই অমূল্য অধিকার দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের নেই, শ্বেতাঙ্গদের আছে। এই অমূল্য অধিকার পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলমানের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। একে ফিরিয়ে আনার জন্যে কুমারী ফাতেমা জিন্নার অভিযান আপাতত ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তানকে এর জন্যে কতকাল তপস্যা করতে হবে কে জানে। এই অমূল্য অধিকার আমাদের দীনতম নাগরিকেরও আছে। কী করে এর সদ্‌ব্যবহার করতে হয় সেটা ওরা এখনো ভালো করে শেখেনি। ওদের ভালো করে শেখানো হয় নি। ইংলণ্ডেও সময় লেগেছে শিখতে। এ জিনিস দেখে শেখা যায় না। ঠেকে শিখতে হয়। ভুলভ্রান্তি হবেই। কিন্তু কংগ্রেস যতদিন আছে ততদিন এটুকু নিশ্চয়তা আছে যে ভারতীয় নাগরিকদের ভোট দেবার অধিকার কেউ কেড়ে নেবে না। কংগ্রেস যদি শাসক পক্ষ ছেড়ে বিরোধী পক্ষে দাঁড়ায়, তা হলেও আশা থাকে যে ভোটের অধিকার বাতিল হবে না। কিন্তু কংগ্রেস যদি শূন্য হয়ে যায় তবে বিশ্বাস করা কঠিন যে গণতন্ত্র বা ভোটাধিকার অবিকৃত থাকবে। আমার আশঙ্কা কংগ্রেসের শূন্যতা পূরণ করা আর কোনো পার্টির একার সাধ্য নয়। এমন কি পাঁচটা পার্টি মিলে কোয়ালিশন করলেও না। তখন হয় দেশ খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে, নয় দেশজুড়ে· মিলিটারি ডিকটেটরশিপ হবে। দ্বিতীয়টার সম্ভাবনাই বেশী। একবার ও-জিনিস হলে গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন সুদূরপরাহত। যেমন দেখছেন পাকিস্তানে। একই জাতি আমরা। আমাদের এমন কোনো বিশেষ গুণ নেই যে আমরা ডিকটেটরকে হটিয়ে দিয়ে আবার গণতন্ত্র ফিরে পাব। হয়তো এক প্রকার ডিকটেটরশিপের জায়গায় আরেক প্রকার ডিকটেটরশিপ হবে। মিলিটারির জায়গায় কমিউনিস্ট বা ফ্যাসিস্ট। নয়তো সেই আয়ুব-মার্কা ছদ্মবেশী 'বেসিক ডেমোক্রাসী'। গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হলে আবার গণ-সত্যাগ্রহ করতে হবে। কোথায় সেই নেতা, সেই তপস্যা, সেই ত্যাগশক্তি আর সেই ইংরেজ লিবারেল প্রতিপক্ষ!

এই হলো একটা কথা। আর একটা কথা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিরোধের মতো শ্রেণীবিরোধও একটা এলিমেণ্টাল ব্যাপার। ভারতে যদি সে ব্যাপার ঘটে তবে কংগ্রেসকে দোষ দিয়ে কোনো সান্ত্বনা মিলবে না। যেসব দেশে কংগ্রেস নেই সেসব দেশেও তো মহামারী বেধে গেছে। বরং গণতন্ত্র সেটাকে কতক পরিমাণে বাগ মানাতে পারে। যেমন পেরেছে ইংলণ্ডে। গণতন্ত্র

যেখানে কাজ করছে না সেখানে শ্রেণীবিরোধ এক কোপে একটা শ্রেণীকে একদম ছেঁটে ফেলতে পারে। রুশ চীনে আমরা তার নমুনা দেখেছি। যেসব শ্রেণী কাটা পড়বে তারা যদি গণতন্ত্রের ঢালের আড়ালে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করতে চায় আমি তাদের সুবুদ্ধিকে সাধুবাদ দেব। বলা বাহুল্য তারা সন্ধি করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। জনগণের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী থাকবে। গণতন্ত্রে এটা মানে মানে হতে পারে।

(শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্তকে লিখিত পত্র)

আঠার বছর পরে

একজন লোক ঘটনাচক্রে একটি হীরা পেয়েছিল। একদিন ঘটনাচক্রে সেটি খোওয়া গেল। কী করবে! ঘটনাচক্রের উপর হাত নেই। অসহায়!

আমাদের স্বাধীনতা কি ঘটনাচক্রে পাওয়া হীরা? তা যদি হয়ে থাকে তবে আবার একদিন ঘটনাচক্রে হারিয়ে যেতে পারে। ঘটনাচক্র কখন অনুকূল হয়, কখন প্রতিকূল হয়, কেউ বলতে পারে না। ইতিহাস দীর্ঘ। তার কাছে এক আধ শতাব্দী কিছু নয়। তার হাতে কত পাকা ঘুঁটি কেঁচে গেছে।

না, আমাদের স্বাধীনতা ঘটনাচক্রে পাওয়া হীরা নয়। একে আমাদের বহু দুঃখে অর্জন করতে হয়েছে। এর পিছনে রয়েছে বহু বৎসরের তপস্যা ও ত্যাগ। লক্ষ লক্ষ নরনারীর উদ্যোগ ও অধ্যবসায়।

নিজেদের যারা সাহায্য করে বিধাতা তাদের সাহায্য করেন। বিধাতার সেই সাহায্য হঠাৎ একদিন ঘটনাচক্ররূপে আবির্ভূত হয়। যে ইংরেজকে "ভারত ছাড়ো" বলে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল সেই ইংরেজই নোটিশ দেয় সে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ভারত ছাড়বে। রাশিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জার্মানীর একাংশ অধিকার করতে হলে সৈন্যের দরকার। সে অধিকার পাঁচ সাত বছরের জন্যে নয়। কে জানে কতকালের জন্যে। ইউরোপের ব্যালান্স অফ পাওয়ার বজায় রাখতে হলে সৈন্য চাই। সুতরাং ভারত থেকে সৈন্য অপসারণ না করে উপায় নেই। ঘটনাচক্র রাশিয়াকে জার্মানীর মাঝখানে টেনে এনে ভারতকে সাহায্য করে। ভারত ইংরেজ অধিকার থেকে মুক্ত হয়।

মহাযুদ্ধের ফলাফল অন্যরকম হলে ইংরেজ অত সহজে সাম্রাজ্য গুটিয়ে নিত না, হয়তো আরো একবার গণসত্যাগ্রহ করতে হতো। গান্ধীজী তার জন্যে আরো অনেকদিন বাঁচতে চেয়েছিলেন। অনেকেরই ধারণা ছিল যে, ১৯৪৬ সালের "অন্তর্বর্তী সরকার" ধোপে টিকবে না, এক আধ বছর বাদে ইস্তফা দেবে। তখন আবার অচল অবস্থা। আবার সংগ্রাম। পরিশেষে আমেরিকার স্বাধীনতার মতো ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার।

ঘটনাচক্র আমাদের সাহায্য করেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু না করলেও আমরা নিজেদের চেষ্টায় স্বাধীন হতুম। কয়েকজন নেতা হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু গান্ধীজী ছিলেন অক্লান্ত। দেশের যৌবন ছিল অক্লান্ত। দেশের জনগণ ছিল অক্লান্ত। কয়েকজন নেতার তথাকথিত ক্লান্তি এত বড়ো একটা দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করত না। অন্য কারণ ছিল। সে কারণ ঐতিহাসিক। ও রকম একটা পরিস্থিতি অভূতপূর্ব ও অভাবনীয়।

ইতিমধ্যে সারা দেশের উপরে একপ্রকার অবসাদের ছায়া নেমেছে। এ অবসাদ সংগ্রাম করতে করতে ক্লান্ত হওয়ার দরুন নয়। এর সঙ্গে জাতীয় সংগ্রামের কোনো সম্পর্ক নেই। তা হলে কী এর কারণ?

এখনো এ দেশে যথেষ্ট লোক আছে যারা ত্যাগ করতে তপস্যা করতে সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক। কিন্তু কার নেতৃত্বে করবে? কেন করবে? কার বিরুদ্ধে করবে? এসব প্রশ্নে কেউ কারো সঙ্গে একমত নয়। সংগ্রাম একবার আরম্ভ হলে পরস্পরের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে। তাকে অহিংস আকার দিতে চাইলেও সে হিংসায় ফেটে পড়বে। আর সেই হিংসা পরস্পরকে এমন-ভাবে ক্ষতবিক্ষত করবে যে, পরে আর একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারা যাবে না। আমাদের ঘরোয়া বিভেদের সুযোগ নেবে বিদেশী শত্রু। আমরা তাদের রুখতে গিয়ে দেখব যে, পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘাতে নেমে আমরা বলক্ষয় করে বসে আছি।

চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে যে সংহতি চাই সেই সংহতির দাবী আমাদের অন্য কোনো প্রকার সংগ্রামে লিপ্ত হতে দেবে না। মাঝে মাঝে নির্বাচন-দ্বন্দ্ব হবে। সংগ্রাম করতে চাইলে নির্বাচন সংগ্রামে যোগ দিতে পারা যাবে। বলা বাহুল্য, এর সঙ্গে ত্যাগ বা তপস্যার সম্পর্ক নেই।

যারা পেশাদার সৈনিক তাদের কথা আলাদা। কিন্তু যারা এককালে জাতীয় সংগ্রামে যোগ দিত সে রকম লোক এখন কেবলমাত্র গঠনের কাজ করে সন্তুষ্ট নয়। নির্বাচনেও তাদের তৃপ্তি নেই। হিংসাবাদীদের তবু একটা নির্গমনের পথ আছে। কেউ ট্রাম বাস পোড়ায়, কেউ সংখ্যালঘুদের মারে, কেউ থানা বা ডাকঘরের উপর হামলা করে। কিন্তু অহিংসাবাদীদের হাত-পা বাঁধা। ওরা এখন আর সংগ্রামের কথা বলে না।

আমার এক স্নেহের পাত্র এখন সর্বোদয় নেতা। তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করি, "আচ্ছা, তোমরা কি কোনো ইস্যুতেই লড়বে না? ধরো, যদি কন্‌স্ক্রিপশন প্রবর্তিত হয়, যদি যুবকদের ধরে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করতে বলা হয়—"

"যার বিবেকে বাধবে সে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিরোধ করতে পারে, কিন্তু গণতন্ত্র যদি পার্লামেণ্টে আইন পাশ করে কন্‌স্ক্রিপশন চালায় তবে আমাদের গণসত্যাগ্রহ করা চলবে না। করলে ওটা হবে গণতন্ত্রবিরুদ্ধ কাজ।"

জিজ্ঞাসা করিনি পার্লামেণ্ট যদি মদ্যপান নিবারণ না করে অবাধে প্রচলন

করে তা হলে কী কর্তব্য। সম্ভবত একই উত্তর পেতুম। গণতন্ত্র থাকতে গণসত্যাগ্রহ সুদূরপরাহত। ওই নির্বাচন দ্বন্দ্বই একমাত্র অহিংস সংগ্রাম যাতে লক্ষ লক্ষ লোক যোগ দিতে পারে।

অস্তেয়

একজন মানুষ আরেকজন মানুষের ধন অপহরণ করলে তার নাম হয় চুরি। চুরির জন্যে কঠিন সাজা দেওয়া হয়। চোরকে সকলেই নিন্দা করে। যে সমাজে চুরি নেই সেই সমাজকে সকলেই প্রশংসার চোখে দেখে।

একজন মানুষ আরেকজন মানুষের শ্রম অপহরণ করলে তার নাম কী? তার নামও চুরি। কিন্তু তার জন্যে কঠিন সাজা দেওয়া হয় না। তার বদলে দেওয়া হয় পুরস্কার। সমাজের সব চেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি এঁরাই। সাধুসন্ন্যাসীদেরও দেখা যায় এঁদের আশেপাশে ঘুরতে। চোরাই শ্রমের একাংশ সাধুকে দিলে সাতখুন মাফ। আরেক অংশ দিতে হয় রাজাকে, রাজপুরুষদের। কর হিসাবে, উৎকোচ হিসাবে। তা হলে আর ওটা চৌর্য নয়। আইনকর্তারাও আইন করে দিয়ে চোরাই শ্রমের সম্পদকে উত্তরাধিকারী-সূত্রে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করে দেন। বাপের চুরির ফল ভোগ করে ছেলে। স্বামীর চুরির ফল ভোগ করে স্ত্রী।

ফল ভোগ এতকাল পর্যন্ত ছিল সুফল ভোগ। কিন্তু জমানা বদলা গেছে। এখন এসেছে কুফল ভোগের পালা। দেশকে দেশ লাল হয়ে যাচ্ছে কেন? কারণ কৃষক আর সহ্য করতে চায় না যে তার শ্রম চুরি করে জমিদার বা মহাজন বংশানুক্রমে ফুলে ঢোল হবে। শ্রমিকও আর সহ্য করতে চায় না যে তার শ্রম চুরি করে কলওয়ালা বা সওদাগর বংশানুক্রমে বড়লোক হবে। বিপ্লব যাকে বলা হয় সেটা ওই চোরাই শ্রমের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তির সঙ্গে প্রতিবাদ। প্রতিবাদ যে সব ক্ষেত্রে সফল হবেই এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু যতদিন না সফল হয়েছে ততদিন তার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

স্বাধীন দেশগুলোতেও বিপ্লব ঘটছে দেখে কী মনে হয়? এই মনে হয় যে স্বাধীন দেশগুলোতেও শ্রমচুরি অব্যাহত। ইদানীং মধ্যবিত্তদের শ্রম চুরি যাচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি তথা বর্ধিত মূল্য আকারে। কখনো আইনসঙ্গত ভাবে, কখনো আইনকে কলা দেখিয়ে এই যে শ্রম চুরি চলেছে, এই হরির লুট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিজেদের অভ্যস্ত শ্রম চুরির চেয়ে আরো সাংঘাতিক। অথচ এর জন্যে কারো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হচ্ছে না, কাউকে উত্তরাধিকারের থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না। চুরি করে দিব্যি হস্তান্তর করে চলে যাচ্ছে শ্রমচোর। কিছু দিচ্ছে পার্টিদের তহবিলে, কিছু সাধুদের আশ্রমে, কিছু মধ্যবিত্তদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে। কিছু খবরের কাগজের মুখ বন্ধ করতে।

কিছু শ্রমিকদের ধর্মঘট বন্ধ করতে।

স্বাধীনতার পরবর্তী অবস্থাটা আগে থেকে অনুমান করে গান্ধীজী অহিংসার সঙ্গে সঙ্গে অহিংসারই সমতুল্য আরো একটি নীতির উপর অতখানি জোর দেন। সেই নীতির নাম অস্তেয়। কেউ কারো ধন অপহরণ করবে না। কেউ কারো শ্রম অপহরণ করবে না। জীবনের শেষদিন এক মার্কিন মহিলা সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখেন তিনি চরকা নিয়ে বসেছেন, সযত্নে সুতো কাটছেন। এর তাৎপর্য তিনি যে কেবল অহিংসাবাদী তাই নয়, তিনি অস্তেয়বাদী। তিনি কারো শ্রম চুরি করবেন না। তাঁর ওই চরকা তাঁকে প্রতিদিন মনে করিয়ে দেয় যে তিনিও একজন দিনমজুর।

তাঁর খাদির পরিকল্পনাও এমন যে তাতে শ্রম চুরির অবকাশ নেই। শেষবয়সে তিনি সে পরিকল্পনা আরো সংশোধন করেন। খাদি নিয়ে ব্যবসাদারি যাতে সঙ্কুচিত হয়। স্বাধীনতার পরে যাঁরা বড় বড় পরিকল্পনা করছেন তাঁরা কি ঠিক জানেন যে তাতে ধন চুরি তথা শ্রম চুরির সহস্র ছিদ্র রুদ্ধ? তা যদি না হয় তো অমঙ্গলের সহস্র ছিদ্র মুক্ত হয়ে যাবে। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা হলেও লোকে ধন চুরি তথা শ্রম চুরি সহ্য করবে না। একদিন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়বে। এখন থেকেই যেন তাঁরা সহস্র ছিদ্র রুদ্ধ করেন। তা যদি না পারেন তবে বড় বড় পরিকল্পনা ছেড়ে যেন ছোট ছোট পরিকল্পনায় হাত দেন। তাতে ধন চুরি তথা শ্রম চুরির ছিদ্র সংখ্যায় অত বেশী নয়, রোধ করাও অত শক্ত নয়।

পরিকল্পনা যত বড়ই হোক আর যত ছোটই হোক, তাকে অস্তেয় নামক নীতির আমলে আনতে হবে। ধন চুরি তথা শ্রম চুরি বরদাস্ত করা চলবে না। সবাইকে এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। কর্তাদের, কর্মীদের, জনসাধারণের সবাইকে মনে রাখতে হবে যে ধন চুরি যেমন একটা জঘন্য অপরাধ, শ্রম চুরিও তেমনি জঘন্য, এমন কি তার চেয়েও বেশী জঘন্য। আফ্রিকার নিগ্রোদের শ্রম চুরি করার জন্যে তাদের ক্রীতদাস করে আমেরিকায় চালান দেওয়া হয়েছিল, সেই পাপে আমেরিকা গত শতাব্দীতে গৃহযুদ্ধে জর্জর হয়। এখনো তার জের মেটেনি। আমাদের অস্পৃশ্যতার মূলেও সেইরকম কিছু ছিল। সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূলে তো ছিলই। পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষীদের শ্রম চুরি করেছিল বহুকাল ধরে বহু হিন্দু জমিদার ও মহাজন। সাজা পাওনা ছিল। ইতিহাসে অনেক সময় উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়ে। সাধারণ হিন্দু যদিও শ্রম চুরি করেনি তবু শ্রমচোরদের পাওনা সাজা সাধারণকেও পেতে হয়েছে।

ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজমের বিরুদ্ধে অবশ্য আরো একটা অভিযোগ আছে। সেটা খাদির বিরুদ্ধে করবার জো নেই। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজম হচ্ছে অশ্বিনীকুমারের মতো যমজ। ওর অপর ভ্রাতার নাম মিলিটারিজম। ইতিমধ্যে ইনিও পোঁছে গেছেন।

সেকুলারিজম

সংকটকালে সৈনিকের কর্তব্য যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া, নাগরিকের কর্তব্য যেমন যে যার জায়গায় স্থির থেকে নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করা, ইন্‌টেলেক-চুয়ালের কর্ম তেমনি প্রত্যেকটি বিষয় পরিচ্ছন্নভাবে চিন্তা ও প্রকাশ করা। মানসিক বিশৃঙ্খলাও দেশের পক্ষে অহিতকর।

এই সংকটে ভারতের আভ্যন্তরিক দুর্বলতা হচ্ছে, সাধারণ লোক বোঝে না সেকুলার স্টেট বলতে কী বোঝায়। যাঁরা সাধারণ নন, অসাধারণ, তাঁরাও সেকুলার শব্দটির বিভিন্ন অর্থ করেন। তার ফলে সাধারণের মনে ধাঁধা লাগে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে সব দেশেই রাজতন্ত্রের সঙ্গে পুরোহিততন্ত্রের বা সন্ন্যাসীতন্ত্রের মণিকাঞ্চনযোগ ছিল। তখনকার দিনে কল্পনাই করতে পারা যেত না যে রাষ্ট্র আর ধর্ম দুই স্বতন্ত্র সত্তা, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মের হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশ অন্যায়, ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশ অন্যায়।

আমেরিকার তেরোটি ব্রিটিশ উপনিবেশ যখন স্বাধীনতা লাভ করে রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে তখন তাদের সেই প্রজাতন্ত্রে রাজতন্ত্রের সাথী পুরোহিততন্ত্র বা সন্ন্যাসীতন্ত্রের ঠাঁই হয় না। মণির সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনও বাদ যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি আছেন, কিন্তু তাঁর যে কী ধর্ম তার উল্লেখ নেই। গবর্ণমেণ্ট আছে, কিন্তু তার যে কী ধর্ম তারও সন্ধান নেই। কংগ্রেস আছে, কিন্তু তার যে কী ধর্ম তারও ঠিকানা নেই। অর্থাৎ যাঁর যে ধর্মে রুচি সে ধর্মে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি খ্রীস্টান না ইহুদী, খ্রীস্টান হয়ে থাকলে ক্যাথলিক না প্রোটেস্টাণ্ট, প্রোটেস্টান্ট হয়ে থাকলে লুথারপন্থী না ক্যালভিনপন্থী না কোয়েকার না মেথডিস্ট না অন্যান্য শাখার অন্তর্ভুক্ত কেউ তা জানেও না, জানতে চায়ও না। মনে রাখবেন "রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে"। সামাজিক ক্রিয়াকর্মের বেলা জানতে চায়, জানে। হয়তো বাছবিচার করে। কিন্তু সংবিধান সে বিষয়ে নীরব।

আমেরিকার বিপ্লবের পর এই যে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের বিয়োগ এটা ফরাসী বিপ্লবেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়। ফরাসীরা আরো এক পা এগিয়ে গিয়ে রাজার ও চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। একদল তো ঈশ্বরকে পর্যন্ত অস্বীকার করে। আমেরিকানরা নাস্তিককে সহ্য করে না। কিন্তু ফরাসীরা করে।

তারপর একে একে অনেকগুলি দেশ রাজতন্ত্র ছেড়ে প্রজাতন্ত্র গ্রহণ করেছে। কিন্তু মার্কিন বা ফরাসীর মতো রাজার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার থেকে বিদায় দিতে হবে এটা অনেকেই মানে না। সেইজন্য প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেও সংবিধানের ললাটে এঁকে দিয়েছে "ক্যাথলিক" বা "ইসলামী" বা "ইহুদী" বা "বৌদ্ধ"। আমাদের প্রতিবেশী

বর্মা প্রথমে হয়েছিল আমাদেরি মতো সেকুলার স্টেট। কিন্তু সুবুদ্ধি থাকিন নু-র কুবুদ্ধি হল। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাহায্যে ভোটযুদ্ধে বিজয়ী হবার পর তাদের সহায়তার মূল্য দেবার জন্যে "বৌদ্ধ রাষ্ট্র" প্রবর্তন করেন। সঙ্গে সঙ্গে খ্রীস্টধর্মী কারেন, কাচিন, শানরা পৃথক শাসন দাবী করে। তা দেখে সেনাপতি নে উইন ক্ষমতা হাতে নেন। থাকিন নু এখনো বন্দী। বর্মা এখন আবার সেকুলার স্টেট। ভোটের বালাই নেই বলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও রাজনৈতিক ওজন নেই।

দূরদর্শী নেহেরু এইসব কারণেই হিন্দু রাষ্ট্র প্রবর্তন করেননি। তখন গান্ধীজী জীবিত ছিলেন। তিনিও পরামর্শ দেন সেকুলার স্টেট সংস্থাপন করতে। "আমাদের সংখ্যার জোর বেশী। আমরা আমাদের খুশিমতো হিন্দু রাষ্ট্র প্রবর্তন করব", এই যাদের যুক্তি তাদের হাতে পড়লে এদেশ বেশীদিন সংহতি রক্ষা করতে পারবে না। খ্রীস্টধর্মী নাগারা তো স্বাধীনতার জন্যে লড়বেই। লড়বে বৌদ্ধধর্মী সিকিম, ভুটান। লড়বে পাঞ্জাবের শিখরা, কেরলের খ্রীস্টানরা ও সর্বোপরি কাশ্মীরের মুসলমানরা। হিন্দুদেরও তো বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি। একবার ভাঙন ধরলে এ রাষ্ট্র চৌচির হয়ে যাবে।

সুতরাং সেকুলার স্টেট হচ্ছে সেই ভিত্তি যা আমাদের রাষ্ট্রকে ধারণ করে আছে। যে ধারণ করে আছে তাকেও ধারণ করা অত্যাবশ্যক। এটা একজনের একটা খেয়াল নয় যে একে বিসর্জন দিলেও চলে। অথচ এরকম বিপরীত বুদ্ধি আমাদের দেশে অতি সুলভ। হিন্দুরাই যেন এদেশের মালিক, আর সকলে হিন্দুদের কৃপায় বাস করছে। প্রকৃত সত্য তা নয়। হিন্দুরাও আর সকলের কৃপায় বাস করছে। তারা যদি বিমুখ হয় তবে রাষ্ট্র ভেঙে যাবে, শিখরা প্রাণ দিয়ে লড়বে না, পার্শীরা সেনা পরিচালনা করবে না, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা শত্রুবিমান ভূতলে নামাবে না, খ্রীস্টানরা নার্স হয়ে রণাঙ্গনে যাবে না। আর মুসলমানরা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলে অর্থনীতি বিধ্বস্ত হবে। অর্থনীতির বিভিন্ন ধাপ তাদের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দুর চেয়ে মুসলমান কম দরকারী নয়। এখানে মানুষ হিসাবে বিচার করতে হবে। টিকি দেখে বা দাড়ি দেখে নয়। ঘরে আগুন লাগলে যারা নিবিয়ে ফেলতে ছুটে আসে তারা কে কোন ধর্মের লোক কোন সমাজের লোক এটা মূর্খের গণনা। তেমনি শিল্পে বাণিজ্যে কৃষিতে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যার কর্ম তারে সাজে। তাকে পরম সমাদরে তার স্বস্থানে নিযুক্ত রাখতে হবে। তাকে ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দেওয়া চলবে না। তাকে কথায় কথায় সন্দেহ করাও নির্বুদ্ধিতা। কোটি কোটি নাগরিককে সন্দেহ করলে মানুষ বিশ্বাস করবে কাকে? শেষকালে নিজের সম্প্রদায়কেও অবিশ্বাস করে বসবে।

সংকটকালে শুভবুদ্ধি জাগ্রত থাকলে সঙ্কট পার হওয়া তত কঠিন হবে না, যত কঠিন হবে ঘরে-বাইরে সর্বত্র জুজু দেখলে। সেকুলার স্টেটের বিরোধী যাঁরা তাঁরা এতকাল বলে এসেছেন, লোক বিনিময় করা উচিত। তাঁদের মতে

সব মুসলমানই কালো, সব হিন্দুই সাদা। মানুষকে অমন করে সাদায় কালোয় ভাগ করা যায় না। সেটা যে আমরা করিনি এর জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ। পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমান নেই, সুতরাং সেখানকার জনগণের উপর বোমা ফেলতে পাকিস্তানী বোমারু বৈমানিকদের বাধে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান আছে। এখানকার জনগণের উপর বোমা ফেললে মুসলমানেরাও মরবে। তাই পশ্চিমবঙ্গের উপর পাকিস্তানী বোমারু বৈমানিকরা বোমা বর্ষণ করছে না। লোকবিনিময়বাদীরা যদি পশ্চিমবঙ্গকে নির্মুসলমান করতেন তবে তাঁরাই বোমার বলি হতেন।

হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে থাকা কেন প্রয়োজন, একথা হাজার তর্ক করেও বোঝানো যায়নি। এতদিনে ওটা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হবে। তাই যদি হয় তবে মুসলমানকে ধরে রাখাই প্রাণে বাঁচার উপায়। যাকে রাখ সেই রাখে। একথা ওপারের হিন্দুদের বেলাও খাটে। ওখানকার মুসলমানরা এবার হিন্দুদের প্রাণপণে রক্ষা করেছে। হিন্দুরা থাকলে এপারের বৈমানিকরা বোমা বর্ষণ করবে না। মুসলমানদেরও প্রাণরক্ষা হবে। এর থেকে একদিন আসবে ইসলামী রাষ্ট্রে অরুচি ও সেকুলার রাষ্ট্রে রুচি। তর্ক করে যেটা বোঝানো যায়নি সংকটের লজিক সেটা বোঝাবে। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের অন্তঃপরিবর্তন যখন আরো গভীর হবে তখন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হতে পৃথক হয়ে যেতে পারে। আর যদি পূর্ব পাকিস্তানের মতো পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানরাও উপলব্ধি করে যে বিপৎকালে অপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলেমিশে থাকাই শ্রেয় তা হলে তাদেরও অন্তঃপরিবর্তন ঘটবে। তখন পাকিস্তান আর ইসলামী স্টেট বলে অহংকার বোধ করবে না। বরং পূর্ব পাকিস্তানকে সঙ্গে রাখার জন্যে সেকুলার মতবাদ অবলম্বন করতে চাইবে।

একদিন ক্লাসের পরে আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে আমার প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয় বলেন, "অশোকের ওই বিশাল সাম্রাজ্য পরে ভেঙে পড়ল কেন, তার আসল কারণ জানো? বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। যে দেশে বহু ধর্ম সেদেশে একটি ধর্ম যদি রাজধর্ম হয় ও সেই ধর্মটির প্রতি যদি রাজআনুকূল্য বর্ষিত হয় তবে সে রাজ্য টেকে না।"

আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করি। আমার মনে হয়েছিল তিনি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বলেই অমন উক্তি করলেন। তিনি আমাকে বোঝান যে তিনি বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে নন, বৌদ্ধধর্মের রাজধর্ম হওয়ার বিরুদ্ধে। অশোকের বৌদ্ধ হওয়াটা ভুল নয়, বৌদ্ধধর্মকে রাজধর্ম করাটাই ভুল।

তেতাল্লিশ বছর পরে তাঁর সঙ্গে আমি একমত। ব্যক্তিগত মুক্তি বা নির্বাণ বা পরিত্রাণের জন্যে যে-কোনো ব্যক্তি যে-কোন ধর্মে বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু রাজা তাঁর নিজের ধর্মকে রাজধর্ম করবেন ও আর-সব ধর্মের উপর অগ্রাধিকার দেবেন এটা হয়তো সেই ধর্মটির দিক থেকে সুবিধের, রাজ্যের

দিক থেকে সুবুদ্ধি নয়। বৌদ্ধধর্মেরও শেষ পর্যন্ত এতে লাভ হয়নি। বিস্তার ঘটেছে, কিন্তু শিকড় ক্ষয়ে গেছে।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটা কাঠামো থাকে। সেটা যদি মজবুত হয়ে থাকে তবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ, ক্ষমতা নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রজাদের অসন্তোষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নেপোটিজমের অবশ্যম্ভাবী কুফল ইত্যাদি বহু শতাব্দী ধরে সে পোহাতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রের কাঠামো মোটের উপর শক্ত ছিল। সেটা ছিল ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। রাজা ক্ষত্রিয়, মন্ত্রী ব্রাহ্মণ। সামরিক ক্ষমতা ক্ষত্রিয়ের, অসামরিক ক্ষমতা ব্রাহ্মণের। ক্ষত্রিয় শব্দটির সংজ্ঞা যথেষ্ট উদার ছিল। গায়ের জোরে যে জবরদখল করত সেই ক্ষত্রিয় হতে পারত। কে মনে রাখতে যাচ্ছে যে তার গর্ভধারিণী শূদ্রাণী? চন্দ্রগুপ্তের জননী যেমন শূদ্রাণী অশোকের তেমনি ব্রাহ্মণী। আর ব্রাহ্মণ শব্দটির সংজ্ঞাও যথেষ্ট উদার ছিল। শকদের সঙ্গে তাদের পুরোহিতরাও আসেন ও পরে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হন। যেমন একালের নমঃশূদ্রদের পুরোহিতরাও ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিচ্ছেন ও ব্রাহ্মণের পদবী নিচ্ছেন।

চন্দ্রগুপ্ত ব্যক্তিগত জীবনে জৈন হলেও ক্ষত্রিয়ই ছিলেন। ক্ষত্রিয় সমাজই তাঁর সমাজ। তেমনি অশোকও ব্যক্তিগত জীবনে বৌদ্ধ হলেও ক্ষত্রিয়ই ছিলেন। বৌদ্ধদের গ্রন্থে এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ক্ষত্রিয় সমাজই তাঁর সমাজ। তবে শেষের দিকে তিনি বোধহয় বৌদ্ধদের সঙ্ঘে যোগ দেন। সঙ্ঘে যারা যোগ দিত তারা জাত দিত। সমাজে যারা থাকত তারা জাত রাখত। অমুক ব্যক্তি জৈন বা বৌদ্ধ বা শিখ বললে এমন কথা বোঝায় না যে অমুক ব্যক্তি জাতে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শূদ্র নন; জাতি ও ধর্ম এদেশে একার্থক নয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও চেয়েছিলেন যে ব্রাহ্ম হবার পরেও লোকে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বা নাপিত বা মুচি থাকে। এটা কেশবচন্দ্র প্রভৃতির অসহ্য হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেই যে বিদ্রোহ সে বিদ্রোহ ইতিহাসে অপূর্ব। জাতিভেদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এখন আর কাউকে সন্ন্যাস নিতে বা সঙ্ঘে যোগ দিতে হয় না। সমাজে থেকে ও গৃহস্থ হয়েও এখন জাত দেওয়া যায়। নতুন একটা জাত তৈরি করারও দরকার হয় না।

চন্দ্রগুপ্ত জৈন হবার দরুন বা অশোক বৌদ্ধ হবার দরুন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। সামরিক ক্ষমতা, শাসকের ক্ষমতা ক্ষত্রিয়দের হাতেই রয়ে গেছে। অসামরিক ক্ষমতা, মন্ত্রীর ক্ষমতা ব্রাহ্মণদের হাতছাড়া হয়নি। এসব সাধারণত বংশানুক্রমিক। জাত জিনিসটা আসলে পেশার ধারাবাহিকতা। যার যেমন পেশা তার তেমন জাত। পরে, যার যেমন জাত তার তেমন পেশা। সাধারণত সেটা বংশানুক্রমিক ছিল। কেউ একজন বৌদ্ধ বা কোনো একটি পরিবার জৈন হলেই অমনি তার বা তাদের পেশা বদলে যেত না। তাই জাত বদলে যেত না। ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব বলতে একালে যা বোঝায় প্রাচীন ভারতে তা বোঝাত না। তার সূচনা মুসলমান আগমনের পর থেকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সেই প্রথম আঘাত

পড়ে। মুসলমান হলেই সব রকম পদে অধিকার বর্তায়। যে চণ্ডাল মুসলমান হয়েছে সে রাজাও হতে পারে, মন্ত্রীও হতে পারে, সেনাপতিও হতে পারে, সওদাগরও হতে পারে। চিরন্তন কাঠামোটাকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে।

মুসলমানী আমলের গোড়ার দিকে ইসলামী রাষ্ট্রের কাঠামো আমদানীর চেষ্টা যে হয়নি তা নয়, কিন্তু এদেশের মাটিতে ও জিনিস টেকে না। বহু অঞ্চল হিন্দুদের দখলে থেকে যায়, যেসব অঞ্চলে পুরাতন বন্দোবস্ত। মুসলমান অধিকৃত অঞ্চলেও হিন্দুদের সঙ্গে একটা নয়া বন্দোবস্ত হয়। সাধারণত দেওয়ানী হিন্দুদের হাতে, ফৌজদারী মুসলমানদের হাতে। তার মানে সেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়। তবে ঠিক সাবেক অর্থে নয়। জাতে ব্রাহ্মণ নন এমন বহু লোক মুসলমান সরকারে অসামরিক পদ পান, পরে জমিদারি পান। ক্ষত্রিয় নন এমন বহু লোক সামরিক পদ পান, সামন্তরাজা হন। ওদিকে সৈয়দরা বা মৌলানারা ব্রাহ্মণের মর্যাদা পান। ক্ষত্রিয় মর্যাদা পান। ক্ষত্রিয় মর্যাদা যে সব মুসলমানকেই দেওয়া হয় তা নয়। আভিজাত্যের সৃষ্টি হয়। মুসলমান সমাজ আর ডেমোক্রাটিক থাকে না।

ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি হিন্দুতে মুসলমানে নয়, হিন্দুতে হিন্দুতে, মুসলমানে মুসলমানে। সব উপরের স্তরে। নিচের স্তরে কারো সামনে কোনো লোভনীয় পদ বা মর্যাদা ছিল না। যে ভিস্তি সে ভিস্তিই। যে দর্জি সে দর্জিই। তেমনি যে তাঁতী সে তাঁতীই। যে কামার সে কামারই। নিচের স্তরে যেটা ছিল সেটা গোহত্যা নিয়ে দাঙ্গা বা সেই জাতীয় ব্যাপার। ধর্মের লড়াই বলতে মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে যা বোঝায়, যার জন্যে বহু লোক আমেরিকায় চলে গিয়ে স্বাধীনভাবে বিশ্বাস করতে চাইল, সে জিনিস ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে অনুপস্থিত। বিশ্বাসের স্বাধীনতা এখানে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো নিত্য প্রবাহিত ছিল। মুসলমানরা বিশ্বাসের স্বাধীনতায় যেটুকু হস্তক্ষেপ করেছিল সেটুকু মানুষকে দেশছাড়া বা ঘরছাড়া করবার মতো নয়। হিন্দু রাজাদের উৎপীড়নে হিন্দুরা হিন্দুরাজ্য ছেড়ে পালিয়েছে, আবার ফিরে এসেছে। তেমন উৎপীড়নকে ধর্মের উৎপীড়ন বলে না। মুসলমান রাজারাই এদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রবর্তনে আপত্তি করেন। রাজা মুসলমান হলেই রাষ্ট্র ইসলামী হয় না। দেশটাও তার উপযোগী হওয়া চাই। অধিকাংশ মুসলমান রাজার সেটুকু বাস্তবজ্ঞান ছিল। যাঁদের ছিল না তাঁদের বুদ্ধির ভুলে তাঁদের ধর্ম অশোকের আমলের বৌদ্ধধর্মের মতো রাজ-আনুকূল্য পেয়ে রাজ্যের স্থায়িত্বের অন্তরায় হলো। ধর্মের বিস্তার ঘটল, কিন্তু রাজ্যের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে লাগল। ফলে পলাশীতে পরাজয়।

আমি ইসলামের বিরুদ্ধে নই, ইসলামকে রাজধর্ম করার বিরুদ্ধে। তেমনি হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে নই, হিন্দুত্বকে রাজধর্ম করার বিরুদ্ধে। মারাঠাদের আমলে রাজধর্ম দস্যুধর্মে পরিণত হয় ও স্বধর্মীকে রক্ষণের নামে ভক্ষণ করে।

বর্গীর হাঙ্গামায় যত লোক পালিয়েছে তুর্কের হাঙ্গামায় তত লোক নয়। ইংরেজরা যে অত সহজে এদেশ করায়ত্ত করে তার প্রধান কারণ তারা তাদের ধর্মকে কোনো রকম বিশেষ মর্যাদা বা অগ্রাধিকার দেয় না। প্রথম থেকেই এই নীতি স্থির হয় যে ইংরেজ সরকার সব ধর্মকে সমান মর্যাদা দেবে, কোনো ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না। এটার নজীর আকবর দেখিয়েছিলেন, তাঁর আগেও এর নজীর খুঁজলে পাওয়া যায়, কিন্তু এবার সমসাময়িক ইউরোপের নতুন সুরে বাধা। ইউরোপে ওটার নাম এন্‌লাইটেনমেন্টের যুগ। লণ্ডন থেকে যাঁরা নীতি নিয়ন্ত্রণ করছিলেন তারা ধর্মের যুগ পেরিয়ে এসেছেন, মধ্যযুগ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এদেশে যেটা কোনো একজন রাজার বা সম্রাটের ব্যক্তিগত উদারতা হিসাবে গণ্য ছিল সেটা এখন থেকে রাষ্ট্রের নৈর্ব্যক্তিক ভিত্তিশিলা হিসাবে পুরুষানুক্রমিক হলো। একজন রাজা পরধর্মসহিষ্ণু হন তো তাঁর বংশধর পরধর্ম-অসহিষ্ণু হন। কিংবা তিনি এক এক বয়সে এক এক মূর্তি ধরেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান এক একজন রাজার এক এক নীতি। পাকাপাকিভাবে রাষ্ট্রের নৈর্ব্যক্তিক নীতি তা নয়। সেইজন্যে উদারচরিত রাজন্যদের সংখ্যা যত বেশীই হোক না কেন তাঁদের কারো রাষ্ট্রকেই ধর্মনিরপেক্ষ বলা যায় না। সেকুলার বলা যায় না।

কেউ কেউ সেকুলারের অর্থ করেন ধর্মে নিরপেক্ষতা। সেটা ঠিক নয়। যে মানুষ ধর্মে নিরপেক্ষ তারও একটা নিজের ধর্ম থাকে। কিন্তু এমন তো হতে পারে যে তার কোনো ধর্মে বিশ্বাস নেই, সে অজ্ঞেয়বাদী বা নাস্তিক। ইংরেজ আমলে ধর্মে নিরপেক্ষতা ছিল, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল না। নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদীকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বা বিশিষ্ট রাজপদে অধিষ্ঠান করতে দেওয়া হতো না। শপথ নিতে হতো ভগবানের নামে। এমন কি পার্লামেণ্টেও ব্র্যাডলকে বসতে দেওয়া হয়নি, তিনি শপথ নিতে রাজী হলেও তাঁকে নিতে দেওয়া হয়নি। যেহেতু তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী নন। সেই ইংরেজই তো ছিল এদেশের হর্তাকর্তা বিধাতা।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পত্তন ইতিহাসের প্রাচীন বা মধ্যযুগে তো নয়ই, ইংরেজ আমলেও নয়। এটা কংগ্রেস আমলেরই বিশেষত্ব। এর জন্যে আমরা গর্ব অনুভব করতে পারি। আমাদের হাত দিয়েই বা ভোট দিয়েই এটা সম্ভব হয়েছে। একে রক্ষা করা আমাদের পরম দায়িত্ব। ধর্মের জন্যে কেউ যদি এ রাষ্ট্র ছেড়ে পালায় তবে সেটা আমাদের কলঙ্ক। আমাদের উপর অনাস্থাসূচক।

এই নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তিশিলা সর্বধর্ম সহিষ্ণুতা তো বটেই, তার চেয়েও কিছু বেশী। এ রাষ্ট্র ধর্মের এলাকার বাইরে যারা থাকবে তাদের প্রতিও সহিষ্ণু। না, তার চেয়েও বেশী। এ রাষ্ট্র তাদের নাস্তিক হবার, অজ্ঞেয়বাদী হবার অধিকারও মেনে নেয়। তারা যে যার নিরীশ্বরতায় অবিচল থেকে ধাপে ধাপে রাষ্ট্রীয় পদে আরোহণ করতে পারে। একদিন হয়তো দেখা যাবে

যে রাষ্ট্রপতি নিরীশ্বরবাদী। তিনি না হিন্দু, না মুসলমান, না খ্রীস্টান, না শিখ, না পার্সী, না বৌদ্ধ, না ইহুদী, না জৈন। হয়তো আরেকটি লেনিন কি স্টালিন। তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে এমন কোনো শপথবাক্য আমাদের সংবিধানে নেই।

আজকালকার পরিভাষায় যাকে কনস্টিটিউশন বলা হয় আগেকার যুগে সেরকম কিছু বিবর্তিত হয়নি এদেশে। কিন্তু সেই যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সেটাও একহিসাবে একটা অলিখিত সংবিধান। মুসলমান আমলে সেটার অদলবদল হয়, কিন্তু পুরোপুরি রদ হয় না সেটা। ইংরেজ আমলে সেটা পাকাপাকিভাবে রদ হয়। তার বদলে দেখা দেয় আরেক রকম বন্দোবস্ত। একজিকিউটিভ, জুডিসিয়াল, লেজিসলেটিভ, এই তিন অঙ্গ। সব ক'টাই ইংরেজদের মুঠোর মধ্যে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে মুঠোর ভিতর থেকে বেরোয়। যাঁদের হাতে একটু একটু করে যায় তাঁরা প্রধানত হিন্দুসমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত স্তরের ব্যক্তি। তাঁদের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুচ্চশিক্ষিত স্তরের ব্যক্তি। সরাসরি প্রতিযোগিতায় না পেরে এঁরা ধর্মের নামে দাবী করতে শুরু করেন ও প্রশ্রয় পান। এইভাবে যে ঝগড়ার সূচনা তা ক্রমশ নিচের স্তরে সঞ্চারিত হয়, উপরের স্তরেও সংক্রামিত হয়। অভিজাতদের মধ্যে কোনো কালেই ধর্ম নিয়ে বিরোধ ছিল না। অন্তত মোগল আমলে তো নয়ই। এই সেদিন দেখা গেল। ইংরেজ চলে গেলে তার উত্তরাধিকারী কে হবে, এই নিয়ে বেধে গেল দুই শরিকের লড়াই। কিছুতেই মিটমাট হলো না। উপর থেকে নিচ অবধি ফাটল। প্রত্যেকটি বিভাগ দু'ফাঁক। সৈন্য, পুলিশ, পেয়াদা, কেরানী, হাকিম।

আমরা স্বচক্ষে দেখলুম যে আমাদের দেশ দু'চির হয়ে গেল। যে ফাটল তাকে দু'চির করতে পারল সেই ফাটলের মতো আরো দু'চারটি ফাটল কি তাকে চৌচির করতে পারত না? হিন্দুরাষ্ট্র হলে শিখরা কি বলত না, লড়কে লেঙ্গে শিখিস্থান? নাগা খ্রীস্টানরাও কি বলত না, লড়কে লেঙ্গে নাগাল্যাণ্ড? সিকিমের বৌদ্ধরাও কি বলত না, লড়কে লেঙ্গে স্বাধীন সিকিম? কাশ্মীরের মুসলমানেরাও কি বলত না, লড়কে লেঙ্গে স্বাধীন কাশ্মীর?

যে যার ধর্মকে রাজধর্ম বা রাষ্ট্রধর্ম করতে চাইলে এ দেশ দু'চির কেন, চৌচির হবে, চৌচির কেন, ছ'চির হবে। এই সর্বনাশা ফাটল দিয়ে আবার বাইরের শত্রু ঢুকবে। স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। স্বাধীনতার জন্যে এতকালের তপস্যা ব্যর্থ হবে। এসব কথা চিন্তা করেই ভারতীয় ইউনিয়নের কনস্টিটিউ-শনে হিন্দুধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়নি। হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং অধিকাংশের ভোটে হিন্দুরাষ্ট্র পত্তন করা অনায়াসেই সম্ভব ছিল। কিন্তু ওটা একটা ফাঁদ। ওতে পা দিলে মৌর্য সাম্রাজ্য বা গুপ্তসাম্রাজ্য বা হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়া যেত না। মাঝখান থেকে হারিয়ে যেত ভারতীয়

জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদী মুক্তিসংগ্রাম, জাতীয় মুক্তি, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি। জাতীয়তার অর্থ এখানে হিন্দু জাতীয়তা নয়, হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান পার্শী নির্বিশেষে ও সবাইকে সমমূল্যে দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তা। যে জাতীয়তা শিখকে বলে এটাও তোমারই স্থান, আলাদা একটা স্থান নিয়ে কী করবে? যে জাতীয়তা নাগা খ্রীস্টানকে বলে, এটাও কি তোমার ল্যাণ্ড নয়? স্বাধীন নাগাল্যাণ্ড নিয়ে কী করবে? যে জাতীয়তা কাশ্মীরী মুসলমানকে বলে, এটা হিন্দুস্থান নয়, এটা ইণ্ডিয়া, এখানে তুমি চিরকাল ছিলে, চিরকাল থাকবে। স্বাধীন কাশ্মীর নিয়ে কী করবে, কেনই বা পাকিস্তানে যোগ দেবে?

সেকুলারিজম ভারতের সীমান্ত রক্ষা করছে। শুধুমাত্র বন্দুক কামান যা না পারে একটি কলমের খোঁচা তা পারে। একটি শব্দ তা পারে। সেকুলারিজম তেমনি একটি কলমের খোঁচা। তেমনি একটি শব্দ। একে ওলটপালট করে দাও, দেখবে সীমান্তবর্তী অহিন্দু অঞ্চলগুলি এক এক করে খসে যাবে, যারা ছিল ঘরের লোক তারাই হবে বাইরের শত্রু। হিন্দুরাষ্ট্র অনায়াসেই সম্ভব, পার্লামেণ্টের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট তাকে যে কোনোদিন সম্ভব করতে পারে। কিন্তু তার পরের দিন তার সীমান্তগুলিতে ভাঙন ধরবে। হিন্দুরাষ্ট্র নিজেই নিজেকে কোণঠাসা করবে। অভ্যন্তরে অহিন্দু যারা থেকে যাবে তারাও অশান্ত হবে। তারা দাবী করবে চাকরিবাকরিতে আনুপাতিক অংশ ও তার উপর ওয়েটেজ। তার পর দাবী করবে স্বতন্ত্র নির্বাচন, সেক্ষেত্রেও ওয়েটেজ। তার পর দাবী করবে মন্ত্রীমণ্ডলীতে স্থান, কংগ্রেসী হিসাবে নয়, কংগ্রেস ভিন্ন অন্য এক সাম্প্রদায়িক দলের সদস্যরূপে। এক্জিকিউটিভ, জুডিসিয়াল, লেজিস্লেটিভ, সর্বত্র ফাটল ধরবে। দেশ অরাজক হবে। পুলিশ বা মিলিটারি যা না পারে সেকুলার স্টেট তা পারে। সীমান্ত রক্ষা তথা শান্তিরক্ষা।

সেকুলার স্টেট ভারতের ইতিহাসে একটি নতুন এক্স্পেরিমেণ্ট। এ যদি হিন্দুদের মনে না বসে, যদি শুধু মুখের বুলি হয়, যদি তাদের মনের কথাটা হয় হিন্দু আধিপত্য, যার অন্য নাম ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বেনিয়া মনোপলি, তা হলে ভিতরের সত্যটা একদিন না একদিন বাইরে ফুটে বেরোবে। কী করে মনে বসবে, যদি যুগ সম্বন্ধে কোনো ধারণা তাদের না থাকে? যুগটাই ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে রাজতন্ত্র তথা ধর্মতন্ত্র তথা উভয়ের মণিকাঞ্চন-যোগে বিশ্বাস হারিয়েছে। ইংরেজ চলে গেছে বলে যুগটা তো চলে যায়নি। যুগের হাওয়া থেকে কোনো দেশই মুক্ত নয়। ভারতের স্বাধীনতার অর্থ যুগের হাত থেকে মুক্তি নয়। আমরা বরং আমাদের যুগের সঙ্গে আরো অবাধে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছি। এ হাওয়া যে বার্তা বহন করে এনেছে তার অনুরূপ অতীতের আর কোনো যুগে শোনা যায় নি। না মহাভারতের যুগে, না মৌর্যযুগে, না গুপ্তযুগে, না মুঘলযুগে। যাকে আমরা ব্রিটিশ যুগ বলে জানি সেটা একটা বৃহত্তর যুগের অঙ্গ। এ যুগ ভারতকে বিশ্বের

মধ্যে ও বিশ্বকে ভারতের মধ্যে সঞ্চারিত করেছে। আমাদের অতীত বিচ্ছিন্ন হতে পারে, বর্তমান বিচ্ছিন্ন নয়, ভবিষ্যৎ বিচ্ছিন্ন থাকবে না। এ যুগের যা শিক্ষা তাকে অন্তর থেকে গ্রহণ করতে হবে।

একদিন পাকিস্তানের মুসলমানরাও করবে। তার জন্যে ধৈর্য ধরতে হবে। ওরা যদি সেকুলার নাও হয় তবু আমরা হব। সেইভাবে আমরা অন্যান্য অগ্রসর দেশগুলির সঙ্গে পা মিলিয়ে নেব। পাকিস্তানের অনুকরণে ধর্মরাষ্ট্র প্রবর্তন নয়, আমেরিকা রাশিয়া ও ফ্রান্সের অনুসরণে সেকুলার স্টেট প্রবর্তন এই হচ্ছে অগ্রগতির শর্ত।

সম্পাদকের সঙ্গে আমি একমত নই যে পশ্চিমবঙ্গে সেকুলার মানসিকতা বিরাজমান। সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র কিসের সাক্ষ্য দেয়? বারোয়ারী দুর্গাপূজো, কালীপূজো, বিশ্বকর্মাপূজো এমন কি শীতলাপূজোর এমন উৎকট প্রাদুর্ভাব ইংরেজ আমলেও তো দেখিনি। সরকারী অফিসে ও থানাতেও আজকাল পুজোপার্বণ হয়। রাষ্ট্রের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা তাঁদের কর্ণ গুরু মহারাজদের হাতে সঁপে দিয়েছেন দেখা যায়। দিল্লীতে নাকি হেন মন্ত্রী নেই যাঁর জ্যোতিষী নেই। বছরের ক'টা দিন কাজকর্ম হয়? সম্প্রদায়ের—প্রধানত হিন্দুদের—ধর্মকর্মের জন্যে ছুটি। সরকারী কর্মচারীরা ভুলে যান যে তাঁদের মাইনে জোগায় সব সম্প্রদায়ের লোক। কালীপুজোর উদ্বোধন কি বেসরকারী ব্যক্তিদের দিয়ে হোত না? সম্পাদকের প্রশ্নের উত্তরে বলি, কাশ্মীরের বোমাবর্ষণ বিমানবন্দর প্রভৃতি সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর নিবদ্ধ ছিল বলেই জানি। অসামরিক জনতার উপর দুটো একটা বোমা পড়ে থাকলে সেটা আকস্মিক। জনতা যেখানে মিশ্র সেখানে বিপদ অপেক্ষাকৃত কম।

রাষ্ট্রগঠনের সেকুলার ভিত্তি

দেশ যদি দুই ভাগে বিভক্ত না হতো তা হলে "সেকুলার স্টেট" এই কথাটি কারো মুখে শোনা যেত না। দেশ ভাগ হওয়ার আগে তো এটি শোনা যায়নি। ইংরেজ রাজত্বের সময়ও কি শাসনতন্ত্র ছিল না? কই, তার বেলা তো কেউ "সেকুলার" শব্দটির আবশ্যকতা অনুভব করেননি।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজকীয় ঘোষণাই ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরবর্তী ভারতশাসনের মূলনীতি। রাজশক্তি কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাত দেখাবে না, কোনো ধর্মের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করবে না, সকলের সঙ্গে সদ্‌ভাব রক্ষা করবে। তবে রাজার ও বড়ো বড়ো রাজপুরুষদের ধর্ম ছিল খ্রীস্টধর্ম। তাঁদের প্রয়োজনে ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয় চার্চের জন্যে একটা সরকারী বিভাগ

ছিল। সেটার খরচ জোগাত ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান। এটুকু বাদ দিলে আর কোনো আপত্তির কারণ ছিল না। হিন্দু মুসলমানের মুখরক্ষার জন্যে পুলিশ লাইনে মসজিদ ও মন্দিরও থাকত দেখেছি। তার খরচ জোগাত সরকার। তার মানে প্রজাসাধারণ। প্রজাসাধারণের মধ্যে পাশী, জৈন, বৌদ্ধ এরাও তো ছিল। এদের টাকা নিয়ে মন্দির মসজিদের খরচা জোগানো হতো। আপত্তির কারণ ছিল বইকি। তবে সেটা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়।

এদেশের জনসাধারণ সম্প্রদায়নির্বিশেষে ধর্মপ্রাণ। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দুকে যেমন বোঝে তেমন একজন নাস্তিককে বা অজ্ঞেয়বাদীকে নয়। একবার আমার এক মুসলমান বন্ধু আমার ভুল শুধরে দিয়ে বলেন, "মিস্টার গান্ধী কেন বলছেন? বলুন মহাত্মা গান্ধী। বরাবরই তিনি একজন প্রেরণাময় নেতা। মিঃ জিন্না সে রকম নন।" অথচ এই বন্ধুই তখন থেকে পাকিস্তানের পক্ষে। ইসলামের উপর তাঁর গভীর অনুরাগ। তার থেকে এলো পাকিস্তানের প্রতি। তা বলে হিন্দুদের প্রতি তাঁর বিরাগ ছিল না। হিন্দু মুসলমানে সমভাব ছিল। তিনি একবার আমাকে বলেন, "গীতা যখন পড়বেন তখন আগে একটি শ্লোক সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করবেন, তারপরে আরেকটি শ্লোক, এমনি করে অগ্রসর হবেন।" ইনি নিজে চরকা কাটতেন, খাদি পরতেন, বেগমকেও বাধ্য করতেন। পরে পাকিস্তান থেকে আমাদের চমৎকার এক থান খদ্দর পাঠিয়ে দেন। প্রীতির দান।

ইংরেজ চলে গেলে কে রাজা হবে এই নিয়ে ঝগড়া করতে করতে হিন্দু মুসলমান দেশ ভেঙে দিল। এটা ঠিক ধর্মের লড়াই নয়। যদিও দেখলে সেই রকম মনে হয়। আসলে এটা রাজনীতির খেলা। এর পিছনে অর্থনীতিও ছিল। হিন্দু মহাজন বনাম মুসলমান খাতক। হিন্দু জমিদার বনাম মুসলমান প্রজা। হিন্দু হাকিম বনাম মুসলমান নাগরিক। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এসব বৈষম্য ধর্ম থেকে আসেনি। এসেছে ইংরেজী শিক্ষা বা ইংরেজ সরকারের জমিদারি বন্দোবস্ত বা সেই রকম কোনো সেকুলার কারণ থেকে। তা ছাড়া মহাজনি করাটা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ বলে হিন্দু মহাজনদের কোনো প্রতিযোগী ছিল না। প্রতিযোগিতার যে যে ক্ষেত্রে হিন্দুরা সুযোগ পেয়েছে সে সে ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিজেদের দিক থেকেও উদ্যোগের অভাব ঘটেছে। যেখানেই মুসলমানরা উদ্যোগী হয়েছে সেইখানেই তারা প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়েছে, সফল হয়েছে। চাষবাস ও ছোট বড় বিস্তর ব্যবসা মুসলমানদের উদ্যোগের সাক্ষ্য তখনো বহন করত, এখনো করে। বঙ্গের মুসলমানরা কারো চেয়ে কম ভাগ্যবান নয়।

দেশ অবিভক্ত থাকলে আমরা খুব সম্ভব মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্রকেই অখণ্ড ভারতবর্ষের সংবিধানের ভিত্তিশিলা করতুম। এদেশ হতো সর্ব ধর্মের সমান অধিকারের ভিত্তিতে শাসিত। সকলের মত নিয়ে রাষ্ট্র হয়তো কোনো স্থলে মন্দির মসজিদের গির্জার ব্যয় বহন করত। তেমনি জৈন বৌদ্ধ শিখদের ধর্মস্থানের জন্যেও সকলের মত নিয়ে খরচপত্র করত।

রাষ্ট্রের চরিত্র হতো ধর্মনির্বিশেষ নয়, সর্বধর্মীয়। যাঁদের আদর্শ সমন্বয় তাঁরা সুখী হতেন।

কিন্তু দেশ ভাগের পরে ও দেশ ভাগের দরুণ এখন যা হয়েছে তা আমাদের ভাগে ধর্মনির্বিশেষ। ইচ্ছা করলেই আমরা এটিকে ধর্মবিশিষ্ট করতে পারতুম। কিন্তু তা হলে ওপারের ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সেটা হয়ে দাঁড়াত হিন্দু রাষ্ট্র। তাতে এপারের মুসলমানদের অসন্তোষ বাড়ত বই কমত না। সর্বত্র শিবমন্দির বা কালীমন্দির উঠত। তাতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের হিন্দুদেরও অসন্তোষ জন্মাত। হিন্দুদের মধ্যেও আর্য-সমাজীদের মতো নিরাকারবাদী আছেন। ব্রাহ্মসমাজও তো নিরাকারবাদী। রাষ্ট্রের আনকূল্য না নিয়ে যদি কেউ মন্দির গড়ে তবে কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু রাষ্ট্র যদি গড়ে দেয় আপত্তি করবে। তখন যতগুলো শিবমন্দির উঠত ততগুলো বিষ্ণুমন্দির উঠত, যতগুলো রামমন্দির ততগুলো কৃষ্ণমন্দির, ততগুলো কার্তিকপূজার মণ্ডপ। রাষ্ট্র কোনো মতেই সাম্য রক্ষা করতে পারত না। বৈষম্যের দরুন ভারত আবার খণ্ড খণ্ড হতো।

আমরা ধর্মের দ্বন্দ্ব এড়াবার জন্যেই "সেকুলার স্টেট" পত্তন করেছি। এই আমাদের মন্দির, এই আমাদের মসজিদ, এই আমাদের গুরুদ্বারা ও গির্জা। এর মধ্যে যদি ফাঁকি ঢোকে তা হলে আমরা যা গড়ছি তা ভেঙে পড়বে। তখন বিপদ। সবাইকে এ কাজে অন্তর থেকে হাত লাগাতে হবে।

কেন সেকুলার স্টেট

জীবনের কোনো অংশই কোনো অংশের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। সেইজন্যে সাহিত্য আর অর্থনীতি আর বিজ্ঞান আর ধর্ম আর সমাজ আর রাজনীতি আর দেহতত্ত্ব আর মনস্তত্ত্ব কোনোটাকে কোনোটার থেকে বিচ্ছিন্ন করবার উপায় নেই। তা যদি করতে যাই তবে অঙ্গহানি হয়। পরিপূর্ণতার আদর্শের মধ্যে সবকিছুর স্থান আছে। যথাযোগ্য স্থান।

কিন্তু কথা হচ্ছে ব্যক্তির জীবনের পরিপূর্ণতার আদর্শ কি সমষ্টির জীবনের পরিপূর্ণতার আদর্শ হবে ? তা যদি মেনে নিই তা হলে সমষ্টিকে মানিয়ে নেবার দায়িত্ব কার ? সমষ্টি যদি না মানে তা হলে তাকে মানাবার কোনো ন্যায়সঙ্গত বা আইনসঙ্গত বা যুক্তিসঙ্গত উপায় আছে কি ? যেসব দেশে নানা মতবাদের লোক বাস করে সেসব দেশে সেকালের ঋষি বা প্রোফেটদের ধর্ম বা একালের মার্কস প্রভৃতি প্রবর্তকদের মতবাদ সমষ্টিগত সম্মতি কোনো যুগেই পায়নি। উপনিষদের ব্রহ্মবাদ বা আত্মবাদের বিপরীত তত্ত্ব নিয়ে আরো কয়েকটি দর্শন অবতীর্ণ হয়েছিল। ছয়টি আস্তিক দর্শনের কথাই

আমরা জানি, কিন্তু আরো ছয়টি নাস্তিক দর্শনও ছিল ও তাদের ধারা এখনো শুকিয়ে যায়নি। তেমনি খ্রীস্টধর্মের আদিকাল থেকে খ্রীস্টানের সঙ্গে খ্রীস্টানের তীব্র মতভেদ ঘটে আসছে। যে যাকে পারে পুড়িয়েছে। ইসলামের ইতিহাসও মুসলমানের সঙ্গে মুসলমানের ধর্মগত মতভেদে রক্তাক্ত। ইংরেজী "অ্যাসাসিন" কথা এসেছে ইসলামের এক সম্প্রদায়ের নাম থেকে। ওরা কত যে গুপ্ত হত্যা করেছে তার সংখ্যা নেই। ধর্মের সঙ্গে নরবলির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হিন্দুদের মধ্যেও ছিল। ইংরেজরা না এলে নরবলি এখনো সমানে চলত। এখনো দুটো একটা হয়। যারা করে তারা কালীভক্ত। ওটা তাদের ধর্মের অঙ্গ।

ইংরেজ অপসরণের পূর্বে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ নেতারা সকলেই স্বীকার করতেন যে ধর্মকে জাতীয় জীবনের মধ্যমণি করতে হবে। ধর্মহীন জীবন একটা জীবনই নয়। কিন্তু একে তো "ধর্ম" শব্দটার সংজ্ঞা নিয়ে প্রচণ্ড মতভেদ, তার উপর ধর্মের নামে ভোট সংগ্রহ করা সব চেয়ে সস্তা বলে অনেকেই ধর্মের ভেক ধরে নির্বাচনক্ষেত্রে আসর গরম করে তোলেন। তাদের মধ্যে সব চেয়ে সফল বলতে হবে মুসলিম লীগকে। সে তার আপনার জন্যে একটা রাষ্ট্র আদায় করে নিল। তার মতো সফল যারা নয় তারাও আওয়াজ তুলল যে তাদেরও অমনি একটি ধর্মরাষ্ট্র চাই। তার নাম হিন্দুরাষ্ট্র। হিন্দুরাষ্ট্র হলে শিখরাষ্ট্রই বা হবে না কেন ? তারপর নাগাদের খ্রীস্টান রাষ্ট্র কী দোষ করল ?

আমাদের মহান চিন্তানায়করা জানতেন না যে ধর্মকে জীবনের মধ্যমণি করতে গিয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী ও তারই জের টেনে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবে। তেমনি করে ভারত বিভক্ত হবে। নয়তো যা হতো তার নাম গৃহযুদ্ধ। তাতে বিদেশীরাও হস্তক্ষেপ করত। সে যুদ্ধে জয়লাভ করা গান্ধী, নেহরু, পটেল প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী বা সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রবাদীদের কারো সাধ্য ছিল না। গায়ের জোরে যে যতটা কেড়ে নিতে পারত সেই পর্যন্ত তার সীমানা। তার বাইরে মুসলিম লীগের বা তারই মতো স্বাতন্ত্র্যবাদী দলের আস্তানা। তাদের মধ্যে অকালী শিখ দলও পড়ে। ইংরেজ সৈন্য ও শাসক ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বিদায় নিলে দেশ কোনো মতেই একছত্রাধীনে আসতে পরে না এটা ধ্রুব। এই ধ্রুব সত্যের সঙ্গে সময় থাকতে আপস করলে আর কিছু না হোক দেশ মাত্র দুই ভাগ হয়। পঞ্চাশ ভাগ হয় না। পঞ্চাশ ভাগ হতো। হায়দরাবাদ, কাশ্মীর, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর কেউ কারো ক্ষমতা ছাড়ত না। ছেড়েছে বা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে তার কারণ ইংরেজরা কেবলমাত্র দুটি রাজনৈতিক দলকেই তাদের উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তৃতীয় উত্তরাধিকারী স্বীকার করেনি।

এই যে ভারতীয় ইউনিয়ন এটি ইংরেজদের কাজ থেকে আপসে উত্তরাধিকারীসূত্রে হস্তান্তরিত। এর সংবিধান রচনার সময় যখন এলো তখন সব অঞ্চলের ও সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা একমত হয়ে এই স্থির

করলেন যে এ রাষ্ট্র হবে সব ধর্মের লোকের ও যারা কোনো ধর্ম মানে না তাদের সকলের জাতীয় রাষ্ট্র, কারো সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নয়। হিন্দুর একার নয়, মুসলমানের একার নয়, শিখের একার নয়, নাস্তিকের একার নয়, সকলের। তাই একে বলা হলো সেকুলার স্টেট। যে রাষ্ট্র কোনো একটি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয়। ধর্ম জিনিসটার সঙ্গেই যুক্ত নয়। অথচ ধর্ম-বিরোধীও নয়।

এই সিদ্ধান্ত যে ধার্মিকদের মনে লাগবে এটা তখন থেকেই আমরা জানি। জীবনের পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের লবণ যে ধর্ম সেই লবণই যদি না থাকে তবে সব বিস্বাদ। কিছুই মুখে দেওয়া যায় না। এরকম একটা সিদ্ধান্ত কে চেয়েছিল? কবে চেয়েছিল? কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো সিদ্ধান্ত সেদিন সম্ভব ছিল না। আজকের দিনেও সম্ভব নয়। এ বিষয়ে একটু দুর্বলতা দেখালে মাস্টার তারা সিং শিখিস্থান দাবী করবেন। নাগাদের বিদ্রোহ আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। কাশ্মীর তো হাতছাড়া হবেই।

সব ধর্মের লোক একমত হলে এ রাষ্ট্র ধর্মরাষ্ট্র হতে পারত, সেকুলার স্টেট হতো না। কিন্তু সেরূপ সিদ্ধান্ত অধিকাংশের ভোটে নেওয়া যায় না। গণতন্ত্রে অধিকাংশের ভোটই রীতি, কিন্তু ধর্মের বেলা ভাষার বেলা নয়। এ কথাটা হিন্দু ও হিন্দীওয়ালাদের সমঝানো শক্ত। মুসলমানরা তো অবুঝ। তার সাক্ষী পাকিস্তানের ইসলামী রাষ্ট্র।

ইসলামী রাষ্ট্র পত্তন করে বা পুনঃপ্রবর্তন করে আধ্যাত্মিক লাভ কতটুকু হয়েছে জানিনে। রাজনৈতিক অনর্থ তার চেয়ে ঢের বেশী। হিন্দুদের বিতাড়ন করার পর আহমদিয়াদের পালা। তাদের নিপাত করার পর শিয়াদের পালা। এমনি করতে করতে একদিন সেনাপতির একনায়কত্ব ও রাজনীতিকদের অরণ্যবাস। পাকিস্তান 'ধর্ম' 'ধর্ম' করে এমন কিছু মহৎ দৃষ্টান্ত দেখায়নি যে আমরা সবাই ধর্মরাষ্ট্রের জন্যে ব্যাকুল হব। এই ব্যাকুলতাটা ঈশ্বরের জন্যে হলে অধ্যাত্মমার্গে অগ্রসর হওয়া নিশ্চিত। ঈশ্বরের জন্যে না হয়ে বিশেষ একটা ধর্মের জন্যে হলেও তবু কথা ছিল, কিন্তু বিশেষ একটা ধর্মের চেয়ে বড় হয়েছে তার দোহাই দিয়ে রাষ্ট্র ও তার আনুষঙ্গিক ক্ষমতা ও পৃষ্ঠপোষকতা। ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে অধিকাংশের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার একটা ফন্দী। পাকিস্তানীরাও ক্রমে এটা বুঝছে। একদিন ওদের রাষ্ট্রও সেকুলার হবে। তা বলে ওরা ধর্মহীন হবে না।

রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হলে মানুষ ধর্মহীন হবে, এটা ভ্রান্ত ধারণা। ধর্ম-হীনতার অন্য অনেক কারণ আছে। আধুনিক যুগ রাষ্ট্রকে ধর্মের অচলায়তন থেকে উদ্ধার করে দেশ-বিদেশের মানুষকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছে। কেউ কেউ স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারে পরিণত করেছে বলে স্বাধীনতা নিরর্থক হয়নি। স্বাধীনতাও একপ্রকার ধর্ম।

সমাজও সেকুলার হবে

সেদিন আমার এক ইংরেজ বন্ধু পূর্ব পাকিস্তানে ঘোরাঘুরি করে এসে বললেন, "ওখানকার মুসলমানদের মনোভাব যেমন সেকুলার এখানকার হিন্দুদের মনোভাব তেমন সেকুলার নয়। ভারত নামেই সেকুলার স্টেট। পাকিস্তান নামেই ইসলামিক স্টেট। নাম দেখব না কাম দেখব ?"

আমি মেনে নিতে পারলুম না যে ভারত নামেই সেকুলার স্টেট। কিন্তু তর্ক করতে করতে একটা জায়গায় পৌঁছলুম যখন আমাকে মানতেই হলো যে আমাদের রাষ্ট্র সেকুলার হলেও আমাদের সমাজ সেকুলার নয়। তখন আমার বন্ধু আমাকে চেপে ধরলেন। বললেন, "সমাজ সেকুলার না হলে রাষ্ট্র সেকুলার হবে কী করে ?"

কথাটা অযথা নয়। রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক আচরণে যদি হিন্দু মুসলমান ভেদবুদ্ধি পরস্পরকে আঘাত করে, অপমান করে তা হলে রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি কোনো রকমে জোড়াতালি দিয়ে উপস্থিত কিছু কাজ হাসিল করলেও আখেরে ভেদবুদ্ধির কাছে পরাস্ত হবে।

হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান এক মায়ের সন্তান আমার কাছে এটা প্রত্যক্ষ সত্য। বার বার দাঙ্গা বাধলেও, বার বার পার্টিশন হলেও, লক্ষ লক্ষ মানুষ উচ্ছেদ হলেও এই প্রত্যক্ষ সত্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্যই থাকবে। অসত্যে পরিণত হবে না। হয়তো সাময়িকভাবে অসত্যের জয় হবে। তার উপায় নেই। ভেদবুদ্ধির হাত থেকে উদ্ধার না পেলে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়, আপনার লোক পর হয়ে যায়। এর স্থায়ী প্রতিকার ভেদবুদ্ধিকে অতিক্রম করা। কে হিন্দু কে মুসলমান কে খ্রীস্টান কে শিখ মনে না আনা।

সামাজিক আচরণেও ভাই ভাই হতে হবে। আঘাত প্রত্যাঘাত ঝেড়ে ফেলতে হবে। আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কী না হয়েছে! অথচ যেখানে মুসলমানের সংখ্যা মুষ্টিমেয় সেখানেও হিন্দুর মন্দির ও মুসলমানের মসজিদ পাশাপাশি দেখা যায়। তেমনি যেখানে হিন্দুর সংখ্যা আঙুলে গোনা যায় সেখানেও মসজিদ ও মন্দির পাশাপাশি। হিন্দু সেবায়েৎ রসুলের কদম সযত্নে রক্ষা করছে, পীরের দরগায় চেরাগ দিচ্ছে এসব আমার স্বচক্ষে দেখা। আর কালী-ভক্ত মুসলমান, কৃষ্ণভক্ত মুসলমানও বাংলা সাহিত্যে ও বাংলার জীবনে অনেক।

"রোটি আওর বেটি" নিয়ে কারো সঙ্গে কারো মিটমাট হয়নি। না মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর, না শূদ্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণের, না প্রজার সঙ্গে জমিদারের, না আশরাফের সঙ্গে আতরাপের। দেশকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না করলে, আধুনিক শিল্পবাণিজ্যের দুরমুশ দিয়ে না পেটালে, হয়তো বিপ্লবের প্লাবনে না ভাসালে সামাজিক গোঁড়ামি সহজে যাবে না। তবে এটা একদিন যাবেই। সমাজও সেকুলার হবে।

খ্রীস্টানুসরণ

খ্রীস্টধর্মের প্রতি আমার একটা নাড়ির টান আছে। কারণ আমার নাড়ি কাটার সময় যিনি উপস্থিত ছিলেন তিনি আমাদের রাজসরকারের লেডি ডাক্তার মিসেস অ্যান্ডারসন। ইনি রোজ আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে রাজবাড়ী যাওয়া আসা করতেন ও মাঝে মাঝে গাড়ী থামিয়ে আমাদের খোঁজ-খবর নিতেন। এঁর স্বামীও কখনো কখনো আমাদের বাড়ী এসে বাবার সঙ্গে গল্প করতেন। আমরাও কখনো কখনো এঁদের বাংলায় গিয়ে তখনকার দিনে দুর্লভ কেক খেয়ে আসতুম।

এছাড়া ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী জন চৌধুরী। এঁদের বাড়ীর একটি ছেলেকে মনে আছে, তার নাম ললিত। আর একটু দূরে স্যামুয়েল মহাপাত্র। কিছুকাল আমাদের পোস্টমাস্টার ছিলেন সাইমন সাহু। আমার বাবা স্বয়ং নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হলেও অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে উদার ছিলেন। তাই আমাদের বাড়ীতে সব ধর্মের লোক সব সময় আসতেন যেতেন। বাবা একবার আমাকে বলেছিলেন, "এতগুলো জাত যদি এদেশে থাকতে পারে তবে ইংরেজরা কেন পারবে না? থাকুক না ওরা এদেশের লোক হয়ে। আর একটা জাত হিসাবে। ওদের যেতে বলছে কে? দেশ ছেড়ে দিতে বলা হচ্ছে না, রাজত্ব ছেড়ে দিতে বলা হচ্ছে।"

সর্ব ধর্ম সমন্বয় খুব বড়ো কথা। কিন্তু সর্ব ধর্মে আগ্রহ তেমন কিছু বড়ো কথা নয়। ছেলেবেলায় আমার এক কাকা আমাকে "যিশুখ্রীস্ট" উপহার দেন। আর এক কাকা আমাকে ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়ের গির্জায় নিয়ে যান। সেখানে আমরা উপাসনায় যোগ দিই, কমিউনিয়নের শরিক হই। বলতে গেলে খ্রীস্টের সঙ্গে একদেহ একপ্রাণ হয়ে যাই। এই কাক পরীক্ষায় পাশ করে বাইবেল সোসাইটি থেকে একখানি 'হোলি বাইবেল' পেয়েছিলেন। বইখানি আমার কৌতূহল জাগিয়েছিল। কিন্তু ইংরেজীজ্ঞান তখন এতদূর ছিল না যে অর্থ বুঝি।

পরবর্তী বয়সে ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর দিয়ে ইংরেজদের ধর্ম, ইউরোপীয় সাহিত্য ও ইতিহাস ও আর্টের ভিতর দিয়ে ইউরোপীয়দের ধর্ম আমার মর্মে প্রবেশ করে। তার সঙ্গে আমি একপ্রকার আত্মীয়তা অনুভব করি। তা বলে আমি আমার ভারতীয় উত্তরাধিকার ভুলে যাইনে বা ত্যাগ করিনে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আমি উপনিষদের মধ্যে আপনার ধর্ম খুঁজে পাই। সঙ্গে সঙ্গে সব ধর্মের থেকে সার সংগ্রহ করি। নিজের আত্মিক প্রয়োজনে। আমার স্বধর্ম বলতে এক কথায় কী বোঝায় তা এখনো স্থির হলো না। সাধারণ হিন্দুর সঙ্গে আমার মিলও আছে, অমিলও আছে। তেমনি সাধারণ খ্রীস্টানের সঙ্গে, মুসলমানের সঙ্গে, বৌদ্ধের সঙ্গে। প্রত্যেক ধর্মে আমি সত্যের মুখ দেখতে পাই, যেমন প্রত্যেক আর্টে সৌন্দর্যের মুখ। "এটা আপনার, ওটা পরের", এমন উক্তি যাদের মানায় তাদের মানায়, কিন্তু আমার মানায় না।

সব ধর্মই কতক পরিমাণে আমার ধর্ম। হিন্দুধর্মের সবটাই যে আমার তাও নয়। দেবদেবীর পূজা আমি ছেলেবেলায় বিশ্বাসভরে করেছি। পরে তাতে অবিশ্বাস এসে যায়। তেমনি অবতারবাদ আমি পরবর্তী বয়সে বাদ দিই। গুরুবাদ পুরোহিতবাদ আমার কাছে পরিত্যক্ত হয়। জাতিভেদ আমি মানিনে। বিবাহের সময় ধর্মভেদও অতিক্রম করি। আমার সহধর্মিণী খ্রীস্টান কন্যা। বিয়ের পর যদিও পঁয়ত্রিশ বছর কেটে গেছে তবু আমরা কেউ কারো ধর্মে হাত দিইনি। তবে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছি। ইচ্ছা থাকলেই উপায় থাকে।

খ্রীস্টের ধর্ম প্রেমধর্ম। তাঁর অনুজ্ঞা দুটি কথায় ব্যক্ত হয়েছে। ঈশ্বরকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে, সমস্ত মন দিয়ে, সমস্ত আত্মা দিয়ে ভালোবাসবে। আর প্রতিবেশীকে আপনার মতো ভালোবাসবে। প্রেমের দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই দেখিয়েছেন। সে দৃষ্টান্ত অনির্বাণ দীপশিখার মতো হাজার হাজার বছর ধরে জ্বলছে ও জ্বলতে থাকবে।

তারপর তাঁর অপর অনুজ্ঞা, ঈশ্বরের রাজ্যের অন্বেষণ কর। আর সবই তোমার জুটে যাবে। ঈশ্বরের রাজ্য যেমন অন্তরে তেমনি বাইরে। এই পৃথিবীতেই সে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মানুষের উপরে যীশু বরাত দিয়ে গেছেন প্রেমরাজ্য স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নিয়ে আসতে। সকলেই যদি তাঁর মতো হতো তা হলে এই মর্ত্যই স্বর্গ হয়ে উঠত। সকলেই যদি তাঁর অনুসরণ করত তা হলে অন্তত খ্রীস্টীয় দেশগুলি এই দু'হাজার বছরে স্বর্গ হয়ে যেত। কিন্তু তেমন কিছু তো হয়নি। হবার সম্ভাবনা অবশ্য যায়নি। দু'হাজার বছরে যা সম্ভব হলো না পাঁচ হাজার বছরে হয়তো হবে। ইচ্ছা করলে এই শতাব্দীতেই হয়। যদি ব্যাপকভাবে ও গভীরভাবে অন্তঃপরিবর্তন ঘটে।

অন্তঃপরিবর্তন যে-কোনো দিন যে-কোনো লোকের ঘটতে পারে। এক একটা জাতির বা দেশেরও ঘটতে পারে। ঘটলে পরে দেখা যাবে যে প্রেমের পরশমণি লেগে সব কিছু সোনা হয়ে গেছে ; আক্ষরিক অর্থে নয় অবশ্য। কন্‌ভারসন বলতে অন্তঃপরিবর্তনই বোঝায়, সেইসূত্রে জীবনের রূপান্তর। ব্যক্তিগত তথা সমষ্টিগত। সংখ্যাবৃদ্ধি বা শক্তিবৃদ্ধির জন্যে যে কন্‌ভারসন তাতে সংখ্যাও বাড়ে, শক্তিও বাড়ে, কিন্তু রূপান্তর ঘটে না। ভারতে বা ভারতের বাইরে ধর্মবিস্তার যতদূর সম্ভব ততদূর হয়েছে। আর হবে না। এখন থেকে খ্রীস্টানদের দৃষ্টি বহির্মুখী না হয়ে অন্তর্মুখী হোক। তাঁরা খ্রীস্টানুসরণ করে ঈশ্বরের রাজ্যকে আরো কাছে নিয়ে আসুন, যা দেখে আর সকলে তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে।

খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক পর্তুগীজ আগমনের বহুপূর্বে। শোনা যায় যীশুর সাক্ষাৎ শিষ্য সেণ্ট টমাস দক্ষিণ ভারতে এসে খ্রীস্টীয় উপাসনা প্রবর্তন করেন। অন্তত এটা তো ঠিক যে কেরলের খ্রীস্টীয় উপাসকমণ্ডলীর অবস্থিতি দেড় হাজার বছর ধরে। এদের সম্পর্ক ইউরোপের সঙ্গে নয়,

সীরিয়ার সঙ্গে। আধুনিক যুগে ইউরোপ ও খ্রীস্টধর্ম এমনভাবে একাকার হয়ে গেছে যে, লোকে খ্রীস্টানুসরণ বলতে বোঝে ইউরোপানুসরণ। এতে ভারতীয় খ্রীস্টানদের লাভ যত হয়েছে ক্ষতি তার চেয়ে কম নয়। ইউরোপ আমাদের তুলনায় দরিদ্র ছিল, এখন ধনবান হয়েছে। আমাদের তুলনায় দুর্বল ছিল, এখন বলবান হয়েছে। আমাদের তুলনায় অজ্ঞ ছিল, এখন জ্ঞানবান হয়েছে। এসব দেখে লোকে ইউরোপের অনুসরণ করতে চায়। সেটা কিন্তু খ্রীস্টানুসরণ নয়। ইউরোপের অনুসরণ একদিন শেষ হয়ে যাবে, তখন আরম্ভ হয়ে যাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের অনুসরণ। তখন যারা ইউরোপবিমুখ তারা কি খ্রীস্টবিমুখ হবে না? সে আশংকা খাস ইউরোপেই লক্ষিত হচ্ছে। কমিউনিজমের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করলে পূর্ব ইউরোপের মতো পশ্চিম ইউরোপও লাল হয়ে যেতে পারে। অথচ কমিউনিজমের উত্তর পরমাণু বোমা নয়, কন্‌স্‌ক্রিপশন নয়।

এদেশেই বরং কমিউনিজমের উত্তর দেবার একটি মহান প্রয়াস দেখা যায়। খ্রীস্টীয় প্রেরণা তার মূলে। অপ্রতিরোধ বা সাত্ত্বিক প্রতিরোধ খ্রীস্ট কেবল প্রচার করে ক্ষান্ত হননি, নিজের জীবনে ও নিজের মরণে প্রমাণ করেছেন। গান্ধীজীর পরিভাষায় এরই নাম সত্যাগ্রহ। তিনিও কেবল প্রচার করে ক্ষান্ত থাকেননি, জীবনে ও মরণে প্রতিপন্ন করেছেন। খ্রীস্টের দৃষ্টান্ত ও বাণী গান্ধীজীকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর ঘরে একখানি মাত্র আলেখ্য দেখা যেত। সেখানি যীশুখ্রীস্টের। কথায় কথায় তিনি বাইবেল থেকে উদ্ধার করতেন। যদিও তাঁর আশ্রয়গ্রন্থ গীতা তবু বাইবেলের সঙ্গে সত্যাগ্রহ দর্শনের সান্নিধ্য ও সাদৃশ্য আরো বেশী। টলস্টয়ের ব্যাখ্যা পড়ে তিনি অপ্রতিরোধ বা সাত্ত্বিক প্রতিরোধ তত্ত্বে বিশ্বাসী হন। পরে রাস্‌কিনের "Uhto this Last" পড়ে নিজের জীবনযাপনের ধারা পরিবর্তন করেন। এ গ্রন্থের গান্ধীকৃত অনুবাদের নাম "সর্বোদয়"। সর্বোদয় আন্দোলন সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় অধ্যায়রূপে গান্ধীশিষ্য বিনোবাজীর কল্যাণে ভারতব্যাপী হয়েছে। কিন্তু এর মূলেও খ্রীস্টীয় প্রেরণা। দীনতম জনেরও শ্রমে ও পারিশ্রমিকে সমান অধিকার আছে।

"I will gi ve unto this last even as unto thee."

ভারতের মতো প্রাচীন ও বিরাট একটি ভূখণ্ড খ্রীস্টীয় প্রেরণায় খ্রীস্টান না হোক, সত্যাগ্রহী ও সর্বোদয়ী হতে পারে। বহুপরিমাণে হয়েছেও। এই যে হওয়া এটা বড়ো সামান্য কথা নয়। কই, আর কোনো ভূখণ্ড তো হয়নি। খ্রীস্ট তাঁর নিজের কাজ অপরের দ্বারা হচ্ছে দেখলে সানন্দে আশীর্বাদ করতেন। আমরা তাঁর প্রিয় কৃত্যই করছি।

(শ্রীহেমেন্দ্র মল্লিককে লিখিত পত্র)

ভাষা প্রসঙ্গে

আমি সংকল্প করেছি যে রাজনীতি নিয়ে লেখা আর নয়। এক জীবনের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। এর ঊর্ধ্বে যদি না উঠতে পারি কোনো মহৎ কাজই আমার হাত দিয়ে হবে না। অবশ্য রাজনীতি বলতে এখানে বুঝতে হবে যা সাহিত্যের দিক থেকে বুনিরাদী নয়। একপ্রকার রাজনীতি আছে যা না থাকলে সাহিত্য দাঁড়াতে পারে না। তার নাম চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, আপনার মতো করে বাঁচার স্বাধীনতা। যাকে বলে সিভিল লিবার্টি তা যদি কোনো দিন বিপন্ন হয় সাহিত্যও বিপন্ন হবে। তেমন দুর্দিন যদি আসে তা হলে আমি উদাসীন থাকব না।

তেমনি আর একপ্রকার রাজনীতি আছে যা মহাস্থবির বারট্রান্ড রাসেলকে জেলে নিয়ে গেছে। পরমাণবিক বোমায় মানুষের জীবন মানবজাতির জীবন বিপন্ন। তিনি এই বিপদের আসন্নতা সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করছেন, তাই সমস্ত সত্তা দিয়ে প্রতিরোধ করছেন। শুধু লেখা দিয়ে নয়। আমার কাছে এটা এখনো সত্য হয়নি, আমি বোমার মুখে বাস করছিনে এবং আমাদের দেশ পরমাণবিক বোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এক হিসাবে রাসেলের কাজই করছে। ভারতবর্ষের মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিলে ভারতীয় সাহিত্যিককেও রাসেলের মতো সক্রিয় হতে হবে। তেমন অবস্থায় পড়লে আমাকেও রাজনীতি নিয়ে লিখতে হবে। কারণ এটাও সাহিত্যের দিক থেকে বুনিয়াদী। মানুষই যদি না থাকল তবে সাহিত্য লিখবে কে? পড়বে কে?

আরো অনেক রকম রাজনীতি আছে। তার মধ্যে কোনোটি বুনিয়াদী, কোনোটি বুনিয়াদী নয়। দেশের লোক যদি জংলী বনে যায়, যে যার হাতে আইন কানুনের ভার নেয়, ধর্মের নামে বা ভাষার নামে হন্যে হয়ে ওঠে বা শ্রেণীসংঘর্ষে মাতে, তা হলেও সাহিত্যের গোড়া আলগা হয়ে যায়। যদি দক্ষিণ আফ্রিকার মতো বর্ণান্ধ হয়, যদি আইনকেও সেই বর্ণান্ধতার বাহন করে তা হলেও সাহিত্যের ভিত্তিমূল নড়ে। সাহিত্যিক তখন কার জন্যে কী সৃষ্টি করবে? সাহিত্যের দিক থেকে এগুলিও বুনিয়াদী।

আপনি আমার কাছে চেয়েছেন ভাষাসমস্যা নিয়ে লেখা। আমি তা নিয়ে বিস্তর লিখেছি। পুনরুক্তি সাহিত্যিকের ধর্ম নয়। কিন্তু আসল কথা হলো আমি বুঝতে পেরেছি যে ধর্মের মতো ভাষাও একপ্রকার রাজনীতি। অথচ সাহিত্যের দিক থেকে বুনিয়াদী রাজনীতি নয়। এ কথা ঠিক যে ভাষা না হলে সাহিত্য হয় না, আগে ভাষা তার পরে সাহিত্য। কিন্তু যা নিয়ে আমরা সকলে উত্তেজিত, যার জন্যে মাস্টার তারা সিং ত্রিশ দিনের উপর অনশন করছেন, তা সাহিত্যের দিক থেকে বুনিয়াদী নয়। বাংলা যখন সরকারী ভাষা ছিল না তখনো বাংলা সাহিত্য ছিল, যদি সরকারী ভাষা না হয় তা হলেও বাংলা সাহিত্য থাকবে। সরকারী ভাষা হওয়াটা জনসাধারণের পক্ষে দরকারী হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিকের দিক থেকে বুনিয়াদী নয়। সরকারী ভাষা

হওয়ার সঙ্গে মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দানাপানির প্রশ্নও। কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির দিক থেকে সরকারী ভাষার এমন কোনো সার্থকতা নেই যাকে বলা যেতে পারে বুনিয়াদী। বরং বিপরীতটাই সত্য বলে মনে হয়। এক কালে ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র ছিলুম, ইংরেজী ভাষায় সাহিত্যিক প্রবন্ধ লিখেছি। পরবর্তী কালে সরকারী চাকরিতে ঢুকে সরকারী ইংরেজী লিখেছি, সাহিত্যিক ইংরেজী ভুলেছি। হাত একবার নষ্ট হয়ে গেলে আর ফেরে না। এ দশা ঘটেছে বহু ইংরেজেরও। ইংরেজী যদিও তাদের মাতৃভাষা তবু সাহিত্যিক ইংরেজী ও সরকারী ইংরেজী বা সওদাগরি ইংরেজী এক নয়। একবার হাত খারাপ হলে আর ভালো হয় না। বাংলা যদিও সরকারী ভাষা বলে ঘোষিত হয়নি তবু গত দেড় শতাব্দী ধরে দ্বিতীয় সরকারী ভাষা বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। আদালতের ভাষা বলে মর্যাদাও পেয়ে এসেছে। ইংরেজ সিভিলিয়ান ইত্যাদিকে সেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আমল থেকেই বাংলা শিখতে ও বাংলা ভাষায় পরীক্ষা দিতে হতো। সরকার থেকে বিস্তর বাংলা পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশিত হতো। বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণা প্রচারিত হতো। সরকারী ইংরেজীর মতো সরকারী বাংলা বলেও একটা পদার্থ ছিল। সে ভাষা এমন ভাষা যে তাতে একবার সিদ্ধহস্ত হলে আর আমাকে সাহিত্যিক হতে হতো না। সাহিত্যের হাত নষ্ট হয়ে যেত।

সারস্বত বাংলা ও সরকারী বাংলা এক ভাষা হলেও একই জিনিস নয়। আমরা সাহিত্যসাধকরা রসের জন্যে সৌন্দর্যের জন্যে মানুষের মুখ থেকে কথা বেছে নিয়ে সাহিত্যের ভাষা গড়ি। আর ওঁরা সরকারী লোকরা বিষয়-কর্মের জন্যে ইউটিলিটির জন্যে অভিধান থেকে আইনের বই থেকে শব্দসংগ্রহ করে ভাষা গড়েন। এতদিন ইংরেজী ছিল বলে জোর কদমে হয়নি। এবার হিন্দীর সঙ্গে পা মিলিয়ে তড়িৎ গতিতে হবে। এতে নিরানন্দের কী আছে? তবু আমি পুষ্পবৃষ্টি করতে পারছিনে। কারণ ইংরেজ আমলে সরকারী বাংলায় বাঙালী সাহিত্যিকদের দশটা পাঁচটা কলম পিষতে হয়নি। তাঁরা ইংরেজী ভাষায় দরকারী কাজ করে বাংলা ভাষায় সৃষ্টির কাজ করেছেন! এবার থেকে সরকারী বাংলার পেশাদার কলমচী হয়ে দরকারী কাজ করতে গিয়ে দেখবেন হাতটি খারাপ হয়ে গেছে। আর তা দিয়ে সৃষ্টির কাজ হচ্ছে না। যঃ পলায়তি স জীবতি। সারস্বত বাংলার জন্যে সরকারী বাংলা ও সরকারী বাংলো দুই ছাড়তে হবে। সে আর ক'জন পারবেন!

তা বলে আমি বাংলা ভাষার সরকারী মর্যাদাপ্রাপ্তির বিপক্ষে নই। স্বাধীন দেশে জনগণের ভাষাই সরকারী ভাষা হয়। ইংরেজরাও এটা মানত বলে বাংলাকে আংশিকভাবে সরকারী ভাষা করেছিল। জনগণের বেশীর ভাগ কাজই তো আদালতে। সেখানকার সরকারস্বীকৃত ভাষা ছিল বাংলা। এবার আমরা জনগণের ভাষাকে রাজ্যের যাবতীয় সরকারী কার্যের ভাষা করতে যাচ্ছি। এর পরের ধাপ রাষ্ট্রের কতক সরকারী কার্যের ভাষা করতে চাওয়া। তরে পরের ধাপ প্রতিবেশী রাজ্যে যেসব বাঙালীর বাস তাঁদের

উভয়সঙ্কটের সর্বসম্মত সমাধান আবিষ্কার করা। বোঝা যাচ্ছে এই শেষের ধাপটিই সব চেয়ে কঠিন। খবরের কাগজে গরম গরম প্রবন্ধ লিখে, আইন-সভায় গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে, তথাকথিত সত্যাগ্রহে নেমে গুলী খেয়ে একের ইচ্ছাকে অপরের উপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। না, আমরণ অনশনেও কোনো ফল হবে না। একের ইচ্ছার সঙ্গে অপরের ইচ্ছার সামঞ্জস্যের সূত্র খুঁজে বার করতে হবে। আর নয় তো ভারতের বাইরে আর একটা পাকিস্তান রচনার জন্যে জান মাল কবুল করতে হবে। আশা করি তেমন দুর্বুদ্ধি কারো হবে না।

ভারতবর্ষ এমন একটি আইডিয়া যার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। হেথায় আর্য হেথা অনার্য, হেথায় হিন্দু হেথা মুসলিম, হেথায় বাঙালী হেথা অসমীয়া এবং হেথায় হিন্দী হেথা ইংরেজী প্রাচীন ও আধুনিক বিভিন্ন ও বিরোধী ধাতু আছে ও থাকবে। সামঞ্জস্যের জন্যে কি কেউ জান মাল কবুল করবে না? কেন কাউকে বহিষ্কার করা হবে? কেন কেউ স্বেচ্ছায় বহিষ্কৃত হতে চাইবে? বহিষ্কার মানে ভারতবর্ষের ব্যর্থতা। আমি সার্থকতার স্বপ্নই দেখি। প্রেম যেদিন বলবান হবে সেদিন পাকিস্তানও সাড়া দেবে।

শান্তিনিকেতন, ১৭ই সেপটেম্বর,

("জয়শ্রী" সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লীলা রায়কে লিখিত পত্র)

মাধ্যমের প্রশ্ন

আজকাল আমাদের স্কুলগুলোতে ইংরেজী শিক্ষকের অভাব। ছেলেদেরও ইংরেজী শিক্ষায় অরুচি। ফলে তারা এক ধার থেকে ফেল করে। কিংবা কলেজে গিয়ে হাবুডুবু খায়। তাদের দুর্দশা দেখে সহজেই এ কথা মনে আসে যে মাধ্যম যদি ইংরেজী না হয়ে মাতৃভাষা হয় তা হলেই তারা উদ্ধার পায়। একবার এ রকম একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলে এর পক্ষে জোরালো ও জবরদস্ত যুক্তি খাড়া করা কঠিন নয়। ভোটের জোরে এ রকম একটা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেওয়াও দুরূহ নয়।

তা হলে আটকাচ্ছে কোথায়? প্রথমত আটকাচ্ছে এইখানে যে এরা কেউ কাব্যতীর্থ বা বিজ্ঞানবাচস্পতি উপাধি নিয়ে সন্তুষ্ট হবে না। এরা চাইবে বি. এ., বি. এসসি. এম. এ., এম. এস-সি. ডিগ্রী। এসব ডিগ্রীর একটা আন্তর্জাতিক মান ও মর্যাদা আছে। সেই মান সুরক্ষিত না হলে সেই মর্যাদাও থাকে না। সেই মান সুরক্ষিত হবে কি না এটা বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারেন। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। এর নিষ্পত্তি ভোটের জোরে হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত আটকাচ্ছে এইখানে। ভারতীয়মাত্রেরই অধিকার ভারতের

সর্বত্র শিক্ষার সুযোগ লাভ। যারা ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষার্থী তারা সর্বত্রচারী। যারা বাংলা বা অসমীয়া বা ওড়িয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তাদের দৌড় তত দূর নয়। তারা যদি স্বেচ্ছায় কোণঠাসা হয় তবে তাদের ভবিষ্যৎও কোণঠাসা হবে। অপর পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে যেসব পাঞ্জাবী বা তামিল বা গুজরাতী ছাত্র আছে তারা দাবী করবে তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে তাদের দাবী অযথা নয়। এতদিন সবাইকে একসূত্রে গ্রথিত করার মতো একটা সূত্র ছিল। এখন এক এক কলেজে এক এক ভাষা হবে মাধ্যম। পরীক্ষারও মাধ্যম হবে এক আধ ডজন। হট্টগোল অনিবার্য।

তৃতীয়ত আটকাচ্ছে অদৃশ্য একটি জায়গায়। কলকাতার মতো সর্বভারতীয় নগরে যদি সাত আটটি মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয় ও তার ফলে যদি বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তবে লোকে একদিন অতিষ্ঠ হয়ে বলবে, "এর চেয়ে হিন্দী ভালো!" হিন্দীমাধ্যম কলেজগুলিতেই ছাত্রের ভিড় হবে। শেষে কেন্দ্রীয় সরকার একটা হিন্দীমাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবেন। নিখিল ভারতীয় সংহতির ধুয়ো ধরে পার্লামেণ্ট তাঁদের সমর্থন করবেন। ইংরেজীর স্থান নেবে হিন্দী। অনেকের বিশ্বাস এতে সংহতিরই ক্ষতি হবে। সংহতির না হোক আধুনিকতার ক্ষতি হবে। হিন্দী এখনো আধুনিক চিন্তার বাহন হিসেবে দুর্বল।

শান্তিনিকেতন, ২১শে জুন

শ্রীআশিস সান্যালকে লেখা চিঠি)

জাতীয় সংহতি

স্বাধীনতার সংগ্রাম যতদিন চলছিল ততদিন আমরা আর কোনো দিকে দৃষ্টি দেবার সময় পাইনি। দিলে একাগ্রতা নষ্ট হতো। সংগ্রাম লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো। যখনি যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তখনি তাকে স্থগিত রাখতে হয়েছে। কিংবা তার এমন একটা সমাধান খুঁজে বার করতে হয়েছে যার দ্বারা সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। এই যেমন গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলন।

স্বাধীনতার পরে এক এক করে পাওনাদার হাজির হচ্ছে। একজন পাওনাদার তো স্বাধীনতা পর্যন্ত সবুর করবে না। স্বাধীনতার আগেই তার পাওনা আদায় করে নেবে। ছলে বলে কৌশলে। বছর খানেক মারামারি করার পর এই স্থির হলো যে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে তার পাকিস্তান দেওয়া হবে। দেরি করলে স্বাধীনতা মিলত, কিন্তু শান্তি মিলত না। গৃহযুদ্ধের ভিতর দিয়ে যেতে হতো। যুদ্ধমাত্রেরই পরিণাম অনিশ্চিত। গৃহযুদ্ধের পরিণাম সুনিশ্চিত নয় দেখেই নেতারা দেশ ভাগাভাগিতে রাজী হয়ে যান। তা হলে অন্তত কতক অংশ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব।

স্বাধীনতার পরে আরো এক ঝাঁক পাওনাদার এসে রাজ্য দাবী করে। বেশীদিন তাদের ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তাই তেলেগুদের ঠাণ্ডা করার জন্যে অন্ধ্র, তামিলদের ঠাণ্ডা করার জন্যে মাদ্রাজ, কন্নাডিগদের ঠাণ্ডা করার জন্যে মৈশুর, মালয়ালীদের ঠাণ্ডা করার জন্যে কেরল ইত্যাদি রাজ্য গঠিত বা পুনর্গঠিত হয়। এতদিনে প্রায় সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারা গেছে, কেবল পাঞ্জাবী সুবার দাবীদারদের নয়। পাহাড়ী সুবার দাবীদারও জুটেছে দেখছি।

মনে করা গেছল এর পরে আর গোলমাল বাধবে না। কিন্তু মাদ্রাজ হঠাৎ একদিন তামিলকে তার সরকারী ভাষা বলে ঘোষণা করল। তার পর থেকে একে একে প্রত্যেকটি রাজ্যই একটি ভাষাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দিয়ে রাজ্যস্থিত অন্যান্য ভাষাকে উপেক্ষা করে আসছে। এই নিয়ে আসামে ঘোরতর হাঙ্গামা বেধে গেল।

তখন থেকেই জাতীয় সংহতির নামে হৈ চৈ শোনা যাচ্ছে। একটা চীনা-মাটির বাসনকে ভেঙে টুকরো টুকরো করার পর জোড়া দেওয়া যেমন সংহতি এটাও তেমনি। ভাঙতেই বা বলেছিল কে? জুড়তেই বা কে বলছে? এসব বিষয়ে আগে চিন্তা করা উচিত ছিল। কিন্তু ভাষাগত সংখ্যাগুরুদের দাপটে তা পারা যায়নি। একে তো তাদের হাতেই অধিকসংখ্যক ভোট। তার উপর তথাকথিত সত্যাগ্রহ নামক একটি অস্ত্র। একজন 'সত্যগ্রহী' তো অনশনেই মারা যান। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় রেললাইন ধ্বংস ইত্যাদি 'অহিংস' কার্যকলাপ। যার তালিম নেওয়া হয়েছিল ১৯৪২ সালের অগাস্ট মাসে।

এখন সংখ্যালঘুদের দিক থেকে ভাববার সময় এসেছে। তামিল যদি সরকারী ভাষা হয় তবে তার মানে দাঁড়ায় তেলেগুদের বাধ্য হয়ে তামিল শিখতে হবে, তামিল শিখে তামিলদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে, আর নয়তো মানে মানে মাদ্রাজ রাজ্য ত্যাগ করে অন্ধ্র প্রদেশে আশ্রয় নিতে হবে। বলা বাহুল্য সেখানে গিয়ে তারা চুপ করে বসে থাকবে না। কাঁদুনী গাইবে, প্ররোচনা দেবে, ঘরবাড়ী জ্বালাবে, তামিলদের ভাগাবে। এমনি করে লোকবিনিময় ঘটবে। একই ব্যাপার দেখা দেবে গুজরাতে ও মহারাষ্ট্রে, মহারাষ্ট্রে ও মৈশুরে, বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গে। কোথাও এক জায়গায় দাঁড়ি না টানলে গুজরাত হবে মরাঠাশূন্য, মাদ্রাজ হবে তেলেগু শূন্য, অন্ধ্রপ্রদেশ হবে তামিলশূন্য। এর নাম কি ভারত নামক এক নেশন? জাতীয়তাবাদের স্বরূপ কি এই? এই যদি হয় ভাবী ভারতের প্যাটার্ন তা হলে সৈন্যদলেও এর প্রতিফলন পড়বে। সৈন্যদল হবে স্বতোবিভক্ত ও দুর্বল। কেন্দ্রীয় সরকারকে পদে পদে ব্যালান্স করে পথ চলতে হবে। একটু এদিক ওদিক হলেই পদস্খলন। তার ফলে আরো একটা চীনামাটির বাসন পড়ে গিয়ে ভাঙবে। তার নাম ভারতীয় ইউনিয়ন।

সরকারী ভাষার পরের ধাপ শিক্ষার মাধ্যম। ইংরেজী মাধ্যম ইংরেজ

থাকতেই যথেষ্ট সংকুচিত হয়েছিল। এই পনেরো বছরে আরো হয়েছে। স্কুলের পড়া সাধারণত মাতৃভাষার মাধ্যমেই হয়। কলেজের পড়াও বহু রাজ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে হতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু মাতৃভাষা বলতে বোঝায় সংখ্যাগুরুদের মাতৃভাষা। সংখ্যালঘুরা যেখানে দলে ভারী সেখানে তাদের নিজেদের মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিচালিত স্কুলও দেখা যায়। কিন্তু সে রকম কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় দুর্লভ। কারণ স্কুল চালাবার মতো ধনবল ও জনবল সংখ্যালঘুদের যদি বা থাকে বিশ্ববিদ্যালয় চালাবার মতো নেই। সেক্ষেত্রে তাদের পক্ষে ইংরেজী মাধ্যমই সুবিধের। কিন্তু সংখ্যাগুরুরা ইংরেজী মাধ্যম বরদাস্ত করবার পাত্র নয়। সবাইকে জোর করে তাদের ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়ার দিকে তাদের ঝোঁক। মাঝখান থেকে হিন্দী গিয়ে ঢুকে পড়ছে। তার বাসনা ইংরেজীর স্থান সে-ই নেবে। কিন্তু হিন্দীও তো মাতৃভাষা নয় সংখ্যালঘুদের। আইনে তাকে ভারত সরকারের সরকারী ভাষার মহিমা দেওয়া হয়েছে। সে বলে সে জাতীয় ভাষা।

ভারতের শিক্ষামন্ত্রীর মুখে শোনা যাচ্ছে প্রত্যেক রাজ্যেই নাকি একটা করে ফেডারাল ইউনিভার্সিটি স্থাপন করা হবে। বলা বাহুল্য সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম হবে হিন্দী। কিন্তু সংখ্যালঘুরা যদি বলে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করা আমাদের জন্মগত অধিকার, সংবিধানেও এটা স্বীকৃত হয়েছে, হিন্দী আমাদের মাতৃভাষা নয়, আমরা আমাদের পাওনা এক পাউণ্ড মাংস চাই, যেমন চেয়েছে ও পেয়েছে সংখ্যাগুরুরা—তখন সেসব হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয় কার কোন্ কাজে লাগবে? মনে রাখতে হবে যে সংখ্যাগুরু হলেই একটা বিশেষ অধিকার জন্মায় না। আর সংখ্যালঘু হলেই ভারতীয় নাগরিকের সাধারণ অধিকার খর্ব হয় না। সব নাগরিকই ভারতীয় নাগরিক। সকলেই সমান অধিকারী। যথেষ্টসংখ্যক বাঙালী যদি বিহারে থাকে, তাদের নিয়ে একটা বিশ্ববিদ্যালয় যদি চলতে পারে, তবে সেই বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ন্যায্য পাওনা ও তার মাধ্যম হবে বাংলা।

স্থানীয় বাঙালীদের এ দাবি যদি রাজ্য সরকার না মেটান, যদি কেন্দ্রীয় সরকার উপেক্ষা করেন তা হলে তারা পশ্চিমবঙ্গে এসে ভিড় করবেই। নয়তো হিন্দী সাহিত্যসম্মেলনের দেখাদেখি বঙ্গসাহিত্যসম্মেলনও দাবী করবে যে পার্লামেণ্টে আইন পাশ করিয়ে তাকে বাংলা মাধ্যমে পরীক্ষা নেবার সনদ দেওয়া হোক, বি. এ., এম. এ. ইত্যাদি ডিগ্রী দেবার অধিকার দেওয়া হোক।

তখন হয়তো রব উঠবে, দেখ! দেখ! বাঙালীরা কেমন এক্স্ট্রাটেরিটোরিয়াল! কিন্তু হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনই বা এক্স্ট্রাটেরিটোরিয়াল নয় কেন? সংবিধানে হিন্দীকে অন্যতম আঞ্চলিক ভাষা বলেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যে কয়টি অনুচ্ছেদে তাকে সরকারী ভাষা করা হয়েছে সেই কয়টি নিতান্তই সরকারী কাজকর্ম সংক্রান্ত। শিক্ষা তার আমলে আসে না। সাহিত্যও না। হিন্দী সেই গণ্ডীর বাইরে আঞ্চলিক ভিন্ন আর কিছু নয়। হিন্দীর দাবী

যতই সর্বগ্রাসী হবে, নিছক আত্মরক্ষার খাতিরে মাতৃভাষার দাবীও ততই নাছোড়বান্দা হবে। বিশেষ করে তামিলের ও বাংলার। বঙ্গসাহিত্যসম্মেলন সম্বন্ধে যা বলেছি তামিল সাহিত্যসম্মেলন বা সঙ্ঘম্ সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। বরং বেশী করেই খাটে। কারণ বাংলা হিন্দীর থেকে ততখানি দূরে নয় তামিল যতখানি। তামিল আর্যভাষাও নয়। কিন্তু বাংলা যথেষ্ট দূরে। এর সাহিত্য অনেক বেশী আধুনিক। এ জগতে দেশই একমাত্র সত্য নয়। যুগও সত্য। হিন্দীর সঙ্গে বাংলার অন্তত আধ শতাব্দী ব্যবধান। যেমন জার্মানের সঙ্গে ফরাসীর। জার্মানদের সংখ্যা বেশী বলে যদি জার্মানকে করা হয় ইউরোপের সরকারী ভাষা তথা শিক্ষার মাধ্যম তা হলে ফরাসীরা মনের দিক থেকে বেশ কিছু দূরে পেছিয়ে যাবে। ইউরোপের ঐক্য যেমন আবশ্যক প্রগতি তেমনি। একটার জন্যে আরেকটাকে বিসর্জন দেওয়া যায় না।

ইউরোপের সঙ্গে ভারতের তুলনা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। ইউরোপের ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, সুইটজারলাণ্ড যেমন আমাদের বাংলা, বিহার, ওড়িশা, আসামও মোটামুটি তেমনি। ওরা যে কেন এক একটি নেশন হয়েছে, এরা যে কেন তা হয়নি, এর কারণ এরা এতদিন একছত্রাধীন ছিল, আর ওরা বহুদিন থেকেই বিভিন্ন ছত্রাধীন। মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পর যদি ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না হতো তা হলে এরাও এক একটি নেশন হয়ে উঠত। স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন যদি দুর্বল বা অপ্রিয় হয় তা হলে দেশ বহুভাগ হয়ে যেতে পারে। এক একটি রাজ্য এক একটি নেশন হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আমরা বহু সম্ভবপর নেশনকে একসূত্রে গেঁথে একটি মহাজাতি গঠনের ব্রত গ্রহণ করেছি। ব্রতসিদ্ধি আমাদের হবেই, যদি সংখ্যালঘুদের স্বার্থকে বলি না দিই। এই পশ্চিমবঙ্গে বহু নেপালী বাস করে, তারাও বাঙালীর সমান অধিকারী। বহু হিন্দীভাষী বাস করে, তারা বাঙালী না হলেও পশ্চিমবঙ্গীয়। ওড়িয়ার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। তারাও ভোটদাতা, তারাও করদাতা, সরকার তাদেরও সরকার। কিন্তু তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে সংখ্যাগুরুদের মাথাব্যথা কি দেখছেন? এই রকম সব ক'টি রাজ্যে। সংখ্যাগুরুর স্বার্থকে সংযত না করলে সংখ্যালঘু অশান্ত হবেই। সে অশান্তি রকমারি রূপ নেবে। তখন রব উঠবে, সংহতি গেল গেল!

যাঁহা মুশকিল তাঁহা আহসান।

শান্তিনিকেতন, ২৬শে জুন

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্র

অবশেষে এমন কথাও শুনতে হলো যে, দ্রাবিড়দের জন্যে দ্রাবিড়নাড বলে একটা স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্র চাই। তার মধ্যে থাকবে সিংহলেরও কতক অংশ।

হাসির কথা নয় কি? হাসতে চেষ্টা করছি। কিন্তু হাসি পাচ্ছে না। কারণ পনেরো বছর হাসাহাসি করার পর সামনে দেখি কান্নার নদী। রিভার অফ সরো। পাকিস্তান। সে নদী এখনো অতিক্রম করতে পারিনি।

হাঁ, বছর তিরিশ আগে কে একজন ছাত্র যখন ইংরেজী বর্ণমালার থেকে অক্ষর নিয়ে পাকিস্তান বলে একটি শব্দ বানায়, তখন হেসেছিলুম আমরা সবাই। মুসলমানরাও। ইকবাল মন থেকে স্বীকার করেননি, জিন্না ১৯৪০ সালেও উচ্চারণ করেননি, ১৯৪৬ সালে যখন "লড়কে লেঙ্গে" চলছে তখনো লীগ নেতাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি সত্যি সত্যি কেউ অতখানি বিচ্ছেদ চান না, মুসলমান অফিসার বন্ধুরা তো ভাবতেই পারেন না। চাকা হঠাৎ ঘুরে যায় ১৯৪৭ সালের গোড়ায়। ততদিন বোঝা গেছে ইংরেজের বিদায় আসন্ন। কে তার উত্তরাধিকারী হবে তা নিয়ে কংগ্রেস-লীগ একমত নয়। শাজাহান বাদশার পুত্রদের মধ্যে যেমন গৃহযুদ্ধ বেধেছিল তেমনি একটা গৃহযুদ্ধ বাধতে বাধ্য যদি না বানরকে দিয়ে পিঠে ভাগ করিয়ে নেওয়া হয়। পিঠে ভাগ যেই হয়ে গেল অমনি দিল্লীর জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল, "মহাত্মা মাউন্টব্যাটেন কী জয়।" আসল মহাত্মা তখন অরণ্যে রোদন করছেন। গৃহযুদ্ধ রোধ করার শক্তি তাঁর ছিল না। ছিল একমাত্র মাউন্টব্যাটেনেরই।

অবশ্য পিঠের একটা উল্টো পিঠও ছিল। সেটা তখন কারো নজরে পড়েনি। শুরু হয়ে গেল পৃথিবীর ইতিহাসের বৃহত্তম গণপলায়ন, বিপুলতম নরহত্যা ও নারীহরণ, তিন সপ্তাহের মধ্যে। দিনে বিশ হাজার মানুষ মারা মহাযুদ্ধেও ঘটে কি না সন্দেহ। সম্প্রতি একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক এর জন্যে মাউন্টব্যাটেনের অদূরদর্শিতাকে দায়ী করেছেন। কিন্তু করতেন তিনি কি? ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সৈন্যসামন্ত নিয়ে চলে যেতেন? করলে কার হাতে সঁপে দিয়ে যেতেন? কংগ্রেসের হাতে দিতে গেলে তৎক্ষণাৎ মুসলিম সৈন্যদল বিদ্রোহী হতো, লীগের হাতে দিতে গেলে তৎক্ষণাৎ শিখ ও হিন্দু সৈন্যদল বিদ্রোহ করত। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আক্ষেপ করেছেন যে ইংরেজের উচিত ছিল আরো কয়েক বছর সবুর করা। ততদিনে লীগ কমজোরী হতো, কংগ্রেস জোরদার হতো।

মজা তো ওইখানেই। আরো কয়েক বছর সবুর করলে লীগ কমজোরী হতো, কংগ্রেস জোরদার হতো। এটা লীগের ভালো করেই জানা ছিল। বিশেষত জিন্না সাহেবের। তিনি বিলেতে গিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে এলেন। ইংরেজ কর্তারা বুঝলেন। অপসরণের দিন ফেললেন ১৯৪৭ সালের জুন মাস বা আরো আগে। বেচারা ওয়েভেলের চাকরিটি গেল। তিনি ছিলেন

অখণ্ড ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু। আমি তাঁকে অকারণে ভুল বুঝেছিলুম। তেমনি ভুল বুঝেছিলুম বহুসংখ্যক ইংরেজ সহকর্মীকে। তাঁরা চেয়েছিলেন কোয়ালিশন। পার্টিশন নয়। কোয়ালিশনের সম্ভাবনা যখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হলো তখন গৃহযুদ্ধের বিকল্প হিসাবে পার্টিশন ভিন্ন আর কোনো গতি রইল না। ইংরেজরা চেয়েছিল পার্টিশন এ কথা যদি কেউ বলেন, তবে তিনি অন্যায় করবেন। ইংরেজরা চেয়েছিল কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের কোয়ালিশন। ন্যাশনালিজমের সঙ্গে কাউন্টার-ন্যাশনালিজমের সন্ধি-সমাস। তাহলে ব্যালান্স অফ পাওয়ার ইংরেজের হাতেই থেকে যেত। যদিও তাদের উপর শাসনভার থাকত না। তারা শাসনদায় থেকে মুক্ত হয়ে নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ত।

"নিউ স্টেটসম্যান" চিরকাল ভারতের স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মনে আছে সেসময় "নিউ স্টেটসমান" গান্ধীজীর উপর কটাক্ষ করে, "এই সন্তের অভিসন্ধি আমরা আরো কিছুদিন ভারতবর্ষে থাকি। আমরা কিন্তু যত শীগগির পারি চলে আসতে চাই।" আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের মাথার উপর ওয়েভেল থাকলেও সত্যিকার ক্ষমতা পটেল ও নেহরুর হাতে পড়েছিল, তাঁদের একমাত্র কণ্টক ছিলেন অর্থসচিব লিয়াকৎ আলী খান। লিয়াকতের বাজেট-খানা ইতিহাসের বিস্ময়। সর্দারের দ্বিধা কেটে যায় বাজেটের চেহারা দেখে। যেমন অর্জুনের দ্বিধা কাটে বিশ্বরূপদর্শন করে। নিষ্কণ্টক হতে হলে পার্টিশন কবুল করতেই হবে, নতুবা গৃহযুদ্ধ বাধবে। সর্দারের সর্দারি এবার দেখা গেল জিন্নার হাতের তাস কেড়ে নিয়ে টেবিল ঘুরিয়ে দেওয়া। পার্টিশনে রাজী, কিন্তু বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবকেও ভাগ করতে হবে। জিন্নাকে ঢোঁক গেলানোর জন্যে মাউণ্টব্যাটেনকে বিলেত যেতে হয়, চার্চিলকে দিয়ে চিঠি লেখাতে হয়। তা সত্ত্বেও জিন্না মুখ ফুটে সম্মতি দেননি। দিয়েছিলেন নীরবে মাথা নেড়ে। নিছক রাজনৈতিক বার্গেন হিসাবে ওটা তাঁর পক্ষে লাভ-জনক হয়নি। বিখ্যাত সাংবাদিক কারাকা অভিনন্দন জানাতে গিয়ে দেখেন জিন্না মুখ হাঁড়ি করে বসে আছেন। যা বললেন তার থেকে মনে হতে পারে পার্টিশন তিনিও চাননি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল সমান সমান ক্ষমতার ভিত্তিতে কোয়ালিশন। এবং একমাত্র মুসলিম প্রতিষ্ঠান যে তাঁর পরিচালিত লীগ এই স্বীকৃতি। ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখার শর্ত ছিল এমন একটি ফরমুলা যার অর্থ এক একজন মুসলমান তিন তিনজন হিন্দুর সমান।

অমন একটা ফরমূলায় রাজী হলে বাজীকরের টুপীর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসত একে একে আরো অনেকগুলি খরগোস। সমানসংখ্যক সৈন্যসামন্ত, সমানসংখ্যক পুলিস, সমানসংখ্যক সিভিল সার্ভিসের লোক, সমানসংখ্যক আইনসভার সদস্য, সমানসংখ্যক মন্ত্রী, সমান ওজনের দপ্তর। কোনো সিদ্ধান্তই অধিকাংশের ভোটে গ্রহণ করা চলত না। সমানসংখ্যক ভোটের দরুন নিত্য অচল অবস্থার উদ্ভব হতো। দরকার হতো কাস্টিং ভোট। দিতেন ইংরেজ বড়লাট বা লাট। প্রধান সেনাপতি হিন্দু হলে চলত না,

হতেন একজন ইংরেজ। আসল ক্ষমতা রয়ে যেত ইংরেজের হাতে। পটেল ও নেহরু কেনই বা তাতে রাজী হতেন, যখন আসল ক্ষমতার বারো আনাই চলে এসেছে তাঁদের হাতে? ওরকম একটা কোয়ালিশন ধোপে টিকত না। একদিন না একদিন ভেঙে পড়তই। তখন সেই পার্টিশনই হতো, কিন্তু তার আগে কংগ্রেসকে ও অন্যান্য মুসলিম দলগুলিকে আরো দুর্বল করা হতো। লীগ হতো আরো সবল। স্বাধীনতার জন্যে লড়ত কারা, যাদের লড়ার কথা তারাই যদি অবল হলো? দুর্বল কাঁধ দেখলে ইংরেজও কি চেপে বসতে চাইত না? অত সহজে বিদায় নিত? ইংরেজ বিদায় নিয়েছে স্বেচ্ছায়, সেকথা ঠিক। কিন্তু বিদায় নিয়েছে আসল ক্ষমতা হাতছাড়া হয়েছে দেখে। কংগ্রেস নেতারা পদত্যাগ করলে বা পদচ্যুত হলে ১৯৪৭ সালে বিপ্লব ঘটত। তাতে সৈন্যদলও যোগ দিত। ভারতের স্বাধীনতা দয়ার দান নয়। বারুদ জমেছিল। যে বারুদ দিয়ে বিপ্লব ঘটানো যেতো সেই বারুদটাই লক্ষভ্রষ্ট হয়ে সাম্প্রদায়িক লঙ্কাকাণ্ড ঘটায়।

কিন্তু কেন সাম্প্রদায়িক লঙ্কাকাণ্ড? কেন শ্রেণীগত লঙ্কাকাণ্ড নয়? কেন অন্যরকম লঙ্কাকাণ্ড নয়? এর উত্তর সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি একটু একটু করে বলসঞ্চয় করছিল। ন্যাশনালিজম নামক একটি শক্তি যখন জার্মানীকে একাকার ও ইটালীকে স্বাধীন তথা একাকার করে তখন ভারতবর্ষেও তার সঞ্চারণ ঘটে। এর একটা বিরোধী শক্তির প্রয়োজন হয়। সেটা কাউণ্টার-ন্যাশনালিজম। বা কমিউনালিজম। এটা শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। এর বিস্তার ঘটে পাঞ্জাবের শিখদের মধ্যেও, দক্ষিণ ভারতের অব্রাহ্মণদের মধ্যেও, পরে দেখা গেল সারা ভারতে এক শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেও। গান্ধীজী সতর্ক ও তৎপর না হলে অস্পৃশ্যদের মধ্যেও ঘ ত। আম্বেদকার তো সেই তালেই ছিলেন। এতগুলো জাতীয়তাবিরোধী স্রোত যেদেশে সক্রিয় সেদেশে জাতীয়তাবাদ একা কতদূর যাবে? ক'টাকে পরাস্ত করে? হয়তো আরো কয়েক বছর সময় পেলে পারত। কিন্তু জিন্না সময় দিলেন না, ইংরেজ কর্তারা সময় দিলেন না।

জিন্নাকে একটি ব্যক্তি না ভেবে একটি শক্তি ভাবতে হবে, নইলে অত বড় একটা বিপর্যয়ের তাৎপর্য বোধগম্য হবে না। যে শক্তির সঙ্গে তিনি আপনাকে একাত্ম করেছিলেন তার প্রকৃত নাম কাউণ্টার-ন্যাশনালিজম এবং তার লৌকিক রূপ মুসলিম সাম্প্রদায়িতা। ইংরেজ রাজা হবার আগে মুঘল রাজবংশ ভারতের অধিকাংশের উপর প্রভুত্ব করতো, সেই সূত্রে ভারতের সিংহাসনের উপর স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলমানদের মনে মনে একটা দাবী ছিল। সংখ্যালঘু বলে দিল্লীর সিংহাসন পুনরধিকার করা তাঁদের পক্ষে সহজ ছিল না, কিন্তু সংখ্যাগুরু বলে কলকাতা, লাহোর, করাচী প্রভৃতির মসনদ দখল করা সম্ভব ছিল। পিছনে ইংরেজ থাকলে তো কথাই নেই। ইংরেজকে তাঁরা শত্রু করেননি, বরং ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের শত্রুতার দিনে নিষ্ক্রিয় থেকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। ইংরেজ তো তার মিত্রকে ভুলতে পারে না।

এতদূর পর্যন্ত যা বলা গেল তা ক্ষমতার রাজনীতির পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর যা করেন নি এঁরা তাই করলেন। ধর্মকে ব্যবহার করলেন রাজনীতির সেবায়। খান আবদুল গফর খানের মতো ধার্মিক মুসলমান যা করেননি এঁরা তাই করলেন। রাজনীতির ময়দানে তুললেন ধর্মের ধ্বজা। সাধারণ মুসলমানকে বোঝানো হলো এঁদের জয় হচ্ছে ইসলামের জয়। নতুবা ইসলাম বিপন্ন। দুনিয়ায় এমন দৃশ্য কমই দেখা গেছে যে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও ইসলামধর্মী জনগণ একই দলের পিছনে ও পাশে দাঁড়িয়েছে। মিশর বা ইন্দোনেশিয়ায় বা আলজেরিয়ায় এর অনুরূপ দৃশ্য দেখা যায়নি। এই সার্কাসের মতো ব্যাপার ভাবতবর্ষে সম্ভব হলো কী করে? হলো এইজন্যে যে ধর্ম নিয়ে একটা ভুল বোঝাবুঝি সাত শ' বছর ধরে বোঝাপড়ার অপেক্ষায় ছিল। এখনো কি বোঝাপড়া হয়েছে? "ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরে নাম" বা "ভজ মন রাম রহিম" বললেই কি হয়? নানক কবীর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক সাধকের জীবনেই সে বোঝাপড়া সত্য হয়েছে। সাধারণের সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, তারা পরস্পর-সহিষ্ণু।

সুতরাং যা হবার তাই হয়েছে। একমাত্র আশা রাজনীতির খেলায় ধর্মকে ঘুঁটি করা ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে বাতিল হয়ে যাবে, জনগণও ধর্মের বিভেদকে নেশনভেদ বলে ভাবতে কুণ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু ঘটিত রেষারেষির পরিণামটাও সকলের উপলব্ধি হোক। এখনো হয়নি। পাকিস্তানেও হয়নি, ভারতেও হয়নি। আরো দুঃখ আছে কপালে।

ক্ষমতা হস্তান্তর করে ইংরেজ যেসময় চলে যেতে উদ্যত সেসময় দক্ষিণের এক দ্রাবিড় নেতা বললেন, "ও কী! আর্যদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে যাচ্ছ যে!" এ ঘটনার পর পনেরো বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণের দ্রাবিড় আন্দোলন আরো জোর হয়েছে। রব উঠেছে দ্রাবিড়দের জন্যে দ্রাবিড়নাড চাই। গত সাধারণ নির্বাচনে দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাঘম এই রব তুলে মাদ্রাজ আইনসভায় দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের মর্যাদা লাভ করেছে। পার্লামেণ্টেও মাদ্রাজের জন্যে নির্দিষ্ট আসনের বড় একটা অংশ তার ভাগে জুটেছে। এই তো সেদিন সে একটা উপনির্বাচন জিতল। ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামেও নেমেছে। নেতাদের সাজা হয়েছে। কিন্তু সাজা হওয়া তো এদেশে রাজা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন। কে জানে পরের বারের সাধারণ নির্বাচনে এটা তাদের রাজটিকা হবে কিনা! যদি হয় তাহলে ভাবনার কারণ হবে। অপোজিশন বলবান হলে গবর্নমেণ্ট চালানো কঠিন। বিশেষত সেই অপোজিশন যদি কথায় কথায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। তারপর সে যদি নির্বাচনে অধিকতর সংখ্যক আসন লাভ করে তাহলে গবর্নমেণ্ট চালানোর অধিকার তারই। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বনিবনা যদি না হয় তবে তাকে ডিসমিস করা খুব সুখের হবে না। শেষে এমন দিন আসবে যেদিন তাকেই ডাকতে হবে তারই শর্তে শাসনের কাজ চালাতে। আর সেও সুযোগ বুঝে

পেশ করবে তার চরম দাবী। দ্রাবিড়নাড।

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়! এটাকে হালকা করে দেখলে ভুল হবে। আমাদের শান্তিনিকেতনের এক চিত্রকর বছর দুই আগে মাদ্রাজ রাজ্য ঘুরে এসে আমাকে যা বলেছিলেন তা উদ্বেগজনক। দেখলেন লোকের মনোভাব তাঁর উপর বিরূপ। যেহেতু তিনি উত্তর ভারতীয়। তিনি বললেন, তিনি উত্তর ভারতীয় নন, তিনি পূর্ব ভারতীয়, তিনি বাঙালী। তখন মনোভাব বদলায়। তারপর ভাষা নিয়ে সমস্যা। ইংরেজী ওরা বোঝে, কিন্তু না বোঝার ভান করে। হিন্দীতে বলতে গেলে একদম বধির। বলতে হবে তামিল ভাষায়। কিন্তু আমাদের চিত্রকর বন্ধু তামিল জানেন না। তাঁকে আশ্রয় নিতে হলো কখনো সংস্কৃতের, কখনো মুদ্রার। মাছ কিনতে গিয়ে বলেন, "মীন"। ভাগ্যিস ওটা তামিল ভাষায় জলচল হয়ে গেছে। নইলে সংস্কৃতেও দ্রাবিড়দের আপত্তি। আর মাংস কেনার সময় অভিনয় করে দেখাতে হলো কেমন করে পাঁঠা কাটে। এর পরে বোধহয় তামিল শব্দপুস্তক হাতে নিয়ে ঘুরতে হবে। মোট কথা হিন্দী বা ইংরাজী ও রাজ্যে চলবে না। ওরা মনে মনে স্বতন্ত্র হয়ে বসে আছে। সম্প্রতি পড়লুম উত্তর ভারতীয়দের উপর একচোট মার হয়ে গেল। রামায়ণ, সংবিধান ইত্যাদি আগেই পোড়ানো হয়েছিল, এবার পুড়ল মনুস্মৃতি।

আরো পড়লুম, রামায়ণ নতুন করে লেখা হচ্ছে। রাবণ নাকি দ্রাবিড়দের বীর। তিনি আর্য আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে প্রাণ দেন। পাঠ্যপুস্তকগুলো নাকি দ্রাবিড়-ভাবে ভরপুর। তামিলরা নিজেদের ভাষায় নিজেদের খুশিমতো লিখছে, পড়াচ্ছে, পড়ছে। দৃষ্টিকোণটা স্বাতন্ত্র্যসূচক। পাকিস্তানের পূর্বলক্ষণ ছিল—"আমরা আগে মুসলমান, তারপর ভারতীয়।" দ্রাবিড়নাডেরও পূর্বলক্ষণ সেইরূপ—"আমরা আগে দ্রাবিড় বা তামিল, তারপরে ভারতীয়।" কার্যকালে "ভারতীয়"টা পরিত্যক্ত হবে। হয়তো বছর তিরিশ বাদে।

আমরা ছেলেবেলা থেকেই আর্যদের গৌরবগাথা শুনে আসছি। অনার্যদের হীন ভেবে আসছি। কেমন, সত্য কিনা? কিন্তু অনার্যরা তো ভারতবর্ষ থেকে বিলুপ্ত হয়নি। তারা অন্য নামে বিদ্যমান। ওই দ্রাবিড়রাই অনার্য। ওরা শুধু অনার্য নয়, ওরা প্রাগ্-আর্য। ওরাই আর্যদের পূর্বে রাজত্ব করত। আর্যরা ওদের হটাতে হটাতে দক্ষিণে নিয়ে যায়, সেখানে কোণঠাসা করে। তা সত্ত্বেও তাদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করতে পারেনি। তাদের হাতে তিনটি বড় বড় স্বাধীন রাজ্য ছিল। উত্তর ভারতের কোনো সাম্রাজ্যই তাদের গ্রাস করতে পারেনি। কিন্তু ক্ষত্রিয়রা যেখানে ব্যর্থ হয়েছে ব্রাহ্মণরা সেখানে সফল হয়েছে; উত্তর ভারতের আর্য সংস্কৃতি ও ধর্ম সেখানে অনুপ্রবেশ করেছে। দ্রাবিড়দের রাজ্যে ব্রাহ্মণরা গিয়ে বসতি করেছে, কিন্তু ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। তার জন্যে কঠিন কঠিন সব নিয়ম করেছে। সে-সব নিয়ম দ্রাবিড়দের পক্ষে অবমাননাকর। স্বর্গের বা জন্মান্তরের মোহে তারা এতকাল সহ্য করে

এসেছে, কিন্তু এখন আর সহ্য করতে রাজী নয়। মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ হোটেলে অব্রাহ্মণ অর্থাৎ দ্রাবিড়দের আজকাল ঢুকতে দেয় কিন্তু প্রত্যেকের আলাদা আলাদা টেবিল। কাজেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে বসে খেতে হয় না।

অব্রাহ্মণ অর্থাৎ দ্রাবিড় বলেছি। গোড়াতে ওটা ছিল অব্রাহ্মণদের "আত্মসম্মান" আন্দোলন। তখনো দ্রাবিড় চেতনা জাগেনি। কিন্তু "অব্রাহ্মণ" বলে আত্মপরিচয় দিলেও তো ব্রাহ্মণকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই একদিন "আদিদ্রাবিড়" আন্দোলন দেখা দেয়। অব্রাহ্মণরা সকলকেই দ্রাবিড়, দ্রাবিড়রা সকলেই অব্রাহ্মণ, কাজেই একই উদ্দেশ্য সাধিত হলো। এতদিনে সেই স্রোতেরই একটি শাখা দ্রাবিড়কে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরেছে। সংস্কৃত শব্দে তামিল ভাষা ভরা। এটা ওদের কানে বাজে। সংস্কৃত বাদ দিতে চেষ্টা চলছে। তেমনি সংস্কৃতির ভিতর থেকে আর্য উপাদান। হিন্দী তো তামিলের তুলনায় শিশু। তাও সংস্কৃতের দ্বারা আচ্ছন্ন। আর্যাবর্তেই তার জন্ম। আর্য্য উপাদানে গড়া তার অঙ্গ। হিন্দীর প্রভাব পড়লে তামিলের স্বভাব নষ্ট হবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায়, দিল্লীর শাসন কোনোকালেই অতি দক্ষিণে পৌঁছয় নি ব্রিটিশ আমলের আগে। যোগসূত্রটা বরাবরই ছিল সংস্কৃতিগত। ধর্মগত। সে ক্ষেত্রেও আবহমানকাল একটা ব্যবধান ছিল আর্যের সঙ্গে দ্রাবিড়ের। সেটা ধর্ম ও সংস্কৃতির সেতুবন্ধন সত্ত্বেও গভীর ছিল। রক্তের মিশ্রণ তেমম হয়নি, যেমন হয়েছিল উত্তরাপথে। ভাষার মিশ্রণও তেমন হয়নি। দ্রাবিড় ভাষাগুলি অন্য এক বংশের। তাদের দিক থেকে ইংরেজী যতখানি দূর হিন্দী ততখানি। ইংরেজীকে যদি তারা হটায় তাহলে নিশ্চয় হিন্দীকে অভিষেক করার জন্যে নয়। সংস্কৃতকে তো নয়ই। সিংহাসনটা তামিলের জন্যেই সংরক্ষিত। তামিল শুধু একটি আঞ্চলিক ভাষা হয়েই ক্ষান্ত হবে না। সিংহলেও তার প্রচলন আছে। তার অতীত সম্পদ ও আধুনিক বিকাশ হিন্দীর তুলনায় ক্ষীণ নয়।

তারপর ভারতের রাজধানী দক্ষিণ থেকে বড় বেশী দূরে। দ্বিতীয়ত সেটা একান্তই উত্তরে। দক্ষিণ মেরুর সঙ্গে উত্তর মেরুর যেমন বৈপরীত্য মাদ্রাজের সঙ্গে দিল্লিরও তেমনি। কলকাতা বা বম্বে বা নাগপুর হলে "নিউট্রাল" হতো। ভবিষ্যতে দ্বিতীয় রাজধানীর কথা চিন্তা করতে হবে। এর সঙ্গে মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। দিল্লীর একটা ঐতিহাসিক মহিমা আছে, কিন্তু দক্ষিণ সে মহিমার শরিক নয়। রামায়ণ মহাভারতেও দক্ষিণকে ইন্দ্রপ্রস্থের বা অযোধ্যার মহিমার অংশীদার করা হয়নি। দক্ষিণ যদি মনে করে যে সে উত্তর ভারতের একটি উপনিবেশ মাত্র, তাহলে তার মনে পূর্ব পাকিস্তানের মতো অভিমান জন্মাবেই। এর থেকে একদিন উঠবে কাশ্মীরের মতো আংশিক স্বাতন্ত্র্যের দাবী।

কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে তামিলদের সঙ্গে তেলেগুদের বনে না, কন্নাড়িগদের বনে না, মালয়ালিদেরও যে খুব একটা বনে তা নয়। দক্ষিণ

ভারতের চারটি দ্রাবিড় রাজ্যের সমবায় কোনো দিন হবার নয়। "হিন্দীর সঙ্গে বাংলার যতখানি তফাৎ তামিলের সঙ্গে তেলেগুর তফাৎ তার চেয়েও বেশী" বলেছিলেন আমাকে ডক্টর গোপাল রেড্ডি, এখন যিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী। সুতরাং তামিলনাড থেকে দ্রাবিড়নাড হওয়া সুদূরপরাহত। কিন্তু সমস্যাটা তা বলে লঘু হয়ে যায় না। সিংহল কতটুকু দেশ! সেও তো স্বাধীন! তামিলনাড কি তার তুলনায় বড় নয়? একবার স্বাতন্ত্র্যের হাওয়া গায়ে লাগলে মানুষ আকার আয়তন বিবেচনা করে দেখে না। সাইপ্রাস কতটুকু দেশ! জ্যামেকা কতটুকু!

অনেকের ধারণা, আরো গোটাকতক কারখানা খুলে দিলেই তামিলদের মন পাওয়া যাবে। অসম্ভব নয়। মানুষের মন তো তার পকেটে। কিন্তু স্মরণাতীত কাল হতে ঐতিহাসিক ভুল বোঝাবুঝি যদি থাকে, বিজেতা ও বিজিত বোধ যদি থাকে তবে তাকে দূর করাই চাই। আর্য ও দ্রাবিড় সম্বন্ধে আগেকার দিনে যা লেখা হয়েছে তার সংশোধন দরকার। দ্রাবিড়রা যে সভ্য ছিল, কতক বিষয়ে সভ্যতর ছিল, ভারতীয় সভ্যতায় তাদের দান যে সুবৃহৎ, বহু বিষয়ে বৃহত্তর, এটা স্বীকার করতে হবে। তামিলচর্চাকেও সংস্কৃতচর্চার মতো মর্যাদা ও মূল্য দিতে হবে। হিন্দীর সর্বভারতীয় দাবী খাটো করতে হবে। যেটা নিয়ে মনোমালিন্য তীব্র হলো সেই ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের ভেদটাকেও মুছে ফেলা চাই। দক্ষিণ ভারত তো দক্ষিণ আফ্রিকা নয় যে সেখানে "আপার্টহাইড" বজায় থাকবে। সমাজে ব্রাহ্মণশূদ্রের সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শুধু তাই নয়, অসবর্ণ বিবাহের দ্বারা অভেদের অভিমুখে যাত্রা করতে হবে।

দ্রাবিড়নাড আন্দোলনে ব্রাহ্মণদের অনেকে যোগ দিয়েছেন। যাঁরা যোগ দেননি তাঁদেরও কারো কারো সহানুভূতি আছে। তাঁদের সকলের মিলনভূমি হলো ভাষা। তামিল ভাষা। সেই ভূমিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করলে সে লড়াই অনেক দূর গড়ায়। রাজ্যসুদ্ধ লোককে তার মধ্যে টেনে আনা যায়। হিন্দী ভাষান্ধতার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে তামিল ভাষান্ধতা। সন্ধির চেষ্টা নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু সন্ধিসূত্র যদি হয় উত্তর ভারতের কয়েকটি কলেজে বা স্কুলে নমো নমো করে তামিল শেখানো তাহলে ভবী তাতে ভুলছে না। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার মাধ্যম যদি হয় হিন্দী ভবীর তাতে ক্ষতি। ভারতের সরকারী ভাষা যদি হয় একমাত্র হিন্দী ভবীর তাতে অসুবিধা। সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার ও পরীক্ষার একমাত্র মাধ্যম যদি হয় হিন্দী ভবীর তাতেও আপত্তি। অগত্যা সন্ধির সূত্র হবে ইংরেজীকে অনির্দিষ্টকাল রাখা। এই তিক্ত ভেষজটি হিন্দীপ্রেমীদের গলাধঃকরণ করতে হবে।

সময়ে সন্ধি না করলে ও সন্ধির সূত্র গ্রহণযোগ্য না হলে কাউন্টার-ন্যাশনালিজম এবার তামিল ভাষান্ধতার সুযোগ নিয়ে দ্রাবিড়নাডের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। অশুভ সম্ভাবনা, কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেবার মতো

নয়। অবাক হচ্ছি শুনে যে এর সূচনা নাকি ১৯৪৫ সাল থেকে। বোধহয় জিন্না সাহেবের দ্বিজাতিতত্ত্বের পিঠোপিঠি। মাদ্রাজের কংগ্রেসের উপরেও পরোক্ষভাবে এর প্রভাব পড়েছে। ব্রাহ্মণকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে না। অতএব রাজাজীর গঙ্গাযাত্রা। ব্রাহ্মণরা চাকরির জন্যে উত্তরে ছুটছেন, যেখান থেকে তাঁদের পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন। কেউ কেউ উত্তরেই বাড়ি করেছেন। তা ইহুদীরা যদি প্যালেস্টাইনে ফিরে যায় দু' হাজার বছর বাদে তো এঁরাই বা কেন আর্যাবর্তে না ফিরবেন অগস্ত্যের পথ ধরে বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে বিপরীত মুখে?

কার ব্রেকিং পয়েণ্ট যে কখন উপস্থিত হয় কে বলতে পারে? হিন্দু মুসলমানের বা ভারত পাকিস্তানের ব্রেকিং পয়েণ্ট এলো ১৯৪৭ সালে। আর্য দ্রাবিড়ের বা হিন্দী তামিলের ব্রেকিং পয়েণ্ট আসতে পারে আরো ত্রিশ বছর পরে। আমেরিকার স্বাধীনতার আশি বছর বাদে বাধল উত্তরে দক্ষিণে গৃহযুদ্ধ। সেইজন্যে খুব বেশী নিরুদ্বেগ হতে নেই। যদি কোথাও কোনো গভীর ব্যবধান থেকে থাকে তবে তাকে ভরাট করতে হবে। শুধু সেতুবন্ধন করাই যথেষ্ট নয়। এক শতাব্দী পূর্বে ন্যাশনালিজম এ দেশে ছিল না। তার আগে যা ছিল তাকে জাতীয় ঐক্য বলা ভুল। তলে তলে ছিল বই কি এক প্রকার ঐক্য। সে রকম ঐক্য ইউরোপেও ছিল। কিন্তু ন্যাশনালিজম তা সত্ত্বেও ইউরোপকে বহু খণ্ড করেছে এবং প্রত্যেকটি খণ্ডকে অন্য এক প্রকার ঐক্য দিয়েছে, যার নাম জাতীয় ঐক্য। প্রায়ই আমরা এক প্রকার ঐক্যকে অন্য প্রকার ঐক্যের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলি। ছিল ভারতবর্ষের এক প্রকা ঐক্য, কিন্তু জাতীয় ঐক্য বা ন্যাশনাল ঐক্য তার নাম নয়। এটার আয়ুষ্কাল এক শতাব্দীরও কম। মোটের উপর এটা কংগ্রেসের সমবয়সী। এ যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে ভারত ইউরোপের মতো বহু খণ্ড হতে পারে। যাতে দুর্বল না হয়, তার জন্যে নিত্য সজাগ থাকতে হবে। ধর্মের মতো ভাষাও বিস্ফোরক হয়ে দেশ ভেঙে দিতে পারে। ভাষার দ্বন্দ্ব থেকেও অভিনব রাষ্ট্রের উৎপত্তি হতে পারে। সৈন্যসামন্ত দিয়ে একে রোধ করা যায় না। ভাবাবেগ দিয়েও বাঁধ বাঁধা যায় না। খাদ থাকলে তাকে ভরাট করতে হবে।

আমাদের ছেলেবেলায় যখন কংগ্রেসের অধিবেশন বসত তখন একই শহরে অনুষ্ঠিত হতো নিখিল ভারত সমাজসংস্কার সম্মেলন, নিখিল ভারত ঈশ্বরবাদী সম্মেলন ইত্যাদি কতরকম অল ইণ্ডিয়া কনফারেনস। অসহযোগ আন্দোলনের পর থেকে সে পাট উঠে যায়। তার বদলে আসে খাদি, গ্রামোদ্যোগ প্রভৃতির প্রদর্শনী বা বৈঠক। এগুলিও দরকারী। কিন্তু ওগুলি কি অদরকারী? ওগুলির দরকার কি ফুরিয়েছিল? তা নয়। আমাদের নেতাদের একটা ধারণা জন্মেছিল যে, রাজনীতি আর অর্থনীতি ছাড়া একটা নেশনের তৃতীয় কোনো বুনিয়াদ নেই। থাকলে সেটা হয়তো হরিজন আন্দোলন বা নয়ী তালিম। যে নেশন গড়ে উঠছে তার গঠনের সামাজিক, নৈতিক, দার্শনিক, নন্দনতাত্ত্বিক ইত্যাদি কত রকম ভিত্তি চাই। এসব

সরকারী আওতায় হবার নয়। স্বাধীন ভারতের সরকার দিল্লিতে এ সকলের আয়োজন করলেও তা সার্থক হবে না। এর জন্যে চাই বেসরকারী উদ্যোগ উদ্দীপনা। কিন্তু কংগ্রেস পর্যন্ত আজকাল সরকারী সাহায্যনির্ভর। জাতীয়তাবাদের আধার যদি জাতীয় সরকারেই নিবদ্ধ হয়, তবে জাতীয় ঐক্য নিতান্ত যান্ত্রিক হবে। যেটা সকলের সাধনা সেটা গুটিকতক রাজনীতি-নিপুণের উপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা যায় না।

মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষ আর একটি আয়ারল্যাণ্ড বা ইটালী নয়, আর একটা ইউরোপ। এই ইউরোপসদৃশ উপমহাদেশকে আমরা নেশন করে তুলতে চেয়েছিলুম। মস্ত বড় একটা প্রাচীর খাড়া করল মুসলীম লীগ। আর-একটা বার্লিনের প্রাচীর। এখন আরো একটা প্রাচীর নির্মাণের প্রস্তাব উঠেছে দক্ষিণে। পরের দোষ দেখার আগে একবার নিজের ত্রুটি দেখলে হয় না? ত্রুটি দেখলে সংশোধন করলে হয় না? একটা ত্রুটি তো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। বরাবরই আমরা বলে এসেছি যে, হিন্দী হচ্ছে ভারতের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা। অর্থাৎ ইউরোপে যেমন ফরাসী ভারতে তেমনি হিন্দী। সকলেই জানেন, ফরাসী ইউরোপের সরকারী ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা বা ন্যাশনাল ভাষা নয়। লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা মানে সামান্য ভাষা। ফরাসীরা যদি জেদ ধরে যে, তাদের ভাষাকেই সারা ইউরোপের রাষ্ট্রভাষা বা ন্যাশনাল ভাষা বানাতে হবে, তাহলে ইউরোপ কোনো দিনই এক নেশন হয়ে উঠবে না। যে-ভাষা আপোসে সামান্য ভাষা হয়েছে, সে ভাষা গায়ের জোরে ন্যাশনাল ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা হতে চাইলে এ-কূল ও-কূল দুকূল হারাবে। সম্প্রতি পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিকে একসূত্রে গাঁথার আয়োজন চলেছে। কিন্তু সেই "ইউরোপীয়" সংস্থার ভাষা কোনটি হবে তা নিয়ে তর্ক বেধে গেছে। ফরাসীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজী। তাই ফরাসীরা ইংরেজদের ঢুকতে বাধা দিচ্ছে। ইংরেজরা ঢোকবার জন্যে আঁকুপাঁকু করছে।

যাকে আমরা সরল মনে আমাদের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা করতে রাজী ছিলুম সে এখন হয়ে উঠতে চায় রাষ্ট্রভাষা বা ন্যাশনাল ভাষা। অথাৎ ভারতের ফরাসী না হয়ে ইংরেজী। আমরা তো নারাজ হবই। এই যে নারাজ ভাব এটা তামিলদের মধ্যেই সব চেয়ে ব্যক্ত। কিন্তু বাঙালীদের মধ্যেও অব্যক্ত নয়। নেশন তৈরি হয় সকলের সম্মতি নিয়ে। নেশনের প্রতিষ্ঠা সম্মতির উপরে। সংবিধান রচনা করা ভোটের জোরে সহজ। তা দিয়ে রাষ্ট্র তৈরি হয়। রাষ্ট্র তৈরি করলেই অমনি একটা নেশন তৈরি হয়ে যায় না। পাকিস্তান বলে একটা পৃথক রাষ্ট্র তৈরি করার সময় জিন্না ধরে নিয়েছিলেন যে পৃথক একটা নেশন তৈরি হলো। কিন্তু পনেরো বছর পরেও পাকিস্তান একটা নেশনে পরিণত হয়নি। আমরাও যদি মনে করে থাকি যে, সংবিধান রচনা করে রাষ্ট্র বানালেই অমনি নেশন গড়ে উঠল তাহলে আমরাও তেমনি ভুল করব। নেশন একটা যান্ত্রিক ব্যাপার নয়, একটা আত্মিক ব্যাপার। অন্তরাত্মা সায় না দিলে কেউ তার জন্যে প্রাণ দিতে ছুটে যায় না। পাকিস্তানের জন্যে

যারা প্রাণ দিয়েছিল তারা আসলে দিয়েছিল ইসলামের জন্যে। নেশন আর ধর্ম এক নয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রধানত উত্তর ভারতবর্ষেরই ইতিহাস। আসাম, সিন্ধু ও তামিল রাজ্যগুলি আবহমানকাল উত্তর ভারতীয় রাজশক্তির অধিকারের বাইরে ছিল। ইংরেজরা দিল্লি থেকে নয়, কলকাতা বম্বে ও মাদ্রাজ থেকে তাদের জয় করে রাষ্ট্রভুক্ত করে। তেমনি কাবুল, পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ কখনো বা উত্তর ভারতীয় রাজশক্তির অধিকারে এসেছে, কখনো বা অধিকারের বাইরে গেছে। দিল্লি থেকে নয়, কলকাতা থেকে ইংরেজরা বাংলা ও পাঞ্জাব জয় করে। কিন্তু কাবুল হতে ফিরে আসে। এই যেখানকার ইতিহাস, সেখানে শুধুমাত্র ক্ষমতা হস্তান্তরের বলে বা সংবিধান রচনার কৌশলে নেশন গড়ে তোলা যায় না। রাষ্ট্র তৈরি করা যায় বটে। নেশন গড়ে তুলতে হলে আরো কিছু চাই। তার নাম সম্প্রীতি। তার নাম অভয়। তার নাম সমান ত্যাগ। তার নাম সমান সুযোগ। দিল্লিকে রাজধানী করে ও হিন্দীকে রাজভাষা করে উত্তর ভারতই আবহমান আধিপত্য করবে এরকম একটা সন্দেহ যদি কারো মনে জাগে তবে সেই একটি লোক একদিন বরফের গোলার মতো বাড়তে বাড়তে এক কোটি হবে। সন্দেহটা অমূলক একথা মুখে বললেই যথেষ্ট হবে না, কাজে দেখানো চাই। কাগজে কলমে প্রমাণ করা চাই।

চল্লিশ বছর আগে যখন আমি কলেজের ছাত্র তখন থেকেই আমি হিন্দীর অনুরাগী। স্বেচ্ছায় হিন্দী বই কিনেছি, পত্রিকার গ্রাহক হয়েছি। হিন্দীকে ফরাসী ভাষার মর্যাদা দিতে চেয়েছি। এখনো আমার সে ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটেনি। আমার আপত্তি এইখানে যে, হিন্দীপ্রেমিকরা আমাকে আমার শর্তে চান না। চান তাঁদের শর্তে। তাঁদের মতে হিন্দী হবে ভারতের ফরাসী নয়, ইংরেজী। আমার মতে হিন্দী হবে ভারতের ইংরেজী নয়, ফরাসী। হিন্দী যদি ইংরেজীর উত্তরাধিকারী হয় তবে আমাদের উপর আধিপত্য করবে। তার সেই অসপত্ন অধিকার তামিলরা কোনোদিনই মেনে নেবে না। বাঙালীরা আত্মবিভক্ত হয়ে এক পা পাকিস্তানে ও এক পা ভারতে না রাখলে তামিলদের মতোই হুমকি ছাড়ত। আপাতত দুর্বল, তাই আবেদন নিবেদন করছে। কিন্তু ইতিহাস তো দু'চার দশকেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। সন্দেহের বীজ যদি মনে ঢোকে তবে কুফল ফলতে হয়তো কিছু বেশি সময় লাগবে। নেশন গড়া যাঁদের ব্রত তাঁদের কর্তব্য সন্দেহের বীজ না বোনা। বুনতে না দেওয়া। বুনে থাকলে তুলে ফেলা।

এক একটি ভূখণ্ডের ইতিহাসের ধারা সহজে বদলায় না। উত্তর ভারতের অধিকার অতীত থেকে বর্তমানে ও বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে দক্ষিণে সম্প্রসারিত হতে চলেছে, ন্যাশনালিজমের ছাতার আড়ালে। পদক্ষেপটাকে সংশোধন করা চাই। সিঁদুরে মেঘ এই কথাই বলছে।

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে দ্বিমত দেখা দিয়েছে। ঠিক এই রকমটি দেখা দিয়েছিল হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের যুগে। কিন্তু সেবারকার প্রশ্ন আর এবারকার প্রশ্ন এক নয়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শিক্ষার জন্যে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। টাকাটি কী ভাবে ব্যয় হবে সেটা ছেড়ে দেয় ভারতীয় জনমতের উপরে। ভারতীয়দের এক পক্ষে সংস্কৃত, ফারসী ও আরবীর সংরক্ষকগণ। অপর পক্ষে ইংরেজীর প্রবর্তকগণ। শাসকরা রক্ষণশীলদের চটাতে চাননি। তাঁরা এটাও জানতেন যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হলে নব্যশিক্ষিতরা চাকরির দাবী তুলবে ও ইংরেজের পাওনায় ভাগ বসাবে। শেষে একদিন সমকক্ষ হয়ে উঠবে। তবে বিচারবিভাগে হাইড ইস্টের মতো উদারমনা ইংরেজ ছিলেন, সরকারের বাইরে ডেভিড হেয়ারের মতো বিদ্যোৎসাহী। গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর না করে ইংরেজীর প্রবর্তনে বিশ্বাসী ভারতীয়রা এঁদের মতো কয়েকজন বান্ধবের সহায়তায় ইংরেজী স্কুল ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

এর ফলে সংস্কৃত, ফারসী ও আরবীর সংরক্ষকরা যে নিরুদ্যম হলেন তা নয়। কলকাতার মাদ্রাসা আগে থেকেই ছিল। সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হলো। দুই পক্ষের চেষ্টা চলতে থাকল। ওই এক লক্ষ টাকা কোন পক্ষের কথায় খরচ হবে? দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কি সংস্কৃত, ফারসী ও আরবীমূলক হবে, না ইংরেজীমূলক? অর্থাৎ তার ভিত্তি কি প্রাচীন ক্লাসিকাল হবে, না আধুনিক বৈজ্ঞানিক? বলা বাহুল্য সংস্কৃত এ দেশের হলেও আরবী ফারসী এ দেশীয় নয়। সুতরাং স্বাদেশিকতা কোনো পক্ষের প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল না। দ্বিতীয়ত সংস্কৃত কোনো দিন বাংলা প্রভৃতি ভাষাকে প্রাথমিক পাঠশালার চৌহদ্দি পার হতে দেয়নি। সংস্কৃত টোলে বাংলার প্রবেশ ছিল না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেউ সংস্কৃত শিক্ষার অধিকারী ছিল না। সুতরাং সংস্কৃতের পক্ষ নেবে কে? জনসাধারণ নয় নিশ্চয়!

মেকলের সভাপতিত্বে একটি কমিটির অধিবেশন হয়। তাতে উভয় পক্ষেই সমান ভোট। মেকলে তাঁর কাস্টিং ভোট দিয়ে ইংরেজী প্রবর্তকদের জিতিয়ে দেন। তার পর থেকে ইংরেজী শিক্ষা সরকারী অনুমোদন ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে সর্বত্র প্রসারিত হয়। ইংরেজী স্কুলগুলিতে বাংলাকেও স্থান দেওয়া হয়। মাধ্যমিক শিক্ষায় বাংলাও হয় ইংরেজীর শরিক ও মিত্র। ইংরেজীর প্রবর্তক যাঁরা তাঁরা বাংলারও প্রবর্তক। নইলে বাংলা সেই গ্রাম্য পাঠশালায় নিবদ্ধ রইত। স্কুলপাঠ্য বিষয় ও নিচের দিকের মাধ্যম হয়ে বাংলারও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তা হলে দেখা যাচ্ছে এক নৌকায় সংস্কৃত, ফারসী ও আরবী। আরেক নৌকায় ইংরেজী ও বাংলা। সরকার যখন ইংরেজী তথা বাংলার পক্ষ নেন তখন বাংলা খবরের কাগজগুলি জয়ধ্বনি দেয়। সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যদি বিপরীত হতো তা হলে বাংলা সাহিত্যেরও আধুনিক যুগে পদার্পণ ঘটত

না। শুধু বাংলা কেন, হিন্দী উর্দু গুজরাতী মরাঠী তামিল তেলেগু প্রভৃতি কোনো সাহিত্যেরই আধুনিক পর্যায় আরম্ভ হতো না।

ইংরেজী শিক্ষা যখন পুরো দমে চলছে তখন দেশবাসীর মনে জাতীয় স্বাধীনতার চিন্তা জাগে। তখন ইংরেজীকে মনে হয় বিজাতীয়তার বাহক। সে যে আধুনিকতার বাহক এটা ভুলে যেতে বেশিদিন লাগল না। কিন্তু ইংরেজীকে তুলে দিলে তার জায়গায় শিক্ষার মাধ্যম হবে কোন্ ভাষা? সংস্কৃত? বাংলা? বাঙালী প্রধানরা কেউ ততদূর যেতে রাজী হন নি। সব চেয়ে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরাও না। অনেকের ধারণা রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ও বিশ্বভারতীতে বাংলা মাধ্যম প্রবর্তন করেছিলেন। দুঃখের বিষয় তথ্যের সঙ্গে এই ধারণার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদিপর্ব থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার উপর ছিল বালকদের গুরুজনের লক্ষ্য। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারলে কলেজে বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তারা প্রবেশ পেতো না। রবীন্দ্রনাথ এটা জানতেন। তাই নিচের দিকে বাংলায় পড়ানো হলেও উপরের দিকে ইংরেজীই ছিল মাধ্যম। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীরঞ্জন দাস এঁরা প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে ইংরেজী মাধ্যমে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স কিংবা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেছেন।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময় বাংলা মাধ্যম প্রবর্তন করতে পারা যেত, কিন্ত তা হলে বাংলার বাইরে থেকে ছাত্র সমাগম হতো না। বিশ্বভারতীর আদি-যুগের ছাত্ররা সাধারণত গুজরাতী বা দক্ষিণী। ইংরেজীতেই তারা শিখত ও লিখত। বাংলাটা ছিল অধিকন্ত বা ঐচ্ছিক। তার পর রবীন্দ্রনাথের অনিচ্ছা-সত্ত্বে স্থাপিত হয় কলকাতা মডেলের কলেজ, ছেলেদের তৈরি করে দেওয়া হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ বি-এ পরীক্ষার জন্যে। অতএব ইংরেজী হয় তার মাধ্যম। বড়রকম একটা পরিবর্তন ঘটে বিশ্বভারতী যখন স্বাধীন ভারতের পার্লামেণ্টের আইনবলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় বা বিশ্ববিদ্যালয় বলে পরিগণিত হয়।

তখন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাকেই করে তার পাঠভবনের উচ্চতম শ্রেণীর শিক্ষার ও পরীক্ষার মাধ্যম। তার পরের ধাপগুলো এখনো ইংরেজী মাধ্যমের দখলে। ইতিমধ্যেই চাপ পড়েছিল ইংরেজীর জায়গায় হিন্দীকে মাধ্যম করতে, যেহেতু টাকা আসছে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে। সে চাপ এড়ানো গেছে আন্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়ে। আঞ্চলিকতার খাতিরে বাংলা মাধ্যম প্রবর্তন করতে চাইলে কেন্দ্রের সঙ্গে আড়াআড়ি বাধবে। তা ছাড়া ছাত্রও পাওয়া যাবে না বিশ্ব কিংবা ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে। অবাঙালী ছাত্রদের কোনো দিনই বাংলা মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে দেখা যায়নি। উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বাংলা শিখতে বাধ্য হলে তারা অন্যত্র সরে যাবে। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। শান্তিনিকেতনে এই নিয়ে আলোচনা বৈঠক বসেছিল। অধিকাংশের মত হলো ইংরেজী মাধ্যম বহাল রাখা।

বিশ্বভারতীর যা ঐতিহ্য তাকে রক্ষা করতে হলে ইংরেজী মাধ্যমকেও রক্ষা করতে হবে। নতুবা ইংরেজীর জায়গায় হিন্দী উড়ে এসে জুড়ে বসবে। উপরের দিকে তর্কটা ইংরেজী বনাম বাংলা নয়। ইংরেজী বনাম হিন্দী। বিশ্বভারতী কবিগুরুর জীবদ্দশায় হিন্দীকে তার যথাযোগ্য স্থান দিয়েছে। হিন্দীভবন স্থাপন করেছে। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম হবে হিন্দী এটা বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যবিরুদ্ধ। এর দরুন যদি তাকে জাতীয়তাবিরোধী বলে কটু কথা শুনতে হয় তাতেও সে রাজী। আর বাংলা মাধ্যমের পক্ষপাতীরা এখন পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারেন নি যে ইংরেজী মাধ্যম উঠে গেলে তার জায়গায় বাংলাই হবে উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যম ও সেটা কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নেবে। এঁরা এমন একটা অবাস্তব জগতে বাস করেন যেখানে রবীন্দ্রনাথের নামেই বিশ্ব আব ভারত বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে দেখতে বদ্ধপরিকর। যা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই দেখে যেতে পারলেন না।

তার পর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। সেদিন আর নেই যেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল একেশ্বর। কলকাতাতেই আরো দুটি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, বর্ধমানে আর একটি, কল্যাণীতে আর একটি, উত্তরবঙ্গে আর একটি। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এগুলির শিক্ষার মাধ্যম কলমের এক খোঁচায় বাংলা হতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোনো লক্ষণ নেই। অন্তত রবীন্দ্রভারতীর শিক্ষার মাধ্যম অনায়াসেই বাংলা হতে পারে। বিশ্বভারতীর বেলা যেসব কথা খাটে রবীন্দ্রভারতীর বেলা সে সব খাটে না। রবীন্দ্রভারতী স্বচ্ছন্দেই অভিনব ঐতিহ্যের সূত্রপাত করতে পারে। তেমনি বর্ধমান, যাদবপুর, কল্যাণী ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতাকে নিয়ে এত টানাটানি কেন? কলকাতা যদিও পশ্চিমবঙ্গের শাসনাধীন তবু তার ঐতিহ্য সর্বভারতীয়। একদিন তার এলাকা ছিল রেঙ্গুন থেকে পেশাওয়ার অবধি বিস্তৃত। বাংলা বিভাগ বলে তার কোনো বিভাগই নেই। বিভাগটার নাম "আধুনিক ভারতীয় ভাষাবৃন্দ" কেবল বাংলার প্রতি নয়, হিন্দী উর্দু ওড়িয়ার প্রতিও কলকাতার উদার দৃষ্টি। একমাত্র বাংলার সঙ্গে আপনাকে একাত্ম করলে কলকাতা আর ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী থাকবে না। রাজনৈতিক রাজধানী এখন দিল্লী, অর্থনৈতিক রাজধানী বোম্বাই, কলকাতা যদি সাংস্কৃতিক রাজধানীও না হয় তবে সে কী? একটি আঞ্চলিক সদর? যেমন পাটনা, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ? ইংরেজী মাধ্যমের দরুন এখনো ভূভারতের ছাত্র আসে কলকাতায়। বাংলা মাধ্যম হলে আসবে কি? সে রকম একটা মোহ হয়তো কারো কারো মনে আছে। জার্মানীতে যখন জার্মান শিখে পড়তে যাচ্ছে, ফ্রান্সে যখন ফরাসী শিখে পড়তে যাচ্ছে তখন কলকাতায় কেন পড়তে আসবে না বাংলা শিখে?

যাই হোক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এ সিদ্ধান্ত একদিন নিতে হবেই। আজ না নিলে কাল, কাল না নিলে পরশু। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তকরাও

কল্পনা করেন নি যে শিক্ষার মাধ্যম নিরবধিকাল ইংরেজীই থাকবে। বাংলার সঙ্গে ইংরেজীর বিরোধ বাধবে এটা তাঁরা ভাবতে পারেন নি। কিন্তু বাধবেই যদি বাংলার উচ্চাভিলাষ ইংরেজীর দ্বারা ব্যাহত হয়। যদি বাংলার চরম বিকাশের পথ ইংরেজীর দ্বারা রুদ্ধ হয়। সুতরাং ইংরেজী মাধ্যমের হাজার গুণ থাকলেও বাংলার সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমত্তা। ক্রমে ক্রমে ইংরেজীর বদলে বাংলা হবে উচ্চতম শিক্ষারও মাধ্যম।

এখন এর একটা উল্টো দিকও আছে। সেটা সকলের মনে রাখা চাই। সর্বভারতীয় সংস্কৃতির বাহন ছিল বহুকাল ধরে সংস্কৃত। সে যুগে কেউ বাংলাদেশে আসত না, বাংলাদেশের দিকে তাকাত না। বড়জোর একটি বিশেষ বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্যে কতক পড়ুয়া নবদ্বীপে কিছুদিন কাটাত। বাঙালীর সুদিন এলো অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর দুর্দিনের সঙ্গে সঙ্গে। বাংলার সুদিন এলো ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে। কলকাতার সুদিন এলো ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে। সারা ভারতের দৃষ্টি পড়ল ইতিহাসে প্রথম বার পূর্বদিকের মানচিত্রের উপর। বিংশ শতাব্দীতে সে গৌরবরবি পৃথিবীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করল। "আজ বাংলাদেশ যা ভাবে—"

ইংরেজী শিক্ষা বলতে অনেক কিছুই বোঝায়। শুধু ইংরেজীতে লেখা পাঠ্যপুস্তক পড়া নয়। মানুষের মনে অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মানবিকতা, গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকারবোধ, আইনের শাসন, মিলিটারির উপর সিভিলের শ্রেষ্ঠতা, অথরিটির উপর যুক্তির শ্রেষ্ঠতা। এমনি কতকগুলি মূল্য যা আগেকার দিনে আমাদের দেশে ছিল না, এখনো আমাদের মনে গভীরভাবে বসেনি, আমাদের জীবনে সহজ হয়নি। এ সব ক্ষেত্রে জাপানীরা কি আমাদের উপর টেক্কা দিয়েছে? তাদের ইনটেলেকচুয়ালরা কি আমাদের ইনটেলেকচুয়ালদের চেয়ে বড়? তাদের সাহিত্যিকরা কি আমাদের সাহিত্যিক-দের চেয়ে মহৎ? তাদের আইনজ্ঞরা কি আমাদের আইনজ্ঞদের চেয়ে বিদ্বান? তাদের বিচারকরা কি আমাদের বিচারকদের চেয়ে বিজ্ঞ? জাপানের দৃষ্টান্ত যাঁরা দিচ্ছেন তাঁরা কি জানেন না জাপানকে ফাসিস্ট করতে কতটুকু কাঠখড় লাগে? ভারতকেও মিলিটারিস্ট করতে বা মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে খুব বেশি কাঠখড় লাগে না। রামমোহন রায় প্রভৃতির ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের বদলে আর একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যাঁরা নেবেন তাঁরা যেন ভারতের সনাতন দুর্বলতার কথাটাও গণনার মধ্যে আনেন। বিশেষত বাঙালীর।

যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা

যে দেশে বহু ধর্ম সে দেশের মূলনীতি কী হওয়া উচিত? এ প্রশ্নের উত্তর পাকিস্তান একভাবে দিয়েছে। ভারত দিয়েছে অন্যভাবে। পাকিস্তানের অধিকাংশের ইচ্ছা অনুসারে স্থির হয়ে গেছে পাকিস্তান হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র।

সেই যুক্তি অনুসরণ করলে ভারত হতে পারত হিন্দু রাষ্ট্র। কিন্তু ভারত করল অপর একটি যুক্তি অবলম্বন। ভারতের মতে সব ধর্মই সমান, সব ধর্মই সত্য, সংখ্যাগুরুর মুখ চেয়ে একটি ধর্মকেই রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করলে আর সব ধর্মের উপর অবিচার করা হবে, সুতরাং সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু নির্বিশেষে সর্বোদয়ের বিচারে সকলের প্রতি সমদর্শিতার খাতিরে ভারতকে হতে হবে সেকুলার স্টেট। যে রাষ্ট্র ধর্মের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ।

এই যুক্তি বর্মাও অবলম্বন করেছিল। কিন্তু কী যে দুর্বুদ্ধি হলো উনু ও তাঁর দলের। তাঁরা সাধারণ নির্বাচনে জিতেই আইন পাশ করিয়ে নিলেন যে বর্মা হবে বৌদ্ধ রাষ্ট্র। অধিকাংশের ইচ্ছায় কর্ম। কে বাধা দেবে? কিন্তু এর পরিণাম হলো অশুভ। শান, কারেন প্রভৃতি পার্বত্য জাতির তরফ থেকে দাবী উঠল আংশিক স্বাতন্ত্র্যের। শেষে প্রধান সেনাপতি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আত্মসাৎ করে শাসনতান্ত্রিক সরকার ধ্বংস করলেন। পাকিস্তানেও তাই হয়েছে। তবে ইসলামী রাষ্ট্র এখনো লোপ পায়নি, যেমন লোপ পেয়েছে বৌদ্ধ রাষ্ট্র। পাকিস্তানী জনগণ যদি কোনো দিন গণতন্ত্রের মর্যাদা বোঝে তা হলে সেই সঙ্গে সেকুলার স্টেটের মর্যাদাও বুঝবে। যেখানে সেকুলার স্টেট নেই সেখানে গণতন্ত্র কেবলমাত্র অধিকাংশের ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়, সর্বজনের ইচ্ছানির্ভর। গণতন্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক থাকতে পারে না। যারা প্রতিবেশীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পর্যবসিত করে তারা ডিক্টেটরের পদানত হবেই। তারা আত্মকর্তৃত্বের যোগ্য নয়। কারণ তারা অপরের সমান অধিকার মানে না।

ভারত সেকুলার স্টেট হয়ে বর্মার ও পাকিস্তানের দশা এড়িয়েছে। সেকুলার স্টেট যতই দৃঢ় হবে গণতন্ত্রও ততই দৃঢ় হবে। অনেকেই এটা হৃদয়ঙ্গম করেছেন, কিন্তু সকলে এখনো করেননি। তাঁরা চান হিন্দু রাষ্ট্র, হলোই বা সেটা ফাসিস্ট শাসিত। ইতিহাস এঁদের বাসনা পূর্ণ করলে ভারতেরও দশা হবে পাকিস্তানের বা বর্মার মতোই।

এ গেল ধর্মের কথা। ইতিমধ্যে ভাষার প্রশ্ন প্রবল হয়েছে। যে দেশে বহু ভাষা সে দেশের মূলনীতি কী হওয়া উচিত? এর উত্তরে বেলজিয়াম ও সুইটজারল্যাণ্ড একভাবে দিয়েছে। ভারত দিয়েছে অন্যভাবে। কার উত্তরটা ঠিক? কারটা বেঠিক?

বেলজিয়াম বলে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৩০ সালে। তার রাষ্ট্রভাষা হয় ফরাসী। দশটা বছর যেতে না যেতেই ফ্লেমিশদের দিক থেকে প্রতিবাদ ওঠে। তারাও তো বেলজিয়ান। তবে তাদের ভাষা কেন ফরাসীর সমান মর্যাদা পাবে না? দীর্ঘকাল আন্দোলন চালানোর ফলে ১৮৯৮ সালে আইন করে ফরাসী ও ফ্লেমিশ উভয় ভাষাকেই বেলজিয়ামের ন্যাশনাল ভাষা-রূপে সমান স্থান দেওয়া হয়। এখন সে দেশের রাষ্ট্রভাষা এক নয়, দুই। সরকারী কাজকর্ম দুই ভাষায় চলে।

তেমনি সুইটজারল্যাণ্ডে ১৮৭৪ সালের শাসনতন্ত্রে মেনে নেওয়া হয় যে,

তাদের ন্যাশনাল ভাষা হবে জার্মান, ফরাসী ও ইটালিয়ান। বলা বাহুল্য এ তিনটি ভাষা শুধু উপরের দিকের কাজকর্মের ভাষা। নিচের দিকের কাজকর্ম জেলা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় চলে। জেলা স্তরে আরো দুটি ভাষারও অস্তিত্ব আছে। এ ছাড়া সর্বত্র ইংরেজীর প্রচলন। সেটা অবশ্য বেসরকারী ভাবে। সুইসরা একাধিক ভাষা শিখতে অভ্যস্ত।

একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রধর্ম হবে এ ধারণা ইউরোপেও ছিল। তার দরুন প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের জ্বালিয়েছে। আজকাল আর সে ধারণা নেই। কিন্তু একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হবে, এ ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। এর ফলে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছে। আলসাস লোরেনের লোক একবার জার্মানদের হাতে মার খেয়েছে, একবার ফরাসীদের হাতে।

এখন ভারতের কথা বলি। একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রধর্ম হবে, এ ধারণা যাঁদের মধ্যে নেই তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হবে। বেলজিয়ামের চেয়ে, সুইটজারল্যাণ্ডের চেয়ে বহুগুণ বৃহৎ যে দেশ, যার ভাষাসংখ্যা খুব কম করে ধরলেও চোদ্দ পনেরটি সেদেশ যখন পরাধীন ছিল তখন একটিমাত্র বিদেশী ভাষার দ্বারা একসূত্রে গাঁথা ছিল। তার থেকে একটা সংস্কার জন্মেছে যে রাষ্ট্রভাষা একাধিক হতে পারে না। আমি কিন্তু এই সংস্কারের স্বতঃসিদ্ধতা স্বীকার করিনি। এটার সত্যতা নির্ভর করছে সকলের সম্মতির উপরে, সুবিধার উপরে, ন্যায়বোধের উপরে। অধিকাংশের ভোটের জোরে কোনো একটি ভারতীয় ভাষাকে আর সকলের উপর চাপালে পাকিস্তানের ইসলামী রাষ্ট্রের মতো একটা অপরিণামদর্শী সমাধান হয়। সেরকম একটা সমাধান যখন বেলজিয়ামে বা সুইটজারল্যাণ্ডে টিকল না তখন ভারতেও টিকতে পারে না। ইতিমধ্যেই তামিলদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রস্তাব উঠেছে। মাত্র পনেরো বছর যেতে না যেতেই এই। এখনো তো অর্ধ শতাব্দী কাটেনি। ভারত যদি ছত্রভঙ্গ হয় তবে ভাষার ইসুতেই হবে।

হিন্দীর পিছনে সকলের সম্মতি নেই। সকলের তাতে সুবিধা হবে না। সকলের ন্যায়বোধ তার দ্বারা চরিতার্থ হবার নয়। তার পক্ষে একটিমাত্র যুক্তি। অধিকাংশ লোক হিন্দী চায়। অর্থাৎ অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। পাকিস্তানে যেমন ধর্মের ব্যাপারে অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত, ভারতে তেমনি ভাষার ব্যাপারে অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের আশঙ্কা জাগে। এমন কয়েকটি বিষয় আছে যা গায়ের জোরে বা ভোটের জোরে নিষ্পত্তি করা যায় না। ধর্ম তার একটি। ভাষা তার আরেকটি। ধর্মের বেলা আমরা বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছি। ভাষার বেলাও কি দিতে পারিনে ?

তর্কটা হিন্দী বনাম ইংরেজী নয়। ইংরেজীকে সরানোর পরে ঘোরতর বিবাদ বেধে যাবে। তামিলরা হিন্দীকে মানবে না, নাগারা মানবে না, কাশ্মীরীরা মানবে না। বাঙালীরাও মানবে না। এমনি না মানার লক্ষণ চার-

দিকে। কংগ্রেস থাকতেই এই। কংগ্রেস কি চিরস্থায়ী? পরে যে দলটার হাতে ক্ষমতা পড়বে সে দল যদি সবকটা রাজ্যের আস্থা না পায় তখন হিন্দীর প্রতি বিরাগ হবে মানুষকে খেপিয়ে তোলার একটা উপায়। যেমন হিন্দুর উপর বিরাগ হয়েছিল মুসলমানকে বিভ্রান্ত করার অব্যর্থ উপায়। সেইজন্যে তর্কটা হিন্দী বনাম ইংরেজী নয়। তর্কটা আসলে হচ্ছে হিন্দী বনাম তামিল-বাংলা-পাঞ্জাবী ইত্যাদি। হিন্দী হবে কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র ভাষা, এর মানে হিন্দী হবে সারা ভারতের একচ্ছত্র ভাষা। যাদের মাতৃভাষা হিন্দী নয় তারা হিন্দী শিখতে গিয়ে দেখবে যে, প্রত্যেকটি হিন্দীভাষী শিশু জন্মত স্টার্ট পেয়ে এগিয়ে রয়েছে। যেমন জন্মত স্টার্ট পেয়ে এগিয়ে থাকত প্রত্যেকটি ইংরেজ শিশু। ইংরেজীকে যারা বিদায় করবে তারা কি ইংরেজীর একমাত্র উত্তরাধিকারীকেও একদিন ঘাড় থেকে নামাতে চাইবে না?

হিন্দী যে ইংরেজীর একমাত্র উত্তরাধিকারী হবার স্বপ্ন দেখছে হিন্দী কি বুঝতে পারছে না যে, আর সকলের সঙ্গে ভাগ না করে ভোগ করা যায় না? ভাগ করার নমুনা কি এই যে, হিন্দীই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ও আর-সব আঞ্চলিক ভাষা? সব কটা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা চাই। সেটা যদি কাজের কথা না হয় তবে এমন একটি ভাষাকে হিন্দীর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করা চাই যার দ্বারা আর সকলের ন্যায়বোধ চরিতার্থ হবে। প্রতিযোগিতার বা পরীক্ষার ভাষা যদি হয় ইংরেজী, তা হলে আমাদের ন্যায়বোধ যতখানি চরিতার্থ হয় হিন্দী হলে ততখানি হয় না। বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজীকে হটাতে চাও? বেশ। তার বদলে এমন একটি ভাষাকে হিন্দীর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত কর যে-ভাষা আমাদের ন্যায়বোধকে পীড়া দেবে না। সে-ভাষাটি যে কোন ভাষা, অহিন্দী-ভাষীদের দ্বারাই সেটি স্থির হোক।

আর কোনো ভাষা ভারতের সকল প্রান্তে ইংরেজীর মতো ব্যাপকভাবে প্রচলিত নয়, এটা একটা প্রত্যক্ষ সত্য। যেখানে হিন্দী চলে না সেখানেও ইংরেজী চলে। ইংরেজীর অধিকারে না থাকলে সে সব অঞ্চল হিন্দীর অধিকারেও আসত না। ইংরেজী নামক সত্যটির উৎপত্তিস্থল ইংলণ্ড। তেমনি আরো অনেকগুলি সত্যেরও উৎপত্তি ইংলণ্ডে বা ইউরোপে। আমাদের শাসন-ব্যবস্থা, সংবিধান, আইন আদালত, পার্লামেণ্ট, আর্মি, নেভী, পুলিস, স্কুল কলেজ, লেবরেটারি, রেল স্টীমার, ডাকঘর ডাক্তারখানা ব্যাঙ্ক, স্টক এক্সচেঞ্জ, ছাপাখানা খবরের কাগজ, থিয়েটার, সিনেমা, রেডিও, ট্রাম, বাস, মোটর—কোনটিই বা বিদেশাগত নয়? এমন কি কংগ্রেসও তো বিদেশী। হিন্দ, হিন্দু, হিন্দী। এসবও তো বিদেশী ভাষার শব্দ। আজকাল স্বদেশী পারিভাষিক শব্দ দিয়ে শোধন করে নেওয়া চলেছে। "রাজ ভবন" বললে স্বদেশিয়ানার একটা বিভ্রম সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে বস্তুর নাম পালটে দেওয়া হয় তার বস্তুসত্তা অবিকল তেমনি রয়ে যায়। টেলিফোনকে কী একটা বিকট হিন্দী নাম দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও সেটা টেলিফোন নামক বিদেশী একটা যন্ত্রই। বিদেশী বলেই সেটা বর্জনীয় নয়।

তেমনি ইংরেজী। তার সঙ্গে পরাধীনতার সম্পর্ক একদা ছিল। এখন তো নেই। ভবিষ্যতেও সে সম্পর্ক ফিরবে না। ইতিমধ্যেই স্থির হয়ে গেছে যে সব ছাত্রকেই একটা স্তরে ইংরেজী শিখতে হবে। অবশ্যশিক্ষণীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীতে কারো আপত্তি নেই। তাই যদি হলো তবে শিক্ষার শেষ ধাপে পরীক্ষার ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম ইংরেজী হলে আপত্তির কী কারণ থাকতে পারে? তামিলরা ও বাঙালীরা জিতে যাবে, হিন্দীভাষীরা তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না, এই কারণ নয় তো? উপরের দিকে পরীক্ষার ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম ইংরেজী যেমন ছিল তেমনি থাকাই রাষ্ট্রের স্বার্থ। সেইভাবেই রাষ্ট্র যোগ্যতম প্রার্থী বেছে নিতে পারে। করদাতার অর্থ সেই-ভাবেই সৎপাত্রে পড়বে। নিকট ভবিষ্যতে আমি এই ব্যবস্থার রদবদলের পক্ষপাতী নই। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়াই যদি নীতি হয় তবে প্রতিযোগিতার মাধ্যম ইংরেজীই থাকবে, ইংরেজী ভিন্ন আর কোনো ভাষা হবে না। যদি হিন্দীকেও অন্যতম মাধ্যমে কর তবে বাংলাকেও করতে হবে, তামিল তেলেগু কন্নাডিগ মালয়ালমকেও করতে হবে।

জাতীয় মর্যাদার খাতিরে হিন্দী ভারত রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা হোক, কিন্তু আভ্যন্তরিক ন্যায়ের খাতিরে ইংরেজীই পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম রূপে থাকুক। ইংরেজী মাধ্যম না থাকলে পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম হোক বাংলা, উর্দু, মরাঠী, গুজরাতী ইত্যাদি চোদ্দ পনেরোটি ভাষা। শুধু হিন্দী নয়। যেখানে হিন্দীকে বসালে অহিন্দীভাষীদের ক্ষতি সেখানে ইংরেজীকে রাখাই সমীচীন। বিদেশী বলে তাকে খেদিয়ে দিলে স্বদেশী বলে শুধু হিন্দীকে নয়, বাংলাকে, পাঞ্জাবীকে, তামিলকেও বসাতে হবে। যেখানে কারুর কোনো ক্ষতি নেই সেখানে হিন্দী আরাম করে বসুক। কিন্তু অপরের ক্ষতি যেখানে সেখানে হিন্দীর আরাম করে বসার অধিকার নেই। জাতীয়তার জন্যে তাকেও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। এটা একভাষী দেশের বেলাই খাটে। ভারতের মতো বহুভাষী দেশে এটাকে খাটাতে যাঁরা চাইছেন তাঁরা মনে মনে ইংরেজীরই নজির অনুসরণ করছেন। ইংরেজী যেমন একচ্ছত্র ছিল তেমনি একচ্ছত্র হবে অন্য একটা ভাষা। অন্য একটিমাত্র ভাষা। সেই বিদেশী লজিকের জোরে হিন্দীকেও একচ্ছত্র করতে হবে। কিন্তু বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজী যদি বিদায় হয় তবে তার নজিরটাকেই বা মানতে যাব কেন? জাতীয় ঐক্য কি সুইসদেরও নেই? বেলজিয়ানদেরও নেই? একাধিক রাষ্ট্রভাষা কি তাদের ঐক্যহানি ঘটিয়েছে?

শেষ পর্যন্ত তর্কটা দাঁড়ায় ইংরেজী হলো বিদেশীর ভাষা, বিজেতার ভাষা। তাকে বিদায় না দিলে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হবে না। বেশ, তাই হোক। তা হলে ইংরেজীর নজিরটাকেও মন থেকে ঝেড়ে ফেলা যাক। ভারতের সব কটা ভাষাকেই হিন্দীর সঙ্গে সমান মর্যাদা দিয়ে ভারতীয় ইউনিয়নের সরকারী ভাষা করা হোক। সেটা কাজের কথা নয় এ যুক্তি আর আমরা

শুনতে চাইনে। একটা বহুভাষী দেশের রাষ্ট্রভাষা একটাই হবে এটাও কি কাজের কথা? ইংরেজরা তাদের নিজেদের সুবিধের জন্য ওরকম করেছিল। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভারতীয়েরও ওতে কিছু সুবিধে হয়েছিল। কিন্তু জনগণের দিক থেকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা—হিন্দী হলেও—কাজের কথা নয়। যতগুলি ভাষা ততগুলি রাষ্ট্রভাষা এইটেই কাজের কথা। আমরা যদি এই সত্যকে স্বীকার না করি, এই সত্যের সঙ্গে আপস রফা না করি তবে অমীমাংসিত সমস্যা একদিন আপনার পথ আপনি করে নেবে। বহুভাষী দেশ বহু রাষ্ট্র হবে।

ইউরোপীয়রা যদি না আসত তা হলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতো। এরা যে যার সুবিধা-মতো এক একটা স্বদেশী ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক স্বদেশী ভাষাকে। হিন্দীর সার্বভৌমত্ব সব হিন্দু মেনে নিত না। উর্দুর সার্বভৌমত্ব সব মুসলমান মেনে নিত না। হয়তো সবাই মিলে একদিন একটা ফেডারেশন বা কনফেডারেশন গড়ে তুলত। কিন্তু সেই সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা যে একমাত্র হিন্দী বা একমাত্র উর্দু হওয়া উচিত এটা সবাইকে দিয়ে মানিয়ে নেওয়া খুবই কঠিন হতো। অত দূর যেতে হবে কেন? ধরুন ১৯৪৭ সালে যদি জিন্নাসাহেব ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় রাজী হয়ে যেতেন, যদি অখণ্ড ভারতবর্ষের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হতো তা হলে সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা কি এক হতো, না একাধিক হতো, না হিন্দী উর্দুর যমজরূপ হতো? সকলেই জানেন যে একমাত্র হিন্দীর একচ্ছত্র দাবি কেউ স্বীকার করতেন না। না জিন্না, না গান্ধী। ঐক্যের খাতিরে হয় যমজ ভাষাকে সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা করতে হতো, নয় ইংরেজীকেই অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখতে হতো।

দেশ ভাগ হয়ে গেছে বলেই একদিকে হিন্দী ও অন্যদিকে উর্দু একচ্ছত্র হবার ছাড়পত্র পেয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমান হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে যে ওই ছাড়পত্রটা উর্দুভাষী মুসলমানদের শাসন শোষণের সনদ। তাই তারা বাংলাকেও উর্দুর সমান অংশীদার করার জন্যে প্রাণপণ করছে। আক্ষরিক অর্থে প্রাণ দিয়েছেও। উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে এটা তারা কোনো কালেই মেনে নেবে না। তারা যেন বেলজিয়ামের ফ্লেমিশ ভাষী। সঙ্গে থাকলে তাদের মাতৃভাষাও পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষা হবে, শুধু পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষা নয়। উর্দুভাষীরা যদি তাতে নারাজ হয়, তবে রাষ্ট্র দু' ভাগ হয়ে যাবে। তার জন্যে দায়ী হবে উর্দুভাষীদের জেদ। আর নয়তো ইংরেজীকেই অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখতে হবে। আপসের আর কোনো উপায় নেই। ইংরেজী বিদেশী ভাষা, কিন্তু আপসের একমাত্র উপায়।

উর্দুর বিরুদ্ধে নয়, উর্দুভাষীদের প্রচ্ছন্ন সনদের বিরুদ্ধেই পূর্ব-পাকিস্তানীদের এ বিক্ষোভ। তেমনি হিন্দীভাষীরাও একটা সনদ পেয়ে

গেছে। ভাবী ভারতের শাসক ও ধনিক শ্রেণী হবে হিন্দীভাষী এরকম একটা ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। মহাত্মাজী ভেবেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অতি অল্প ক্ষমতা দেবেন, আর সব ছড়িয়ে দেবেন প্রদেশে প্রদেশে, গ্রামে গ্রামে। ঠিক উল্টোটি হয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের ভরসা নেই। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বিকেন্দ্রীকরণের অন্তরায়। দেশ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনকেই বরণ করে নিয়েছে। অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে হিন্দীভাষীদের ধনাধিক্য ও ভোটাধিক্যের উপর ছেড়ে দিলে সেটা গণতন্ত্রের মতো দেখায়, কিন্তু সেটা হয় উত্তর ভারতের দ্বারা ভারাক্রান্ত মাথাভারী গণতন্ত্র। তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী। তামিলদের একদল এরই মধ্যে খেপেছে। হিন্দী নামক ভাষার বিরুদ্ধে ততটা নয়, যতটা হিন্দীভাষী শাসক ও ধনিক শ্রেণীর সনদের বিরুদ্ধে। মিটমাট না হলে দেশ আবার ভাঙবে। আপসের আর কী উপায় আছে—ইংরেজীকে সহচর ভাষারূপে অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখা ভিন্ন ?

আমাদের হাজার বছরের অভিজ্ঞতা বলছে যে দেশ বহুখণ্ড হলে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। বিপদের সময় দেশবাসী একজোট হয় না। সুতরাং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন চাই। এতকাল পরে আমরা আমাদের নিজেদের একটি কেন্দ্রীয় সরকার পেয়েছি। কাশ্মীরী, কেরলী, বাঙালী, তামিল, অসমীয়া, গুজরাতী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি নানা প্রান্তের লোক একবার কুরুক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিল শুনেছি। সেটা কিন্তু মিলেমিশে দেশ চালানোর জন্যে নয়। ইতিহাসে এই প্রথমবার আমরা একজোট হয়ে রাষ্ট্র চালাচ্ছি। এ জোট যদি ভেঙে যায় তবে আবার পরাধীনতা। একে অটুট রাখতেই হবে। অথচ একমাত্র রাষ্ট্রভাষার সনদ যে একে তলে তলে ভাঙছে। এটা এমন একটা ইস্যু যার একপ্রান্তে হিন্দীভাষীদের স্বার্থ, অপর প্রান্তে অহিন্দীভাষীদের স্বার্থ, মাঝখানে ওই আপসের প্রস্তাব। ওই সহচর ভাষা। ভাঙনকে রোধ করতে হলে ওর চেয়ে আর কোনো সহজ উপায় নেই। বিদেশী বলে ইংরেজীতে যাঁদের আপত্তি তাঁরা ইচ্ছে করলে ইংরেজীর বদলে বাংলা তামিল মরাঠী ইত্যাদি চোদ্দ পনেরটি ভাষাকে সহচর ভাষা বানাতে পারেন। কিন্তু সেটার নাম আরো সহজ নয়, আরো জটিল।

'বিদেশী' এই বিশেষণটাই যদি যত নষ্টের গোড়া হয়ে থাকে তবে আমরা তার বদলে 'আন্তর্জাতিক' এই বিশেষণটি ব্যবহার করতে পারি। স্বাধীন রাষ্ট্র যদি কমনওয়েলথ নামক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তো আন্তর্জাতিক ভাষা ব্যবহার করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। স্বাধীনতার সঙ্গে সেটা যদি খাপ খায়, তবে এটাই বা বেখাপ হবে কেন ? আগেকার দিনে বিদেশী ভাষার বিরুদ্ধে যতগুলি যুক্তি শোনা যেতো ইদানীং স্বদেশী ভাষার বিরুদ্ধেও ততগুলি শোনা যাচ্ছে। তামিলরা তো সাফ বলে দিয়েছে যে, হিন্দীও ওদের পক্ষে বিদেশী। আমরাও তো দেখছি হিন্দী শিখতে ইংরেজীর চেয়ে কম শক্তি খরচ হলেও হিন্দীতে শেখবার যোগ্য বিষয় অল্পই আছে, ইংরাজীতে বিস্তর। শব্দগুলো হয়তো চেনা, কিন্তু অর্থ এক নয়। আর ব্যাকরণ তো আরবীর

কাছাকাছি যায়। 'মহাত্মা গান্ধীকী' হলো কেন? 'কা' হলো না কেন? কারণ 'জয়' শব্দটা স্ত্রীলিঙ্গ। আর বিশেষ্য যদি স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তবে বিশেষণকেও স্ত্রীলিঙ্গ হতে হবে, ক্রিয়াপদকেও স্ত্রীলিঙ্গ হতে হবে। কিন্তু গোড়ায় গলদ, 'জয়' কেন স্ত্রীলিঙ্গ হবে। 'ফতে' স্ত্রীলিঙ্গ বলে?

যাই হোক হিন্দী আমাদের দেশের সব চেয়ে বহুল প্রচলিত ভাষা। দেশের লোকের সঙ্গে কারবার করতে হলে হিন্দী আমাদের শিখতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা না হলেও শিখতুম। শিখেছি। 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়' হেঁকেছি। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বলে সুখীই হয়েছি। তা হলে বাধছে কোন্‌খানে? বাধছে এইখানে যে, ভারত যেমন ধর্মের বেলা নিরপেক্ষ তেমনি নিরপেক্ষ ভাষার বেলা নয়। হিন্দুধর্মের সঙ্গে সে তার রাষ্ট্রকে একাকার করেনি, কিন্তু হিন্দীভাষার সঙ্গে তা করেছে। ভারত হিন্দুরাষ্ট্র নয়, কিন্তু সংবিধানের যদি সংশোধন না হয়, তবে ১৯৬৫ সালে হিন্দী ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে একমেবাদ্বিতীয়ম্ হওয়ামাত্র ভারতকে বলতে পারা যাবে হিন্দী-রাষ্ট্র। তখন হিন্দীভাষীরাই হবে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। পাকিস্তানের হিন্দুরা যেমন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ভারতের বাংলাভাষী তামিলভাষী পাঞ্জাবীভাষীরাও তেমনি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বনবে। সংবিধান রচনার সময় কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেমব্লির সদস্যেরা সর্ব-সম্মতিক্রমে হিন্দীকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করেননি। তাঁদের মধ্যে তখনি দ্বিমত দেখা দিয়েছিল। এক পক্ষ ছিলেন হিন্দীর সমর্থক। অপর পক্ষ ইংরেজীর। বলা বাহুল্য ইংরেজীর সমর্থকরা জানতেন যে ইংরেজী একটি বিদেশী ভাষা। শুধু বিদেশীর নয় বিজেতার ভাষা। ইংরাজীর সমর্থন করেছিলেন বলে তাঁরা যে কম স্বদেশী বা কম স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন তা নয়। তাঁরাও কংগ্রেসের লোক। ভোটে দিয়ে দেখা গেল দু'পক্ষের ভোটসংখ্যা প্রায় সমান সমান। হিন্দীর সঙ্গে ইংরেজীর সামান্য একটিমাত্র ভোটের ব্যবধান। এরূপ ক্ষেত্রে হিন্দী ইংরেজী দুটি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা উচিত ছিল।

এখানে আর একটি কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই। আমাদের সংবিধানে কোনো ভাষাকেই 'রাষ্ট্রভাষা' বা 'জাতীয় ভাষা' বলে আখ্যাত করা হয়নি। হিন্দীকে বলা হয়েছে 'সরকারী ভাষা'। সংবিধান যদি সংশোধন করা হয়, তবে ইংরেজীকে বলা হবে 'সহচর সরকারী ভাষা'। 'রাষ্ট্রভাষা', 'জাতীয় ভাষা' ইত্যাদি আখ্যা প্রকৃতপক্ষে সব ক'টি ভারতীয় ভাষারই পাওনা। কোনো একটি ভাষার নয়। হিন্দী যদি সে রকম একটা আখ্যা পেয়ে থাকে, তবে সেটা বিধিসম্মতভাবে নয়। সেটা পাঁচজনের মুখে মুখে। যেমন সুবোধ মল্লিক মহাশয়কে লোকে 'রাজা' বলত। যেমন কংগ্রেস সভাপতিকে লোকে 'রাষ্ট্রপতি' বলত। রাষ্ট্রভাষা বলে হিন্দীর একটা নামডাক হয়েছে। মন্ত্রীরাও তাকে রাষ্ট্রভাষা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু সংবিধানে এর কোনো সমর্থন নেই। সুতরাং হিন্দী এমন কিছু হারাচ্ছে না, যা সংবিধান অনুসারে তার প্রাপ্য। আর ইংরেজীও এমন কিছু পাচ্ছে না যার বলে সে রাষ্ট্রভাষা বলে গণ্য

হবে। লোকমুখে হিন্দীই থেকে যাবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু সংবিধানে তার একটি সহচর সরকারী ভাষা জুটবে। সেটি যদি ইংরেজী না হয়ে উর্দু কিংবা তামিল হতো তাতেও হিন্দী গোঁড়াদের আপত্তির তরঙ্গ উঠত। ইংরেজীকে যেমন তাঁরা 'বিদেশী' বলে অপাংক্তেয় করতে চান, তেমনি তাকেও করতেন অন্য কোনো ছুতোয়। মোদ্দা কথা শরিক তাঁরা চান না। হলেই বা সে স্বদেশী।

হিন্দী থাকছে, ইংরেজীও থাকবে, ভবিষ্যতে ভাববিনিময়ের ভাষার অভাব হবে না। যাঁরা হিন্দীতে চান তাঁরা হিন্দীতে ভাব বিনিময় করবেন, যাঁরা ইংরেজীতে চান তাঁরা ইংরেজীতে। যদি বিনিময় করবার মতো ভাব থাকে। যদি সে রকম মনোভাব থাকে। সরকারের কাজকর্মের ভাষা ছাড়া কি ভাববিনিময় হয় না? সংস্কৃতেও হতে পারে। উর্দুতেও।

গান্ধীজী সাধারণত হিন্দীতেই ভাববিনিময় করতেন, কিন্তু জীবনের শেষ-দিনও তাঁকে বাংলা হাতের লেখা তৈরি করতে দেখা গেছে। নোয়াখালীতে ফিরে বাংলায় ভাববিনিময় করতেন। তামিলদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের জন্যে তিনি তামিল ভাষা শিখেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে। পশ্চিমা মুসলমানদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের জন্যে তিনি উর্দুতেও কথা বলতেন। রথীবাবুর সঙ্গে, আমার সঙ্গে তিনি ইংরেজীতে কথা বললেন ১৯৪৫ সালে। ভাববিনিময় একটিমাত্র ভাষায় হবে—হিন্দীতে—এমন অদ্ভুত ধারণা তো গান্ধীজীর ছিল না।

এই প্রসঙ্গে একটি মজার গল্প মনে পড়ল। বছর কয়েক আগে স্বাধীন ভারতের সংস্কৃতভাষী সুধীদের এক সম্মেলন হয়। আমাদের এক বিশিষ্ট অধ্যাপক গেছলেন যোগ দিতে। ফিরে এসে বললেন, আলোচনা হলো—কোন্ ভাষায়, বলুন তো? ইংরেজীতে!

আর একটা মজার গল্প বলি। পাঞ্জাবে সেদিন দারুণ বচসা বেধে গেল। খোঁপা আর এলোচুলে নয়, পাঞ্জাবীতে আর হিন্দীতে। তামাশা এই যে, দু'পক্ষেরই বাক্যবাণ বর্ষিত হলো উর্দু সংবাদপত্রে। মামলার ভাষা হলো উর্দু। মনে আছে ছেলেবেলায় আমি একবার লালা লাজপৎ রায়ের 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার নমুনা চেয়ে পাঠাই। পত্রিকা দেখে আমার চক্ষুঃস্থির। হিন্দী নয়, ইংরেজী নয়, উর্দু। যেখানে উর্দু উভয়ের জানা সেখানে ভাববিনিময়ের ভাষা উর্দু হওয়াই স্বাভাবিক। স্কুল কলেজে যিনি যাই পড়ুন না কেন দেখা হলে হিন্দুতে আর শিখে বার্তাচিৎ হয় উর্দুতেই।

সরকারী ভাষা বলে গণ্য না হলেও উর্দুতেই পশ্চিমা হিন্দু ও শিখদের স্বাচ্ছন্দ্য আমি অনেকবার লক্ষ করেছি। তেমনি সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃত না হলেও ইংরেজীর কদর এদেশে দীর্ঘকাল থাকবে। কেন থাকবে তার একশ কারণ। জাতীয়তাবাদীরা যত সহজে ইংরেজকে হটিয়েছেন, তত সহজে ইংরেজীকে অচলিত করতে পারবেন না। কাজেই সে চেষ্টা না করাই ভালো। স্বাধীনতার পরে আমাদের গ্রামে গ্রামে হাইস্কুল হয়েছে।

লোকে চায় হাই স্কুল। টোল নয়, মাদ্রাসা নয়, বুনিয়াদী নয়, বিশুদ্ধ বাংলা বিদ্যালয় নয়, সেই সেকালের মতো হাই স্কুল। কিংবা টেকনিক্যাল স্কুল। কলেজের সংখ্যাও বাড়ছে। যেখানে মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী উঠে যাচ্ছে সেখানেও বিষয় হিসাবে ইংরেজী থেকে যাচ্ছে। এটাও জনগণের ইচ্ছায়।

ইংরেজীর কাজ হবে স্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক করে দেওয়া বা ঠিক করতে সাহায্য করা। সে কাজ হিন্দীর দ্বারা হতে পারে না। সামনের দশ বিশ বছরে তো নয়ই, এই শতাব্দীতে নয়। একবিংশ শতাব্দীর ভাবনা একবিংশ শতাব্দী ভাববে। আমরা যারা বিংশ শতাব্দীতে বাস করছি তাদের ভাবনা বিংশ শতাব্দীকেই ঘিরে। যতদূর দেখতে পাচ্ছি ইংরেজীর প্রয়োজন থাকবে। সে প্রয়োজন প্রশাসনঘটিত নাও হতে পারে। বাংলাদেশ যদি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হতো তা হলে আমরা কেউ ইংরেজীকে সরকারী ভাষা বা তার সহচর করতুম না। সব যুক্তিকে খারিজ করত সেণ্টিমেণ্ট। বাংলাভাষাই হতো রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রেও ইংরেজীর প্রয়োজন ফুরোত না। লোকে ইংরেজীকে চাইত বাংলার স্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক করে দেবার জন্যে। লেখার ও সমালোচনার আদর্শ চোখের উপর তুলে ধরার জন্যে। ইংরেজের যুগ গেছে, ইংরেজীর যুগ যায়নি। আরো আধ শতাব্দী থাকবে।

কিন্তু তাই বা কেমন করে বলি? খাস ইংরেজের দেশে ইংরেজী যদি পেছিয়ে পড়ে, তেমন বড় লেখক যদি না জন্মান, বইগুলো যদি হয় অন্তঃসারশূন্য, সাময়িকপত্রগুলো যদি হয় অন্তঃসারশূন্য, খবরের কাগজগুলো যদি হয় বিশেষত্বহীন, সেই জ্বলন্ত বিবেক যদি নিবে আসে, চিন্তার স্বাধীনতা যদি চোরাবালিতে ঠেকে যায়, তা হলে অর্ধ শতাব্দীকাল কে একটা মরা সাহিত্য কাঁধে করে বেড়াবে? ইংরেজী যদি বাংলাকে বা হিন্দীকে এগিয়ে দিতে না পারে তবে ইংরেজীর অবস্থানকাল আধ শতাব্দীও নয়। আরো আগে তার উপর থেকে লোকের মন উঠে যাবে। মানুষকে জোর করে ইংরেজী শেখানোর আমি পক্ষপাতী নই। ইংরেজী যে অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় হয়েছে এটাও আমার মতে অনুচিত। ছেলেরা যদি ইংরেজী শিখতে না চায় না শিখবে। না শিখলে পরে পশতাবে। নিজেদের ছেলেমেয়ে হলে তাদের বলবে অমন ভুল না করতে। কতক লোকের পশতানো দরকার। আজকাল মাড়োয়ারীর ছেলেরা মন দিয়ে ইংরেজী শেখে। বাঙালীর ছেলেরা ফাঁকি দেয়।

ইংরেজীর পেছিয়ে পড়া যেমন অসম্ভব নয় হিন্দীর এগিয়ে যাওয়াও তেমনি সম্ভবপর। এক পুরুষের মধ্যে হিন্দীর অসাধারণ উন্নতি হতে পারে। ইচ্ছা করলে সে উর্দুকে আত্মসাৎ করতেও পারে। দেবনাগরী লিপি ছাড়া অন্যান্য লিপিতে কি হিন্দী লেখা যায় না, ছাপা যায় না? রোমক লিপিতে ছাপা হলে হিন্দী বই কাগজ আরো চলবে। বাংলা লিপিতে ছাপলে বাঙালীরা অনায়াসে পড়বে। কতক হিন্দী বই কাগজ একাধিক লিপিতে ছেপে পরীক্ষা করা উচিত পাঠকসংখ্যা কী পরিমাণ বাড়ে। অনেকে দেবনাগরীর ভয়ে হিন্দীর দিকে ঘেঁষতে চায় না। তাদের উপর জোরজুলুম

করে যেটুকু ফল হবে তার চেয়ে ঢের বেশী হবে বিভিন্ন লিপিতে হিন্দী বই কাগজ ছেপে। তার পর হিন্দীর ব্যাকরণ আরো সরল হওয়া চাই। পশু-পাখির কার কী লিঙ্গ তাই আমাদের জানা নেই। শব্দমাত্রেরই লিঙ্গ থাকবে ও আমরা তা জানব, এ কী জ্বালা!

শেষ কথা, ইংরেজীর দীপশিখা নিবে গেলেই যে হিন্দীর দীপশিখার, বাংলার দীপশিখার, অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির দীপশিখার দেওয়ালি হবে এটা একপ্রকার নঞর্থক চিন্তা। বরং ইংরেজীর দীপ যতক্ষণ জ্বলছে জ্বলতে দাও, তার সাহায্যে নিজেদের দীপ জ্বালিয়ে নাও। ফুঁ দিয়ে তাকে অকালে নিবিয়ে দিলে পরে হয়তো দেখবে নিজেদের দীপও নিবু-নিবু। দেওয়ালি হবে, না কালীপুজো হবে, কে এখন থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করবে?

মাতৃভাষা

হায়দরাবাদে আপনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা "মাতৃভাষা" নামক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে ও তার এককপি আপনি আমাকে সাদরে উপহার দিয়েছেন। এর জন্যে যদি আমি ধন্যবাদ দিই তা হলে সেটা মামুলী শোনাবে। আমাদের সম্পর্ক আরো গভীর।

শিক্ষার মাধ্যম যে মাতৃভাষাই হওয়া উচিত এটা আপনার বহুকালের মত। আপনার পুরোনো মতই আপনি নতুন করে ব্যক্ত করেছেন। ভুল বোঝার কোনো অবকাশ রাখেননি। অথচ এই নিয়ে ভুল বোঝারও বিরাম নেই। অনেক কটু কথাই আপনাকে শুনতে হচ্ছে। আরো শুনতে হবে। কারণ আপনি একটা বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। বিতর্কটা যদি শুধুমাত্র শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে হতো তা হলে তা অত তীব্র হতো না। তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে আরো পাঁচটা প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলোকে এক কথায় উড়িয়ে দিতে পারা যায় না।

বাংলা, ওড়িয়া প্রভৃতি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ইংরেজদের আমলেও ছিল। যারা ডাক্তারি পাশ করত তাদের বলা হতো ভি এল এম এস। ছেলেবেলায় এ রকম ডাক্তার জনা-তিনেক দেখেছি। তখনকার দিনে যাকে মাইনর পাশ বলা হতো তার একটা স্বদেশী সংস্করণও ছিল। তার নাম মিডল ভার্নাকুলার। এম ভি পাশ করে কেউ কেউ হাইস্কুলে আসত। তাদের বসিয়ে দেওয়া হতো কয়েক ক্লাস নিচে। তারা ইংরেজী শিখে নিয়ে পরে প্রমোশন পেতো।

তাছাড়া ছিল মাদ্রাসা, মক্তব ও টোল। এখনো আছে। জনগণকে আপনি ইচ্ছা করলে মাদ্রাসায়, মক্তবে ও টোলে পড়াতে পারেন। সেসব

ভার্নাকুলার স্কুল, ভার্নাকুলার মেডিক্যাল স্কুল অন্য নামে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে আজ এই মুহূর্তেই কোটি কোটি বালক-বালিকাকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করতে পারা যায়। এর জন্যে শুধু এইটুকু করলেই যথেষ্ট হবে যে শিক্ষকদের বা অধ্যাপকদের নির্দেশ দেওয়া হবে ইংরেজী বই দেখে মাতৃভাষায় পড়াতে ও পরীক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া হবে মাতৃভাষায় প্রশ্ন করতে, উত্তরপত্র পরীক্ষা করতে। পরে ইংরেজী বইয়ের বদলে মাতৃভাষায় বই লিখিয়ে নেওয়া হবে।

কিন্তু আপনার ভার্নাকুলার স্কুলের বা কলেজের সঙ্গে সঙ্গে যদি এক সার ইংরেজী স্কুল বা কলেজ থেকে যায়, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে যদি সেসব প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পায়, তা হলে দেখবেন তাদেরই বাজারদর ও সামাজিক মর্যাদা বেশী। স্বাধীনতার পরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ জনগণের জন্যে মাতৃভাষার মাধ্যম বরাদ্দ করেছে। কিন্তু ইংরেজী মাধ্যম নিষেধ করে দেয়নি। কলকাতা শহরেই অনেকগুলি নতুন স্কুল হয়েছে, যেখানে ইংরেজীতে পড়ানো হয়। চারগুণ খরচ, তবু ছেলেমেয়েদের ভীড়। বিহারে তো হিন্দীর জয়জয়কার। কিন্তু মিশনারীদের স্কুল-কলেজের সংখ্যা বেড়ে গেছে। বাপ মা হিন্দীর অধ্যাপক অধ্যাপিকা, মেয়েকে দিয়েছেন কন্‌ভেন্ট স্কুলে। কটক থেকে এক মন্ত্রী এসেছিলেন শান্তিনিকেতন দেখতে। বললেন, তাঁর দুই ছেলেকে তিনি দিয়েছেন দিল্লীতে, কোনো এক ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে।

ইদানীং শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে বাংলা মাধ্যমের সঙ্গে সমান্তরালভাবে ইংরেজী মাধ্যমও প্রবর্তিত হয়েছে। যারা দূর থেকে আসবে তাদের জন্যে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাংলা মাধ্যমে এতকাল যারা পড়ে এসেছে তাদের কেউ কেউ এক বছর লোকসান দিয়েও ইংরেজী মাধ্যমে পড়তে চায়। কেন এই দুর্মতি? বাঙালীর মেয়ে কেন বাংলা মাধ্যম ছেড়ে ইংরেজী মাধ্যম বরণ করে? আমার মেয়ে নয়, আমি এর উত্তর দিতে পারিনে।

আপনি বৈজ্ঞানিক মানুষ। তথ্য নিয়ে আপনার কারবার। তথ্য হচ্ছে এই যে, বালক-বালিকাদের মধ্যেও দুর্মত দেখা যায়। তাদের গুরুজনদের মধ্যেও। ইংরেজী মাধ্যম অস্বাভাবিক ও ব্যয়সাপেক্ষ। তাসত্ত্বেও বাপ-মা ছেলেমেয়েকে কন্‌ভেন্ট স্কুলে পাঠান, মিশনারী স্কুলে দেন, ক্ষমতায় কুলোয় তো দেরাদুনে রাখেন। আপনি হয়তো ভাবছেন এঁরা ইঙ্গবঙ্গ। না, এঁরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, কেউ কেউ সাম্যবাদী। কারো কারো মতবাদ সাম্প্রদায়িক। ইংরেজের উপর যারা হাড়ে হাড়ে চটা, ইংরেজীর উপর তাদের অন্ধ নির্ভরতা। তাদের বিশ্বাস ইংরেজী ধরণের শিক্ষাই সত্যিকার শিক্ষা, দেশী ধরণের শিক্ষা তারই একটা সুলভ সংস্করণ। যেমন ছিল সেকালের সেই ভি এল এম এস।

জোর-জবরদস্তি করে ইংরেজী মাধ্যমের স্কুল কলেজ উঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তা যদি না করেন, যদি "বাঁচো আর বাঁচাও" নীতি মেনে সেগুলিকেও টিকে থাকতে দেন, তা হলে দেখবেন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী সেই সব স্কুল

কলেজেই পড়তে চাইবে। ইংরেজীতে পাঠ্যপুস্তক অসংখ্য। মাতৃভাষায় অত নয়। সুতরাং শিখবেও তারা বেশী। যতদিন না গায়ের জোরে ইংরেজী মাধ্যমের মূলোৎপাটন হচ্ছে ততদিন কতক লোক ওর পক্ষপাতী ও পৃষ্ঠপোষক থেকে যাবেই। প্রতিযোগিতায় তাকে হটানো সহজ নয়। ববং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সে-ই সহায়।

যে দেশে হিন্দীভাষীর সঙ্গে তামিলভাষীর প্রতিযোগিতা, বঙ্গভাষীর সঙ্গে উর্দুভাষীর প্রতিযোগিতা, সে দেশে ইংরেজীকে কতক লোক শত্রু না ভেবে মিত্র ভাববেই। জাপানে বা জার্মানীতে এ সমস্যা নেই, কারণ ভাষা তাদের আমাদের মতো চোদ্দ-পনেরোটা নয়, একটাই। জাপানের বা জার্মানীর উদাহরণ আমাদের জনগণের কাজে লাগতে পারে, তারা প্রতিযোগিতায় নামে না। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রতিদিন প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। কতরকম পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। চাকরিতে বহাল হতে হয়। চাকরি রাখতে হয়। প্রমোশন আশা করতে হয়। মাতৃভাষার মাধ্যম বড় জোর পশ্চিমবঙ্গে ফলপ্রদ হবে, কিন্তু সারা ভারতে? হিন্দীভাষীরা এর উত্তরে বলবেন, হিন্দীই জনপথ তথা রাজপথ। সবাইকে হিন্দী মাধ্যম মেনে নিতে হবে। কিন্তু হিন্দী কি বাঙালীর মাতৃভাষা? তামিলের মাতৃভাষা? ইংরেজী মাধ্যমের পরিবর্তে হিন্দী মাধ্যম প্রবর্তন কি মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এদের বেলা?

প্রতিযোগিতার বালাই যদি না থাকত, প্রতিযোগিতার পরিসর যদি ভারতব্যাপী না হতো, তা হলে যে যার মাতৃভাষায় উচ্চতম শিক্ষালাভ করলে ভালোই হতো। কিন্তু আমরা জানি যে উচ্চ শিক্ষার প্রতি ধাপেই প্রতি-যোগিতা। শিক্ষা শেষ হলে চাকরির জন্যে প্রতিযোগিতা। চাকরি জুটে গেলে প্রমোশনের জন্যে প্রতিযোগিতা। সুতরাং প্রতিযোগিতার উপর দৃষ্টি রেখেই পড়াশুনা করতে হয়। জনগণের জীবনে এ সমস্যা নেই। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনে তো আছে। এই শ্রেণীটা যতদিন থাকবে, এ সমস্যা যতদিন থাকবে, ততদিন শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে দ্বিমত অনিবার্য। একদল তর্ক করবেন ইংরেজী রাখার পক্ষে, আরেক দল ইংরেজী হটানোর পক্ষে। তবে এটাও দেখছি যে অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে ইংরেজী সকলের কবুল।

আমি জোর-জবরদস্তির সমর্থন করব না। আমি বলব, এক একটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক একটা মাধ্যম হোক। কোনোটার তামিল, কোনোটার তেলেগু, কোনোটার হিন্দী, কোনোটার বাংলা। সেই সঙ্গে কোনো-কোনোটার ইংরেজী। যাদের বদলির চাকরি তাদের ছেলেমেয়েরা ইংরেজী পছন্দ করবে। সারা ভারতে যদি চারটে ইংরেজী মাধ্যমের বিশ্ববিদ্যালয় থাকে ও তাদের অধীনে চার সেট স্কুল কলেজ থাকে তাহলেই যথেষ্ট। বিশ ত্রিশ বছর পরে লোকে ফল দেখে বুঝবে ইংরেজী মাধ্যম ভালো কি মন্দ। যদি ভালো হয়ে থাকে তাহলে আরও কিছুকাল থাকবে। বরাবরও থেকে যেতে পারে। ইংরেজীর অপরাধ তো এই যে, ওটা বিদেশী ভাষা। আরবী ফারসীরও সেই একই অপরাধ, উর্দুর

অপরাধও তার কাছাকাছি যায়। "বিদেশী" বিশেষণটা শিক্ষার ক্ষেত্রে বড়ই শ্রুতিকটু। বিদেশীর কাছে যদি শেখবার থাকে, তবে শিখতে হবে চাই কি আরো পঞ্চাশ বছর।

(আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে লিখিত পত্র:)

ছাব্বিশে জানুয়ারীর প্রশ্ন

জাতীয় সংহতির কথা যখন আমরা ভাবি তখন আমাদের মনে থাকে না যে ভারত একটি তৈরী 'নেশন' নয়। যেমন জাপান একটি তৈরী 'নেশন'। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সাম্রাজ্য বহুবার গড়ে উঠেছে বহুবার ভেঙে পড়েছে। কিন্তু 'নেশন' এর আগে হয়নি। এই প্রথম। এই নবজাতকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় মাত্র সতের বছরের। আমাদের চোখের সামনে এই শিশু ধীরে ধীরে বাড়ছে। এর বিকাশে আমাদেরও কিছু হাত আছে। আমরা যদি একে সুশিক্ষা দিই এ সুশিক্ষিত হবে। যদি কুশিক্ষা দিই তবে কুশিক্ষিত হবে। আমরা যদি সতর্ক না থাকি তা হলে এ অবোধ হয়তো একদিন আগুনে হাত দিয়ে হাত পোড়াবে, মুখ পোড়াবে। তা বলে একে সব সময়ে বেঁধে রাখতেও চাইনে। একে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে দিতে হবে। ভুলভ্রান্তির ঝুঁকি নিতে হবে। শুধু দেখতে হবে যে সেটা মারাত্মক ভুল নয়। 'নেশন' যাতে ভেঙে না যায়, যাতে 'ডিক্টেটার'-এর কবলে না পড়ে, যাতে জার্মানীর মতো যুদ্ধে নেমে বিভক্ত না হয়, যাতে নিজের হাতে নিজের গলা না কাটে, অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জর না হয়—বাইরে অক্ষত থেকে ভিতরে ভিতরে ফোঁপরা না হয়ে যায়।

তারপর আমাদের মনে থাকে না যে ভারত একটি ঐককেন্দ্রিক 'নেশন' নয়। যেমন ইতালী একটি ঐককেন্দ্রির 'নেশন'। এ দেশে যতগুলি ভাষা ততগুলি কেন্দ্র। এ দেশের এক একটি ভাষা ইউরোপের এক একটি ভাষার সঙ্গে তুলনীয়। যেমন ইংরেজী ফরাসী জার্মান রাশিয়ান তেমনি হিন্দী উর্দু বাংলা তামিল। কোন কোনটি ইংরেজী ফরাসীর চেয়েও প্রাচীন। বাংলা তো এখন অন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। ভারতের ভাষাগুলিকে 'আঞ্চলিক ভাষা' বলে আখ্যায়িত করা সমীচীন নয়। কারণ এটা সত্য নয়। অসত্যের উপর দাঁড় করালে একটা 'নেশন' দাঁড়াতে পারে না। জাতীয় সংহতি যত বড়ই হোক না কেন, সত্য তার চেয়েও বড়। সত্য এ ক্ষেত্রে এই যে, ভারত একটি বহুকেন্দ্রিক 'নেশন,' একটি বহুসেলবিশিষ্ট প্রাণী। এর এক একটি ভাষা এক একটি স্বর। ভারত যেন একটি সপ্তস্বর। অনেকগুলি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাষাগোষ্ঠী মিলে একটি মহাগোষ্ঠী রচনা করার সংকল্প গ্রহণ করেছে। কেউ 'আঞ্চলিক' নয়। সকলেই 'রাষ্ট্রিক' বা 'জাতীয়'। কোন একটিকে বেছে নিয়ে রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষা বলে বিশেষ মর্যাদা দিলে জাতীয়তার বুনিয়াদ শক্ত হয় না দুর্বল হয়, এ প্রশ্নের উত্তর একদিন দিতে

হবে। ভারতের ইতিহাসের গতি নির্ভর করছে এর সত্যনিষ্ঠ উত্তরের উপরে।

রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলা ভাষায় লিখতেন তখন তিনি সেই সূত্রে ভারতীয় ভাষায় লিখতেন। সে ভাষাকে ইংরেজরা হয়তো 'ভার্নাকুলার' বলে ইংরেজীর তুলনায় খাটো ভাবতো। আমরা তা ভাবতুম না। তাই 'ভার্নাকুলার' শব্দটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি। প্রতিবাদের ফলে সে শব্দটি পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু তার বদলে এসে জুটেছে 'আঞ্চলিক' বলে দেখতে শুনতে নিরীহ আর একটি শব্দ।

একদা আমাদের ভাষা ছিল ইংরেজীর নিরিখে 'ভার্নাকুলার'। এবার হয়েছে হিন্দীর নিরিখে 'আঞ্চলিক'। এর গভীরে যেতে হবে। একটা দেশে একাধিক ভাষা থাকবে এটা এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। তা বলে কোন একটি হবে সে দেশের 'জাতীয় ভাষা' আর বাদবাকী 'আঞ্চলিক'? ঐ শর্তে কোথাও কোন 'নেশন' গড়ে ওঠার খবর কেউ শুনেছেন?

কানাডার মতো সুপ্রতিষ্ঠিত দেশেও আজ রব উঠেছে কুইবেক পৃথক হতে চায়। কেন হঠাৎ এ খেয়াল হোল? কারণ কুইবেকের লোক ফরাসীভাষী। আর সকলে ইংরেজীভাষা। কথা ছিল ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীকেও কেন্দ্রীয় সরকারে স্থান দেওয়া হবে। কার্যত যা হয়েছে তাতে ফরাসীভাষীরা সুখী নয়। ইংরেজীভাষীদের ফরাসী শিখতে চাড় নেই, অথচ ফরাসীদের ইংরেজী না শিখলে নয়। গরজটা যেন এক পক্ষেরই। অপর পক্ষের নয়। অবিকল এই ব্যাপারটি দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের উত্তর ও দক্ষিণে। কথা ছিল স্কুল-গুলিতে মাতৃভাষা, মাতৃভাষা ভিন্ন আর একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও ইংরেজী শেখানো হবে। সেই অবসরে দক্ষিণ ভারতে মাতৃভাষা, হিন্দী ও ইংরেজী শেখানো হচ্ছে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের ছেলেদের শেখানো হচ্ছে মাতৃ-ভাষা, সংস্কৃত ও ইংরেজী। বলা বাহুল্য সংস্কৃত একটি আধুনিক ভাষা নয়। সংস্কৃত শিক্ষারও প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার জন্যে যদি একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষাকে বাদ দিতে হয় তবে দক্ষিণ ভারতও তো হিন্দীকে বাদ দিতে পারে, ওর বদলে সংস্কৃতকে ত্রিভাষার অন্তর্গত করতে পারে। মোদ্দা কথা, হিন্দীভাষীরা জানে যে তামিল বা তেলেগু না শিখলেও তাদের চলে, শিখলেও যে তাদের বিশেষ কোন লাভ হবে তা নয়। জাতীয় সংহতির অনুরোধে নিছক ত্যাগস্বীকারে তাদের রুচি নেই। কারই বা আছে? দক্ষিণীদেরও কি আছে? তারা যদি হিন্দী শেখে তো সেটা অনেকটা জীবিকার দায়ে। কিন্তু সবাই তো সরকারী চাকরি করবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি করে আরও কম লোক। তাহলে জাতীয় সংহতির কী উপায়?

ভাষা নিয়ে মীমাংসা এখানো হয়নি, ওভাবে হবেও না। সামনের ছাব্বিশে জানুয়ারী তারিখে ইংরেজীকে 'রিপ্লেস' করতে গিয়ে কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দী প্রভৃতি ভাষা যে নতুন অধ্যায়টি আরম্ভ করতে যাচ্ছে সেটি 'শুভায়'

কিনা ভবিতব্য জানে। ইংরেজী তো চলল, কিন্তু তার ছেড়ে যাওয়া জমিতে দখল নিতে যারা আজ এখনি উদ্যত তারা নিজেদের মধ্যে একমত না হলে পরে এর লাঠি ওর পিঠে পড়বে।

ছাব্বিশে জানুয়ারীর উত্তর

ইংরেজ ও মার্কিন একই ভাষায় কথা বলে। তবু তারা এক নেশন নয়। এককালে তাদের একই শাসনব্যবস্থা ছিল, একই সৈন্যদল ছিল, একজনই মাথা ছিলেন। তবু তারা পৃথক হয়ে গেল। তা হলে দেখা যাচ্ছে ভাষাগত ঐক্যই চূড়ান্ত নয়। আমরা যে হিন্দীকে আমাদের একমাত্র সরকারী ভাষা বা রাষ্ট্র-ভাষা বা জাতীয় ভাষা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ২৬শে জানুয়ারি ১৯৬৫ দিন ধার্য করেছিলুম এটার মূলে ছিল ভাষাগত ঐক্যের উপর বিশ্বাস। অথচ সেই দিনটিতেই কিনা দক্ষিণ ভারতে এক ব্যক্তি অনলে আত্মাহুতি দিলেন।

তার পর থেকে দক্ষিণে আগুন জ্বলছে। ইতিমধ্যে আরো তিনজন আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করেছেন, এছাড়া এক ব্যক্তি বিষপান করে আত্মঘাতী হয়েছেন। পুলিশের গুলী মিলিটারির গুলী ইত্যাদির কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। এই যে সতীর আত্মাহুতি তথা দক্ষযজ্ঞ চলেছে এটা নিশ্চয়ই ভাষাগত ঐক্যের উপর বিশ্বাস দৃঢ় করছে না। বরং ওই তত্ত্বটাকেই খণ্ডন করছে যে ভারতীয় নেশনকে একদিন এক ভাষায় কথা বলতে হবে।

ভুল। ভুল। মস্ত বড়ো ভুল এই ধারণা। কাজকর্ম চালানোর জন্যে একটা সরকারী ভাষা দরকার হতে পারে, কিন্তু সেটার সঙ্গে ভাবগত ঐক্যের সম্পর্ক কতটুকু? ভাবগত ঐক্যের জন্যে চাই একই ভাবের ভাবুক হওয়া। স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন চলছিল তখন আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বা হিন্দীতে বা অন্য ভাষায় কথা বলেছি। অন্তরে অন্তরে ঐক্য বোধ করেছি। কেউ কাউকে বাধ্য করি নি অপরের ভাষায় কথা বলতে। স্বাধীনতার জন্যে আবেগ আমাদের একাত্ম করেছিল। কে কোন্ ভাষায় কথা বলছে এইটাই ছিল তুচ্ছ। কী বলছে এইটেই ছিল মুখ্য। এখন আমরা মুখ্যটাকেই গৌণ করেছি। তাই রাষ্ট্রপতিকেও হুকুম করি, হিন্দীমে বোলিয়ে! দক্ষিণের লোকের মনে লাগবে না?

সুইটজারল্যাণ্ডের লোক এখনো কোনো একটি ভাষাকে ঐক্যের বাহন করে নি। অথচ তাদের মতো একপ্রাণ একতা দেখা যায় না। তিন-তিনটে ভাষাকে সমান মর্যাদা দিয়েও তাদের কাজকর্ম চলে যাচ্ছে। তারা তেভাগা হয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু সমান মর্যাদা না দিলে ওরাও বিদ্রোহ করত, গৃহযুদ্ধে জর্জর হতো, স্বাধীনতা হারাত। নেশনমাত্রকেই এক ভাষায় কথা বলতে বা

ভাববিনিময় করতে হবে সুইসরা এ তত্ত্বে বিশ্বাস করে না।

নেশন সৃষ্টির মূলে ভাষা নয়। নেশন সৃষ্টির মূলে আবেগ। যারা চোদ্দটা প্রধান ও অসংখ্য অপ্রধান ভাষায় কথা বলে তারাও একই আবেগ অনুভব করার ফলে এক নেশন হতে পারে। আমরা একটা মহৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি। অথচ সেই আমরাই আজ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অন্ধ ধারণার যূপে আপনাকে বলি দিচ্ছি। কত বড়ো একটা বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় চলেছে আমাদের চোখের সামনে!

কেন এ রকম হলো? এর কারণ আমি যতদূর বুঝি বলছি। ইংরেজ যখন চলে যায় তখন প্রশ্ন ওঠে, কে বড়ো? কে ছোট? ভারতবর্ষে মুসলমান ছোট হতে নারাজ হয়। পাকিস্তানে বাংলা দেশের সবটা গেলে হিন্দু ছোট হতে নারাজ হয়। অগত্যা ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়। এবার চলে যাবার পালা ইংরেজী ভাষার। বহু লোকের এর উপরে রাগ। এটা বিদেশী ভাষা, বিজেতার ভাষা। এর যাত্রার জন্যে নোটিশ দেওয়া হলো ২৬শে জানুয়ারি ১৯৫৫। তখন আর এক দফা প্রশ্ন উঠল, কে বড়ো? কে ছোট? ভারতীয় ইউনিয়নে তামিল ছোট হতে নারাজ। বাংলা ছোট হতে নারাজ। অথচ আবার দেশটাকে খণ্ড-বিখণ্ড করতেও কারো উৎসাহ নেই। দেখেছে তো তার পরিণাম। হিন্দীর হাত থেকে নিস্তার নেই। তার কাছে মাথা হেঁট করে থাকতেই হবে। এই যে জ্বালা এই জ্বালায় মানুষ জ্বলে-পুড়ে মরছে।

জ্বালাটা আঁচতে পেরে কর্তারা ভালোমানুষের মতো বলছেন, "আহা, আমরা তো সত্যি সত্যি ইংরেজীকে চলে যেতে বাধ্য করছিনে! নোটিশ দিয়েছিলুম তা ঠিক। কিন্তু তোমাদের যাতে অসুবিধে না হয় তার জন্যে সব কিছু বন্দোবস্ত ভি করেছি। লেকিন তোমরা ভুল বুঝলে হামরা কী করব।" ভুল বোঝার কোনো রাস্তাই নেই। সংবিধান অতি পরিষ্কার ভাষায় বলেছে হিন্দী হলো ইউনিয়নের একমাত্র সরকারী ভাষা। তার মানে আর সব ভারতীয় ভাষার মাথার উপরে তার স্থান। ইংরেজী আরো কিছুদিনের জন্যে থাকবে তার সহযোগীরূপে। সরকারের সঙ্গে কারবারে তার ফলে অসুবিধে কম হবে, কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে তামিল বাংলা প্রভৃতি অন্যান্য ভাষার পোজিশন কী হবে? এরা কি সামন্ত রাজার মতো অঙ্গরাজ্য শাসন করেই সন্তুষ্ট থাকবে? উচ্চতম মহলে এদের প্রবেশ নিষেধ হবে? সেখানে শুধু হিন্দী ও তার সহযোগী?

"যতদিন তোমরা চাইবে ততদিন তোমাদের সুবিধের জন্যে ইংরেজী থাকবে।" আশ্বাস দিচ্ছেন কর্তারা। তামাশা মন্দ নয়। আমরাই বা কেন একটা বিজাতীয় ভাষাকে আঁকড়ে ধরে থেকে কম জাতীয়তাবাদী বলে হাতে-নাতে ধরা পড়তে যাব? এটা তো খুব অদ্ভুত কথা যে জাতীয়তাবাদের পুরোধাদেরই হিন্দী না শিখলে ইংরেজী শিখতে হবে। তাই যদি হলো তবে ইংরেজী তো থেকেই গেল। সে গেল কোথায় যে তার যাত্রার জন্যে দিন স্থির

করার দরকার ছিল ? কর্তারাই যেন হাতজোড় করে ইংরেজীকে বলছেন, "এ ভাই আংরেজী, তুমি আজ এখনি যেয়ো না। তুমি গেলে দাউ দাউ করে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে। তুমি থাকলে আমাদেরও সুবিধে। আমরা তোমাকে দরজায় খাড়া রেখে ভিতরে ভিতরে সব কাজ গুছিয়ে নেব। কেবল চার-পাঁচটি অঙ্গরাজ্যে নয়, ইউনিয়ন গবর্নমেণ্টের সিভিল ও মিলিটারি যাবতীয় দপ্তরে হিন্দী চালু করে নেব। তার পর তোমাকে আর কষ্ট করে খাড়া থাকতে হবে না। তুমি আস্তে আস্তে স্বস্থানে প্রস্থান করবে। যেখান থেকে এসেছিলে।"

খুড়োর গঙ্গাযাত্রা যে কতকাল জুড়বে তা কেউ বলতে পারে না। অনির্দিষ্ট-কাল এই বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে বাস করবে। এক পা গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রাখবে, কে জানে কখন নাড়ী ছেড়ে যায়! ততকাল আমরা সকলে এরই আর একটা পা ধরে জাতীয় ঐক্যের সাধনা করতে থাকব। ওইভাবেই ভারতীয় জাতি কায়মনোবাক্যে সুসংহত হবে। যথাকালে খুড়ো পঞ্চত্ব পাবেন। ততদিনে আমরা সবাই হিন্দীতে বাতচিৎ করতে শিখে থাকব। আঠারো কোটি লোকের মাতৃভাষা সাতাশ কোটি লোকের ভাববিনিময়ের ভাষা হয়ে থাকবে।

সে যে কবে হবে তা সাতাশ কোটি লোক বা তাদের প্রতিনিধিরাও কি জানেন? আজ আমরা যেটা দর্শন করছি সেটা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। উত্তরে দক্ষিণে এমন আড়াআড়ি বেধে গেছে যে সহজে তার নিষ্পত্তি নেই। বেচারা আওরাংজেবকে শেষজীবনটা দক্ষিণ ভারতেই কাটাতে হয়েছিল। সেই-খানেই তিনি দেহরক্ষা করেন। উদ্দেশ্য তাঁর ছিল সাধু। ভারতবর্ষকে তিনি একচ্ছত্রাধীন করতেই চেয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদী মাত্রেরই যেটা মনের কথা। তার জন্যে বাদশাহী সৈন্যদলকে দক্ষিণেই আটকা পড়তে হয় বছরের পর বছর। তবু তো সে সময় চীনের দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা ছিল না।

বরণ করে নেবার স্বাধীনতা দিলে হিন্দীকে যারা যোগাযোগের ভাষারূপে বরণ করবে তাদের নাম উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ ও দিল্লী। তাদের সঙ্গে যোগ দেবে গুজরাত ও মহারাষ্ট্র। পাঞ্জাব এ বিষয়ে দ্বিমত হতে পারে, পাঞ্জাবীভাষীরা হিন্দীভাষীদের উপর বিরক্ত। কাশ্মীর চাইবে উর্দু, কিন্তু সেটার নাম কেউ করছেন না। সুতরাং কাশ্মীরী-ভাষীরাও দ্বিমত হতে পারে। বাদবাকী যতগুলি রাজ্য বা ইউনিট আছে তাদের যদি বরণের স্বাধীনতা দেওয়া হয় তবে তারা ইংরেজীকেই বরণ করবে। তাদের নাম মাদ্রাজ, মহীশূর, কেরল, অন্ধ্র, উৎকল, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, নেফা, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান, পণ্ডিচেরী, গোয়া। তা যদি হয় তো অধিকাংশই ইংরেজীর পক্ষে।

যে রাষ্ট্রের অধিকাংশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইংরেজীকেই রাখতে চায় সে রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা প্রধানত হিন্দী হলে লোকের অসহ্য হতো না। কিন্তু সংবিধানে লেখা আছে একমাত্র হিন্দী। তবু যদি সরকারী ভাষা হয়েই হিন্দী

ক্ষান্ত হতো ! তার তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে সে হচ্ছে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, একমাত্র জাতীয় ভাষা, শুধু তাই নয়, সে নাকি রাজভাষা। আমাদের এই প্রজাতন্ত্রে রাজভাষা থাকবে কেন ? রাজভাষা যদি থাকে তো রাণীভাষাও থাকা উচিত। নইলে রাজা একা নিঃসঙ্গ বোধ করবেন। যতদূর দেখতে পাচ্ছি দুটো ভাষাই যোগাযোগের তথা কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে। তা বলে অন্যান্য ভাষাকে শুধু সামন্ত ভাষা করে রাখলে চলবে না। তারাও সমান মর্যাদার অধিকারী হবে। তাদেরও জাতীয় ভাষা বলা হবে। তবে তাদের দ্বারা যোগাযোগ বা কেন্দ্রীয় দপ্তরের কাজকর্ম চলবে না। কিন্তু মনি অর্ডার ফর্ম তো আগেকার দিনে বাংলা ভাষাতেও ছাপা হতো। রেলের টাইম-টেবল তো এখনো বাংলায় ছাপা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের যেসব কার্যকলাপ জন-সাধারণের সঙ্গে সংযুক্ত সেসব শুধু হিন্দীতে বা ইংরেজীতে আবদ্ধ রাখলে অন্যায় হবে।

মোট কথা কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপের ভাষায় একপ্রকার ক্রমবিভাগ চাই। কোনো কোনো কাজ শুধু হিন্দীতেই হবে, যেমন অনুষ্ঠানিক কর্ম। কোনো কোনো কাজ শুধু ইংরেজীতেই হবে, যেমন সরকারী চাকরির জন্যে পরীক্ষা। কোনো কোনো কাজ হিন্দীতে ও ইংরেজীতে হবে, যেমন দপ্তরের কাজ। কোনো কোনো কাজ সব ক'টা ভাষায় হবে, যেমন ডাকঘরের কাজ, রেলের কাজ। এসব ক্ষেত্রে গোঁড়ামি ভালো নয়। সব ক'টা ভাষাই জনগণের সেবার ভাষা। মিলনের ভাষা।

এত বড়ো একটা জটিল ব্যাপার রাতারাতি নিষ্পন্ন হতে পারে না। এটা বিপ্লবধর্মী নয়, বিবর্তনধর্মী। বিবর্তন অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলে। তার কাছে পনেরো বছর কিছুই নয়। মানুষের মন তৈরি করতে আরো বেশী সময় লাগে। ইংরেজরা প্রথম দিকে ইংরেজী প্রবর্তন করতে চায় নি। ফার্সী ভাষাকে 'রিপ্লেস' করতে প্রায় নব্বই বছর লেগেছিল। আর আমাদের নেতাদের ধারণা সংবিধানে একটা ধারা জুড়ে দিলেই পনেরো বছর বাদে ইংরেজীকে 'রিপ্লেস' করতে পারা যাবে। করবে কে ? না হিন্দী ! এসব কাজ বাহুবলেও হয় না, কলমের জোরেও হয় না, বিপ্লবের শক্তিতেও কুলোয় না। কমিউনিস্টরাও বুঝতে পারছে যে, ইংরেজীকে রাতারাতি উঠিয়ে দিলে বিপদ। কারণ হিন্দী একা সব দিক সামলাতে পারবে না। তার অনেক শরিক। শরিকদের সঙ্গে লড়তে লড়তে তার দম ফুরিয়ে যাবে।

যে দেশের বাইরে শত্রু ওৎ পেতে আছে, যার ঘরেও সব জিনিস আগুন, সে দেশে ভাষা নিয়ে ধর্মান্ধের মতো আত্মকলহ একটা দিনও সহ্য করা যায় না। এর জন্যে দায়ী কে ? দায়ী প্রথম ঢিলটি যে মেরেছে সে। তার উত্তরে পাটকেলটি যে মেরেছে সেও। কর্তারা কি জানতেন না যে, ২৬শে জানুয়ারি ভারতীয় ইউনিয়নের একচ্ছত্র রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দীর অভিষেক হলে তামিলদের মধ্যে অনেকেই সেদিন শোকপ্রকাশ করবে ? শোকপ্রকাশকে জবরদস্তি দমন করতে গেলে শুরু হবে অনলে আত্মাহুতি। না, এই জিনিসটা তাঁরা

জানতেন না। এটা ভারতে নতুন। এতে ভারতের গৌরব বাড়ছে না। হিন্দীর উপরেও শ্রদ্ধা বাড়ছে না। আরো বড়ো অনর্থের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। অতএব দ্রুত সমাধান চাই। সে সমাধান সর্বসম্মত হওয়া চাই। বিনোবাজীর অনশন যেন অযথা প্রলম্বিত না হয়।

আচ্ছা, এ দেশে তো অনেকগুলো দল। এমন কোনো নিখিল ভারতীয় দল আছে কি যার দপ্তরে ইংরেজী ব্যবহার করা হয় না, তার বদলে হিন্দী ব্যবহার করা হয়? এরা কেউ যদি ইংরেজীকে 'রিপ্লেস' করতে না পেরে থাকে তবে ভারত সরকারকে ও কাজ থেকে নিবৃত্ত করে নি কেন? যে দলের সভ্যরা ভারতের নানা রাজ্যের ভাষায় কথা বলে, সুতরাং পরস্পরের সঙ্গে ইংরেজীতেই বাক্যালাপ বা পত্রালাপ করে, তারা ইংরেজীকে বাদ দেবার স্বপ্ন দেখতে যায় কেন? দেশকে বিভ্রান্ত করার জন্যে তারাও কি দায়ী নয়? ইংরেজী থাকলেই যে আমাদের দেশ ইঙ্গ-মার্কিন তাঁবেদার বনে যাবে তা নয়। ইংরেজী আর গোলামি সমার্থক শব্দ নয়। এই অনর্থের মূলে এঁদের এই বিভ্রমও কাজ করছে। সবাইকে আজ আত্ম সমালোচনা করতে হবে।

উল্টো দৌড়

জনাব জিন্না সাহেবের জীবনচরিতের প্রথম অধ্যায় পাঠ করতে গিয়ে অবাক হয়ে যাই। কত বড়ো বিস্ময়কর প্রতিভা! ইতিহাসে অভূতপূর্ব। তবে অতুলনীয় নয়। সম্প্রতি আমরা তাঁর অনুরূপ প্রতিভার সন্ধান পেয়ে "তদা নাশংসে" জপ করতে আরম্ভ করেছি। হায়, গান্ধী, তুমি কি এ জলতরঙ্গ রোধ করতে পারতে, যদি বেঁচে থাকতে!

যা বলছিলুম। একদা জিন্না সাহেব বিষম এক পণ করেন। তখন তাঁর বয়স বোধ হয় আট কি দশ। খেলাধূলোয় পোক্ত নন। অবজ্ঞার সঙ্গে তাঁর এক সহপাঠী তাঁকে বলেন, "তুই আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়তে পারবি!"

"কেন পারব না? আলবৎ পারব। তুই হেরে যাবি।" জিন্না বুক ফুলিয়ে বলেন।

সহপাঠী তো হেসে অস্থির। যে ছেলে কোনো দিন কোনো খেলায় জেতেনি সে কিনা পাল্লা দিয়ে দৌড়বে ও জিতবে! সহপাঠী বলেন, "আয়, বাজি রাখি। যে হেরে যাবে সে খাওয়াবে।" (এই অংশটা আমার ঠিক মনে নেই।)

জিন্না বলেন, "রাজি। আমি জানি আমি জিতব। কেন মিছিমিছি হেরে যাবি!"

ওয়ান, টু, থ্রী। শুরু হয়ে যায় দৌড়। সহপাঠী ছুটতে ছুটতে অনেক-দূর এগিয়ে যান। জিন্না তাঁর ধারে কাছেই নেই। মনের আনন্দে তিনি একবার পিছন ফিরে তাকান। ও কী!

সহপাঠী তো হাঁ। তিনি ডাক ছেড়ে বলেন, "ও কী! ওদিকে দৌড়চ্ছিস কেন? ওটা তো উল্টো দিক। আচ্ছা আহাম্মক দেখছি!"

"আরে, আমিও তো সেই কথাই ভাবছি।" জিন্না সপ্রতিভভাবে জবাব দেন, "কেন বাপু, বেকুবের মতো উল্টো দিকে দৌড়তে গেলি? হেরে গেলি তো?"

বাজি রাখার সময় কোন্ দিকে দৌড়তে হবে এ বিষয়ে কথাবার্তা হয়নি। সহপাঠী খেলাধুলায় যেমন মজবুৎ বুদ্ধিশুদ্ধিতে তেমন নন। তাই তো তিনি জিন্নার সঙ্গে বুদ্ধির দৌড়ে হেরে যান। জীবনযুদ্ধেও তাই ঘটে। কায়দে আজম জিন্না উল্টো দিকে দৌড়তে আওরাংজেবের যুগে পৌঁছে যান। "আওরাংজেব ভারত যবে করিতেছিল খান্ খান্।" তাঁর মতে সেইটেই অগ্রগতি। সেইটেই সোজা দিক।

পাকিস্তান বেরিয়ে যাবার পর বাকী যা রইল সেই বাকীস্থানের নামকরণ হলো ভারত। মনে করা গেল যে আমরা আমাদের মতে সোজা এগোচ্ছি। আমরা বিংশ শতাব্দীর ভারতীয়। আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর মোগল নই। যার নতুন নামকরণ হয়েছে পাকিস্তানী। আমাদের বিচারে আমরা তিন শতাব্দী এগিয়ে রয়েছি ও আধুনিকতার যুগের দিকেই যাচ্ছি।

এখন গান্ধীজীর কথা বলা যাক।

কংগ্রেসের ভাষা আগেকার দিকে ইংরেজী ছিল। গান্ধীজী এসে সেটাকে বদলে দিয়ে হিন্দী করেন। কিন্তু পুরোপুরি না। ইংরেজীও রাখেন। "ইয়ং ইণ্ডিয়া"র সম্পাদনা হাতে নিয়ে তিনি এই কৈফিয়ৎ দেন যে দক্ষিণ ভারতের লোক হিন্দী বুঝবে না বলেই তাঁকে ইংরেজীতে লিখতে হচ্ছে।

তারপর হিন্দী বলতে তিনি ঠিক কী বুঝতেন সেটাও পরে তিনি অন্যত্র ব্যক্ত করেন। সীতাপুরে অনুষ্ঠিত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে তাঁর বক্তব্য হলো—

"Highly Sanskritized Hindi is as avoidable as highly Persianized Urdu. Both the speeches are not intelligible to the masses. I have accepted Hindustani as a common medium because it is understood by over twenty crores of people of India. This is not the artificial Lucknavi Urdu or the Sammelani Hindi. And one would expect at least a sammelan address to be such as would be understood by both Hindus and Muslims of the common type." (vide *Mahatma* by Tendulkar, vol. 2, p. 273).

এটা ১৯২৫ সালের কথা। মুসলমানরা "হিন্দী"র জায়গায় "হিন্দুস্তানী"

পছন্দ করেন বলে দশ বছর পরে তাঁর বক্তব্যের বিবর্তন নিম্নোক্তরূপ ধারণ করে—

"When I presided over the Sammelan once again in 1935, I had the word properly defined as a language that was spoken both by the Hindus and Musalmans and written in Devanagari or in Urdu script. My object in doing so was to include in Hindi the high-flown Urdu of Maulana Shibli and the high-flown Hindi of Pandit Shyamsunderdas. Then came the Bharatiya Sahitya Parishad, also an offshoot of the Sammelan. At my suggestion the name Hindi-Hindustani was adopted, in the place of Hindi. (ibid., vol. 4. p. 179).

পরে কিন্তু হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন মহাত্মার এই উপদেশ লঙ্ঘন করে ও উর্দুকে পরিহার করে। তখন তিনি শেঠ যমুনালালজীকে পরামর্শ দিয়ে আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করান। তার নাম রাখা হয় হিন্দুস্তানী প্রচার সভা। এবার আর হিন্দী নয়, হিন্দী-হিন্দুস্তানী নয়, এবার সোজাসুজি হিন্দুস্তানী। কিন্তু সে হিন্দুস্তানীর বাহন দেবনাগরী তথা উর্দু লিপি। সে ভাষা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই ভাষা। নিছক হিন্দীও নয়, নিছক উর্দুও নয়। সেই অনুসারে "হরিজনসেবক" পত্রিকার দুটি সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। যমজ সংস্করণ। একটি দেবনাগরীতে। অপরটি উর্দু লিপিতে। বলা বাহুল্য পাঞ্জাবের হিন্দুরা দেবনাগরীর চেয়ে উর্দু লিপিতেই অভ্যস্ত। একবার আমি লালা লাজপৎ রায়ের "বন্দে মাতরম্" আনিয়ে দেখি যে বিলকুল উর্দুতে লেখা ও ছাপা।

কেউ কল্পনা করেনি যে দেশ রাতারাতি ভাগ হয়ে যাবে। যদি অখণ্ড ভারত থাকত ও কংগ্রেস লীগ মিলে মিশে রাজত্ব করত তা হলে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের শুদ্ধ হিন্দীর ও তার একমাত্র বাহন দেবনাগরী লিপির দিকে ভোট বেশী পড়লেও এত বড়ো গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ের মীমাংসা কেবলমাত্র অধিকাংশের ভোটেই হতো না। সংখ্যালঘু মুসলমানের মুখ চেয়ে হিন্দী উর্দু উভয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার বা সরকারী ভাষার মর্যাদা দিতে হতো। দেবনাগরী ও উর্দু লিপি উভয় লিপিকেই সমান আসন দিতে হতো। অথবা ভাষার ও লিপির দ্বন্দ্ব এড়াতে গিয়ে ইংরেজীকেই বাহাল রাখতে হতো। অবশ্য গান্ধীজী থাকলে প্রাণপণে চেষ্টা করতেন হিন্দী উর্দুর মধ্যে মিলন ঘটাতে। সরকারী ভাষা যেটা হতো সেটা হতো শিবলীর উর্দু নয়, শ্যামসুন্দর দাসের হিন্দী নয়, আবু শেখ আর হাবু দোসাতের দেহাতী বুলি। শুধু লিপিটাই দুরকম। সে বুলিতে সরকারী কাজকর্ম করা খোদার বা রামের অসাধ্য হলে গান্ধীজী কী করতেন জানিনে।

হঠাৎ দেশ ভাগ হয়ে যায়। তখন এ ঝগড়া আপনি মিটে যায়। উর্দু একেবারে মুলুক ছেড়ে চলে যায়। মক্কার দিকে মুখ করে মক্কার আরো কাছাকাছি

করাচী। দিল্লির রাজ্যপাট আপোসে পেয়ে যায় দেবনাগরী লিপিতে লেখা শুদ্ধ হিন্দী, যাতে আরবী ফারসীর 'যাবনী মিশাল' নেই। তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে একমাত্র ইংরেজী। এ সময় গান্ধীজীর "হরিজন সেবকে"র উর্দু সংস্করণটির পাঠকসংখ্যা শূন্যের দিকে যাচ্ছে লক্ষ করে তিনি ওটি বন্ধ করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী সংস্করণটিও তুলে দেন। যদিও তার পাঠকসংখ্যা যথেষ্ট। একজন পাঠক কৈফিয়ৎ চাইলে তিনি বলেন হিন্দুস্তানী প্রচার সভার দৃষ্টিতে হিন্দুস্তানী হচ্ছে একই ভাষা যার দুই লিপি। একটি সংস্করণ বাদ দিয়ে অপরটি প্রকাশ করলে অত্যন্ত অনুচিত কাজ হবে। গভীর বিষাদের সঙ্গে তিনি বলেন—

"...Hindustani means a language which may be written in both the scripts equally. Consequently, paper published in both the scripts should continue in both.. This becomes all the more necessary when the people clamour on all sides that the national language of India should be Hindi and that it should be written in the Nagari script only. It is my duty to show that this claim or demand is not right. If my reasoning is correct, a further duty devolves on me that I should either publish "Harijansevak" in both the scripts or stop both the editions · I am undoubtedly an advocate of Hindustani. I believe that between the Nagari and the Urdu scripts, Nagari will prevail ultimately. But if we leave aside script and consider only the language, then I say that Hindustani will win in the end as the Sanskritized Hindi is entirely artificial, while Hindustani is quite natural. In the same way, the Persianized Urdu is artificial and unnatural. There are not many Persian words in my Hindustani. I find very little argument in favour of Hindi···To conclude, even if I was alone to say so, I am quite clear that, ultimately, neither the Sanskritized Hindi nor the Persianized Urdu will win the race ; Hindustani alone can do so." (ibid., vol. 8. pp. 294-6)

জিন্না সাহেবের সহপাঠীর মতো গান্ধীজীও ধরে নিয়েছিলেন যে দৌড়টাতে যারা যোগ দেবে তারা একই অভিমুখে দৌড়বে। জানতেন না যে এক একজন এক এক অভিমুখে দৌড়তে পারে। একজন ব্রিটিশ যুগ ডিঙিয়ে আওরাংজেবের যুগে। আরেকজন ওটাও ডিঙিয়ে পৃথ্বীরাজের যুগে। একজনের আদর্শ ফারসী পুঁথি ও আরবী কোরান। আরেকজনের আদর্শ সংস্কৃত পুঁথি ও বেদ পুরাণ। বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল জগৎ বা ভারতের অশিক্ষিত জনগণ কারো প্রতি এদের দৃষ্টি নেই। লোকভাষা বা যুগভাষা এদের লক্ষ্য নয়।

হঠাৎ মসনদ লাভ করা গেছে। এদের লক্ষ্য মসনদী ভাষা বা দরবারী ভাষা। সংবিধানে যাকে বলে সরকারী ভাষা। ঘটা করে যাকে বলা হয় রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষা। এরা প্রাণপণে ছুটছে বইকি। কিন্তু ছুটছে সাগরসঙ্গম থেকে বিপরীত মুখে। গঙ্গোত্রীর অভিমুখে। সিন্ধু উৎসের অভিমুখে। যেখানে কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। এ যুগের সঙ্গেও মিল নেই। জাগ্রত জনগণের সঙ্গেও মিল নেই।

এখন ইংরেজীর কথা। এটা আমাদের লোকভাষা নয়, জনগণের সঙ্গে এর মিল নেই। কিন্তু এটা যুগভাষা। এ যুগের সঙ্গে এর মিল আছে। এ যুগের সঙ্গে আমাদের এ মেলাচ্ছে। জনগণের সঙ্গে মেলাবার জন্যে রয়েছে বাংলা মরাঠী তামিল তেলুগু প্রভৃতি লোকভাষা। হিন্দীও যদি প্রাকৃতিক হয় তবে হিন্দীও সেই রকম একটি লোকভাষা। কিন্তু এদের কোনোটির সঙ্গে ইংরেজী যদি সংযুক্ত না হয় তা হলে লোকের সঙ্গে যুগের বিচ্ছেদ ঘটে যায়। ইংরেজীতে যাঁদের আপত্তি আছে তাঁরা ফরাসী বা জার্মান বা রাশিয়ান শিখতে পারেন। কিন্তু একটি না একটি আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা না শিখলে মাটির মানুষ মাটিতেই আবদ্ধ থাকবে। আকাশে উড়তে পারবে না। মানুষের ছেলেও পাখীর ছানার মতো। তার জন্যেও চাই একটা আকাশ। সেটা যদি ঘিরে রাখা হয় তবে তার স্বাধীনতা তার কোন্ কাজে লাগবে? কূপমণ্ডুকও তো কম স্বাধীন নয়। যতখুশি জলকেলি করতে পারে। কিন্তু সাতশ' আটশ' বছর সমুদ্রযাত্রার অনুমতি না পেয়ে সমুদ্রের অপর পারের প্রগতির বার্তা না পেয়ে আমরা যে অবস্থায় ছিলুম সেই অবস্থায় ফিরে যাওয়া কিছুতেই স্বাধীনতার উপসংহার হতে পারে না।

দেশ বিদেশের সঙ্গে আমরা যুক্ত থাকতে চাই। যাদের ফরাসী জার্মান প্রভৃতি ভাষা শেখার সুবিধে নেই তারাও হাত বাড়ালেই ইংরেজী বই পেতে পারে, ইংরেজী কাগজ পেতে পারে। কেন তারা এ সুযোগ ত্যাগ করবে? ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া তো মিটে গেছে। তার জের টেনে কার কী লাভ? ইংরেজীর উপর কেন এ বদ্ধমূল বিদ্বেষ? যদি জানতুম যে এঁরা ইংরেজীর বদলে রাশিয়ান বা ফরাসী শিখেছেন বা শিখতে চান তা হলে বোঝা যেত যে এঁরাও একভাবে না একভাবে প্রগতির পক্ষপাতী। হয়তো আরো বেশী প্রগতির জন্যেই এঁরা ইংরেজীর মতো পেছিয়ে পড়া ভাষাকে বিদায় দিতে চাইছেন। কিন্তু কই কোথাও তো শুনিনে যে, ইংরেজীর বদলে রুশ জর্মান প্রভৃতি ভাষার চর্চা হচ্ছে? চর্চা যাঁরা করছেন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীরও চর্চা করছেন।

মহাত্মা গান্ধীর হিন্দীসম্পর্কিত ধারণা বদলাতে বদলাতে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা দেখিয়েছি। ইংরেজী সম্পর্কে ঐ প্রবন্ধেই তিনি বলেন—

"Even as Tamil. etc., are the languages of the different provinces, and Hindustani is the national language of the country, so is English the language of the world. Its interna-

tional position cannot be disputed. The imperialist rule of the Englishman will go, because it was and is an evil. But the superior role of the English language cannot go." (ibid, pp. 296-7)

গান্ধীজী সেইজন্যে ইংরেজী "হরিজন" তুলে দেন না। বিশ্বের সর্বত্র তাঁর পাঠক ছিল। তাদের খাতিরে তাঁকে ইংরেজীতেও লিখতে হতো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুজরাতী "হরিজনবন্ধু"ও চালিয়ে যান। বন্ধ হয় শুধু হিন্দী উর্দু পত্রিকা।

মহাত্মার এই কাজ যে হিন্দী গোঁড়ামির নিঃশব্দ প্রতিবাদ এ কথা না বললেও চলে। কিন্তু যাঁদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে এই প্রতিবাদ তাঁরা তাঁদের হৃদয়কে পাষাণের মতো কঠিন করে ফেলেছেন। মুসলমানকে তাঁরা হটিয়েছেন, আংরেজকে তাঁরা হাটিয়েছেন, বাকী থাকে আংরেজী। তাকেও তাঁরা হটাবেন। সংবিধান রচনার সময় গান্ধীজীর হিন্দুস্তানীর কথা, দেবনাগরী ও উর্দু উভয় লিপির কথা গ্রাহ্য হলো না। সামনে দুটিমাত্র বিকল্প : দেবনাগরীতে লেখা হিন্দী এবং রোমক লিপিতে লেখা ইংরেজী। দেখা গেল ভোটসংখ্যা সমান সমান। কাস্টিং ভোট দিয়ে সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ হিন্দী-দেবনাগরীকে জিতিয়ে দেন। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ না হয়ে যদি আর কেউ সভাপতির আসনে থাকতেন তা হলে কে জানে হয়তো ইংরেজীই হতো ভারতের সরকারী ভাষা।

কে কোন্ দিকে ছিলেন আমি জানিনে। তবে অনুমান হয় ইংরেজীর পক্ষে বহুসংখ্যক কংগ্রেস সভ্য ছিলেন, তাঁরা শুধু বাঙালী বা দাক্ষিণী নন, সম্ভবত পাঞ্জাবী শিখও। গান্ধীজী ধরে নিয়েছিলেন যে ইংরেজী শুধু দাক্ষিণীদের হিন্দী না জানার দরুন দরকার। কিন্তু পরে বোঝা যায় যে সংস্কৃতবহুল হিন্দীর সঙ্গে হিন্দু ধর্মের বা আর্যসমাজেরও একটা সম্পর্ক আছে। ওটা রিভাইভালিজমের বাহন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘেরও বাহন হিন্দী। কংগ্রেসের যে অংশটা গান্ধীর চেয়ে গোড়সের কাছাকাছি সেটা হিন্দীতেই কথা বলে। দেশ তার কাছে বড়ো নয়। ধর্মই বড়ো। ধর্মের জন্যে সে মুসলমানকে তাড়িয়েছে, খ্রীস্টানকেও তাড়াতে পারে, ব্রাহ্মকেও রাখবে না, শিখের সঙ্গেও তার বনিবনা নেই। মুখ ফুটে সে বলতে পারছে না যে এটা হিন্দু রাষ্ট্র। বললে এখুনি হিন্দুতে শিখেতে বেধে যাবে। তাই একটু ঘুরিয়ে বলতে হয় এটা হিন্দী রাষ্ট্র। হিন্দী এ দেশের রাষ্ট্রভাষা। আর সে হিন্দী দেবনাগরীতেই লিখতে হবে। কারণ সেটা দেবভাষা। বাণভট্টের সংস্কৃতের সঙ্গে যার জান পহিচান আছে সেই শুধু সে হিন্দীর মর্ম বুঝবে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তের চাষী মজুরের সঙ্গে মিশতে চাই বলে আমাকে সংস্কৃত অভিধান খুলে বসতে হবে ও ধর্মান্ধ হিন্দু বা আর্যসমাজী হতে হবে, মনে মনে হাজার বছর পিছু হটতে হবে, এর মধ্যে আমি গান্ধীর 'গ' অক্ষর দেখতে পাইনে। বরং দেখি তাঁর ঘাতক গোড়সের 'গ' অক্ষর। আর গোমাতার

'গ' অক্ষর। এরা যদি জয়ী হয় তবে ভারত পাকিস্তান কোনো কালেই এক হবে না, নিদেনপক্ষে একজোট হবে না। আমরা বাঙালীরা দুই নৌকোয় দুই পা রেখে বঙ্গোপসাগরে তলিয়ে যাব।

মহাত্মা ত্রিশ বছর ধরে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের মত পরিবর্তনের জন্যে সাধনা করে অবশেষে হাল ছেড়ে দেন। তাঁর জীবনের ওটাও একটা পরাজয়। হিন্দী সাহিত্যিকদের কথা হলো তাঁরা তাঁদের ভাষার শুদ্ধি রক্ষা করবেন। বেশ তো, তাই করুন। তাঁদের ঘরে তাঁরা থাকুন, আমাদের ঘরে আমরা থাকি। আমাদের ঐতিহ্য বরাবরই একটু অন্যরকম। বাংলা ভাষা ও লিপি মুসলমানরাও মেনে নিয়েছেন। তাই 'যাবনী মিশাল' আমরাও মেনে নিয়েছি। উত্তরভারতের ভাষা যেমন সংস্কৃত ও ফারসী দুই প্রভাবের দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে হিন্দী ও উর্দু নাম নেয় বাংলা সে রকম হয় নি। সংস্কৃত ও ফারসী উভয় প্রভাবকেই স্বীকার করে নিয়ে বাংলা তার ঐক্য রক্ষা করেছে। আমরা দুই রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েও আমাদের ভাষাগত ঐক্য হারাই নি। হারাতুম, যদি সংস্কৃতের দিকে খুব বেশী ঝুঁকে আরবী ফারসীকে দূরে সরিয়ে দিতুম। দেবনাগরী যে নিইনি এটা পরম ভাগ্য। নিলে পাশের গাঁয়ের মুসলমান আরবী লিপিতে মুসলমানী বাংলা লিখত আর তার নাম রাখত 'তুর্ক'।

পুরাতন সব মধ্যযুগীয় কোঁদলকে আধুনিক ভারতের সংবিধানে জীইয়ে রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের বেয়োনেটের সাহায্যে সারা দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে না দিলে জাতীয় সংহতি হবে না, এ যুক্তি দেশের অর্ধেক লোক বিশ্বাস করে না। বিনোবাজীর মতো হিন্দীপ্রেমী ও জনদরদীও বলতে আরম্ভ করেছেন যে অহিন্দীভাষীদের উপর হিন্দী চাপানো উচিত নয়। তাঁর অনশনের অন্যতম কারণও তাই। 'অহিন্দীভাষী' এই কথাটিতে আমার আপত্তি আছে। এতে 'হিন্দীভাষী' কথাটির সঙ্গে বৈপরীত্য মেনে নেওয়া হয়। এটা যেন সেই মণ্টেগু চেমসফোর্ডের 'মুসলমান' ও 'অমুসলমান'। যার পরিণামে দেশ দু'ভাগ হয়ে যায়। এখন এই 'হিন্দীভাষী' ও 'অহিন্দীভাষা' যদি আমাদের চিন্তা ও লেখা ও বক্তৃতা জুড়ে বসে তা হলে আজ যেটা ছুঁচ হয়ে ঢুকছে কাল সেটা ফাল হয়ে বেরোবে। আবার ভেঙে যাবে দেশ। দুই ভাষা বড়ো, না এক ভারত বড়ো? ভারতের ঐক্যের খাতিরে ভাষার দাবীকেই খাটো করতে হবে। যেমন ধর্মের দাবীকে খাটো করতে হয়েছে।

চাই সেকুলার স্টেটের মতো একটি ফরমুলা। সেটা হিন্দী স্টেটের পোষক নয়। এখন আমাদের সংবিধান যেটি প্রতিষ্ঠা করেছে, যেটির প্রতিষ্ঠাদিবস ছিল গত ২৬শে জানুয়ারী, সেটি হিন্দী স্টেট। তাতে দয়া করে ইংরেজীর জন্যে সাময়িকভাবে একটু ঠাঁই রাখা হয়েছে। পাকিস্তানের ইসলামী রাষ্ট্রের পতাকায় যেমন অমুসলমানদের জন্যে একটুখানি সাদা অংশ। পাকিস্তানে তবু ওটা বরাবরের জন্যে। এখানে এটা স্বল্পকালের জন্যে।

যে দেশে বহু ধর্ম সে দেশে কোনো একটি ধর্ম যদি রাজধর্ম হয় তা হলে অন্যান্য ধর্ম হাজার সদ্ব্যবহার পেলেও ঠিক সমান ব্যবহার পায় না। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক হাজার বড়লোক হলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে অনুকম্পার পাত্র হয়। রাজধর্মে যারা বিশ্বাস করে তারা হয় রাজার জাত। হাজার গরিব হলেও তাদের তেজ কত! জার্মানীর ইতিহাসে দেখছি রাজা বা সামন্ত রাজা যদি প্রোটেস্টাণ্ট হন তো প্রজারা প্রোটেস্টাণ্ট হয়ে যায়। আর তিনি যদি ক্যাথলিক হন তো প্রজারা ক্যাথলিক রয়ে যায়। এর অনুরূপ দৃশ্য অন্যত্রও দেখা গেছে। এ কালে ধর্মের সে দাপট নেই। এখনকার দিনে ভাষার দাপট। আলসাস লোরেন যখন জার্মানীর হাতে পড়ে তখন সেখানকার ছেলেদের জার্মান শিখিয়ে জার্মান বানানো হয়। যখন ফরাসীদের দখলে যায় তখন ফরাসী শিখিয়ে ফরাসী বানানো হয়। ন্যাশনালিজমের ইহাই নিয়ম।

এই নিয়ম দেশের অভ্যন্তরেও কাজ করে। একটি দেশে যদি একাধিক ভাষা থাকে তবে কোনো একটিকে রাজভাষা করলে সেই ভাষা যাদের মাতৃভাষা তারাই রাজার জাত হয়। আর সবাই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। বেলজিয়ামের রাজভাষা ছিল ফরাসী। কিন্তু যেই সে দেশে ন্যাশনালিজম প্রবল হলো অমনি ফ্লেমিশরা জেদ ধরল যে তাদের ভাষাকেও সমান মর্যাদা দিতে হবে। এখন বেলজিয়ামে ফরাসী ও ফ্লেমিশ দুই ভাষারই সমান মর্যাদা। তেমনি সুইজারল্যাণ্ডে জার্মান, ফরাসী ও ইটালিয়ান ভাষার সমান মর্যাদা। এই যে সমান মর্যাদা এটা স্বীকার করে না নিলে মহা অনর্থ বাধত। জাতীয় সংহতির দোহাই দিয়ে কোনো একটি ভাষার মাথায় রাজছত্র ধরলে ভবী ভুলত না।

মোগল আমলে ফরাসী ও ব্রিটিশ আমলে ইংরেজী রাজভাষা হওয়ায় আমাদের সকলেরই বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে একটা দেশের রাজভাষা কেবল একটাই হতে পারে, দু'তিনটে হতে পারে না। তা ছাড়া ন্যাশনালিজম আমাদের এই কথাই শেখায় যে ইংরেজদের পর যেমন কংগ্রেস ইংরেজীর পর তেমনি হিন্দী। অর্থাৎ একের উত্তরাধিকারী এক। বহু হলে বিপদ। আমরাও ঐক্যের খাতিরে হিন্দীকেই মনে মনে শিরোপা দিই। কিন্তু সে সময় আমরা অতটা ভেবে দেখিনি যে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হলে হিন্দীভাষীরাই প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হবে। তাছাড়া আমাদের অনেকের ধারণা ছিল যে হিন্দীর সঙ্গে উর্দুও তো থাকবে, সুতরাং ওটা একজনের একাধিপত্য নয়। মনোপলি গড়ে উঠবে না। তারপর আমার মতো স্বাপ্নিকদের বিশ্বাস ছিল গান্ধীজী চিরজীবী হবেন ও তাঁর প্রভাবে রাষ্ট্রের তথা অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে। আসল ক্ষমতা তো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে না, ধনভাণ্ডারও নিচের তলায় চলে আসবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হয়ে শোভাবর্ধন করবে।

কিন্তু স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের মিল কোথায় আজ? ব্রিটিশ আমলে প্রাদেশিক

সরকারের চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও পৃষ্ঠপোষকতা যত বেশী ছিল কংগ্রেস আমলে তার চেয়ে অনেক বেশী। অত বড়ো সৈন্যদল ব্রিটিশ আমলে তো নয়ই, মোগল আমলেও ছিল না। কেন্দ্রীয় দপ্তরের কর্মচারী সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে। পাবলিক সেক্টর সেকালে অতি ক্ষুদ্র ছিল। একালে অতি বৃহৎ। কোথায় বিকেন্দ্রীকরণ! তাও যদি রাজধানীটা কলকাতায় থাকত! ইংরেজরা সেটা দিল্লীতে তুলে নিয়ে যায় বাঙালীর প্রভাব এড়াতে। পাঞ্জাবীর প্রভাব পড়ার ভয়ে দিল্লীকে পৃথক একটি প্রদেশে পরিণত করে। এখন ওটা হয়ে উঠেছে হিন্দীভাষী জনগণের অলিখিত সদর। হিন্দীভাষার সাহিত্যিক, সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশন সংস্থার অভিনব মক্কা। কোনো একটার না হোক গোটাকয়েক রাজ্যের প্রভাব পড়তে বাধ্য। সেগুলি হিন্দী গুজরাতী ও মরাঠীভাষী। সিংহর হিস্সা তো এরাই ভোগ করছে।

এখনো ইংরেজী চালু আছে বলেই রক্ষা, নয়তো ভারতের আভ্যন্তরিক হিংসাদ্বেষ চরমে উঠবে। "একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান......" বলে গেছেন কবি। হিন্দীকে মোকাবিলা করতে হবে বারো রাজপুতের সঙ্গে। তাদের নাম বাংলা ওড়িয়া তামিল তেলেগু কন্নাড় ইত্যাদি। নাগারা কোনো কালেই হিন্দী ও দেবনাগরী মেনে নেবে না। আসামের শিক্ষিত আদিবাসীরা রোমক লিপিতে ও ইংরেজী ভাষায় অভ্যস্ত। কাশ্মীরী মুসলমানদের হিন্দীর চেয়ে উর্দুর প্রতি অনুরাগ বেশী, দেবনাগরীর চেয়ে উর্দুলিপির প্রতি। ইংরেজী আছে বলেই এসব গোলমাল ধামাচাপা পড়েছে। ধামাটি সরিয়ে দিলে ভীষণ উপদ্রব শুরু হয়ে যাবে। এখন হয়েছে কী! দক্ষিণ ভারতের ওটা তো সামান্য একটু নমুনা।

বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি দ্বিভাষী বা ত্রিভাষী রাষ্ট্রের মতো আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তানও দ্বিভাষী হয়েছে, হতে বাধ্য হয়েছে। তিনটি বলিতেই ওখানকার মোগলদের টনক নড়েছে। পঞ্চাশটি বলি ও পাঁচটি আত্মবলি যদি এখানকার ছত্রপতিদের হুঁশিয়ার করে তো এ রাষ্ট্রও দ্বিভাষী বা বহুভাষী হবে। নয়তো এ বিরোধ তোলা রইল। পরে আবার দপ করে জ্বলে উঠবে। এত বড়ো একটা দেশ একভাষী হতে পারে না। যখন পরাধীন ছিল তখন পরের ইচ্ছায় একটিমাত্র সরকারী ভাষায় কাজ চলত। এখন তো এক পক্ষের ইচ্ছায় সেটা হতে পারে না। ধর্মের ক্ষেত্রে বা ভাষার ক্ষেত্রে অধিকাংশের ভোটই নিয়ামক নয়। তাই যদি হতো তবে আমরা হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করিনি কেন? গণতন্ত্র সংখ্যালঘুকেও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে না। করলে পাকিস্তানের মতো অন্যায় করে। আমরা একটা অন্যায় এড়িয়েছি। আরেকটা অন্যায় এড়াতে পারব কি?

সব কটা ভাষাকে আক্ষরিক অর্থে রাজমর্যাদা দেওয়া সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু কাজকর্মের বেলা অসম্ভব। আর কোনো দেশে অতগুলো ভাষা নেই, তাই এর কোনো নজির নেই। সুইসদের দৌড় তিন ভাষা পর্যন্ত, বেলজিয়ানদের দৌড় দুই ভাষা পর্যন্ত। এসব ভাষা পরস্পরসদৃশ। হিন্দী

তামিলের মতো বা উর্দু বাংলার মতো বিসদৃশ নয়। পাকিস্তান সেইজন্যে ইংরেজীকে আরো পঁচিশ বছরের জন্যে রেখে দিয়েছে। শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর বলে রাতারাতি দ্বিভাষিক হতে ইচ্ছুক নয়। যদি আরো পঁচিশ বছর রাখে তা হলেও আশ্চর্য হব না। আমরা যদি বহুভাষিক সমাধান খুঁজি তা হলেও আমাদের শেষের সেদিনের ভয়ে ইংরেজীকে ধরে রাখতে হবে। একভাষিক সমাধান যে অবাস্তব এটা কি আমরা কোনো দিন হৃদয়ঙ্গম করব না?

যেদিক থেকেই দেখি না কেন ইংরেজীকে উচ্ছেদ করা বা "রিপ্লেস" করা শেষের সেদিনকে অকারণে ডেকে আনা। হিন্দী পোশাকী রাষ্ট্রভাষা হতে পারে, কিন্তু আটপৌরে রাষ্ট্রভাষা হতে গেলে এমন গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলবে যে সব কিছু বিপন্ন হবে—শান্তি, মৈত্রী, একতা, স্বাধীনতা। কাজের কথা হচ্ছে ইংরেজীকেও রাখা ও হিন্দীকেও মধ্যযুগের মোহ থেকে মুক্ত করে জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করা। যে যাই বলুক ইংরেজী কখনো কোটি কোটি নাগরিকের ভাববিনিময়ের ভাষা হবে না। অপরপক্ষে হিন্দী যতই উন্নতি করুক আধুনিক যুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্রুতগামী বাহন হতে পারবে না, সুতরাং শিক্ষিত ভারতবাসীর ভাববিনিময়ের ভাষা হতে পারবে না। সর্ব ভারতের শিক্ষিত জনের সংখ্যাও বাড়তির দিকে। তাঁদের ভাব-বিনিময়ের জন্যেও একটা ভাষা চাই। সে ভাষা হিন্দী বাংলা তামিল মরাঠী নয়। এক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ অচল। এই কঠোর প্রতিযোগিতার জগতে ভারতের শিক্ষিত অংশকে অশিক্ষিত অংশের সঙ্গে তাল রেখে চলতে বলা মানেই দুনিয়ার প্রগতিশীলদের সঙ্গে বেতালা হতে বলা। বরং অশিক্ষিত অংশকেই বলতে হবে শিক্ষিত অংশের সঙ্গে তাল রাখতে চেষ্টা করতে। তা হলেই তারা দুনিয়ার প্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারব।

"মাতৃভাষার পর দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজী শিখবে, না তামিল তেলেগু বা বাংলা শিখবে?" এই প্রশ্নের উপর যদি গণভোট হয় তো হিন্দীভাষী রাজ্যগুলিতে এমন একটিও ছাত্র পাওয়া যাবে না যে বলবে, "আংরেজী নেহি শিখুঙ্গা, তামিল য়া তেলেগু য়া বাংলা শিখুঙ্গা।" ইংরেজীর মূল্য কী তা আমার বিহারী ভৃত্য গণেশ পর্যন্ত বোঝে। এইমাত্র তার ভোট নিলুম। সে বলছে সে ইংরেজী শিখবে, তামিল শিখবে না। খাদিকর্মী বারাণসীনিবাসী হরিভাইকে হাতের কাছে পেয়ে একই প্রশ্ন করলুম ও একই উত্তর পেলুম। দেশের লোককে সুযোগ দিলে তারা মাতৃভাষার পর ইংরেজীই শিখতে চাইবে, অন্য একটা ভারতীয় ভাষা নয়। অন্য একটা ভারতীয় ভাষা শিখতে বাধ্য হলে তারা মাতৃভাষা ও ইংরেজীর পর সংস্কৃতকেই চাইবে, তামিলকে নয়, তেলেগুকে নয়, এমন কি বাংলাকেও নয়। এই যদি হয় উত্তর ভারতের মনোভাব তবে দক্ষিণ ভারতের মনোভাবও তো একই রকম হবে। ওখানকার লোক প্রথমে শিখবে মাতৃভাষা, তার পরে ইংরেজী, তার পরে যদি বাধ্য হয় তবে সংস্কৃত। তাও তামিল অব্রাহ্মণরা নয়। সংস্কৃতের উপর ওদের রাগ হিন্দীর চাইতেও বেশী, কারণ আর্যরা দ্রাবিড়দের সঙ্গে যেখানে অসিযুদ্ধে জেতেনি

সেখানে মসীযুদ্ধে জিতেছিল, অর্থাৎ সংস্কৃত দিয়ে ভুলিয়েছিল। হিন্দীর বিরুদ্ধে যাদের জাতক্রোধ তাদের আশঙ্কা যে হিন্দীর ভিতর দিয়ে সংস্কৃত আবার এসে আধিপত্য করবে। যেসব সংস্কৃত শব্দকে তামিল থেকে ওরা ইতিমধ্যে বহিষ্কার করেছে সেই সব শব্দ হিন্দীর ভেক ধরে পুনঃপ্রবেশ করবে।

বিহারীদের যদি বলা হয় আজ থেকে তামিল রাষ্ট্রভাষা হলো, মাতৃভাষার পর আর ইংরেজী নয়, ইংরেজীর পরিবর্তে তামিল শিখতে হবে তা হলে তারাও কি আগুন জ্বালিয়ে নিজেরা পুড়বে না, অপরকে পোড়াবে না? তারাও কি রেললাইন ওপড়াবে না, ডাকঘর তছনছ করবে না? তারাও কি থানায় হানা দেবে না, বন্দুক লুট করবে না? বিহারীদের কাছে যেমন তামিল দক্ষিণীদের কাছে তেমনি হিন্দী। খুশি হয়ে শিখতে যারা চায় তারা শিখুক, কিন্তু বাধ্য করতে গেলেই অবাধ্য হবে। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করাই হিন্দী রাষ্ট্র পত্তন করা। তামিলকে রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করলে উত্তর ভারতেও বিদ্রোহ দেখা দিত। এ জিনিসকে রাজনীতিকের কারসাজি বলে লাঘব করা উচিত নয়। ঘরের এক কোণে যদি আগুন লাগে তা হলে দক্ষিণেই লাগুক আর উত্তরেই লাগুক গোটা ঘরটাই পুড়ে যেতে পারে। তর্ক না করে চালাকি না করে নেবাও যেমন করে পারো।

কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দীকরণের পথে বাধা যখন প্রথম দিবসেই এসেছে তখন যে লোকটি সেদিন অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছে তার প্রতিবাদবাণী গ্রাহ্য করতেই হবে। ইউরোপের প্রোটেস্টাণ্ট আন্দোলনের মতো এটাও একপ্রকার প্রোটেস্টাণ্ট আন্দোলন। সকলের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে উঠেছে শিবলিঙ্গমের কণ্ঠস্বর। হিংস্র আকার ধারণ করলেও এর পিছনে মূলনীতির প্রশ্ন রয়েছে। সেকুলার স্টেটকে হিন্দুরাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলে যেমন মূলনীতির প্রশ্ন ওঠে এক্ষেত্রেও তেমনি হিন্দী অহিন্দীর ঊর্ধ্বে স্থিত রাষ্ট্রকে হিন্দী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করতে গিয়ে উঠেছে।

ধরো যদি এই রাষ্ট্রকে হিন্দুরাষ্ট্র বলে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে বলা হতো যে মুসলমান খ্রীস্টান শিখদের কোনো অসুবিধে হবে না তা হলে কি ওরা নির্বিবাদে মেনে নিত? তেমনি অহিন্দীভাষীদের কোনো অসুবিধে হবে না বললেই ভবী ভুলবে না। ইংরেজী আরো কিছুদিন থাকবে কি থাকবে না এটা অবান্তর। যদি থাকে তবে শুধু অহিন্দীভাষীদের সুবিধের জন্যে কেন, সকলের সুবিধের জন্যে থাকবে। শুধু অহিন্দীভাষী এলাকায় থাকবে কেন, সব এলাকায় থাকবে। ইংরেজীর বিরুদ্ধে হিন্দীর যে আপত্তি বাংলারও সেই একই আপত্তি। হিন্দী যদি তার ছায়ায় থেকে বিকশিত হতে না পারে তো বাংলাও তার ছায়ায় থেকে বিকশিত হবে না। তাকে আরো কিছুদিন ধরে রাখার দায়টা কেবল আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া কেন? আমরা কি কম জাতীয়তাবাদী না আমরা কম স্বাধীনতাপ্রিয়?

মাতৃভাষা যে ক্ষেত্রে সরকারী ভাষা সে ক্ষেত্রে লোকে সরকারের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে। বিহারের লোকের মাতৃভাষা বিহার সরকারের সরকারী

ভাষা হলে লোকে সেখানকার সরকারের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করবে। তেমনি মাদ্রাজের লোকের মাতৃভাষা মাদ্রাজ-সরকারের সরকারী ভাষা হলে লোকে সেখানকার সরকারের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করবে। এই পর্যন্ত পরিষ্কার। এ নিয়ে গোলমাল যা হবার তা হয়ে চুকেছে। বর্তমান পর্যায়ে গণ্ডগোলটা ভারত সরকারের সরকারী ভাষা কোন্‌টা হবে তাই নিয়ে। হিন্দী হলে অর্ধেক লোক একাত্মতা অনুভব করবে। তাদের বেলা দেশাত্মবোধ ও ভাষাত্মবোধ সমার্থক শব্দ। কিন্তু বাকী অর্ধেক দেশবাসীর বেলা তা নয়। এরা তা হলে কী করবে? অনন্তকাল ইংরেজীকে ধরে রাখবে? তাতেও কি ভারত সরকারের সঙ্গে একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হবে? তা হলে কি ইংরেজীকে ছেড়ে দিয়ে হিন্দীকেই ধরবে?

আমাদের হয়েছে উভয়সংকট। ইংরেজীকে চিরকাল ধরে রাখতে হলে দেশসুদ্ধ লোক ধরে রাখবে, শুধুমাত্র আমরাই ধরে রাখতে চাইলে কথা উঠবে যে আমরা দেশপ্রেমিক নই, পাশ্চাত্ত্য প্রেমিক। আমরা আমাদের মুখ হারাব, কণ্ঠস্বর হারাব, চোরের মতো থাকব। ঘরের ছেলের মতো আদর পাব না। "এ লোগ সুবিধাবাদী হ্যায়"। অপরপক্ষে ইংরেজীকে ছেড়ে দিয়ে হিন্দীকে ধরতে গেলে হিন্দী রাষ্ট্রে বিলীন হব। তামিলরা এই আতঙ্কে আত্মবলি দিচ্ছে। আমাদের আত্মবলিটা তিলে তিলে ঘটবে। অমন নাটকীয়ভাবে নয়।

এমন একটা ফরমুলা চাই যাতে শ্যাম ও কুল দুই রক্ষা হয়। কতকগুলো কাজের জন্যে ইংরেজী চিরকালের জন্যে থাকবে ও সারা দেশের জন্যে থাকবে। যেমন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কাজে। তেমনি কতকগুলো কাজের জন্যে হিন্দী চিরকালের জন্যে আসবে ও নিখিল ভারতে আসবে। যেমন আনুষ্ঠানিক কর্মে। বৈদেশিক রাজদরবারে। তেমনি কতকগুলো কাজের জন্যে ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলিকেও ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে হবে। যেমন ডাকঘরে, রেলওয়েতে। পোস্টকার্ডের উপর যদি হিন্দী ব্যবহার করা হয় তবে পাঁচ পয়সার ডাকটিকিটের উপর বাংলা, দশ পয়সার ডাকটিকিটের উপর উর্দু, বিশ পয়সার ডাকটিকিটের উপর গুজরাতী ব্যবহার করা হবে। তেমনি উত্তর প্রদেশের চিঠির উপর যদি হিন্দী পোস্টমার্ক ছেপে দেওয়া হয় তো পশ্চিমবঙ্গের চিঠির উপর বাংলা পোস্টমার্ক, ওড়িশার চিঠির উপর ওড়িয়া পোস্টমার্ক, কেরলের চিঠির উপর মলয়ালম পোস্টমার্ক ছেপে দেওয়া হবে। এমনি কত রকম উপায়ে ভারতের বিভিন্ন ভাষাকে রাজভাষার মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। তবে কোনো ভাষাকেই সব কাজের ভাষা করা উচিত নয়। হিন্দীকেও না। ইংরেজীকেও না। যাকে সব কাজের ভাষা করবে সেই ঠাওরাবে সে সর্বেসর্বা। একমাত্র রাষ্ট্রভাষা না হয়ে হিন্দী যদি হতো প্রধান রাষ্ট্রভাষা তা হলে মানুষ অত গরম হয়ে উঠত না। যে ভাষা চার-পাঁচটি রাজ্যের মাতৃভাষা তাকে তো তার উপযুক্ত সম্মান দিতে হবে। কিন্তু তার উপযুক্ত সম্মান বলতে কি এই বোঝায় যে রামচন্দ্রজীর মতো তিনি অযোধ্যার সিংহাসনে বসবেন, আর যতদিন না সীতা বনবাসে যাচ্ছেন

ততদিন সীতাদেবীর মতো ইংরেজী তাঁর বাম পাশে বসবেন, আর ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নের মতো অন্যান্য ভাষা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছত্র ধরবে ও চামর দুলোবে আর হনুমানজীর মতো আদিবাসী ভাষাগুলি তাঁর সামনে হাত জোড় করে খাড়া হবে ?

একমাত্র রাষ্ট্রভাষা না হয়ে হিন্দী আমাদের প্রথম রাষ্ট্রভাষা হোক। ইংরেজীকে একদিন বনবাসে পাঠানোর কল্পনা ছেড়ে দিয়ে তাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিক। এবং বরাবরের মতো দিক। কতকগুলো কাজ নিজে করুক, কতকগুলো ইংরেজীর উপর ছেড়ে দিক। তেমনি বাংলা তামিল প্রভৃতি তথাকথিত আঞ্চলিক ভাষাকেও সমপর্যায়ের রাষ্ট্রভাষা বলে সমান আসন দিক। তাদের সবাইকে কতকগুলো কাজের সাথী করুক। এইভাবে একটা শ্রমবিভাগ হয়ে যাক। তা হলে কারো মনে কোনো ক্ষোভ থাকবে না। যে যার নির্দিষ্ট কাজ করে যাবে।

এমন দিন কোনো দিন আসবে না যেদিন সব কাজ হিন্দীর একার দ্বারা হবে। এটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ নয়। এমন দিন কোনো দিন আসবে না যেদিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হিন্দীর মাধ্যমে হবে। তার জন্যে ইংরেজীকেই বরাবরের মতো ভারতের অন্যতম সরকারী ভাষার আসন দিতে হবে। হিন্দীর ও ইংরেজীর সীমানা ভৌগোলিক অর্থে নয়, ফাংশনাল অর্থে বেঁধে দিতে হবে। তেমনি অন্যান্য ভাষার সীমানা শুধু নিচের তলায় নয়, উপরের তলার কয়েকটি ব্যাপারেও বিস্তার করতে হবে।

ভুলটা শাস্ত্রী মন্ত্রিমণ্ডলীর নয়, ভুলটা পূর্বসূরীদের। তাঁদের জানা উচিত ছিল যে ধর্ম বা ভাষাঘটিত মূলনীতির প্রশ্ন কখনো ভোটে দিতে নেই। ভোটে দিলেও কাস্টিং ভোট প্রয়োগ করতে নেই। এসব ক্ষেত্রে যেটা ধোপে টিকবে সেইটেই প্রকৃত সমা ন। নইলে সেটলড ফ্যাকট একদিন না একদিন আনসেটলড হবে। তাঁরা যখন দেখলেন যে, সদস্যরা দুই সমান ভাগে বিভক্ত, তখন তাঁদের বোঝা উচিত ছিল যে, দেশের অর্ধেক লোক হিন্দী রাষ্ট্র মেনে নেবে না, সুতরাং ভাষার জন্যে গৃহযুদ্ধ বাধবে বা দেশ ভাগ হয়ে যাবে। তখন তাঁদের কর্তব্য ছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা কী হবে, সেটা সংবিধানে লিপিবদ্ধ না করা, সেটা পার্লামেণ্টের উপর ছেড়ে দেওয়া। পার্লামেণ্ট পরে এক সময় জনমত সংগ্রহ করে যা করবার তা করত। এর জন্যে একটা তারিখ ধার্য করাও নিষ্প্রয়োজন। তাঁরা যদি অন্তত সেটুকুও পার্লামেণ্টের উপর ছেড়ে দিতেন, তা হলে মহাসংবিধান অশুদ্ধ হত না।

এখন একভাষিক রাষ্ট্রকে কেমন করে বহুভাষিক করা যায়, সেই হচ্ছে ভাবনা। আজ হক কাল হক একদিন না একদিন এককে একাধিক করতে হবেই। ভারত কখনো হিন্দী রাষ্ট্র হবে না। একদিনের জন্যে হতে গিয়ে এই বিপত্তি, চিরকালের মতো হতে গেলে অনেকগুলি রাজ্যকে তালাক দিতে হবে। তখন সেই হিন্দীস্থানের চৌহদ্দি আরো সঙ্কীর্ণ হবে, যদিও তখনো তাকে বলা হবে ভারত। সহিংস বা অহিংস যেভাবেই সেটা ঘটুক না কেন,

সেটা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয় একটা অশুভ পরিণতি। সেটা ইতিহাসবিরুদ্ধ, কারণ ভারতের ইতিহাস হিন্দু বা হিন্দীর একার নয়। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে সবাইকে মিলতে ও মেলাতে হবে।

যাঁদের উপর সিদ্ধান্তের ভার তাঁরা কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তাঁরাই জানেন। হয়তো তাঁরাও জানেন না। কিন্তু আমরা যেন নিশ্চিত জানি যে, একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিন্দীও হতে পারবে না, ইংরেজীও হতে পারবে না। একচ্ছত্র হতে কোনটাকেই দেওয়া হবে না। আর বিশেষ কয়েকটি কাজের জন্যে ইংরেজীর প্রয়োজন পঞ্চাশ বছর পরেও ফুরিয়ে যাবে না, কারণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যম একাধিক হতে পারে না, কোনো প্রকার মডারেশন দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করা যাবে না। আর আঞ্চলিক ভাষা বলে কোনো পদার্থই নেই, সব কটি ভাষাই জাতীয় ভাষা ও সকলেরই সাহায্য নিতে হবে।

আমরা ভুলে যাই যে, আমাদের এই রাষ্ট্রে নাগাভূমি আছে, কাশ্মীর আছে, গোয়া আছে। খ্রীস্টধর্মী আদিবাসীরা রোমান লিপিতে লেখাপড়া করে। এরা কেউ কোনো কালেই দেবনাগরী লিপিতে লিখিত সংস্কৃতবহুল হিন্দী মেনে নেবে না। এদের দিক থেকে ইংরেজীই শ্রেয়। যদি না এদের মাতৃভাষাগুলিকেও রাষ্ট্রীয় স্তরে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। বর্তমান সংবিধানে তো আদিবাসী ভাষাগোষ্ঠী বেবাক বাদ গেছে। ওরাও কি একদিন মুখর হবে না? ওদের তখন কী দিয়ে ভোলানো যাবে? হিন্দী কি ওদের লোকভাষা হতে পারবে? ওই দেবনাগরী লিপি নিয়ে?

হয় এদের ভারতীয় ইউনিয়নের বাইরে রেখে ভুটান বা সিকিমের মতো মর্যাদা দিতে হবে, নয় এদের ভারতীয় ইউনিয়নের ভিতরে রেখে এদের দিক থেকে শ্রেয়স্কর বলে ইংরেজীকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষার বা সরকারী ভাষার মর্যাদা দিতে হবে। ইংরেজ আর ইংরেজী একই জিনিস নয়। সমস্ত গোলমালটার মূলে এই রজ্জুতে সর্প ভ্রম করে দৌড়। উল্টো দৌড়।

ভাষা সঙ্কট

একটা বহুভাষী দেশকে একভাষী করার চেষ্টা তখনি সফল হতে পারে যখন বিদেশ থেকে একটা পরাক্রান্ত ভাষা উড়ে এসে জুড়ে বসে, কিংবা স্বদেশেরই একটি ভাষা সেকালের রাজাদের মতো রাজচক্রবর্তী হয়।

ইংরেজী একদিন উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল। একটা বহুভাষী দেশকে সরকারী কাজকর্মে একভাষী করেছিল। এমন কি সাংস্কৃতিক ব্যাপারেও একভাষী করেছিল।

এখন ইংরেজীর যুগ গেছে। হিন্দীর সহযোগীরূপে সে হয়তো আরো কিছুকাল থাকবে। এখন একটা বহুভাষী দেশকে একভাষী করার ভার নিয়েছে হিন্দী। সেকালের রাজাদের মতো হিন্দী হবে রাজচক্রবর্তী। তার নিজের এলাকায় সে রাজা, তার নিজের এলাকার বাইরে সে চক্রবর্তী। যেমন ছিলেন যুধিষ্ঠির, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। যেমন ছিলেন মহম্মদ তুঘলক, আকবর, আওরংজেব।

সেই ঐতিহাসিক প্যাটার্ন আবার ফিরে এলো। উত্তরভারতের একটি ভাষা নিখিল ভারতের ভাষাচক্রবর্তী হয়ে ভারতীয় সংবিধানের কল্যাণে সামনের পাঁচশ' বছর প্রভুত্ব করবে। কারো কিছু বলবার থাকবে না। কারণ জাতীয়তা-বাদ ও গণতন্ত্র হিন্দীর পিছনে একজোট হয়েছে। বিপক্ষে যারা আছে তাদের নানা মুনির নানা মত। তারা কেবল যে বিচ্ছিন্ন তাই নয়, তারা বিবদমান। কখনো তারা বলে, চোদ্দটা ভাষা চাই। কখনো বলে, পাঁচ ভাষা। কখনো বলে, সংস্কৃতই একমাত্র ভাষা হবে। কখনো বলে, ইংরেজী চিরস্থায়ী হোক।

হিন্দী এদের ভয়ে ভীত নয়। হিন্দীর একমাত্র ভয় দক্ষিণের বিদ্রোহীদের। ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখতে পাওয়া যায় উত্তর বার বার আক্রমণ করেছে, অনুপ্রবেশ করেছে, দক্ষিণ বার বার প্রতিরোধ করেছে, বহিষ্কার করেছে। মহম্মদ তুঘলককে রাজধানীটাই সরিয়ে নিয়ে যেতে হয় দিল্লী থেকে দেবগিরিতে। যার নামকরণ হয় দৌলতাবাদ। আওরংজেবকে দক্ষিণেই শেষ জীবনটা কাটাতে হয় তাঁবুতে। আমরা অবাক হয়ে লক্ষ করছি যে ছাব্বিশে জানুয়ারীর পর মাস তিনেক কেটে গেলেও মাদ্রাজের মাটিতে পা দেবার সময় পাননি প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নন্দ। বিনোবাজীর শান্তিসেনা তো চীনযাত্রার উদ্যোগ করছিলেন। দক্ষিণযাত্রা করছেন কবে? পুলিশ আর মিলিটারি এখন শান্তিরক্ষা করছে। অহিংসার এই পরিণতি।

অমন করে একটা বহুভাষী দেশকে একভাষী করা যাবে না। ওই মনোভাবটাই ভুল। ওর সংশোধন যদি না হয় তবে সংবিধান সংশোধন বা সরকারী ভাষা আইন সংশোধন হবে কী করে? যা হবে তা গোঁজামিল। দু'দিন বাদে ভেঙে পড়বে।

দুই সত্য

একজোড়া অপ্রিয় সত্যের মাঝখান দিয়ে পথ করে নেওয়া মুখের কথা নয়। তবু মুখের কথা দিয়েই আমরা কার্যোদ্ধার করতে চাই। যেন কয়েকটা প্রস্তাব কোনো মতে পাশ করিয়ে নিলেই বা আইনবন্ধ করলেই মুশকিল আসান।

ইংরেজীর বিরুদ্ধে জনমত উত্তর ভারতে যেমন তীব্র হিন্দীর বিরুদ্ধে জনমত দক্ষিণ ভারতে তেমনি তীব্র। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বলে যাঁরা

পরিচয় দেন তাঁরা এই দ্বিতীয় সত্যটিকে স্বীকার করতে চান না। তাঁদের বিশ্বাস এটা একটা সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি। কয়েকটা দুষ্টুলোকই সাধারণ লোককে ক্ষেপিয়েছে, ছাত্রদের মাথা খেয়েছে, অকারণে একটা অনর্থ বাধিয়েছে। তাঁদের মতে পাঁচ দশ বছর ধৈর্য ধরলেই দক্ষিণ ভারত উত্তর ভারতের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে হিন্দীর জোয়াল কাঁধে নিয়ে জোড়া বলদের মতো জমি চষবে।

তাঁদের এই বিশ্বাসের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তবে তাঁদের সাবধান করে দেওয়াও আমাদের কর্তব্য। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলতে যদি বোঝায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যাকে গ্রহণ করেছে সেই মতবাদ তবে সে মতবাদ জাতিধর্মভাষা নিরপেক্ষ। গান্ধী জবাহরলাল থাকতেই কংগ্রেসে দক্ষিণীদের খাতিরে ইংরেজীও চলত। এখনো চলে। কেবল কংগ্রেসে নয় যতগুলি নিখিলভারত রাজনৈতিক দল আছে প্রত্যেকটিতেই দক্ষিণের খাতিরে ইংরেজী। এটা ইংরেজ সরকারের হুকুমে নয়, বিদেশী রাজত্বের ফরমানে নয়, এটা আমাদেরি এক ভাগের সঙ্গে অন্য ভাগের ঐতিহাসিক অসংযোগের ফলে। উত্তর দক্ষিণ কোনোকালেই স্বাধীন ইচ্ছায় এক হয়নি। আর্য দ্রাবিড়ের বিরোধ আর্যের একচ্ছত্রতায় পর্যবসিত হয়নি। মোগলরাও সবটা গ্রাস করতে পারেনি। ইংরেজরা যা বাহুবলে পেরেছে আমরা ভাবছি আমরা তা নিছক ভাবাবেগ দিয়ে পারব।

পাঁচ দশ বছর অপেক্ষা করতে চাও, করো। কিন্তু কখনো আশা কোরো না যে দক্ষিণ বিনা শর্তে হিন্দীতে রাজী হয়ে যাবে। এক এক করে অনেক-গুলি শর্ত দিল্লীকে দিয়ে মানিয়ে নেবে। দিল্লীর যদি আপত্তি থাকে দক্ষিণেরও আপত্তি থাকবে। একতরফা চাপ দিতে গেলেই সে আবার আর্তনাদ করে উঠবে। এটা ইংরেজী প্রীতির জন্যে নয়, আত্মরক্ষার জন্যে। দক্ষিণ ভারত আত্মরক্ষা করতে চায় কার হাত থেকে ও কেন উত্তর ভারতকে এটা গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। ভারতের জাতীয় স্বার্থ আর হিন্দীভাষীদের প্রজাতীয় স্বার্থ একই জিনিস নয়।

বাঙালী এখনো মনঃস্থির করতে পারেনি, তাই বাঙালীর মুখে তিন চার রকম কথা শোনা যায়। ক্রমে বাঙালীও মনঃস্থির করবে। তখন যেটা হোক একটা কথাই বলবে।

একীয়তা

আমরা যে রাস্তায় চলেছি সে রাস্তায় চলতে থাকলে ভাষাভিত্তিক এক একটি রাজ্য ক্রমে ক্রমে এক একটি নেশন হয়ে উঠবে। তখন ভারতীয় ইউনিয়নকে তারা সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো একটি নেশন-সমবায় বানাতে চাইবে। আমরা এতদিন যে ভারতের ধ্যান করে এসেছি সে ভারত একটি নেশন-সমবায়

নয়, একটি ধর্মনিরপেক্ষ ভাষানিরপেক্ষ মতবাদনিরপেক্ষ নেশন। কিন্তু আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের গরমিল দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

এক একটি রাজ্যের সঙ্গে এক একটি ভাষার একীয়তা ঘটলে তার পরিণাম হবে এই।

"মহারাষ্ট্রের জন্যে মরাঠী" বদলাতে বদলাতে হবে "মরাঠীভাষীদের জন্যে মহারাষ্ট্র"। তেমনি "গুজরাতের জন্যে গুজরাতী" বদলাতে বদলাতে হবে "গুজরাতীভাষীদের জন্যে গুজরাত"। তেমনি "বঙ্গভাষীদের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ", "তামিলভাষীদের জন্যে মাদ্রাজ", "হিন্দীভাষীদের জন্যে বিহার, উত্তর-প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ"। রাজ্যের জন্যে ভাষা এটা ঘুরে গিয়ে হবে ভাষার জন্যে রাজ্য।

একই প্রকার চিন্তাবিপর্যয় ঘটবে আরো উপরের স্তরে। "ভারতের জন্যে হিন্দী" ছুঁচ হয়ে ঢুকছে। ফাল হয়ে বেরোবে "হিন্দীর জন্যে ভারত, হিন্দী-ভাষীদের জন্যে ভারত"। সেটার প্রতিবাদে দিকে দিকে এমন বিক্ষোভ দেখা দেবে যে বাধ্য হয়ে ভারতীয় ইউনিয়নকে সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো নেশন-সমবায় করতে হবে। হিন্দীর সীমানা যাতে সঙ্কুচিত হয়। বলা বাহুল্য অমন করে এক নেশন গড়ে তোলা যায় না। ওটা বহু নেশনকে মেনে নিয়ে একসূত্রে গাঁথা। সেটা তো আমাদের আদর্শ নয়। আমরা বহুনেশনবাদী নই, একনেশনবাদী। ভারত একটা মালটিন্যাশনাল স্টেট নয়। এক্ষেত্রে নেশন ও স্টেট একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।

ধর্মমূলক বিভেদের মতো ভাষামূলক বিভেদ ভারতকে হিন্দী অহিন্দী দুইভাগে বিভক্ত করতে পারে। এমন কি বলকানে পরিণত করতে পারে। এই দুঃসম্ভাবনাকে ভাবাবেগ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফল চাইব আমগাছের, রোপণ করব আমড়া গাছ। পরে একদিন দেখব আদর্শের সঙ্গে মিলছে না। ততদিনে খুব দেরি হয়ে গিয়ে থাকবে।

এক একটি রাজ্যের সঙ্গে এক একটি ভাষার একীয়তা যাতে না ঘটে তার জন্যে প্রত্যেক রাজ্যকেই বলতে হবে আর-একটি ভাষাকেও সরকারী ভাষার মর্যাদা দিতে। তেমনি ভারত রাষ্ট্রকেও বলতে হবে আরো অনেকগুলি ভাষাকেও সরকারী ভাষার মর্যাদা দিতে। তবে সব ক'টাকে দিয়ে সব কাজ হবে না, কর্মবিভাগ করে দিতে হবে। ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। ইচ্ছা আছে কি না সেইটেই জিজ্ঞাস্য।

প্রাণরক্ষার ও বংশরক্ষার অধিকার

প্রাণরক্ষার ও বংশরক্ষার অধিকার

মানব মাত্রেরই দুটি মৌল অধিকার আছে। একটি তো তার বাঁচবার অধিকার। আর একটি তার বংশরক্ষার অধিকার। এটা শুধু কায়িক অর্থে নয়, মানসিক বা সাংস্কৃতিক অর্থেও বটে। রবীন্দ্রনাথের বংশ রবীন্দ্ররচনাবলী তথা বিশ্বভারতী তথা অশেষ কীর্তি, যা জীবিত থেকে তাঁকে জীবিত রাখবে, তাঁর বাণীকে জীবিত রাখবে। তেমনি মহাত্মার বংশ তাঁর গ্রন্থমালা, তাঁর আশ্রম, তাঁর বিবিধ প্রতিষ্ঠান, তাঁর অগণিত স্মৃতিচিহ্ন। এ সকলের মধ্যে তিনি জীবিত আছেন, কেউ যদি ধ্বংস না করে তবে জীবিত থাকবেন। যে-কোনো মহাপুরুষের বেলাই একথা খাটে। এমন কি সাধারণ মানুষের বেলাও একথা সত্য। বাঁচবার অধিকার তথা বংশরক্ষার অধিকার সার্বজনীন অধিকার। এ দুটি অধিকার কেউ হরণ করতে পারে না।

বাইশ বছর আগে মহাত্মা গান্ধীর বাঁচবার অধিকার হরণ করে একদল পিতৃহন্তা যে অমানুষিক অপরাধ করেছিল আর-একদল পিতামহ-হন্তা এখন তারই পরিসমাপ্তি ঘটাতে উদ্যত হয়েছে। সুযোগ পেলে এরা মূর্তিভঙ্গও করবে। মহাত্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি প্রতিক্রিয়াশীল। তিনি যে অর্থে প্রতিক্রিয়াশীল সে অর্থে আরো হাজার হাজার মুনি ঋষি জ্ঞানী গুণী কবি চিত্রকর প্রভৃতিও প্রতিক্রিয়াশীল। এইরূপ হাজার হাজার জনের জীবননাশ ও বংশনাশ করলে সংস্কৃতি বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। অন্ধকার যুগ নেমে আসবে।

সাম্যবাদীরাও মানবিকবাদী। তাঁরা মানবের প্রত্যেকটি পদক্ষেপকেই তার ঐতিহাসিক মূল্য দেবার জন্যে অবিকৃতভাবে রেখে দেন। টলস্টয় বা চেকভের সঙ্গে মতভেদ সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়া অতি যত্নের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেকটি উক্তি রক্ষা করছে। কমিউনিস্ট চীনদেশ তার কনফুসীয় তথা বৌদ্ধ ঐতিহ্যের থেকে বহুদূরে সরে এলেও অতীতের বিলোপ ঘটায়নি। এদেশের মতো এত বড়ো গুরুতর অপরাধ আর কোনো দেশের সাম্যবাদীরা করেনি। করেছে একমাত্র ফাসিস্টরা। এ দেশে সাম্যবাদী বলে যারা পরিচয় দিচ্ছে তাদের কার্যকলাপ কিন্তু ফাসিস্টদের মতো। মানবিকবাদী হলে এরা অমন করত না।

জার্মান কবি হাইনে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আজ যারা বইপত্র পোড়াচ্ছে একদিন তারা মানুষকেও পোড়াবে। হিটলারী আমলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে গ্যাস চেম্বারে পুরে যে ভাবে মারা হলো সেটাও এক প্রকার পোড়ানো। সুতরাং সময় থাকতে সতর্ক হতে হবে এদেশের লোকের। বইপত্র পোড়ানো কেবল সম্পত্তিনাশ নয়। এ হচ্ছে প্রাণনাশের আদিপর্ব। লেখা হচ্ছে লেখকের রক্ত। লেখা ধ্বংস করা হচ্ছে রক্তপাত করা। আমরা যারা লিখি তারা এই রক্তপাত সহ্য করতে পারিনে। এর নিন্দা করা উচিত। এতে বাধা দেওয়া উচিত। এদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করা উচিত।

দুই

আমাদের মনীষীদের কারো মূর্তি ভাঙা হচ্ছে, কারো মূর্তির মুখে আলকাতরা মাখানো হচ্ছে। কারো প্রতিকৃতি পোড়ানো হচ্ছে, কারো বই পোড়ানো হচ্ছে। কোথাও কেউ প্রতিরোধ করতে সাহস পাচ্ছে না। যদি বোমা পড়ে! এমন কী প্রতিবাদ করতেও লোকে ভয় পায়। চাচা আপনা বাঁচা।

দেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ একবার ধ্বংস হলে পরে আর তার পুনরুদ্ধার হয় না। একখানার জায়গায় আর-একখানা ছবি আঁকিয়ে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেই ছবিখানা তো নয়। তেমনি একটি মূর্তির জায়গায় আর-একটি মূর্তি গড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেই মূর্তি তো নয়। সেই বই অবশ্য আবার ছাপিয়ে নেওয়া যায়, যদি একটিও কপি আস্ত থাকে। কিন্তু সেই সংস্করণ তো নয়। প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক কর্মের বা কীর্তির মধ্যে একটি অপূরণীয়তা আছে। সেটা আছে বলেই সেটার মূল্য এত বেশী।

যাদের মূল্যবোধ বিকৃত বা অসাড় তারা ধ্বংসের কাজটাই করে দিয়ে যায়। সৃষ্টির দায় নেয় না। সে ক্ষমতা বা সে প্রতিভাই নেই। সব কিছুই তাদের চোখে বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রকাশ। আর বুর্জোয়া সংস্কৃতি হলেই তা একদম পচা, একেবারেই প্রতিক্রিয়াশীল। শ্রমিকের কাছে তা হারাম, কৃষকের কাছে তা গোমাংস।

গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, আশুতোষ এঁরা এমন কী অপরাধ করেছিলেন যে এঁরা অবমাননার যোগ্য হবেন? এঁদের কীর্তিলোপ বা সূক্ষ্ম অর্থে বংশলোপ করা হবে? প্রাণরক্ষার প্রশ্ন এঁদের বেলা ওঠে না, কারণ এঁরা এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু কীর্তিরক্ষা বা সূক্ষ্ম অর্থে বংশরক্ষার প্রশ্ন কি উঠবে না? এঁদের যদি কীর্তিলোপ বা সূক্ষ্ম অর্থে বংশলোপ হয় তা এঁদের গায়ে লাগবে না, এঁরা এখন তার ঊর্ধ্বে। কিন্তু আমরা যাঁরা এঁদের মূল্য ও এঁদের কীর্তির মূল্য বুঝি তাদের গায়ে লাগবে না? এঁদের বাণীর মূল্য যদি এঁদের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গিয়ে না থাকে তবে সে মূল্য বিনষ্ট হতে দেখলে আমাদের কারো মনে লাগবে না?

কতকগুলো মিথ্যা এখন মানুষকে সত্যের মুখোশ পরে বিভ্রান্ত করছে। তার মধ্যে এটাও একটা যে আমাদের মনীষীরা বুর্জোয়া সংস্কৃতির ধারক ও বাহক আর যেহেতু এটা বুর্জোয়া সংস্কৃতি সেহেতু এটা প্রতিক্রিয়াশীল ও পচা। ফরাসী ভাষায় বুর্জোয়া বলতে যাদের বোঝায় তারা প্রধানত কল-কারখানার মালিক, দোকানদার, ব্যবসাদার, ব্যাঙ্কার বা পরের ধনে ধনী। সে রকম একটা শ্রেণী গড়ে উঠতে ইউরোপের ধনতন্ত্রী দেশগুলিতে প্রায় দু'শো বছর লেগেছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই শ্রেণী শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ফেঁপে উঠেছে। আমাদের দেশে শিল্পবিপ্লব হলোই বা কবে, বাঙালীরা তার সুযোগ নিলই বা কবে? প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে শুরু করলে প্রায় অর্ধশতাব্দী হলো আমাদের এদেশেও বুর্জোয়ার উদ্ভব ঘটেছে।

কিন্তু মুষ্টিমেয় সেই বুর্জোয়া পরিবারগুলিকে আস্ত একটা সমাজ বলা যায় না। সংস্কৃতির উপর তাদের প্রভাব অতি ক্ষীণ।

মধ্যবিত্ত বলে আরো একটা কথা আছে। এটা বুর্জোয়ার সমার্থক নয়। অনেক সময় বোঝবার ভুলে আমরা মধ্যবিত্তকেই বুর্জোয়া বলে চালিয়ে দিই। মধ্যবিত্তরা সাধারণত চাকুরিজীবী। বেশীর ভাগই কেরানী বা শিক্ষক। সুদ, মুনাফা, খাজনা বা ভাড়া থেকে যারা বড়লোক তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সেই ক'জনকে বুর্জোয়া বলতে আপত্তি নেই, কিন্তু অধিকাংশ মধ্যবিত্তের আয়ের উৎস হচ্ছে মাসের শেষে মাইনে। উকীল বা ডাক্তার হয়ে থাকলে ফী। তাঁদের মধ্যে ক'জনেরই বা হাতে টাকা জমে, জমানো টাকা থেকে আরো টাকা আসে। বুর্জোয়ার প্রধান লক্ষণ হলো টাকা থেকে আরো টাকা। বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইতিহাস সেরকম নয়। এ শ্রেণীকে বুর্জোয়া আখ্যা দিলে শুধু যে এর প্রতি অবিচার করা হয় তাই নয়, শব্দটারই অপব্যবহার করা হয়।

সম্ভবত এদেশেও একটা বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে উঠবে। যেমন ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে গড়ে উঠেছে। কিন্তু তেমন একটা শ্রেণীর পিণ্ডি মধ্যবিত্তদের ঘাড়ে এসে পড়বে কেন? মাইকেল, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ কেন তাদের হয়ে জবাবদিহি করবেন? রবীন্দ্রনাথের রচনায় বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব কোথায়? কবে তিনি তাদের মুখ চেয়ে লিখলেন বা তাদের মনের কথাটাই ব্যক্ত করলেন? আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে মধ্যবিত্তদের বন্ধু বলতে পারা যায়, কিন্তু বুর্জোয়াদের তিনি কেউ নন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের বিস্তার, সেই সঙ্গে চাকরির একটা হিল্লে। কলকারখানা, আমদানী রপ্তানী, ব্যাঙ্ক ইনসিওরান্স ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি থাকলে তিনি ঘরে ঘরে গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করতেন না। যার ফলে গ্রাজুয়েটের চাহিদার চেয়ে জোগান গেল বেড়ে, বাজার দর এসে চল্লিশ টাকায় ঠেকল। তাও দুর্লভ।

বাংলার মধ্যবিত্তরা ভুল নিশ্চয়ই করেছেন অনেক। কিন্তু এ ভুলটা করেননি যে সংসারে অর্থোপার্জন ও অর্থবৃদ্ধিই হবে মুখ্য, জ্ঞানলাভ ও সৌন্দর্যসৃষ্টি হবে গৌণ বা তুচ্ছ। তবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বদনাম ছিল যে তিনি বাঙালীর ছেলেকে মাড়োয়ারী করতে চান। একালের পরিভাষায় বুর্জোয়া করতে চান। না, বাংলার মনীষীরা তাদের বুর্জোয়া করতে চাননি। মধ্যবিত্ত করতেই চেয়েছিলেন। একালে যাদের বলা হয় নিম্নমধ্যবিত্ত। তবে একেবারে নিঃস্ব করতেও চাননি। না, শ্রমিক বা কৃষক করতেও নয়। সেটা গান্ধীবাদী চিন্তা।

গান্ধীবাদী চিন্তাও কমিউনিজমের দোসর। কমিউনিজমের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নেবার জন্যে গান্ধীজী কঠোর কায়িক শ্রমের উপর ও নির্লোভের উপর জোর দেন। তাঁর শিক্ষা ক'জনই বা বুঝেছে বা নিয়েছে? নিলে ইতিহাস অন্যরূপ হতো। অথচ সেই গান্ধীজীর প্রতিকৃতি যত্র তত্র দগ্ধ হচ্ছে। যেহেতু তিনি ধনকুবেরদের বন্ধু। বন্ধু তো তিনি দীনতমদেরও ছিলেন। অস্পৃশ্যদেরও ছিলেন। অবলাদেরও ছিলেন। কুষ্ঠরোগীদেরও ছিলেন। বন্ধু

তিনি সর্বপ্রাণীর। কিন্তু কী করে এ ধারণা জন্মায় যে তিনি শোষণের সমর্থক ছিলেন ?

গান্ধীজীর কথা থাক। বাংলার মনীষীদের কথাই বলা যাক। সকলেই এঁরা বিশ্বাস করতেন যে ভারতের সংস্কৃতি চিরকালের। কিন্তু সেই সঙ্গে অনেকেই আবার বিশ্বাস করতেন যে আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন করা অত্যাবশ্যক। এর থেকেই আসে ইংরেজী শিক্ষায় রুচি। বাঙালী একদিন ইংরেজী শিক্ষায় গভীর আনন্দ পেয়েছে। তার সেই আনন্দ সে প্রকাশ করতে চেয়েছে ইংরেজীতে সাহিত্যসৃষ্টি করে। পরে তার আনন্দ প্রকাশের মাধ্যম হয় বাংলা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টারা সকলেই ইংরেজী শিক্ষার সুফল। যে সংস্কৃতি তাঁদের অনুপ্রাণিত করছিল সে সংস্কৃতি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কল্পনা ও মনন। যে সংস্কৃতি তাঁদের হাত দিয়ে সৃষ্ট হলো তার সঙ্গে মেশানো ছিল ভারতের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার ও আদর্শ। এমনি করে ঘটে আমাদের রেনেসাঁস, তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয় রেফরমেশন অর্থাৎ ধর্মসংস্কার। ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত সুবিধার জন্যে রামমোহন বা বিদ্যাসাগর দেশবাসীর ক্রোধের ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হননি। কত লোক যে সমাজের হাতে মার খেয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র শতখানেক বছর আগেই লিখেছিলেন "সাম্য"। সাম্যবাদী ইশ্‌তাহার হিসাবে তখনকার দিনে অভূতপূর্ব। দেশ তাঁর "আনন্দমঠ"কে নিল, "বন্দেমাতরম্‌"কে নিল, কিন্তু "সাম্য"কে নিল না। নেবার সময় হয়নি বলে। কিন্তু তাঁর কাজ তিনি করে গেছেন। সে কাজ বুর্জোয়ার কাজ নয়, দূরদ্রষ্টা ঋষির কাজ। প্রমথ চৌধুরী অর্ধশতক আগে "রায়তের কথা" লেখেন। দেশ তখন নিল না, এখনো কি সমস্তটা নিয়েছে ? তাঁর কথ্যভাষা-সংখান্ত প্রস্তাব এতদিনে গৃহীত হয়েছে, কিন্তু ভূমিসংস্কারবিষয়ক প্রস্তাব এখনো ঝুলছে।

স্বামী বিবেকানন্দ তো অন্ত্যজদের ভাই বলে ভাবতে বলে গেছেন। বহুদূর থেকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে ইতিহাসের শূদ্রযুগ আসন্ন। সোশিয়ালিজমকেও তিনি আবাহন করে ঘরে তুলতে চেয়েছিলেন। দেশ তখন প্রস্তুত ছিল না, নামটাই জানত না, তত্ত্বটাও অজানা। দেশ যদি সত্যি সত্যি সোশিয়ালিজমের পক্ষপাতী হয় তবে স্বামীজীকে বিপক্ষের লোক মনে করে আলকাতরা মাখাতে পারে না।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া যায় যে বুর্জোয়া সংস্কৃতি এদেশের শ্রমিক ও কৃষকদের বর্জনীয় আর সেই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক যাঁরা তাঁরা দণ্ডনীয় তা হলেও একবার তো বিচারকের ভূমিকা নিয়ে বিচার করতে হয়। তার আগেই সরাসরি জল্লাদের ভূমিকা নিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া কি সামাজিক ন্যায়ের নমুনা ? মারতে চাও মারো, কিন্তু তার আগে বিচার তো একবার করো, আসামী তরফের কথাটা তো একবার শোন, তাঁদের আত্মরক্ষার সুযোগ তো একবার দাও।

বিচারে যদি সাব্যস্ত হয় যে বিবেকানন্দ মে অপরাধ করেছেন তার যথাযোগ্য শাস্তি তাঁর মূর্তির মুখে আলকাতরা লেপন বা আশুতোষ যে অপরাধ করেছেন সে অপরাধের উপযুক্ত সাজা তাঁর মুণ্ডপাত তাহলে আমরা আর তর্ক না করে ভাবীকালের উচ্চতর আদালতে আপীল দায়ের করে ক্ষান্ত হব। ভাবীকালের বিচারের উপর আমাদের আস্থা আছে। একালের বিচারের উপরেই বা থাকবে না কেন? মানুষ যদি নিতান্তই অবুঝ না হয় তো এ কালেই তাকে বোঝানো সম্ভব যে নির্বিচার হিংসার নাম সামাজিক ন্যায় নয়। সামাজিক ন্যায় যারা চায় তাদেরও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। আগে সম্যক বিচার, তারপর সম্যক দণ্ড।

আমাদের তরুণদের মধ্যে এ পরিমাণ অন্ধতা ও হিংসা আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারিনি। এতে এদের নিজেদেরই মামলা দুর্বল হচ্ছে। ফলে মামলায় এদের হার হবে। ইতিহাস তো আজ এখানি শেষ হয়ে যাচ্ছে না। গোড়ার দিকে ফাউল করতে করতে যে জেতে আখেরে যে তারই জিৎ হয় তা নয়। তাই যদি হতো তবে হিটলারের ব্লিৎসক্রিগ ও তোজোর পার্ল হারবারই তাদের জয় পাকা করত।

আমরা বোমার বদলে বোমায় বিশ্বাস করিনে, কিন্তু তলোয়ারের বদলে কলমে বিশ্বাস করি। তলোয়ার যা পারবে না কলম তা পারবে। কলম হচ্ছে তলোয়ারের চেয়েও জোরদার। এই পরিস্থিতিতে লেখকদের কর্তব্য বিচারবিমুখদের বিচারে প্রবৃত্ত করা ও হিংসাব্রতীদের হিংসার থেকে নিবৃত্ত হতে বলা।*

* প্রথম অনুচ্ছেদ আরো অনেকের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়ে দৈনিকে ছাপাতে দেওয়া হয়েছিল।—লেখক

এক পুরুষ ফাঁক

কথাটা 'জেনারেশন গ্যাপ'। আমি তার তর্জমা করেছি 'এক পুরুষ ফাঁক'। এটা যাঁদের পছন্দ নয় তাঁরা ইচ্ছামতো তর্জমা করে নিতে পারেন।

কথাটা যাই হোক না কেন ব্যাপারটা হলো এই যে আমাদের সঙ্গে আমাদের তরুণদের স্বাভাবিক মতভেদ ইতিমধ্যে এত দূর গড়িয়েছে যে কেউ কারো ভাষা বোঝে না, বোধহয় বুঝতেই পারে না। এ যেন দুই বধিরের কথোপকথন।

মতভেদ স্বাভাবিক। আজকের দিনে মতবাদ ভিন্ন হলেও কেউ আশ্চর্য হয় না। হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যেমন দেখা যাচ্ছে বড়োদের সঙ্গে ছোটদের কথাবার্তাই বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। কথাবার্তার জন্যে উভয় পক্ষের বোধগম্য ভাষারই অভাব।

আমরা বড়োরা যদি ছোটদের ভাষা বুঝতে পারতুম তাহলে ওরা আমাদের বোমা দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইত না। যারা বোমা দিয়ে বোঝাতে চায় না তারাও এমন বিচিত্র ব্যবহার করে যে, হয় ওরা অবুঝ, নয় আমরা অবুঝ।

এই 'জেনারেশন গ্যাপ' শুধু যে এই দেশেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা নয়। দুনিয়ার বহু দেশেই এ দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ধনীর দেশেও যে এক পুরুষের ফাঁক নেই তা নয়। বরঞ্চ কথাটা ধনীর দেশ থেকেই এসেছে। যাঁদের চোখ আছে তাঁরা নিশ্চয়ই চাক্ষুষ করেছেন যে আমাদের দেশের ধনীর ঘরের দুলালরাই সবচেয়ে বেপরোয়া। না মানে তারা গুরুশিষ্য সম্পর্ক, না পিতাপুত্র সম্পর্ক, না জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ সম্পর্ক। বামপন্থার যেটা চরমতম রূপ তাতেও তারা অগ্রণী। আবার সমাজবিরোধী কর্মেও তারাই সবচেয়ে অগ্রসর। ডাকাতকেও তারা ডাকাতি শেখাতে পারে। এমন বিদ্বান! একদিন হয়তো ফাসিস্ট হতেও তাদের বাধবে না।

সমাজ থেকে সৎ অসৎ জ্ঞান যদি লোপ পায়, একজন অন্যায় করছে বলে আরেকজনও যদি জেনে শুনে অন্যায় করে, জোর যার তারই ইচ্ছা যদি জয়ী হয়, জোট যার তারই জেদ যদি সফল হয়, শঠ যারা তারাই যদি শিরোপা পায়, তবে সমাজের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তেমন সমাজ ক্যাপিটালিস্ট না হয়ে কমিউনিস্ট হলেও কি বেশী দিন খাড়া থাকতে পারবে? সমাজবিরোধী অপরাধের ভিতর দিয়ে কখনো সত্যিকার সামাজিক পরিবর্তন আসতে পারে না। একদল মরে, আরেকদল মারে, কিন্তু যারা মারে তারাও বেঁচে থাকে না। আরও একদল এসে তাদেরও মারে। এই অন্তহীন হানা-হানির পাপ হজম করতে বহু পুরুষ লেগে যায়। সাফল্য যে ধোপে টিকবেই এমন কী কথা আছে? সফল নেশনেরও বহু প্রতিদ্বন্দ্বী নেশন জোটে। বল পরীক্ষায় প্রতিবার জিৎ হবেই এমন কী নিশ্চয়তা আছে?

একালের ছেলেছোকরাদের মাথায় খুন চেপেছে। উদ্দেশ্য হয়তো মন্দ নয়, কিন্তু উপায় তো মন্দ। সকলেই যদি মন্দ উপায় অবলম্বন করে সকলেই বিড়ম্বিত হবে। যার জন্যে এত পাপ সেই লক্ষ্য আরও দূরে সরে যাবে। সামাজিক ন্যায় ব্যক্তিগত অন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

পুলিশ যদি আদৌ না থাকে কিংবা থেকেও না থাকে তাতে কি বিপ্লবীদের কাজ কিছু এগোয়? সেটা একটা ভ্রম। তেমনি মিলিটারি যদি না থাকে কিংবা থেকেও না থাকে তাতেও কি বিপ্লবীদের কিছু সুরাহা হয়? সেটাও আর একটা ভ্রম। পুলিশ না থাকলে বা নিষ্ক্রিয় হলে প্রাইভেট পুলিশ গড়ে উঠবে। মিলিটারি না থাকলে বা নিষ্ক্রিয় হলে প্রাইভেট আর্মি গড়ে উঠবে। তার আভাস কি আজকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না? অরাজকতা বিপ্লবের প্রসূত নয়। ফ্যাসিবাদেরই প্রস্তুতি।

এ-রাজ্যের অবস্থা এমন হয়েছে যে পুলিশ যে কোন দিন ফেল করতে পারে। মিলিটারি অবশ্য অত সহজে ফেল করবে না। কিন্তু আখেরে যা হবে তা ইন্দোনেশিয়ার অনুরূপ। আশ্চর্য হই একথা ভেবে যে আমাদের

তরুণরা কেবল হিমালয়ের উত্তর দিকেই তাকায়, বঙ্গোপসাগরের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে তাকায় না। ইন্দোনেশিয়ার তরুণদেরও দৃষ্টি ছিল পশ্চিম-উত্তর দিকে নিবদ্ধ। কই, কেউ তো এল না ওদের বিপদের দিন ত্রাণ করতে?

ভারত সরকার কতদূর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ কেউ তা জানে না। পরে কাদের হাতে ক্ষমতা পড়বে বলা যায় না। জার্মানীতে সংবিধানও ছিল, নির্বাচনও ছিল, হিটলারকে ভোটে জিতিয়ে দেবার পর দেখা গেল একে একে সব কিছু অচল। পার্লামেণ্ট থাকতেও পার্লামেণ্ট না থাকার সামিল, কারণ বারো বছর কাল তার কোন অধিবেশনই হয়নি। আমাদের তরুণদের এসব জানা উচিত। ক্ষমতা যে দক্ষিণ মার্গে যাবে না এমন অভয় কে তাদের দিয়েছে? আমাদের জনগণ কি জার্মানীর জনগণের চেয়ে আরো শিক্ষিত, না আরো সেকুলার? ধর্মের নামে ভোট চাইলে এখনো তাদের অনেকেই ভোট দেবে।

প্রতিষ্ঠিত সংবিধানকে অমান্য করে, দুর্বল করে, ভেঙেচুরে যা হবে তা এতই ভয়ঙ্কর যে প্রগতিশীলমাত্রেরই উচিত ও-পথে না চলা। একদল দুঃসাহসী একটা ভুল পথে চললেই যে ওটা ঠিক পথ হয়ে যাবে তা নয়। এই দিকভ্রান্তদের শেখানো হচ্ছে যে অতীতের সন্ত্রাসবাদী বাঙালীরাই নাকি ইংরাজকে হারিয়ে দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছিল। একটা অসত্য দিয়ে আরেকটা অসত্যকে সমর্থন করতে গেলে যা হবার তা হবেই। দুই পক্ষের কতকগুলি অমূল্য প্রাণ অকালে ও অকারণে বিনষ্ট হবে। পরে সন্ত্রাসবাদী অধ্যায়ের মতো এ-অধ্যায়েরও অবসান হবে।

শিক্ষার ভবিষ্যৎ

ভূমিকা

সেদিন জার্মানদের একটি পার্টিতে আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যায় তাঁর সঙ্গে। শান্তিনিকেতনের আদিপর্বের প্রাক্তন ছাত্র। বয়স এখন আশির উপরে। তাঁর সতীর্থদের মধ্যে যে কয়েকজন এখনো ইহলোকে তিনি তাঁদের একজন। কলকাতায় তিনি অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে এখনো সক্রিয়। বড়ো আনন্দ হল তাঁকে দেখে। নাম আগে থেকেই জানা ছিল। শ্রীপ্রণবেশ সিংহ।

দু'চার কথার পর আমি তাঁকে ধাঁ করে জিজ্ঞাসা করি, "আচ্ছা, এটা কি সত্যি যে আপনাদের সময়ে কোনো ছাত্রকেই বারো বছর বয়সের পূর্বে ইংরেজী শেখানো হতো না? কারণ সেটা গুরুদেবের শিক্ষাতত্ত্বের বিরোধী।"

এর উত্তরে তিনি সেদিন যা বলেন তার প্রত্যেকটি কথা আমার মনে নেই। তার মর্ম, তিনি ন'দশ বছর বয়সে শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ের শিশুবিভাগে ভর্তি হন। সালটা ১৯০৯ কি ১০। ইংরেজী শেখানো হতো বইকি। গুরুদেব স্বয়ং সপ্তাহে এক ঘণ্টার জন্যে ইংরেজীর ক্লাস নিতেন। তাঁর নিজেরই লেখা খান-দুই ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক ছিল।

যেখানে তত্ত্বের সঙ্গে তথ্যের বিরোধ সেখানে কেবলমাত্র তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে তর্ক করা চলে না। ইংরেজী শেখা যদি একান্ত আবশ্যক হয়ে থাকে তবে তার জন্যে বারো বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, এটা গুরুবাক্য হতে পারে, কিন্তু গুরুদেবের নিজের কর্মই তার ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রমের হেতু নিশ্চয়ই ছিল, সেটা সম্ভবত এই যে ছাত্রদের অভিভাবকরা তাদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার জন্যে ইংরেজীটা আরো কম বয়স থেকে ধরিয়ে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। আরো একটা কারণ তো সেদিন প্রণবেশবাবুর কথা থেকেই মালুম হয়। তাঁর বাবার ছিল বদলীর চাকরি। বিহারেও বদলী হতে হতো, ওড়িশাতেও। ছেলেদের নিয়ে সব জায়গায় ঘোরা যায় না। তাই শান্তি-নিকেতনে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। পরে কলকাতায় পাঠানো হয়। প্রণবেশ-বাবুকে কলকাতার কোনো একটি স্কুলে নতুন করে ভর্তি হতে হয়। তখন তাঁর বয়স এগারো কি বারো। আগে থেকে ইংরেজীর বিন্দুবিসর্গ জানা না থাকলে তাঁকে সব চেয়ে নিচের ক্লাস থেকে শুরু করতে হতো। নষ্ট হতো কয়েকটা বছর। গুরুদেবকে নিশ্চয়ই এটা বিবেচনা করতে হয়েছিল। শান্তিনিকেতন তো সারা দেশের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সেখানকার আশ্রম বিদ্যালয়ও নয় প্রাচীন ভারতের তপোবন গুরুকুল।

দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি বদলায়। আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বসূরীরা সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী শিক্ষার চেয়ে ইংরেজী শিক্ষার উপযোগিতায় বিশ্বাসী ছিলেন, কারণ ইংরেজীটাই ছিল যুগোপযোগী, সেই ভাষাতেই নিত্য নতুন বই নিত্য নতুন পত্রিকা ছাপা হয়ে বেরোত। বিষয়ও ছিল রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যামিতি প্রভৃতি তৎকালীন জগতের জ্ঞাতব্য বিষয়। টোল বা

মাদ্রাসায় এসব শেখবার উপায় থাকলে স্কুল বা কলেজের আবশ্যক হতো না। ইংরেজরা তো কলকাতার মাদ্রাসাতেই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু ছাত্র পাওয়া যায় না বলে সে ব্যবস্থা রহিত হয়।

অভিনব বিষয়ে পঠন-পাঠনের জন্যেই অভিনব শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন হয়। সে ব্যবস্থার ভালোমন্দ গোড়া থেকেই বিতর্কের প্রশ্ন ছিল। ইংরেজরা নয়, হিন্দুরা তার প্রথম উদ্যোগী। বিপক্ষে যেমন একদল হিন্দু ছিলেন, স্বপক্ষেও তেমনি আরেকদল হিন্দু। কে বুর্জোয়া আর কে বুর্জোয়া নয় এই ভেদাভেদ-তত্ত্ব তৎকালে অচিন্ত্য ছিল।

প্রণবেশবাবু আমাকে চমকে দিয়ে বলেন শিশুবিভাগে তখন শ্রেণী ভাগ করা ছিল না। এর থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী স্কুলের মতো শ্রেণী-বিন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। একজন হয়তো বাংলায় খুব ভালো, কিন্তু অঙ্কে গোল্লা পায়। অন্যান্য স্কুলে তার ক্লাস প্রমোশন বন্ধ। তাকে মরি কি পড়ি করে অঙ্কে পাস-মার্ক পেতেই হবে। তা সে ছলে বলে কৌশলে যেমন করেই পাক। আরেকজন হয়তো অঙ্কে ওস্তাদ, কিন্তু ইতিহাসে বেবাক ভুল লেখে। বাবর আকবরের ছেলে, পাণিপথের যুদ্ধে ইংরেজদের জয়। প্রাণপণে তাকে মুখস্থ করতে হবে ইতিহাসের সন তারিখ। অঙ্কের বেলা তার উত্তর নির্ভুল, কিন্তু ইতিহাসের সন তারিখের বেলা হাস্যকর। এক্ষেত্রে কী করণীয়? তাকে এই কারণে একবছর আটক করে রাখা? না অন্য কারণে প্রমোশন দেওয়া? রবীন্দ্রনাথ আটকানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছিলেন। শেষে শিক্ষকদেরই জয় হয়। কারণ ছেলেদের উপরে উঠিয়ে দিলে কী হবে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় নির্ঘাত ফেল। আর ম্যাট্রিকুলেশন ফেল মানে পড়াশুনায় ইতি। কলেজে কেউ তাকে নেবে না, তখনকার দিনের মেডিকাল স্কুলেও না, ইন্‌জিনীয়ারিং স্কুলেও না। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদেরও কলকাতার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে হতো।

সেকালের রীতি ছিল প্রত্যেকটি হাই স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশনের পূর্ববর্তী চার বছর ইংরেজীভাষার মাধ্যমে অধিকাংশ বিষয় পড়ানো ও লেখানো। শান্তিনিকেতন সেটাকে চার বছরের জায়গায় দু' বছর করে। ইংরেজী মাধ্যম শান্তিনিকেতনে কোনো কালেই ছিল না, কোনো ক্লাসেই ছিল না, এটা একটা কিংবদন্তী। শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্‌ট্রান্স বা ম্যাট্রিকুলেশন যাঁরাই দিয়েছিলেন তারাই বছর-দুই ইংরেজী মাধ্যমে পড়েছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব যা-ই হোক না কেন, সমসাময়িক দেশাচার তাঁকে মানতেই হয়েছিল।

আমাদের জীবনে আমরা বহু পরিবর্তন দেখলুম। আরো দেখতে প্রস্তুত। কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে নেই, যেমন বেদ বাইবেল কোরানে নেই। কার্ল মার্কসের সুসমাচারে থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু তার পরীক্ষাটা কি পশ্চিমবঙ্গের স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উপর দিয়ে না চালালেই নয়? এইসব গিনিপিগের ভবিষ্যৎটা কী? পশ্চিমবঙ্গের বাইরে

কোথায় এরা খাপ খাবে? পশ্চিমবঙ্গেই বা এদের দৌড় কতদূর? এদের গুরুজনরা যদি শঙ্কিত হয়ে থাকেন তবে তাঁদের শঙ্কা কি অমূলক? বুর্জোয়া বলে জাত তুলে গালাগালি দিলেই কি তাঁরা আশ্বস্ত হবেন।

শিক্ষার ভবিষ্যৎ হচ্ছে পুত্রকন্যার ভবিষ্যৎ। যাঁদেরই পুত্রকন্যা আছে তাঁরাই শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথা বলার অধিকারী। কেবলমাত্র রাজনীতিকরা বা তাঁদের দলভুক্ত শিক্ষক-অধ্যাপকরা নন। ইংরেজীতে একটা বচন আছে, "War is too serious a business to be left to the Generals" যুদ্ধ নামক ব্যাপারটা এত গুরুতর যে সেনাপতিদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আমাদের মতে শিক্ষা নামক বিষয়টাও তেমনি গুরুতর। একে শিক্ষাবিশেষজ্ঞদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারা যায় না। এই বিতর্কে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরাও যোগদানের অধিকারী। সেই সুবাদে আমারও যোগদানের অধিকার আছে। আমার বক্তব্য আমি পেশ করছি। জনমতের দরবারে। বিচার জনসাধারণেরই হাতে।

এই প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্রিকা ও বিভিন্ন সভাসমিতির জন্যে বিভিন্ন সময়ে রচিত। পুনরুক্তি পরিহার করা সম্ভব হয়নি। পারিবারিক প্রসঙ্গও বার বার এসেছে। পরে বাদসাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি। এর জন্যে আমি দুঃখিত।

অন্নদাশঙ্কর রায়

বিষয়সূচী

ভারতের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ

বিষয়টি এত বৃহৎ যে কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে এর প্রতি সুবিচার করা অসম্ভব। তবু প্রশ্নটা যখন আলোচনার বস্তু হয়েছে তখন আমিও সাধ্যমতো বিচার করতে পারি।

ভারতবর্ষ কোনো দিনই একজাতির দেশ ছিল না, যথা আর্য জাতির বা দ্রাবিড় জাতির। কোনো কালেই একভাষী ছিল না, যথা সংস্কৃতভাষী বা তামিলভাষী। কোনো কালেই এক ধর্মে বিশ্বাসী ছিল না, যথা বৈদিক ধর্মে বা বৌদ্ধ ধর্মে। কোনো কালেই এক সমাজভুক্ত ছিল না, যথা হিন্দুসমাজভুক্ত বা মুসলিম-সমাজভুক্ত। কোনো কালেই এক শাসনাধীন ছিল না, যথা মৌর্য শাসনাধীন বা মোগল শাসনাধীন।

ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের পূর্বে একদেশ, একজাতি, একভাষা ইত্যাদি তত্ত্ব কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি। এসব ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের ছত্রছায়ায় বসে ধ্যানধারণার গোচর হয়েছে। ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যকে একদিন ভারতীয় নেশনে রূপান্তরিত করতে হবে, যে নেশন একটাই নেশন, ঐককেন্দ্রিক নেশন। আর যার প্রতিষ্ঠা বাহুবলের উপরে নয়, গণতান্ত্রিক ভোটবলের উপরে। এই হলো কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য। যে কংগ্রেস গান্ধীপূর্ব। গান্ধীজী এসে তাকে যেমন জনগণ-অভিমুখী করেন তেমনি পশ্চিমবিমুখী। পশ্চিম ছাড়া আর কোথায় ন্যাশনালিজম তথা ডেমোক্রাসীর বিবর্তন ঘটেছে? এদেশে এসব ইংরেজদের বা তাদের শিক্ষায় শিক্ষিতদের প্রবর্তন। তাদের ছাঁটাই করলে আর তাদের দোহাই দেওয়া চলে না। বিবর্তনের কোনো ঐতিহাসিক পটভূমিকা নেই, প্রবর্তনেও প্রবল আপত্তি। তা হলে বাকী থাকে বিপ্লব। কিন্তু সে পথেও কংগ্রেস চলতে অনিচ্ছুক।

ওদিকে মুসলমানদের একভাগ ইণ্ডিয়ান হিস্‌ট্রিতে নয়, ইস্‌লামিক হিস্‌ট্রিতে লালিত। তাদের কাম্য ভারতীয় ঐক্য নয়, ইসলামী ঐক্য। সে ঐক্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদের চেয়ে প্যানইসলামিক জাতীয়তাবাদকেই শ্রেয় বলে জানে। দেশভিত্তিক এক আইডেনটিটির সঙ্গে ধর্মভিত্তিক অপর আইডেনটিটির অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব স্বাধীনতার তথা দেশভাগের পরেও অব্যাহত। পাকিস্তান এর চূড়ান্ত সমাধানের জন্যে পরমাণু অস্ত্র নির্মাণরত। স্বাধীন ভারতও যে কেবল শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্যে পারমাণবিক শক্তির সাধনারত সে বিষয়ে বিদেশীরা নিঃসন্দেহ নয়। এর পরিণতি কবে ও কী ভাবে ঘটবে তা কেউ বলতে পারে না। সুতরাং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা বৃথা। ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ ভারতের দিকে দিকে মাথা তুলছে শুধু উত্তর-পূর্ব দিকে নয়, উত্তরপশ্চিম দিকেও। হিন্দী তামিল বিরোধ এখনও মেটেনি। ইংরেজকে তাড়ানোর ফলে দেশ বিভক্ত প্রদেশ বিভক্ত হয়েছে। এবার ইংরেজীকে তাড়ানোর পালা। ইংরেজীর শূন্যে স্থান পূরণের জন্যে হিন্দীই হাজির হবে, তখন হিন্দীকে তাড়ানোর জন্যে কেন্দ্র বনাম রাজ্যের কলহ শুরু হবে। কেন্দ্র

প্রবলতর হয়ে রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব করবে, না রাজ্য প্রবলতর হয়ে কেন্দ্রের ক্ষমতা খর্ব করবে, এটাই ভাবীকালের প্রধান প্রশ্ন।

আমরা যে যুগে বাস করছি সে যুগের মুখ্য স্রোত ভারতে প্রবাহিত নয়, ইউরোপ আমেরিকায় প্রবাহিত। সেই মুখ্য স্রোতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে হলে ইংরেজীকে রাখতে হয়। তা বলে প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নয়। উচ্চশিক্ষিত বলে যাঁরা পরিচিত হবেন তাঁদের পক্ষে ইংরেজী জ্ঞান একান্ত আবশ্যিক বলে বিবেচিত হবে। তা বলে তাঁরা দেশের মাটির থেকে বিযুক্ত হবেন না। জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন না। মুখ্য স্রোতের সঙ্গে স্বদেশের ধারাবাহিকতাকে মিলিয়ে নেবেন। রামমোহনের যুগে এই সমস্যা ছিল। রবীন্দ্রনাথের যুগেও এই সমস্যা ছিল। উত্তরসূরীদের যুগেও এই সমস্যা থাকবে। যদি না ভারত দিয়েই বয়ে যায় মুখ্য স্রোত। ভারত হয় জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে দর্শনে শীর্ষস্থানীয়। আপাতত এটা একটা মধুর স্বপ্ন।

যে দেশে রেনেসাঁস এখনো হয়নি কিংবা হয়ে থাকলে কখন একসময় থেমে গেছে, যে দেশে রেফরমেশন এখনো হয়নি বা হয়ে থাকলে কাউন্টাররেফরমেশনের তলায় চাপা পড়ে গেছে, এনলাইটেনমেণ্ট এখনো হয়নি কিংবা হয়ে থাকলে অন্ধকারে মিট মিট করে জ্বলছে সে দেশে এখনো সেই সব পর্ব বাকী আছে। সেসব পর্ব বাকী রেখে সে দেশ কখনো সারা বিশ্বের অগ্রণী হতে পারবে না। তবে কারো কারো ধারণা যে একবার কোনো গতিকে একটা বিপ্লব ঘটাতে পারলেই আর সব আপনাআপনি হবে। আপনাআপনি যে হয় না তার প্রমাণ বিপ্লবোত্তর রুশদেশ ও চীনদেশ। কোথায় সেই সংস্কৃতির রূপান্তর যার পূর্ব শর্ত এই দুই দেশের বিপ্লব? টলস্টয়, টুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্কি, চেকভের উত্তরসূরী কারা? কোথায় তাঁদের অভিনব সাহিত্য যা উচ্চতায় সমান বা আরো উচ্চকোটির? চীন তার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর বিরাট এক ডিগবাজি খেয়ে জাপানের দিকেই মুখ ফিরিয়েছে, রুশের দিকে নয়। সাফল্যের পর ভারতীয় বিপ্লববাদীরাও যে তাই করবেন না এমন নিশ্চয়তা কোথায়? সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে শোষণের অবসান হতে পারে, কিন্তু শোষণের অবসান হলেই রেনেসাঁস বা রেফরমেশন ও এনলাইটেনমেণ্ট নামক তিনটি পর্ব স্বতঃসিদ্ধরূপে পূর্বনির্ধারিত হবে এটা মায়া।

আমরা যদি এই তিনটি পর্বকে নিতান্ত একটা পাশ্চাত্ত্য ব্যাপার বলে খারিজ করে না দিই তবে ইতিমধ্যে এর ভিতর দিয়ে গিয়ে না থাকলে অতঃপর এর ভিতর দিয়ে যেতে হবে। নয়তো বিপ্লব হতে পারে, বিকাশ হবে না। শ্রীবৃদ্ধি হতে পারে, সংস্কৃতিবৃদ্ধি হবে না। সংস্কৃতি শব্দটি আসলে ইংরেজী কালচার শব্দটির পারিভাষিক শব্দ। কালচার নির্ভর করে কর্ষণের উপর। তার মূলে কালটিভেশন। যারা কর্ষণ করবে না তারা কর্ষণের ফল ভোগ করতে পারে, কিন্তু কৃষিপণ্ডিত নয়। তেমনি যারা বুদ্ধিবিদ্যার কর্ষণ করবে না তারাও কালচার্ড নয়, সংস্কৃতিবান নয়। সবাইকে কালচার্ড বা সংস্কৃতিবান করতে হলে সবাইকে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ানোই যথেষ্ট নয়।

সবাইকে উচ্চতম শিক্ষাও দিতে হবে। কিন্তু সবাই যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়, ক্ষেতখামারে কাজকর্ম করবে কারা ও কবে? কারুশিল্পের ভার কাদের উপর বর্তাবে? না যন্ত্রের দ্বারাই সব কাজ দিনে আট ঘণ্টার মধ্যেই সারা হবে? কিংবা কম্পিউটারের সাহায্যে দিনে আধ ঘণ্টার মধ্যে?

আধুনিক সভ্যতা বিপুল পরিমাণে যন্ত্রনির্ভর। আর সেই যন্ত্রও বিপুল পরিমাণে তৈলনির্ভর। এক্ষেত্রে রুশে মার্কিনে ভেদ নেই। তৈলসম্পদ অফুরন্ত নয়। সেইজন্যে পারমাণবিক শক্তির উপর এখন থেকেই নির্ভরতা। কিন্তু এই নতুন শক্তি যেমন বিপুল পরিমাণে সৃষ্টিক্ষম তেমনি বিপুল পরিমাণে প্রলয়ক্ষম। সৃষ্টি ও প্রলয়ের মাঝখানে পড়ে স্থিতি বেচারী বিপন্ন। আধুনিক মানুষ অস্থির মানুষ। অস্থির মানুষ ইচ্ছা করলে ময়দানবের মতো মাটির তলায় মহানগরী গড়তে পারে, মহাশূন্যেও স্টেশন বানাতে পারে, এ-বেলা ও-বেলা আকাশ পাড়ি দিতে পারে, তার জন্যে খেয়া তৈরি চলেছে। কিন্তু ইচ্ছা করলে আর একটা ক্যাথিড্রাল বা সূর্যমন্দির বা তাজমহল গড়ে তুলতে পারে না। সে ধৈর্যই তার নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আর একটা অজন্তা বা এল্লোরাও কি ভারতের আধুনিক মানুষ সৃষ্টি করতে পারবে? পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দিয়ে তা হয় না। চাই পঞ্চশতবার্ষিকী পরিকল্পনা। কার অত দূর দৃষ্টি যায়? আমরা সবাই ব্যস্ত মানুষ। আমাদের লক্ষ্য কোনো মতে এই জীবনটা কাটানো। ঋষি যদি কেউ থাকেন তবে তাঁকে ধ্যানে বসতে হবে। তপস্বী যদি কেউ থাকেন তাঁকে তপস্যায়। দলবদ্ধ হয়ে এসব কৃত্য হয় না। সংস্কৃতির ক্ষেত্র রাজনীতির ক্ষেত্র নয়। এখানে জনতার চেয়ে বিজনতার মূল্য বেশী।

বাঙালীর ভবিষ্যৎ

অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত। তাই ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে বসে অতীতের কথা আবার স্মরণ করতে হচ্ছে। শুধু বাঙালী নয় ভারতবাসী সবাই ছিল ব্রিটিশ রাজের অধীন প্রজা। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চলে। মহাত্মা গান্ধী তো তার জন্যে শতবর্ষ জীবিত থাকতে প্রস্তুত ছিলেন, যাতে আরো একবার বা একাধিকবার সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারেন। কিন্তু হিটলারের পতনের পর দেখা গেল রুশ সৈন্য পূর্ব জার্মানী তথা পূর্ব বার্লিন দখল করে বসে আছে। সুতরাং পশ্চিম জার্মানী তথা পশ্চিম বার্লিন দখল করার জন্যে ইঙ্গ মার্কিন ফরাসী সৈন্য চাই। যতদিন না রুশ সৈন্য স্বস্থানে ফিরে যায় ততদিনে ইঙ্গ মার্কিন ফরাসী সৈন্যও স্বস্থানে ফিরবে না। কে জানে সেটা হয়তো তাদের অগস্ত্য যাত্রা। তা যদি হয় তবে ভারত দখল করে ইংরেজ সৈন্য দূরে পড়ে থাকবে কদ্দিন? হঠাৎ যুদ্ধ বেধে গেলে রুশ সৈন্যের সঙ্গে মোকাবিলা করবে কে? তখন যে তাদের মাতৃভুমি বিপন্ন হবে। অনুরূপ

অবস্থায় রোমান সৈন্য ব্রিটেন থেকে অপসরণ করেছিল। তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। ব্রিটিশ সৈন্য অপসরণ করবে ভারত থেকে।

মহাত্মা গান্ধী তো ১৯৪২ সালেই এর নোটিস দিয়ে রেখেছিলেন। সে সময় ইংরেজ কর্তাদের হোঁশ হয়নি। কিন্তু স্টালিনগ্রাডের পর রুশ সৈন্যের অব্যাহত অগ্রগতি দেখে আমাদের কারো মনে সন্দেহ থাকে না যে জার্মানী ভাগাভাগি হবে। আমরা মানচিত্র সামনে নিয়ে বসে পার্টিশনের লাইন টানতে শুরু করি। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি এড়াতেই হয় তবে কোনো এক জায়গায় লাইন টানতেই হবে। হায়, তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছি যে মানচিত্র সামনে রেখে ভারতভাগ্যবিধাতাও কোন্ জায়গায় লাইন টানবেন তা ভাবছেন। আমরা বুঝতে পারি যে ইংরেজদের মধ্যে যাঁরা দূরদর্শী তাঁদের চেষ্টা হবে ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে নিজেদের শিবিরে সন্ধিসূত্রে আকর্ষণ করা। তা হলে ভারতীয় সৈন্যরা আবার ইউরোপে গিয়ে ইঙ্গ মার্কিন ফরাসীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে লড়বে। এবার সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে। যাতে স্টালিনের পতন ঘটে। ক্রিপস প্রস্তাব তখনকার মতো প্রত্যাহৃত হলেও বরাবরের মতো পরিত্যক্ত হয়নি। সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় সদস্যদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্গঠিত হলে ও তার হাতে অন্যান্য দফতরের সঙ্গে দেশরক্ষা দফতর ছেড়ে দিলে কংগ্রেস হয়তো তাতে যোগ দিতে রাজী হবে। তবে মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলির বিচ্ছিন্নতার অধিকার মেনে নেওয়া চাই। যদি তারা সে রকম দাবী করে। তার মানে বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মিলে ইচ্ছা করলে স্বতন্ত্র এক ফেডারেশন গঠন করতে প্যারবে। ক্রিপস প্রস্তাব নানা কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রধান কারণ মহাত্মা চান না যে ভারত ইংরেজদের শিবিরভুক্ত হয়ে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। পরে আবার রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। অমন স্বাধীনতার কী মূল্য যে স্বাধীনতা পরের শিবিরে যোগ দেবার শর্তাধীন? তিনি চান বিনা শর্তে স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পরে কয়েকটি প্রদেশ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায় তবে দুই পক্ষ সরাসরি কথাবার্তা বলে নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া বন্দোবস্ত হিসাবে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হবে। ইংরেজদের দিয়ে নতুন কোনো কমিউনাল এ্যাওয়ার্ড করিয়ে নেওয়া চলবে না। অর্থাৎ বন্দোবস্ত যেটা হবে সেটা ত্রৈপাক্ষিক নয় দ্বিপাক্ষিক।

ওদিকে কায়দে আজম ঝীণা সাহেবের পলিসি কিন্তু তার বিপরীত। তিনি যা চান তা হচ্ছে হিন্দু মুসলমান এই দুই 'নেশনে'র মধ্যে বিভক্ত হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান। দুই দিকের পাল্লা সমান ভারী হবে। একদিকে বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার আর ওড়িশা। অন্য দিকে বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর বেলুচিস্থান। এদিকেও ছয়, ওদিকেও ছয়। সমান সমান। কেউ যদি বলে, আসাম কবে থেকে মুসলিমপ্রধান প্রদেশ হলো, তিনি বলবেন, হতেই হবে। নইলে সমতা থাকবে না। ইংরেজীতে যাকে বলে ব্যালান্স অভ পাওয়ার।

কেউ যদি বলে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তো কংগ্রেসশাসিত প্রদেশ, সেখানকার মুসলমানরা লীগপন্থী নয়, তিনি বলবেন, মুসলমানমাত্রেরই এক আল্লা, এক রসুল, এক লীগ ও এক কায়দে আজম। হিন্দুদের কংগ্রেস মুসলমানদের সংহতি বিনষ্ট করছে। ইসলাম বিপন্ন।

তবে ঝীণা সাহেব কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন করতেও রাজী ছিলেন, কংগ্রেস যদি তাতে রাজী হতো তিনি পাকিস্তান দাবী মুলতুবি রাখতেন। কিন্তু তাঁর শর্ত হলো প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলগুলিতে লীগপন্থী ব্যতীত অপর কোনো মুসলমান থাকবে না, হিন্দু মেজরিটির সিদ্ধান্তকে মুসলিম মাইনরিটি যখন ইচ্ছা তখন ভীটো প্রয়োগ করতে পারবে আর সেটা যে কেবল ধর্মীয় বিষয়ের বেলা তা নয়, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বা শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ের বেলাও। এর পর কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্গঠিত হলে সেক্ষেত্রেও একই শর্তে কোয়ালিশন হবে। উপরন্তু আর একটা শর্তও থাকবে। কংগ্রেস ও লীগের ভোটসংখ্যা হবে সমান সমান। আবার সেই ব্যালান্স অভ পাওয়ার। দুই পক্ষের দুই মত হলে ইংরেজ বড়লাট যা বলবেন তাই হবে। তাঁর হাতেও ভীটো থাকবে।

এ ধরণের শর্ত চাপাতে চায় কারা? যারা যুদ্ধে জয়ী হয়ে বিজিত পক্ষকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে তারা। মুসলিম লীগ কি কংগ্রেসকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছে? হ্যাঁ, ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসী মুসলিম প্রার্থীদের অধিকাংশকেই নির্বাচন কেন্দ্রে হারিয়ে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় আইন-সভায় কংগ্রেসী মুসলিম সদস্যদের সংখ্যা একটি কি দুটি। প্রাদেশিক আইন-সভায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কিছু বেশী, অন্যত্র একটি কি দুটি কিংবা শূন্য। নির্বাচনের মূল ইস্যু ছিল পাকিস্তান। সুতরাং পাকিস্তানের ম্যাণ্ডেট পেয়েছে মুসলিম লীগ। আজ হোক কাল হোক একদিন না একদিন ইংরেজ বিদায় নেবেই। বিদায়কালে তার মুসলিম মিত্রদের পাকিস্তান দিয়ে যাবে। তারা তো ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েনি। লড়েছে কংগ্রেস। শত্রু হয়ে কংগ্রেস যদি হিন্দুস্থান পায় তো মিত্র হয়ে মুসলিম লীগ পাকিস্তান পাবেই। কায়দে আজম এ বিষয়ে নিশ্চিত। তাই এক এক করে সব রকম আপস প্রস্তাব তিনি নাকচ করে দেন। এমন কি ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবও। যাতে আসামকে বন্ধনীভুক্ত করা হয়েছিল বাংলার সঙ্গে। ইনটারিম গভর্ণমেণ্টেও তাঁর দল যাবে না, যেহেতু তাতে একজন কংগ্রেসী মুসলিম থাকবে। সংবিধান সভাও তাঁর দল বয়কট করবে। যেহেতু জবাহরলাল নাকি বলেছেন যে কংগ্রেস কোনো রকম শর্তে আবদ্ধ থাকবে না। তা ছাড়া এটাও ততদিনে স্পষ্ট হয়েছিল যে সারা ভারতের উপর ইংরেজ রাজের উত্তরাধিকারী যদি কংগ্রেস রাজ হয় তবে সারা ভারতে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়বে, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাংলা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মান্য করবে না, অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্যে মুসলিম রেজিমেণ্ট পাঠানো চলবে না, হিন্দু-শিখ রেজিমেণ্ট পাঠালে ও তাদের গুলীতে মুসলমান মারা গেলে মিউটিনি বেধে যাবে। জবাবদিহির

দায় এড়াবার জন্যে ইংরেজরা কোনো পক্ষের সঙ্গে বন্দোবস্ত না করে ভগবানের হাতে বা অরাজকতার হাতে ভারতকে সঁপে দিয়ে কুইট করবে। গান্ধীজী যেমনটি চেয়েছিলেন।

সঙ্কটকালে দেখা গেল কংগ্রেস অরাজকতার দায়িত্ব নিতে নারাজ। সর্বনাশ সমুৎপন্ন দেখে পণ্ডিত ও সর্দার অর্ধেক নয়, এক-চতুর্থাংশ ত্যাগ করতে সম্মত হন। তখন যেটা হয় সেটা ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট। কায়দে আজম যেমনটি চেয়েছিলেন। তবে বাদসাদ দিয়ে। তাঁর পরিকল্পিত পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম বাংলা তথা আসামের অধিকাংশ ত্যাগ করতে হয়। নইলে তাঁকেও অরাজকতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হতো। কিংবা লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানের জিগীর তুলে সত্যি সত্যি লড়তে হতো হিন্দু-শিখ সৈন্যের সঙ্গে। বিনা যুদ্ধে শিখরা কি সারা পাঞ্জাব ছেড়ে দিত? এদিকে বাঙালী হিন্দুদের সৈন্য না থাকলেও স্টেনগান ছিল, বোমা ছিল, রিভলভার ছিল। কলকাতা তারা কিছুতেই ছেড়ে দিত না। মাইল্ড হিন্দু তখন ওয়াইল্ড হিন্দু। এর জন্য দায়ী লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন।

মহাত্মা চেষ্টা করেছিলেন বাংলাকে অবিভক্ত রাখতে। তাঁরই পরামর্শে বা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই সুহরাবর্দী সাহেব ও শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় যুক্তবঙ্গের আবেদন নিয়ে দিল্লী যান। মাউনব্যাটেন তাঁর পরিকল্পনায় একটি ধারা জুড়ে দেন। বাংলার আইনসভার হিন্দু মুসলমান সদস্যরা যদি একমত হয়ে বাংলাকে অবিভক্ত রাখতে চান তো বাংলা বিভক্ত হবে না, স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র হবে। জবাহরলাল তা দেখে বলেন, "অমন করলে ভারত বলকান হয়ে উঠবে। কংগ্রেসকে আমি কিছুতেই রাজী করাতে পারব না।" মাউনব্যাটেন তাঁর প্রস্তাবিত ধারা বর্জন করেন। বাংলার আইনসভার সদস্যরা একমত হয়ে বাংলাকে দু'ভাগ করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। একভাগ পড়বে পাকিস্তানে, একভাগ ভারতে। মাস তিনেকের মধ্যে দেশ ভাগ প্রদেশ ভাগ সমাপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান ভাগ। যে যার নিজের সংবিধান তৈরি করার স্বাধীনতা পায়। এই স্বাধীনতা প্রয়োগ করে কংগ্রেস নেতারা ভারতকে করেন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। যৌথ নির্বাচন প্রবর্তন করেন। ওয়েটেজ তুলে দেন। সরকারী চাকরি থেকেও সাম্প্রদায়িক কোটা আর ওয়েটেজ উঠে যায়। তার আগে দেশীয় রাজ্যগুলির অধিকাংশ হয় ভারতভুক্ত। ফলে স্বাধীন ভারতের আয়তন ও জনসংখ্যা হয় পাকিস্তানের পাঁচগুণ। পাকিস্তানীরা যা পায় তা এক-চতুর্থাংশও নয়, এক-পঞ্চমাংশ। অবিভক্ত ভারতে মোট মুসলমান সংখ্যা ছিল শতকরা বাইশ। সরকারী চাকরিতে তাদের ভাগ ছিল শতকরা পঁচিশ। আর আইনসভার আসন তার চেয়েও বেশী। এ তো গেল কেন্দ্রীয় স্তরে। প্রাদেশিক স্তরে তারা সর্বত্র লাভবান হয়েছিল। সমস্ত বিসর্জন দিল স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্যে। তাও তো পরে ভেঙে দু'খানা হলো।

ইংরেজরা সময়ের পূর্বেই প্রস্থান করে। তার আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় মহাপ্রস্থান পর্ব। তিন সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে হিন্দু

মুসলমান শিখ মিলিয়ে পাঁচলক্ষ নরনারী ইহলোক থেকে পরলোকে লোকান্তরিত। এককোটি হিন্দু মুসলমান ও শিখ ঘরবাড়ী জায়গা জমি হারিয়ে দেশান্তরিত। সিন্ধুতে বা পশ্চিম পাঞ্জাবে হিন্দু বলতে বিশেষ কেউ থাকে না। পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমান বলতে বিশেষ কেউ থাকে না। দিল্লীতেও এই জিনিসটি ঘটতে যাচ্ছিল, অতখানি স্বতস্ফূর্তভাবে নয়, বেশ সুপরিকল্পিত ভাবে। গান্ধীজী জীবন পণ করে বাধা দেন। সুপরিকল্পিত ভাবেই নিহত হন। বলপূর্বক লোকবিনিময় বন্ধ হয়। সেই পরিমাণ ধর্মান্ধতা আমাদের এদিকে ছিল না। থাকলে চার সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ববঙ্গ হিন্দুশূন্য ও পশ্চিমবঙ্গ তথা বিহার মুসলিমশূন্য হয়ে যেত। আসামে হিন্দু মুসলমান দু'পক্ষ সমান বলবান। সুতরাং উভয় পক্ষে বহু লোক নিহত হতো। কলকাতার হিন্দুদের নিবৃত্ত করেন গান্ধীজী। তাঁর দৃষ্টান্ত দেখে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের নিবৃত্ত করেন ওপারের বন্ধুরা। পরবর্তী কালে জুনাগড় কাশ্মীর হায়দরাবাদ প্রভৃতির পাল্টা দিতে না পেরে পাকিস্তান হিন্দুবিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে। তার প্রতিক্রিয়ায় এপারেও মুসলিমবিদ্বেষ নতুন করে জাগে। দুই পক্ষে নিহতের সংখ্যা পাঞ্জাবের মতো না হলেও এপারে চলে আসে মোটামুটি ষাট লক্ষ, ওপারেও চলে যায় মোটামুটি ষাট লক্ষ। বেশীর ভাগ উর্দুভাষী। এটাও একপ্রকার লোকবিনিময়, তবে তিন চার সপ্তাহের মধ্যে নয়। পনেরো বিশ বছরের মধ্যে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়। পেছনে ছিল ধর্মান্ধদের বা স্বার্থান্বেষীদের প্রেরণা বা চাপ। এদের বক্তব্য হলো, পশ্চিমের মতো পুরোপুরি লোকবিনিময় হলো না কেন? হলে নাকি সমস্যাটা চিরকালের মতো মিটে যেত। সেটা হয়নি বলেই রক্ষা, নইলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ষাট লক্ষ মুসলমানকে উচ্ছেদ করলেও তাদের জায়গায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ হিন্দুকে বসানো যেত না। তাদের বসাতে হতো বিহারে, মধ্যপ্রদেশে, ওড়িশায়। সেখানে তারা বাংলা ভুলে গিয়ে স্বকীয়তা হারাত বা স্বকীয়তা রাখতে গিয়ে বাঙালীবিরোধী মনোভাব উদ্রেক করত। যেমন করেছে আসামে, মণিপুরে, মেঘালয়ে, ত্রিপুরায়। পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধু থেকে যারা এসেছে তারা চটপট হিন্দী শিখে নিয়েছে ও বেমালুম মিশে গেছে। যেখানে তা পারেনি সেখানে ভাষা নিয়ে বিরোধ বেধেছে। সে বিরোধ মেটাতে গিয়ে পূর্ব পাঞ্জাবের এক টুকরো জুড়ে দেওয়া হয়েছে হিমাচল প্রদেশে, এক টুকরো কেটে নিয়ে হরিয়ানা হয়েছে। বাকীটুকুকেই বলা হচ্ছে পাঞ্জাবীভাষী। এক পাঞ্জাবী শিখ মিলিটারী অফিসার আমার কাছে আফসোস করেন যে, সিমলা আর তাঁদের নয়। আফসোস তো হবেই। ধর্মান্ধতার জন্যে লাহোর গেল। ভাষান্ধতার জন্যে সিমলা গেল।

আরেক পাঞ্জাবী শিখ অফিসার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। প্রশ্ন করলে বলেন, "যা হয়েছে ঠিকই হয়েছে। বরাবরের জন্যে হয়ে চুকেছে। আমরা শিখরা আর সর্বত্র মাইনরিটি নই। একটা রাজ্যে আমরাই মেজরিটি। এতে মনের জোর বাড়ে। সারা ভারতে আমরা শিখরা এখন সর্বঘটে। যেমন আর্মিতে তেমনি সিবিল সার্ভিসগুলিতে তেমনি ব্যবসায় বাণিজ্যে আমরা

এখন সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্বত্র। কেন আফসোস করব ?" আমি তাঁর সেণ্টিমেণ্টে তা দিই। জন্মভূমির জন্যে মন কেমন করে না ? নানকানা সাহেবে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না ? তাঁর চোখ ছলছল করে ওঠে। বলেন, "আমাদের দৈনিক প্রার্থনার পদগুলির সঙ্গে আমরা মনে মনে আর একটি পদ জুড়ে দিই। একদিন যেন নানকানা সাহেবে ফিরে যেতে পারি।" অবিকল ইহুদীদের প্রার্থনা। দু'হাজার বছর ধরে ওরা প্রার্থনা করে এসেছে যেন জেরুজালেমে ফিরে যেতে পারে। ইতিহাস সে প্রার্থনা অবশেষে পূরণ করেছে।

তেমন কোনো প্রার্থনা কি পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসা হিন্দুদের অন্তরে রয়েছে ? তাঁরাই জানেন। আমি এইটুকু জানি যে পূর্ব পাকিস্তান যেদিন মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপ দেয় এঁরাও সেদিন ধর্মীয় বিরোধ ভুলে যান ও যোদ্ধাদের আশ্রয় দেন, অর্থ দেন, অস্ত্র দেন। তাঁরা যেদিন মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে যান এঁরাও সঙ্গে সঙ্গে যান ঘরবাড়ী জায়গা জমি ফিরে পাবার প্রত্যাশায়। কিন্তু গিয়ে দেখেন সব বেদখল হয়েছে। এক দেশের নাগরিক হয়ে অন্য দেশের নাগরিকের সঙ্গে মোকদ্দমা করে সম্পত্তি উদ্ধার করা কি সম্ভব ? নয়া সরকার অসহায়। তখন স্বাধীন বাংলাদেশের উপরেই এঁদের অশ্রদ্ধা জন্মে যায়। লোকগুলো কী অকৃতজ্ঞ ! নেতারাও কী বেইমান ! বাস্তবিক, বাংলাদেশের পশ্চাদ্ অপসরণ সেই সময় থেকেই শুরু। হিন্দুর প্রত্যাবর্তন রোধ করে তার সম্পত্তি ভোগ করার এই তো মোক্ষম উপায়। শুরু হয় বাংলাদেশের ইসলামের দিকে মোড় ফেরা। এবার সে পূর্ব পাকিস্তান নয়, সে এখন 'পাক বাংলা' বা 'মুসলিম বাংলা'। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সাহেব আমাদের যা বলেছিলেন। তিনি গোড়া থেকেই ছিলেন যুক্ত-বঙ্গের পক্ষপাতী। বারো কোটি বাঙালী এক হলে কী না করতে পারে ? পৃথিবী জয় করতে পারে। কিন্তু তা যখন হলো না, কংগ্রেস বা লীগ কেউ তাতে রাজী নয়, তখন তিনি কলকাতা থেকে পূর্ববঙ্গে ফিরে যান ও বাংলা ভাষার নামে আন্দোলনে নামেন। আন্দোলনটা ভাষার নামে শুরু হলেও স্বাধিকারের জন্যে আন্দোলন। আন্দোলনে সাফল্যের আশা আছে বুঝতে পেরে নেতা তাঁর অনুগামীদের শুধান, "আমাদের এই দেশের নাম কী হবে ?" এর উত্তরে কেউ বলেন, "পূর্ব বাংলা।" কেউ বলেন, "পাক বাংলা।" নেতা তা শুনে বলেন, "না। বাংলাদেশ।"

এর পরে তিনি শুধান, "আমাদের জয়ধ্বনি কী হবে ?" কেউ বলতে পারে না। তখন তিনি বলেন, "আমাদের ধ্বনি হবে জয় বাংলা।" তা শুনে তাঁর অনুগামীদের কেউ কেউ উপহাস করেন। বলেন, "জয় বাংলা না জয় মা কালী।" ওঁরা তাকে ভুল বুঝেছিলেন। বাংলা বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশ, বাংলাভাষা ও বাঙালী জাতি। তিনটেই ছিল তাঁর কাছে সত্য। কিন্তু বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমান মিলে যে এক জাতি এ সত্য বহু পূর্বেই তাঁর অনুগামীদের কারো কারো কাছে অসত্য হয়ে গেছে। হিন্দুকে তাঁরা সঙ্গে নিতে চান না, অথচ হিন্দুকে বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ

চালানো যায় না। "জয় বাংলা" ধ্বনি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মুক্তি-যোদ্ধাদের সবাইকে রক্তদানের প্রেরণা যোগায়। ত্রিশ লক্ষ মানুষ মৃত্যু বরণ করে। তারা সবাই যে মুসলমান তা নয়। খান্ সেনা কাউকে রেয়াৎ করেনি। হিন্দুদের উপরেই তাদের রাগ বেশী। যেহেতু তারা পৌত্তলিক। রমনার সেই প্রসিদ্ধ কালীবাড়ী তো ধ্বংস হয়ই আরো অনেক মন্দির ধ্বংসের খবরও পরে আমার কানে আসে। এটাও কি প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে কোনো অংশে কম ত্যাগ? এসব প্রাচীন কীর্তি আর পুনর্গঠিত হবে না। হলেও তাদের সে মহিমা থাকবে না। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মসজিদ মন্দির সব প্রাচীন কীর্তিই সকলের উত্তরাধিকার। যে ক'টি মন্দির অবশিষ্ট আছে সে ক'টি এখন পর্যটক আকর্ষণ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সাহায্য করছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আমি তিনবার আমন্ত্রিত হয়েছি। প্রথমবার একবছর বাদে। "জয় বাংলা" ধ্বনি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তবু শোনা গেছে। দ্বিতীয়বার যাই চোদ্দ মাস পরে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণের শেষে ধ্বনি দেন "জয় বাংলা"। আর কারো কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি শুনেছি বলে মনে পড়ে না। তৃতীয়বার যাই আরো একবছর বাদে। তখন সকলের মুখে এমারজেন্সীর কালো ছায়া। কোথায় "জয় বাংলা"। অনুভব করি যে পাঁচবছর যেতে না যেতেই তার প্রেরণা নিঃশেষ হয়েছে। কিন্তু তখনো আমি অনুমান করতে পারিনি যে সঙ্গে সঙ্গে তার উদ্‌গাতার পরমায়ুও নিঃশেষ। অনেকেই ভেবেছিলেন যে এর পর পতাকা বদলে যাবে, জাতীয় সঙ্গীত বদলে যাবে, দেশের নাম বদলে যাবে, এমন কি যৌথ নির্বাচনও উঠে যাবে। না, তেমন বিপর্যয় এখনো ঘটেনি। যাবার মধ্যে গেছে ধর্মনিরপেক্ষতা। তার সম্বন্ধে আমি নিজেই তো সন্দিহান ছিলুম। আমার তখনকার লেখাতেই তার উল্লেখ রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ধোপে টেকেনি, গণতন্ত্রও ধোপে টেকেনি, সমাজতন্ত্রও ধোপে টেকেনি। কেবল জাতীয়তাবাদ এখনো টিকে আছে। তবে সেটা বোধহয় বাঙালী জাতীয়তাবাদ নয়। মুসলিম বাংলার মুসলিম বাঙালী জাতীয়তাবাদ।

আমার ঢাকার বন্ধুরা আমাকে শুধান, "বাঙালীদের এই রাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গ কেন যোগ দেয় না? তা হলে তো বারো কোটি বাঙালী এক হয়ে যুক্তবঙ্গ রচনা করত। সেটা কি আপনারা চান না?" এর উত্তরে আমি বলি, "যুক্তবঙ্গ যদি ভারতের বাইরে হয় তবে পশ্চিমবঙ্গ তাতে রাজী হবে না, কারণ আপনারা যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়েছেন, আমরাও তেমনি ভারতের স্বাধীনতার জন্যে লড়েছি। পরে সংবিধান রচনা করেছি, সে সংবিধানে বিচ্ছিন্নতা নিষেধ। অপরপক্ষে পাকিস্তানের তো কোনো সংবিধানই হয়নি, ইয়াহিয়া খান্ হতে দেননি, আপনাদের কেস আলাদা।" বিচ্ছিন্ন না হলে আর যোগদানের প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া বাংলাদেশ এখন মুসলিম বাংলা। বিশ্ব মুসলিম সম্মিলনীর সদস্য। তার সঙ্গে যোগদান অসম্ভব। ভারতভুক্ত বাঙালী এখন সংখ্যায় চার কোটি। হিন্দীভাষীদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। অথচ

বাংলা হলো বারো কোটি মানুষের ভাষা। এশিয়ায় সে তৃতীয় স্থানের অধিকারী, পৃথিবীতে পঞ্চম স্থানের। চীনা, ইংরেজী, রাশিয়ান, হিন্দী, বাংলা এই পাঁচটিই প্রধান ভাষা। স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানী, ইন্দোনেশিয়ান বা মালয় এগুলিও বাংলার কাছাকাছি যায়। হয়তো ইতিমধ্যে তাকে অতিক্রম করেছে, আমি জানিনে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসামকে আতঙ্কিত করে। বছর সাত আট আগে এক অসমীয়া অধ্যাপক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বলেন, "আপনারা বাংলাদেশ পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছেন। ত্রিপুরাও পেয়েছেন। আসামকেও পেতে চান। আপনাদের সংখ্যা বারো কোটি। আমাদের সংখ্যা এক কোটিও নয়। আমরা কি তবে বৃহত্তর বঙ্গের সামিল হব?" আমি তাঁকে বলি যে আমাদের তেমন কোনো অভিসন্ধি নেই। তিনি ভারতীয় সংবিধানকে সোভিয়েট ইউনিয়নের অনুরূপ করতে চান। আসাম তা হলে হবে স্বতন্ত্র এক রেপাবলিক। বিনা পাশপোর্ট ভিসায় বহিরাগতদের ঢুকতে দেবে না। যারা ঢুকেছে তাদের তাড়াতে পারবে। আমি কিন্ত ভারতীয় ইউনিয়নের আওতার মধ্যে একরাশ রেপাবলিকের অস্তিত্ব সমর্থন করিনে। ভারত একটাই নেশন, একরাশ নেশনের সমবায় নয়।

বাঙালীরা যেদিক থেকেই আসুক না কেন—বাংলাদেশের দিক থেকে বা পশ্চিমবঙ্গের দিক থেকে—তাদের সংখ্যাধিক্য ঘটলে অসমীয়ারা সংখ্যালঘু হবে ও তাদের 'আইডেনটিটি' লোপ পাবে। অতএব "বিদেশী নাগরিকদের" বহিষ্কার চাই। আপাতত এই পর্যন্ত দাবী করা হচ্ছে। এর পরের ধাপ "বহিরাগতদের" আগমন রোধ। বলা বাহুল্য "বিদেশী নাগরিক" বলতে প্রধানত বাঙালীদেরই বোঝায়। "বহিরাগত" বললেও প্রধানত তারাই। অসমীয়াদের আইডেনটিটি বিপন্ন। ভারত যদি বাঙালীদের হাত থেকে অসমীয়াদের রক্ষা না করে তবে তারা হয়তো একদিন বাংলাদেশের অনুকরণে ছয় দফা দাবী পেশ করবে ও দাবী না-মঞ্জুর হলে বিচ্ছিন্নতার জন্যে লড়বে। শ'খানেক বছরের বাঙালী প্রাধান্যের স্মৃতি তাদের মনের উপর কাজ করছে। বাঙালীদের সদিচ্ছার প্রতি তারা সন্দিহান। দুই পক্ষই ভারতীয়, তবু জুজুর ভয়। বাংলাদেশে ভয়ানক, সেখান থেকে হিন্দু শরণার্থী আর চাষী মুসলমান ঢুকছে। পশ্চিমবঙ্গ ভয়ানক, সেখান থেকে ভারত সরকারের কর্মচারী ঢুকছে। ভারত ভয়ানক। তার সৈন্যসামন্ত ভয়ানক। এই যে সর্ব-ব্যাপী ভয় এর থেকে পরিত্রাণ চাই। এটাই আসাম আন্দোলনের সার কথা। অসমীয়াদের অভয় না দিলে তারা বাঙালীবিরোধী থেকে ভারতবিরোধী হয়ে উঠবে।

তিন পুরুষ ধরে আসামে বসবাস করছেন এরূপ এক বাঙালীর সঙ্গে সেদিন আলাপ হলো। তিনি বললেন, "এ সমস্যার কোনো সমাধান নেই। এটা সমাধানের অতীত। গৃহযুদ্ধের জন্যে তৈরি হতে হবে।" অর্থাৎ সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে বাঙালীরা চলে আসবে না। মারবে ও মরবে। তারাও

তো চাল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ। এই কথাটাই আরেকজন বাঙালীর মুখে শুনেছিলুম বছরখানেক আগে। তিনি বলেছিলেন, “পালিয়ে গেলে আমি থাকবার জায়গা পাব, জানি। কিন্তু আমাকে চাকরি দেবে কে? তাই আমরা লড়বার জন্যেই তৈরি হচ্ছি।” সমস্যাটা যদি সত্যিই সমাধানের অতীত হয়ে থাকে তবে হয় গৃহযুদ্ধ, নয় দেশ ভাগ বা রাজ্য ভাগ। পরিস্থিতিটা ক্রমেই ১৯৪৬ সালের অনুরূপ হয়ে উঠছে। সমাধানের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চাই।

“বাঙালীরা বারো কোটি, অসমীয়ারা এক কোটিও নয়” এই মনোবৃত্তি যদি দুই পক্ষে বদ্ধমূল হয় তবে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। বাঙালীরাও যে এর থেকে মুক্ত তাই বা কেমন করে বলি? জার্মানদের মধ্যেও এই মনোবৃত্তি বদ্ধমূল ছিল। তার পরিণাম কী হয়েছে সকলেই জানেন। প্রথমত, অস্ট্রিয়াকে আবার পৃথক করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, জার্মানীকে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যাতে ওরা এক না হয় তার জন্যে দুই রাষ্ট্রের এলাকা দখল করে রয়েছে বিদেশী সৈন্য। তৃতীয়ত, পোলাণ্ড থেকে, চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে, বলটিক উপকূল থেকে জার্মানদের সবাইকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সেসব অঞ্চলের মালিক এখন পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও রাশিয়া। বৃহত্তর জার্মানী গড়তে গিয়ে যা হয়েছে তা ক্ষুদ্রতর জার্মানী। তাও ত্রিভঙ্গ। জার্মানদের রাজধানী বার্লিনটাও দ্বিভঙ্গ। তবে অপর রাজধানী ভিয়েনা অভগ্ন। জার্মানদের চিরকালের স্বপ্ন পূর্ণ হতে হতে হলো না। যতদূর মনে হয় এই বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। যেমন ঘটেছিল দেড়শো বছর ধরে পোলাণ্ডের বেলা। তাকে তিন প্রতিবেশী মিলে তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পোলাণ্ড আবার জোড়া লাগে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দু'ভাগ হয়। পরে রাশিয়া তার একাংশ কেটে রাখে ও পরিবর্তে জার্মানীর একাংশ কেটে নিয়ে পোলাণ্ডকে দেয়। রাশিয়ার অধিকৃত অংশ থেকে পোলরা বহিষ্কৃত হয়। যদিও তারা রাশিয়ানদের মতোই কমিউনিস্ট। কমিউনিস্টরাও বুর্জোয়াদের মতোই ন্যাশনালিস্ট এটা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ন্যাশনালিজম নেপোলিয়নের দিগ্বিজয়ের সময় থেকেই ইউরোপের সর্বত্র জাগ্রত হয়েছে ও জাগ্রত রয়েছে। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ছিল বহুভাষী। ন্যাশনালিজমের কল্যাণে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ক্রমশ অচল হয়। সেটা এক দিক থেকে বিরাট ক্ষতি, অপর দিক থেকে বিরাট লাভ। ক্রমশ গড়ে ওঠে এক এক করে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র। কিন্তু ভাষা অনুসারে নেশন ও নেশন অনুসারে রাষ্ট্র গঠিত হলে সব রাষ্ট্রের জনবল ও ধনবল সমান হয় না। বাহুবলেরও তারতম্য ঘটে। রেষারেষি বাড়ে। নেশনরা পরস্পরের বিরুদ্ধে জোটবন্দী হয়। ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র থেকেও বাধে যুদ্ধবিগ্রহ। যেমন ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র থেকে। তা সত্ত্বেও এটা ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রেরই যুগ। দ্বিভাষী রাষ্ট্রও ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র। তাদের কারো কারো ভিতরেও একভাষাভিত্তিক আন্দোলন শুরু হয়েছে। যেমন কানাডায় ও বেলজিয়ামে।

আমাদের এই ভারতীয় ইউনিয়ন পৃথিবীতে অভিনব। এই রাষ্ট্র ভাষার দিক থেকে বহুভাষী আর ধর্মের দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষ। বহুধর্মী ও ধর্মনিরপেক্ষ একই জিনিস নয়। আমাদের স্বপ্ন ছিল আমরা বহুধর্মী রাষ্ট্র গঠন করব, কিন্তু বেশীর ভাগ মুসলমান পৃথক হয়ে যাওয়ায় দেশভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নভঙ্গ হয়। তার বদলে আমরা নতুন এক স্বপ্ন দেখছি। সে স্বপ্ন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের। যারা ধর্ম মানে না, অবতার মানে না, ব্রাহ্মণ মানে না তারাও এ রাষ্ট্রের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হতে পারে ও সমান সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। দায়িত্বও তেমনি সমান। প্রয়োজন হলে দেশের জন্য প্রাণ দিতে হবে। যোগ্য হলে ও বিশ্বাসভাজন হলে তাদের একজন রাষ্ট্রপতি বা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি বা সেনাপতি হতে পারেন। কাউকেই জিজ্ঞাসা করা হবে না তাঁর ধর্ম কী। জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিতে বাধ্য নন।

এমন যে রাষ্ট্র এটি ধর্মনিরপেক্ষতার দিক থেকে অদ্বিতীয় নয়, কিন্তু ভাষা সংখ্যার দিক থেকে একেবারে অদ্বিতীয়। এখন আসাম যদি ভাষাগত কারণে ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বিদায় নেয় তা হলে সেই একই কারণে আরো কয়েকটি রাজ্যও বিদায় নিতে পারে। বিদেশী নাগরিক হয়তো সব ক'টি রাজ্যে যায় না কিন্তু স্বদেশী নাগরিক তো যায়। তাদের যদি "বহিরাগত" বলে বহিষ্কার করা হয় বা বাইরে রাখা হয় তবে তেমন "বহিরাগত" কোন্ রাজ্যেই বা নেই? আজকাল প্রত্যেকটি রাজ্যেই কলকারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। খনি থেকে তেল উদ্ধার করা হচ্ছে. লোহা উদ্ধার করা হচ্ছে, কয়লা উদ্ধার করা হচ্ছে। স্থানীয় অধিবাসীদের দিয়ে সব কাজ করানো কি সম্ভব? বহিরাগতদের বর্জন করলে তো রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধি হবে না। সম্পদ না বাড়লে স্থানীয় অধিবাসীরা সম্পদের ভাগ পাবে কী করে? বাঙালী ইনজিনীয়ার আসামে গিয়ে যে মাইনে পান তার বেশীর ভাগই তো খরচ করেন আসামে। অসমীয়ারাই একভাবে না একভাবে তার থেকে লাভবান হয়।

ধর্মের প্রশ্নে পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাওয়ায় আমাদের বহুধর্মী রাষ্ট্রের স্বপ্নভঙ্গ হয়। ভাষার প্রশ্নে আসাম যদি বেরিয়ে যায় ও তার অনুষঙ্গে মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড ও অরুণাচল, তা হলে তো আমাদের বহুভাষী রাষ্ট্রেরও স্বপ্নভঙ্গ হয়। অনেকেই হয়তো থেকে যাবে, কিন্তু সেই অনেককে নিয়ে তো ইণ্ডিয়া বলে পরিচয় দেওয়া যায় না। সবাই মিলে আমাদের যে আইডেনটিটি সেটার সংজ্ঞা সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাবে, কিন্তু বদলে গিয়ে কী হবে তা কেউ বলতে পারবেন কি? অসমীয়াদের কাছে তাদের আইডেনটিটি যেমন গুরুতর তেমনি ভারতীয় বলে যাদের পরিচয় তাদের কাছে তাদের আইডেনটিটি তার চেয়েও গুরুতর। অসমীয়াদের পায়ের তলায় থাকবে ভাষার ভিত্তি। ভারতীয়দের পায়ের তলায় থাকবে কিসের ভিত্তি? হিন্দীভাষীদের সংখ্যানুপাত তো আরো বেড়ে যাবে। অহিন্দীভাষীদের সংখ্যানুপাত আরো কমে যাবে।

আচার্য সুনীতিকুমার একদা হিন্দী একাধিপত্যের প্রচণ্ড সমর্থক ছিলেন,

পরে তেমনি প্রচণ্ড বিরোধী। বাইরে কেমন ছিলেন বলতে পারব না, ঘরে কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথাবার্তায় হিন্দী সার্বভৌমতার প্রবল প্রতিপক্ষ। একবার কথা ওঠে ভারতীয় একতার খাতিরে বাংলাও কি দেবনাগরী লিপিতে ছাপা হবে? তিনি বলেন, "না। তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন হবে।" অথচ আমি যতদূর জানি ভারতীয় সংবিধান যখন বাংলায় প্রথমবার তর্জমা হয় তখন সেটি নাকি ছাপা হয় দেবনাগরী লিপিতে আচার্য সুনীতিকুমারের পরামর্শে। সে বই আমরা কেউ কোনোদিন দেখিনি। না দেখলে, না পড়লে জাতীয় একতা হবে কী করে?

ইংরেজ চলে গেলে তার শূন্য স্থান পূরণ করবে হিন্দু। এই চিন্তার পরিণাম কী হলো তা সকলেই জানেন। ইংরেজী উঠে গেলে তার শূন্য স্থান পূরণ করবে হিন্দী। এই চিন্তারও পরিণাম কী হবে তা অনুমান করা শক্ত নয়, যদি বাংলাদেশের দিকে তাকাই। সেখানেও ইংরেজীর শূন্য স্থান পূরণ করার অভিপ্রায় ছিল উর্দুকে দিয়ে। সেখানকার বাংলাভাষীরা বিদ্রোহী হয়ে সেট্‌লড ফ্যাক্‌টকে আনসেট্‌ল করে। এখানেও একই অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে একই বিদ্রোহী ভাব। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইংরেজীর শূন্য স্থান অন্যান্য বিষয় দিয়ে পূরণের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার বিরুদ্ধে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের অনেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। আশ্চর্য ব্যাপার! একজন আমাকে বলেন, "বুঝতে পারছেন না? এই ফাঁকে হিন্দী এসে হাজির হবে ইংরেজীর শূন্য স্থান পূরণ করতে। তখন তাকে রোধ করবে কে?" হিন্দীকে ইংরেজীর শূন্য স্থানে বসাতে হবে, এটাই তো ভারত রাষ্ট্রের সরকারী নীতি। তার জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন হয় শূন্যতার। শূন্যতার আয়োজন যাঁরা করছেন তাঁরা শূন্যতা পূরণের নীতি অমান্য করবেন কী করে?

চাকুরিজীবী বাঙালীর কাছে ইংরেজী হচ্ছে জীবনমরণের প্রশ্ন। তাই আজকাল ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ের এখন ছড়াছড়ি। এসব বিদ্যালয়ে কিণ্ডারগার্টেন ক্লাস থেকেই ইংরেজী শেখানো শুরু হয়ে যায়। এইসব ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক স্তরে হিন্দীও শেখানো হয়। অভিভাবকরাই চান যে হাতের পাঁচ হিসাবে হিন্দীটাও যেন জানা থাকে। ইংরেজীর পরেই হিন্দী। হিন্দীর পরে বাংলা। হিন্দীর বিপক্ষে কেউ নয়। অথচ ইংরেজীর স্বপক্ষে সবাই। বাংলা সম্বন্ধে অভিভাবকদের ধারণা আগে যা ছিল এখনো তাই। "বাংলা? ও তো বাড়ীতেই শিখছে। ওর জন্যে আবার বিদ্যালয়ে যেতে হয় নাকি?" ফলে বাংলাই সবচেয়ে অবহেলিত। বাংলার এম-এ শুনলে কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না। গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। যদি না সে জনপ্রিয় উপন্যাস লিখে লক্ষ্মীমন্ত হয়। কিংবা রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে নেমে রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা হয়।

আমরা যতদূর দেখতে পাচ্ছি ইংরেজ চলে গেলেও ইংরেজী এদেশে থাকতে এসেছে। এর একটা মস্ত কারণ হচ্ছে এটা বিজ্ঞান আর টেকনোলজির যুগ। আধুনিকতম প্রামাণিক গ্রন্থগুলির জন্যে ইংরেজীর শরণ নিতে হয়।

তা ছাড়া উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বিদেশে না গেলে চলে না। আমাদের হিন্দীভাষী ভ্রাতারাও ইংরেজী-মাধ্যম স্কুলে পুত্রদের পড়াচ্ছেন। ভর্তির জন্যে যখন লাইন পড়ে তখন এমন দৃশ্যও দেখা যায় যে বাঙালীকে গায়ের জোরে ঠেলে রাজস্থানী এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর পুত্র বড়ো হয়ে কমার্স পড়বে। তার পরে ম্যানেজমেণ্টে যাবে। ব্যবসা বাণিজ্যেও ইংরেজীর কদর। সে ক্ষেত্রে ইংরেজের শূন্যস্থানে বসছেন সাধারণত রাজস্থানী বা গুজরাটী। কিন্তু এঁরাও ইংরেজীতে কারবার করতে উৎসুক।

তারপর ইংরেজী এই বহুভাষী দেশের যোগাযোগের ভাষা হয়ে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণকে ও পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমকে বেঁধেছে। দক্ষিণীরা তাকে ছেড়ে হিন্দীকে ধরতে নারাজ। নাগা মিজো গারো খাসীরা তাকে ছেড়ে হিন্দীকে ধরতে অনিচ্ছুক। বাঙালীই একমাত্র ইংরেজীনবীশ নয়। তবে পাঁচ পুরুষ ধরে ইংরেজী শিখে আসছে বলে সারা ভারতে তার একটা বনেদী আসন। ইংরেজ, ইংরেজের পরেই বাঙালী। বা পার্সী। আই সি এস পরীক্ষার সূত্রপাতের সময় থেকেই পার্সী আর বাঙালী হয়েছে অগ্রণী। প্রথম পরীক্ষার্থী ছিলেন পার্সী। তিনি বিফল হন। দ্বিতীয় পরীক্ষার্থী বাঙালী। তিনি সফল হন। ব্যারিস্টারিতেও তেমনি পার্সী আর বাঙালী। বাঙালীরাই বড়লাটের শাসন পরিষদের আইন সদস্য হতেন বার বার। দক্ষিণের ওঁরাও ইংরেজীনবীশ বলে নাম করেছেন। উচ্চ পদ পেয়েছেন। দক্ষিণেও ইংরেজী শিক্ষার বনেদ অতি গভীর। বাঙালীও একদিন বামপন্থীদের চাপে ইংরেজী ছাড়তে পারে। কিন্তু তামিলরা কখনো ছাড়বে না। আর ছাড়বে না নাগা মিজো গারো খাসীরা। বহুভাষিকতা যদি আমাদের রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে তবে বহুভাষার মধ্যে ইংরেজীও অন্যতম। তাকে বাদ দিলে আবার সেই আইডেনটিটির সংজ্ঞা নিয়ে তর্ক উঠবে। জাতীয়তাবাদীদের অভিমানে বাধবে, কমিউনিস্টদের তত্ত্বজ্ঞানে বাধবে, হিন্দভাষীদের মর্যাদায় বাধবে, তা সত্ত্বেও ইংরেজী এদেশে থাকতে এসেছে। যেমন এসেছে আরবী-ফারসীর ধারাবাহী উর্দু। ইংরেজীর শূন্যতা হলে তো শূন্যতা পূরণের প্রশ্ন উঠবে। শূন্যতা হতে দিচ্ছে যারা তারা দিক, কিন্তু এ রাজ্যের লোক হতে দেবে না। এমনি আরো কয়েকটি রাজ্যের লোকও হতে দেবে না। জবাহরলাল তো প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন যে এরা যতদিন না সম্মতি দিচ্ছে ইংরেজী ততদিন সরকারী কাজকর্মে বহাল থাকবে। ইংরেজদের বা আমেরিকানদের ইচ্ছায় নয়, তথাকথিত অনার্যদের ইচ্ছায়। সংস্কৃত ও হিন্দী তাঁদের কাছে ইংরেজীর চেয়ে কম বিজাতীয় নয়।

কায়ার স্বাধীনতা, মনের স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতার মতো শিক্ষার স্বাধীনতাও মানুষের একটি মৌল স্বাধীনতা বা অধিকার। সেইজন্য এখনো এদেশে সংস্কৃত টোল ও আরবী-ফারসী মাদ্রাসা রয়েছে। তাদের অস্তিত্ব যদি বিতর্কের অতীত হয় তবে ইংরেজী স্কুল-কলেজ নিয়ে এত বিতর্ক কেন? কেনই বা এক্ষেত্রে সরকার

হস্তক্ষেপ করবেন, বা আইনসভা হস্তক্ষেপ করবেন ? এক্ষেত্রে মেজরিটির ইচ্ছাই একমাত্র নিয়ামক নয়। মেজরিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। ছাত্রদলকে আজকাল ইউনিফর্ম পরানো চল হয়েছে। যে কোনো স্কুলে গেলে পাওয়া যায় ছাত্র বা ছাত্রীদের একই রকম পোশাক। শৃঙ্খলার দিক থেকে এর একটা মূল্য আছে। কিন্তু এ নিয়ম কি শিক্ষণীয় বিষয় তথা শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধেও মূল্যবান ? বাঙালীর ছেলে যদি অ্যালো-ইণ্ডিয়ান স্কুলে পড়তে যায় তা হলে সেটা কি আইন অনুসারে নিষিদ্ধ হতে পারে ? সেই ধাঁচের স্কুল যদি বাঙালীরাই স্থাপন করেন ও সেসব স্কুলে যদি বাঙালীর ছেলেমেয়েরা পড়তে যায় সেটা কি বেআইনী হতে পারে ? সরকারী স্কুল থেকে ইংরেজী উঠে যাচ্ছে শুনে বেসরকারী স্কুলে এখন ছাত্র-ছাত্রীর ভিড় বাড়ছে। বেসরকারী স্কুলের বিভাগ বাড়ছে, সংখ্যা বাড়ছে। এই যে চাহিদা এটাকে কৃত্রিম উপায়ে রোধ করা উচিত নয়। করলে এক রাজ্যের ছাত্র অন্য রাজ্যে পড়তে যাবে। এক রাষ্ট্রের ছাত্র অন্য রাষ্ট্রে পড়তে যাবে। বাংলাদেশ থেকে ছাত্ররা আসে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং-এ পড়তে, আসাম থেকে ছাত্ররা আসে নরেন্দ্রপুরে পড়তে। চাহিদা অনুসারে যোগান এটাই তো নিয়ম। জোর করে ইউনিফর্ম পরানোর মতো ইউনিফর্ম শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করলে যে যেখানে পারে পালাবে। যদি জায়গা পায় ভর্তি হবে। ভারতের সংবিধান শিক্ষাকে রাজ্য সরকারের অধীন করেছে বলে রাজ্য সরকার যা খুশি করলে বাধ্য হয়ে আদালতের আশ্রয় নিতে হবে। সুপ্রীম কোর্ট কিছুকাল আগে ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে রুলিং দিয়েছেন। সেটা যদি স্কুল বা কলেজ কর্তৃপক্ষ আবশ্যক মনে করেন।

সরকারী স্কুল কলেজে সরকার নিজের ইচ্ছা খাটাতে পারেন, কিন্তু এখনো এদেশে যাবতীয় স্কুল কলেজ সরকারী হয়নি। যারা সরকারী আনুকূল্য চায় না তাদের অস্তিত্বে আপত্তি করা উচিত নয়। ধর্মান্ধতার মতো এটাও একপ্রকার অন্ধতা। ভাষান্ধতা বা মতবাদান্ধতা। আপত্তি যাঁরা করছেন তাঁরা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী নন, একপ্রকার না একপ্রকার সাম্যবাদী। এই পর্যায়ে গান্ধীপন্থী মার্কসপন্থী ও মাওপন্থীরাও পড়েন। এঁরা প্রতিকূল হলে সাম্যের দোহাই দিয়ে একদিন হয়তো বেসরকারী স্কুল কলেজ থেকেও ইংরেজীর পাট উঠে যাবে। মাধ্যম হিসাবে তো বটেই শিক্ষণী বিষয় হিসাবেও। পুরোপুরি উঠে যাবে না হয়তো। কিন্তু সেটুকুতে অগ্রসর ছাত্রদের জ্ঞানের চাহিদা মিটবে না। চীনদেশের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মতো এদেশেও একপ্রকার সাংস্কৃতিক বিপ্লব দেখা দেবে। যারা অগ্রসর নয় তারা আর কাউকে অগ্রসর হতে দেবে না। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেবে। উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাটাই বানচাল করবে। তুমি কেন উপরে উঠবে, আমি যদি না উঠি ?

অপরপক্ষে এটাও আমি ন্যায়সঙ্গত মনে করিনে যে যারা ইংরেজী শিখতে চায় না বা ইংরেজীতে বার বার ফেল করে তাদের উপরেও ইংরেজী চাপাতে হবে। আমার মতে ইংরেজী হবে ঐচ্ছিক বিষয় বা ঐচ্ছিক মাধ্যম। আবশ্যিক

বিষয় বা আবশ্যিক মাধ্যম নয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, স্নাতক প্রভৃতি প্রত্যেকটি স্তরেই ইংরেজী হবে ঐচ্ছিক, কোনোটাতেই আবশ্যিক নয়। যারা শিখবে তারা কষ্ট করেই শিখবে। ফেল করলে নাম কাটা যাবে। শিক্ষকদেরও ট্রেনিং নিতে হবে। ফেল করলে তাঁরাও ছাঁটাই হবেন। নমো নমো করে সবাইকে ইংরেজীনবীশ করতে গেলে অযোগ্যতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। নমো নমো করে সবাইকে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরেও তুলে দেওয়া উচিত নয়, আরো উপরে তো নয়ই।

উপরে যাদের কথা বলা হলো তারা বিশ্বের বারো কোটি বাঙালী নয়, তারা ভারতের চার কোটি বাঙালী। তাদের কোনো আন্তর্জাতিক পরিচিতি নেই। তারা ভারতের পাশপোর্ট নিয়ে বিদেশে যায়। এমন কি বাংলাদেশেও যায় অন্যান্য ভারতীয়দের মতো ভারতীয় পরিচিতি বহন করে। আট কোটি বাঙালী যে রাষ্ট্রে বাস করে সে রাষ্ট্র ভারতের অঙ্গ নয়, তারা ভারতীয় নয়, তাদের ভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষা নয়, তাদের সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির সামিল নয়, তারা ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র একটি জনস্রোত। আর তারাই হলো বাঙালী জাতির মুখ্য স্রোত। হ্যামলেট নাটকে তারাই ডেনমার্কের রাজপুত্র। তাদের বাদ দিয়ে হ্যামলেট অভিনয় হয় না।

ওরা যেমন ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন এরাও তেমনি বাংলাদেশের থেকে বিচ্ছিন্ন। আগেকার দিনে অবিভক্ত বাঙালীর সংখ্যানুপাত ছিল শতকরা বারো। এখন বিভক্ত ভারতে বিভক্ত বাঙালীর সংখ্যানুপাত শতকরা ছয় থেকে সাত। ফলে সর্বভারতীয় ব্যাপারে বাঙালীর অংশ কমে গেছে। শিক্ষাদীক্ষার অগ্রসরতার কল্যাণে বাঙালীর ওজন ছিল সংখ্যানুপাতের তুলনায় বেশী। এখন সে ওজন আর নেই। বাঙালী তার নেতৃত্ব হারিয়েছে। বাঙালী এখন বিবর্তনের পথ ছেড়ে বিপ্লবের পথ ধরতে চায়, সেটার জন্যে দেখি বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি। অথচ বিবর্তনের পথও ছাড়তে নারাজ। তাই পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে নির্বাচনও লড়ে। বিবর্তনের পথ ধর দাক্ষিণীরা চলেছে, পশ্চিম-ভারতীয়রা চলেছে, পাঞ্জাবীরা চলেছে। বিপ্লবের জন্যে তাদের তাড়া নেই।

আর ওদিকে যে আটকোটি বাঙালী আছে তাদের রাষ্ট্রে তারাই শতকরা নিরানব্বই। কয়েক লক্ষ বিহারী পাকিস্তানে প্রস্থানের আশায় দিন গুনছে। এ বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ আছে যে আগেকার দিনে হিন্দুর তুলনায় মুসলমান ছিল অনগ্রসর, কলকাতার আর তার আশপাশের তুলনায় পূর্ববঙ্গ ছিল অনগ্রসর, জমিদারদের তুলনায় তাদের প্রজারা ছিল সুযোগসুবিধাহীন, মহাজনদের তুলনায় খাতকরা নিঃস্ব? পার্টিশন না হলে চাকা ঘুরত না। তার ফলে কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ। ইতিহাসবিধাতাই চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

এই তেত্রিশ বছরে পূর্ববঙ্গের বা পূর্ব পাকিস্তানের বা বাংলাদেশের মানুষ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। বহু পরিমাণ সুযোগসুবিধা পেয়েছে। আগের

মতো নিঃস্বও নয়। তাদের বেশীর ভাগই মুসলমান। যেসব ঐতিহাসিক পরিবর্তন ইউরোপে ঘটে গেছে, ভারতেও হিন্দুসমাজে সেই সূত্রে এসেছে, মুসলমানদের মধ্যেও সেসব এতদিন পরে দেখা দিচ্ছে। বিলম্ব হলেও অবশেষে হচ্ছে বাংলাদেশের সাহিত্যে ও শিল্পে রেনেসাঁস, বাঙালী মুসলমানের ধর্মে রেফরমেশন। সুধীমহলে এনলাইটেনমেণ্টের লক্ষণও পরিস্ফুট। কিছুদিন আগেও কোরানের বাংলা অনুবাদ ছিল ক্ষমার অযোগ্য এক অপরাধ। কাজী আবদুল ওদুদের নিন্দাবাদই শুনেছিলুম। তাঁর কোরানের অনুবাদটা মূলানুগ নয় বলে নিন্দনীয় হলে কথা ছিল না, কোরানের অনুবাদ করাটাই ছিল গর্হিত কাজ। কিন্তু দিনকাল বদলেছে। বহু স্বধর্মনিষ্ঠ মুসলমান এখন কোরান হাদিস পড়েন বাংলাভাষায়, তর্জমা করেন যাঁরা তাঁরাও ধর্মপ্রাণ মৌলানা মৌলভী। ইউরোপে যে-কাজ করেছিলেন মার্টিন লুথার। রেফরমেশনের সূত্রধার।

ভবিষ্যতের কথা যখন ভাবি তখন কেবল চারকোটি বাঙালীর নয় আট-কোটি বাঙালীর ভবিষ্যতের কথাও ভাবি। বিবর্তন সকলেরই হচ্ছে। নাই বা হলো একই ভাবে।

শিক্ষার ভবিষ্যৎ

আমার বিদ্যারম্ভ হয় গুরুমহাশয়ের কাছে পাঠশালায়। তার পরে স্কুলে। আমার ছেলেবেলায় এদেশে দু'প্রস্থ বিদ্যালয় দেখেছি। একপ্রস্থের নাম ছিল ভার্নাকুলার স্কুল, সেখানে ইংরেজী মাধ্যম তো দূরের কথা, ইংরেজী বলে একটি শিক্ষণীয় বিষয়ও ছিল না। সেখানকার ছাত্রদের পড়াশুনা শেষ হয়ে যেত মাঝপথেই মিডল ভার্নাকুলার পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তার পরে তারা যেতে পারত ভার্নাকুলার মেডিকাল স্কুলে। কিংবা সার্ভেয়ার হবার জন্যে অন্য একপ্রকার বিদ্যালয়ে। এমনি কয়েকটা রাস্তা তাদের জন্যে খোলা ছিল। যাদের সেদিকে রুচি নেই তারা আসত মিডল ইংলিশ স্কুলের ছাত্রদের মতো হাই ইংলিশ স্কুলে ভর্তি হতে। কিন্তু মিডল ইংলিশ স্কুলের ছাত্ররা ইংরেজী মাধ্যমে না পড়লেও ইংরেজী বলে একটি শিক্ষণীয় বিষয় পড়েছে। তাই তারা এক শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। ওদিকে হাই ইংলিশ স্কুলে যারা গোড়া থেকেই পড়ে এসেছে তারা ইংরেজী মাধ্যমে না পড়লেও ইংরেজী নামক বিষয়টা পড়েছে। মিডল স্ট্যাণ্ডার্ড অতিক্রম করার পর তারা পড়তে শুরু করে ইংরেজী মাধ্যমে। সেকালে বলা হতো ফোর্থ ক্লাস থেকে ফার্স্ট ক্লাস অবধি। তার পরে এনট্রান্স বা ম্যাট্রিকুলেশন। একালে সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী। তার পরে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এসব নাম পরিবর্তনের ফলে ইনটারমিডিয়েট

হয়ে গেছে উচ্চমাধ্যমিক। ইনটারমিডিয়েটের মাধ্যম ছিল ইংরেজী। শিক্ষণীয় বিষয়ও ছিল সর্বাগ্রে ইংরেজী। যারা বিজ্ঞান পড়ত তারাও ইংরেজী পড়ত ও ইংরেজীতে পড়ত। সঙ্গে সঙ্গে ভার্নাকুলারও পড়তে হতো। বি এ'তেও ইংরেজী আর ভার্নাকুলার ছিল অবশ্য শিক্ষণীয়। বি-এসসিতে নয়।

এখন ফিরে যাই আমাদের হাইস্কুলের প্রসঙ্গে। মিডল ইংলিশ পাশ করে যারা আসত তাদের নিয়ে কোনো সমস্যাই ছিল না। তারা খাপ খেয়ে যেত। মিডল ভার্নাকুলার পাশ করে যারা হাই ইংলিশ স্কুলে ভর্তি হতে আসত তাদের কী করে ফোর্থ ক্লাসে বা সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করা যায়? তারা কি ইংরেজী মাধ্যমে পড়তে পারে? কাজেই তদের ভর্তি করা হতো কয়েক ক্লাস নিচে। তাদের প্রাণপণে ইংরেজী শিখে নিতে হতো। বয়স তো নষ্ট হতোই। সব শ্রেণীতেই তারা বসত পেছনের সারিতে। তবে এরা গণিত প্রভৃতি কয়েকটা বিষয়ে এগিয়ে থাকত বলে মোটের মাথায় পাশ মার্ক'ও পেতো, পোজিশনও পেতো। চূড়ান্ত ফল খুব একটা খারাপ হতো না। সংস্কৃততে আর গণিতে টেক্কা দিয়ে আর সব বিষয়ে পাশ মার্ক পেয়েও তারাই হয়তো আখেরে ফার্স্ট সেকেণ্ড হতো। কিন্তু ইংরেজীতে নৈব নৈব চ।

একদিন দেখা গেল ভার্নাকুলার মেডিকাল স্কুল উঠে গেছে, সার্ভে ইত্যাদিতেও যাবার রাস্তা বন্ধ। কাজেই ভার্নাকুলার স্কুল বন্ধ। সবাই চায় গ্রাম অঞ্চলে মিডল ইংলিশ স্কুল, শহর অঞ্চলে হাই ইংলিশ স্কুল। মাধ্যম হিসাবে ভার্নাকুলার সেকালের অষ্টম থেকে পঞ্চম শ্রেণী অবধি, অর্থাৎ একালের ষষ্ঠ শ্রেণী অবধি। এর কারণ সপ্তম শ্রেণী ছিল ত্রিধা বিভক্ত, পরে দ্বিধা বিভক্ত। তাই পৃথক নামকরণ হয়। মোট কথা সেকালেও দশ বছর পরে ম্যাট্রিক, একালেও দশ বছর পরে মাধ্যমিক। উপরের চারটি শ্রেণীতে ছিল ইংরেজী মাধ্যম। কিন্তু সর্ব শ্রেণীতেই ইংরেজী অবশ্য শিক্ষণীয়। কলেজের ইনটার-মিডিয়েটেও তাই। বি-এ'তেও তাই। বি-এসসিতে নয়।

এতে অনেকগুলো রাস্তা খুলে যেত। ডাক্তারি, ইনজিনীয়ারিং থেকে শুরু করে শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং। বুক কীপিং। টেলিগ্রাফ। আরো কত কী? সারা ভারতে কোথাও না কোথাও কাজ জুটে যেত। ভারতের বাইরেও। তাই ইংরেজীর এত কদর।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে যারা পড়তে যেত তারাও বিষয় হিসাবে ইংরেজী পড়ত গোড়া থেকেই। আর মাধ্যম হিসাবে ইংরেজীতে পড়ত শেষ দুই শ্রেণীতে। যাতে তারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে ও পরে কলেজে ভর্তি হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-নীতি অবশ্য বারো বছর বয়সের আগে ইংরেজী না শেখারই পক্ষে। কিন্তু তিনি ভিন্ন আর কেউ তেমন শিক্ষানীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই ছাত্রদের অভিভাবকদের অনুরোধে তাঁকেও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল ছয় বছর বয়স থেকেই, আর ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল চোদ্দ বছর বয়স থেকেই। দূর থেকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতির অনুসরণ

করতে গিয়ে আমাকে পড়ে যেতে হয় মহাবিপদে। আট বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেকে ইংরেজী বলতে বা পড়তে বা লিখতে শেখানো হয়নি, ইংরেজী শুনে সে একটি কথাও বুঝতে পারত না। তার মাকেই বাংলা শিখতে হয়েছিল, বাংলায় শেখাতে হয়েছিল। বাংলা মাধ্যমেই সে আর সব বিষয় শিখেছিল, ভালোই শিখেছিল। কিন্তু ইংরেজীতে নিরক্ষর। তাকে যখন আটবছর বয়সে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে শুনি, আটবছর বয়স হলো, তবু ইংরেজীর এ-বি-সি-ডিও জানে না। অতএব তাকে ছয় বছর ববসী শিশুদের সঙ্গে গোড়া থেকেই শিখতে হবে। তাকে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করা চলবে না, তাকে প্রথম শ্রেণীতেই ভর্তি করতে হবে। যদিও সে আর সব বিষয়ে আটবছর বয়সীদের সমকক্ষ। আমরা অকারণে ওর দুটো বছর নষ্ট করতে রাজী হইনি। ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। বাড়ীতে ইংরেজী শিখিয়ে তিন বছরের মধ্যে সেকালের পঞ্চম শ্রেণীর অর্থাৎ একালের সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে দিই। কৃষ্ণনগরের মিশনারী হাইস্কুলের ইংরেজ হেডমাস্টার নিজে তার ইংরেজী বিদ্যায় সন্তুষ্ট হন। সেখানে পরের বছর থেকে ইংরেজী মাধ্যম। তাতেও সে ভালোই করে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইংরেজীতে পায় শতকরা বাহাত্তর কি তিয়াত্তর।

দেখা যাচ্ছে আট বছর বয়সে ইংরেজী আরম্ভ করে তিন বছর বাড়ীতে ইংরেজী শিখে এগারো বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হয়ে, বারো বছর বয়সে ইংরেজী মাধ্যমে পড়ে, ষোল বছর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশনে প্রথম বিভাগে পাশ করা সম্ভব। পার্টিশনের দরুন বছরের মাঝখানে স্কুল পরিবর্তন না করলে ফল আরো ভালো হতে পারত। মোট কথা শান্তিনিকেতনে থাকলে শেষ দু'বছর ইংরেজী মাধ্যমে পড়তে হতো। অন্যত্র পড়াশুনা করায় চার বছর ইংরেজী মাধ্যমে পড়তে হয়। শিক্ষানীতির ওলটপালট যাঁরা ঘটাতে চান তাঁরা জেনে রাখতে পারেন যে শান্তিনিকেতনে এখনো গোড়া থেকেই ইংরেজী অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়, তবে পাঠভবনের উপরের দিকেই দুই শ্রেণী থেকে ইংরেজী উঠে গেছে। কলেজে কিন্তু ইংরেজী মাধ্যম এখনো চলে। নানা দেশ থেকে ছাত্রছাত্রী আসে। তাদের স্বাগত করাই বিশ্বভারতীর মূল নীতি। যাতে বিশ্ব এক-নীড় হয়। আর ভারতও হয় সেই নীড়ের সামিল।

ভারত সরকারও ভারতের নানা স্থানে কতকগুলি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। তাঁদের সেইসব সেণ্ট্রাল স্কুলে ইংরেজী শেখানো হয় প্রথম শ্রেণী থেকেই অর্থাৎ ছয় বছর বয়স থেকেই। কেবল বিষয় হিসাবে নয় মাধ্যম হিসাবেও চলে ইংরেজী। তথা হিন্দী। তবে হিন্দী কেবল পলিটিকাল সায়েন্সের বেলা। সেটা বোধহয় একটু বেশী বয়স থেকে। রাজ্যগুলিতে ইংরেজী আর হিন্দী নিয়ে তীব্র মতবৈষম্য। কেউ কেউ গোড়া থেকেই ইংরেজী পড়ায় ও ইংরেজীতেই পড়ায়। যেমন নাগাল্যাণ্ড। কেউ কেউ তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজী পড়ায়, কিন্তু ইংরেজী মাধ্যমে নয়। কেউ কেউ চতুর্থ থেকে, কেউ কেউ পঞ্চম থেকে, কেউ কেউ বা ষষ্ঠ থেকে। এছাড়া আছে একপ্রস্থ

প্রাইভেট স্কুল, তারা গোড়া থেকেই পড়ায় ইংরেজী মাধ্যমে। এদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ভর্তির জন্যেও ভিড়।

স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি এসব শব্দ এদেশে নামান্তরিত হয়েছে কিন্তু নাম বদলে গেলেও রূপ বদলে যায়নি। তাই আমরা বলি প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চতর মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর। আবহমানকালের সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে নামও মেলে না, রূপও মেলে না, পদ্ধতিও মেলে না, লক্ষ্যও মেলে না। তেমনি আরবী ফারসী শিক্ষার সঙ্গেও। টোল চতুষ্পাঠী মক্তব মাদ্রাসার শিক্ষা এখনো প্রচলিত। আমাদের পূর্বপুরুষরা সর্বসাধারণের জন্যে স্থাপন করতেন পাঠশালা। সেখানকার পড়াশুনার মান ছিল একই রকম কিন্তু নিম্নতম। কেউ নিরক্ষর থাকত না কিন্তু কেউ তার বেশী শিখতে চাইলেও শিখতে পারত না মাতৃভাষায়। বেশী শিখতে চাইলে সংস্কৃত শিখতে হতো, সংস্কৃততে শিখতে হতো। সেটা ছিল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে নিবদ্ধ। অথবা শিখতে হতো আরবী ফারসী, সেই দুই ভাষার মাধ্যমে শিখতে হতো। হিন্দুর ছেলেরাও সেসব প্রতিষ্ঠানে পড়তে পারত। কথায় বলে, ফারসী পড়ে তাঁতী। কলেজে আমার সতীর্থ ছিলেন বিহারের কায়স্থ সন্তান। তিনি পড়তেন ফারসী। কর্মজীবনে কুমারখালীর স্কুলে দেখি তিলির ছেলেরা ফারসী পড়ছে। অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে বসবাস করি। প্রতিবেশী গ্রামের মৌলবীসাহেব আসতেন তাঁর বাংলা রচনা দেখাতে। তিনি পড়াতেন ফারসী আগুরির ছেলেদের।

সত্যি এ এক বিচিত্র দেশ! জগতে অদ্বিতীয়। দুই শতাব্দী আগে মোগল রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে। তবু হিন্দুর ছেলে পড়ে ফারসী। উত্তরপ্রদেশের হিন্দুদের নামকরণ হয় ফারসীতে। যথা মোতিলাল, জবাহিরলাল। একটু বদলে দিয়ে জবাহরলাল। ব এখানে অন্ত্যস্থ ব। তেমনি লাল বাহাদুর। শাদিলাল। ইকবাল বখ্‌ত। খুশবখ্‌ত রায়। মুনশীরাম। আমীরচাঁদ। আমিনচাঁদ। 'হিন্দু' কথাটাই তো ভারতীয় নয়, সংস্কৃতও নয়। 'হিন্দী' কথাটাও তেমনি। আমি যদি বলি যে দুই শতাব্দী পরেও ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস থাকবে তবে কি সেটা ভুল হবে? তেমনি কমিউনিস্ট পার্টি অভ ইণ্ডিয়া। এ দেশ এমন এক দেশ যে দেশ কাউকে ছেড়ে দিতে চায় না। মুসলমানকে না, ফারসীকে না, উর্দুকে না, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকে না, ইঙ্গবঙ্গকে না, ইংরেজীকে না। পোশাক পরিচ্ছদ সর্বত্র ইঙ্গবঙ্গ বা ইঙ্গভারতীয়। সব শ্রেণীর ছেলেরা পরে ফুল না হাফপ্যাণ্ট, মেয়েরা ম্যাকসি বা মিনি স্কার্ট।

সবাইকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে, বিনা বেতনে দিতে হবে, আবশ্যিক ভাবে দিতে হবে, এটাও একটি বিলিতী ধারণা। যেমন সবাইকে দিতে হবে ভোট দেবার অধিকার। ইংলণ্ডে এখন শুধু প্রাথমিক নয় মাধ্যমিক শিক্ষাও সকলের পক্ষে আবশ্যিক, সকলেই বিনা বেতনে পড়তে পারে। তবে কোনো অভিভাবক যদি নিজের খরচে তাঁর পুত্রকন্যাকে অন্যত্র পড়ানোর ব্যবস্থা করেন তাঁর সে স্বাধীনতা স্বীকৃত। ধর্মের মতো শিক্ষাতেও যত মত তত পথ।

সরকারী বিদ্যালয়ে সবাই যেতে বাধ্য নয়, যদি অন্য ব্যবস্থায় আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত পড়ে। আমরা যখন ইংলণ্ডের অনুসরণে সবাইকে ভোটদানের অধিকার দিয়েছি সাবালক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, তখন সবাইকে শিক্ষাদান করতে ন্যায়ত বাধ্য সাবালক না হওয়া পর্যন্ত। তা বলে সরকারী বিদ্যালয়ে যেতে বাধ্য করব না সবাইকে। যে চায় বা পারে সে অন্য কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করুক। সেখানে যদি অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাদান হয়, তবে হোক। যদি ইংরেজী শেখানো হয়, তবে হোক। যদি ইংরেজী মাধ্যমে শেখানো হয়, তবে হোক।

রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেব যারা পড়তে চায় তাদের কাছ থেকে বেতন নিয়ে ইংরেজীটা গোড়া থেকেই শেখাতে, তাদের দরকার দেখলে ইংরেজী মাধ্যমেও শেখাতে। কেন্দ্রীয় সরকারও তো তাই করছেন। এই কলকাতাতেই রয়েছে সেণ্ট্রাল স্কুল। ওখানে বেতন লাগে, কিন্তু বেসরকারী বিদ্যালয়ের মতো অত বেশী নয়। লোকে তবু বেসরকারী বিদ্যালয়ই পছন্দ করে বেশী, তাদের মধ্যে নরেন্দ্রপুরও পড়ে।

ভারতের মতো এত বড়ো একটা দেশের শিক্ষাপদ্ধতি হুবহু একই রকম হতে পারে না। শিক্ষাপদ্ধতি রাজ্য অনুসারে ভিন্ন হতে পারে, ধর্ম অনুসারে ভিন্ন হতে পারে, বংশ অনুসারে ভিন্ন হতে পারে, আবার সামাজিক শ্রেণী অনুসারে ভিন্ন হতে পারে। তারপর গ্রামবাসী ও শহরবাসী অনুসারেও ভিন্ন হতে পারে। সবাইকে ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছে বলে সবাইকে একই রকম বিদ্যালয়ে পড়াতে হবে এটা যুক্তিসম্মত নয়। তবে সরকার অবশ্যই একথা বলতে পারেন, ছেলেমেয়েরা যে যার খুশিমতো পড়লে সবাইকে তাঁরা বিনা বেতনে পড়াতে পারবেন না, বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক যোগাতে পারবেন না। এক্ষেত্রে নীতি হচ্ছে বৃহত্তম সংখ্যকের বৃহত্তম মঙ্গল। সরকারী বিদ্যালয়ের সমস্ত দায়িত্ব যখন সরকারের তখন সরকারের অর্থ কেবল তাঁদের জন্যেই ব্যয় করা হবে যাঁরা সরকারী ব্যবস্থাপনায় পুত্রকন্যাদের পড়াতে রাজী হবেন। যাঁরা নারাজ তাঁদের জন্যে অন্য ব্যবস্থা। অর্থসংগ্রহের দায়িত্বও অন্যদেরই।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আর্থিক ব্যাপারে আত্মনির্ভর। সরকার সাহায্য করতেও পারেন, না করতেও পারেন। কিন্তু আমাদের এদেশে প্রায় সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ই সরকারের মুখাপেক্ষী। যতদূর জানি পুনা ও বোম্বাইয়ের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর। অন্তত ছিল এককালে। আচার্য কার্বে যখন জীবিত ছিলেন। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থেকে মুক্ত ইটন, হ্যারো প্রভৃতি তথাকথিত পাবলিক স্কুলের অনুরূপ ভারতেও প্রতিষ্ঠিত হয় বেসরকারী উদ্যোগে। যেমন দুন স্কুল। যেখানে শ্রীমতী গান্ধীর পুত্ররা লালিত। মিশনারী বিদ্যালয়গুলিতে পড়েছেন বহু স্বদেশী নেতা। সুভাষচন্দ্র পড়েছিলেন প্রথমে কটকের ইউরোপীয় স্কুলে। তার পরে সরকারী স্কুলে। বলা বাহুল্য ইউরোপীয় স্কুলগুলি বেসরকারী। তবে সরকারও অর্থসাহায্য করতেন ও করেন।

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতারা বাঙালী হিন্দু। তাঁদের মধ্যে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও ছিলেন। কেরানী তৈরি করা এদের উদ্দেশ্য ছিল না। ইংরেজদেরও ব্যবহারিক ভাষা ছিল ফারসী। তাঁরা ইতিমধ্যে ফারসী শিক্ষার জন্যে কলকাতায় মাদ্রাসা ও সংস্কৃত শিক্ষার জন্যে বেনারসে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কলকাতার বাঙালী হিন্দু নাগরিকদের দাবী হলো যে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ইত্যাদি শিক্ষার জন্যে চাই রীতিমতো ইংরেজী কলেজ। ইংলণ্ডের আদর্শে। যে বিদ্যায় বিদ্বান হয়ে ইংরেজরা দিগ্বিজয়ী হয়েছে সেই বিদ্যাই ভারতে বসেই শিখতে হবে। সমুদ্র-পারে যাবার তো শাস্ত্রসম্মত উপায় নেই। কলকাতার হিন্দু কলেজ হলো খাস বিলিতী কলেজের বিকল্প। মেকলে তখনো আসেননি। রামমোহনের অনুরোধে বড়লাট কর্ণপাত করেননি। ইংরেজরা দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত। একটি গোষ্ঠী চান সংস্কৃত ও ফারসী মাধ্যমে প্রাচীন শিক্ষার সংরক্ষণ। অপর গোষ্ঠী চান ইংরেজীর মারফৎ আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন। মেকলের কাস্টিং ভোটে আধুনিকপন্থী ইংরেজ গোষ্ঠী জয়ী হন। পরে আসে সরকারী ভাষার প্রশ্ন। এটি একটি সম্পূর্ণ পৃথক ইস্যু। মেকলের সুপারিশেই ফারসী পরিত্যক্ত হয়। ইংরেজী তার স্থান নেয়।

সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো হিন্দু কলেজের পূর্বেই যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয় সেটি কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা, হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি ভার্নাকুলার শেখানোর জন্যেই। তাঁদের জন্যে হ্যালহেড লিখেছিলেন বাংলাভাষার ব্যাকরণ। এমনি করে ইংরেজরা শিখতে শুরু করে বাংলা, আর বাঙালীরা লিখতে শুরু করেন বাংলা গদ্য। ইংরেজ রাজত্বের শেষ কাণ্ড পর্যন্ত ইংরেজদের বাংলার পরীক্ষা দিতে হতো। ইংরেজী বাংলার শত্রু নয়।

হিন্দু, হেয়ার প্রভৃতি স্কুলগুলিকে তাদের ঐতিহ্য বজায় রাখতে দিলে মহাভারত এমন কী অশুদ্ধ হবে? পাঁচ পুরুষের উপর বাঙালীর ছেলেরা ওইসব স্কুলে পড়ে মানুষ হয়েছে। কেউ অমানুষ হয়েছে বলে তো শুনিনি। কেন তবে তাদের খোল নলচে বদলে দিয়ে ভার্নাকুলার স্কুলে পরিণত করার উদ্যোগ? পুরাতনকে পুরাতনের মতোই থাকতে দিয়ে কি নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা যায় না? সেকালের টোল চতুষ্পাঠী বা মক্তব মাদ্রাসার মতো হিন্দু, হেয়ার যদি ইংরেজী শিক্ষায়তন হয়েই তাদের ঐতিহ্যে সুপ্রতিষ্ঠ থাকে তবে সরকার কেন তাদের গায়ে হস্তক্ষেপ করবেন? না হয় অর্থসাহায্য বন্ধ করে দেবেন। তারাও শিখবে আত্মনির্ভর হতে। তেমন আত্মনির্ভর বিদ্যালয় তো কলকাতায় আরো অনেক আছে। তাদের বেতন অবশ্য বেড়ে যাবে।

ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়, বাংলা-মাধ্যম বিদ্যালয়, মিশ্র ইংরেজী-হিন্দী-মাধ্যম বিদ্যালয় নানা রকম বিদ্যালয়েই আমি নিমন্ত্রিত হয়েছি। বাংলা-মাধ্যম বিদ্যালয়ে যারা পড়ে তারা বাঙালী ভিন্ন আর কারো সঙ্গে মেলামেশা

করে না। আর ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ে যারা পড়ে তারা বাঙালী, পাঞ্জাবী, দক্ষিণী, অসমীয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি সারা ভারতের সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায়। ইংরেজী-হিন্দী মিশ্র মাধ্যমের বেলাও সেই কথা খাটে। পরবর্তী বয়সে তারা যেখানেই যাক বন্ধুবান্ধব সহপাঠী পায়। এমনি করে একটা সর্বভারতীয় মানসিকতার চর্চা হয়। ইংরেজ মিশনারী বিদ্যালয়ে পড়লে বিশ্বচেতনাও অঙ্কুরিত হয়। এখন তো ইংরেজরা আর রাজার জাতি নয়। দাসমানসিকতা জন্মাবে কেন?

যে জগতে আমরা বাস করছি সে জগতে ইংরেজীর মতো বহুল প্রচলিত ভাষা আর একটিও নেই। তা বলে ইংরেজী শিক্ষাকে আবশ্যিক করতে হবে এমন কথা আমি বলব না। যারা চায় না তাদের উপর জোর করে চাপাতে গেলে ফল হবে বিপরীত। কিন্তু যারা চায় তাদের বঞ্চিত করাও ঠিক নয়। মেজরিটির জন্যে মাইনরিটিকে দুর্ভোগ পোহাতে হবে এটা সুবিচার নয়, অবিচার। ধর্মের বেলা তো আমরা এটা মানিনে। তা হলে ভাষার বেলা মানতে যাই কেন? মেজরিটির সুবিধার জন্যে বাংলা-মাধ্যম বা হিন্দী-মাধ্যম বিদ্যালয় যত ইচ্ছা স্থাপন করো কিন্তু ইংরেজী-মাধ্যমের পক্ষপাতী যারা তাদের সংখ্যা যত কম হোক না কেন তাদের জন্যে কয়েকটা বিদ্যালয় থাকতে দাও। আবার এমন লোকও আছে যারা মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী চায় না, কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে ইংরেজী চায় ও গোড়া থেকেই চায়। তাদের জন্যেও কতকগুলো প্রতিষ্ঠান থাকুক। মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে তারাই বেশীর ভাগ। যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উঠতে চায় তারাও তাদেরই পন্থী। আর তারা তো চারদিকে ভুঁই ফুড়ে উঠছে।

মাধ্যম হিসাবে ইংরেজীর পক্ষপাতী রামমোহন প্রভৃতিরাও ছিলেন না। তাঁরা সকলেই চেয়েছিলেন বাংলা পুস্তকের দ্রুত প্রণয়ন। রামমোহন নিজেও তো বাংলা ব্যাকরণ ও ভূগোল লিখেছিলেন। মিশনারীরাও বাংলা-মাধ্যমেই কাজ শুরু করেন সকলের আগে। হিন্দু কলেজেরও আগে। সেটাই স্বাভাবিক পদ্ধতি। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজনমতো লেখা হয়নি। এখনো লেখা হচ্ছে না। শিক্ষণীয় বিষয় আবার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এক বিজ্ঞানেরই এখন শাখাপ্রশাখার অন্ত নেই। আমেরিকার এক একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে একশোটা দেড়শোটা কোর্স। বাংলা কী করে বিশ্ববিদ্যাব সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইংরেজীকে হটাবে? হিন্দীও অপারগ। সরকার অকাতরে টাকা ঢালছেন। কিন্তু পুঁথি দু'চার বছর পরে পুরোনো হয়ে যাচ্ছে। যাকে বলে আউট অভ ডেট। আইনের বেলাও তাই। অর্থনীতির বেলাও তাই। সব দেখেশুনে আমি ইংরেজী-মাধ্যম উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে সমর্থন করি। কিন্তু ঐচ্ছিক ভাবে।

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো যে জগতে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি ও জীবনধারণ করছি সে জগতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্যকভাবে সচেতন হতে শেখানো। সংস্কৃত, আরবী বা ফারসী অতীত সম্বন্ধে ও পরলোক সম্বন্ধে সচেতন করতে পারে, কিন্তু বর্তমান বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নয়,

ইহলোক সম্বন্ধে খুব কম। তাই ওকে সর্বসাধারণের অবশ্য শিক্ষণীয় করা বৃথা। এক্ষেত্রে ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দীর প্রয়োজন আছে, কিন্তু কোন্‌টি কোন্‌ বয়সে শুরু করে কতদিন পর্যন্ত প্রয়োজন সেটা যেমন বিবেচনা করতে হবে, তেমনি কতজনের পক্ষে। ভাষাশিক্ষাই যদি মানুষের অধিকাংশ সময় কেড়ে নেয় তবে ভাষার সাহায্যে যা যা শেখবার কথা সেসব শিখবে কখন বা কতটুকু সময়? ভাষার বোঝা লাঘব করার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন সে নীতি এককথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বহুজন হিতায় সে নীতি সমর্থনযোগ্য। কিন্তু ব্যতিক্রমের জন্যেও তাকে আরো নমনীয় করা উচিত। আমি তিনটি ভাষা প্রাথমিক স্তরে একসঙ্গেই শিখেছি। বাংলা, ওড়িয়া তথা ইংরেজী। তিনটিতেই লিখেছি, পুরস্কার পেয়েছি। হিন্দীও শিখি পাটনায় পড়বার সময় স্বেচ্ছায়। ইংরেজীতে লিখে পুরস্কার হিসেবে চেয়ে নিই প্রেমচন্দ্রের হিন্দী উপন্যাস। হিন্দীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রীতি আযৌবন। তা সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে ইংরেজীকে বিদায় দিয়ে তার শূন্যতা হিন্দী দিয়ে পূরণ করা অন্ধতা ও মূঢ়তা। তা যদি করি আধুনিক যুগ আমাদের ছাড়িয়ে বহুদূর চলে যাবে, আমরা পেছনে পড়ে থাকব।

আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানকে কি বাংলার মাধ্যমে পরিবেশন করা যায় না? যায় বইকি। যে ভাষা বারো কোটি বাংলাভাষীর ভাষা তাতে কী না করা যায়? কিন্তু এপারের বই ওপারে বিকোবে না, ওপারের বই এপারে বিকোবে না। বিজ্ঞানের বই একসঙ্গে একলক্ষ কপি না ছাপলে মেহনৎ পোষাবে না। বছর বছর সংস্করণ না ছাপলে একবছরের বই আরেক বছর পুরোনো হয়ে যাবে। এ তোমার কাব্য নাটক নয় যে দু'হাজার বছরেও চিরন্তন। এ হলো বিজ্ঞান। যার অসংখ্য শাখা। এ হলো অর্থনীতি। যার অসংখ্য প্রয়োগ। এ হলো রাজনীতি। যা বহুরূপীর মতো নিত্য রং বদলায়। আমি প্রতিদিন তিনখানা ইংরেজী সংবাদপত্র পড়ি। তিনখানা বাংলা সংবাদপত্র। ইংরেজীতে যা পাই বাংলায় তার চেয়ে অনেক কম, যদিও দাম সমান। একটু কষ্ট করে ইংরেজীটা ভালো করে শিখলে একই খরচে বা আরো কম খরচে বহুবিদ্য হওয়া যায়। সেইজন্যে ইংরেজীটাই এত লোক এত যত্ন করে পড়ে। শুধু চাকরির জন্যে নয়। চাকরিও ক্রমে ক্রমে হিন্দীনবীশ ও বাংলানবীশদের দখলে চলে যাচ্ছে। সুতরাং খুব বেশী ছেলেকে ইংরেজী শিখিয়ে সাংসারিক লাভের সম্ভাবনা খুব কম। কেন এদের বৃথা আশা দেওয়া? সাংসারিক উন্নতির দিক থেকে বহুজনের পক্ষে বাংলার পরে হিন্দী ও হিন্দীর পরে ইংরেজী। কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের দিক থেকে ইংরেজীই অগ্রগণ্য, বাংলা তার পরে হতে পারত, যদি দুই বাংলাভাষী রাষ্ট্রের ও রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতা থাকত। এখন যা চলছে তা নিষ্ফল প্রতিযোগিতা। কোনো পক্ষেরই লাভ হচ্ছে না। আমরা হাজার চেষ্টা করেও বাংলাদেশ থেকে বই কাগজ আনাতে পারিনে, দাম দিয়েও কিনতে পারিনে। ওঁরা যা কেনেন তা চোরা পথ দিয়ে। ধরা পড়লে বিপদ। সাংস্কৃতিক আত্মহত্যায় এহেন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই।

আমি হিন্দী প্রেমিকদের দলেই ছিলুম, কিন্তু হিন্দীকে তো বাংলাদেশ একেবারেই বরদাস্ত করবে না, যেমন উর্দুকে বরদাস্ত করেনি। বাঙালীতে বাঙালীতে চিরবিচ্ছেদ ঘটে যাবে। তাই বাংলার উপরে আরো বেশী জোর দিতে চাই। কিন্তু জোর দিয়ে হবে কী? ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যোগসূত্র তো বাংলা নয়, হিন্দী। কেন্দ্রের সঙ্গেও যোগসূত্র হিন্দী। সব দিক বিবেচনা করে আমি ইংরেজীকে হটাতে চাইনে। কেউ বলবেন বুর্জোয়া। বলুন। কিন্তু ইংরেজীওয়ালারাও তো সারা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ।

বাংলাকে আমি সর্বসাধারণের অবশ্যশিক্ষণীয় মনে করি, কিন্তু সংস্কৃতকে নয়। তা যদি করতে যাই তো আরবী ফারসীকেও তার সঙ্গে একসারিতে বসাতে হবে। সেটা হবে বাঙালীতে বাঙালীতে চিরবিচ্ছেদের নীতি। এ লাইনে যাঁরা চিন্তা করেন আমি তাঁদের একজন নই। আমি হিন্দু মুসলমানের মিলনে বিশ্বাসী। অথচ সংস্কৃত শিক্ষারও পক্ষপাতী। তা হলে দাঁড়ায় এই যে সংস্কৃতকে ঐচ্ছিক বিষয় করতে হবে। যারা চায় তারা পড়তে পারবে, তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থাও থাকবে। সংস্কৃতির দায়িত্ব যাঁরা কাঁধে নিতে চান তাঁদের সংখ্যা কোটি কোটিও নয় লক্ষ লক্ষও নয়। তাঁরা স্বেচ্ছায় সংস্কৃত শিখবেন ও সংস্কৃত শিক্ষার বহমান ধারাটিকে বহমান রাখবেন। সংস্কৃত কোনো কালেই কারো মাতৃদুগ্ধ ছিল না। সংস্কৃত নাটকের পাত্রীদের ভাষা ছিল প্রাকৃত। আর তারাই তো মাতৃজাতি। পাত্ররাও যে সবাই সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতেন তা নয়। বিদূষকরা তো প্রাকৃতভাষী। 'সংস্কৃত' এই নামকরণ থেকেই বোঝা যায় সেটা প্রাকৃত ভাষারই শুদ্ধ রূপ। মার্জিত রূপ। প্রাকৃত না থাকলে কি সংস্কৃত থাকত? প্রাকৃত বিবর্তিত হতে হতে বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতি, ওড়িয়া প্রভৃতিতে পরিণত হয়েছে। তখনকার দিনের সেই প্রাকৃত আর নেই। তাই তার সংস্কৃত রূপও অচলিত হয়ে গেছে। বাংলা নাটকের পাত্রদের মুখে সংস্কৃত ভাষা বসিয়ে দিয়ে দেখুন না, কেমন বিসদৃশ শোনায়। এখন আমরা সংস্কৃত শিখব ভাষাকে মার্জিত করার জন্যে নয়। সেটা করতে গেলে চলতি ভাষার সঙ্গে সাধুভাষার বিচ্ছেদ আবার নতুন করে ঘটবে। এখন সংস্কৃত শিখব প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের বহমানতা রক্ষা করতে।

তেমনি ইংরেজীকে রাখব স্বকালের সঙ্গে স্বদেশের যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে। দেশটা এখন স্বতন্ত্র একটা দ্বীপ নয়। বিশ্বের আর সব দেশের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। ইংরেজী এখন সারা দুনিয়ার অধিকাংশ দেশের ভাববিনিময়ের ভাষা। যাঁদের উপর ভাববিনিময়ের ভার বর্তেছে তাঁদের ইংরেজী শিক্ষার পথ সুগম করতেই হবে। তাঁরা একটা সুবিধাভোগী সম্প্রদায় বলে তাঁদের ভাব-ভাণ্ডারকে রিক্ত করা মানে দেশের সংস্কৃতিকেই রিক্ত করা। এতে আমাদের উত্তরপুরুষদেরই বঞ্চিত করা হবে। তা বলে সর্বসাধারণকে ইংরেজী শিখতে বাধ্য করতে হবে, এটাও আমার বিচারে ঠিক নয়। আমার মতে ইংরেজীকেও

ঐচ্ছিক করতে হবে। যারা চাইবে তারা ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ পাবে। যারা চাইবে না তারা পাবে না। দেশে ইংরেজীর আদর এত কমে গেছে যে ইংরেজী শিখতে চাইলেও শেখানোর জন্যে শিক্ষক নেই। যে ক'জন আছেন তাঁদের উপরে দেশসুদ্ধ শিশুর ইংরেজী শিক্ষার ভার দেওয়া যেন সরস্বতী পূজার দিন হাজার হাজার প্রতিমার পূজার ভার মুষ্টিমেয় পুরোহিতদের উপর দেওয়া। আমার মতামত জানতে যাঁরা আসেন তাঁদের আমি বলি, ইংরেজীকে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তুলে দেওয়া ভুল নয়, কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শ্রেণীগুলির থেকে উঠিয়ে দেওয়া ভুল। সেখানে কাউকে বাধ্য করা উচিত নয়, কাউকে বাধা দেওয়াও উচিত নয়।

মাধ্যমকেও আমি ঐচ্ছিক করতে চাই। যার যেটা পছন্দ। যার যেটা সাধ্য। কম্পালসরি ইংলিশ কথাটাই অনর্থের মূল। বিশেষণটা বদলে দিলে লোকের আপত্তির অর্ধেক কারণ চলে যাবে। তবে কতকলোক আছে যারা মনে করে ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই শাসক, শোষক, সুবিধাভোগী ও সুবিধাবাদী। তাদের সঙ্গে তর্ক বৃথা। আবার তারা স্বখাত সলিলে আত্মনিমজ্জনের জন্যে খাল কাটছে। নিজেরাই বাঙালী বলে যারা পরিচয় দেয় তাদের সবাইকে ডোবাবে। এবার সংস্কৃতিগত অর্থে। কালের সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারলে কালই তাদের পেছনে ফেলে চলবে। ইতিমধ্যেই মননশীল সাহিত্যের আকাল দেখে পাঠকেরা শঙ্কিত।

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উপনীত করে দেওয়াই ছিল ইংরেজদের ঐতিহাসিক ভূমিকা। তাদের ভূমিকা তারা রেখে গেছে ভারতীয়দের জন্যে। ভূমিকায় নেমে আমরা দেখছি মধ্যযুগে ফিরে যাবার জন্যে আমাদের অনেকের প্রাণভরা আকুলতা। দেশের অতীতের থেকে বা ঐতিহ্যের থেকে বিচ্ছেদ আমি সমর্থন করিনে, কখনো করিনি। কিন্তু দেশটাকে যদি অতীতের যাদুঘর করে তুলি তা হলে বিশ্ববাসী ভাববে আমাদের আর নতুন কিছু দেবার নেই। আমরা অতীতের জাবর কেটেই বেঁচে আছি ও বেঁচে থাকব। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে বসলেই অতীতের মায়া কাটাতে হয়। পেছনে ফিরে তাকাতে তাকাতে কেউ সামনে এগিয়ে যেতে পারে না। হোঁচট খেয়ে পড়বেই। যদি খানাখন্দ থাকে হাত পা ভাঙবেই। যদি ডোবা থাকে ডুবে মরবেই। চীনদেশের মতো অতীতভক্ত দেশও বিপ্লবের পরে দেখছে বিপ্লবই যথেষ্ট নয়, তাকে সর্বতোভাবে আধুনিক হতে হবে। কিন্তু গুরুতে আর গোরুতে মিলে ভারতকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। বিপ্লবের পরেও এর জের চলতে থাকবে! যাদের উপর ভরসা করে বিপ্লব হবে তাদের গুরুদেব ও গোমাতাই বিপ্লবীদের মার্কস, এঙ্গেলস ভুলিয়ে দেবেন। বিপ্লব মানে নিছক রক্তপাত নয়, ত্বরান্বিত বিবর্তন। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজার ক্রমবর্ধমান আড়ম্বরে আমি অভিভূত। আমার শৈশবে আমি এত ধূমধাম দেখিনি। যোধপুর পার্কে শীতলা মূর্তি ও তাঁর বাহনের মূর্তিকে সেখানকার দীঘির জলে বিসর্জনের উদ্যোগ দেখে বিস্মিত হয়েছি। যোধপুর পার্কেই রয়েছে শীতলা মন্দির।

সেখানে বিলেত-ফের্তা, আমেরিকা-ফের্তা তো ঘরে ঘরে, সেখানে একধার থেকে ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয় ব্যাঙের ছাতার মতো দিন দিন গজিয়ে উঠছে।

ভাববিপ্লব না হলে সত্যিকার বিপ্লব হতে পারে না। হলে তার পরের অধ্যায় হচ্ছে ভাববিপ্লব। আধুনিকতার সঙ্গে সংস্রব না রেখে ভাববিপ্লব ঘটাতে পারা যায় না। তার আগে আধুনিকতার সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হয়। সে কাজটি তো জাতীয়তাবাদীরাই পারলেন না। সাম্যবাদীরাও কি পারবেন? কোথায় তার পূর্বাভাষ? ওঁরা বলছেন হিন্দী, এঁরা বলছেন বাংলা। কিন্তু এসব সাহিত্যে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান বা আধুনিক দর্শন কোথায়? মৌলিক তো দূরের কথা, অনুবাদগ্রন্থই বা ক'খানা? সংবাদপত্র খুললেই চোখে পড়বে জ্যোতিষীগণনা। কোন্ মাসে জন্মালে কী রকম ভাগ্য। দিনটা কেমন যাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেত এখনো বিবাহের নির্বন্ধ নির্ণয় করে। অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর এটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে সাক্ষর হয়ে ওরাও এই সব বুজরুকি শিখবে, ওদের গুরুবাদ আরো দৃঢ় হবে।

এখনো ভারতের ইংরেজী সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রগুলিই আধুনিকতার মান রেখে চলছে। বিপুলসংখ্যক পাঠক না থাকলে এগুলিও একে একে নিবে যাবে। প্রকাশের খরচ পোষাবে না। ইংরেজীর শূন্যতা পূরণ করতে পারে এমন একখানি হিন্দী, বাংলা, মরাঠী, তামিল পত্রিকার নাম আমি জানিনে। অথচ কিছুদিন আগেও ছিল রামানন্দ সম্পাদিত 'প্রবাসী' আর সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'পরিচয়'। কোনোমতে টিকে আছে কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিন। বিজ্ঞাপনের অভাবে তারাও উঠে যাবে। দেশে যদি আধুনিকতার প্রয়োজন থাকে তবে ইংরেজীরও প্রয়োজন থাকবে। সাময়িক ভাবে নয়, পাকাপাকি ভাবে। যেখানে অধিকাংশ লোক পড়ে আছে মধ্যযুগে আর শিক্ষিত শ্রেণীও ভিতরে ভিতরে মধ্যযুগের সংস্কারবদ্ধ সেখানে ইংরেজীকে ঐচ্ছিকভাবে আরো দুশো বছর ধরে রাখতে হবে। সমাজ ব্যবস্থার ওলটপালট সত্ত্বেও রামমোহন রবীন্দ্রনাথের ধারা যেন অব্যাহত থাকে।

ভারতে ইংরেজীর ভবিষ্যৎ

আমার মাতৃভাষা বাংলা, ধাত্রীভাষা শবরীর মুখের ওড়িয়া, জন্মমুহূর্তের লেডী ডাক্তারের ভাষা ইংরেজী, বাড়ীর বাগানের বেড়ার ওপারে যাঁর বাস তিনি উর্দুভাষী বিহারী মুসলমান, বাড়ীতে প্রায়ই যিনি আসেন রাম নাম করে ভিক্ষা চান তিনি হিন্দীভাষী বৈরাগী, বাড়ীর ঝি চাকর রাঁধুনী বামুন ওড়িয়া, রাঁধুনী আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলে। যাদের সঙ্গে আমি খেলাধূলা করেছি তাদের কেউ কথা বলে বাংলায়, কেউ ওড়িয়ায়, কেউ হিন্দীতে। ভালোবাসাবাসিও এক জাতের খেলা। তার কোনো ভাষা নেই। কিংবা মুখের

ভাষা হরেক হলেও বুকের ভাষা এক। মুখের ভাষাই বা এক নয় কেন? যদি চুম্বনকে বলি মুখের ভাষা। এতে বর্ণভেদ বা ধর্মভেদ নেই। এ ভাষা সব দেশের কমন ল্যাঙ্গুয়েজ।

এইচ জি ওয়েলস প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বলেছিলেন, "তোমরা সভ্যতা রক্ষা করবে বলে অস্ত্র ধরেছ, আমাকেও চাইছ যুদ্ধে নামাতে। আমিই সেই সভ্যতা যার জন্যে তোমরা যুদ্ধ করছ।" তাঁর অনুকরণে আমিও তো বলতে পারি, "আমিই সেই ভারতবর্ষ যাকে ধর্মের নামে তোমরা দ্বিখণ্ড করেছ, এখন দেখছি ভাষার নামে সাতখণ্ড করতে যাচ্ছ। এর পরে আসছে আদিবাসী আর হরিজনদের এমনভাবে কোণঠাসা করা যাতে তারাও আত্মরক্ষার জন্যে দাবী করে আদিবাসীস্থান ও হরিজনিস্থান। বেঁচে থাকলে আমাকে আরেক প্রস্থ বলকান রাষ্ট্র চাক্ষুষ করতে হবে। আমার জীবদ্দশায় তার সম্ভাবনা ক্ষীণ। বয়স হলো সাতাত্তর। কিন্তু কী রেখে যাচ্ছি আমি উত্তর পুরুষের জন্যে? অন্তহীন গৃহবিবাদ? কখনো ধর্মের নামে, কখনো ভাষার নামে, কখনো বর্ণের নামে, কখনো ইংরেজীতে যাকে বলে 'রেস' সেই রেসের নামে। দেশের নামে যুদ্ধ বা সত্যাগ্রহ অবশ্য পূর্বেও হয়েছে, পরেও হয়েছে। আমি যুদ্ধবিরোধী। আবার সত্যাগ্রহ যদি কথায় কথায় হয়, এমন লোকের দ্বারা যারা বিবেকচালিত নয় স্বার্থচালিত, আমি তাকে সত্যাগ্রহ বলিনে। গান্ধীবাদী বলে পরিচিত এমন মুনিরও মতিভ্রম দেখে আমি অবাক হচ্ছি।

যে ভারতবর্ষে আমি জন্মেছি তার কোনোখানেই আমি বিদেশী বা বহিরাগত হতে পারিনে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পর সদ্যমুক্ত 'বাংলাদেশ' দেখতে গিয়ে শুনি, "ইনি একজন ইণ্ডিয়ান" বা "ইনি একজন ফরেনার"। তবু তো তখন আমি ছিলুম ওঁদেরি মতো একজন 'বাঙালী'। এবার গেলে শুনব, "ইনি আমাদের মতো নন। ইনি হলেন বাঙালী আর আমরা হলুম বাংলাদেশী। কোথাও কোনো মিল নেই।"

ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ীতে আমার কাকাদের এক বন্ধু আসতেন, তাঁকেও আমরা আমাদের একজন কাকা বলেই জানতুম, তাঁর সঙ্গে বসে যেসব ফোটো তোলানো হয়েছিল তার একটি এখনো আছে, তাতে দেখি তাঁর কোলে বসেছে আমার বোন আর পাশের চেয়ারে আমি। ওর চেয়ে পুরানো ফোটো খুঁজে পাইনি। বাইরে তাঁর পরিচয় ছিল পাঠান মাস্টার। তাঁর বিবি উর্দু-ভাষিণী মুসলমান আর তিনি খুলনা জেলার বাঙালী মুসলমান। পদবী খোন্দকার। নাম ভুলে গেছি। বাংলাদেশের মন্ত্রীদের একজনের পদবী খোন্দকার শুনে আমার ছোটকাকা জানতে চান ইনিই কি আমাদের সেই পাঠান মাস্টার? তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বহুপূর্বেই ছিন্ন হয়েছিল। তিনি তখনো জীবিত কি না জানতুম না। শুনেছিলুম তিনি খুলনায় ফিরে গিয়ে মোক্তারি করতেন। ওড়িশায় মুসলমান মাত্রই পাঠান। যারা সদ্য দীক্ষিত হিন্দুসন্তান তারাও।

বাঙালী ওড়িয়া ভেদবুদ্ধি আমাদের বাড়ীতে ছিল না। হিন্দু মুসলমান

ভেদবুদ্ধি থাকলে আমার ঠাকুমা কি মানত করতেন যে মহরমের দিন আমাকে মুসলমানদের সঙ্গে লাঠি খেলতে হবে? মুসলমান ফকির আসতেন সত্যপীরের সিন্নি দিতে। আমরা মাথায় ছুঁইয়ে তার পরে খেতুম। যিনি সত্যনারায়ণ তিনিই সত্যপীর। বাবার বন্ধু আতাহার মিঞা আসতেন হালুয়া হাতে করে। আমরা তো হালুয়া পেলে তক্ষুনি শেষ করতুম। কিন্তু গুরুজনদের মধ্যে আহার নিয়ে বাছবিচার ছিল। কিন্তু সেটা কি শুধু মুসলমান খ্রীস্টানের বেলা? এই বাছবিচারের মূল কারণ আমি পরে অনেক দেখে অনেক শুনে জেনেছি যে ওরা গোরু খায়, আমরা গোরুকে দেবী বলে পুজো করি। কার কী ধর্মবিশ্বাস তা নিয়ে হিন্দুরা মাথা ঘামায় না। অনায়াসেই বলে, যত মত তত পথ। কিন্তু কে কী খায় তা নিয়ে হিন্দুরা বিশেষ উত্তেজিত। অধিকাংশ দাঙ্গার হেতু গোহত্যা। মুসলমানদের যেমন কয়েকটি ডগমা বা আপ্তবাক্য আছে, হিন্দুদের তেমন কিছু নেই। ধর্মমত আলাদা বলে হিন্দুরা মুসলমানদের কোতল করবে না, কিন্তু গোমাতার প্রাণরক্ষার জন্যে তারাও প্রাণ নেবে ও দেবে।

গোমাতার মতো দেবমন্দিরও হিন্দুদের চোখে পবিত্র। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে গেলে দেখি প্রবেশদ্বারে একটি নোটিস আঁটা রয়েছে। "এখানে খ্রীস্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম ও আর্যসমাজীদের প্রবেশ নিষেধ।" এই নিষিদ্ধ তালিকায় শিখ ছিল কি না মনে পড়ে না। আর যেটা ছিল সেটা অলিখিত হলেও সমান সত্য। সেটা ধর্মে হিন্দু হলেও জাতে 'অস্পৃশ্য'। ম্লেচ্ছ, যবন, অস্পৃশ্য, ধর্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক সবাই সমান অপবিত্র। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, দয়ানন্দ থেকে লাজপৎ রায়। অথচ যেসব শিল্পবিভব আমাদের মন্দিরগুলিতে নিহিত সেসব বাইরে থেকে দৃষ্টিগোচর নয়। যেসব আমাদের সকলের সাধারণ উত্তরাধিকার বা হেরিটেজ তার থেকে একজন ভারতীয়কেও বঞ্চিত করা অন্যায়। এত বড়ো একটা অন্যায়ের উপর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বা সাম্প্রদায়িক মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আমরা যদি এক নেশন হয়ে থাকি তো জগন্নাথের মন্দির আজ অবধি উন্মুক্ত হয়নি কেন? না, হরিজনরাও সেখানে প্রবেশ পায় না। মহাত্মা গান্ধী সেখানে যেতেন না। তিনিও নিজেকে মনে করতেন হরিজনদের একজন। এ প্রথা তো আরো অনেক মন্দিরে আছে অন্যত্র ও সর্বত্র। হরিজনকে বৈষ্ণব দীক্ষা দিলেও সে হরিজন। মার্কিন বৈষ্ণব বা রামকৃষ্ণ শিষ্যরাও অপবিত্র।

আমার বাবা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান সবাই ভারতীয়। তিনি বলতেন ইংরেজরা যদি এই দেশেই থেকে যেত তবে তারাও হতো ভারতীয়। যে দেশে এতগুলো জাত সেদেশে আরো একটা জাত থাকলে আমাদের তাতে আপত্তির কী কারণ? মুশকিল হচ্ছে এইখানে যে ওরা হতে চায় রাজার জাত। আর সকলের চেয়ে বড়ো। ওরা মনে করে আর সকলে ছোট। সেইজন্যেই তো ঝগড়া। ইংরেজ চলে যাক এটা তিনি চাননি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তাঁর মতো সবাই ছিলেন ইংরেজদের পক্ষে, জার্মানদের

বিপক্ষে। ইংরেজের ভাষা ইংরেজীর উপর ছিল সত্যিকার ভালোবাসা। পাঠ্যপুস্তক না হয় বাধ্য হয়ে পড়তে হতো, কিন্তু তার বাইরেও যে ইংরেজী সাহিত্যের, ইতিহাসের, রাজনীতির জগৎ ছিল সে জগতের আলো আর বাতাস আমরা স্বেচ্ছায় ও সাদরে বরণ করে নিয়েছিলুম। সেটাও আমাদের বংশগত উত্তরাধিকার। একদা আমরা জমিদার ছিলুম, ব্রিটিশ আমলের নয়, মোগল আমলের। তাই ফারসীও ছিল আমাদের বংশগত উত্তরাধিকার, তার সামান্য নিদর্শন অবশিষ্ট ছিল 'গোলে বকাউলি' এ 'চাহার দরবেশ'। প্রথমটা ঠাকুমার মুখে শুনেছি, রামায়ণ মহাভারতের মতো। দ্বিতীয়টা চোখে দেখেছি। কেউ কখনো বলতেন না যে ওটা ম্লেচ্ছদের, সেটা যবনদের। ইংরেজী বাইবেল ছিল, পড়েছি। গির্জাতেও গেছি। নিয়ে গেছেন আমার ছোটকাকা। সেখানে আমি ভারতীয় খ্রীস্টানদের এক সম্মেলনে উপস্থিতও থেকেছি। স্বকর্ণে শুনেছি যাঁর মুখে তিনি সর্বজনমান্য উৎকলনেতা মধুসূদন দাস, "আই অ্যাম এভরি ইঞ্চ অ্যান ইন্ডিয়ান।" ওড়িয়াভাষীদের জন্যে অখণ্ড ওড়িশা চাই এ দাবীর প্রধান প্রবক্তাও তিনি। তিনি বিবাহ করেননি, তাঁর এক বাঙালী খ্রীস্টান বন্ধুকন্যাকে পালিতা কন্যা করেছিলেন। সেইসূত্রে তিনি বাংলাতেও অভ্যস্ত ছিলেন। বিহার ওড়িশার মন্ত্রীপদ থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি পাটনাতেই ব্যারিস্টারি প্র্যাকটিস করেন। একদিন ডেকে পাঠান ওড়িশার ছাত্রদের। আমিও তাদের একজন। কৌতুকের কথা আমরা তাঁর সঙ্গে ওড়িয়াতে কথা বলতে গেলে তিনি বাংলায় কথা বলেন। আমাদের তিনি অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা শোনালেন, কিন্তু সমস্তক্ষণ বাংলায়। অথচ তিনি ওড়িশায় থাকতে ওড়িয়াতেই কথা বলতেন।

আসল ব্যাপারটা এই যে সেকালের ওড়িয়াদের সঙ্গে সেকালের বাঙালীদের নিত্য যোগাযোগ ছিল সামাজিক, ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক কারণে। আমাদের বাড়ীতেই গোপালের সামনে কীর্তন গান হতো বাংলায়। গাইত যারা তারা প্রধানত ওড়িয়া। একদিন এক ওড়িয়া চাষী কি কারিগর শ্রেণীর লোক ছুটে এসে বলে, "কীর্তন হচ্ছে শুনে আমি প্রফুল্লিতবাবুর বাড়ী থেকে ছুটে আসছি।" ওড়িয়াতেই বলে। সেই যে প্রফুল্লিতবাবু তিনি আর কেউ নন, স্বনামধন্য প্রফুল্লকুমার সরকার। তিনিও তখন ঢেঙ্কানাল দেশীয় রাজ্যের রাজকর্মচারী ছিলেন। পরে হন 'আনন্দবাজারে'র নবপর্যায়ের স্তম্ভ, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। পুরাতন পর্যায়ের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'ও আমি আমাদের বাড়ীতে দেখেছি। রাজকর্মের পরে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা যাঁরা পার্বতীচরণ দাসের বাড়ীতে মিলিত হয়ে বৈষ্ণবধর্ম চর্চা করতেন তাঁদের একজন তো গৃহকর্তা স্বয়ং। তিনি ওড়িয়া। আর তিনজন প্রফুল্লকুমার সরকার, রাখালদাস রায় ও আমার বাবা নিমাইচরণ রায়। এঁরা বাঙালী। পার্বতীবাবু পরে বৈরাগী হয়ে যান। তখন তাঁর নাম হয় বাবাজী পদ্মচরণ দাস। আমাদের বাড়ী এসে বাবার সঙ্গে বসে বাংলা থেকে ওড়িয়ায় অনুবাদ করতেন 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত'। সে বই তাঁরা নিজেদের খরচে ছাপিয়েও

ছিলেন। তাতে মূলে বাংলাও ছিল ওড়িয়া লিপিতে। প্রচুর ওড়িয়া বই ছিল আমাদের বাড়ীতে। তেমনি প্রচুর বাংলা বই ও ইংরেজী বই। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম ছিল নিচের ক্লাসগুলিতে ওড়িয়া, উপরের ক্লাসগুলিতে ইংরেজী। উপরের ক্লাসে যাবার আগেই আমি লাইব্রেরী থেকে ধার নিয়ে এন্তার ইংরেজী বই পড়েছিলুম, আর স্কুলের ম্যাগাজিন রুমের ভার পেয়ে খাস বিলেতের মাসিক পত্র ও সাপ্তাহিক পত্র। বাবা নিতেন 'বেঙ্গলী'। আমি নিতে আরম্ভ করি 'এপিফেনী'। পরে 'টেলিগ্রাফ'। আর যতদূর মনে পড়ে 'প্রোগ্রেস'। ধার করে পড়ি 'মডার্ন রিভিউ'। চেয়েচিন্তে পড়ি বহু ইংরেজী পত্রিকা।

ইংরেজীও আমার অন্যতম উত্তরাধিকার, যাকে বলে হেরিটেজ। তবে এটাও আমার বেশী বয়সের সিদ্ধান্ত যে একে বাংলা বা ওড়িয়ার মতো আবশ্যিক করা উচিত নয়। সার্বজনীন করা উচিত নয়। আমার ছেলেবেলার সমবয়সীরা কেউ পাঠ্যপুস্তকের চৌহদ্দির বাইরে যেত না। প্রদেশের চৌহদ্দির বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হতো না। আর আমি তো একই দিনে সমগ্র পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। আমি বিশ্বনাগরিক। আট বছর বয়সে বিদ্যালয়ের শিক্ষা শুরু করেই আমি হাতের কাছে যখন যা পেয়েছি তখন তা পড়েছি। শুধু যে বাংলা আর ওড়িয়া তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী। ইংরেজীকে আমি পর ভাবিনি। ইংরেজকেও না। তবে তার সঙ্গে প্রভুভৃত্য সম্পর্ক আমি বা আমার বাবাকাকারা কেউ মেনে নিইনি।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই বাবা স্বদেশী বস্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। মহাযুদ্ধের সময় তিনি একদিন এক তাঁতীকে নিয়ে এসে বলেন, "এরা খেতে না পেয়ে মারা যাচ্ছে। এর হাতে বোনা কাপড় কিনে এদের বাঁচাতে হবে।" গান্ধী আন্দোলনের সময় থেকে তিনি শুধু হাতে বোনা নয়, হাতে কাটা সুতো দিয়ে বোনা কাপড় অর্থাৎ খদ্দর পরতে শুরু করেন। আমরাও তাই করি। বিলেতে গিয়েও আমি খদ্দর পরেছি। মাঝখানে কিছুদিন গান্ধীজীর অর্থনীতির উপর বিশ্বাস হারিয়ে খদ্দর ছেড়েছি। পরে বাবার কথা মনে পড়ে; "দেশের কোটি কোটি গ্রামবাসী কারিগরদের তুমি বাঁচাবে কী করে? শহরের কলকারখানার কাজ দিয়ে? সেটার চেয়ে এটাই বরং সম্ভবপর।" আমারও ক্রমে ক্রমে প্রত্যয় হয় যে কোটি কোটি মানুষকে প্রথমে বেকার করে তার পরে কল-কারখানায় কাজ যোগানো চারটিখানি কথা নয়। যেসব দেশে এটা সম্ভব হয়েছে সেসব দেশ অন্য দেশ থেকে সস্তায় কাঁচামাল আমদানী করে ও সেসব দেশে সস্তায় তৈরি মাল রপ্তানী করে। সুতরাং সাম্রাজ্য তাদের একান্ত আবশ্যক। তার জন্যে নিজেদের প্রতিযোগী দেশগুলির সঙ্গে যুদ্ধ না করে তাদের গতি নেই, আর সাম্রাজ্যের প্রজাদের বিদ্রোহ দমন না করেও তাদের উপায় নেই। আমিও তাদের পাপের ভাগী। যত শীগগির পারি চাকরি ছেড়ে দেওয়াই শুভবুদ্ধি।

অথচ মনেপ্রাণে স্বদেশী হলেও বাবা মানতেন না বিলিতী কাপড়ের মতো

ইংরেজী বিদ্যাও বর্জন করতে হবে। ইংরেজী বিদ্যা হলো আমাদের আধুনিক সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। একেই অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের বিভিন্ন অবিস্মরণীয় কীর্তি। মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ পড়ে ক'জন বুঝবে, যারা কেবল বৈষ্ণব পদাবলী বা মঙ্গলকাব্যই পড়েছে? আধুনিক বাঙালী কি কেবল সেকালের বাঙালীরই উত্তরাধিকারী? সে কি রামমোহন, ডিরোজিও, তরু দত্ত, অরবিন্দ, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ পূর্বপুরুষদের উত্তরপুরুষ নয়? এঁরা সবাই লিখেছেন ইংরেজীতে। এঁদের লেখা পড়বে কে, যদি বাঙালীই না পড়ে? সারা ভারতে প্রত্যেকটি সাহিত্যে নবজীবন সঞ্চার করেছে ইংরেজী বিদ্যা। প্রত্যেকটি রাজ্যের অগ্রগণ্য মনীষীরা যা ভেবেছেন ও যা লিখেছেন তা জানতে হলে তাঁদের ইংরেজী রচনা বা তাঁদের রচনার ইংরেজী অনুবাদ না পড়ে কি কেউ বলতে পারেন যে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির, এমন কি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত? কুমারস্বামীর বই না পড়ে কেউ কি বলতে পারেন যে তিনি ভারতীয় চিত্রকলা বা স্থাপত্য কী তা জানেন ও বোঝেন? প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলা বা সঙ্গীতকলা সম্বন্ধে বিদেশীরাও লিখেছেন। ইংরেজী না জানলে সেসব জানবার একমাত্র উপায় তো সংস্কৃত জানা। সংস্কৃত জানলেও সেসব বিষয়ে মুদ্রিত গ্রন্থ অপ্রাপ্য। নানা জায়গায় ঘুরে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি খুঁজতে হবে। বেদ বলুন, রামায়ণ মহাভারত বলুন, দর্শনশাস্ত্র বলুন এসব বিষয়ের প্রামাণিক গ্রন্থ সংস্কৃত জানা না থাকলে ইংরেজীর সাহায্যেই পড়তে হয়। সংস্কৃত জ্ঞানও একটি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ গণ্ডীর পণ্ডিতজনের আয়ত্ত। আমার বাবা সংস্কৃত জানলেও ইংরেজী জানতেন তার চেয়ে বেশী। স্কুলের পড়া শেষ করার সুযোগ পাননি। বাপ মা ভাই বোনের মুখ চেয়ে আঠারো বছর বয়সে চাকরি নেন, কিন্তু ইংরেজী চর্চা অব্যাহত রাখেন। এমনি আমাদের সকলের ঘরে ঘরে। এককথায় বলতে গেলে ইংরেজী আমাদের কেবলমাত্র জীবিকার বাহন নয়, সংস্কৃতিরও বাহন। যেমন সংস্কৃত। যেমন উর্দুর মূলে ফারসী। আর পাঁচটা বিদেশী ভাষার সঙ্গে এর তুলনা হয় না। আর কোন্ বিদেশী ভাষা এতদিন ধরে এমন বহুল প্রচলিত? আর কোন্ বিদেশী ভাষায় আমাদের মনীষীদের চিন্তা লিপিবদ্ধ হয়ে বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়েছে? বিবেকানন্দের লেখা, গান্ধীর লেখা টলস্টয় পড়েছিলেন আর কোন্ ভাষায়? রবীন্দ্রনাথের লেখা নোবেল প্রাইজ পায় আর কোন্ ভাষার মাধ্যমে? বাংলার বাইরেই বা তাঁকে চিনত কে? সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে চিনত কে? রামমোহনের যুগ থেকেই বা বাঙালী মনীষীদের চিনত কোন্ অবাঙালী ও কোন্ অভারতীয়? আর আমরাও কি সরোজিনী নাইডুকে, তরু দত্তকে, অরবিন্দকে চিনতুম? কবি হিসাবে?

ইংরেজীকে অস্বীকার করা মানে নিজেদেরই পূর্বসূরীদের অস্বীকার করা, তাঁদের সঙ্গে পরম্পরা ছিন্ন করা। ইংরেজের সঙ্গেও কি সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে? তা হলে কমনওয়েলথে আছি কেন? পাঁচ লক্ষ বাংলাদেশী ও আধ

লক্ষ বাঙালী কদ্দিন সেদেশে টিকবে যদি কমনওয়েলথের সঙ্গে ভারতের তথা বাংলাদেশের সম্পর্ক ছিন্ন হয়? ওদের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে অন্যতম অভিযোগ ওদের অনেকেই ইংরেজী ভালো জানে না। কেউ কেউ তো আদৌ জানে না। তা হলে কি ইংরেজদেরই বাংলা শিখতে হবে? কিসের দায়ে? ইংরেজীর সাহায্যে ভারতীয়রা একদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রবেশ পেয়েছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের স্বার্থে তাদের ক্রমে ক্রমে বিতাড়িত হতে হয়েছে। বিতাড়িত হয়ে তারা আশ্রয় নিয়েছে সেই ব্রিটেনে। স্বদেশে ফিরে আসতে চায়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায়দের স্বার্থে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তবু দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করেনি। শত অপমান সত্ত্বেও সম্পত্তি আঁকড়ে পড়ে আছে। এই ভারতীয়রাও এক অর্থে সাম্রাজ্যবাদী না হোক উপনিবেশবাদী। ইংরেজরা তো ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেনি, ভারতীয়রা যা করেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে, ফিজিতে, মরিশাসে। সেসব দেশে তারাও মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছে। স্থানীয় অধিবাসীদের স্বার্থে ভাগ বসিয়েছে। তা হলে কি এদের দেশে ফিরিয়ে আনাই সুবুদ্ধি?

ইংরেজকে হটিয়েছি বলে ইংরেজীকেও হটাব এটা সুবুদ্ধি নয়, দুর্বুদ্ধি। এমন কথা আমার বাবা কোনো দিন বলেননি। তিনি তো বলেছিলেন যে ইংরেজরাও এদেশে আলাদা একটি জাত হয়ে থাক, যেমন মুসলমানরা রয়েছে। উর্দু যদি থাকে, কালক্রমে হিন্দুদেরও ভাষা হয়, ইংরেজীও সেই নজীরে থাকবে না কেন? ভারতীয়দের অন্যতম ভাষা হলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে কেন? আমি তো যোধপুর পার্কে চোদ্দ বছর বসবাস করে নিজের কানেই শুনেছি ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের ছেলেমেয়েরা ইংরেজীতেই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে, বাংলাতেও নয়, হিন্দীতেও নয়। যদিও বাংলা হলো স্থানীয় ভাষা ও হিন্দী হলো কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র সংবিধান-সম্মত সরকারী ভাষা। বলা যেতে পারে একমাত্র বৈধ পত্নী। কার্যত দেখা যাচ্ছে সাময়িকভাবে রক্ষিতা উপপত্নীরও মর্যাদা কম হলেও প্রভাব কম নয়। শান্তিনিকেতনের সংস্কৃত অধ্যাপকের মুখে শুনেছি সংস্কৃত অধ্যাপকদের সম্মেলনে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তার ভাষা ছিল সংস্কৃতও নয়, হিন্দীও নয়, ইংরেজী। আন্তর্ভারতীয় যাবতীয় সম্মেলনে হিন্দী নয়, ইংরেজীই সাধারণ যোগাযোগের ভাষা। রাজনীতিকরাও সভাসমিতিতে একবার বলেন হিন্দীতে, একবার ইংরেজীতে। দুটো ভাষারই বন্ধনীভুক্ত সহ-অবস্থান কংগ্রেসে, কমিউনিস্ট পার্টিতে, জনতা পার্টিতে, ভারতীয় জনতা পার্টিতে। লোহিয়াপন্থীরাও ব্যতিক্রম নন। কলকারখানায়, বহির্বাণিজ্যের তথা অন্তর্বাণিজ্যে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে ইংরেজীরই উচ্চতর স্থান। নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতাগুলিতে হিন্দী তথা বাংলা প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষাকে বিকল্প হিসাবে স্থান দিলেও অধিকাংশ প্রতিযোগীই পছন্দ করে ইংরেজী। প্রতিযোগিতায় যে যত উপরে উঠবে তারই তত কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। নিশ্চিতকে ছেড়ে অনিশ্চিতের ঝুঁকি নেবে কেন? সে মরি কি পড়ি করে ইংরেজী মুখস্থ ও ঠোঁটস্থ করবে। ইদানীং ওড়িয়ারা

বাঙালীদের ছাড়িয়ে প্রত্যেকবার উপরে উঠে যাচ্ছে। কারণ কটকের কলেজে সরকারী খরচে আই এ এস পরীক্ষার্থীদের নিয়মিত তালিম দেওয়া হয়। সেটা ইংরেজীতেই।

লাল চীনে কাউকেহ এলিৎ শ্রেণী গঠন করতে দেবে না বলে কট্টর মাউ-পন্থীরা যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটিয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছে। মাঝখান থেকে কোতল হয়েছে চার লক্ষ লোক। এঁরা এলিৎ কিংবা হবু এলিৎ। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে 'এলিৎ' শ্রেণীর নেতারাই চীনের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত। অভিজ্ঞ ব্যক্তি পরিচালক না হলে কোনো রাষ্ট্রই বিশ্ব প্রতিযোগিতায় সফল হতে পারে না। যাদের সঙ্গে মাথার লড়াই তাদের ভাষাও শিখতে হয়। তাদের সঙ্গেও মিশতে হয়। তাদের ভাষাতেও কথাবার্তা বলতে হয়। দেশের অধিকাংশ ছাত্রকে ইংরেজীতে নিরক্ষর রাখলেও দেশ অচল হয় না। তারাও উৎপাদন ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখায়। চীনা কারিগরদের পৃথিবীতে জুড়ি নেই। কিন্তু তারা তো দেশের উচ্চতর পর্যায়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে না। কারখানা পরিচালনা করতে পারে না। সংস্কৃতি পরিচালনা করতে পারে না। 'এলিৎ' স্তরে তারাও উঠতে পারবে। যোগ্যতার জোরে। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে যে এলিৎ যাঁরা তাঁরা নিজেরাই সবান্ধবে ক্ষমতা আত্মসাৎ করছেন না। বিত্ত আত্মসাৎ করছেন না। এর জন্যে চাই গণতান্ত্রিক চেক ওব্যালান্স। জনগণকেই তার জন্যে জাগ্রত থাকতে হবে। লেখাপড়া শিখতে হবে। গণতন্ত্রের ভাষা প্রধানত ইংরেজী। ইংরেজীর অনুবাদ নয়। সত্যিকার গণতন্ত্র রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রী-ভূত হতে দেয় না। ধনকেও করতে দেয় না কুবেরদের কুক্ষিগত। আমাদের দেশেও সত্যিকার গণতন্ত্রের দিন আসবে। তখন ইংরেজীর প্রয়োজন হবে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে চারদিকে বইয়ে দেবার জন্যে। তখন আমরা লিখব বাংলাতেই, কিন্তু ইংরেজীতে কী লেখা হচ্ছে তা যত্ন করে পড়ব। পরীক্ষা পাশের জন্যে নয়। কতকটা সংস্কৃতিগত কারণে, কতকটা গণতান্ত্রিক প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে।

বিপ্লবের অনিবার্যতায় আমি বিশ্বাস করিনে। বিপ্লবেও না, যদি-না তা হয় বিনা রক্তপাতে বিপ্লব। মহাত্মা গান্ধীর 'হিন্দ্ স্বরাজ' বা 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল' গান্ধীবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তিগ্রন্থ। তার পরিশিষ্টে যে গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হয়েছে তাতে দুজনমাত্র ভারতীয় গ্রন্থকারের নাম। আর-সব গ্রন্থকার বিদেশী। প্রধানত ইংরেজ। ইংরেজকে তাড়াবার জন্যে তিনি ইংরেজীকেই ব্যবহার করেছিলেন। ইংরেজীই ভারতীয়দেরকে জাতীয়তাবাদের, গণতন্ত্রের, সোশিয়ালিজমের, কমিউনিজমের, সিভিল লিবার্টির তথা ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটসের প্রেরণা যুগিয়েছে। রুশো, ভলতেয়ার, কার্ল মার্কস আমরা ইংরেজীর সাহায্যেই পড়েছি।

সাহিত্য আকাদেমির কর্মসমিতির প্রথম দিনের অধিবেশনেই নেহরু ও রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে স্থির হয়ে যায় যে সকলেই আমরা ইংরেজীতেই আলোচনা

ও প্রস্তাব গ্রহণ করব। হিন্দীর দিক্‌পাল জৈনেন্দ্রকুমার ইংরেজীও বলতেন চমৎকার। পণ্ডিত হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী হিন্দীর প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও অধ্যাপক। তিনি আমাকে বাংলায় বলেন, "ইংরেজীকে আমরাও চাই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের স্ট্যাণ্ডার্ড নির্দেশ করার জন্যে। নইলে এক এক সাহিত্যের হবে এক এক স্ট্যাণ্ডার্ড। ঐক্য হবে কী করে?" পরে পুরস্কার দেবার সময় দেখা গেল কয়েকটি সাহিত্যের পুরস্কারের জন্যে সুপারিশ করা হয়েছে এমন সব বইকে যা একান্ত নিম্নমানের। রাধাকৃষ্ণন্ আমাকে বলেন, "দিয়ে দিন। দিয়ে দিন। সীমান্তে অবস্থিত রাজ্যের স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে।" পরে আবার তিনিই তাঁর উক্তির পুনরুক্তি করেন অন্য এক সীমান্তবর্তী ভাষার পুরস্কার উপলক্ষে। কোথায় রইল স্ট্যাণ্ডার্ড? একই ব্যাপার রেডিওর অভিনয়যোগ্য নাটকের জন্যে পুরস্কারের বেলা। সেটা কিন্তু সাহিত্য আকাদেমির বাইরে। রেডিওতে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কবি-সম্মেলনের আবৃত্তি যাঁরা শুনেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন স্ট্যাণ্ডার্ড এক নয়। এ কী রকম সর্ব ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমি বা অল ইন্ডিয়া রেডিও যার সর্ব ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড নেই? সব ভাষাই সমান হতে পারে, কিন্তু সব সাহিত্যের স্ট্যাণ্ডার্ড এক নয়। হিন্দীর পেছনে সার বেঁধে দাঁড়ালে বাংলা আর মরাঠী আর তামিল আর এগোতে পারবে না, তাদের পেছনে সার দিয়ে দাঁড়াবার জন্যেও আর কোনো ভাষা দাঁড়াবে না। এর মধ্যেই ওরা রবীন্দ্রনাথকেও খাটো করতে বা অস্বীকার করতে আরম্ভ করেছে। "আরে, উনি তো বাঙালীর কবি! আমাদের কবি অমুক।" মালয়ালম সাহিত্যে চারজন কবিকে মহাকবি বলা হয়। তবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস এখন ভারতের সর্বত্র অনূদিত হয়ে প্রেমচন্দ্‌কেও পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক পাঠক অন্য এক স্ট্যাণ্ডার্ড দিয়ে বিচার বিবেচনা করেন। সেটা ফরাসী, রুশ ও ইংরেজী কথাসাহিত্যের। নাটকে ইংরেজীই পয়লা নম্বর। দর্শনে বিজ্ঞানে জার্মানী অতুলনীয়। তবে আমেরিকা তার পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। কারণ নিজের দোষে সে তার স্বভাষী ইহুদীদের আমেরিকায় পালিয়ে গিয়ে জান বাঁচাতে বাধ্য করেছে। আজকাল জার্মানদেরকেও ইংরেজী থেকে অনুবাদ করতে হচ্ছে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক তথা দার্শনিক গ্রন্থ। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মূল গ্রন্থও পড়ানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে জাতীয় আত্মসম্মানের প্রশ্ন ওঠে না। আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে রাশিয়ানরাও তাই করছে। সম্প্রতি চীনাদেরও মতিগতি সেই দিকে।

কিন্তু 'ভারত কেবলি ঘুমিয়ে রয়'। যেমন জাতীয়তাবাদী, তেমনি সাম্যবাদী, সকলের মুখে ওই একই রা। ইংরেজীকে হটাতে হবে। হটাতে না পারলে কোণঠাসা করতে হবে। সবাইকে এগারো বছর বয়স পর্যন্ত ইংরেজীতে নিরক্ষর রাখা চাই-ই চাই। একমাত্র ব্যতিক্রম ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়গুলি। যাদের সংখ্যা ও যাদের ছাত্রসংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে ও বাড়ছে ও আরো বাড়বে। সরকারের অনুদান তারা চায় না ও পায় না। সে ঘাটতি পুষিয়ে নেবার জন্যে

চড়া ফী আদায় করে। কোনো কোনো বিদ্যালয় তো অভিভাবকের কাছ থেকে মোটা ডোনেশন আদায় করে। তেমনি শিক্ষকদেরও দেয় দরাজ হাতে। কিন্তু অবাধ্য হলে তাকে বরখাস্তও করে। সরকারী বিদ্যালয়ের মতো স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা সেখানে নেই। কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন বারণ। অথরিটিরা অথরিটারিয়ান। কঠোর সেখানে ডিসিপ্লিন। না মানলে ছাত্রদেরও সরাসরি বিদায় করে দেওয়া হয়। এখন এসব বিদ্যালয় যে কেবল খ্রীস্টান মিশনারী পরিচালিত তা নয়? রামকৃষ্ণ মিশনও চালায়। বিড়লা প্রভৃতি হিন্দু ধনিকরাও তেমনি নিঃস্বার্থভাবে। চালাতে না দিলে তাঁদের লোকসান হবে না। তাঁদের সন্ততি চাকুরিজীবী নয়। চাকুরিজীবীরা যখন কলকাতা থেকে বাঙ্গালোর বা মাদ্রাজ থেকে দিল্লী বদলী হবেন বা বোম্বাই থেকে গোহাটি, তখন তাদের সন্তানদের নিয়ে মুশকিলে পড়বেন। স্থানীয় মাতৃভাষা জানা না থাকলে নিম্নতম শ্রেণীতেই নাম লেখাতে হবে। যে ছেলে বা যে মেয়ে ইংরেজী শিখেছে পাঁচবছর ধরে তাকে ইংরেজীর জন্যে পাঁচবছর অপেক্ষা করতে হবে। এই চাকুরিজীবী শ্রেণীটা কেবল সরকারী চাকুরে নয়। এঁদের অনেকেই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত। ইংরেজী এঁদের কাছে জীবনমরণ প্রশ্ন। এঁদের বদলীর দিকে নজর রেখে ভারত সরকার এখন বিভিন্ন প্রান্তে ইংরেজী-মাধ্যম সেন্ট্রাল স্কুল স্থাপন করেছেন। হিন্দীও সেখানে গোড়া থেকেই আবশ্যিক। মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে ও সমান ভাবে। মাতৃদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ ও বিদেশ থেকে আমদানী মিল্‌ক পাউডার সব সমান। মিলিটারি অফিসারদের মুখ চেয়ে সর্বত্র সৈনিক বিদ্যালয়ও স্থাপন করা চলেছে। সেখানেও ইংরেজী মাধ্যম সগৌরবে বিরাজ করছে। মাতৃভাষাও আবশ্যিক। হিন্দীও তাই। ত্রিভাষী সূত্রই ভারত সরকারের অনুসৃত নীতি। ভবিষ্যতেও এর হেরফের হবে না বলেই জানি।

ভারতকে তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করার দুষ্কৃতি যেমন ইংরেজদের তেমনি তাকে আধুনিক যুগের উপকরণ দিয়ে যুগোচিত করে দেওয়ার সুকৃতিও তাদেরই। আবার তাকে ঐক্যই বা দিত আর কোন্ শক্তি! আফ্রিকার মতো তাকে বহুভাগ করে নিত পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, জার্মান তথা ইংরেজ। মোগলে মরাঠায় শিখে এমন সম্পর্ক যে তারা বরং লড়াই করতে করতে ভাঙবে, তবু মচকাবে না। বিদেশীরা এলে স্বদেশীরা যে ভারতের স্বার্থে একটি যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তুলত সে ধ্যানও তাদের ছিল না। সে সাধনাও তাদের ছিল না। রুশদেশের পিটার বা ক্যাথারিনের মতো সমগ্র ভারতকে আধুনিক করার বা একাকার করার সংকল্প বা সামর্থ্য কোনোটাই তাঁদের ছিল না। শিক্ষাদীক্ষার ধারণা নেহাৎ সেকেলে। অস্ত্রশস্ত্রের ধরন একেবারেই তামাদি। কেউ ডেকে আনে ফরাসীর বিরুদ্ধে ইংরেজকে, কেউ ইংরেজের বিরুদ্ধে ফরাসীকে, কেউ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে পর্তুগীজকে। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতার পত্তন হয় আমাদের রাজা বাদশাহের আনুকূল্যেই। ভাইকে যাঁরা সূচ্যগ্র মেদিনী বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দেবেন না তাঁরাই পরকে দেন ছুঁচ হয়ে

ঢোকার অনুমতি বা সনদ। খুব সস্তা দরেই দেশের মাটি তাঁরা বিকিয়ে দেন। সে মাটিতে দুর্গ গড়তে দেন। জানতেন না যে ছুঁচ একদিন ফাল হয়ে বেরোবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে একজন পিটার বা ক্যাথারিন যদি ভারতীয়দের মধ্যে জন্মাতেন বা বিবাহসূত্রে রাজত্ব করতেন, তা হলে হয়তো ভারতকে একাকারও করতেন, আধুনিকও করতেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বৈরতন্ত্র চাপাতেন। ব্রিটিশ ভারতের শাসনব্যবস্থা স্বৈরতন্ত্র ছিল না। বড়লাটকে জবাবদিহি করতে হতো বিলেতের বড়কর্তাদের কাছে। তাঁদেরকেও জবাবদিহি করতে হতো ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কাছে। পার্লামেণ্ট বরাবর একই দলের কুক্ষিগত ছিল না। কয়েক বছর অন্তর অন্তর পরিবর্তন হতো। ওয়ারেন হেস্টিংসকে ইমপীচ করা হয়েছিল। ক্লাইভকেও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁকে যে লর্ড উপাধি দেওয়া হয় সেটা বনেদী ব্রিটিশ লর্ড উপাধি নয়। আইরিশ লর্ড উপাধি। তাঁর মর্যাদা খাটো হয়। ভারত থেকে কত লক্ষ টাকা সরিয়েছেন এর হিসাব নেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মহত্যা করে নিন্দুকদের হাত থেকে পরিত্রাণ পান। গণতন্ত্রের বিবর্তন খাস ইংলণ্ডেই ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে হয়েছে। ভারতে তার প্রবর্তন তেমনি ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে। তবে একটা বিষ বৃক্ষ ওরা মর্লে প্রভৃতি মনীষীর অমতে রোপণ করে গেল। সেপারেট ইলেকটোরেট। সেটাও একটা ছুঁচ। তার থেকে ফাল হয়ে বেরোলো সেপারেট স্টেট। আপন হাতে গড়া সংযুক্ত ভারতবর্ষ তারা আপন হাতে বিযুক্ত করে রেখে গেল। আমাদের বিবর্তনে ছেদ পড়ল। সে বিষবৃক্ষ এতদিনে আরো বিশাল হয়েছে। ভারতে পাকিস্তানে এখন মোগল মরাঠা সম্পর্ক। যে কোনো দিন আবার যুদ্ধ বাধতে পারে। পাকিস্তান থেকে বিযুক্ত বাংলাদেশও মোগল মরাঠার পর শিখ। সেই পুরাতন ত্রিভুজ নতুন নামে নতুন সাজে দুশো বছর পরে আবার পরস্পরকেই মনে করছে দুশমন।

তবে আধুনিকতার প্রবর্তন বিপরীত মোড় নেয়নি। কিন্তু নিতেও পারে। ইতিমধ্যেই ইসলামী রাষ্ট্র পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। হিন্দুরাষ্ট্রের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টাও তলে তলে চলেছে। আংরেজী হটে গেলে হিন্দ্, হিন্দু ও হিন্দী এঁরা আধুনিকতার সব দরজা জানালা বন্ধ করে দেবেন। বিপ্লবীরা নাচার হয়ে রুশ বা চীনকে ডেকে আনবেন। ইংরেজীকে বাঁচালে ইংরেজীই আমাদের বাঁচাতে পারত। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা যে ভাবে ঢেলে সাজা হচ্ছে ইংরেজী নিজেই বাঁচবে না। অপরকে বাঁচাবে কী করে? বুদ্ধিজীবীরা তো একমুঠো লোক। তাঁরাও দ্বিধাবিভক্ত। তাঁদের একজোট করা শিবের অসাধ্য। তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি এখন আকাশচুম্বী নয়, ধরণীচুম্বী।

শিক্ষাপ্রসঙ্গে বক্তব্য

আমাদের দেশে ব্রিটিশ আমলের আগে যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল তার প্রথম ধাপ ছিল পাঠশালা ও শেষ ধাপ ছিল চতুষ্পাঠী। পাঠশালায় ছিল মাতৃভাষার একাধিপত্য ও চতুষ্পাঠীতে ছিল সংস্কৃত ভাষার একাধিপত্য। মুসলমানদের বেলা মক্তব ও মাদ্রাসা দুটোতেই আরবী-ফারসীর দ্বৈত রাজত্ব। ব্রিটিশ শাসনে পাঠশালার স্থান নেয় প্রাথমিক বিদ্যালয়, তাতে গোড়ার দিকে ইংরেজীর স্থান ছিল না, পরে যখন নিম্নশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার মাঝখানে মধ্যশিক্ষা বলে একটি ধাপ তৈরি হয়, অর্থাৎ সেকেন্ডারি স্কুল বা হাই স্কুল প্রবর্তিত হয়, তখন প্রাইমারিকেও তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। তখন ছাত্ররা দ্বিতীয় ধাপে ওঠার আগেই ইংরেজী শিখতে শুরু করে দেয়। যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় বাইরে থেকে যায় সেগুলির সঙ্গে আরো কয়েকটি শ্রেণী জুড়ে দিয়ে মিডল ভার্নাকুলার স্কুল প্রবর্তিত হয়। সেগুলিতে ইংরেজী পড়ানো হয় না। যারা পড়তে চায় তারা সেখানকার পড়া শেষ করে হাই স্কুলের নিচের দিকে ভর্তি হয়ে ইংরেজী শুরু করে। বাল্যকালে আমার সঙ্গে যোগ দেয় ভার্নাকুলার স্কুল থেকে আগত অধিকবয়সী ছাত্র, ইংরেজীতে কাঁচা, আর-সব বিষয়ে পাকা। ইংরেজী শিক্ষার চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিডল ভার্নাকুলার স্কুলগুলি মিডল ইংলিশ স্কুলে রূপান্তরিত হয়। তার থেকে যারা বেরোয় তাদের আর নিচু ক্লাসে ভর্তি হতে হয় না। তারা তখনকার দিনের ফোর্থ ক্লাসেই জায়গা পায়। ফোর্থ ক্লাসে না ওঠা পর্যন্ত আমাদের মাধ্যম ছিল ভার্নাকুলার। ফোর্থ ক্লাস থেকে হল ইংরেজী।

হাই স্কুলের পর কলেজ। সেটা চতুষ্পাঠীর মতো উচ্চতম ধাপ। আগেকার দিনে কলেজেই এম. এ. পড়ানো হতো। পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগ বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনো বিভাগ ছিল না। আমিও পাটনা কলেজে এম. এ. পড়ি। শেষ না করে বিলেত চলে যাই। আমরা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগে অভ্যস্ত। উচ্চতম শিক্ষা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের এখতিয়ারে। সরকারকেও তাঁরা হস্তক্ষেপ করতে দেন না। কিন্তু বি. এ., বি. এস. সি.-র উপর সরকারকে হুকুমজারি করতে দেখি। তাঁরা বি. এস. সি.-র মতো বি. এ.-কেও করতে চান ইংরেজীর বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত। ইংরেজী হবে অপশনাল। যারা ইংরেজী অপশনাল বিষয় হিসাবে নেবে না তারাও অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে ইংরেজী নিতে পারবে। ফেল করলে ক্ষতি নেই। পাশ করলে পাশমার্কের উপরে যা পাবে তা সর্বমোটের সঙ্গে যোগ করা হবে। বাংলাও তাই। এ নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। মাধ্যমটাও হবে ইংরেজীর বদলে বাংলা ইত্যাদি। কিন্তু এক্ষেত্রে গোঁজামিল চলেছে। কোথাও স্বীকৃতি নেই যে মাধ্যম এখন অপশনাল। প্রশ্নপত্র যথারীতি ইংরেজীতে। আমার কনিষ্ঠা কন্যার অধ্যাপক তাকে সোজা বলে দেন যে সে বাংলা-মাধ্যম বিদ্যালয় থেকে এসেছে, সুতরাং ইংরেজী বক্তৃতা বুঝতে পারবে না, ইংরেজী

ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় উত্তরপত্র গৃহীত হবে না। সে বি. এস. সি-র ছাত্রী। ইংরেজী তার অন্যতম বিষয় নয়। অধ্যাপক তাকে পরামর্শ দেন বাড়িতে ইংরেজী পড়তে। তার মার কাছে। শান্তিনিকেতন ছেড়ে তার মা কলকাতায় বাসা ভাড়া করে মেয়েকে নিয়ে থাকেন ও ইংরেজী পড়ান। অধ্যাপক তাকে বলে রেখেছিলেন যে সে বিজ্ঞান ভালো জানলেও প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাবে না, যদি হয় ইংরেজীতে কাঁচা। ইংরেজী খারাপ দেখলে অন্যান্য বিষয়েও নম্বর কাটা যায়, এটা অনেকেরই অভিজ্ঞতা। বাংলা-মাধ্যম স্কুল থেকে যারা কলেজে যায় তাদের ইংরেজী খারাপ হলে তারা ডিগ্রী নিয়েই বা যাবে কোথায়? চাকরির প্রতিযোগিতায় ঠেকে যাবে।

স্কুলে আজকাল উপরের চারটি ক্লাসের মাধ্যম আর ইংরেজী নয়। ইতিপূর্বেই সে পরিবর্তনটি সাধন করা হয়ে রয়েছে। বর্তমান সরকার মাধ্যমের দিক থেকে নতুন কিছু করছেন না, করছেন বিষয়ের দিক থেকে। বিষয় হিসাবে ইংরেজী বহাল থাকলেও তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ধাপ আর প্রথম শ্রেণী নয়, পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণী। এই ছাত্ররা যখন কলেজে পড়তে যাবে অধ্যাপকরা তো ফাঁপরে পড়বেন। কলেজের উপযুক্ত বাংলা পাঠ্যপুস্তক বিরল। ইংরেজীই সম্বল। সেসব গ্রন্থের ভাষা কি এরা বুঝতে পারবে? উত্তর লিখবে কোন্ ভাষায়? চেনা অধ্যাপক পাশমার্ক দিতে পারেন, অচেনা পরীক্ষকরা যে ফেল করিয়ে দেবেন। কিংবা দেবেন সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স। এসব পরিবর্তন যাঁরা আনছেন তাঁরা কি জানেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকরা ইংরেজীর ভুল দেখলে দর্শন বিজ্ঞান অর্থনীতিতেও পরীক্ষার্থীর উপর বিরূপ হন? আইন করে সর্বপ্রথমে উত্তরপত্রের ভাষা বাংলা করুন। তা হলে যারা ইংরেজীতে কাঁচা তাদের একটা গতি হবে। কিন্তু সেটাও তো পারা যাবে না। বিস্তর অবাঙালী ছাত্র পড়ে। তারা কোন্ ভাষায় উত্তরপত্র লিখবে? ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখলে একজন পরীক্ষক পরীক্ষা করবেন কী করে? যেকালে সংস্কৃত ছিল উচ্চশিক্ষার বাহন সেকালে এ সমস্যা ছিল না। ছিল না যখন আরবী-ফারসী ছিল উচ্চশিক্ষার বাহন। এখন ইংরেজী ভিন্ন আর কোন্ ভাষা আছে যেটা পরীক্ষার্থীরা সবাই মেনে নেবে? আর ইংরেজীই যদি উচ্চতম পরীক্ষার একমাত্র বাহন হয় তবে যারা পাকা ও যারা কাঁচা তাদের মধ্যে তারতম্য থাকবেই। আখেরে পাকারাই জিতবে ও উচ্চতর পদগুলির জন্য প্রতিযোগিতায় সফল হবে।

অভিভাবকরা এটা দেখে শিখেছেন ও ঠেকে শিখেছেন। তাই তাঁরা কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চান না। তিন বছর বয়স থেকেই বাচ্চাকে দিয়ে আসেন নার্সারি ক্লাসে। সে বেচারা বাংলা শেখার আগেই ইংরেজী শেখে। হাস্যরসের অবতারণা তো আমি ঘরে ঘরেই দেখেছি। আমার এক প্রতিবেশী সেদিন বললেন তাঁর রাত্রে ঘুম হচ্ছে না। কেন? মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না? তা নয়, বাচ্চার বয়স এখন তিন বছর হতে চলল। কোন্

স্কুলে তাকে ভর্তি করবেন ? দু'বছর পরে তো কোথাও ওকে ঢুকতে দেবে না। আমার মতো আট বছর বয়সে ভর্তি হবার পাট এখন উঠে গেছে। আমার প্রতিবেশী বাংলার মাধ্যমে পড়াতে চাইলেও পাঁচ বছর বয়সও এখন দেরি। আর ইংরেজী মাধ্যমে পড়াতে চাইলে তিন বছরই প্রশস্ত। কিন্তু সেক্ষেত্রেও যা ভিড় ! ওরা টেস্ট করে নেয়। এমন সব বিদ্ঘুটে প্রশ্ন করে যে খুব কম শিশুই উত্তর দিতে পারে।

গ্রাম অঞ্চলের খবর আমি বহুদিন হলো রাখিনে। শহরের লোকের মনোবৃত্তি যা দেখছি তা বিস্ময়কর। ছিলেরা আজকাল কমিকস পেলে আর-কিছু পড়তে চায় না। আবার কমিকস না পেলে আর কিছু পড়তে চায় না। এদের মানুষ করার ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে পদে পদে পরামর্শ না করে কোনো রকম পরিবর্তন করা কি সম্ভব ? পড়ায় মন বসানোটাই প্রথম সমস্যা। ওরা যদি বাংলাই ভালো করে শিখত তা হলেও কথা ছিল। বাংলা সর্বত্র অবহেলিত। বাংলা-মাধ্যম বিদ্যালয়ও এই দোষে দোষী। শুধু ইংরেজীকে স্কেপগোট করলে কী হবে ?

এখন আমার অভিমত এই যে, যতদিন ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ভিড় হচ্ছে ততদিন ওটাকেও একপ্রকার গণভোট বলে ধরে নিয়ে ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচতে দিতে হবে। ওরা প্রায় সব দিক দিয়ে স্বাবলম্বী। সরকারের গলগ্রহ নয়।

দ্বিতীয়ত, বাংলা-মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির মধ্যে যেগুলি প্রাইমারি ক্লাসেও ইংরেজী পড়িয়ে ছাত্রদের ইংরেজীর ভিৎ পাকা করে দেয় তাদের অভিজ্ঞতা তাদের বলছে ইংরেজীকে নিম্নতম স্তরেও বহাল রাখতে। ডগমা দিয়ে অভিজ্ঞতাকে এককথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অতএব সেগুলিকেও বাঁচতে দিতে হবে। এ ধরনের স্কুল প্রত্যেকটি জেলায় আছে, কেবল কলকাতায় নয়। মহকুমা সদরেও এমন স্কুল আমি দেখেছি। একশো দেড়শো বছরের এসব হাই স্কুল যে বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা একটা শক্ত বনিয়াদ। তবে তারা স্বাবলম্বী নয়। সরকারী অনুদান না হলে তাদের চলে না। অনুদান না পেলে তারা বাঁচবে না। অনুদানের জন্যে যদি তাদের বনিয়াদ কেঁচে যায় তা হলেও কি তারা বাঁচবে ?

সরকার যেটা করতে যাচ্ছেন সেটা আমাদের দেশে নতুন কিছু নয়। আগেকার দিনে হাই স্কুলের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে একসারি নিম্ন প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্য ভার্নাকুলার স্কুল ছিল। পুরোপুরি ইংরেজী বর্জিত। মধ্য ভার্নাকুলার স্কুল থেকে কতক ছাত্র সরাসরি মেডিকাল স্কুলেও যেত। পড়াশুনা করত বাংলা মাধ্যমে। পাশ করলে তারা ভি. এল. এম. এস. ডিপ্লোমা পেয়ে চাকরিও করত, প্র্যাকটিসও করত। সরকার যে খালিপদ ডাক্তার তৈরি করতে যাচ্ছেন তারাও কি নতুন ? সেইসব ডাক্তারদের আমি চাক্ষুষ করেছি। চিকিৎসার জন্যে তাঁদের কাছে গেছি। পুরোনো ব্যবস্থাকেই যদি নতুন করে চালাতে চান তো ফল ভালোই হবে। বিনা চিকিৎসায় কেউ মরবে না।

সাধারণ লোক আশীর্বাদ করবে। কিন্তু তার জন্যে তো কেউ বলছেন না যে মেডিকাল কলেজেও তিন বছরের কোর্স প্রবর্তন করা হোক। সেটাও লোকে চায় না। শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে সাম্য যেমন বাঞ্ছনীয় বৈষম্যও তেমনি অপরিহার্য। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এখন এমন উন্নতি হয়েছে যে মেডিকাল কলেজের গ্রাজুয়েটরাও বিদেশে গিয়ে আরো বড়ো ডিগ্রী বা আরো বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফিরে আসছেন। তাঁদেরই কদর বেশী। যুগটাই এরকম যে এ যুগে বিশুদ্ধ স্বদেশী বিদ্যা বা উপাধি বিকোয় না। এ তত্ত্ব অনুধাবন করে কলকাতার তৎকালীন হিন্দু প্রধানরাই উদ্যোগী হয়ে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা বড়লাটের সকাশে যেতে সাহস পান না, যান চীফ জাস্টিসের সমীপে। তিনিই বড়লাটকে লিখে অনুমতি আনিয়ে দেন। সরকার কিন্তু অর্থসাহায্য করেন না। তাঁদের অর্থ তাঁরা ব্যয় করতে মনঃস্থির করেছিলেন সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী শিক্ষার পেছনে। রামমোহন রায় বড়লাটকে অনুরোধ করেন যুগোচিত শিক্ষা প্রবর্তন করতে। বড়লাট নিরুত্তর। হিন্দু কলেজ থেকে ডিরেজিয়োর শিষ্যের দল বেরিয়ে নবযুগের নিশান ওড়ান। হিন্দু কলেজের ব্যাঙ্ক ফেল করার পর থেকে সরকারী অনুদান নেওয়া হয়। মেকলে এসে দেখেন একদল ইংরেজ ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে, আরেক দল বিপক্ষে, তিনি সভাপতি রূপে তাঁর কাস্টিং ভোট ইংরেজীর পক্ষেই দেন। তখন সরকারের পলিসি পালটায়। পরে হিন্দু কলেজ রূপান্তরিত হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে। তার স্কুল বিভাগটার নাম রাখা হয় হিন্দু স্কুল।

হিন্দু কলেজের ঐতিহ্যবহ যে হিন্দু স্কুল আর হেয়ার সাহেবের ঐতিহ্যবহ যে হেয়ার স্কুল এদের প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজী উঠে গেলে এমন কী লাভ হবে বুঝতে পারিনে। না গেলে এমন কী ক্ষতি। ডগমা থেকে মনটাকে মুক্ত করে চিন্তা করুন দেখি। এগুলি এখন সরকারী প্রতিষ্ঠান। সরকার মালিক। তাঁরা যা ভালো মনে করেন তা করতে পারেন। যাঁদের আপত্তি আছে তাঁরা তাঁদের ছেলেদের অন্যত্র পড়াতে পারেন। আজকাল এমন অনেক বেসরকারী স্কুল হয়েছে যাদের মাধ্যম বাংলা, কিন্তু প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী পড়ানো হয়। সরকারী অনুদান না পেলেও এদের চলে যাবে যদি সরকারী স্কুল থেকে ইংরেজী পড়ুয়ারা ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে এসব স্কুলে যায়। শুনছি ইতিমধ্যেই যেতে শুরু করেছে। ভালো ভালো ছেলেরা অন্যত্র গেলে সরকারী স্কুল কানা হয়ে যাবে। হিন্দু বা হেয়ার স্কুলের তেমন নামডাক থাকবে না।

তবে একটা ভয়ের কথা, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড যদি অ্যাফিলিয়েশন কেড়ে নেন। অনুদান না পেলেও চলে। কিন্তু অ্যাফিলিয়েশন না পেলে চলে না। একথা যখন আমার কানে আসে তখন আমি বলি, তা হলে কেন্দ্রীয় সরকারের সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ডের অ্যাফিলিয়েশন চাইতে হবে। অনেকেই চেয়েছে ও পেয়েছে। তবে সেখানেও আরো একটা ভয়। হিন্দী ঢুকবে। বাংলা কোণঠাসা হবে।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে কবির জীবদ্দশায় বাংলা

মাধ্যমে পড়ানো হতো উপরের দুই ক্লাস বাদে আর সব ক্লাসে। সাধারণ সরকারী স্কুলে উপরের চার ক্লাস বাদে আর সব ক্লাসে। তফাৎ তা হলে মাত্র দুটি ক্লাস নিয়ে। সেখানে ইংরেজী পড়ানো হতো আগাগোড়া সব ক'টি ক্লাসে। প্রাথমিক স্তরও বাদ যেত না। কবির প্রয়াণের বছর দশেক পরে বিদ্যালয় বিভাগে বাংলা-মাধ্যম পুরোপুরি প্রবর্তিত হয়, কিন্তু ইংরেজী শেখানো হয় আগের মতো প্রথম শ্রেণী থেকেই। সুধীরঞ্জন দাস সমান্তরালভাবে ইংরেজী মাধ্যম প্রবর্তন করেছিলেন, কিন্তু সেটা পরিত্যক্ত হয়েছে। কলেজ বিভাগের মাধ্যম বরাবর যা ছিল এখনো তাই। অর্থাৎ ইংরেজী। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ আর তার বাস্তব প্রয়োগ এক জিনিস নয়। তাঁর রচনার থেকে উদ্ধৃতি কারো যুক্তিকে জোরালো করবে না, যদি সে যুক্তি নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে।

গুরুদেবেরই উপদেশ অনুসারে আমার বড় ছেলেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত ইংরেজীর বিন্দুবিসর্গ শেখানো হয়নি। তার মাকেই বাংলা শিখে নিয়ে ছেলেকে বাংলায় মানুষ করতে হয়েছিল। তার বয়সের ছেলেদের চেয়ে সে অন্যান্য বিষয়ে ঢের বেশী ওয়াকিবহাল ছিল। কিন্তু শান্তিনিকেতনের শিক্ষকরা সেসব বিষয়ে পরীক্ষা করলেন না। ইংরেজীর কিছুই জানে না বলে তাকে তাঁরা তার সমবয়সীদের ক্লাসে ভর্তি করলেন না, বললেন প্রথম শ্রেণীর শিশুদের সঙ্গে ভর্তি করতে। তা হলে তার দুটো বছর নষ্ট হতো। মনের উপরেও হীনম্মন্যতাবোধ কাজ করত। আমরা তাকে বাড়িতেই ইংরেজী পড়িয়ে তিন বছর বাদে অন্যত্র মিশনারী স্কুলে দিই। ইংরেজ হেডমাস্টার পরীক্ষা করে তার সমবয়সীদের ক্লাসেই ভর্তি করেন। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে ময়মনসিংয়ের সরকারী স্কুলে সে ফার্স্ট কি সেকেণ্ড হয়।

এর থেকে বোঝা গেল বিশেষ ব্যবস্থা করলে বাড়িতে তিন বছর ও বিদ্যালয়ে পাঁচ বছরের মধ্যেই ইংরেজীতে পাকা হওয়া যায়। সুতরাং সরকার যদি বিশেষ ব্যবস্থা করেন তা হলে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজীর বিন্দুবিসর্গ না জেনেও ছাত্ররা আজকালকার মাধ্যমিক স্তরে সাত-আট বছরের মধ্যেই ইংরেজী বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারবে। কিন্তু কোথায় সেই বিশেষ ব্যবস্থা? তার নমুনা আমরা দেখতে চাই। সরকারী প্রস্তাবের যেটুকু আমার কানে এসেছে তাতে বাংলার উন্নতি হলেও হতে পারে, কিন্তু ইংরেজীর উন্নতি হবার নয়। ইংরেজীর উপরে জোর না দিলে ইংরেজী এত সহজ ভাষা নয় যে রাম শ্যাম যদু মধু সাত-আট বছরেই বারো বছরের পথ অতিক্রম করতে পারবে। সেই জোরটা হিন্দু কলেজের হিন্দু প্রতিষ্ঠাতারা দিয়েছিলেন বলেই হিন্দুরা মুসলমানদের উপর আর বাঙালীরা হিন্দিভাষীদের উপর প্রায় পঞ্চাশ বছর স্টার্ট পেয়েছিল। পরে সে স্টার্ট হ্রাস পায়। এতদিনে সেটা বিলুপ্ত হয়েছে। বাঙালীর ছেলেরা এখন আর এগিয়ে নয়, তা বলে পেছিয়েও নয়। সরকারী প্রস্তাব কার্যকর হলে এখন থেকে পেছোবে। কিসের জন্যে পেছোবে? বাংলার জন্যে?

তা হলে শুনুন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার চার বছর আগে থেকেই মিশনারীরা কয়েকটি স্কুল স্থাপন করে বাংলা মাধ্যমে পড়াতে শুরু করেছিলেন। বিষয় ছিল পঠন, লিখন ও অঙ্ক। ইংরেজীর নামগন্ধ ছিল না। পরে সরকারও কয়েকটি স্কুল স্থাপনের জন্য প্ল্যান করেন। এসব স্কুলও বাংলা ভাষায় পড়ায়। হিন্দু কলেজের একবছর পরে স্কুলবুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতারা হেয়ার প্রভৃতি ইংরেজ তথা বাঙালী। এঁদের উদ্যোগে ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বইও প্রকাশিত হয়। রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১৮৩২ ও ১৮৩৩ এই দুই বছরে ইংরেজী বই বিক্রি হয় ১৪,১৯২ খানা ও বাংলা বই বিক্রি হয় ৪,৭৯২ খানা। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের মূলে যেমন বেসরকারী উদ্যোগ, বাংলা শিক্ষা প্রবর্তনের মূলেও তেমনি বেসরকারী উদ্যোগ। সরকারের ভূমিকা আগে নয়, পরে। আর বাঙালীর ভূমিকাও ইংরেজের সমান সমান। যৌথ উদ্যোগেই ইংরেজী তথা বাংলা শিক্ষা যুগপৎ প্রবর্তিত হয়। সেটাই ছিল যুগধর্ম। যুগকে উপেক্ষা করে দেশ বা দেশকে উপেক্ষা করে যুগ নয়।

আজকের দিনেও কি আমরা দেশের জন্যে যুগকে বা যুগের জন্যে দেশকে উপেক্ষা করতে পারি? দেশের দাবী মেটাবে বাংলা, যুগের দাবী মেটাবে ইংরেজী। বাংলাই যদি একই সঙ্গে দেশের তথা যুগের দাবী মেটাতে চায় তো কোথায় তার প্রস্তুতি? বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত মৌলিক গ্রন্থ দূরের কথা, অনুবাদগ্রন্থই বা ক'খানা? নতুন শিক্ষানীতি হয়তো দেশসুদ্ধ মানুষকে নিম্নশিক্ষিত করে তুলতে পারবে, কিন্তু উচ্চশিক্ষিত বলে গণ্য হতে পারবে ক'জন? কোনোমতে ডিগ্রী লাভ করতে পারবে অবশ্য আরো কয়েক লক্ষ, কিন্তু পশ্চিম বাংলার বাইরে কোথায় তারা কাজকর্ম পাবে? বেকার সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। লোকশিক্ষার আবশ্যকতা কে না স্বীকার করবে? কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্যেও সত্যিকারের প্রস্তুতি থাকা চাই। লোকশিক্ষায় আমরা পেছিয়ে আছি একথা ঠিক, কিন্তু উচ্চশিক্ষায় তো এগিয়ে আছি বা ছিলুম। অগ্রগতি পরিমাপের কি একটাই মাপকাঠি?

যুগের দিক থেকে যে শিক্ষা অগ্রসর নয় সে শিক্ষা লোকশিক্ষার নিরিখে অগ্রসর হলেও তার ত্রুটির খেসারৎ একদিন না একদিন দিতে হবেই। চীনদেশ সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেই আধুনিকীকরণের ধুম পড়ে গেছে। তেমনি একদিন না একদিন এদেশেও আধুনিকীকরণের ধুম পড়বে। ইংরেজীর উপর জোর দিতে হবেই একভাবে না একভাবে। কারণ আধুনিকতার দোর-জানালাগুলো খুলে দিতে ইংরেজী যেমন সাহায্য করে বাংলা তেমন নয়, হিন্দী তেমন নয়, সংস্কৃত বা আরবী তো তেমন নয়ই। যদি জানতুম যে কেবলমাত্র বাংলা বই পড়েই সর্বতোভাবে আধুনিক হওয়া যায় তা হলে সবটা জোর বাংলার উপরেই দিতুম। কিন্তু এটা মঙ্গলকাব্যের যুগ নয়। সেযুগেও শিক্ষিতম্মন্যদের ফারসী পড়তে হতো। তা দেখে কে যেন রসিকতা করেছিলেন—"মোগল পাঠান হদ্দ হলো ফারসী পড়ে তাঁতী!" কিন্তু পরিহাস

করলে কী হবে, সেই বিদ্যার জোরে তথাকথিত শূদ্রবর্ণের মানুষরাও সমাজের উচ্চতর স্তরে উঠতে পেরেছিলেন। গোটা কায়স্থ জাতটাই উত্তর-ভারতে উচ্চতর স্তরে উঠতে পেরেছিল ফারসী শিক্ষার সিঁড়ি বেয়ে। ফারসী পড়ার রেওয়াজ উত্তরপ্রদেশে, বিহারে ও পাঞ্জাবে এখনো ওরা ছাড়েনি। এখানে ওরা ফারসী ছেড়ে ইংরেজী ধরেছে ও আরো উপরে উঠেছে।

আমি বলি, ইংরেজীকে যদি হটাতে চাও তো সর্বস্তর থেকেই হটাও। যদি রাখতে চাও তো অন্তত কতকগুলি স্কুলে নিম্নতম স্তর থেকে ও কতক-গুলি কলেজে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত রাখো; ইংরেজীনবীশরা যদি একটা সুবিধাভোগী শ্রেণী হয় তবে যোগ্যতার পরীক্ষায় পাশ করেই হবে। তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নাও। তারা যদি কাজের লোক না হয় তবে তাদের পতন অবধারিত। ইংরেজের বদলে ইংরেজতরো হয়ে তারা উপরে উঠবে, এটাও একটা মোহ। সেই মোহের উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে এতগুলো ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়। মোহভঙ্গ একদিন অনিবার্য। তা বলে এদের উচ্ছেদ করাও সুবুদ্ধি নয়। এদের শূন্যতা পূরণ করবে হিন্দী-মাধ্যম বিদ্যালয়। এরাই হিন্দী-মাধ্যমে পড়াবে। তাতে বাংলার কী লাভ? বাংলা কি শূন্যতা ভরাতে পারবে?

দেশের অধিকাংশ ছাত্রই প্রাথমিকের পর আর পড়বে না। তাদের অভিভাবকরাই তাদের চাষবাস বা কারিগরির কাজে লাগিয়ে দেবে। তাতে তাদের জীবিকারও সুরাহা হবে। তাদের উপর ইংরেজী বিদ্যা চাপানোর প্রয়োজন নেই। সুতরাং প্রাথমিক স্তরে ইংরেজীকে আবশ্যিক করার পক্ষে বিশেষ কোনো যুক্তি নেই। ইংরেজী হবে ঐচ্ছিক বা অপশনাল। যেখানে যেখানে ইংরেজীর জন্যে চাহিদা থাকবে সেখানে সেখানে ইংরেজীর যোগানও থাকবে। কিন্তু শখ করে ইংরেজী নিয়ে মনের সুখে ফেল করা চলবে না। পরীক্ষা দিতে হবে, পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। নয়তো ইংরেজীর ক্লাস থেকে নাম কাটা যাবে। যোগ্য অযোগ্য সকলের জন্যে ইংরেজী নয়। সর্ব-সাধারণের জন্যে বাংলা। তার উপর কিছু কিছু হিন্দী। সর্বসাধারণের জন্যে সংস্কৃতও নয়, আরবী-ফারসীও নয়। এসব ভাষা যারা শিখতে চায় তাদের অপেক্ষা করতে হবে। আর নয়তো মক্তবে বা মাদ্রাসায় বা টোলে যেতে হবে। সেসব তো দেশ থেকে উঠে যাচ্ছে না। প্রাথমিক স্তরে সকলের জন্যে যে ভাষা অত্যাবশ্যক সে ভাষা বাঙালীর পক্ষে বাংলা, অন্যান্যদের পক্ষে তাদের মাতৃভাষা। মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটি বিষয় শিখতে হবে। সরকার সে বিষয়ে সচেতন। সুতরাং আমার বক্তব্য নেই।

মাধ্যমিকেও বাংলা হোক আবশ্যিক। ইংরেজী হোক ঐচ্ছিক। ইংরেজী যারা চায় না তাদের বাধ্য করা উচিত নয়। যারা চায় তাদের বাধা দেওয়া অনুচিত। চাহিদা অনুসারে যোগান, এ নীতি এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রায় সব ক'টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই ইংরেজী রাখতে চাইবে। প্রায় সব ছাত্রই ইংরেজী পড়তে ইচ্ছা প্রকাশ করবে। তাদের অভিভাবকরাও তাদের পাঠাতে

চাইবেন উচ্চশিক্ষার জন্যে সাধারণ কলেজে বা ডাক্তারি শিক্ষার জন্যে মেডিকাল কলেজে বা ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার জন্যে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে। অথবা তাদের চাকরি নিতে বলবেন কোনো সরকারী দফতরে বা প্রাইভেট কোম্পানিতে। অথবা নিজেদের দোকানে বা ক্ষেতখামারে কাজ করতে বলবেন। আমরা ধরে নিতে পারি যে অধিকাংশেরই মাধ্যমিক শিক্ষা হবে ভোকেশনাল অভিমুখী। আচার্য জগদীশচন্দ্র একবার পাটনা কলেজে গিয়ে আমাদের বলেছিলেন ভোকেশনালের উপর জোর দিতে। সেটা আমার মনে ধরেনি। কিন্তু তাঁর বয়সে উপনীত হয়ে আমিও উপলব্ধি করছি যে দেশের ছেলেদের বেকারদশা থেকে উদ্ধার করতে হলে মাধ্যমিকের পরই তাদের ভোকেশনালের অভিমুখী করতে হবে।

ভোকেশনাল এডুকেশনের বিপরীত হলো লিবারল এডুকেশন। আমার পক্ষে এটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো। যারা সত্যি সত্যি এটার পক্ষপাতী ও এর জন্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করতে প্রস্তুত তারা যেন এর থেকে বঞ্চিত না হয়। লিবারল এডুকেশন কিন্তু আগের মতো অর্থকরী নয়। একজন কেরানীর চেয়ে একজন মিস্ত্রির রোজগার এখন বেশী। আমার বাড়িতে যে একদিন চাকরি করেছে সে মিস্ত্রি হয়ে কলকাতায় ও মফঃস্বলে বাড়ি কিনেছে ও করেছে। আর পরে তার সবটাই সমাজের প্রয়োজন মিটিয়ে। দেশের সামনে আসছে বিরাট এক কর্মকাণ্ড। যাকে বলে ডেভেলপমেণ্ট। তাতে ছোট বড়ো মাঝারি ইঞ্জিনীয়ার টেকনোলজিস্ট ও মিস্ত্রির ভূমিকাই বেশী। তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার সাধ্য কি জজ ম্যাজিস্ট্রেট বা সেক্রেটারিদের আছে?

আমার প্রাক্তন সেবক আমাকে বলে, কেন আমি ওকে ইংরেজী শেখাইনি? দিলে ওর রোজগার না বাড়ুক সামাজিক মর্যাদা বাড়ত। ভদ্রলোক শ্রেণীতে ওর স্থান হতো। মেয়েদের ও ভদ্রলোকদের ঘরে দিয়েছে। ছেলেদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও বাড়িতে মাস্টার রেখে ইংরেজী ইত্যাদি পড়াচ্ছে। ওরাও ভদ্রলোক হয়ে ভদ্রলোকদের মেয়েদের বিয়ে করবে। সামাজিক মর্যাদা যে ধোপা নাপিত রাঁধুনী এরা সবাই চায়। তাই ইংরেজীর উপর ঝোঁক।

কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন তাঁরা শিক্ষার সম্প্রসারণ করবেন, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্কোচন ঘটাবেন। প্রাথমিক স্তর থেকে তাঁরা ইংরেজী উঠিয়ে দেবেন, তাঁদের আয়ত্তাধীন সরকারী বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির প্রাথমিক বিভাগেও ইংরেজী বলে একটি বিষয় থাকবে না, ইংরেজী-মাধ্যম তো দূরের কথা। তবে প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিকে উপনীত হয়ে তারা পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আবশ্যিক বিষয় হিসাবে ইংরেজী পড়তে বাধ্য হবে। মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী এ রাজ্যে ততদিন চলবে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত তথা পরিচালিত ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয় যতদিন। কিন্তু সমান্তরাল ভাবে তাদের অবস্থান কতদিন অনুমোদিত হবে কে জানে! তাদের ছাত্রছাত্রীরা যদি প্রতিযোগিতায় উচ্চতর স্থান পায়, বিশেষ করে ইংরেজীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়, তবে তো পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছাড়া অন্যেরা

তাদের আরো পছন্দ করবে। তখন রব উঠবে, ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয় তুলে দাও। কিন্তু সেটা অত সহজ হবে না। চাহিদা থাকলে যোগান থাকে। চাহিদা আছে বলেই ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বাড়ছে, তাদের বেতনও বাড়ছে। বিনা বেতনের বিদ্যালয়ের চেয়ে চড়া বেতনের বিদ্যালয়ের আদর বেশী হতে পারে, যদি দেখা যায় বঙ্গনবীশদের চেয়ে ইঙ্গনবীশদের বাজারদর বেশী। কেবল চাকরির বাজারেই নয়, বিয়ের বাজারেও। বিনা বেতনের বিদ্যালয়ে তাদেরই আকর্ষণ করতে পারা যায় যাদের চড়া বেতন যোগাবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু যাদের সন্তানসংখ্যা একটি কি দুটি তারা যেমন করে হোক চড়া বেতনও যোগাচ্ছে। কিংবা সেটা যোগাতে গিয়ে সন্তানসংখ্যা কমাচ্ছে। তাদের মধ্যে মিস্ত্রীশ্রেণীর লোকও পড়ে। তারা সেইভাবে সমাজে উঠতে চায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি আইন করে ইংরেজী-মাধ্যম রহিত করেন তবে এসব ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের দ্বারস্থ হবে। শিক্ষা এখন কনকারেণ্ট সাবজেক্ট। কেন্দ্রীয় সরকারও পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের কর্মচারীদের সুবিধার জন্যে বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারেন, ইতি-মধ্যেই করেছেন। কয়েকটি বেসরকারী ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয় ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বোর্ড থেকে নাম কাটিয়ে নিয়ে কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক বোর্ডের আওতায় এসেছে। এক এক করে সব ক'টি ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ই সেই পন্থা অনুসরণ করতে পারে। ইংরেজী-মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের আপত্তি নেই। তবে তাঁরা ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীকেও গুরুত্ব দিতে বলবেন। অভিভাবকদেরও তাতে আপত্তি নেই, যদি ইংরেজী-মাধ্যমে পড়তে ও পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়। অনেক হিন্দীভাষী ছাত্র স্বেচ্ছায় ইংরেজী-মাধ্যমে পড়ে ও পরীক্ষা দেয়। কলকাতা শহরে দক্ষিণীদের সংখ্যাও কম নয়। তাদের ছেলেমেয়েরাও পড়ে ও পরীক্ষা দেয় ইংরেজী-মাধ্যম। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের সুবিধার দিকে না তাকালে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে বা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানেই পড়াশুনা করবে।

বাংলা-মাধ্যম বিদ্যালয়ে অবাঙালীরা কেউ পড়বে না। হিন্দী-মাধ্যম বিদ্যালয়ে হিন্দীভাষী ভিন্ন আর কেউ পড়বে না। কিন্তু ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ে বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী, উর্দু, তামিল, তেলুগু, মরাঠী, গুজরাটী ইত্যাদি সর্বভাষী ছাত্রছাত্রী পড়বে। সেইভাবে একটা নিখিল ভারতীয় চেতনা জাগবে। সঙ্গে সঙ্গে একটা আন্তর্জাতিক চেতনাও। যাদের বদলির চাকরি তারা তো ইংরেজী-মাধ্যম পছন্দ করবেই। আর তাদের সংখ্যাও তো কম নয়। ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয় সমান্তরাল ভাবে থাকবেই। বাঙালী ছাত্রছাত্রীরাও সেখানে ভিড় করবে বেতনের কথা না ভেবে। বাংলাও সেখানে পড়ায় ও পড়াবে।

যে শিক্ষা সর্বসাধারণের জন্যে কল্পিত সে শিক্ষায় ইংরেজী বা সংস্কৃত বা আরবী-ফারসীকে আবশ্যিক করতে হবে, এটা আমার মতে ন্যায়সঙ্গত দাবী

নয়। কিন্তু তাকে ঐচ্ছিক করলে কার কী ক্ষতি ? দেশে সংস্কৃত টোল আছে, আরবী-ফারসী মক্তব-মাদ্রাসা আছে। তেমনি ইংরেজী-মাধ্যম স্কুলও আছে। এসব জায়গায় ইংরেজী আবশ্যিক। তেমনি যদি আরো কয়েক জায়গায় ইংরেজীকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে থাকতে দেওয়া হয়, বিশেষ করে অতি পুরাতন সরকারী বেসরকারী হাই স্কুলে, যদি কোথাও প্রথম শ্রেণী থেকে, কোথাও তৃতীয় শ্রেণী থেকে, তবে কার কী ক্ষতি ? এখানে বলে রাখি যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীও পশ্চিমবঙ্গেই অবস্থিত। তাঁর বিদ্যালয়ে ইংরেজী প্রথম শ্রেণী থেকেই আবশ্যিক ছিল ও রয়েছে। মাধ্যম হিসাবেও ছিল ম্যাট্রিকুলেশনের আগের দুই বছর, এখন আর নেই। কই, কেউ তো একথা বলছে না যে সেখানেও প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী থাকবে না, পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে পড়ানো হবে ?

সর্বসাধারণের জন্যে যেটা সম্ভব নয়, সেটা কারো জন্যে সঙ্গত নয়, এটা কি একটা যুক্তি না এটা একটা ডগমা ? দশ বছর বয়স না হলে কাউকেই ইংরেজী শিখতে দেওয়া হবে না, অথচ দশ বছর বয়স হলেই অমনি সবাইকে ইংরেজী শিখতে বাধ্য করা হবে, এটার নাম কি সামাজিক ন্যায় না অন্ধ শ্রেণীবিদ্বেষ ? কতক ছেলে ইংরেজী শিখে কেন সর্ব বিদ্যার স্বাদ পাবে, কেন দেশে বিদেশে ভাগ্য পরীক্ষা করবে, কেন উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ হবে, সকলে কেন হবে না, এ বড়ো কুটিল প্রশ্ন। এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে সমাজবিপ্লবের পথ ধরতে হবে, সেখানেও থামলে চলবে না, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। চীনদেশে দেখা গেল বিপ্লবের পরেও মধ্যবিত্ত বিপ্লবীরা কেউ কৃষক শ্রমিকদের শ্রেণীতে নেমে যাননি, নিজেদের ছেলেমেয়েদের নামতে দেননি। তাদের জন্যে উচ্চশিক্ষা ও উচ্চপদের ব্যবস্থা বহাল রয়েছে। বিপ্লবের পরেও তারাই উপরওয়ালা। তাদের হটাবার জন্যে নিচের দিক থেকে আসে সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সেটা প্রতিবিপ্লব নয়, অতিবিপ্লব। সেদিন যাঁরা কোনমতে আত্মরক্ষা করেন, মাও মহোদয়ের তিরোধানের পর তাঁরা চাকার উপরে উঠেছেন ও অতিবিপ্লবীদের বলছেন প্রতিবিপ্লবী।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্যিকারের শিক্ষানীতিই অনুসরণ করা উচিত। সমাজনীতির দ্বারা চালিত হওয়া উচিত নয়। যে দশবছর বয়সের আগেই ইংরেজী শিখতে ইচ্ছুক ও সমর্থ তাকে চারবছর বা দু'বছর বসিয়ে রাখা অন্যায়। আর যে দশবছর বয়সের পরেও ইংরেজী শিখতে ইচ্ছুক নয় বা সমর্থ নয় তাকে শিখতে বাধ্য করাও অন্যায়। তাকে তার রুচি অনুসারে অন্য কোনোভাবে শিক্ষিত করা সম্ভব ও সঙ্গত। ইউনিফর্ম জিনিসটা মিলিটারির বেলা মানায়, পুলিসের বেলা মানায়, নার্সের বেলা মানায়, তা বলে সবাইকে ইউনিফর্ম পরালে কি মানায় ? চীনদেশে নাকি সকলেরই একই রকম পোশাক। বেশীদিন সেরকম থাকতে পারে না। সবাইকে এক ছাঁচে ঢালা কোথাও সফল হয়নি। শিক্ষাব্যবস্থাকেও প্রত্যেকের রুচি আর সামর্থ্যের মাপ নিয়ে বিচক্ষণ দর্জির মতো কাটছাঁট করতে হবে। একই মাপের তৈরি পোশাক

সকলের গায়ে বসে না, যদিও সস্তা। তার চেয়ে কিছু বেশী খরচ করে দর্জি ডেকে বানাতে দেওয়া ভালো।

যারা চায় তাদের বাধা দেওয়া, যারা চায় না তাদের বাধ্য করা, এ দুটোর কোনোটাই ঠিক নয়। এই আমার সমালোচনার মর্ম। এটা প্রত্যেক স্তরেই প্রযোজ্য। আমার মতে বাংলা বা মাতৃভাষা ব্যতীত আর সমস্ত ভাষাই ঐচ্ছিক হওয়া বিধেয়। মাতৃভাষাই সবাইকে গোড়া থেকে শেখাতে হবে, তা বলে সর্ব স্তরে নয়। সেটাও গোঁড়ামি। এইসব বঙ্গনবীশ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোথাও স্থান পাবে না, মান পাবে না, কেবল জ্ঞান নিয়ে তারা করবে কী? জ্ঞানও কি তারা তুলনায় বেশী পাবে না কম পাবে? জ্ঞানের জন্যে আধুনিক বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে যেতে হবেই। বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানান্বেষণ করতে হবে। তখন ইংরেজী বিদ্যা তাদের কাজে লাগবে। যারা ইংরেজী জানে না তাদের ফরাসী জানতে হবে, নয়তো জার্মান জানতে হবে, নয়তো রাশিয়ান জানতে হবে। কোনোটাই ছ'মাসে বা একবছরে শুদ্ধভাবে শেখা যায় না, অশেষ পরিশ্রম করতে হয়। তার চেয়ে দীর্ঘকাল ধরে ধীরে-সুস্থে ইংরেজী শেখা ভালো। সেটাতেই এদেশের শিক্ষকরা অভ্যস্ত। শিক্ষার্থীদেরও সুবিধে। এ ক্ষেত্রে গোঁড়ামির কোনো মূল্য নেই। হজরত মোহাম্মদ জ্ঞানের জন্যে আরবদেশ থেকে চীনদেশে যেতেও উপদেশ দিয়েছিলেন, যে যুগে চীনযাত্রা ছিল একান্ত দুর্গম। চীনদেশে গেলে নিশ্চয়ই একান্ত দুরূহ চীনভাষাও শিখতে হতো। আরবী বিদ্যায় কুলোত না।

ইংরেজী জানা যে অত্যাবশ্যক সেটা তো কর্তৃপক্ষ নিজেরাই মেনে নিচ্ছেন। নইলে ইংরেজীকে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে আবশ্যিক করতে যেতেন কেন? অভিভাবকদের একভাগ যদি বলেন যে দশ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের ইংরেজীর অক্ষরপরিচয় না করালে পরে তাদের আরো কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, নয়তো তারা চিরকাল দুর্বল হয়ে থাকবে, তবে তাঁরা কি বুর্জোয়া বলেই ওকথা বলছেন? না পুত্রকন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে বলছেন? যেখানে বিনা বেতনে বারো বছর পড়াশুনা করা সম্ভব সেখানে যদি কেউ পঞ্চাশ থেকে আশি টাকা পর্যন্ত শুধু বেতন বাবদেই খরচ করতে তৈরি থাকেন তবে বুঝতে হবে যে এটার পেছনে আছে ইংরেজী বনিয়াদ কাঁচা না রেখে পাকা করার সংকল্প। কাঁচা আর পাকা এ দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবে। যাঁদের সাধ্য আছে তাঁরা বেছে নেবেন পাকা। তাঁরা বুর্জোয়া বলে নয়, তাঁরা বাস্তববাদী বলে। তবে হাজার বাস্তববাদী হলেও তাঁরা তাঁদের সন্তানদের সবাইকে জীবনসংগ্রামে সফল দেখে যেতে পারবেন না। ইংরেজীতে কাঁচা হয়েও সাফল্য অর্জন করা যায়। যদি গণিত প্রভৃতি বিষয়ে পাকা হওয়া যায়। যারা বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় প্রথম দশজনের একজন হয়েছে তারা হয়তো গণিতে বা ভূগোলে বা বিজ্ঞানে নম্বর তুলেছে। আজকের পরীক্ষায় গণিত আর বিজ্ঞান হচ্ছে সবচেয়ে ফলপ্রদ বিষয়। তার কাছাকাছি যায় বাণিজ্য। সাহিত্য বা ইতিহাসের জন্যে ক'জন আর্টস বা হিউমানিটিজ পড়তে যায়? যারা যায়

তাদের অনেকেরই লক্ষ্য অর্থনীতি।

হিন্দু, হেয়ার প্রভৃতি বিদ্যালয়ে যতদিন ইংরেজী মাধ্যম ছিল ততদিন অপেক্ষাকৃত কম খরচেই ইংরেজী শিক্ষায় পাকা হওয়া যেত। সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে ইংরেজী মাধ্যম তুলে দেবার ফলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে সে শূন্যতা পূরণ করার জন্যে বেশ কয়েকটি ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয় বেসরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। মাধ্যম হিসাবে না থাকলেও বিষয় হিসাবে ইংরেজী এতদিন ছিল, তাও প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীতে নয়। এখন থেকে তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীতেও থাকবে না। ফলে শূন্যতা পূরণের জন্যে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। ছেলে-মেয়েদের ইংরেজী না শিখিয়ে অভিভাবকরা সোয়াস্তি পাবেন না। তাতে খরচ আরো বাড়বে।

আমাদের সময় আমরা স্কুলে আট বছর ও কলেজে চার বছর পড়ে গ্রাজুয়েট হয়েছি। তার মধ্যে ইংরেজী মাধ্যম ছিল স্কুলের চার বছর ও কলেজের চার বছর। নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চতর বিদ্যালয়ে সাত-আট বছর ইংরেজী পড়েই তিন বছর পরে গ্রাজুয়েট হতে পারা যাবে, তার মধ্যে ইংরেজী মাধ্যমের যোগফল থাকবে না। আর সেই সাত-আট বছরে পড়ানো হবে ইংরেজীর একটা পেপার, দুটো বা আড়াইটে নয়। এত কম ইংরেজী শিখে না হবে চাকরি না হবে জ্ঞান। তবে সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে লাভ হতে পারে।

শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে

পাঁচবছর আগে ঢাকায় আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "আপনারা এখনো ইংরেজীকে আঁকড়ে ধরে আছেন কেন?" এর উত্তরে আমি বলি, "ইংরেজী উঠে গেলে তার জায়গা নেবে হিন্দী। তখন হিন্দীকে নিয়ে আমাদের সেই সমস্যা হবে উর্দুকে নিয়ে আপনাদের যে সমস্যা হয়েছিল। আমরা আর একটা মুক্তিযুদ্ধ চাইনে, আরো ত্রিশ লাখ লোকের মৃত্যু চাইনে, ভারত থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র হতে চাইনে। তাই ইংরেজীকে বহাল রাখতে চাই। তা বলে বাংলার বিনিময়ে নয়।"

এ ছাড়া আরো একটা যুক্তি ছিল। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বে শিক্ষিত ভদ্রলোক বলতে বোঝাত যিনি সংস্কৃত বা ফার্সী শিক্ষিত। প্রবর্তনের পরে বোঝাল যিনি ইংরেজী শিক্ষিত। প্রবর্তনটা ইংরেজদের উদ্যোগে হয়নি, হয়েছিল তৎকালীন বাঙালীদেরই উদ্যোগে। সংস্কৃত শিক্ষা যেমন প্রাচীন ভারতের বার্তা বহন করে আনে, ফার্সী শিক্ষা যেমন মধ্যযুগের তথা মধ্য-প্রাচ্যের, তেমনি ইংরেজী বহন করে আনে আধুনিক ইউরোপ আমেরিকা তথা

বহির্বিশ্বের। যুগচেতনা ও বিশ্বচেতনা যতই বাড়তে থাকে ততই শিক্ষা-বিস্তার হতে থাকে ইংরেজী মারফৎ। যাঁরা বড়লোক যাঁদের চাকরিবাকরির দরকার নেই, তাঁরাও তাঁদের ছেলেদের হিন্দু কলেজে পাঠান, সংস্কৃত কলেজে বা ফার্সী মাদ্রাসায় না। রামমোহনের পিতা কিন্তু ফার্সী মাদ্রাসায় পাঠিয়ে-ছিলেন। আর বিদ্যাসাগরের পিতা সংস্কৃত কলেজে। দু'জনেই এঁরা নিজের চেষ্টায় ইংরেজী শিখে নেন ও ইংরেজীতেও লেখেন। পরবর্তীকালে বলা হলো এটা নাকি দাস মানসিকতা। অনেকের বেলা হতে পারে, সকলের বেলা নয়।

ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন এখনো ফুরোয়নি। অসংখ্য ছাত্র ভারতের বাইরে যাচ্ছে, অসংখ্য ছাত্র ভারতের অন্যান্য রাজ্যে। অসংখ্য ছাত্র কলকাতায় পড়তে আসছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে, বাংলাদেশ থেকে, মালয়েশিয়া থেকে, ইরান থেকে। আফ্রিকার ছাত্রও দেখেছি। শান্তিনিকেতনেও একই ব্যাপার। দার্জিলিংএও। পশ্চিমবঙ্গের এই তিনটি স্থান কেবল বাঙালীদের জন্যে নয়। সারা ভারতের জন্যেও। সারা দুনিয়ার জন্যেও। আমরা বাঙালী এটা যেমন সত্য আমরা ভারতীয় এটাও তেমনি সত্য। আমরা বিশ্বনাগরিক এটাও তেমনি সত্য। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থায় যদি এই ত্রিসত্যের স্বীকৃতি না থাকে তবে আমরা আমাদের সন্তানদের ভারতের তথা বিশ্বের আধুনিকতম জ্ঞানবিজ্ঞান থেকে ও সাহিত্য-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করব। অনুবাদের সাহায্যে কতটুকু পাওয়া যায়? নির্জলা অনুবাদই বা কোথায়? মূল ভাষা না জানলে বিভ্রান্ত হতে হয়।

শিক্ষার পরবর্তী ধাপ জীবিকা। এতে ধনীর স্বার্থ নেই, মধ্যবিত্তের আছে। আছে শ্রমিক-কৃষকেরও। নইলে ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে মোটা বেতন দিয়ে ভর্তি হবার জন্যে শ্রমিক কৃষক ঘরানাদেরও লাইন দেখা যেত না। তারাও চায় ভদ্রলোক হতে। তার মানে ইংরেজীশিক্ষিত ভদ্রলোক। তারাও চায় ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, হাকিম হতে। বাংলা রসাহায্যে কি এসব হওয়া যায় না? কই, দৃষ্টান্ত কোথায়? স্বাধীনতা সব শ্রেণীর ছেলেদের উচ্চা-ভিলাষ বাড়িয়ে দিয়েছে। মেয়েদেরও। চাহিদার অনুপাতে যোগান নেই। অধিকাংশের কপালেই আছে মোহভঙ্গ। তবু কী করে বলি যে, "শ্রমিক কৃষক, তোমরা শুধু বাংলাই শিখবে, বাঙালীই হবে, মানুষ হবে না। ভদ্রলোক হবে না। ওটা নাকি দাস মানসিকতা।" ওরা এর উত্তরে বলবে, "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখায়। আপনারা যদি বাংলা-শিক্ষিত ভদ্রলোক হন আমরাও তাই হব।"

নতুন শিক্ষানীতি

সবাইকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত পড়াতে হবে, বিনা বেতনে পড়াতে হবে, এই যদি হয় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষানীতির মূল কথা তবে তাঁরাই বোধহয় ভারতে অগ্রণী। তা হলে সেই প্রবাদটা অমূলক নয়, বাঙালী আজ যা ভাবে অন্যান্যরা কাল তা ভাববে। এই মহৎ কর্মের জন্যে সরকারকে আমি অভিনন্দনই জানাব, এটা গ্ল্যাডস্টোন প্রদর্শিত পন্থারই অনুবর্তন। ইংলণ্ড অনেক আগেই এ পথ ধরেছে। তাই তো তার গণতন্ত্রের বনিয়াদ পাকা। আমাদের গণতন্ত্রের বনিয়াদও এর ফলে হয়তো পাকা হবে। লোকে বুঝে সুঝে ভোট দেবে। চোখ বুজে ভোট দেবে না। তাদের ভোট যে সব সময় বামপন্থীদের অনুকূলে যাবেই এমন কোনো কথা নেই। ইংলণ্ডের লোক যেমন মাঝে মাঝে শ্রমিকদলকে জিতিয়ে দেয় তেমনি মাঝে মাঝে রক্ষণশীলকেও। এখনকার রক্ষণশীল সরকারকে তো স্বল্পবিত্তরাও ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিয়েছে। পলিসি নিয়ে মতভেদ হলে যারা একদিন গাছে তুলে দেয় তারাই একদিন মই কেড়ে নেয়। এরই নাম গণতন্ত্র।

সবাইকে শিক্ষিত করা কর্তব্য। তার মানে কিন্তু এই নয় যে সবাইকে ইংরেজীতে শিক্ষিত করতে হবে, নইলে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে। গণতন্ত্র নানা কারণে বিপন্ন হতে পারে। তার সঙ্কটকালে ইংরেজী শিক্ষাও তাকে রক্ষা করতে পারবে না। আমাদের ইংরেজী শিক্ষিতদের সম্বন্ধে সেরকম কোনো মোহ আমার অন্তরে নেই। বারো বছর কেন, বিশ বছর ইংরেজী শিক্ষার পরেও তাঁদের অনেকের গণতন্ত্রের জ্ঞান ত্বকের চেয়ে গভীর নয়। খোলসটাই তাঁরা আয়ত্ত করেছেন। অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেননি। কবে করবেন তা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। যে-কোনো দিন গণেশ ওলটাতে পারে। এ কাজে প্রতিক্রিয়াশীলরা যেমন আগুয়ান হতে পারেন প্রগতিশীলরাও তেমনি। ধনতন্ত্রী আর সমাজতন্ত্রী কেউ কারো চেয়ে কম ডিকটেটরভক্ত নন। আমরা এখনো অস্থিমজ্জায় গণতন্ত্রী হয়ে উঠিনি। যদিও নির্বাচন লড়তে সিদ্ধহস্ত।

যা বলছিলুম, সবাইকে শিক্ষিত করার মানে সবাইকে ইংরেজী-শিক্ষিত করা নয়। সে দায় না জাতীয়তাবাদী না সমাজতন্ত্রবাদী কোনো সরকারই ঘাড়ে নেবেন না। ইংরেজী শিক্ষা যাঁদের মতে আবশ্যিক তাঁদের জন্যে থাকবে তাঁদেরই খরচে পরিচালিত ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়। আর থাকবে তাঁদেরই উদ্যোগে স্থাপিত বাংলা-মাধ্যম বিদ্যালয়, যেখানে যারা চায় তারা ইংরেজীও শিখতে পারবে। পারবে প্রথম শ্রেণী থেকেই। সরকার যদি অনুদান দিয়ে সাহায্য না করেন তো নাই বা করলেন। শিক্ষকরা কম বেতনে কাজ করবেন। যেসব অভিভাবক ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ের হাতীর খোরাক যোগাড় করতে অক্ষম তাঁরা এইসব বাংলা-মাধ্যম বেসরকারী বিদ্যালয়েই তাঁদের সন্তানদের পাঠাবেন, যাতে তারা পুরো বারো বছর ধরে ইংরেজীতে অভ্যস্ত হতে পারে ও যাতে তাদের ইংরেজীর বনিয়াদ পাকা হবার সুযোগ পায়। সরকারী

বিদ্যালয়ে বিনা বেতনের ছাত্রদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা সরকারের সাধ্য নয়। কিন্তু বেসরকারী বিদ্যালয়ে পাবলিকের সাধ্যাতীত নয়। ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। সরকারের ইচ্ছা থাকলে সরকারী বিদ্যালয়ের কয়েকটিতে নিশ্চয়ই উপায় থাকত। যেমন হিন্দু স্কুলে, হেয়ার স্কুলে ও বালিগঞ্জ গভর্ণ-মেণ্ট স্কুলে। এই স্কুলগুলিরও ইংরেজীর মান নেমে যাবে। কিন্তু ইংরেজীর মান রাখতেই হবে সরকারের তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কেবল বাংলার মান বজায় রাখতেই তাঁরা বাধ্য। ইংরেজী তো মাতৃভাষা নয়, বিমাতৃভাষা। বিমাতার প্রতি যে আচরণ তার প্রতি সেই আচরণই তাঁদের কাছে প্রত্যাশিত। আমি তো তাঁদের এই বলে সাধুবাদ দিই যে তাঁরা ইংরেজীকে হটিয়ে হিন্দীকে তার জায়গায় বসাননি। ইংরেজী হিন্দীর তুলনায় অনেক বেশি খাতির পাচ্ছে। তবে বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তুলনা হয় না। সেখানে বাংলাই সর্বস্তরে।

ইংলণ্ডে যখন ভোটদানের অধিকার সম্প্রসারিত হয় তখন প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন বলেন, "আমরা আমাদের প্রভুদের শিক্ষিত করতে বাধ্য।" কথাটা এদেশের বেলায়ও খাটে। আমরাও দেশসুদ্ধ লোককে ভোটের অধিকারী করেছি। তাদের সবাইকে শিক্ষিত করে নেওয়া আমাদেরও কর্তব্য। যাতে তারা বুঝে সুঝে ভোট দিতে পারে। ইংলণ্ডেও সর্বসাধারণের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা ছিল না, সবাইকে বাধ্য করাও হতো না, বিনা বেতনেও দেওয়া হতো না। এখন তো সেদেশে মাধ্যমিক শিক্ষাও সার্বজনীন, তথা আবশ্যিক, তথা বেতনমুক্ত। তবে তার মান তেমন উঁচু নয় বলে ইটন, হ্যারো প্রভৃতি পাবলিক স্কুলগুলিরই সম্মান বেশি, তাদের বেতনের হার তো আকাশছোঁয়া। যাঁরা সেসব বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের পাঠাতে পারেন না অথচ সরকারী বিদ্যালয়ও তাঁদের চোখে নিচু মানের তাঁদের পুত্রকন্যার জন্যে আছে আরো একপ্রস্থ বিদ্যালয়। সেগুলিকে বলা হয় প্রাইভেট স্কুল। আসলে ওদেশের পাবলিক স্কুলও প্রাইভেট স্কুল। পাবলিক শুধু নামেই। পাবলিক স্কুলের তুলনায় প্রাইভেট স্কুলের বেতনের হার কম। মধ্যবিত্তদের যার যেমন সাধ্য, যার যেমন রুচি, তার তেমন বিদ্যালয়। একটার ব্যবস্থা থাকবে, সকলের জন্য নির্বিশেষে, এটা ইংরেজদের রীতি নয়।

এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এদেশের অভিভাবকদের আর্থিক সঙ্গতি ও মানসিক অভিরুচির সঙ্গে মিলিয়ে প্রবর্তিত হয়েছে। কেউ একে উপর থেকে চাপিয়ে দেয়নি। উপর থেকে যেটা চাপানো সেটা ব্রিটিশ শাসন, সে শাসনের ভাষা উপরের দিকে ইংরেজী, তাই উচ্চাভিলাষীদের কাম্যও উত্তমরূপে ইংরেজী শিক্ষা। উপর থেকে চাপানো আধুনিক ধরনের শিল্প বাণিজ্য রেলপথ সমুদ্র-পথ ডাকঘর তারঘর ইত্যাদি আরো কত কী! এসব ক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষা অধিকতম সাফল্যপ্রদ। যারা সাফল্য চায় তারা ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী হবেই। সমাজে একটা সুবিধাভোগী শ্রেণী আগেও ছিল, পরেও থাকে। এই শ্রেণীর সকলেই যে ইংরেজীর জন্যে উদ্বাহু তা নয়। মুসলমানরা তো ধনী

নির্ধন নির্বিশেষে তার থেকে সরে দাঁড়ায়। বিহারী, ওড়িয়া, অসমীয়া অভিজাত শ্রেণীরও একই মনোভাব। বাঙালী জমিদারদের মানসিকতায় যদি এর ব্যতিক্রম দেখা দিয়ে থাকে সেটা কলকাতার মিশ্র সংস্কৃতির সংস্পর্শে। কলকাতার পত্তন নবাবী আমল শেষ হবার আগেই। কলকাতার দৌলতে যাঁরা ধনবান হন তাঁরা গোড়ায় ছিলেন বণিক, পরে হন জমিদার, আর সেই নয়া জমিদারদের সংস্কৃতি হয় মিশ্র সংস্কৃতি।

সেই মিশ্র সংস্কৃতি এই দু'তিন শো বছরে বাঙালী সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হয়েছে। যারা ইংরেজী জানে না তারাও ইংরেজীর জন্যে উদ্‌গ্রীব। ইংরেজী তুলে দিলে বাবুদের তেমন ক্ষতি হবে না, তাঁদের সন্তানদের জন্যে রয়েছে ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়। ক্ষতি হবে তাদের যারা বাবু হতে ব্যগ্র। ইংরেজী কেড়ে নেওয়া মানে উঠতি বাবু শ্রেণীর মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া। ইংরেজীর স্বাদ বাংলায় মিটবে না। হোক না কেন তা বাবু ইংরেজী। হোক না কেন তার পনেরো আনা ভুল। তবু ইংরেজী তো বটে। বাঙালীরা জাতকে জাত মধ্যযুগে ছিল সংস্কৃত কিংবা ফারসীর দ্বারা মন্ত্রমুগ্ধ। আধুনিক যুগ তো ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় হয়নি। আধুনিকতার প্রভাব দিন দিন বাড়ছে, তাই ইংরেজীর সম্মোহনও বাড়ছে। বিনা বেতনের প্রলোভনেও ভবী ভুলবে না, সে তার সন্তানদের চড়া বেতনের বিনিময়ে ইংরেজী পড়ানোর শিক্ষক খুঁজবে।

বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহু জাতি ও বহু অঞ্চলকে নিয়ে এই দেশ। এদেশের ঐতিহ্য বহুকে মেনে নিয়ে একত্বের সন্ধান। এর সমাজব্যবস্থা প্লুরালিস্ট। এর শিক্ষাব্যবস্থাও প্লুরালিস্ট। একে একাকার করতে গেলে এর দেহ থেকে প্রাণ চলে যাবে। আমি তো মনে করি শিক্ষাক্ষেত্রেও পাবলিক সেকটরের মতো একটা প্রাইভেট সেকটর থাকা ভালো। স্কুল কলেজের বেলা সেটা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলা হয়নি। সরকারী আওতার বাইরে একটি কি দুটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে শুনেছি, যেমন পুনার ও পরে বোম্বাইয়ের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে সরকারী আওতার বাইরেই রেখেছিলেন, তাঁর পুত্র তাকে সরকারের হাতে তুলে দিয়ে তাকে আরো একশোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একছাঁচে ঢালাই করে গেছেন। একই ভাগ্য অপেক্ষা করছে পণ্ডিচেরীর শিক্ষাপীঠের। গান্ধীজীর সংস্থাপিত গুজরাট বিদ্যাপীঠ বোধহয় এখনো স্বতন্ত্র। শুনছি গুজরাটে একটি গ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সবে কাজ শুরু করেছে। বেসরকারী উদ্যোগে। আমেরিকায় অসংখ্য বেসরকারী কলেজ তথা বিশ্ববিদ্যালয় আছে। জাপানেও। তাদের তুলনায় ভারত যে শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর তাও নয়। আমার মতে সরকারের সমালোচনা করার চেয়ে সরকারের বাইরে থেকে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করাই শ্রেয়। সরকার সাহায্য করতে চাইলে করবেন, কিন্তু পলিসি নির্দেশ করবেন না। কই, অক্সফোর্ড কেমব্রিজকে পলিসি নির্দেশ করতে তো তাঁদের দেশের সরকারের সাহস হয় না। অথচ তাঁদের অর্থের অভাব হয় না।

স্বাধীনতা বজায় রাখতে হলে অক্সফোর্ড কেমব্রিজের পন্থায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করতে হবে।

আজ যারা শিশু বিশ বছর বাদে তারাই তো "নব্য বঙ্গে নবযুগের চালক"। তারা যদি ঠিকমতো শিক্ষা না পায় তবে তাদেরই ভবিষ্যৎ শুধু নয়, দেশের ভবিষ্যৎও অন্ধকার। শিক্ষা নিয়ে স্বাধীন ভারত সরকার এই তেত্রিশ বছর ছিনিমিনি খেলেছে। রাজ্যসরকারও। এর পরিণাম আমরা এখনি দেখতে পাচ্ছি। বিশ বছর পরে যারা থাকবে তারাও দেখতে পাবে।

আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এখনো র‍্যাশনাল হয়নি। জাপানের কলেজে ওরা কাউকে একাধিক বিষয় পড়তে বাধ্য করে না। যেটা যার খুশি সেটাই সে পড়ে। কেউ পড়ে ইংরেজী কেউ ফরাসী, কেউ অন্য কোনো ভাষা বা বিজ্ঞান বা দর্শন বা অন্য কিছু। তবে এ নিয়ম ইতিমধ্যে পালটে গেছে কিনা জানিনে। জার্মানিতেও এই প্রথা ছিল, ইতিমধ্যে পালটে গেছে। মুখ্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরো গোটা দুই গৌণ বিষয়ও শিখতে হয়। যার যেটা ভালো লাগে। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সমস্তটাই ঐচ্ছিক। জাপানের এক একটা কলেজও এক একটা বিশ্ববিদ্যালয় বলে গণ্য। আর জার্মানিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কলেজ বলে আর কিছু থাকলে আমার চোখে পড়েনি। ইংলণ্ডেও কলেজ বলতে আদিতে যা বোঝাত তা পাঠস্থান নয়, বাসস্থান অর্থাৎ ছাত্রাবাস। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয় তখন কলেজগুলো হয় পাঠস্থান, কাউকে সেখানে বাস করতে হয় না, ছাত্ররা বাসা নেয় বাইরে কিংবা বাস করে ছাত্রাবাসে। এদেশে লণ্ডনেরই অনুসরণ করা হয়।

চাকরিকে ডিগ্রীর থেকে বিযুক্ত করার প্রস্তাব এখনো কার্যকর হয়নি। কারণ ডিগ্রীর প্রয়োজন নেই বললে রাম শ্যাম যদু মধু সবাই প্রতিযোগিতায় নামবে ও পাঁচশোটা পদের জন্য পাঁচ লাখ উমেদার হবে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন তাদের পরীক্ষা করতে অক্ষম, তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপরেই সে ভার। তারা যাদের ডিগ্রী দেবে তাদের সংখ্যা পাঁচ লাখ না হয়ে পঞ্চাশ হাজার হতে পারে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন তাদের জন্যে একটা পূর্ববর্তী পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে। আমাদের সময় সেটা ছিল না। কারণ এ রকম ভিড় ছিল না। আজকের এই ভিড় সর্বক্ষেত্রে। তাই সর্বত্র লাইন।

বাংলা আর ইংরেজী

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষানীতির হেরফের নিয়ে যে বিতর্ক উঠেছে সেই প্রসঙ্গে আমাকেও দু-এক কথা বলতে হয়েছে, কিন্তু যে ভাবে আমার মতামত প্রকাশিত হয়েছে তাতে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে। তাই সবিস্তারে লিখছি।

কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীকে যদি প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হয় তবে সে শিক্ষা মাতৃভাষাতেই দিতে হয়। এটাই সব দেশের রীতি। এটাই স্বাভাবিক ও সহজ। এটাতেই সব চেয়ে কম খরচ। অথচ এটাকে ত্রিভাষী সূত্রের আমলে এনে অযথা বিলম্ব করা হয়েছে। আমার সুস্পষ্ট অভিমত এই যে প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষাতেই দিতে হবে। সর্বসাধারণের জন্যে এ ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা হতে পারে না।

কিন্তু প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সরকার থেকে এরা অনুদান পায় না। চায়ও না। অভিভাবকরাই বর্ধিত হারে বেতন দেন। আসনের জন্যে ছ'মাস বা এক বছর আগে থেকে ধর্না দিতে হয়। বাছাইয়ের জন্যে টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়, তাতে পাশ করতে হয়। তারও আগে প্রমাণ করতে হয় যে ছেলেমেয়ের বয়স নির্দিষ্ট বয়সের চেয়ে কম নয়। ধরাধরির ব্যাপারও আছে। ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে কেন এত ভিড়? কারণ অভিভাবকরা বদলী হয়ে যেখানে যাবেন সেখানে ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা অব্যাহত হয়। নয়তো যেখানে যাবেন সেখানকার মাতৃভাষা শেখাতে হবে আগে, তার জন্যে এক বছর কি দু'বছর নষ্ট হবে। ফলে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট। যাঁদের বরাত ভালো তাঁদের বদলীর জায়গায় ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয় থাকে। না থাকলে কী হয় তা অনুমেয়। ভারত সরকার এখন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে হিন্দী মাধ্যম চালাতে চান, যাতে কেউ বলতে না পারেন যে বদলীতে তাঁর পুত্রকন্যার পড়ার ক্ষতি হবে। আমার মতে এটা একপ্রকার জুলুম। হিন্দী তো তাদের মাতৃভাষা নয়।

এ ছাড়া আরেকটা কারণ, যাঁদের বদলীর চাকরি নয় বা যাঁরা চাকুরে নন তাঁদের অভিপ্রায় ইংরেজী মাধ্যমে অভ্যস্ত থাকলে কলেজে ইংরেজী লেকচার বুঝতে ও ইংরেজীতে প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে অসুবিধা হবে না, ফলে নম্বর বেশী উঠবে। প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার ছোট মেয়েকে তার অধ্যাপক বলে রেখেছিলেন যে সে প্রথম শ্রেণী পাবার যোগ্য হলেও প্রথম শ্রেণীতে পাশ করবে না, যদি না ইতিমধ্যে ইংরেজীটা ভালো করে শেখে। "এখন থেকে আমি স্থির করেছি যে ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী না হলে ভর্তি করব না, তুমিই শেষজন।" মেয়ের খাতিরে মাকে কলকাতায় বাসা নিয়ে তাকে ইংরেজী পড়াতে হয়। বাপের পেনসনে টান পড়ে। শ্রম ও ব্যয় পরে সার্থক হয়। কিন্তু ক'জনের মা ইংরেজীভাষিণী ও বাপের পেনসন ছাড়া বই থেকে কিছু আয় হয়? "বিশ্বভারতীর ছেলেমেয়ে আর আমরা নেব না। তুমিই শেষজন।" বলেন তার অধ্যাপক। লেকচার তিনি ইংরেজীতেই দেন, বাংলায় নয়। বইপত্র তো আগাগোড়া ইংরেজী। বিষয়টা জীববিজ্ঞান।

তা বলে আমি বলব না যে ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয় ভিন্ন আর কোন বিদ্যালয় থাকবে না। যারা পছন্দ করে তাদের জন্যে নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু যারা পছন্দ করে না তাদের যেন বাধ্য না করা হয় ইংরেজী ছেড়ে বাংলা বা হিন্দীর মাধ্যমে পড়াশুনা করতে। যারা চায় তাদের জন্যে বাংলা-মাধ্যম

কলেজও থাকবে, কিন্তু যারা চায় না তাদের যেন সেখানে পড়তে বাধ্য না করা হয়। কার ভবিষ্যৎ কোন্ মার্গে তা বাইরের লোক কী করে জানবে? যারা তাকে চেনে ও তার মনের খবর রাখে তারাই বলতে পারে কোন্ মাধ্যম তার পক্ষে হিতকর। জাতীয়তা ইত্যাদির প্রশ্ন এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক হচ্ছে ভবিষ্যৎ জীবন ও জীবিকা। একটি ছেলেকে পঙ্গু করে রাখলে ভারত উদ্ধার হবে না, বাংলাদেশ লাল হবে না। বাংলাদেশ বলতে আমি দুই বাংলাকেই বুঝি।

এতক্ষণ বলা হল ইংরেজী মাধ্যমের কথা। যেখানে ইংরেজী মাধ্যমে পড়ানো হয় না সেখানে ইংরেজী হচ্ছে অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়। গোড়া থেকেই আবশ্যিক। শোনা যাচ্ছে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী আদৌ পড়ানোই হবে না, আবশ্যিক হিসাবে তো নয়ই, স্বমনোনীত হিসাবেও না। এটা যদি সত্য হয় তবে সরকারী হাই স্কুলগুলির প্রাথমিক বিভাগ এখন থেকে ইংরেজীশূন্য হবে। বেসরকারী হাই স্কুলগুলি যদি সরকারী অনুদান-নির্ভর হয় তবে সরকারের ইচ্ছা অমান্য করা তাঁদের সাধ্য নয়। ছাত্রছাত্রীদের ইচ্ছা অনিচ্ছা কেউ বিবেচনা করবেন না। অথচ ভবিষ্যৎ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তো তাদেরই হবে। একজন শিক্ষক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, "এর মধ্যেই কয়েকটি বেসরকারী বিদ্যালয় বেশী বেতন নিয়ে ইংরেজীতে পড়াচ্ছে বা ইংরেজী পড়াচ্ছে। অভিভাবকরা সেই সব বিদ্যালয়েই ছেলেমেয়েদের পাঠাচ্ছেন। ফলে ছাত্রসমাজ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। যারা ইংরেজীনবিশ ও যারা বাংলানবিশ। এটা কি ভালো হচ্ছে?"

আমার মতে ইংরেজী শেখা দশবছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু পরে তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে, নয়তো ছেলেরা ইংরেজীতে কাঁচা থেকে যাবে। আমি নিজে কী করেছি তা বলছি। আমার বড় ছেলেকে আটবছর বয়স পর্যন্ত ইংরেজী শিখতে দিইনি। তার মা ইংরেজীভাষিণী, তাঁকেই বাংলা শিখতে হয়েছে ছেলেকে বাংলা শেখাতে ও বাংলায় শেখাতে। আট বছর বয়সে সে বাংলায় সবকিছু পড়েছিল, তবু শান্তিনিকেতনের পাঠ-ভবনের কর্তারা তাকে তার সমবয়সীদের ক্লাসে ভর্তি করতে নারাজ হলেন, যেহেতু সে ইংরেজী একেবারেই জানে না। তাকে বলা হল সবচেয়ে নিচের ক্লাসে ভর্তি হয়ে দু' বছর পিছিয়ে থাকতে। ছেলের দুটো বছর নষ্ট হত, যদি আমি এ প্রস্তাব মেনে নিতুম। ওকে বাড়িতেই ইংরেজী শেখাতে শুরু করি, তিন বছর বাদে একজন ইংরেজ হেডমাস্টার ওকে হাই স্কুলে ওর সমবয়সীদের ক্লাসে ভর্তি করে নেন। ম্যাট্রিক ও প্রথম শ্রেণীতে পাশ করে। ইংরেজীতে পায় শতকরা সত্তরের বেশী। গোড়া থেকে ইংরেজী শেখেনি বলে ওর তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ওর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। সেটা ক'জনের সাধ্যে কুলোয়? এগারো বছর বয়সে ইংরেজী শিখতে শুরু করলে কি কোন হাই স্কুলেই ওঁর ঠাঁই হত? ওকে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিতে হত। ফলাফল অনিশ্চিত।

সরকার তাঁদের হাই স্কুলে যা করতে চান করুন, কিন্তু বেসরকারী স্কুলগুলিকে যেন একই নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য না করেন। ওরা যদি পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষ ব্যবস্থা করতে না পারে তো প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজী পড়াতে বা ইংরেজীতে পড়াতে শুরু করবে। অভিভাবকদের যাঁর যেমন খুশি তিনি তেমনি পর্যায়েই ইংরেজী পড়ানো বা ইংরেজীতে পড়ানো শুরু করবেন। সরকার যদি অনুদান দিতে না চান তো সরকারের খুশি। ছেলেমেয়েরা যদি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, একভাগ হবে ইংরেজীনবিশ ও আরেক ভাগ বাংলানবিশ, সেটা বেআইনী হবে না। আইনে মানুষকে যেসব অধিকার দিয়েছে তার মধ্যে এটাও পড়ে যে অভিভাবক তাঁর পুত্রকন্যার পক্ষে যেটা হিতকর সেইটেই বেছে নেবেন। স্কুল পরিচালকদের স্বাধীনতা আছে, তাঁরাও স্থির করবেন কোন্‌টা শ্রেয়।

এর পরে কলেজের কথা। এতদিন বিজ্ঞানের ছাত্রদের অন্যতম বিষয় হিসাবে ইংরেজী ও বাংলা পড়তে হত না, কিন্তু হিউম্যানিটিজ তথা বাণিজ্যের ছাত্রদের বেলা সেটা ছিল আবশ্যিক। এখন থেকে তাদের বেলাও আবশ্যিক হবে না। তবে ফালতু পাঠ্য হিসাবে কেউ নিতে পারবে ইংরেজী, কেউ সংস্কৃত, কেউ বাংলা। পাশ মার্ক রাখতে না পারলে ক্ষতি হবে না, রাখতে পারলে বাড়তি নম্বরগুলো অন্যান্য বিষয়ের নম্বরগুলোর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। যোগফল লাভজনক হবে। আমি এ সিদ্ধান্তের বিরোধী নই। কারণ আমি ছাত্রদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইংরেজী ও বাংলা শিখতে বাধ্য করা সঙ্গত মনে করিনে। যারা ভালো করে শিখতে চায় তারা অন্যতম বিষয় হিসাবে বাংলাও নিতে পারবে, ইংরেজীও নিতে পারবে। কিন্তু একসঙ্গে নয়। কলেজ পর্যায়ে এখনও ইংরেজী মাধ্যম চালু আছে। সেই সূত্রে খানিকটে ইংরেজী সকলেরই শেখা হয়ে যায়। আর বাংলা যদিও মাধ্যম নয় তবু কার্যত বাংলাতেই লেকচার দেওয়া হয়ে থাকে, উত্তরপত্রও বাংলাতেই লেখা হয় অধিকাংশ কলেজে। সেই সূত্রে বাংলাও খানিকটে শেখা হয়ে যায়। অবশ্য সে বাংলা বা ইংরেজী জ্ঞান সাহিত্যের জ্ঞান নয়। সাহিত্যের জ্ঞান কলেজে না হলে কি নয়? যাদের তাতে রুচি আছে তাদের বলব অন্যতম বিষয় হিসাবে বাংলা বা ইংরেজী নিতে। আর উচ্চাভিলাষী হলে ফালতু বিষয় হিসাবে হয় বাংলা নয় ইংরেজী নয় সংস্কৃত নিতে।

শিক্ষার সুযোগ যারা পাচ্ছে না তাদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। এ বিষয়ে দ্বিমত থাকা উচিত নয়। কিন্তু শিক্ষার সুযোগ যারা পাচ্ছে তাদের সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে হবে, নইলে সমাজে দুটি শ্রেণী থেকে যাবে, এইখানেই দ্বিমত। একটি শ্রেণী ইংরেজীনবিশ হয়ে বড় বড় সরকারী চাকরি, বড় বড় কোম্পানীর চাকরি পাবে, এ রাজ্যে না পেলে অপর রাজ্যে পাবে, এ দেশে না পেলে অপর দেশে পাবে, আরেক শ্রেণী বাংলানবিশ হয়ে ছোট ছোট চাকরিও পায় কিনা সন্দেহ, তাও শুধু এই রাজ্যেই, কেন এই বৈষম্য? ইংরেজীর জন্যেই তো। অতএব তুলে দাও ইংরেজী মাধ্যম, তুলে দাও

আবশ্যিক স্বমনোনীত বিষয় হিসাবে ইংরেজী, তুলে দাও আপাতত প্রাথমিক পর্যায় থেকে, পরে মাধ্যমিক পর্যায় থেকেও, আরও পরে কলেজ পর্যায় থেকেও। এই যে মনোভাব এর বিপরীত মনোভাব হচ্ছে, প্রত্যেকটি পর্যায়েই ইংরেজী শেখাও, স্বমনোনীত বিষয় হিসাবে তো নিশ্চয়ই, আবশ্যিক বিষয় হিসাবেও। মাধ্যম হিসাবে যেখানে আছে সেখানে রেখে দাও, যেখানে নেই সেখানেও প্রবর্তন কর। সুযোগ থেকে কাউকেই বঞ্চিত কোরো না, উল্টে আরও বেশী সুযোগ দাও।

এই দুই চরম মনোভাব জনমতকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। এক পক্ষ আরেক পক্ষকে বলছেন, "তোমরা সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করছ। সবাই হবে সমান অন্ধ।" অপর পক্ষ এর উত্তরে বলছেন, "ইংরেজ চলে গেছে, অথচ ইংরেজীর মোহ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এ মোহ কৃষক শ্রমিককেও যদি পেয়ে বসে তা হলে বৈষম্যের আর মূলোচ্ছেদ হবে না।" এই তর্কের সার কথা, সবাই যদি সাহেব হতে চায় তো হোক না কেন সাহেব। সবাই যদি সাহেব হতে না পারে তো একশ্রেণী কেন সাহেব হবে, হোক না কেন জবাই।

আমার মতে এ তর্কের মীমাংসা ছাত্রছাত্রীদের উপরে ছেড়ে দেওয়া উচিত। শর্ত শুধু এই, যেটা পড়বে সেটা মন দিয়ে পড়বে, তাতে ফেল করবে না, গ্রেস মার্ক চাইবে না, টোকাটুকি করবে না। সাধ্য বুঝে কাজ।

আচার্যকুলের প্রতি

প্রাচীন ভারতের মতো মধ্যযুগের ইউরোপেও একপ্রকার বর্ণাশ্রম ছিল। লাটিন শিক্ষা ও লাটিনের মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষা সর্বসাধারণের জন্যে নয়, উচ্চতর বর্ণের জন্যেই। এদেশে যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ওদেশেও তেমনি যাজক ও অভিজাত শ্রেণী। ইংরেজীতে যাঁদের বলা হতো লর্ডস স্পিরিচুয়াল ও লর্ডস টেম্পোরাল। হাউস অব লর্ডসে তাঁদেরই অধিষ্ঠান। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ তাঁদেরই গুরুকুল। ইংলন্ডের যাবতীয় রাজকর্মে তাঁদের বা তাঁদের শিষ্যদের বা অপত্যদের একাধিপত্য। অন্যান্য রাজ্যের অবস্থা ও ব্যবস্থাও মোটামুটি সেইরূপ। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদেরই প্রবেশ ছিল যাঁরা চার্চের ও স্টেটের উচ্চতর পদগুলি পূরণ করার প্রার্থী। যাঁদের বরাতে সেসব জুটত না তাঁরা অভিজাত পরিবারে গৃহশিকক্ষতা করতেন বা নিজেরাই বিদ্যালয় খুলতেন। বৈশ্য ও শূদ্রদের লাটিন শিক্ষার বা লাটিনের মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজনও ছিল না, সুযোগও ছিল না। পাঠশালার তিনটি 'আর'—রিডিং, রাইটিং, রিথমেটিক (লেখা, পড়া, আঁক কষা)—এই পর্যন্ত তাদের দৌড়। কিন্তু

ছাপাখানার উদ্‌ভাবনের পর পুঁথিপত্র সুলভ হওয়ার ফলে ইংরেজী, ফরাসী, ইটালিয়ান প্রভৃতি ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয়। গ্রীক, লাটিন থেকে বিস্তর বই লোকসভায় তর্জমা হয়। লেখাও হয় নাটক, নভেল, কাব্য। পড়াশুনার ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আসে। লোকে পাঠশালায় সন্তুষ্ট নয়। তারা চায় স্কুল। তাতেও সন্তুষ্ট নয়। তারা চায় ইউনিভার্সিটি। ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ত তাদের আবাসকেই বলা হতো 'কলেজ'। 'কলেজ' কথাটার আদি অর্থ ছাত্রাবাস। বৈশ্য বর্ণীয় ধনীর ছেলেরা ইউনিভার্সিটিতে যেতে চাইলে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তন হয় ও 'কলেজে'র অর্থও বদলে যায়। ছাত্রাবাসের বাইরেও বিপুলসংখ্যক ছাত্রকে থাকতে দেওয়া হয়। লণ্ডনের অনুকরণে কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাইতে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় সেসব আবাসিক নয়, তাদের অধীনস্থ কলেজের ছাত্ররা কলেজের বাইরে থাকতে পারে ও থাকে।

বৈশ্যবর্ণীয় ইংরেজ ফরাসীদের বুর্জোয়া বলা হতো। কারণ তারা প্রধানত নাগরিক। ইতিমধ্যে একটা মধ্যশ্রেণীও গড়ে ওঠে। যেমন উকীল, ডাক্তার, ইন্‌জিনীয়ার, কেরানী। লণ্ডন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে এদেরই সংখ্যাধিক্য। পরে সরকারী চাকরিতেও এদের সংখ্যাবৃদ্ধি। এরাও নাগরিক বলে বুর্জোয়া নামে অভিহিত। সরকারী ভাষা লাটিনের পরিবর্তে ইংরেজী ফরাসী ইত্যাদি হয়। পরে আদালতের ভাষাও তাই হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাও তাই। এই যে বিবর্তন এটা একদিনে বা এক দশকে বা এক শতাব্দীতে ঘটেনি। নির্বিবাদেও ঘটেনি। কিছুদিন আগেও লাটিন না জানলে কাউকে অক্সফোর্ড কেমব্রিজে ভর্তি করা হতো না। ব্যারিস্টার হতে দেওয়া হতো না।

ঊনবিংশ শতাব্দীটা বুর্জোয়াদের অভ্যুত্থানের যুগ। পরে তাদের আধিপত্যের বিরোধীপক্ষ হিসাবে সমাজের নিম্নতম শ্রেণীরও নিদ্রাভঙ্গ হয়। তারাও চায় তাদের ছেলেদের স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে। তাদের বন্ধুরা তাদের জন্যে নৈশ বিদ্যালয়, নৈশ কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষিত শ্রমিকদের একদল পার্লামেন্টেও যায় ও পরে শাসকদল হয়। তাদের চাপে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। শ্রমিকের ছেলেরা ছাত্রবৃত্তি নিয়ে অক্সফোর্ড কেমব্রিজেও যেতে পারে। ছাত্রবৃত্তি পাওয়া শ্রমিকের ছেলেরা এখন অভিজাত তথা বুর্জোয়া বংশধরদের চেয়ে সংখ্যাধিক। তাদের জন্য নিত্য নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে। সরকারী দফতরের দুয়ারও খুলে যাচ্ছে। তবে বনেদী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের শিক্ষার মান নিম্নতর করতে রাজী নয়। নিম্নতর শ্রেণীর প্রতি ন্যায়বিচার এক জিনিস, আর শিক্ষার মান নিম্নতর করা আরেক জিনিস। যারা উচ্চ মানের উপযোগী নয় তাদের বছর খানেক বাদে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে উচ্চবংশীয়রাও পড়ে। অক্সফোর্ড কেমব্রিজের এত যে সুনাম তার কারণ সেখানকার শিক্ষার মান কারো চাপেই নিম্নতর হবে না। সরকারের চাপেও না। সেসব বিশ্ববিদ্যালয় কণ্ট্রোল করেন সেখানকার আচার্যকুল। তাঁদের বলা হয় ফেলো। যাকে তাকে ফেলো করা হয়

না। ফেলো নির্বাচনের পদ্ধতি অতি কঠোর। ফেলোদের অমান্য করার সাধ্য কারো নেই। ছাত্ররা দল পাকালে ছাত্রদেরই রাস্টিকেট করা হয়। রাজনীতিকরা নাক গলাতে সাহস পান না। ফেলোদের অমান্য করলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হবে।

তা বলে ফেলোরা কি সব সময় অভ্রান্ত? না, তাঁদের মধ্যেও দলাদলি আছে। অনেক সুযোগ্য অধ্যাপককে তাঁরা অন্যত্র যেতে বাধ্য করেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁরা শিক্ষার মান বজায় রেখেছেন। সেইজন্যে অক্সফোর্ড কেমব্রিজের ছাপ থাকলে ছাত্ররা সর্বত্র মান পায়। শিক্ষার মান সামাজিক শ্রেণীনিরপেক্ষ। তুমি শ্রমিকপুত্র বলে নিম্ন অধিকারী নও কিংবা অভিজাত-বংশীয় বলে উচ্চ অধিকারী নও। পক্ষান্তরে তোমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে তোমাদের খাতিরে শিক্ষার মান নামাতে হবে, নিম্ন অধিকারীকে উচ্চ অধিকারী করতে হবে, এটাও ঠিক নয়। কে কোন্ শ্রেণীভুক্ত, কার শ্রেণীর সংখ্যা কত, কার কত রাজনৈতিক জোর, এসব অবান্তর গণনা। যে ছেলেটি যোগ্য হবে তার যদি অর্থবল না থাকে তবে তাকে ছাত্রবৃত্তি দিয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠানো যাবে। যদি অর্থবল থাকে তবে সে নিজের খরচেই পড়বে। কিন্তু সকলের বেলাই একই মান। সে মান যথাসম্ভব উচ্চ। তা বলে তাকে অযথা উচ্চ করাও অনুচিত। আমরা শিক্ষার বিস্তারই চাই, শিক্ষাকে একটি 'এলিৎ' শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইনে।

আমাদের সমস্যা এখন সব দেশেরই সমস্যা। জার্মানীতে গিয়ে দেখি একটি হল তৈরি হচ্ছে। সেখানে দু'হাজার ছাত্রকে পড়াবেন একজন অধ্যাপক। কী করে তা সম্ভব? সম্ভব যন্ত্রপাতির সাহায্যে। ছাত্রদের প্রত্যেকের কানে থাকবে একটি করে ইয়ারফোন। তারা হলের পেছনের সারিতে বসলেও অধ্যাপকের বক্তৃতা সমানে শুনতে পাবে। তাঁকেও গলা ফাটাতে হবে না। একটি ক্লাসে দু'হাজার ছাত্র! বিষয়টার নাম কী জানতে চাইলে শুনি, অর্থনীতি। তবে অন্যান্য বিষয়ের ছাত্ররাও সে হলে বসতে পারবে, যখন সে হল খালি থাকে। উত্তম ব্যবস্থা, কিন্তু সেমিনারের বেলা কী হবে? দু'হাজার ছাত্রকে নিয়ে তো সেমিনার হয় না। চাই আরো বহুসংখ্যক অধ্যাপক। ছাত্রবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অধ্যাপকবৃদ্ধিও করতে হবে। অথচ সুযোগ্য অধ্যাপকের সর্বত্র অভাব। উচ্চ অধিকারীরা উচ্চ বেতনের লোভে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়, সেখানে ঠাঁই না পেলে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে। অনেকেই চায় টেকনোলজি পড়তে। তাতেই রোজগার বেশী। সাহিত্য বা দর্শন বা ইতিহাসের জন্যে উচ্চ অধিকারী পাওয়া শক্ত। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে নাকি দর্শন বিভাগটাই তুলে দেওয়া হয়েছে। অথচ আধুনিক ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মূল বিষয়ই তো হলো দর্শনশাস্ত্র। যেমন মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মূল বিষয় ছিল থিয়োলজি বা অধ্যাত্মশাস্ত্র। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে থিয়োলজি নেই। কিন্তু ফিলসফি আছে। যদি ছাত্রের অভাবে সেটা উঠে যায় তবে দুঃখের বিষয় হবে।

বিজ্ঞান, বাণিজ্য, অর্থনীতি, স্থাপত্য ও চিকিৎসাবিদ্যার উপরেই ঝোঁক পড়েছে অধিকাংশ উচ্চ অধিকারীর। অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ অধিকারী বিরল। তা হলে কি নিম্ন অধিকারী নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে হবে? আচার্যকুল কী বলেন?

গত শতাব্দীতে শূদ্র জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে নারী জাগরণও শুরু হয়। মেয়েরাও চায় স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। তাদের জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও হয়। কিন্তু তাতে কুলায় না। বর্তমান শতাব্দীতে সহশিক্ষা প্রচলিত হয়। সহশিক্ষার আদি কিন্তু কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ তথা প্রেসিডেন্সী কলেজেই। খ্রীস্টান ও ব্রাহ্ম মেয়েদের খাতিরে। আজকাল হিন্দুসমাজের মেয়েরাও বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠিনী। মুসলিম মেয়েরাও দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারি পড়ার জন্যেও মেয়েদের উৎসাহ ছেলেদের চেয়ে কম নয়। তবে মোটামুটি বলা যায় যে ছেলেদের নজর যেমন অর্থকরী বিষয়গুলোর উপরে মেয়েদের নজর তেমন নয়। আর্টস বা হিউমানিটিজ বলতে যেসব বিষয় বোঝায় সেসব আজকাল ছেলেদের চেয়ে মেয়েদেরই পছন্দ। এক একটা ক্লাসে ছেলের চেয়ে মেয়ের সংখ্যাই বেশী। তারা জানে যে চাকরি তাদের জুটবে না। কিন্তু বিয়ে তো আটকাবে না। মেয়েরা চাকরি পেলেও বিয়ে করে, না পেলেও বিয়ে করে। ছেলেদের বেলা সেকথা বলা চলে না। আর মধ্যবিত্তদের তো চাকরিগত প্রাণ।

এক কথায় বলতে গেলে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার উপরেই একালে মধ্যবিত্ত সমাজের রুচি অরুচির প্রভাব। অভিজাতদের আধিপত্য আর নেই। শ্রমিকদের আধিপত্য আসতে দেরি আছে। আর্থিক উন্নতির কল্যাণে ওরাও মধ্যবিত্ত মানসিকতার পক্ষপাতী হয়েছে। ওরাও ওদের ছেলেমেয়েদের মধ্যবিত্ত দেখতে চায়। ছোটলোক বলে যাদের অবজ্ঞা করা হতো তারাও হঠাৎ বড়লোক না হোক একপুরুষে ভদ্রলোক হতে পারে। হচ্ছেও। বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে যাঁরা বিপ্লবের হাতিয়ার শানাচ্ছেন তাঁরাও তাঁদের পুত্রকন্যাদের বাবুয়ানা শেখাচ্ছেন। বাবুদের সঙ্গেই তারা এক বিদ্যালয়ে বা এক কলেজে পড়ে। দেশ স্বাধীন হবার পরে যত্র তত্র ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয় গজিয়ে উঠেছে। সেখানে বাবুদের ছেলেরা তো আছেই, আরো আছে তাদেরও সন্তান যাঁরা নিজেরা বাবু হতে না পারুক ছেলেদের বাবু দেখতে চায়। ইংরেজী আদৌ না জানলে বাবু হওয়া যায় না। ভালো জানলে আরো এক ধাপ উপরে ওঠা যায়। বিদেশে গিয়ে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া যায় ও পরে সাহেব হওয়া যায়। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর থেকে ইংরেজীর পাট উঠিয়ে দিলে কী হবে, ইংরেজীর চাহিদা বাড়ছে বই কমছে না, কারণ বাবুয়ানার চাহিদাও বাড়ছে। সাহেবিয়ানার চাহিদাও। দর্জির দোকানের দিকে চেয়ে দেখুন। আর সর্বশ্রেণীর পোশাকের দিকে।

ইংরেজী ঐচ্ছিক হোক

আজকের বিতর্কটা শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে নয়, শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে। কিন্তু এখনো অনেকের ধারণা যে ইংরেজীকে মাধ্যম করা উচিত কি না এইটেই বিতর্কের বিষয়। এ নিয়ে বিতর্ক বহুপূর্বেই হয়ে গেছে। ইংরেজী মাধ্যমের পক্ষপাতী যাঁরা তাঁদের সন্তানদের জন্যে বিকল্প হিসাবে সেণ্ট জেভিয়ার্স, সেণ্ট লরেন্স, লা মার্টিনিয়ের, লোরেটো প্রভৃতি পুরাতন ও সাউথ পয়েণ্ট, আশিট ইডিথ প্রভৃতি নতুন বিদ্যালয় সরকারের সম্মতিক্রমে সহ-অবস্থান করছে। শুধু তাই নয়, ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ের চাহিদা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে, তাই ছাত্রসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়সংখ্যাও বেড়েই চলেছে। আসানসোল, বর্ধমান প্রভৃতি শহরেও সেণ্ট জেভিয়ার্স বিদ্যালয় দেখতে পাওয়া যায়। সেণ্ট জেভিয়ার্স আজকাল ভারতের নানান রাজ্যে ডালপালা মেলেছে। ডন বস্কোরও বহু শাখাপ্রশাখা। এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনও ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয় স্থাপন করে চলেছে। নরেন্দ্রপুর এখন এত জনপ্রিয় হয়েছে যে ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকেও ভিন্নভাষী ভারতীয়রা এসে সেখানে বাঙালী ছাত্রদের সঙ্গে ইংরেজীতে পড়াশুনা করছে। ভারতের বিভিন্ন শহরেই আগেকার দিনে একটি কি দুটি ইউরোপীয়ান স্কুল থাকত, এখনো আছে। নামে ইউরোপীয়ান, আসলে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ভারতীয় খ্রীস্টান বা হিন্দু মুসলমান পার্শী। এইরকম একটি স্কুলে বিদ্যারম্ভ করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। পরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সরকারী কলেজিয়েট স্কুলে। সেখান থেকেই তিনি ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করেন। তাঁর সময় ইউরোপীয়ান স্কুলে ম্যাট্রিক অবধি পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল না, থাকলে সম্ভবত তিনি কটকের ইউরোপীয়ান স্কুল থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করতেন। আজকাল শুনছি সেই স্কুলে সেকেণ্ডারি বা হাইয়ার সেকেণ্ডারি অবধি পড়ানো হয়। পড়ে যারা তারা সবাই ভারতীয়, বেশীর ভাগই হিন্দু।

সুভাষচন্দ্র যে সরকারী বিদ্যালয়ে পরে ভর্তি হন তাতে ইংরেজী পড়ানো হতো বিষয় হিসাবে সব ক'টা শ্রেণীতেই। কিন্তু মাধ্যম হিসাবে ইংরেজীতে পড়তে হতো শুধুমাত্র উপরের চারটি শ্রেণীতে। নিচের চারটি বা ছ'টি শ্রেণীতে ছিল ভার্নাকুলার মাধ্যম। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের শিক্ষার মাধ্যম ছিল প্রথমে ইউরোপীয়ান স্কুলে ইংরেজী, পরে সরকারী স্কুলে বাংলা, আরো পরে সরকারী স্কুলে আবার ইংরেজী। সুভাষচন্দ্র যখন ম্যাট্রিক দেন তখনো কটক ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এখতিয়ারে। তিনি ম্যাট্রিকুলেশনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বোধ হয় বনিয়াদ শক্ত ছিল বলেই।

শান্তিনিকেতনের ছাত্ররাও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বসত। তাই উপরের দুটি শ্রেণীতে তাদেরও শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজী। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর পুত্রের মুখ চেয়ে আপস করতে হয়।

আর পুত্রপ্রতিম ছাত্রদের মুখ চেয়েও। সুধীরঞ্জন দাস প্রমুখ যশস্বী ছাত্রদেরও নিচের দিকের শ্রেণীগুলির মাধ্যম ছিল বাংলা, উপরের দিকের দুটি শ্রেণীর মাধ্যম ছিল ইংরেজী। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন ইংরেজী মাধ্যমেই পাশ করত। তাঁর প্রয়াণের দশ বছর বাদে বিশ্বভারতী যখন নিজেই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে তখন তার নিজস্ব ম্যাট্রিকুলেশনের মাধ্যম হয় বাংলা। তখন থেকে ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়-বিভাগ থেকে নির্বাসিত। মাঝখানে সুধীরঞ্জন দাস উপাচার্য হয়ে অবাঙালী ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্যে আবার ইংরেজী মাধ্যম প্রবর্তন করেন, এবার গোড়া থেকেই। এটা কিন্তু বিকল্প হিসাবে। কাউকেই ইংরেজী মাধ্যমে পড়তে বাধ্য করা হতো না। যে কারণেই হোক শান্তিনিকেতন এই পরিবর্তনটা সংরক্ষণ করেনি। এখন বাংলাই বিদ্যালয় বিভাগের একমাত্র মাধ্যম। ফলে ভিন্নভাষী ছাত্রদের সংখ্যাও কমে গেছে। যারা বাইরে থেকে আসে তারা কলেজ বিভাগ বা কলাভবন বা সঙ্গীত ভবনের জন্যেই আসে। কলেজ বিভাগে ইংরেজী মাধ্যম এখনো বিদ্যমান। সেটা উঠে গেলে বাইরে থেকে বিশেষ কেউ পড়তে আসবে না। বিশ্বভারতীর উচ্চতর স্তরে ইংরেজী মাধ্যম কেন থাকবে এ নিয়ে বিতর্ক বারো তেরো বছর আগে একগোট হয়ে গেছে। বিশ্ব আর ভারতের মুখ চেয়ে বিশ্বভারতীকে অবাঙালী শিক্ষার্থীদের সুবিধার কথা ভাবতে হয়। তাই বাংলা মাধ্যমের প্রবর্তন উচ্চতর স্তরে এখনো ঘটেনি। একই সমস্যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও। এই বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হলেও এর পরিধি ছিল উত্তরভারত, বর্মা ও সিংহলব্যাপী। ইতিমধ্যে বার বার সঙ্কুচিত হলেও এর চরিত্র কসমোপলিটান। এখনো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অনেকেই অবাঙালী তথা অভারতীয়। এটিও আর একটি বিশ্বভারতী। কী করে এর মাধ্যম শুধুমাত্র বাংলা হবে? ইংরেজী ও বাংলার সহ-অবস্থানই এ সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলের ভাবনা চিন্তা দ্বিভাষী সূত্রের সন্ধানী। তাঁদের অনেকের আশঙ্কা ইংরেজী মাধ্যম উঠে গেলে হিন্দী মাধ্যম তার জায়গায় উড়ে এসে জুড়ে বসবে। বাংলায় তাতে কি সুরাহা হবে? এই যে আশঙ্কা এটা কি অমূলক?

আমি আগেই বলেছি যে আজকের বিতর্কটা মাধ্যম নিয়ে নয়। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে ইংরেজীর অবস্থান কোন্ স্তরে বহাল থাকবে, কোন্ স্তরে বিলুপ্ত হবে। কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই স্থির করেছেন যে বি-এ ডিগ্রীর জন্যেও ইংরেজী আবশ্যিক হবে না। যার ইচ্ছা সে ইংরেজী বলে একটি বিষয় বেছে নিতে পারে, যেমন ইতিহাস বলে একটি বিষয় বেছে নিতে পারে, দর্শন বলে একটি বিষয় বেছে নিতে পারে। এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠলে আপস হিসাবে ইংরেজীকে অতিরিক্ত শিক্ষণীয় বিষয় করা হয়। কিন্তু তাতে কেউ ফেল করলেও ডিগ্রী আটকাবে না। পাশ করলে অতিরিক্ত নম্বর মোটের মাথায় জুড়ে দেওয়া হবে, পাশ মার্ক বাদে। বাংলার

বেলায়ও অনুরূপ ব্যবস্থা।

আপাতত সে প্রতিবাদের ঝড় থেমেছে। এখন যা নিয়ে প্রতিবাদ তা মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে ইংরেজীর অবস্থান বা প্রস্থান। কর্তাদের মতে মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী একটি অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে বরাবর বিদ্যমান ছিল, বরাবর বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে সে আর অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হবে না, এমন কি ঐচ্ছিক শিক্ষণীয় বিষয়ও নয়। অর্থাৎ দশবছর বয়সের আগে কর্তারা কাউকেই ইংরেজী শিখতে দেবেন না, সে বেতন দিতে চাইলেও ইংরেজী পড়ার সুযোগ পাবে না, বইপত্র নিজের খরচে কিনতে চাইলেও ইংরেজী পড়ার অনুমতি পাবে না। একটি ক্লাসের ত্রিশটি ছাত্রের মধ্যে পঁচিশটিই যদি ইংরেজী পড়তে চায়, বেতন দিতে চায়, বইপত্র নিজেরাই কিনতে প্রস্তুত থাকে তা হলেও তাদের ইচ্ছায় কর্ম নয়, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। যে বিদ্যা দশবছর বয়স হলেই অবশ্য শিক্ষণীয় সেই বিদ্যাই আট বছর বয়সে অবশ্য বর্জনীয়, আরো কম বয়সে তো বিলকুল বর্জনীয়, এ তত্ত্ব যাঁরা সমর্থন করতে পারছেন না তাঁরা কি বাঙালী নন, তাঁরা কি বাংলাকে ভালোবাসেন না? তাঁরা কি সকলেই শ্রমিকবিদ্বেষী, কৃষক-বিদ্বেষী? তাঁদের দলে কি শিক্ষাব্রতী নেই, শিক্ষাবিজ্ঞানী নেই? তাঁদের মধ্যে তো বামপন্থীদেরও নাম দেখতে পাই।

রবীন্দ্রনাথ থাকতেই তাঁর বিদ্যালয়ে ছয় বছর বয়স থেকেই ইংরেজী ছিল অবশ্য শিক্ষণীয় একটি বিষয়। এ খবরটা আমার জানা ছিল না। বার বার সেখানে গেলেও আমি সে বিষয়ে খোঁজখবর নিইনি। আমার বড়ছেলেকে যখন শান্তিনিকেতনে ভর্তি করার জন্য নিয়ে যাই তখন তার বয়স আটবছর। গুরুদেবেরই শিক্ষানীতি অনুসারে তাকে একসঙ্গে দুটি ভাষা শেখানো হয়নি, তার মাকেই বাংলা শিখে নিয়ে তাকে একমাত্র বাংলাভাষাই শেখানো হয়েছে ও বাংলা মাধ্যমে সব রকম বিষয় পড়ানো হয়েছে। কিন্তু ইংরেজী সে একেবারেই জানে না। তা দেখে শান্তিনিকেতনের গুরুকুলের চক্ষু স্থির। তাঁরা বললেন তাকে ছয়বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসে প্রথম শ্রেণী থেকেই বিদ্যারম্ভ করতে হবে। যদিও সে আর-সব বিষয়ে তার সমবয়সীদের সমকক্ষ। সে-সময় অধ্যক্ষ ছিলেন কৃষ্ণ কৃপালানী। তিনি বললেন ওকে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে ইংরেজী শিখে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক। কিন্তু গুরুকুলের বক্তব্য হলো ও ইংরেজীর ক্লাস ফলো করতে পারবে না। আমরা ওকে শান্তিনিকেতনে দিয়ে ওর দুটো বছর নষ্ট করতে রাজী হইনে। ফিরিয়ে নিয়ে প্রাইভেটে পড়াই। তিনবছর পরে কৃষ্ণনগরের মিশনারী বিদ্যালয়ে দিই। ইংরেজ হেডমাস্টার তাকে পরীক্ষা করে দেখেন সে ইংরেজীতে তার সমবয়সীদের সমকক্ষ।

এসব কথা বলার তাৎপর্য এই যে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা মুনির নানা মত আমরা ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের আদিযুগ থেকেই শুনে আসছি। মহামুনি রবীন্দ্রনাথের এক এক বয়সে এক এক মত। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম

প্রতিষ্ঠার পূর্বেও শিলাইদহে ইংরেজ মাস্টার রেখে মাধুরীলতা ও রথীন্দ্র-নাথকে ইংরেজী শেখানো হয়েছিল। শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে ইংরেজী তো সেখানে প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই ছিল। রবীন্দ্রনাথ সরকারের কাছ থেকে পয়সাও নিতেন না, সে-বিষয়ে তিনি অসহযোগী ছিলেন গান্ধীজীর অসহযোগ নীতির বিশ বছর আগে থেকেই। কিন্তু সরকারের সঙ্গে অসহযোগ এক জিনিস, ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে অসহযোগ আরেক জিনিস। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর এই নিয়ে মতবিরোধ তাঁকে দেশবাসীর কাছে ১৯২১ সালে অপ্রিয় করে। কিন্তু ১৯৩১ সালেও তো তিনি মনেপ্রাণে স্বদেশী হয়েও ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজী মাধ্যম সম্বন্ধেও যে তাঁর অনড় মনোভাব ছিল না তার প্রমাণ ভগিনী নিবেদিতার উপর লিখিত তাঁর প্রবন্ধ। নিবেদিতাকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর কন্যাকে ইংরেজী পড়াতে ও সেই ভাষা অবলম্বন করে যা কিছু পড়ানো যায় তাও পড়াতে। এটাই ঠাকুর ঘরানার বিশিষ্ট ঐতিহ্য। বাড়ির মেয়েদেরও তাঁরা বাড়িতে রেখে ইংরেজী শেখাতেন। অথচ তাঁদের মতো স্বজাতিপ্রেমিক ও স্বভাষাপ্রেমিক আর কে ছিলেন ?

ইংরেজীর প্রতি বাঙালীর একটা স্বাভাবিক টান রয়েছে। এটা সুবিধা-ভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে নিবদ্ধ নয়। ইংরেজরা গেছে, কিন্তু ইংরেজীর প্রেস্টিজ আগের চেয়ে কমেনি। বরং বেড়েছে। তার প্রমাণ ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির জনপ্রিয়তা। সেখানে যাদের ছেলেমেয়েরা পড়ে তাদের অনেকেই মেহেনতী মিস্ত্রী শ্রেণীর লোক। এই তথ্যটা বামপন্থী থীসিসের সঙ্গে খাপ খায় না। শিক্ষিত ভদ্রলোক মানেই ইংরেজী-শিক্ষিত ভদ্রলোক। যে ইংরেজী-শিক্ষিত নয় সে ভদ্রলোক নয়। অতএব শ্রমিক কৃষকরা চায় যে তাদের ঘরানারাও ইংরেজী শিখে শিক্ষিত ভদ্রলোক ঘরানা হোক। এটা কি বাঙালীমাত্রেরই অভিলাষ নয় ? এ হাওয়া বদলাতে কে জানে কতকাল লাগবে! মধ্যবিত্তরা বিদায় নিলেও নয়া মধ্যবিত্ত সৃষ্টি হবে। মানসিকতার হেরফের সহজে হবে না। এক যদি আমরা জগৎকে নিত্য নতুন আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও সৃজন দিয়ে সমৃদ্ধ করতে পারি। তার জন্যেও ইংরেজী শিক্ষায় উন্নত হওয়া চাই।

ইংলণ্ডে ভোটদানের অধিকার যখন সম্প্রসারিত হয় তখন প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন বলেন, "আমরা আমাদের প্রভুদের শিক্ষিত করতে বাধ্য।" সেই উক্তির তাৎপর্য, সবাইকে ভোটদানের অধিকারী করলে সবাইকে শিক্ষালাভেরও অধিকারী করতে হয়। ওটা যদি তাদের জন্মস্বত্ব হয়ে থাকে তবে এটাও তাদের জন্মস্বত্ব। আমাদের সংবিধানেও এই তত্ত্বের স্বীকৃতি আছে। শিক্ষাকে আমরা মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ রাখতে চাইনি। স্বাধীনতার পর থেকেই শিক্ষার সম্প্রসারণ হয়েছে গণতন্ত্রী সরকারের ঘোষিত নীতি। পশ্চিমবঙ্গের সমাজতন্ত্রী সরকার এমন কিছু করছেন না যা গণতন্ত্রী সরকার করতেন না বা নির্বাচিত হলে করবেন না। দুজন শিক্ষাব্রতী আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে বলেন, "প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজী উঠে যায় অনেক আগে। বর্তমান সরকার তার জন্যে দায়ী

নন। সেই নজিরে এ'রা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী থেকেও ইংরেজী উঠিয়ে দিচ্ছেন। এ কাজ তো অন্যান্য রাজ্যে অন্যান্য দলের সরকারেরাও করেছেন। বিহারে তো ও'রা পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজী উঠিয়ে দিয়েছেন। এ'রা তো ততদূর যাচ্ছেন না।"

এ সম্পর্কে আমি কিন্তু উল্টোপাল্টা কথা শুনছি। কেউ কেউ বলছেন প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজী উঠে যাওয়া মানে চারটি শ্রেণী থেকে উঠে যাওয়া। আবার কেউ কেউ বলছেন পাঁচটি শ্রেণী থেকে উঠে যাওয়া। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কার পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন, বিহারের না কেরলের, তার ঘোষণা আমার নজরে পড়েনি। তবে আসামের পদাঙ্ক নয়। সেখানে তিনটি শ্রেণী থেকে ইংরেজী উঠে গেছে। চতুর্থ শ্রেণী থেকে উঠে যায়নি। নাগাল্যাণ্ডে তো প্রথম শ্রেণী থেকেও উঠে যায়নি। যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে নজির আছে। পশ্চিমবঙ্গ আর যাই হোক বিহার নয়। তবে সেই যে একটা প্রবাদ ছিল বাংলাদেশ আজ যা ভাবে অন্যান্যরা কাল তা ভাবে সেটা এতদিন পরে ভিত্তিহীন প্রমাণিত হলো। যদি না বাংলাদেশ বলতে বুঝি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে। সেখানে ইংরেজী মাধ্যম সর্বত্র বর্জিত হয়েছে, কিন্তু ইংরেজী বলে একটি শিক্ষণীয় বিষয় প্রাথমিক স্তরে বর্জিত হয়েছে কি না ঠিক বলতে পারছিনে।

"মাত্র দুটো ক্লাস থেকে ইংরেজী উঠে যাচ্ছে। একে কি আপনি অন্যায় মনে করেন? ওদিকে যে আরো আটটি ক্লাসে ইংরেজী পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। এটা কি ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়? বারো বছর পড়তেই হবে, তা নইলে ইংরেজী জ্ঞান যথেষ্ট হবে না, এটা কি একটা সুযুক্তি?" ভদ্রলোকেরা আমাকে চেপে ধরেন। যেন আমি এর পক্ষপাতী। তা যে আমি নই তা তো আমি নিজের বড়ছেলের বেলায়ই প্রমাণ করেছি। আমার মতে ইংরেজী বিলম্বে শেখালেও চলে, যদি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। সেই বিশেষ ব্যবস্থাটা কোথায়? সরকার কি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন? তাঁরা তা না করে বারো বছর বিনা বেতনে পড়াবেন, বইপত্র বিনামূল্যে যোগাবেন, অন্যান্য দরকারী বিষয়ে শিক্ষিত করবেন। এটাও শিক্ষাবিস্তারে সহায়ক হবে। এমন কি ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারেও। অর্থাভাবে যারা ইংরেজী পড়ার সুযোগ পেতো না তারাও সে সুযোগ পাবে। কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা না করলে সকলেরই ইংরেজীর বনিয়াদ কাঁচা থেকে যাবে। সরকার প্রকারান্তরে বহু স্বল্পবিত্ত গৃহস্থ সন্তানকে বাধ্য করবেন চড়া বেতন দিয়ে নিজের খরচে বইপত্র কিনে বাড়িতে মাস্টার রেখে পড়তে বা ইংরেজী-মাধ্যম স্কুলে লাইন দিয়ে ভর্তি হতে। এই শিক্ষানীতি যেমন অনেকের পক্ষে আশীর্বাদ হবে তেমনি অনেকের পক্ষে অভিশাপ। কাঁচা বনিয়াদ কার কোন কাজে লাগবে? একই বিদ্যালয়ের নিচের চার ক্লাসে ইংরেজী হবে হারাম, অথচ উপরের আট ক্লাসে ইংরেজী হবে ফরজ, এটা যেন মওলানা সাহেবদের ফতোয়া। সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফতোয়া জারি করুন, কিন্তু মাধ্যমিককে বাদ দিন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের

প্রাথমিক বিভাগে ইংরেজীকে ঐচ্ছিক করুন।

লোকশিক্ষার জন্যে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। নইলে নিরক্ষরতা দূর হবে না। এর জন্যে ইংরেজীর কী দরকার? সাক্ষরতা বলতে মাতৃভাষায় সাক্ষরতাই বোঝায়। আগে তো পাঠশালাই যথেষ্ট ছিল। তার পরে নিম্ন প্রাথমিক। সেইখানেই অধিকাংশ লোকের লেখাপড়া সাঙ্গ হতো। আজকাল না হয় আরো কিছু শেখানো যাক। উচ্চ প্রাথমিককে গ্রামসুদ্ধ লোকের হাতের নাগালে এনে দেওয়া যাক। সেখানেও আমি ইংরেজীর সার্থকতা দেখিনে। শেখার সঙ্গে সঙ্গেই লোকে তা ভুলে যাবে। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কথা আলাদা। তেমন বিদ্যালয় প্রত্যেকটি গ্রামের জন্যে নয়, পাঁচখানা গ্রামের জন্যে। সেখানকার প্রাথমিক বিভাগটা উচ্চতর বিভাগের সোপান। সেই সোপানটি না থাকলে নিছক মাধ্যমিকের জন্যে ছাত্র তৈরি হয় না। যে বিভাগে আর-সব বিষয়ের জন্যে ছাত্র তৈরি হবে সে বিভাগে ইংরেজী নামক একটি স্বেচ্ছায় শিক্ষণীয় বিষয়ের জন্যে ছাত্র তৈরি হবে না, ছাত্ররা শিখতে চাইলেও তাদের শিখতে দেওয়া হবে না, বলা হবে চার বছর অপেক্ষা করতে, কারো কারো মতে পাঁচ বছর, এটার পেছনে কাজ করছে ছাত্রদের প্রতি ভালোবাসা নয়, তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তা নয়, কোথায় কুড়িয়ে পাওয়া কোন এক তত্ত্ব। দুটো ভাষা একসঙ্গে শিখলে নাকি কোনোটাই শুদ্ধ-ভাবে শেখা যায় না। পঞ্চম শ্রেণী থেকে দুটো ভাষা একসঙ্গে শিখলেও কি শুদ্ধভাবে শেখা যাবে? এদেশের ছেলে কি কোনো কালেই ওদেশের ছেলের মতো ইংরেজী বলতে বা লিখতে শিখবে? ডাকসাইটে ইংরেজীনবিশের লেখাতেও আমরা ইংরেজী ব্যাকরণের ভুল ইডিয়মের ভুল লক্ষ করেছি। আমরা যখন ইংরেজী লিখি তখন বাংলা ছাঁদেই লিখি। আবার যখন বাংলা লিখি তখন অসতর্ক হলে ইংরেজী ছাঁদে বাক্য গঠন করি। দু'বছর আগে ইংরেজী শুরু করাও যা দু'বছর পরে ইংরেজী শুরু করাও তাই। বাঙালীর ইংরেজী বাঙালীর মতো হবেই। ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও সাংঘাতিক ভুল করে। ইঙ্গবঙ্গ পরিবারের পুত্ররাও। ওসব ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ উচ্চারণ। উচ্চারণের দিক থেকে ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ের জুড়ি নেই। ব্যাকরণ ইত্যাদির দিক থেকে জুড়ি আছে বইকি। অন্তত এককালে তো ছিল। পরে যদি না থাকে তবে সেটার কারণ বোধহয় শিক্ষকরা নিজেরাই ইংরেজী ভালো করে শেখেননি, কিংবা যাঁরা ভালো করে শিখেছেন তাঁদের সংখ্যা বিদ্যালয়ের সংখ্যার বা ছাত্রের সংখ্যার অনুপাতে খুব কম। শত শত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপযোগী ইংরেজী শিক্ষক কোথায় পাব? হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্যে তো দূরের কথা।

বাংলা শিক্ষা অসীম হতে পারে, ইংরেজী শিক্ষা সসীম। কাপড় যদি খাটো হয় কোটও খাটো হবে। সরকারকে সেই জন্যে আমি দোষ দিতে অনিচ্ছুক। আমার প্রস্তাব শুধু এই যে, ইংরেজী শিক্ষাকে ঐচ্ছিক করা হোক। যারা শিখতে চায় তাদের সে ইচ্ছায় যেন বাধা দেওয়া না হয়। ভুল

শিখবে, শিখতে না দেবার পক্ষে এটা একটা যুক্তি নয়। ভুল তো সব বিষয়েই ঘটে। গণিতেই সব চেয়ে বেশী। সরকার ইচ্ছা করলে ইংরেজী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেতন নিতে পারেন, সেই টাকায় স্বতন্ত্র শিক্ষক নিয়োগ করতে পারেন। সরকারী স্কুলে না হোক বেসরকারী স্কুলে এ রকম ব্যবস্থা থাকতে পারে। ওরা যদি বেতন নিয়ে পড়ায় সরকার অনুদান বন্ধ করবেন না, অনুমোদন প্রত্যাহার করবেন না। ঈর্ষা বলে একটা নিকৃষ্ট বৃত্তি আছে। ইংরেজী-শিক্ষিত ছাত্রদের প্রতি ঈর্ষা। জীবনসংগ্রামে তারাই নাকি অধিকতর সুযোগ পেয়ে যাবে। অতএব তাদের শিক্ষার পথে কাঁটা দাও। এ মনোবৃত্তি যেন সরকারকেও প্রভাবিত না করে। সরকারকে সকলের স্বার্থ দেখতে হবে। সেইসব তথাকথিত সুবিধাভোগীদেরও। তাদের অভিভাবকরাও তো করদাতা।

তবে একথাও সত্য যে অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে ইংরেজী শিক্ষা হচ্ছে সময় ও শক্তির অপচয়। তারা বার বার ফেল করে বা টোকাটুকি করে সফল হয়। বরাতে থাকলে কাজকর্ম জোটে, নয়তো ভেরেণ্ডা ভাজে। জ্ঞানও যে খুব একটা বাড়ে তা নয়। তার চেয়ে এমন কিছু শেখা ভালো যা শিখে একমুঠো অন্ন হয়, আজীবন পরনির্ভর হতে না হয়। এসব কথা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শতবার বলেছেন, আচার্য জগদীশচন্দ্রকেও বলতে শুনেছি। কিন্তু বাঙালী-মাত্রের বিশ্বাস ওটা ভদ্রলোকের পথ নয়, যারা ওপথে যায় তারা বড়োমানুষ হতে পারে, কিন্তু ভদ্রলোক নয়। এই যে মজ্জাগত সংস্কার স্বাধীন হয়েও আমরা এর থেকে মুক্ত নই। জীবিকার জন্যে প্রতিযোগিতায় ইংরেজী বহু-জনের পক্ষে ফলপ্রদ, কিন্তু সর্বজনের পক্ষে নয়। তা হলে ইংরেজীকে সরকার মাধ্যমিক স্তরে সর্বজনের পক্ষে আবশ্যিক করছেন কেন? কলেজের মতো সেখানেও তো অপচয় রোধ করার জন্যে ইংরেজীকে ঐচ্ছিক করতে পারেন। যাদের ইচ্ছা নেই তাদের বাধ্য করবেন না। বরং অন্য কোনো বিষয় শিখতে উৎসাহ দেবেন। বিনা বেতনে ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ অযোগ্য পাত্ররা নিতে চাইলে বাছাই করে ইংরেজীর ক্লাসে ভর্তি করতে পারেন, কিংবা ফেল করলে এক ক্লাস নামিয়ে দিতে পারেন। যারা ইংরেজীর ক্লাসে অযোগ্যপাত্র তারা চিত্র-কলার ক্লাসে বা কারুশিল্পের ক্লাসে সুযোগ্য পাত্র হতে পারে। যারা ইংরেজী লিখতে গেলে পদে পদে ভুল করে তারা হয়তো গণিতের প্রশ্নের উত্তর দেয় নির্ভুল। এসব ছাত্রকে ইংরেজীর পেছনে সময় ও শক্তি ব্যয় করতে বাধ্য করা উচিত নয়। তারা যদি সব ক'টা বিষয় জড়িয়ে পাশ মার্ক পায় তবে একটা কি দুটো বিষয়ে পাশ মার্ক পায়নি বলে তাদের প্রমোশন বন্ধ করা উচিত নয়। ফাইনাল পরীক্ষাতেও তাদের গ্রেস মার্ক না দিয়েই পাশ করিয়ে দিলে ক্ষতি কী? পরে যদি কলেজে ভর্তি হতে চায় কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের আরেকবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। কলেজে যদি সেই-সেই বিষয় নিতে না চায় তবে আবার পরীক্ষা করাই বা কেন?

বাংলার ক্ষতি করে সবাইকে ইংরেজী শেখাতে হবে এমনতর তর্ক কেউ

করছে না। বাংলার ক্ষতি না করেও ইংরেজী শেখানো যায় এটাই সরকারী শিক্ষানীতির সমালোচকদের তর্ক। এই তর্কে যোগ না দিয়ে আমি শুধু নিবেদন করব যে, দুটি ভাষাই পাশাপাশি অবস্থান করুক। কিন্তু কেউ যদি একটির উপর আরেকটি শিখতে না চায় তবে তাকে বাধ্য করা উচিত হবে না। যদি সে আরেকটি শিখতে চায় তবে বাধা দেওয়াও উচিত হবে না। বাংলা আবশ্যিক হোক। ইংরেজী ঐচ্ছিক।

উদারতার জন্যে ব্যাকুলতা

(শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র)

এতগুলি ভাষা পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। এটা একমাত্র ভারতের সমস্যা। এর একটি সর্বসম্মত সমাধান করতে না পারলে ভারত ভেঙে খণ্ড খণ্ড হবে। যেমন পাকিস্তান দ্বিখণ্ড হয়েছে। উর্দুকে বাংলাভাষীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যে মারাত্মক ভুল এটা স্বীকার যদি করেন তো হিন্দীকে তামিলভাষীদের উপরে, বাংলাভাষীদের উপরে, গারো খাসী নাগা মিজোদের উপরে চাপিয়ে দিতে যাবেন না। যতদিন না তারা আপনা থেকে হিন্দী চাইছে ততদিন ধৈর্য ধরতে হবে। ততদিন তারা যদি ইংরেজীকে বহাল রাখতে চায় তবে অসময়ে ইংরেজীকে হটাতে যাবেন না। ইংরেজ গেছে, অতএব ইংরেজী যাক, এটা একটা কুযুক্তি। সুযুক্তি হচ্ছে হিন্দী যারা শিখতে চায় তারা অবাধে শিখুক, যারা শিখতে না চায় তাদের বাধ্য করলে তারা বিদ্রোহ করবেই। ভারত থেকে বেরিয়ে যাবেই. ভাষাও ধর্মের মতো একটি জীবনমরণ প্রশ্ন। ধর্মের প্রশ্নে ভারতবর্ষ চোখের সামনেই দ্বিখণ্ড হয়ে গেল। জোর জুলুম করে অখণ্ড রাখতে হলে গৃহযুদ্ধের ভিতর দিয়ে যেতে হতো।

সব দিক বিবেচনা করে ভারত সরকার একটি ত্রিভাষী সূত্র উদ্ভাবন করেছেন। মাতৃভাষা, হিন্দী ও ইংরেজী এই তিনটি ভাষা নিয়েই সর্বভারতের শিক্ষানীতির মূলসূত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যেই একাধিক সেণ্ট্রাল স্কুল গড়ে উঠেছে ও উঠছে। এ ছাড়া আরো একপ্রস্থ বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে ও হচ্ছে। তার নাম সৈনিক স্কুল। সেখানকার শিক্ষণীয় বিষয়ও মাতৃভাষা, হিন্দী ও ইংরেজী। সর্বত্র শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী অথবা হিন্দী। কোথাও কোথাও ইংরেজী এবং হিন্দী। যার যেটা পছন্দ। কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিন্দী-মাধ্যম চাপিয়ে দেওয়া সরকারী নীতি নয়, তবে কার্যত অনেক জায়গায় তাই হচ্ছে বলে নালিশ শোনা যাচ্ছে। সরকারের আন্তরিকতায় লোকের সন্দেহ জন্মাচ্ছে, সরকারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ কানে আসছে।

এখন বলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কথা। এঁরা পণ করেছেন প্রাথমিক স্তর

থেকে ইংরেজী হটাবেনই। কিন্তু তার শূন্য আসনে হিন্দীকে বসাবেন না। শূন্যতা পূরণ করবে বাংলা, শুধু বাংলা। তা হলে কি নেপালীভাষী অঞ্চলে শুধু নেপালী? সাঁওতাল ভাষী অঞ্চলে শুধু সাঁওতালী? ফল হবে এই যে যাদের শিক্ষাদীক্ষা প্রাথমিক স্তরেই পরিসমাপ্ত হবে তেমন মানুষ পশ্চিমবঙ্গের বাইরের মানুষের সঙ্গে মিশতে পারবে না, প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে না। আর তারাই হবে অধিকাংশ মানুষ। তারা যেন বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপবাসী। একই নীতি অবলম্বন করেছে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক প্রভৃতি। সর্বত্র এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ গড়ে তোলা হচ্ছে। সব চেয়ে বড়োটির নাম হিন্দীস্থান, অন্যান্য দ্বীপগুলি তার স্যাটেলাইট। সব ক'টি মিলে একটি দ্বীপপুঞ্জ। আর একটি ইন্দোনেশিয়া কি ফিলিপাইনস। চার দিক থেকে অটোনমির আওয়াজ উঠবে। কেন্দ্রশক্তি বিকেন্দ্রিত হতে বাধ্য হবে। নয়তো ভারত হবে বলকানের মতো বিভক্ত।

গোড়া কেটে আগায় জল ঢালারও ব্যবস্থা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাসূত্র মেনে নিয়ে মাধ্যমিক স্তরে এগারো বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের শেখাতে হচ্ছে ইংরেজী বর্ণমালা। তার কয়েক বছর বাদে হিন্দী। ইংরেজীর জন্যে মাত্র একটি পেপার ও একশোটি নম্বর বরাদ্দ। ভাষা হয়তো শিখতে পারা যাবে, কিন্তু সাহিত্য কি ওইটুকুতে শেখা যায়? তেরো বছর বয়সে তো আমার ইংরেজী রচনা ছাপার অক্ষরে বেরোতে দেখেছি। সেকালের ইণ্টারমিডিয়েট বা একালের উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে আমি ইংরেজীতে কবিতাও লিখেছি ও সেটা কলেজ ম্যাগাজিনে স্থানও পেয়েছে। এক ইংরেজীর অধ্যাপকের 'অ্যান অ্যাণ্টিফেমিনিস্ট ক্রাই'-এর পাল্টা 'এ ফেমিনিস্ট কাউণ্টার-ক্রাই'। স্ত্রীস্বাধীনতাবিরোধী চিৎকারের উত্তরে স্ত্রীস্বাধীনতাবাদী পাল্টা চিৎকার। তা বলে কি আমি বাংলা ওড়িয়া ভুলে গেছি? একই সময়ে ওড়িশার বিখ্যাত মাসিকপত্রে ওড়িয়াতেও কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছি। গল্পও ছাপা হয়েছিল। বাংলায় লিখেছি ষোল বছর বয়স থেকে 'প্রবাসী'তে, একটু পরে 'ভারতী'তে। আমার ত্রিভাষী সূত্র বাংলা, ওড়িয়া, ইংরেজী। প্রাথমিক স্তর থেকেই।

ইচ্ছে থাকলে তিনটি ভাষা বেছে নিয়ে তিনটিকেই প্রাথমিক স্তর থেকে শেখা যায়। হিন্দী এসে ব্যাপারটাকে আরো ঘোরালো করেছে। আমার উপর হিন্দী চাপালে আমার ইংরেজী খতম হতো। ইংরেজীর অনার্সে পাটনায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় ভারতে প্রথম হতে পারতুম না। আমার পক্ষে সেটা এমন কিছু কষ্টকর ছিল না। আট বছর বয়সে ইংরেজী শুরু করলেও দশবছর বয়স থেকেই ইংরেজী সংবাদপত্র 'বেঙ্গলী' পড়তে হতো বাবার ইচ্ছায়। পরে হেডমাস্টার মশায় কী মনে করে আমাকে স্কুলের কমন রুমের চাবী সঁপে দেওয়ায় স্বেচ্ছায় পড়তুম বারো বছর বয়স থেকে দেশী বিলিতী মাসিকপত্র। সংবাদপত্র। এনসাইক্লোপীডিয়া। লাইব্রেরী থেকে বই চেয়ে নিয়ে পড়েছি। সেসব কলেজেও আমার কাজে

লেগেছে, আই সি এস প্রতিযোগিতাতেও। ইতিহাস ও অর্থনীতি আমি কলেজে যাবার আগেই পড়ি। সাধ ছিল সাহিত্যিক না হয়ে সাংবাদিক হওয়ার। তাও আমেরিকায় গিয়ে। অথবা বাংলাদেশে বাংলা কাগজে।

সেই আমি পরে বাংলাদেশে নিযুক্ত হয়ে আমেরিকার কন্যা বিবাহ করি। কিন্তু আমার ছেলেমেয়েদের ইংরেজী শেখানো চলবে না বলে তাঁকেই বাংলা শিখতে ও তাদের সঙ্গে বাংলায় কথাবার্তা বলতে হয়। ফলে আমার বড়-ছেলেকে আটবছর বয়সে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করতে গিয়ে দেখি যে রবীন্দ্রনাথের দেশটিও একটি 'তাসের দেশ'। যে ছেলে তার সমবয়সীদের মতো আর সব বিষয় জানে তাকে ইংরেজীতে নিরক্ষর দেখে তাঁরা জেদ ধরেন যে শুধু ইংরেজী শেখার জন্যেই তাকে দু'বছর নিচের ক্লাসে ভর্তি হয়ে দুটি বছর নষ্ট করতে হবে। কারণ সেটাই নিয়ম। আমরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনবছর বয়সের মধ্যে ইংরেজীতেও তার সমবয়সীদের সমকক্ষ করে তুলি। তখন এক ইংরেজ হেডমাস্টার তাকে তার সমবয়সীদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তে দেন। ম্যাট্রিকে সে ইংরেজীতে শতকরা বাহাত্তর কি তেয়াত্তর পায়। পরে বিদেশে গিয়ে ইংরেজীতে পড়িয়েছে ও বই লিখে নাম করেছে। বিলেতের পৃথিবীবিখ্যাত 'টাইমস' পত্রিকার লিটারেরি সাপ্লিমেণ্টে ওর বইয়ের সুদীর্ঘ সমালোচনা ছাপা হয়েছে। প্রশংসাসূচক।

অন্যান্য সন্তানদের শান্তিনিকেতনে পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেবার পর থেকে আমরা 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ' এই নীতিই মেনে নিয়েছি। প্রেসিডেন্সী কলেজে যাদের দিয়েছি তারাও সেখানকার নীতিই মেনে নিয়েছে। ফল ভালোই হয়েছে, যেমন শান্তিনিকেতনে, তেমনি প্রেসিডেন্সীতে। কিন্তু এর জন্যে কলকাতায় তাদের মাকে বাড়ি ভাড়া করে বাড়িতে ভালো করে ইংরেজী শেখাতে হয়েছে। পেনসনের টা[illegible]য় শী করে কুলোত? অকালে চাকরি থেকে অবসর নেওয়া চলত না। আয়ব্যয়ের সমতা পাবার জন্যে স্বামী স্ত্রী দু'জনাকে সম্পাদক ও প্রকাশকদের দাক্ষিণ্যনির্ভর হ[illegible] হয়েছে।

এখন আমার শিক্ষানীতি আমার ছেলেমেয়েরাই অমান্য করেছে। তাদের ছেলেমেয়েদের গোড়া থেকেই ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিখিয়েছে ও ইংরেজীতে শিখিয়েছে। গোড়া থেকেই হিন্দী শেখাতে হয়েছে যারা ভারতে শিক্ষারম্ভ করেছে তাদের। ফলে বাংলা অবহেলিত হয়েছে। বাংলার টানে বড়ছেলেকে আমেরিকার কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হয়েছে সিমলায়। তাতে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি। আবার সেটাও ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে কলকাতায়। তাতে সমূহ ক্ষতি। বসে আছে বেকার হয়ে। যেখানে এত বেশী বেকার ও চাকরির জন্যে এত বেশী উমেদার সেখানকার নীতি হওয়া উচিত সবাইকে কোলে টেনে আনা নয়, বাঙালী করে রাখা নয়, দেশে বিদেশে ঠেলে দেওয়া, একভাবে না একভাবে সবাইকে মানুষ করা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যা করতে যাচ্ছেন তার ফলে সবাই অবশ্য বাঙালী হবে, কিন্তু মানুষ হবে না লক্ষ লক্ষ শিশু। বড়ো হয়ে দেখবে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কেউ তাদের ভাষা

বোঝে না, তারাও কারো ভাষা বোঝে না। ভারতের বাইরে তারা অসহায় ও অবাঞ্ছিত। বেশী বয়সে ইংরেজী শুরু করেও নামমাত্র শিখে তারা এক লাইন ইংরেজী শুদ্ধভাবেও লিখতে পারবে না। কে তাদের কী কাজ দেবে? পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতাও এর প্রতিকার নয়। পূর্বপাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর সর্বত্র বাংলা চালু হয়েছে, কিন্তু ইংরেজী-মাধ্যম উঠে গেলেও ইংরেজী শিক্ষা জোর কদমে চলেছে, প্রাথমিক স্তরেও। কারণ বাংলাদেশ জানে যে লক্ষ লক্ষ ছেলেকে বিদেশে জীবিকার অন্বেষণে বেরোতে হবে। বিদেশেই থেকে যেতে হবে। ইংলণ্ডে এখন পাঁচ লক্ষ বাংলাদেশী আর আধ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গীয় বালবৃদ্ধবনিতা বসবাস করছে। পশ্চিম এশিয়ায় যারা গেছে তাদেরও শিখতে হয়েছে ইংরেজী, যদিও আরবীরই আদর বেশী। তাদের সংখ্যাও কয়েক লক্ষ। আজকাল জীবিকার জন্যে, আশ্রয়ের জন্যে, উচ্চশিক্ষার জন্যে পশ্চিম এশিয়া থেকেও বহু লোক যাচ্ছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তথা কানাডায়। অন্তত একটা বিদেশী ভাষা তো শিখতেই হচ্ছে, নাই বা হলো ইংরেজী। আমাদের পক্ষে ইংরেজীই অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য। তাই ইংরেজী হয়েছে মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক। মাধ্যমিকেও ইংরেজী মাধ্যম কোথাও কোথাও আবশ্যিক, কোথাও কোথাও ঐচ্ছিক।

এসব ব্যাপারে মূলনীতি হবে কেমন করে সব ছেলেমেয়েকে ভবিষ্যতের উপযুক্ত করে কর্মক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়া যায়। অনুপযুক্ত করে ছেড়ে দিলে তারা সমাজের বোঝা হয়ে জীবন কাটাবে। এ সমাজ রুশ চীনের সোশিয়ালিস্ট সমাজ নয় যে সবাইকে যেমন করে হোক কাজে লাগানো হবেই। দরকার হলে গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে আবদ্ধ করে। তবে যেমন লক্ষণ দেখছি এক একটি রাজ্য যদি একটি দ্বীপ হয় ও সেখানে সবাইকে কাজে লাগাতে হয়, আমাদের ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জকেও দুশমনরা বলবে গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ।

প্রতিবাদ যাঁরা করছেন তাঁরাও বাঙালী, তাঁরাও মাটির টানে এইখানেই থাকতে চান, ছেলেমেয়েদের কোলে টেনে নিতে চান। কিন্তু পাখির ছানা কি কেবল নীড়েই আটক থাকে? সে আকাশেও উড়তে শেখে। সে চায় মুক্ত আকাশে ডানা মেলে উড়তে। কাঁহা কাঁহা মুলুকে ঘুরতে। তার চাই অন্তহীন আলোক, অনবরুদ্ধ বায়ু। মানবশিশুও যেখানে আরো আলো-বাতাস পাবে সেখানে উড়ে যেতে চাইবে। দশ বছর বয়স থেকেই আমি বিদেশে যাবার স্বপ্ন দেখেছি। ষোল সতেরো বছর বয়সে আমেরিকায় পালিয়ে যাবার মতলব এঁটেছি। যেতে না পেরে ছটফট করেছি। সেটা না হয়ে যেটা হলো সেটা ইউরোপযাত্রা। দেশের বাইরে গিয়ে আমি প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিয়েছি। তেমন স্বাধীনতা আমি স্বদেশে অনুভব করিনি। দেশটা পরাধীন বলে নয়, মনটা সংকীর্ণ বলে। একে উদ্ধার করতে হবে। সেটাও দেশপ্রেম।

পুত্রকন্যাকে এগারো বছর বয়স পর্যন্ত ইংরেজীতে নিরক্ষর রাখতে কোনো মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহস্থই সম্মত হবেন না। রবীন্দ্রনাথ কবে সেরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন তা কারো মনে নেই। নতুন করে মনে করিয়ে দিলেও কেউ একমত

হবেন না। সেটা সম্ভব যাঁরা চাকুরিজীবী নন তাঁদেরই বেলা। সরকার যদি তাঁদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করতে রাজী না হন তবে তাঁরাই বা সরকারী সিদ্ধান্তে রাজী হবেন কেন? পৃথক ব্যবস্থা নানা ভাবেই করা যায়। যেমন ইংরেজীর জন্যে পৃথক টিউটোরিয়াল ক্লাস। কলেজে আমি ও জিনিস দেখেছি। আরেক হতে পারে স্কুলের বাইরে কোচিং ক্লাস। সেই শিক্ষকরাই পড়াবেন, কিন্তু অতিরিক্ত ভাতা পাবেন। সেটার জন্যে অভিভাবকের কাছ থেকে খরচা নেওয়া যেতে পারে কিংবা শিক্ষকরা নিজেরাই কোচিং ক্লাস খুলে বিদ্যালয়ের বাইরে ইংরেজী পড়াতে পারবেন। সরকার আপত্তি করবেন না। বারট্রান্ড রাসেল তো একটা দিনও তাঁর দেশের কোনো প্রকার স্কুলেই যাননি। তাঁদের বংশের যে আর্থিক অবস্থা তিনি অনায়াসেই সবচেয়ে অভিজাত ইটন বা হ্যারো পাবলিক স্কুলে পড়াশুনা করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর বেলা রাখা হয়েছিল ফরাসী ভাষার জন্যে গভর্নেস, জার্মান ভাষার জন্যে গভর্নেস, অন্যান্য বিষয়ের জন্যে প্রাইভেট টিউটর। রবীন্দ্রনাথের বেলাও কি প্রাইভেট টিউটর রাখা হয়নি? রাসেল স্কুলে না পড়েই কেমব্রিজের প্রখ্যাত কলেজে ভর্তি হন। দুটি বিষয়ে ট্রাইপস অর্থাৎ ফাস্ট ক্লাস অনার্স পান। সরকার কি রাসেলের মতো ছাত্রদের সরাসরি কলেজে ভর্তি করার আদেশ দিতে পারেন? অবশ্য প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট হিসাবে পরীক্ষা দেবার সুযোগ থাকবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজেরাই ভর্তির সময় পরীক্ষা করে নিতে পারবেন। যে ব্যবস্থা ঠাকুর পরিবারের মতো অভিজাত পরিবারে সম্ভব সে ব্যবস্থা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের বেলা অবাস্তব। সরকারকেও মানতে হবে যে সেটা তাঁদেরও সাধ্যাতীত। ছাত্রছাত্রীরা যেটা চায়, অভিভাবকরাও যেটা চান, সেটাকে এক-কথায় খারিজ করে কার কী লাভ হবে? একজনকে পঙ্গু করে রাখলে আরেক-জনের যে চলৎশক্তি বাড়বে তা নয়। একজনকে ধন থেকে বঞ্চিত করলে আরেক-জন যে ধনবান হবে তা নয়।

শিক্ষাও একপ্রকার ধন। সহজলভ্য ধন থেকে কাউকে বঞ্চিত করে যে শিক্ষানীতি তা উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত কোনো শ্রেণীকেই সন্তুষ্ট করতে পারে না। ইংরেজীর কোনো বিকল্প নেই। বাংলা তার বিকল্প নয়। সেটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। তা বলে ইংরেজীকে সর্ব স্তরে আবশ্যিক করার পক্ষেও কোনো সুযুক্তি নেই। সার্বজনীন করার পক্ষেও না। সার্বজনীন ও আবশ্যিক হতে পারে একমাত্র বাংলা, নেপালী বা সাঁওতালী, যার যেটা মাতৃভাষা। আর সেই ভাষার মাধ্যমে অন্যান্য বিষয় শিক্ষা। কিন্তু উচ্চতম স্তরে নয়। বাংলা তার জন্যে প্রস্তুত হয়নি। তা যদি করা হয় তবে ইংরেজীর মাধ্যমে যারা পড়েছে আর বাংলার মাধ্যমে যারা পড়েছে তাদের মান এক হবে না, বাজার-দরও এক হবে না, চাকুরিক্ষেত্রে ইঙ্গনবীশরাই জিতবে, বঙ্গনবীশরা হারবে।

লোকশিক্ষার জন্যে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি বাংলার ব্যবস্থাই করে গেছেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত লোকশিক্ষা পরিষদে। দেশের নানা স্থানের পরীক্ষার্থীরা তার পাঠ্যতালিকা দেখে বাড়িতেই পড়াশুনো করে প্রাইভেট পরীক্ষা দেয় ও

উত্তীর্ণ হলে সার্টিফিকেট পায়। যে কোন বয়সের লোক তেমন পরীক্ষা দিতে পারেন। বিয়ে করে বাপ মা হবার পরেও। সরকার ইচ্ছা করলে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করে লোকশিক্ষার ব্যাপক আয়োজন করতে পারেন। বিদেশেও এ রকম প্রতিষ্ঠান আছে।

ইংরেজীকে সর্বস্তরে সার্বজনীন ও আবশ্যিক করার পক্ষে যেসব বুদ্ধিজীবী আন্দোলন করছেন আমি তাঁদের একজন নই। সেইজন্যে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিইনি। আবার বিপরীত শিবিরেও আমি নেই। আমি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। আমি একক।

নববর্ষ ভাবনা

(শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিককে)

পয়লা বৈশাখের দিনটি হোক বিজয়ার মতো একটি কোলাকুলির দিন। এই দিনটিতে উপস্থিত হবার জন্যে আমি বহু নিমন্ত্রণ পেয়েছি। শারীরিক কারণে একমাত্র সাহিত্যতীর্থের নিমন্ত্রণটিই গ্রহণ করেছি। সেটিও করেছি আমাদের সকলের অগ্রজপ্রতিম মনীষী ও জ্ঞানতপস্বী আচার্য সুকুমার সেন মহাশয়ের সম্বর্ধনা উপলক্ষে।

আচার্য সুকুমার সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম থেকে বহুকাল অবসর নিয়েছেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যা চর্চা থেকে একদিনের জন্যেও নয়। তাঁর সমসূরীদের মধ্যে আমি নিকট থেকে দেখেছি আচার্য যদুনাথ সরকারকে, আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়কে, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে ও আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারকে। জরা এঁদের কাউকেই পরাস্ত করতে পারেনি। জরাকেই এঁরা প্রত্যেকে পরাস্ত করেছেন। নাম করতে ভুলে গেছি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর। শেষবার যখন দেখা হয় আমার হাতে একখানা ফরাসী বই ধরিয়ে দিয়ে বলেন, “চোখে ভালো দেখতে পাইনে। তুমি পড়ো, পড়ে আমাকে বলো সেই ক'জন কমিউনিস্টের কী হলো যাদের ধরে নিয়ে যায় হিটলারের আক্রমণের আগে ফরাসী সরকার।” আমি তো ফরাসী ভাষায় তাঁর মতো সুশিক্ষিত নই, প্রায় অশিক্ষিত বললেও চলে। আমি বলি, “এর একটা ইংরেজী সংস্করণ আছে। সেইটেই মূল গ্রন্থ। এইটেই অনুবাদ। আপনি সেটা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে পেতে পারেন।” উনি বলেন, “আরে, আমি আমার ফরাসী বন্ধুদের কাছে জানতে চাইলুম ও বেচারাদের কী হলো ? তা ওরা আমাকে পাঠিয়ে দিলে মহাযুদ্ধের ইতিহাস।” আমি হেসে বলি, “তখন তো হিটলারে স্টালিনে মিতালির পর্ব। হিটলার তাদের মারতে যাবে কেন ? ছেড়ে দিয়েছে নিশ্চয়। ফরাসীরাই বা তখন রাশিয়াকে শত্রু করতে চাইবে কেন ? ধরে নিন যে ওরা ছাড়া পেয়ে বেঁচে গেছে !”

এই যে সর্ব বিষয়ে কৌতূহল এটা পূর্বোক্ত সূরীদের সকলের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি। আচার্য যদুনাথ তো আমাকে ইংরেজী সাহিত্যও পড়িয়েছেন। ফরাসী বিপ্লবের ক্লাস তো উনিই নিতেন। আমাদের যখন তিনি দিল্লী আগ্রা নিয়ে যান তখন তিনি বাদশাহী আমলের খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দেন। তেমনি সিপাহী মিউটিনিরও। যে কথাটা আমি বোঝাতে চাই সেটা এই যে, বাঙালীদের মধ্যে এই যে সর্বাগ্রহী কৌতূহল এটাই পাশ্চাত্ত্য রেনেসাঁসের প্রধান লক্ষণ, এর জন্যেই ওকে বলা হয় রেনেসাঁস বা নবজন্ম। সেকালের নায়করা পেশায় কেউ চিত্রকর, কেউ নাট্যকার, কেউ সঙ্গীতকার, কেউ অধ্যাপক, কিন্তু স্বধর্ম বলতে তাঁরা খ্রীস্টধর্ম বুঝতেন না। তাঁরা মানবিকবাদী। হিউমানিস্ট। যদিও আনুষ্ঠানিক অর্থে খ্রীস্টান বা ইহুদী।

এই যে রেনেসাঁস এটা ইটালীতে নিবদ্ধ থাকেনি, ধীরে ধীরে সর্বত্র সঞ্চারিত হয়েছে। তবে একই কালে নয়। ইংরেজরা ফরাসীরা একে বহন করে নিয়ে এসেছে কলকাতায়, বোম্বাইতে, মাদ্রাজে, পণ্ডিচেরীতে, চন্দননগরে। উপকূলবর্তী নগর থেকে এটা বাহিত হয়েছে অভ্যন্তরবর্তী নগরে। প্রজাপতি যেমন নিয়ে যায় পরাগ। ঠাকুরপরিবারের মতো এক একটি পরিবার ইটালীর রেনেসাঁস যুগের পরিবারের মতো এই রেনেসাঁসকে অন্তরের সঙ্গে স্বাগত করেন। উপলব্ধি করেন যে ভারতও চায় তার নিজের মতো করে নবজাত হতে। নবজাত সন্তান পরে পিতৃপরিচয় দিতে লজ্জিত হয় না। কিন্তু সে তার পিতার অনুসরণও করে না। মেয়ে তো শ্বশুরবাড়ি চলে যায়, সেখানে তার অন্য পরিচয়। ছেলে যদি রাজপুত্র হয়ে থাকে সেও চলে যায় রাজকন্যার ও অর্ধেক রাজত্বের সন্ধানে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে। কেউ ফেরে, কেউ ফেরে না। যাঁরা ফেরেননি তাঁদের একজনের নাম রামমোহন রায়, আরেকজনের নাম দ্বারকানাথ ঠাকুর। মাইকেল মধুসূদন দত্তও কি ফিরতে পারতেন, যদি না বিদ্যাসাগর মহাশয় করুণাসাগর হতেন? আমাদের রেনেসাঁসের নায়কদের কারো সাংস্কৃতিক শুচিবাতিক ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও না। সংস্কৃত কলেজে তিনি পাঠ্য করেন পাশ্চাত্ত্য দর্শন। আর-একটা সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন না করে তিনি করেন আর-একটা ইংরেজী কলেজ স্থাপন। যাতে গরিবের ছেলেরা কম খরচে আধুনিক জগতের অভিনব বিদ্যার সাগরজলে অবগাহন করতে পারে। প্রাচীন বিদ্যার গঙ্গাস্নানই যথেষ্ট নয়। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা পাঠশালাও তিনি গ্রামে গ্রামে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজের সঙ্গে বা ইংরেজীর সঙ্গে এঁদের জাতিবৈর ছিল না। সেটা জন্মায় পরবর্তীকালে। ফলে রেনেসাঁস বেশী দূর এগোতে পারে না। সনাতন ধর্ম আর জাতীয়তাবাদ মিলে তাকে বাধা দেয় পেছন দিকে টেনে, পাছে হিন্দু তার হিন্দুত্ব হারায়, পাছে বাঙালী হারায় তার বাঙালীত্ব।

হিন্দুর বিকাশ হবে হিন্দুত্বের ভিতর দিয়ে, বাঙালীর বিকাশ হবে বাঙালীত্বের ভিতর দিয়ে। বেশ। তা হলে মুসলমানের বিকাশ হবে কিসের ভিতর দিয়ে? সে যে হিন্দু নয় সেটা তো সুস্পষ্ট, কিন্তু সেও তো বাঙালী।

তার বাঙালীত্ব কি একটু স্বতন্ত্র নয়? অবিকল হিন্দু ছাঁচের? বাঙালী সংস্কৃতির নামে হিন্দু সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে গেলে সে তো প্রতিবাদ করবেই, সে তো বলবেই, "আমরা বাঙালী নই, আমরা মুসলমান।" কথাটা আমি যেমন মুসলমানের মুখে শুনেছি তেমনি হিন্দুর মুখেও শুনেছি, "ওরা মুসলমান, আমরা বাঙালী।" এটা তো আমাদেরই স্বখাত সলিল। ইংরেজের কাটা খাল নয়। খালটা বাড়তে বাড়তে পদ্মানদীর চেয়েও প্রশস্ত ও গভীর হয়েছে।

সংস্কৃত আর সংস্কৃতি যদি এক ও অভিন্ন হয় তবে সংস্কৃতকে স্কুলে কলেজে অবশ্যপাঠ্য করলে আরবী ফারসীকেও অবশ্যপাঠ্য করতে হয়। ছাত্রদের দু'ভাগে বিভক্ত করলে গোড়া থেকেই বাঙালীর ছেলেরা দু'ভাগে বিভক্ত হবার শিক্ষা লাভ করবে। বাংলা-মাধ্যম যে তাদের একত্ব শেখাবে তা নয়। বাংলা পাঠ্যপুস্তকগুলির ভাষা মুসলমানের পক্ষে দুর্বোধ্য। তাতে যে জীবনের বর্ণনা থাকে তাও মুসলমানের সুপরিচিত নয়। এক বিশিষ্ট বাঙালী হিন্দু এখন তাঁর অবসর যাপন করেন কলকাতার আশেপাশের গ্রামে গিয়ে বাঙালী মুসলমানদের বাংলা ভাষার সাহায্যে জ্ঞানবিজ্ঞান শিখিয়ে। আমাকে বলেন ওরা হিন্দুর ছেলেমেয়েদের জন্যে লেখা একখানি বইও পড়ে বুঝতে পারে না। কিছুই ওদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। বস্তুত ধর্ম আলাদা তো বটেই, জীবনযাত্রাও আলাদা। ওদের জন্যে নতুন একপ্রস্থ বই লিখিয়ে নিতে হয়েছে তাঁকে। শিক্ষাবিস্তার করতে হলে এটি অবশ্য করণীয়। নইলে বাঙালী কোনো কালেই বাঙালী হবে না। হিন্দু হয়ে, মুসলমান হয়েই বাঁচবে ও মরবে।

সংস্কৃত ও সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন এটা একটা ভ্রান্তি। বহু শতাব্দী পূর্বেই ভারতের তথা বঙ্গের সংস্কৃতিতে "যাবনী মিশাল" ঘটে গেছে। বহু শতাব্দী হতেই আমাদের সংস্কৃতি মিশ্র সংস্কৃতি। ধর্ম ও সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন নয়। এটাও আরো একটা ভ্রান্তি। ইন্দোনেশীয়রা ধর্মে মুসলমান হয়েও সাংস্কৃতিতে রামায়ণ মহাভারতের ধারা অব্যাহত রেখেছে। নামকরণও তাদের আরবীতে না হয়ে হয় সংস্কৃততে। ওলন্দাজ ভাষায় ইংরেজী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না, তাই সুকর্ণ লিখতে গেলে সেটা হয়ে যায় "সোয়েকার্নো"। কিন্তু বিদেশীরা "সোয়েকার্নো" উচ্চারণ করলেও স্বদেশীরা জানে ওটা "সোয়েকার্নো" নয়, সুকর্ণ। দেশনায়ক সুকর্ণ নিজেই বলতেন তিনি মহাভারতের কর্ণের মতো মন্দ নন, তাই তিনি "সুকর্ণ"। তাঁর বীরের আদর্শ অর্জুন। অর্জুনের একখানি পট থাকত তাঁর কক্ষে। শান্তিনিকেতনে একজন যবদ্বীপী অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হয়। নাম তাঁর বীর্য সুপার্থ। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "এর মানে বীর অর্জুন।" তাঁর স্ত্রীর নামটি ভুলে গেছি। সেটিও একটি পৌরাণিক নাম। একটি সভায় তিনি যবদ্বীপে প্রচলিত একটি সংস্কৃত ছন্দের বর্ণনা দেন। ছন্দটি ভারতে বিলুপ্ত। আমরা শুনে অবাক হয়ে যাই। তিনি বলেন ইন্দোনেশিয়ায় গেলেই আমরা এ রকম আরো

অনেক লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করতে পারব। তিনি নিজের দেশে ফিরে গিয়ে আমাকে একখানি চিঠি লিখে সুসংবাদটি জানান। তাঁদের একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তার জন্ম যবদ্বীপে হলেও সম্ভাবনা আর্যাবর্তে। তাই তার নাম রাখা হয়েছে "আর্যাবর্তপুত্র জয়বিষ্ণুবর্ধন"। আমি তো অবাক। নাম শুনলে ভ্রম হবে যে ধর্মও হিন্দু। না, ধর্ম ইসলাম। সুকর্ণের পিতা ছিলেন মুসলমান, মাতা ছিলেন হিন্দু। সে মহিলা বালিদ্বীপবাসিনী। বালিদ্বীপ পাশাপাশি অবস্থান করলেও ধর্মে হিন্দু। সেখান থেকে শান্তিনিকেতনে এসেছিল "মন্ত্র" নামে একটি ছাত্র, মন্ত্র একদিন বালিদ্বীপের সাজসজ্জা পরে আমাদের বাড়িতে এসে পৌরাণিক নৃত্য দেখায়। তার মুখে শোনা গেল বালিদ্বীপে এখনো চাতুর্বর্ণ্য বিদ্যমান। সে নিজে ব্রাহ্মণবংশীয়। ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করলে নিম্নতর তিন বর্ণের কোনো কন্যার পাণিগ্রহণ করতে পারে। তেমনি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। তবে বহুবিবাহ এ যুগে অচল। সে ও তার সমবয়সীরা সে প্রথা তুলে দিতে যাচ্ছে। মন্ত্র ও সুপার্থ দুজনেরই জন্মগত জাতি অর্থাৎ রেস এক। কারো পূর্বপুরুষ ভারত থেকে গিয়ে বসতি করেননি। জন্মসূত্রে উভয়েই আদিম ইন্দোনেশীয়। তাঁদের ভাষাকেও আগে বলা হতো "মালাই" অর্থাৎ মালয়। এখন বলা হয় "ভাষা ইন্দোনেশিয়া"। ভারত থেকে ওরা সংস্কৃতি পেয়েছে, কিন্তু জাতি পায়নি, ভাষা পায়নি। একদা শৈব ও বৌদ্ধ হয়েছিল, বোধহয় বৈষ্ণবও হয়েছিল। একটি ক্ষুদ্র দ্বীপেই হিন্দু ধর্ম নিবদ্ধ। অন্যত্র ইসলাম। কিন্তু সর্বত্র প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি।

ভারতের বেলা সংস্কৃতিতে ঘটে গেছে আরব, ইরান, তুর্কিস্থান ও মঙ্গোলিয়ার সংস্কৃতির সঙ্গে বহু শতক ধরে মিশ্রণ। তার আগেও ঘটেছিল প্রাচীন গ্রীসের সঙ্গে সংমিশ্রণ। পরে শক হূণ কুশান প্রভৃতির স্বাঙ্গীকরণ। পরবর্তীদের বেলা কিন্তু স্বাঙ্গীকরণ সম্ভব হলো না। সেটা ইসলামের অপ্রতিহত প্রভাবে। তা সত্ত্বেও বাংলার মুসলমান বাংলা ভাষা ছাড়েনি, সেই ভাষার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। এই নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা এখন বিশ্বের সর্বত্র রাষ্ট্রদূতাবাসের ভাষা, এ ভাষা এখন ইউনাইটেড নেশনসের সাধারণ সভাতেও ধ্বনিত হয়। বাংলাদেশের মুসলমান পশ্চিমা মুসলমানের প্রাধান্য অস্বীকার করেছে, এখন করতে চায় পশ্চিমা বাঙালীর প্রাধান্য অস্বীকার। অথচ কলকাতার বাংলাই এখন ঢাকারও বাংলা, চট্টগ্রামেরও বাংলা।

মোটামুটি বুঝতে পারা যাচ্ছে যে বাংলা ভাষা এখন অসপত্ন হতে চায়। যেমন ওপারে তেমনি এপারে। ইংরেজীকে ওরা ওদের রাজকর্ম থেকে, ব্যবসা বাণিজ্য থেকে, স্কুল কলেজ থেকে উচ্ছেদ করতে চলেছে, বাংলা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষার দাবী বা অধিকার ওরা স্বীকার করবে না। তা বলে অন্য কোনো ভাষা শিখবে না তা নয়। ইংরেজী ওরা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বর্জন করেছে বলে শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে বর্জন করেনি। ইংরেজী আগের মতো পড়ানো হয় ও গোড়া থেকেই পড়ানো হয়। বাঙালীর ছেলেকে মানুষ না

করে বাঙালী করে রাখার অভিপ্রায়ে তাকে এগারো বছর বয়স পর্যন্ত ইংরেজীর এ বি সি ডি বর্জিত করে রাখার অপারবর্তনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। তা যদি করতে চায় তবে আবার একদিন স্বখাত সলিলে ডুবে মরবে, সেটা পশ্চিমবঙ্গের বেলা অবশ্যম্ভাবী, যদি ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিও হিন্দী-মাধ্যম বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে আত্মরক্ষা করতে চায়। এটাও আমাদের চোখের সামনেই ঘটতে যাচ্ছে। কটক থেকে আমার বড় মেয়ে লিখেছিল ভারত সরকার সম্প্রতি সেখানে একটি সেণ্ট্রাল স্কুল স্থাপন করেছেন। সেখানে বেতনের হার কনভেণ্টের চেয়ে কম। একই খরচে নৃত্য-গীতও শেখানো হয়। সেণ্ট্রাল স্কুলের শিক্ষার মাধ্যমও ইংরেজী। সে তার ছোট মেয়েকে সেখানেই পড়াতে চায়। আমি তার উত্তরে লিখি, উত্তম সিদ্ধান্ত। পরে লিখেছে, "না বাবা, খোঁজ নিয়ে জানা গেল শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী হলেও পলিটিকাল সায়েন্স পড়তে হবে হিন্দীতে, প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখতে হবে হিন্দীতে। আমরা তাতে নারাজ।" আমি তাকে দোষ দিইনে। জাতীয় সংহতির নামে যে স্বাঙ্গীকরণটা চলেছে সেটা এবার ধর্মের নামে নয়, এর একটা সেকুলার বিকল্প আছে। ছলে বলে কৌশলে সবাইকে মাথা হেঁট করে মানিয়ে নিতেই হবে যে হিন্দীই ভারতের একচ্ছত্র ভাষা। সেই ছত্রতলে বাংলাকেও আসতে হবে, যে ভাষা এখন ইউনাইটেড নেশনসেও হিন্দীর সমকক্ষ।

কলকাতায়ও সেন্ট্রাল স্কুল স্থাপিত হয়েছে। যাদের বদলীর চাকরি তারা তাদের ছেলেমেয়েদের সেই স্কুলে পাঠায় খরচ বাঁচাতে। কিন্তু ছেলেমেয়েরা ইংরেজী-মাধ্যমে আর সব বিষয় শিখতে পেলেও পলিটিকাল সায়েন্সের বেলা হিন্দী-মাধ্যম কচি বয়স থেকেই আবশ্যিক। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বিষয়ও হিন্দী-মাধ্যমে পড়ানো হবে। শেষে সেই একই স্কুলই ইংরেজী-মাধ্যম স্কুল না হয়ে হিন্দী-মাধ্যম স্কুলে বিবর্তিত হবে। এ যে শুধু স্কুলের পড়াশুনায় অনুপ্রবেশ তাই নয়, বিহার থেকে একটি বাঙালীর মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে বলেছিল, বিহারের কলেজে বাংলার লেকচারার হয়ে আমি বর্তে গেছি, পশ্চিমবঙ্গে আমাকে চাকরি দিত কে? কিন্তু বাংলার জন্যে নির্দিষ্ট একশো নম্বরের মধ্যে পঞ্চাশটি নম্বরই হলো হিন্দী। কেমন করে পড়াব ভেবে পাচ্ছিনে।" সাবাশ বিহার সরকার! অহিংস বিতাড়নের কী অপূর্ব কৌশল! অসমীয়া ভ্রাতারা যদি সমান চতুর হতেন তা হলে সমগ্র রাজ্যের স্কুল কলেজ এক বছর বন্ধ রেখে এতগুলি ছাত্রছাত্রীকে পথে নামিয়ে গৃহভেদী আন্দোলন চালাতে হতো না। বরং বাঙালীকেই পথে বসাতে পারা যেত। বিহারে তারা আত্মসমর্পণ করে রেহাই পেয়েছে। শুনতে পাই বিহারী ছাত্ররা নাকি তৃতীয় ভাষা হিসাবে বাংলাকেই পছন্দ করে, তামিল তেলেগু বা উর্দুকে নয়। যদি ইংরেজীকে বাদ দিয়ে ত্রিভাষী সূত্র মানতে হয় তো অসমীয়াদের পক্ষে বাংলাই তো সহজতম তৃতীয় ভাষা। আর বাঙালীর পক্ষে অসমীয়া বা ওড়িয়া। কিন্তু যার মাতৃভাষা বাংলা বা ওড়িয়া বা অসমীয়া সে যদি হিন্দীকে দ্বিতীয়

ভাষা করতে বাধ্যই হয় তো সে চাইবে ইংরেজীকে তৃতীয় ভাষা করতে। ইংরেজী সমেত ত্রিভাষী সূত্র মেনে নিলে সেটাই তো আবশ্যিক। ভারতীয় ইউনিয়নে যখন রয়েছি তখন ত্রিভাষী সূত্রের বাইরে যাচ্ছি কী করে? আমরা এদেশের বাঙালী, ওড়িয়া ও অসমীয়ারা এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাঙালীদের মতো নিরঙ্কুশ নই। আমাদের মাথার উপরে একটা কেন্দ্রীয় সরকার রয়েছে, তার শিক্ষানীতির মূলসূত্র হলো ত্রিভাষী সূত্র। সেখানে মাতৃভাষা যেমন আবশ্যিক, হিন্দীভাষাও তেমনি, ইংরেজীও তেমনি। কিন্তু মাতৃভাষা সম্বন্ধে রাজ্য সরকারগুলি যেমন সকলেই একমত, হিন্দী সম্বন্ধে তেমনি নন, ইংরেজী সম্বন্ধেও তেমনি নন। তামিলনাড়ুর ধনুর্ভঙ্গ পণ সে হিন্দীকে ঢুকতে দেবে না, তার কারণ হিন্দীর মুখোশ পরে সংস্কৃত ঢুকবে, তার পরে সংস্কৃতের মুখোশ পরে ব্রাহ্মণ ঢুকবে, তার পরে ব্রাহ্মণের মুখোশ পরে আর্য ঢুকবে আর দ্রাবিড়দের বলবে হনুমান বা জাম্ববান বা রাক্ষস। সেই আর্য অনার্যের যুদ্ধ এখনো তাদের মনে আছে। তারই প্রতিক্রিয়া হিন্দীবিরোধিতা। দরকার হলে ভারতবিরোধিতা। হিন্দী যতদিন না তামিলকে সমান বলে স্বীকার করছে ও কেন্দ্রীয় সরকারে সমান আসন দিচ্ছে ততদিন তামিলের পরিবর্তে ইংরেজীকেই সমান আসন দিতে হবে সর্বক্ষেত্রে। হিন্দীভাষী প্রদেশগুলিতেও হিন্দীর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীকে ও তার পর তৃতীয় ভাষা হিসাবে তামিলকে বা তেলেগুকে বা দক্ষিণের কোনো একটি অনার্য ভাষাকে বেছে নিতে হবে, উত্তরভারতের কোন একটা আর্য ভাষাকে নয়। ভারত সরকার মন্দের ভালো হিসাবে ইংরেজীকেই হিন্দীর পার্শ্বচর করেছেন। সমান বলে এখনো স্বীকার করেননি। কিন্তু যে মর্যাদা ইংরেজীকে দেওয়া হয়েছে সেটা প্রকারান্তরে বাংলার বা উর্দুর বা তামিলের বিকল্প। ইংরেজীকে অপসারণ করতে গেলে নাগা, মিজো, গারো, খাসি, ত্রিপুরী, মণিপুরী বা মাইতেই প্রভৃতি উপ-জাতিরাও অপসরণের পথ ধরবে। এরা কেউ হিন্দীর একাধিপত্য সহ্য করবে না, কারণ সেটা হবে প্রকারান্তরে আর্যদের মহাভারতীয় দিগ্বিজয়।

ব্যক্তির স্মৃতি বেশীদূর উজিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু জনগোষ্ঠীর স্মৃতি যে কতদূর উজিয়ে যেতে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইহুদীদের রাষ্ট্র ইসরায়েল। ইসরায়েলকে বুঝতে হলে ওল্ড টেস্টামেণ্ট পড়তে হবে। ইহুদীরা প্রায় দু' হাজার বছর হলো ঘরছাড়া। প্রতিদিন তারা প্রার্থনা করেছে আবার যেন তারা ঘরে ফিরে যেতে পারে, আবার যেন জেরুজালেম হয় তাদের রাজধানী। দুই মহাযুদ্ধ মিলে তাদের সেই স্বপ্নকে সার্থক হতে দিয়েছে। বিনিময়ে বিসর্জন দিতে হয়েছে যাট লক্ষ প্রাণ। হিটলারের আদেশে। আর্যদের কাছে হেরে গেলেও দ্রাবিড়রা দিগ্বিজয়ী অশোককেও দক্ষিণতম রাজ্যত্রয় জয় করতে দেয়নি। আওরংজেব চেয়েছিলেন দক্ষিণের শিয়া মুসলিম রাজ্য দুটিকে জয় করে আরো দক্ষিণে গিয়ে হিন্দু রাজ্যগুলিও জয় করতে। শিয়া মুসলিম রাজ্য দুটির অপরাধ তারা শিয়াদের দেশ ইরানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রাখত, দিল্লীর পরোয়া রাখত না। আওরংজেবও তো ভারতীয় সংহতিই

চেয়েছিলেন। যদিও সেটা সুন্নী মুসলমানদের দিবাস্বপ্ন। সেরূপ কোনো দিবাস্বপ্ন দিল্লীর নতুন মোগলরা দেখছেন কিনা এখনো পরিষ্কার নয়। হিন্দীর অনুপ্রবেশ তো নানা ছিদ্র দিয়ে প্রতিদিন ঘটছেই ; ইংরেজী ভাষা সর্বভারতীয় সংহতি সম্ভব করেছিল একের বিরুদ্ধে অপরকে খেলিয়ে অথবা লেলিয়ে। আর-কেউ তা পূর্বেও পারেননি, পরেও পারবে না। ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই দোভাগা ও তার পরে তেভাগা হয়ে গেছে, সংহতির আবেদনে কর্ণপাত করেননি, এর পরে যদি বহুধা বিভক্ত হয় তবে সেটাই তো আর্যদের যুগ থেকে মোগলদের যুগ পর্যন্ত বার বার ঘটে এসেছিল। এই ইংরেজ আমলটাই ব্যতিক্রম।

ইংরেজকে হটিয়েছ, এখন ইংরেজীকেও হটাতে চাও! উত্তম। তা হলে প্রস্তুত হও দ্বিশতাধিক আঞ্চলিক ভাষাকে একে একে বিচ্ছিন্ন হতে দিতে। ইংরেজীকে অন্যতম লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে সকলেই রাজী, কিন্তু হিন্দীকেই একমাত্র লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ করতে হবে এই দুর্যোধনের জেদ বিনা যুদ্ধে সম্ভব হবে না। ইংরেজীও হটবে, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীও হটবে। আঞ্চলিকরা অবশ্য আফ্রিকার বাণ্টু রাজ্যগুলির মতো বিশ্বের দরবারে পেছনের সারিতে বসবে ও নিজেদের মধ্যে মারামারি করে লোক হাসাবে।

ত্রিভাষী সূত্র তামিলরা এখনো মেনে নেয়নি। যতদূর জানি নাগারাও মেনে নেয়নি। তাদের দ্বিভাষী সূত্র হিন্দী বর্জিত, কিন্তু ইংরেজী বর্জিত নয়। ইংরেজীই সেই রেশমী সুতো যা ভারতীয় ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যগুলিকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। হিন্দী অনুপ্রবেশের ফলে দুটি রাজ্য যদি বিচ্ছেদের ধুয়ো ধরে তা হলে সেই রন্ধ্র দিয়ে শনিও ঢুকবে। আমার কণ্ঠস্বর দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছয় না। কিন্তু কলকাতার মহাকরণ অঞ্চল বোধ হয় তার নাগালের বাইরে নয়। আমাকে তাই শোভাযাত্রাও করতে হয় না, জনসভাও করতে হয় না, আইন ভঙ্গ করে কারাবরণও করতে হয় না। আমার বক্তব্য হচ্ছে সংক্ষেপে এই যে, উর্দুর মতো ইংরেজীও আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বা হেরিটেজ হয়ে গেছে। যেমন ইসলামের মতো খ্রীস্টধর্মও আমাদের ধর্মীয় উত্তরাধিকার বা হেরিটেজ হয়ে গেছে। এই হেরিটেজ থেকে উত্তরপুরুষকে বঞ্চিত করা অন্যায়। তা বলে এটাও একটা কাজের কথা নয় যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সব ছেলেমেয়েকে সব বিদ্যালয়ের সব শ্রেণীতে ইংরেজী পড়াতে হবে। একজন করদাতা হিসাবে আমার টাকা আমি অপাত্রে বা অযোগ্য পাত্রে বা অনিচ্ছুক পাত্রে বিলিয়ে দেব না। কতকগুলো অযোগ্য শিক্ষককে "নেই কাজ তো খই ভাজ" বলব না। ইংরেজী শিক্ষার মান এত নিচে নেমে গেছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা একটা উৎপাত। যেমন হিন্দী। ক'জন বাঙালী জীবনে একবারও বাংলার বাইরে যায় ও ভিন্নভাষীদের সংস্পর্শে আসে? বাইরে থেকে যদি কেউ আসে তার উচিত বাংলা শিখে নেওয়া। সাহেবরাও তাই করতেন সেই ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকেই। তাঁদের জন্যেই হ্যালেড বাংলা ব্যাকরণ লেখেন, বাংলা হরফ তৈরি করিয়ে নেন। আমার উপরওয়ালাদের

আমি বাংলায় কথাবার্তা বলতে, বক্তৃতা দিতে শুনেছি। তাঁরা ভুল করলে শুধরে দিয়েছি। ইংরেজরা বাংলাবিরোধী ছিলেন এটা একটা নির্জলা মিথ্যা। কেউ বাংলায় চিঠি লিখলে তাঁরা তা পড়তেন বা পড়িয়ে নিতেন।

তেমনি আরো এক নির্জলা মিথ্যা, তাঁরাই নাকি কেরানী বানাবার জন্যে বাঙালীর উপর ইংরেজী চাপিয়েছিলেন। আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার একদিন শান্তিনিকেতনে গিয়ে প্রমাণপত্র দাখিল করে বলেছিলেন যে ইংরেজী শিক্ষার প্রস্তাব সর্বপ্রথমে ওঠে বাঙালীদের দিক থেকে বাংলা সংবাদপত্রে। তাঁরাই বড়লাটের বিরুদ্ধতার ভয়ে প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হন ও তিনিই কলকাতার হিন্দুপ্রধানদের অনুরোধে বড়লাটের অনুমতি আনিয়ে দেন। কিন্তু অর্থ-সাহায্যের দায় নেন না। হিন্দু কলেজ বাঙালী হিন্দুদের অর্থেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিষয়ে বই বেরিয়ে গেছে নানা গবেষকের। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একলক্ষ টাকা মনজুর করেন শিক্ষার খাতে ব্যয় করার জন্যে। এই প্রশ্নে ইংরেজরা দু'ভাগ হয়ে যান। এক পক্ষ বলেন, হিন্দুদের ছেলেরা শিখবে সংস্কৃত আর মুসলমানদের ছেলেরা আরবী ফারসী। ইংরেজী কাউকেই শেখানো হবে না। আরেক পক্ষ বলেন, তার জন্য তো কলকাতায় মাদ্রাসা ও বেনারসে সংস্কৃত কলেজ রয়েছে, সরকার টাকাও দিচ্ছেন। এ টাকাটা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্যে খরচ করা হোক। ছেলেরা জানুক বাইরের জগতে কী কী বিদ্যা শেখানো হচ্ছে। রামমোহন রায় এঁদেরই সমর্থনে বড়লাটকে চিঠি লিখে সমস্ত টাকাটা ইংরেজী শিক্ষার জন্যে বরাদ্দ করতে পরামর্শ দেন। বড়লাট নিরুত্তর। মেকলে আসেন তার অনেক পরে। তার আগেই ডিরোজিওর ছাত্ররা কৃতী হয়েছেন। কেরানী একজনও হননি। কারণ ইংরেজী তখনো সরকারী ভাষা হয়নি। মেকলেকেও দু'দল দু'রকম পরামর্শ দেন। ভোটসংখ্যা সমান সমান দেখে তিনি তাঁর কাস্টিং ভোট দিয়ে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের পক্ষপাতীদের জিতিয়ে দেন। ইংরেজী রাজভাষা হয় ফারসীকে হটিয়ে, আরো পরে। সেটাও বাঙালী হিন্দুদের ইচ্ছায় ও অনুকূলে। বিলেতে ফিরে যাবার পর মেকলের সুপারিশেই ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের দ্বার সর্ব পরীক্ষার্থীর জন্যে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেতে গিয়ে প্রতি-যোগিতায় যোগ দিয়ে সফল হন। প্রথম পরীক্ষার্থী ছিলেন একজন পার্শী। তিনি আগের বছর পরীক্ষা দিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ইংরেজরা পরে সে পরীক্ষার বয়স কমিয়ে দিয়ে বাঙালীর বিলেতযাত্রার অন্তরায় হন। তখন বাঙালীরা কম বয়স থেকেই ছেলেদের পাঠিয়ে দেন বিলেতে পড়াশুনা করতে। যেমন শ্রীঅরবিন্দকে। তিনি সফলও হয়েছিলেন, কিন্তু ঘোড়ায় চড়ায় ফেল করেন বা ফেল করার ভয়ে ঘোড়ায় চড়েন না। সেকালে ঘোড়ায় চড়ায় ফেল করলে দেশে ফিরে এসে আবার ঘোড়ায় চড়ার সুযোগ দেওয়া হতো না। এত কাণ্ডের পরেও যদি কেউ বলেন যে ইংরেজরাই ইংরেজী চাপিয়েছেন তা হলে তাঁদের মনে করিয়ে দেব লর্ড কার্জন উচ্চশিক্ষার উপর কড়া নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করলে বাঙালীরাই প্রতিবাদমুখর হন। উচ্চশিক্ষার বাহন হবার যোগ্যতা

তখনো বাংলার হয়নি। এখনো বাঙালীরা নিজেরাই দু'ভাগে বিভক্ত। এখনো ইংরেজী শিখলে যতগুলো দরজা খুলে যায় ততগুলো দরজা বাংলা শিখলে খুলে যায় না। তাই চারগুণ পাঁচগুণ খরচ করে অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়েই পাঠান, সেসব বিদ্যালয় সরকারের সাহায্য পায় না বা চায় না।

আমার মতে সরকারের পক্ষে অনুচিত হবে অভিভাবকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্কোচন ঘটানো। সরকার বলতে পারেন যে বাংলার জন্যে তাঁরা ফী নেবেন না, ইংরেজীর জন্যে ফী নেবেন। বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা আবশ্যিক। ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা ঐচ্ছিক। প্রাথমিক স্তরে বাংলা অবশ্য-শিক্ষণীয় একটি বিষয়, ইংরেজী ঐচ্ছিক একটি বিষয়। এ রাজ্যের বুদ্ধি-জীবীদের একাংশ ইংরেজীকে তাড়াবেনই তাড়াবেন, আরেক অংশ রাখবেনই রাখবেন। অভিভাবকদেরও একই মনোভাব। কেউ কারো মুখ দর্শন করবেন না, কেউ কারো সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলবেন না, দুই পক্ষই রাস্তায় নেমে পড়েছেন, আইন ভঙ্গ করছেন বা করার হুমকি দিচ্ছেন। লড়াইটা আসলে বাংলার পক্ষে বা বিপক্ষে হচ্ছে না, হচ্ছে ইংরেজীর পক্ষে বা বিপক্ষে। যেন এটা স্বাধীনতা সংগ্রামের জের। ইংরেজীর বিপক্ষে যাঁরা তাঁরাই প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামী। পক্ষে যাঁরা তাঁরা পরাধীনতাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চান। যত সব দেশদ্রোহী! একদল যদি বলেন, ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোকে রেহাই দাও, অন্য দল বলেন, তাদেরকেও হটাও। এই সাচ্চা আজাদদের বোঝাবে কে যে এটা রাজনীতির ক্ষেত্র নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্র? ইংরেজী এক্ষেত্রে ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। সোনারুপোর চেয়েও দামী। ইংরেজী না জানলে সিভিল লিবার্টি বিপন্ন, রুল অভ ল বিপন্ন, পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী বিপন্ন, প্রেসিডেনশিয়াল ডেমোক্রাসী বিপন্ন, সেকুলার স্টেট বিপন্ন। সুতরাং নাগরিকের মৌল অধিকারও বিপন্ন। লোকের জীবিকাও বিপন্ন, ব্যবসা বাণিজ্যও বিপন্ন, সুতরাং এটা জীবনমরণেরও প্রশ্ন। এই স্বখাত সলিলে একদিন সবাইকে ডুবতে হবে, তখন যারা ডুবতে না চায় তারা আগে থেকে তারস্বরে চিৎকার করবেই। সেট একপ্রকার "বাঁচাও, বাঁচাও" বা "ত্রাহি ত্রাহি" চিৎকার।

আমাদের সংস্কৃতির উত্তরসাধক যারা হবে তাদের শিক্ষা শিশুকাল থেকে কী ভাবে পরিচালিত হবে এ বিষয়ে আমরা সকলেই চিন্তিত, আমরা যারা এই সংস্কৃতির উত্তরাধিকার আমাদের পূর্বসূরীদের হাত থেকে পেয়েছি। অত্যন্ত চিন্তাকুল হয়ে এক অশীতিপর সাহিত্যসাধক যদি এমন কথা বলে থাকেন যে, ভালো ইংরেজী না জানলে ভালো বাংলা লেখা যায় না, তবে আমি তাঁর নৈতিক সৎসাহসের জন্যে আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করব। তিনি বুর্জোয়া বলে তাঁর নিজের শ্রেণীটিকে অক্ষয়বটের মতো অমর করার অভিপ্রায়ে সেকথা বলেননি। এই উক্তি যেভাবে উদ্ধৃত হয়েছে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে অক্ষম। একদিক থেকে এটা সত্য যে, মাইকেল, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ তিনজনেই ইংরেজী রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের

ইংরেজী রচনা বিলম্বে প্রকাশিত হলেও তাতে দীর্ঘকালীন সাধনার ইতিহাস নিহিত। যাঁরা তাঁর গদ্য পড়েছেন তাঁরা তাতেও প্রচ্ছন্ন ইংরেজীর প্রভাব লক্ষ করেছেন। বেশ কয়েকটি জায়গায় আমি ইংরেজী ইডিয়মের বাংলা রূপান্তর সন্দেহ করেছি। প্রমথ চৌধুরীর বাংলা একজন বহুবিধ বিদ্যানাগরিকের বাংলা। সে বিদ্যা বহু দেশের বহু ভাষার থেকে আহৃত। বঙ্কিমেও আমি ইংরেজী গদ্যরীতির অনুশীলন লক্ষ করেছি। মাইকেল তো ইংরেজী, ফরাসী, ল্যাটিন, গ্রীকের দ্বারা প্রকাশ্যে প্রভাবিত। বিশুদ্ধ বাংলানবীশেরা প্রায় প্রত্যেকেই প্রচুর ইংরেজী বই পড়েছেন, যদিও তাঁরা অপেক্ষাকৃত প্রভাবমুক্ত। বালজাকের একটি গল্পের বাংলা রূপান্তর আমি চিনতে পেরেছি। আরেক-জনের বেলা তেমনি বিদেশী গল্পের রূপান্তর। আমার অগ্রজপ্রতিম এক সাংবাদিক আমাকে বলেন যে তিনি যতবারই ইংলণ্ডে যান পুরাতন স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। সেইভাবে গল্পের নেশা পরিতৃপ্ত করেন। আমাকে তিনি বিশ্বাস করে বলেন যে, বাংলা ছোটগল্পের উৎস তিনি আবিষ্কার করেছেন। অসংখ্য গল্প ইংরেজী থেকে ভাষান্তরিত তথা রূপান্তরিত। আমি চেক করে দেখিনি কোন্ ইংরেজী গল্পের সঙ্গে কোন্ বাংলা গল্পের সাদৃশ্য আছে। সন্দেহই তো প্রমাণ নয়। আমি বলি, স্বয়ং শেকসপীয়ার কী করেছিলেন? ইটালিয়ান না থাকলে ইংরেজী নাটক থাকত? লাটিন গ্রীক না থাকলে ইংরেজী ফরাসী ইটালিয়ান থাকত? গোটা রেনেসাঁসটাই তো এক হাতে নিয়ে আরেক হাতের দান। সংস্কৃত সাহিত্যের নিশ্চয়ই পূর্বতন উৎস ছিল। একজন বাঙালী পণ্ডিত তো রামায়ণকেও মিশর থেকে না পশ্চিম এশিয়া থেকে পাওয়া কাহিনীভিত্তিক মনে করতেন। কারো কারো মতে মহাভারতের যুদ্ধ ঘটেছিল ভারতের বাইরে। অনেকেই জানেন না যে প্রাচীন ভারত ছিল বর্তমান ভারতের চেয়ে আরো বৃহৎ। আফগানিস্থান তো তার অন্তর্গত ছিলই, মধ্য এশিয়ার কতক অংশও ছিল তার সামিল। ডক্টর রোয়েরিখ আমাকে বলেছিলেন যে রুশদেশেও দুটি হিন্দু গ্রাম তিনি আবিষ্কার করেছেন। সাইবেরিয়াতেও বৌদ্ধমঠ আছে। সাইবেরিয়াতে, মঙ্গোলিয়ায়, সিনকিয়াঙ্গে, কোরিয়ায়, চীনে, জাপানে, ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায়, মালয়ে, বর্মায়, থাইল্যান্ডে, সিংহলে, কোথায় না বৌদ্ধ বিহার, পালি গ্রন্থ, সংস্কৃত গ্রন্থ? হিন্দু প্রভাবও বৌদ্ধ প্রভাবের সঙ্গে মিশ্রিত। সেকালের সেই বহুবিস্তৃত সংস্কৃতিও ভারতীয় সংস্কৃতি, যদিও ভৌগোলিক অর্থে নয়। ধর্মে আর সংস্কৃতিতে উত্তমর্ণ বা অধমর্ণ বলে কেউ নেই। কিছু না পেলে কিছু দেওয়া যায় না। কিছু দিতে হলে কিছু নিতে হয়। এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচাই কবি, চিত্রকর, সঙ্গীতকার, নাট্যকার প্রভৃতির স্বাভাবিক কর্ম। এটা চলে এসেছে সভ্যতার আদিকাল থেকে। চলবে অনন্তকাল অবধি।

আর্ট

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

টলস্টয়ের মতো মহাশিল্পী তাঁর কীর্তির শিখরে বসে আর্টজিজ্ঞাসা লিখে তাঁর আপন সৃষ্টিকেই খর্ব করেছিলেন। এটা আমার মনে লেগেছিল। কারণ আমি ছিলুম তাঁর 'আনা কারেনিনা'র মন্ত্রমুগ্ধ।

বিশ বছর বয়সে সেই যে আমার মনে আর্টজিজ্ঞাসা সঞ্চারিত হয় তারই পরিণতি এই 'আর্ট'। এটি লেখার কল্পনা আমার ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে, যখন আমি 'সত্যাসত্য' রচনায় নিবিষ্ট। খাতার পাতায় নোট করে যাই, কিন্তু প্রবন্ধ আকার দিইনে। চল্লিশ বছর বয়সে বুদ্ধদেব বসুর আহ্বান পাই। তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা'র জন্যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ চাই। বিষয় আর্টের মূলসূত্র।

তখনো আমার বলবার কথা আমারি কাছে পরিষ্কার হয়নি। বুদ্ধদেব বসুর আহ্বানে সাড়া দিলে অপদস্থ হব। তা সত্ত্বেও রাজী হয়ে গেলুম। আর কিছু না হোক সম্পাদকের চাপে নিবিড়ভাবে ভাবতে বাধ্য হব। কিন্তু কয়েকটি প্রবন্ধ লেখার পর দেখি দেশময় অশান্তি। সাম্রাজ্য টলমল। আমার উপরে রাজপুরুষোচিত দায়। কোনোমতে আরো কয়েকটি প্রবন্ধ লিখতে পারলুম। তারপর আমার চোখের সুমুখে দেশ ভেঙে গেল। সেই ভাঙনের দিন আমার উপরে চাপল আরো দুর্বহ দায়। শেষে সব ছেড়ে দিয়ে দায়মুক্ত হলুম।

ভেবেছিলুম অঢেল অবসর পাব ও যত খুশি লিখব। কিন্তু রাষ্ট্র থেকে দূরে সরে থাকলেও দেশ থেকে তো বিদায় নিইনি। সাময়িক সমস্যাই আমার কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। অনেকদিন পরে 'অন্তঃসার' লিখি। কিন্তু তার পরের প্রবন্ধ 'অন্তঃসৌন্দর্য' আরম্ভ করে আর এগোতে পারিনে। এবার দেশের দশা দেখে নয়। এবার আমার নিজেরি আইডিয়া স্পষ্ট নয় বলে। জোর করে তাকে স্পষ্ট করা যেত না। অপেক্ষা করাই শ্রেয়। প্রজাপতিকে ধরতে ছুঁতে পাকড়াতে ও পিনবদ্ধ করতে এগারো বছর লাগল।

ওই প্রবন্ধটিকে ডিঙিয়ে যেতে পারলে এ বই কবে শেষ হয়ে যেত। কিন্তু তা হলে বাকিটা ঠিকমতো লেখা হতো না। আমার চিন্তার বিবর্তনে ওই প্রবন্ধটি একটি স্টেজ।

আরো কয়েকটা প্রবন্ধ লেখার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু তা হলে আরো অনেক দেরি হতো। যে বইয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে বিশ বছর কি তারও আগে তাকে আর ফেলে রাখা যায় না। আমার প্রকাশক অতিশয় সজ্জন। তা বলে তিনি চিরকাল ধৈর্য ধরতে পারেন না। তাই এইখানেই দাঁড়ি টানছি। সব সময় কিছু হাতে রেখে দেওয়াও আর্ট। হাত একেবারে খালি করে দিতে নেই। তা ছাড়া আমার আর্টজিজ্ঞাসাও অফুরন্ত।

অন্নদাশঙ্কর রায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আর্ট কথাটি আমি পাই বারো বছর বয়সে 'সবুজপত্র' পড়তে গিয়ে। বাংলা হরফে লেখা এই ইংরাজী শব্দটির অর্থ কী তখন আমি জানতুম না। কিন্তু শব্দটি আমার মনে গেঁথে যায়। কলেজে পড়তে গিয়ে হাতের কাছে পাই টলস্টয়ের বই 'হোয়াট ইজ আর্ট'। কতক বুঝি কতক বুঝিনে। অস্কার ওয়ালড না কার রচনায় পাই 'আর্ট ফর আর্টস সেক'। আর্টের জন্যই আর্ট। টলস্টয় কিন্তু এটা সইতে পারেন না। সত্য আর শিব তাঁর কাছে শ্রেয়। সৌন্দর্যই একান্ত নয়। রম্যা রলাঁর দৃষ্টি ছিল জনগণের উপরে। শেষ বয়সে টলস্টয়েরও তাই। আর্ট যেন তাঁদের জন্যে।

এই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে করতে একদিন পাটনা থেকে যাই শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথকে নির্জনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, **'Is Art too good to be human nature's daily food ?'** আর্ট কি এতই ভালো যে মানবপ্রকৃতির দৈনন্দিন পথ্য হতে পারে না ?

তিনি একটু ভেবে নিয়ে বলেন, 'তা কী করে হবে ? উচ্চতর গণিত কি সর্বজনবোধ্য ? আগে সহজ গণিত শিখতে হবে।

বোঝা গেল যে আর্ট উচ্চতর গণিতের সঙ্গে তুলনীয়। তা হলে তো শুধু বিদগ্ধজনের জন্যে। মন মানে না। বছর চারেক বাদে সুইটজারল্যাণ্ডে গিয়ে রম্যা রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি ও সেই একই প্রশ্ন শুধাই। তিনি তা শুনে বিরক্ত হয়ে বলেন, 'রেনেসাঁসের যুগে সাধারণ কারিগররাও সুন্দর সুন্দর ভোগ্য সামগ্রী তৈরি করত। সাধারণের জন্যে। সকলেই ব্যবহার করত, সকলেই খুশি হতো। আর্ট কতক লোকের বিলাস বস্তু নয়।

নানা মুনির নানা মত শুনে আমি নিজের জন্যে একটা পথ খুঁজে বার করি। আমি পাঠকদের দিকে অর্ধেক দূর যাব। পাঠকরা আমার দিকে অর্ধেক দূর আসবেন। আমি যেমন তাঁদের জন্যে শ্রম স্বীকার করব তেমনি তাঁরাও আমার জন্যে শ্রম স্বীকার করবেন। বিনা শ্রমে গড়বার মতো লেখা আমার নয়। বিনা শ্রমে আমিও তো লিখিনে। বিশুদ্ধ আর্টের রসাস্বাদন ও রূপভোগের জন্যে জনগণকেও প্রস্তুত হতে হবে। তা সে সাহিত্যই হোক আর সঙ্গীতই হোক আর চিত্রই হোক। যা নিছক জনপ্রিয় তা রসোত্তীর্ণ ও রূপতীর্থ তথা কালোত্তীর্ণ হয় না। উত্তীর্ণ হওয়াটাই লক্ষ্য।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়ে কার্তিক ঘোষ আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। শিশুসাহিত্য রচনায় ইনি সুনাম অর্জন করেছেন। প্রকাশনায়ও তিনি সার্থকতা অর্জন করবেন আশা করি।

অন্নদাশঙ্কর রায়

১৪ ডিসেম্বর

বিষয়সূচী

আর্ট কী ও কী নয়

লেখার ভিতর দিয়ে আমি আমার আপনাকে দিচ্ছি, যিনি পড়ছেন তিনি আমাকে পাচ্ছেন। গানের ভিতর দিয়ে আমি আমার আপনাকে দিচ্ছি, যিনি শুনছেন তিনি আমাকে পাচ্ছেন। ছবির ভিতর দিয়ে আমি আমার আপনাকে দিচ্ছি, যিনি দেখছেন তিনি আমাকে পাচ্ছেন।

আরো আছে। কিন্তু যে কথাটা বোঝাতে চাই সেটা এই যে একটা না একটা ছলে আমি আমার আপনাকে দিচ্ছি আর তিনি আমাকে পাচ্ছেন। আমার পক্ষে এই দেওয়াটা আনন্দের, তাঁর পক্ষে ঐ পাওয়াটা আনন্দের। দেওয়া ও পাওয়ার এই যে ছল বা উপলক্ষ বা মাধ্যম এরই নাম আর্ট। এও আনন্দের।

আমরা অনেক সময় বলে থাকি রান্না একটা আর্ট। অযথা নয়। রান্নার ভিতর দিয়ে একজন তার আপনাকে দিতে পারে, যে খায় সে তাকে পেতে পারে। দেওয়া ও পাওয়ার এটাও একটা ছল বা উপলক্ষ বা মাধ্যম। স্যাকরা যে গয়না গড়ে, ধোপা যে কাপড় কাচে, গাড়োয়ান যে গাড়ী হাঁকায়, পসারিনী যে পসরা হাঁকে, এদের এক একটি ছলে আপনাকে দেওয়া, আপনার পরিচয় দেওয়া, এক একটি আর্ট বলে গণ্য হতে পারে। যদিও হয় না।

বস্তুত মানুষের আপনাকে দেওয়ার অন্ত নেই, পরকে পাওয়ার অন্ত নেই, দেওয়া ও পাওয়ার ছল বা উপলক্ষ বা মাধ্যম অনন্ত অজস্র। আমার এক কালে দুরভিলাষ ছিল যে আমার প্রতিদিনের প্রত্যেকটি কাজ ও অকাজ, প্রত্যেকটি হাসি ও কান্না, প্রত্যেকটি চিন্তা ও বাক্য আর্ট হবে। আমি যখন মরব তখন লোকে বলবে, অমন করে মরাটাও একটা আর্ট। এখন ততবড়ো দুরভিলাষ নেই, তবু এখনো আমি বিশ্বাস করি যে মোটের উপর জীবনটা একটা আর্ট। ঠিকমতো বাঁচতে পারাটা একটা আর্ট। তা যদি হয় তবে জীবনের ছোট বড়ো অনেক ব্যাপার আর্ট হতে পারে। তাস খেলাও একটা আর্ট, চুকলি করাও তাই। ঢিল মেরে আম পাড়াও একটা আর্ট, ফাঁদ পেতে প্রজাপতি ধরাও তাই। গম্ভীর ভাবে যোগাসনে বসে মেয়েদের দিকে আড়চোখে চাওয়াও একটা আর্ট, পাগলা ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে দিব্যি সরে পড়াও তাই। এসব উপলক্ষেও মানুষ তার আপনাকে দিচ্ছে, আপনার পরিচয় দিচ্ছে। হয়তো কেউ লক্ষ করছে না, কিন্তু করতে তো পারত। লক্ষ করলেই পরিচয় পেত। সব সময় কল্পনা করতে হয় যে কেউ একজন লক্ষ করছেন। আর কেউ না করলেও, অন্তর্যামী ভগবান।

আর্ট কথাটা আমাদের ভাষার নয়। এর ঠিকঠিক প্রতিশব্দ নেই। তবে কলা কথাটা যদি হাস্যকর না হতো তা দিয়ে আর্টের কাজ চলত। হাস্যকর হয়েই মাটি করেছে। ধরুন আমি যদি নিরীহভাবে বলি, আপনার লেখায় কলা আছে, হনুমানেরা আপনাকে ক্ষেপিয়ে তুলবে। জীবনটা একটা কলা

শুনলে হনুমানেরা ঠাওরাবে আমিও তাদের একজন। সেই ভয়ে আমি ইংরেজী আর্ট কথাটাকে আসরে নামালুম। শিল্প এক্ষেত্রে অচল, কেননা ছলার সঙ্গে কলার নিকট সম্পর্ক, শিল্পের মধ্যে একটা আয়াসের ভাব। আর্টিস্টকে আমরা শিল্পী বলে অনুবাদ করে থাকি, কিন্তু ওর চেয়ে খাঁটি অনুবাদ কলাবৎ বা কলাবতী।

আর্ট কথাটার মস্ত দোষ এই যে আর্ট বলতে যার যা খুশি সে তাই বোঝে। ইদানীং সাহিত্য শব্দটাও পিতৃমাতৃহীন হয়েছে। সাহিত্যসম্মেলনে বিজ্ঞানশাখা ইতিহাসশাখা দেখে ভ্রম হয় বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস বুঝি সাহিত্যের শাখা। যাদের মাথা এত পরিষ্কার তাদের কেউ যদি ধর্মকেও আর্টের আমলে আনে কিংবা আর্টকেও ধর্মের আমলে তবে নালিশ করতে পারিনে। শুধু চতুরাননকে স্মরণ করে নিবেদন করতে পারি, শিরসি মা লিখ। অধুনা চণ্ডীমণ্ডপের সমাজপতিরা যদিবা চুপ করেছেন তাঁদের চাদর পড়েছে মস্কো মণ্ডলের সমাজতন্ত্রীদের কাঁধে। আর্ট এবং মার্কস্ কথিত সুসমাচার যে এক এবং অভিন্ন হওয়া উচিত, না হলে বুর্জোয়া বলে বর্জনীয় হওয়া বিধেয়, আধুনিক ভাটপাড়া থেকে এই জাতীয় পাঁতি দেওয়া হচ্ছে। আর্ট যে একপ্রকার প্রোপাগাণ্ডা, প্রোপাগাণ্ডা যে একপ্রকার আর্ট, অপোগণ্ডরা সহজেই তা মেনে নিচ্ছে। না নেবেই বা কেন? তাদের পূর্বপুরুষরা যে আবহমানকাল দেবদেবীর মাহাত্ম্য-প্রচারকে মঙ্গলকাব্য বলে মেনে এসেছে।

আর্ট কী তার একটা আভাস দিয়েছি, সংজ্ঞা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। আর্ট কী নয় তার এবার একটা ইঙ্গিত দিই।

আমার অনেক লেখা আছে, সব লেখার ভিতর দিয়ে আমি আমার আপনাকে দিইনি। বৈষয়িক চিঠিপত্র, মামলার রায়, পরিদর্শনের মন্তব্য, তদন্তের রিপোর্ট এসব লেখা আর্ট নয়। যদিও তাদের কোথাও কোথাও হয়তো আমার সাহিত্যিক রুচির ছাপ আছে।

যেমন সব প্রেম প্রেম নয়, তেমনি সব লেখা আর্ট নয়। প্রতিদিন রাশি রাশি লেখা প্রকাশিত হচ্ছে, আরো কত অপ্রকাশিত থাকছে। সব যদি আর্ট হতো তবে আনন্দের বিষয় হতো, কিন্তু বিষয়কর্ম চলত না। কোম্পানী আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে বারো ভোল্ট্ ব্যাটারী দিতে পারবে না। আমি যদি এর উত্তরে একটা কবিতা কি প্রবন্ধ লিখে পাঠাই তা হলে কোম্পানী আমাকে পাগলাগারদে পাঠাবে। সব লেখা আর্ট নয়, তাই বাঁচোয়া। নইলে কোম্পানী আমাকে একটা ছোট গল্প পাঠিয়ে বলত এই তার পাল্টা জবাব। তখন আমি মনের ঘেন্নায় লেখা ছেড়ে দিতুম।

পৃথিবীতে তিন ভাগ জল যেমন সত্য জীবনে বারো আনা বিষয়কাজ তেমনি। বিষয়কাজের সঙ্গে আর্টের সম্বন্ধ সদরের সঙ্গে অন্দরের। আমার বিহার উভয়ত্র। আমি নভেলও লিখি, রিপোর্টও লিখি। কিন্তু অন্দরকে যেমন সদর বলে ভ্রম করিনে তেমনি নভেলকে রিপোর্ট বলে। কিংবা রিপোর্টকে নভেল বলে। সব লেখা আর্ট নয়। কারণ সব লেখায় আমি আমার আপনাকে

দিতে পারিনে, দেবার ছল পাইনে। ঘর কেন বাহির, বাহির কেন ঘর, জীবনে এ রকম নিত্য ঘটে না। ঘটে হয়তো ক্বচিৎ। যদি কেউ ঘরে-বাইরের ভেদ তুলে দেন তবে তাঁর জীবনটা হাট হয়ে উঠবে। লেখার থেকে আর্ট উঠে যাবে।

যেমন সব লেখা আর্ট নয় তেমনি সব গান আর্ট নয়, সব ছবি আর্ট নয়, সব রান্না আর্ট নয়, সব কান্না আর্ট নয়, সব চুল ছাঁটা আর্ট নয়, সব হাত-সাফাই আর্ট নয়। দেখতে হবে কিসে মানুষ তার আপনাকে দিয়েছে, দেবার ছল পেয়েছে। কিসে দেয়নি, দেবার ছল পায়নি। সেই অনুসারে স্থির করতে হবে কোনটা আর্ট, কোনটা আর্ট নয়।

আমি চুল ছাঁটাকেও আর্টের মধ্যে ধরেছি, পকেট কাটাকেও। কিন্তু বিজ্ঞান দর্শন বা ইতিহাসকে ধরতে রাজি নই। এর কারণ আমি সাম্রাজ্যবাদী নই, স্বরাজ্যবাদী। বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস সমাজতত্ত্ব এরা একটা স্বতন্ত্র রাজ্য। আর্টও স্বতন্ত্র। পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ নিশ্চয় আছে, না থাকলে অস্বাভাবিক হতো। কিন্তু যা আর্ট নয় তাকে আর্টের সীমানার ভিতর পুরলে আর্ট বেচারী কোণ-ঠাসা হয়, তার পা ছড়াবার ঠাঁই থাকে না। আবার উল্টো বিপত্তি ঘটে যখন আর্টের উপর ফরমাস পড়ে বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক হবার। বিজ্ঞানকে বা ধর্মকে আত্মসাৎ করতে গিয়ে আর্ট তাদেরই উদরসাৎ হয়। আজকাল সমাজকে নিয়ে আর্টের এই বিপত্তি।

তবে আর্ট ও আর্ট-নয়ের মাঝখানে কোনো সুনির্দিষ্ট সীমান্তরেখা নেই। যে রেখা নেই তাকে গায়ের জোরে টানতে গেলে দ্বন্দ্ব বাধে। উপনিষদ্ পড়তে পড়তে অনেক সময় মনে হয়েছে যা পড়ছি তা কাব্য। প্লেটোর রচনা পড়ে বুঝতে পারিনি কেন আর্ট নয়। বাইবেলের যেখানে সেখানে কবিতার কণা ছড়ানো। এসব উড়িয়ে দেবার যো নেই। অথচ একথা কখনো মানতে পারিনে যে ধর্মগ্রন্থের বাইরে দর্শনগ্রন্থের বাইরে আর্ট নেই বা থাকলেও নিচু দরের আর্ট। আসল কথা, কোথায় আর্ট শেষ হয়ে দর্শন আরম্ভ হয়েছে, কোথায় ধর্ম শেষ হয়ে আর্ট আরম্ভ হয়েছে তা কেউ জানে না, জানতে পারে না। কেউ কি বলতে পারে কোনখানে হেমন্তের সারা, শীতের শুরু? কোনখানে বসন্তের শুরু, শীতের সারা?

সীমানার গোলমাল চিরদিন থাকবে, জোর করে বেড়া দিলে বেড়া টিকবে না। তা বলে যদি কেউ মনে করেন যার নাম বিজ্ঞান তারই নাম ধর্ম, যার নাম ধর্ম তারই নাম দর্শন, যার নাম দর্শন তারই নাম ইতিহাস, যার নাম ইতিহাস তারই নাম সমাজতত্ত্ব, যার নাম সমাজতত্ত্ব তারই নাম আর্ট, তবে সেই অদ্বৈত-বাদীকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার জন্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে বলব। সীমানার বিবাদ হাজার বার সইব, কিন্তু এই হবুচন্দ্রের বিচার একবারও না। কোন-খানে ব্যবধান তা যদিও স্পষ্ট নয় তবু ব্যবধান তো সত্য। ব্যবধানের সত্যতা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হয়।

যা আর্ট তা আছে। যা আর্ট নয় তাও আছে। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ, তাও

আছে। প্রভেদের অস্পষ্টতা, তাও আছে। সুতরাং তর্কের অবকাশ চিরকাল। তাতে আমার ক্ষোভ নেই। আমার লেখা যদি আর্ট হয়, আমার আর্ট যদি সত্য হয়, তবে সত্যের জোরে নিজের স্থান করে নেবে, তর্কের জোরে নয়, তত্ত্বের জোরে নয়। কিন্তু সম্প্রতি একটা ধারণা আর্টিস্টদের নিজেদেরই মাথা ঘুলিয়ে দিচ্ছে। তাঁরা ভাবছেন যে আপনাকে দেওয়াটা কোনো কাজের নয়, যে ছলে দেওয়া যায় সেটাও বাজে, দিতে হবে এমন কিছু যাতে সমাজের প্রত্যক্ষ প্রগতি হয়, তা দিলেই আর্ট হবে, না দিলে আর্ট হবে না। এই ধারণা যে একটা কুসংস্কার—একটা নতুন কুসংস্কার—এ জ্ঞান একদিন ফিরবে তাঁদের যাঁদের ভিতরে কিছু আছে। অন্তরের মূল্যই আর্টের পরম মূল্য, বাইরের মূল্য তাকে মূল্য দিতে পারে না। আর্ট একটা ছল, একটা উপলক্ষ, একটা মাধ্যম। সমাজ-প্রগতির হেতু বা নিমিত্ত নয়। সে কাজ অন্য লেখার, অন্য ছবির, অন্য গানের।

(১৯৪৪)

লক্ষ্য এবং উপলক্ষ

আমার কিছু দেবার আছে। না দিয়ে আমার শান্তি নেই। যত দিন আমি না দিয়েছি তত দিন আমার অন্তর আকুল, আমার অন্তর উদ্বেল। হয়তো শুধু এই জিনিসটি দিয়ে যাবার জন্যেই আমি জন্মেছি, মরার আগে না দিয়ে যাই তো জীবন বৃথা। কে জানে হয়তো আবার জন্মাতে হবে কেবল এই অঞ্জলি অর্পণ করবার জন্যেই, এই ভার থেকে মুক্ত হবার জন্যেই। মুক্তির যেন আর কোনো অর্থ নেই, মুক্তি বলতে বুঝি এই দায় থেকে মুক্তি। এই বোঝা আমার নামবে যেদিন সেদিন আমার কী উল্লাস, কী সোয়াস্তি!

তার পর দেখা যাবে আমার দানের ভিতর দিয়ে আমি আপনাকে দিয়ে গেছি। একখানি উপন্যাসের কি একটি কবিতার ভিতর দিয়ে আমার পরিপূর্ণ পরিচয় জানিয়ে গেছি। দৃশ্যত ওখানি একখানি উপন্যাস বা ওটি একটি কবিতা। কিন্তু অদৃশ্যত আমার আপনা।

সেইজন্যেই বলেছি, আর্ট একটা ছল, একটা উপলক্ষ, একটা মাধ্যম। ওর আড়ালে রয়েছে আরো এক ব্যাপার। দেওয়া আর পাওয়া। জানা আর জানানো। যে দিচ্ছে তার নাম লেখক বা গায়ক বা চিত্রকর। এক কথায় আর্টিস্ট। কিন্তু ঐ নামের অন্তরালে রয়েছে আরো একজন, সে দাতা। সে জ্ঞাপক। লেখক নামে আমি সাধারণের পরিচিত। কিন্তু ঐ কি আমার পরম পরিচয়? আমি যে ওর চেয়ে অনেক বড়ো, ওর চেয়ে অনেক উঁচু। আমি যে দাতা। আমি আত্মদা। লেখাটা আমার ছল, যে ছলে আমি আপনাকে দিই।

তেমনি যিনি পাচ্ছেন তাঁর নাম পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শক বা এক কথায় রসিক। যিনি রসের আস্বাদন করেন। যিনি উপভোক্তা। কিন্তু ঐ নামের অন্তরালে আছেন আরো একজন, তিনি জ্ঞাতা। তিনি গ্রহীতা। পাঠক নামে

আপনি লাইব্রেরী মহলে পরিচিত। কিন্তু ঐ কি আপনার চূড়ান্ত পরিচয়? ওর চেয়ে যে আপনি অনেক বৃহৎ, অনেক মহৎ। আপনি যে গ্রহীতা। গ্রহণ করেন একজনের আত্মদান। বইখানা তো একটা উপলক্ষ, একটা মাধ্যম। আপনি যে জ্ঞাতা। জ্ঞাত হন একজনের অন্তর। আপনি যে অন্তরঙ্গ।

অন্তর জানাজানির ব্যাপারটা অলক্ষ্যে। সেইটেই লক্ষ্য। বই লেখা ও বই পড়ার ব্যাপারটা সকলের নজরে। এটা উপলক্ষ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের স্বভাব এই যে ওরা চাক্ষুষ যা দেখে তাই চরম প্রমাণ বলে ধরে নেয়। তলিয়ে দেখতে যায় না। সেইজন্যে উপলক্ষকে মনে করে লক্ষ্য। লক্ষ্যের কোনো সন্ধান রাখে না। লেখা যদি লক্ষ্যভেদ না করে বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তা হলে ওর টেরই পায় না, কেয়ারই করে না। বলা বাহুল্য, এমন লোক শুধু পাঠকদের মধ্যে নয়, লেখকদের মধ্যেও আছেন। অনেক আর্টিস্ট অন্তর দিতে জানেন না, অন্তরঙ্গ চান না। তাঁদের সম্বন্ধ অন্তরঙ্গের সঙ্গে নয়, ক্রেতা বা স্তাবকের সঙ্গে। বই খুব বিক্রি হচ্ছে, ছবির খুব সুখ্যাতি হচ্ছে। গান শুনতে রাজা মহারাজারা আমন্ত্রণ করছেন। ব্যস, জন্ম সার্থক।

আর্ট একজনের অন্তরবাসীকে আরেকজনের অন্তরগোচর করে। একজনের সত্য পরিচয় আরেকজনের হৃদয়ে পৌঁছে দেয়। একজনের গোপনতম বাণী আরেকজনের মনের কানে বলে। একজনের দুঃখসুখের অভিজ্ঞতা দিয়ে আরেকজনের উপভোগ্য বানায়। একজনের সঞ্চিত ঐশ্বর্য নিয়ে আরেকজনের উত্তরাধিকার গড়ে।

একজন, আরেকজন, এই দু'জন না থাকলে আর্ট হয় না। অন্তত একজন কল্পিত পাঠক বা দর্শক থাকা চাই, যার জন্যে লেখক লিখবে বা নর্তক নাচবে। একলব্যের দ্রোণাচার্যের মতো একজন শ্রোতার প্রতিমা বা প্রতীক সামনে রেখে সারেগামার সাধনা করতে হয়। প্রত্যেক আর্টিস্টের নিজের ভিতরেই একজন রসিক বা রসাস্বাদক থাকেন, তাঁকেই সাক্ষী করে অনেক সময় কাজ করে যেতে হয়।

একজন, আরেকজন, এই দু'জন না থাকলে আর্ট হয় না, বলেছি। একবার হয়ে গেলে পরে সর্বজন তার অধিকারী। সর্বজনকে আরেকজন বললে যদি গণিতশাস্ত্রের অবমাননা হয় তা হলে আরেক পক্ষ বলতে পারি। আমি এক পক্ষ, আমার পাঠকরা অপর পক্ষ। আক্ষরিক অর্থে না হলেও অপর পক্ষ হচ্ছেন আরেকজন। তাঁরা বা তিনি আমার অন্তরঙ্গ। একযোগে না হলেও এক এক করে আমার অন্তরঙ্গ। যখন লিখি তখন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি আত্মনিবেদন করি। যে ছলে করি তার নাম উপন্যাস বা কবিতা বা আরো তুচ্ছ ছড়া। সেই আমার আর্ট।

আমি নিজেকে একজন বলে গণেছি। কিন্তু এমন যদি হত যে আমি ও আমার বন্ধুরা মিলে "বন্দে মাতরম্" গান রেকর্ডে দিয়েছি, গানের কোন অংশ কে গেয়েছে জানবার উপায় নেই, সবটাই সকলের গাওয়া, তা হলে আমরা ঠিক একজন হতুম না আক্ষরিক অর্থে। এক পক্ষ বললে গণিতশাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা

হত। কিন্তু আর্টের বিচারে এক পক্ষও যা, একজনও তাই। তার মানে আমরা "বন্দে মাতরম্" গায়করা সাত আট জন হয়েও একজন। কারণ অন্তর আমাদের একটিই। সুরও একটি। তালও একটি। দৃশ্যত আমরা বহু, কিন্তু অদৃশ্যত এক।

এই অর্থে তাজমহল একজনের সৃষ্টি। সেই একজনের নাম সকলের সুবিধার খাতিরে শাহ্‌জাহান। আসলে তাঁর নামই নেই।

যেমন নেই সাঁচী ভারহুৎ এল্লোরা অজন্তার ভাস্করদের স্থপতিদের চিত্রীদের নাম। তাঁরা এক লক্ষ্যে এক উপলক্ষে এক হয়েছেন। তাই তাঁরা একজন। অজন্তার বেলায় একজন, এল্লোরার বেলায় একজন, তাজমহলের বেলায় একজন, কোণার্কের বেলায় একজন। গণভাস্কর্য বা জন-স্থাপত্য বলে যদি কিছু থাকে তবে তা একজনের সৃষ্টি। যে হিসাবে আমাদের সেই "বন্দে মাতরম্" গান। একজন মানে মাথা গুনতির একজন নয়। অন্তর গুনতির, সুর গুনতির, লক্ষ গুনতির একজন। মহাভারতেও বহুজনের হাত লেগেছে, রামায়ণেও বহুজনের হস্তক্ষেপ। সকলের নাম মনে রাখা যায় না বলে ব্যাস বাল্মীকির নামই গ্রন্থকারের নাম।

একজনই হোক আর বহুজনই হোক, এক পক্ষ দাতা, অপর পক্ষ গ্রহীতা : এক পক্ষ জ্ঞাপক, অপর পক্ষ জ্ঞাতা। দুই পক্ষ নিয়ে যেমন পক্ষী, তেমনি আর্ট। কিংবা দুই পার নিয়ে যেমন নদী, তেমনি আর্ট। উপমা দুটি জুৎসই হল না, কিন্তু ওর চেয়ে সুন্দর উপমা খুঁজে পাচ্ছি কোথায়! যুগল না হলে যেমন লীলা হয় না, দুই পক্ষ না হলে তেমনি আর্ট হয় না। দুই হাত না হলে যেমন তালি বাজে না, দুই পক্ষ না হলে তেমনি বাঁশি বাজে না, বীণা বাজে না, অর্কেস্ট্রা বাজে না। দুই-র উপরে আমি এতটা জোর দিচ্ছি এইজন্যে যে লেখকের ও পাঠকের পরস্পরের সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে সাহিত্য হয় আঁধারে ঢিল ছোঁড়া। আমরা প্রতিদিন আঁধারে ঢিল ছুঁড়ছি ও খাচ্ছি। আমাদের অধিকাংশ রচনা প্রীতি পাচ্ছে না, ব্যর্থ হচ্ছে।

লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মন জানাজানি, বছরে চারখানা করে বই লেখাটাই লক্ষ্য নয়। ওটা যে সব সময় আর্ট তাও নয়। ওটা অধিকাংশস্থলে আর্ট নয়, ইন্ডাস্ট্রী। ওর মূলে রয়েছে আর্থিক তাড়না, আন্তরিক প্রেরণা নয়। আন্তরিক প্রেরণা যেখানে, সেখানে চেনা-শোনাটাই লক্ষ্য, আর আর্ট তার উপলক্ষ। অর্থের প্রশ্ন ওঠে না, তবে সামাজিক অব্যবস্থার দরুন আর্টিস্টকে তা নিতে হয়, নতুবা প্রাণহানি।

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আমাদের যুগে সামাজিক অব্যবস্থার পেষণে আর্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে বাজারের পণ্য। যেমন চাল ডাল মশলা মাছ মাংস ডিম শাড়ী গয়না সিঁদুর তেমনি নাটক উপন্যাস কাব্য নাচ গান ছবি। লেখকের সঙ্গে পাঠকের যথার্থ সম্বন্ধ কোনো পক্ষেরই মনে নেই, দু'পক্ষেরই ব্যবহার এ দেশের বরপক্ষের ও কন্যাপক্ষের ব্যবহারের মতো। রবীন্দ্রনাথের "বধূ" বলছে,

"কেহ বা দেখে মুখ কেহ বা দেহ
কেহ বা ভালো বলে, বলে না কেহ।
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।"

বলা বাহুল্য কন্যাপক্ষীয়েরাও বরকে পরখ করে নেন সুযোগ পেলেই। কেউ কাউকে পরখ করতে ছাড়ে না, কারণ সম্বন্ধটা হচ্ছে ক্রেতাবিক্রেতার।

আর্ট যেহেতু পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সেহেতু তার বিচার হচ্ছে পণ্য হিসাবে। যিনি দাম দিয়ে কিনে কৃতার্থ করবেন তিনি কেন গ্রহীতা হবেন, তিনি ক্রেতা! আর যে হতভাগ্য দাম না নিয়ে পারে না সে কোন মুখে বলবে সে দাতা! হাতেনাতে ধরা পড়ছে সে বিক্রেতা। স্বয়ং শেক্‌স্‌পীয়ারের পক্ষেও প্রমাণ করা শক্ত যে তিনি বিশুদ্ধ দাতা। টলস্টয়ের প্রকাশক ও পত্নী তাঁকে দাতা হতে দিলেন না কিছুতেই, তাঁর শেষ জীবনের দ্বন্দ্ব তো প্রধানত এই নিয়ে। এই দ্বন্দ্ব থেকে তাঁকে উদ্ধার করল তাঁর মৃত্যু। মৃত্যুর পরে তিনি আর বিক্রেতা নন, তিনি বিশুদ্ধ দাতা। কিন্তু আমরা যারা বেঁচে আছি ও থাকতে চাই এই দ্বন্দ্ব থেকে পরিত্রাণের উত্তম কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিনে। ইচ্ছা করে কোনো এক আশ্রমের বা ট্রাস্টের নামে গ্রন্থের উপস্বত্ব লিখে দিতে, কিন্তু তাতে করে লেখকের সঙ্গে পাঠকের সম্বন্ধ শোধরায় না।

(১৯৪৫)

আর্টের মূল্য

আমি আমার আপনাকে দিচ্ছি। যার ভিতর দিয়ে দিচ্ছি, যে ছলে দিচ্ছি, যে উপলক্ষে দিচ্ছি তার নাম আর্ট। আর্টের মূল্য কি? আর্টের মূল্য কতক তার নিজের, কতক আমার।

যেমন একখানা চিঠির মূল্য। প্রিয়ার চিঠি প্রিয়ার মূল্যে মূল্যবান। কিন্তু যদি প্রিয়ার চিঠি না হয়ে অপ্রিয়ার চিঠি হতো তা হলেও তার একটা মূল্য থাকত। চিঠি হিসাবে। সেটা তার নিজের মূল্য।

আর্টের মূল্য কতক তার নিজের। যেহেতু সে আর্ট। কতক আর্টিস্টের। যেহেতু তিনি আপনাকে দিচ্ছেন। এ ছাড়া আরো এক মূল্য আছে। বিষয়ের। বিষয়বস্তুর। চিঠি এলে প্রথমেই মনে জাগে, কে লিখেছে? তার পরে কথা ওঠে, কী লিখেছে? প্রিয়জনের চিঠিতে যদি কিছু নাও থাকে তবু তা মূল্যবান, কিন্তু কিছু থাকলে আরো মূল্যবান। জানতে ইচ্ছা করে কেমন আছে, কী করছে, কবে দেখা হবে। তেমনি প্রিয় লেখকের নতুন বই দেখলে পড়ে দেখতে ইচ্ছা করে, কী বিষয়ে লেখা, বিষয়ের দিক থেকে মূল্যবান কি না। সাধারণত আমরা ধরে নিই, নিশ্চয়ই মূল্যবান। কিন্তু শেষ করবার পর নিরাশ হয়ে বলি, কই, কী এমন ভালো! কিংবা নিশ্চিন্ত হয়ে বলি, ভালোই হয়েছে। কিংবা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলি, আগের খানার চেয়েও ভালো।

আর্টের মূল্যে তা হলে তিন দফা। এক, তার নিজের। দুই, তার রচয়িতার। তিন, তার বিষয়ের। লাইব্রেরীতে যখন এক রাশ বই হাতের কাছে পাই তখন আমরা একখানা টেনে নিই তার লেখকের নাম দেখে, যেমন রবীন্দ্রনাথের। একখানা পেড়ে নিই বিষয়ের আকর্ষণে, যেমন স্বপ্নের ফলাফল। এবং যদি সুরসিক হয়ে থাকি তো একখানা বইয়ের খোঁজ করি নিছক আর্টের খাতিরে। যেমন "বীরবলের হালখাতা"। সংস্কৃত সাহিত্যে এমন অনেক রচনা আছে যার আদি অন্ত সুভাষিত। আমরা তাদের স্বাদ নিই লেখকের খাতিরে নয়, কারণ লেখক অনামা। বিষয়ের খাতিরে নয়, কারণ বিষয় মরচে-ধরা। আর্টের খাতিরে। অর্থাৎ কে বলেছে তার জন্যে নয়, কী বলেছে তার জন্যে নয়, কেমন করে বলেছে তারই জন্যে।

সোনায় সোহাগা হয় যদি 'কেমন করে বলেছে'র সঙ্গে 'কী বলেছে'র সঙ্গম হয়। তার সঙ্গে যদি 'কে বলেছে' যোগ দেয় তো ত্রিবেণীসঙ্গম। কিন্তু এ রকম সার্থক রচনা জগতে খুব বেশী নেই। সেইজন্যে শেক্‌স্‌পীয়ারের এত দর। আমাদের দেশে কালিদাসের ও রবীন্দ্রনাথের। অবশ্য এঁদের সব রচনা সমান সার্থক বা সমান অমূল্য নয়। কিন্তু কোন কোন রচনা সার্থক বা অমূল্য তা বিচার করা সহজ হয় যদি মনে রাখি কেমন করে বলেছেন, কী বলেছেন, কে বলেছেন।

কে বলেছেন, এর মধ্যে একটু কথা আছে। মলাটের উপর যদি লেখা না থাকে তো লেখকের নাম উদ্ধার করা শক্ত। ছেলেবেলায় এমন অনেক বই আমার চোখে পড়েছে যেগুলির মলাট ছেঁড়া ও ভিতরের কয়েক পৃষ্ঠা নেই। প্রাচীন পুঁথির যেখানে ভণিতা আছে সেখানে নাম পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু যেখানে ভণিতার অভাব সেখানে লেখকের নাম অজ্ঞাত। ছবিতে স্বাক্ষর করার প্রথা সেকালে ছিল না, একালে সকলে মানেন না। মন্দির মসজিদের গায়ে রাজা-রাজড়ার নাম খোদাই থাকতে পারে, কারিগরের নাম থাকে না। ভাস্কর্যের কোনো কোনো স্থলে উৎকীর্ণ লিপি লক্ষিত হয়, কিন্তু ভাস্করের নাম নয়।

তা হলে কে বলেছেন বা এঁকেছেন বা গড়েছেন কেমন করে জানব ? জানব মন দিয়ে পড়ে, অন্তদৃষ্টি দিয়ে দেখে, সত্তা দিয়ে অনুভব করে। নাম হয়তো জানব না। তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ নামটা একটা লেবেল ছাড়া আর কী? উঠে গেলেও যে যার জিনিস চিনে নিতে পারে। তেমনি অজন্তার গুহাচিত্র দেখে চিনতে পারি, যদি যত্ন করি, কে কোনখানা এঁকেছেন। নাম জানিনে, কিন্তু যে কোনো নাম কল্পনা করতে পারি। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে না চাপালেই হলো। নিচে স্বাক্ষর না থাকলেও যে কোনো অর্বাচীন দর্শক যামিনী রায়ের ছবির সঙ্গে নন্দলাল বসুর ছবির তফাৎ ধরতে পারবে। নাম যদি না জানে তো কল্পনা করবে, এখানা পাঁচকড়িবাবুর ওখানা তিনকড়ি-বাবুর। আমার নাম ও বুদ্ধদেববাবুর নাম যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তা হলেও আমাদের লেখায় এমন কোনো গভীর পার্থক্য থাকবেই যার থেকে আন্দাজ হবে আমার নাম উদো, ওঁর নাম বুধো।

অত কথায় কাজ কী, শেক্‌স্‌পীয়ার যে বেকনের ছদ্মনাম, নাটকগুলি যে বেকনের কীর্তি, এখনো এ ধারণা খাস ইংলণ্ড থেকে যায়নি। সুতরাং নিজ নামে লিখলেও নিস্তার নেই। বৌদ্ধরা হয়তো একদিন দাবি করবেন যে শঙ্কর হচ্ছে বুদ্ধদেবেরই অষ্টোত্তর শত নামের এক নাম। ভরসা এই যে বৌদ্ধারা সে দাবি নাকচ করবেন।

কিন্তু যে কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই সেটা এই যে, আর্টের ভিতরেই আর্টিস্টের সত্যিকার পরিচয় অদৃশ্য থাকে, যার অন্তর্দৃষ্টি আছে সে আবিষ্কার করতে পারে। প্রিয়জন যদি টাইপরাইটারে চিঠি লেখেন ও নিচে নাম সই করতে ভূলে যান তা হলে কি আমরা ও চিঠি আর কারো চিঠি বলে ভুল করি? সেক্ষেত্রে আমরা অভ্রান্ত। প্রত্যেকটি বাক্যের ও শব্দের যোজনায় প্রিয়জনের পরিচিত মুখ নতুন করে দেখতে পাই। তেমনি আর্টের বেলা। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা যদি অন্য কোনো নামে প্রচারিত হয় তা হলেও আমার চিনতে ভুল হবে না কে লিখেছেন। কবি তাঁর অদৃশ্য পরিচয় চিরকালের মতো রেখে গেছেন তাঁর প্রকাশিত অপ্রকাশিত যাবতীয় লেখায়। হয়তো তাঁর নামটা লোকে ভুলে যাবে, বা ভুল করবে। বলবে ভানুসিংহ বা নিবারণ চক্রবর্তী। কিন্তু তাঁর পরিচয় নিয়ে ভুল করতে পারে না। ভোলবার নয়।

আর্টকে মূল্যবান করে আর্টিস্টের প্রচ্ছন্ন পরিচয়। মহাশিল্পীরা সে পরিচয় আরো প্রচ্ছন্ন করেন, তাঁদের কাছে তাঁদের নিজেদের দাম কানাকড়ি। তাঁরা যা দিতে চান তাকেই দাম দেন সবচেয়ে বেশী। কী দিচ্ছেন তারই উপর এতটা জোর দেন যে কেমন করে দিচ্ছেন তাও ভাবেন না। তাঁদের রচনায় আর্ট যদি থাকে তো অনিচ্ছাকৃত বা স্বয়ম্ভসম্ভব। অথচ সে আর্ট সজ্ঞান শিল্পীর অসাধ্য। যাঁরা দুবেলা 'আর্ট' 'আর্ট' করেন তাঁরাই যে সেরা আর্টিস্ট তা নয়। সেরা আর্টিস্টদের মুখে কথা নেই, তাঁরা ইজম আওড়ান না, তাঁদের একাগ্র অভিনিবেশ বিষয়ের উপর। কিন্তু তাঁদের অজ্ঞাতসারে তাঁদের ভিতরে যে আর্টিস্ট থাকে সে আর্টের প্রতিও তীব্র দৃষ্টি রাখে। তাঁরা যেমন তেমন করে লেখেন না, আঁকেন না, গড়েন না। কেমন করে লেখেন বা আঁকেন তা হয়তো তাঁদেরও অজ্ঞাত, কিন্তু আমরা যখন পড়ি বা দেখি তখন বুঝতে পারি সেটাও আছে এবং সেটাও দামী।

কেমন করে লিখব এটা অনেক সময় 'কী লিখব'র থেকে অভিন্ন। বিষয় অনুসারে লেখার ধরণ ধারণ বদলায়। প্রত্যেক বারেই ভেবে নিতে হয় কেমন করে লিখব, কেমন করে লিখলে ঠিক লেখাটি ওতরাবে, ঠিক সুরটি বাজবে, ঠিক ছবিটি ফুটবে, ঠিক অর্থটি হৃদয়ঙ্গম হবে। যাঁরা ওস্তাদ লিখিয়ে তাঁদের অত ভাবতে হয় না, তাঁদের অজ্ঞাতসারে আর একজন ভাবে, সে তাঁদের ভিতরকার আর্টিস্ট। তাঁরা তাঁদের সবটা মনোযোগ দেন বিষয়ের উপরে। 'কী লিখব'র উপরে। 'কেমন করে লিখব'র দিকে নজর আর একজনের। কিন্তু আমার ভিতরকার মানুষ যদি না ভাবে তো আমাকেই ভাবতে হয়।

তাতে আমার বিষয়বিভোরতা ব্যাহত হয়। ধ্যানীর পক্ষে ধ্যানহানি প্রায় প্রাণহানির মতোই দুঃখকর। সেইজন্যে আমি আঙ্গিকের কথা একেবারেই মনে আনতে চাইনে। অথচ ওর প্রয়োজন মানি।

একটু বয়স হলে, হাত পাকলে, আত্মবিশ্বাস জন্মালে অন্যান্য সাধকের মতো শিল্পীরও স্মরণীয় শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। শর যেমন লক্ষ্যে মগ্ন সাধকও তেমনি বিষয়ে মগ্ন। বিষয় অবশ্য ধনসম্পদ নয়। বিষয় হচ্ছে যা দেবার। যা না দিয়ে আমার নিষ্কৃতি নেই, যা দিতে আমি এসেছি। কে কী দিতে এসেছে তা অপরের অজানা, হয়তো তার নিজেরই না-জানা। কিন্তু প্রত্যেক অভিনেতার যেমন নির্দিষ্ট পাঠ প্রত্যেক লেখকেরও তেমনি। জীবনদেবতার নির্দেশ। তিনিই প্রম্পট্ করেন। আমরা ইতস্তত পরীক্ষা করতে করতে যে যার বিষয় পেয়ে যাই। এ ক্ষেত্রে যার তার ফরমাস খাটে না। তবে পরের ফরমাসও অনেক সময় সোনার কাঠির কাজ করে। তার পরশ লেগে আমাদের ঘুম ভাঙে, আমরা আত্মস্থ হই, আপনাকে চিনি, আপনার পাঠ বুঝে নিই। পরের ফরমাস খাটতে গিয়ে ঘরের কাজ করি। যা দেবার তা প্রথমে জানি, তার পরে দিই।

তিন দফা মূল্যের কথা হলো। এবার কাঞ্চনমূল্য। কাঞ্চনমূল্য আর্টের নয়, কারণ আর্ট হচ্ছে বিশুদ্ধ দান। কাঞ্চনমূল্য ছাপা-কাগজের, কাঞ্চনমূল্য বহুজনের শ্রমের। আর্টিস্ট তার পাওনাহিসাবে যেটুকু পায় সেটুকু যে কোনো শ্রমিকের পাওনা। কারো কম, কারো বেশী।

(১৯৪৫)

মুখ্য আর গৌণ

আমার কিছু দেবার আছে, আমি তা দিয়ে যেতে চাই—এই ভাবে আর্টের শুরু। আর্টের গোড়ার কথা অন্তরের পূর্ণতাবোধ ও পূর্ণতার অঞ্জলি শূন্য করার কামনা।

এ যেমন গোড়ার কথা তেমনি মাঝখানকার কথা হচ্ছে কেমন করে শূন্য করব সেই কৌশল জানা ও প্রয়োগ করা। কেমন করে দিতে হয় সে বিদ্যা আমি শিখেছি, সে লীলা আমি সেধেছি—এই ভাবে আর্টের চলা।

তার পরের কথা দান। আমার যা দেবার ছিল আমি তা দিয়েছি, সেই সূত্রে আপনাকে দিয়েছি—এই ভাবে আর্টের সারা। আর্ট যখন সারা হয় তখন দেখা যায় অঞ্জলি শূন্য করে একজন তার পূর্ণতার দান দিয়ে গেছে, সেই ছলে নিজেকেও দিয়ে গেছে। এই হচ্ছে শেষ কথা।

শুরু ও সারার মাঝখানে দীর্ঘ পথ। এ পথ যে কেবল দীর্ঘ তাই নয় দুর্গমও বটে। সুতরাং শুরু করার আগে দশ বার ভাবা উচিত এ পথে পা দেব কি দেব না। জগতে করবার মতো কাজ অনেক আছে, আর্টই একমাত্র করণীয় নয়। যদি কেউ সব জেনে শুনে এ পথে পা দেন তবে তাঁকে মনে

রাখতে হবে এ পথের অন্য নাম কলাবিদ্যা বা লীলাসাধনা। এর কোনো শর্ট-কাট বা একলম্ফ নেই।

কিন্তু এই সামান্য কথাটা অনেকের মনে থাকে না। তাঁদের ধারণা যেমন তেমন করে বাজালেই তার নাম বীণাবাদন, যেমন তেমন করে গাইলেই তার নাম মার্গসঙ্গীত, যেমন তেমন করে লিখলেই তার নাম কথাসাহিত্য। না, আর্টের মধ্যে 'যেমন তেমন করে'র স্থান নেই। এর আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত 'কেমন করে'র রাজত্ব।

কেমন করে লিখব বা গাইব বা আঁকব বা গড়ব এ চিন্তা যাঁর কাছে তুচ্ছ চিন্তা তাঁর উচ্চ চিন্তা নিয়ে তিনি দর্শন বিজ্ঞান ধর্মনীতি সমাজনীতি করুন, আর্ট তাঁকে দিয়ে হবে না। এ রাজ্যে উচ্চ চিন্তার মূল্য আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু যতক্ষণ না সে জিনিস আর্টে রূপান্তরিত হচ্ছে ততক্ষণ তাকে আর্ট বলার উপায় নেই। সে জিনিস একলম্ফে আর্ট হয়ে ওঠে না। মহাবীর মারুতি রামনাম বুকে এঁকে একলম্ফে সাগর পার হয়েছিলেন, কিন্তু রামায়ণ বা রামচরিতমানস যাঁরা লিখে গেছেন তাঁরা কেবল রামনামের মহিমায় কালসাগর পার হননি। কেমন করে লিখতে হয় সে বিদ্যা শিখেছেন ও তার সাহায্য নিয়ে কালসাগর পার হয়েছেন।

এর থেকে যদি কেউ সিদ্ধান্ত করেন যে আর্টের আসল কথাটা হলো কলাবিদ্যা, কোনো মহান সত্য বা গভীর প্রেরণা থাকলেও চলে, না থাকলেও চলে, তবে তিনি ভুল করবেন। সেকালের অনেকে এ ভুল করেছিলেন, একালের অনেকে করছেন, ভাবীকালের অনেকেও করবেন। আমরা আর্টিস্টরা মায়া দিয়ে মনোহরণ করি, সেটা আমাদের স্বধর্ম। কিন্তু তাই বলে সত্যকে গৌণ ও মায়াকে মুখ্য করতে যাইনে, যদি যাই তো আমরা সত্যিকার আর্টিস্ট নই, আমরা মায়াবী। মায়া যাঁদের সম্মোহিত করেছে তাঁরা আর্ট সৃষ্টি করতে অক্ষম। তাঁরা নিজেরাও মজেন, অপরকেও মজান, শেষ পর্যন্ত কোথাও পৌঁছন না, পৌঁছে দেন না। শুরু থেকে সারা অবধি যে মাঝখানকার পথ সেই পথই তাঁদের বেঁধে রাখে, মুক্তি দেয় না। কী করে তাঁরা মুক্ত পুরুষ হবেন! আর আর্টিস্টের অন্য নাম তো মুক্তপুরুষ। যে পুরুষ দানভার মুক্ত। যে কিছু হাতে রাখেনি, হাত খালি করে দিয়ে গেছে।

এই পথপাশবদ্ধদের কালোয়াৎ বলা যেতে পারে। কালোয়াতী সঙ্গীত আমাদের কানেই পশে, কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে না। কালোয়াতী কবিতারও সেই স্বভাব। কালোয়াতী চিত্র, কালোয়াতী ভাস্কর্য, কালোয়াতী নৃত্য—যত রকম কালোয়াতী আর্ট আছে তাদের সকলেরই সেই প্রকৃতি। তারা মরমে পশে না। আর্টের যেখানে সারা তাদের সেখানে প্রবেশ নেই, তত দূর তারা পৌঁছয় না, মধ্য পথেই বাঁধা পড়ে। বিশুদ্ধ কালোয়াতীরও এক প্রকার রস আছে, সেটা কলাবিদ্যার নিজস্ব রস। কলারসিকরা সে রসের সমজদার। তাঁরা একখানি বিশুদ্ধ আলাপ শুনলে ধন্য হয়ে যান, তাঁকেই বলেন পিওর আর্ট। এই যদি হয় পিওর আর্ট তো এ শুধু অল্পসংখ্যক

গন্ধর্বের জন্যে। এঁরা মানুষ হলে এঁদের হৃদয় থাকত এবং হৃদয়ের সমজদারি অত সহজে মিটত না, হৃদয় চাইত হৃদয়ের নিবেদন। সত্যকারের সমজদার হচ্ছেন হৃদয়রসিক, সেই সঙ্গে কলারসিক। আর মায়ামুগ্ধ সমজদার হচ্ছেন বিশুদ্ধ কলারসিক। পিওর আর্ট বলতে যদি বোঝায় হৃদয়-বিরহিত কালোয়াতী তবে তাকে আমি উঁচুদরের আর্ট বলতে কুণ্ঠিত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ আমাকে মুগ্ধ করে, অবাক করে, কিন্তু আমার হৃদয়ে পৌঁছয় না। শ্রুতিসুখে আচ্ছন্ন করে, কিন্তু মর্ম স্পর্শ করে মর্মান্তিক সুখী করে না। সেইজন্যে মনে হয় জয়দেবও পথপাশবদ্ধ মায়াবী পুরুষ, মুক্তপুরুষ নন। চণ্ডীদাস তাঁর বিপরীত।

আর্টের মধ্যে একটা মুক্তি আছে। যাতে তা নেই তা আর্ট হতে হতে হলো না, কোনো এক জায়গায় ঠেকে গেল। হয়তো কলাবিদ্যার একান্ত অভাব, নয়তো কলাবিদ্যার একান্ত আতিশয্য। কিংবা এমনো হতে পারে যে গোড়াতেই গলদ। দান করবার মতো অন্তঃসার নেই। পূর্ণতাবোধ নেই। দান করার কামনা নেই। কামনার বেদনা নেই। যা আছে তা অন্য জাতের কামনা, যেমন ধনকামনা যশকামনা শক্তিকামনা। শুরুতেই যদি ছাই থাকে তো সারাতেও তাই থাকে। মাঝখানে থাকে ভস্মে ঘি ঢালা। কলাবিদ্যার অপচয়।

তবে অনেক সময় ছাইঢাকা আগুনও থাকে। ঘি ঢালতে ঢালতে জ্বলে ওঠে। ঘৃতের কিছু অপব্যয় হয়, কিন্তু একেবারে অপচয় নয়। সেইজন্যে কোনো কবিযশঃপ্রার্থীকে উপহাস করতে নেই। উৎসাহ দিয়ে বলা উচিত, "লিখুন, লিখতে থাকুন, লিখতে লিখতেই হবে।" এটা স্তোকবাক্য নয়। লিখতে লিখতে কত লেখক নিজেকে পেয়ে গেছেন। পেয়ে গেছেন নিজের বাণী, নিজের ধ্যান, নিজের যা শ্রেষ্ঠ, নিজের যা সত্য। কিন্তু লিখতে লিখতে মানে যেমন তেমন করে লিখতে লিখতে নয়। কেমন করে লিখতে হয় তার প্রতি দৃষ্টি রেখে লিখতে লিখতে। কলাবিদ্যার অনুশীলন করতে করতে। গাইতে গাইতে কেউ গুণী হয় না, কেমন করে গাইতে হয় তার প্রতি লক্ষ রেখে গাইতে গাইতে গুণী হয়, যদি তার ভিতরে গুণ থাকে, আগুন থাকে।

"তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী—" রবীন্দ্রনাথের এই লাইনটিতে ঝোঁক পড়েছে 'কেমন করে'র উপর। গানের উপর নয়। এই 'কেমন করে' আছে বলেই গুণ আছে। চর্চা করতে করতে গুণ ফুটে ওঠে, আগুন জ্বলে ওঠে। সুরের আগুন তো বটেই, হৃদয়মনের আগুন। বৈষ্ণবকবিরা যাকে বলেন "হিয়া দগদগি অন্তরদাহনি"। তার পরে আর ভস্মে ঘি ঢালা নয়, আগুনে ঘি ঢালা।

আর্টের ইতিহাসে সব রকম পথিক দেখা যায়। কেউ পথকেই সর্বস্ব করে কালোয়াৎ হলেন, কেউ পথসংক্ষেপ করতে গিয়ে বেরসিক। সেই যিনি বলেছিলেন, "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে", তাঁর যে কিছু বলবার ছিল না তা নয়। তবু তিনি হলেন চিরকাল হাস্যাস্পদ, অথচ সেই কথা আরেকজনের মুখে

রূপ নিল "নীরসঃ তরুবরঃ পুরতঃ ভাতি" আর তিনি হলেন কবির কবি। সেই থেকে একটা সূত্র রচিত হলো বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। অন্যান্য সূত্রের মতো এটিও মনে রাখার সুবিধার জন্যে। এর মধ্যে কাব্যের সব কথা নেই। রস যার আত্মা এমন যে বাক্য সেই হচ্ছে কাব্য। কিন্তু কোন রস? কথার পর কথা সাজিয়ে গেলে তারও তো একটা রস আছে। "না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো" এটা শুধু নায়িকার অত্যুক্তি নয়। শব্দের মধ্যে, ধ্বনির মধ্যে, উপমার মধ্যে, অলঙ্কারের মধ্যে স্বকীয় একটা রস আছে। সেটা বিষয়-নিরপেক্ষ। প্রেরণানিরপেক্ষ। কালোয়াতেরা এ রসের সন্ধান রাখেন। কিন্তু শব্দমাত্র এই রসই কাব্যের মূলতত্ত্ব নয়। কবির হৃদয় থেকে উৎসারিত হৃদয়-রসই সেই রস যাকে বলা যেতে পারে কাব্যের আত্মা। সেই রসে রসাত্মক না হলে বাক্য কখনও কাব্য হতে পারে না, কলা কখনও আর্ট হতে পারে না।

রস আর আলো

উদ্ভিদ রস বিনা বাঁচে না, আলো বিনা বাড়ে না। আলো আর রস তার নিত্য আবশ্যক। জ্ঞানকে যদি বলি আলো আর আনন্দকে রস তা হলে আলো আর রস মানুষেরও নিত্য আবশ্যক।

মানুষের মন যেন আকাশের দিকে উন্মুখ হয়ে আছে, আলোর জন্যে, জ্ঞানের জন্যে। আকাশেরও সীমা নেই, আলোরও অবধি নেই। আবিষ্কারের পর আবিষ্কার মানুষের জ্ঞানের পিপাসা তৃপ্ত করছেও বটে, বৃদ্ধি করছেও বটে। এমনি করে মানুষ মনের দিক থেকে বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে পশু থেকে মানুষ হয়েছে, মানুষ থেকে সভ্য শিক্ষিত মানুষ।

তেমনি মানুষের হৃদয় যেন ধরিত্রীর বুকে মুখ রেখে স্তন্য অন্বেষণ করছে, রস অন্বেষণ করছে। অন্বেষণ করছে আনন্দ, কখনো বা তার নাম বেদনা। পার্থিব জীবন তাকে নিত্য অভিষিক্ত করছে নানা বিচিত্র রসে। তৃপ্ত করছে তার তৃষা, অতৃপ্ত রাখছেও। অনুভূতির গাঢ়তা, গভীরতা ও বিচিত্রতা তাকে সহৃদয় করে, নতুবা সে হৃদয়হীন হয়, অসাড় হয়। পাষাণ হয়ে যায়। মানব-রূপধারী জীবন্ত পাষাণকে মানুষ বলিনে। জড় পদার্থ বলি। হৃদয়ের দিক থেকে নীরস যারা তারা সভ্য শিক্ষিত হলেও অমানুষ। তাদের চেয়ে অসভ্য অশিক্ষিত ভালো, যদি সহৃদয় হয়, স-রস হয়। ধরিত্রীর স্নেহের দুলাল এরা। এরাই জানে বাঁচতে।

মানুষের রসের পিপাসা অনাদি কালের। প্রকৃতির কাছে পৃথিবীর কাছে পার্থিব জীবনের কাছে মানুষ যে রস পায় তাতেও সে তুষ্ট নয়। তাকে তুষ্ট করার ভার নিয়েছে কবি সঙ্গীতকার ভাস্কর চিত্রকর নর্তকী ও নট। এরা দিচ্ছে এদের হৃদয়ের রস, দিচ্ছে কাব্য সঙ্গীত ভাস্কর্য রূপে, নৃত্য নাটক চিত্র রূপে। আরো অনেক রূপ আছে। সব রূপই হৃদয়রসের রূপ। সব রূপই মানবহৃদয়ের সৃষ্টি। অনুভূতির তুলি দিয়ে আঁকা, অনুভূতির লেখনী দিয়ে

লেখা। একের অনুভূতি এমনি করে অপরের হয়। কবির অনুভূতি পাঠকের, গায়কের অনুভূতি শ্রোতার, ভাস্করের অনুভূতি দর্শকের। জীবনের কাছে সরাসরি যা পায় পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শক তাই যথেষ্ট মনে করে না, আরো চাই আর্টের মাধ্যমে। আর্ট তাকে এনে দেয় এমন একটা রস যেটা তার অনাস্বাদিত। অথবা এমন একটা রস যেটা আস্বাদিত হলেও আবার আস্বাদন করতে সাধ যায়। পরের অনুভূতির সঙ্গে নিজের অনুভূতি মিলে গেলেও আনন্দ, না মিললেও আনন্দ। তার পর যে অনুভূতি নিজে প্রকাশ করতে পারছিনে অপরে তা প্রকাশ করলেও আনন্দ।

আর্ট হলো রসের যমুনা। আর বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস অর্থনীতি হলো আলোর আকাশগঙ্গা। আলোর জন্যে আমরা আকাশগঙ্গার পথে ঘুরি। রসের জন্যে ফিরি যমুনাপুলিনে। রসের জন্যে বললে ঠিক বলা হয় না। বলতে হয় রূপঘন রসের জন্যে। বা রসঘন রূপের জন্যে। যে রসের রূপ নির্দিষ্ট হয়নি তা আর্ট হয়ে ওঠেনি। তার জন্যে যমুনার কূলে না ফিরে সোজাসুজি সাগরজলে ঝাঁপ দেওয়া ভালো। জীবনের সাগরজলে।

আর্ট হচ্ছে রসাত্মক রূপ বা রূপাত্মক রস। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। যেখানে রূপ নেই সেখানে আর্ট নেই। যেখানে রস নেই সেখানে তো নেইই। কূল আর জল দুই নিয়েই নদী। রূপ আর রস দুই নিয়েই আর্ট। দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতির এমন কোনো বন্ধন বা বাঁধ নেই, আলোকে ধরে রাখতে পারে এমন কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই। দর্শন বিজ্ঞানের ভাষা রূপহীন, অলঙ্কারহীন। পক্ষান্তরে সাহিত্যের ভাষা রূপবান, সালঙ্কার। ভাষা যে ক্ষেত্রে রূপহীন ভাবও সে ক্ষেত্রে রূপহীন, কারণ ভাব ও ভাষা অভিন্ন। দর্শন আমাদের আলোর দর্শন দেয়, বিজ্ঞান দেয় আলোর স্পর্শন। কিন্তু কোথাও তাকে ধরে রাখতে বেঁধে রাখতে গেলে দেখি সে ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাকে একটা চিহ্ন দিয়ে প্রতীক দিয়ে সাঙ্কেতিক ভাষায় বোঝাতে হয়। সে ক্ষেত্রে রূপসৃষ্টির চেষ্টা করা বৃথা। করলে সেটা সায়েন্স না হয়ে পপুলার সায়েন্স হবে। সূর্যের আলো নয়, চাঁদের আলো।

আলোর ধর্ম এই, সে বাক্যে ধরা দেয় না। বাক্য তাকে প্রকাশ করতে পারে না। যদি বা কোনো মতে প্রকাশ করে তো আভাসে ইঙ্গিতে সঙ্কেতে। সেইজন্যে আলো নিয়ে আর্ট হয় না। যদি হয় তবে তা সূর্যের আলো নয়, চাঁদের আলো। ইনটেলেকচুয়াল উপন্যাস লিখতে গিয়ে দেখেছি সূর্যের আলোকে আকার দেওয়া যায় না। বড়ো জোর মেঘের আড়াল দেওয়া যায়, আড়াল থেকে তাকে বিচিত্র দেখায়, আড়ালটাও বিচিত্র রূপ নেয়। তাতে মনের ক্ষুধা মেটে না। মন চায় মুক্ত আকাশ যার কোথাও কোনো ঝাপসা বা মেঘলা নেই, গোধূলি বা রাত্রি নেই। যার সবটাই আলো। নগ্ন আলো। আর্ট কি কখনো মেটাতে পারে এ ক্ষুধা ? আর্ট বড়ো জোর মানুষের আড়াল দিয়ে মানুষের উপর আলোর ক্রিয়া কেমনতর তারই একটা বিবরণ বা বর্ণনা দিতে পারে। সেটার বিচিত্রতাই আর্টের আলোকসাধনার সীমা। তবুর আলোক-

সাধনা যেমন পত্রের শ্যামলতায় পর্যবসিত।

তা বলে তরু তার আলোকসাধনায় নিবৃত্ত হতে পারে না। আর্টকেও করতে হয় আলোর সাধনা আপন শক্তির সীমা কতটুকু তা জেনে ও মেনে। এমন কোনো মহাকাব্য নেই যাতে কেবল রসই আছে, আলো নেই। হৃদয়ের ভোজ্যই আছে, মনের ভোজ্য নেই। কাব্য প্রধানত রসাত্মক বটে, কিন্তু উপরন্তু জ্যোতির্ময় না হলে মহাকাব্য হতে পারে না। তমসো মা জ্যোতির্গময় মানব-মনের এ আকিঞ্চন কি কেবল দার্শনিকের, বৈজ্ঞানিকের? এ কি শিল্পীরও নয়? রসিকেরও নয়? আর্টের যমুনার সঙ্গে বিজ্ঞানদর্শনের জাহ্নবী যদি যুক্ত হয় তো সেই যুক্তবেণী আর্টের মহিমা ক্ষুণ্ণ করে না, বৃদ্ধি করে বরং। যদি না রূপ তার দ্বারা মগ্ন হয়, বাঁধ তার দ্বারা ভগ্ন হয়। আর্টের আত্মার সঙ্গে দর্শনবিজ্ঞানের আত্মা মিলিত হোক, ক্ষতি নেই। কিন্তু তনু যেন আর্টের থাকে। নইলে ক্ষতি। মহাকাব্য যদি অঙ্গহীন বা রূপহীন হয় তবে তা মহা অকাব্য। তখন তার কোনোখানে স্থান নেই। না দর্শন বিজ্ঞানের রাজ্যে। না আর্টের রাজ্যে। প্রথমে তাকে কাব্য হতে হবে, তার পরে সে মহান হতেও পারে, না হতেও পারে। কিন্তু মহান হতে গিয়ে কাব্য যদি না হয় তো মহত্ত্ব তাকে রক্ষা করবে না। কাব্যকে রক্ষা করে রস। মহান করে আলো। শিকড় আর পাতা এ দুয়ের মধ্যে শিকড়টাই আসল। কিন্তু পাতাটাও দামী। এ ভিন্ন আরো একটা জিনিস আছে, সেটা আকৃতি। তাইতেই চিনিয়ে দেয় যে এটা গাছ না আগাছা না পরগাছা না পানা। সেটা আগাগোড়া দরকারী।

রস যাকে বলা হচ্ছে সেও সত্য। আলো যাকে বলা হচ্ছে সেও। এক সত্য মনের গোচর। আরেক সত্য হৃদয়ের। উভয়ের মধ্যে বিরোধ বা বিচ্ছেদ নেই, কারণ হৃদয় যার আছে মনও আছে তার। একসঙ্গেই আছে। সত্য কথা বলতে কি, সত্য এক ও অবিভাজ্য. কিন্তু পূর্ণ সত্য কেবলমাত্র মনের বা কেবলমাত্র হৃদয়ের ধারণাতীত। কিছু আমরা হৃদয় দিয়ে পাই, কিছু পাই মন দিয়ে। কিছু ইন্দ্রিয় দিয়ে, কিছু আত্মা দিয়ে · সমগ্রকে পাই সমগ্র সত্তা দিয়ে। আর্ট কিংবা বিজ্ঞান সমগ্রের বার্তা বহন করে না, করতে পারে না। তাদের কারো কাছে সমগ্র সত্য প্রত্যাশা করা যায় না। যার যত দূর দৌড় সে তত দূরের বার্তা বয়ে আনে, সেই পর্যন্ত তার স্বরাজ্য বা স্বধর্ম। তার ও-পারে পররাজ্য বা পরধর্ম। হৃদয়গ্রাহ্য সত্য নিয়েই আর্টের দৌড়ঝাঁপ। মানসগ্রাহ্য সত্য নিয়ে দর্শনবিজ্ঞানের বিরোধের অবসর নেই। বিচ্ছেদেরও না। রস আর আলো পরস্পরবিরোধী বা পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের হৃদয় ও মন তাদের একাধারে বিধৃত করতে যত্নবান। সেইজন্যে আর্টের রাজ্যে রস যদিও রাজা আলো তার মন্ত্রী। দর্শনবিজ্ঞানের রাজ্যে আলো যদিও রাজা রস একেবারে অজানা নয়। দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদেরও হৃদয় আছে, অনুভূতি আছে। তাঁদের সত্যান্বেষণ যদি আনন্দরঞ্জিত বা বেদনালাঞ্ছিত হয় তাঁদের সিদ্ধান্ত বা আবিষ্কার কি তার প্রভাব এড়াতে পারে?

তা ছাড়া কল্পনা যাকে বলি সে রস ও আলো উভয়ের রাজ্যে আনাগোনা

করে। কবিদের মতো বিজ্ঞানীরাও কল্পনাপ্রবণ। কল্পনার সাহায্য না নিলে বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক বেশী দূর অগ্রসর হতে পারতেন কিনা সন্দেহ। বড়ো বড়ো কবিদের আকাশচারী কল্পনা তাঁদের অনেক দূর অগ্রসর করে দেয়। এমনি করে আর্ট আর জ্ঞান-বিজ্ঞান উভয়েরই অগ্রগতি ঘটে। তার পর কল্পনার দ্বারা আর একটি কাজ হয়। আলো পরিণত হয় রসে। মানসগ্রাহ্য সত্য হৃদয়গ্রাহ্য সত্যে রূপান্তরিত হয়। আমি বিজ্ঞানী নই, তাই জোর করে বলতে পারছিনে, হয়তো রস পরিণত হয় আলোয়। হয়তো হৃদয়গ্রাহ্য সত্য মানসগ্রাহ্য সত্যে রূপান্তরিত হয়।

এটা সত্য, ওটা কল্পনা, প্রায়ই আমরা বলে থাকি। যেন সত্যের অভাবটাই কল্পনা। কিংবা কল্পনার অভাবটাই সত্য। কিন্তু কল্পনার পক্ষিরাজ না হলে সত্যের অন্বেষণ সুদূরপরাহত। তা সে হৃদয়ের সত্যই হোক আর মনের সত্যই হোক। রস আর আলো উভয়ের মাঝখানে যোজকের কাজ করে কল্পনা। শুধু যোজক নয়, যাদুকরও বটে। রূপান্তর ঘটায়। যেসব ব্যাপার নিতান্তই মানসিক বা মনস্তত্ত্বের এলাকাভুক্ত, নিপুণ সাহিত্যিকের হাতে কল্পনার ভোজবাজিতে সেসব ব্যাপার হৃদয়ের ভোজ্যরূপে পরিবেশিত হয়, অনুভূতির অধিকারে আসে। রসের প্রজা হয় আলো। তখন তাকে আলো বলে চেনা যায় না। সেও রস। সত্যকে আমরা অবিভাজ্য রূপে পাই, যদি কল্পনার আশ্রয় নিই। কল্পনা সত্যের অভাব নয়। সত্যের একত্ববিধায়ক।

তারপরে শিল্পী যখন রসকে রূপদান করে তখনো কল্পনার সহায়তা নিতে হয়। রস থেকে রূপে পৌঁছতে হলে কল্পনাকে করতে হয় পথপ্রদর্শিকা তারা।

(১৯৪৭)

রস আর রূপ

প্রথমে আসে রসের উপলব্ধি, তারপরে রূপের উপলব্ধি। আমি যখন একটি কবিতা বা গল্প লিখে শেষ করি তখন কবিতাটির বা গল্পটির রূপদর্শন করি। তার আগে ঘটে গেছে রসোপলব্ধি। রসোপলব্ধি যদি আপনাতে আপনি পরিসমাপ্ত হতো তা হলে কবিতা বা গল্প লেখা হতো না, রূপোপলব্ধি হতো না। রূপোপলব্ধি না হলে আমি রসিক হতুম, কিন্তু রূপকার হতুম না। আমি যে রসিক তার প্রমাণ আমার রসোপলব্ধি। আমি যে রূপকার তার প্রমাণ আমার রূপোপলব্ধি। শিল্পীমাত্রেই একাধারে রসিক ও রূপকার।

বললুম বটে কবিতাটির রূপ, গল্পটির রূপ। বলতে পারতুম রসের রূপ। রস যখন একের অন্তর থেকে অপরের অন্তরে যায় তখন রূপ ধরে যায়। কবিতারূপ, কাহিনীরূপ, চিত্ররূপ, নৃত্যরূপ, এমনি কত রকম রূপ। আমি যখন রসদান করি তখন রূপদান করি। নইলে দান করা অসম্ভব হতো। রস দিতে হলে রূপ দিতে হয়। রূপ না দিলে রস দেওয়া হয় না। অন্তরের রস অন্তরেই আবদ্ধ থাকে। মুক্তি পায় না। শিল্পীর মুক্তি নির্ভর করে রসের

মুক্তির উপর। আর রসের মুক্তি নির্ভর করে রূপের সৃষ্টির উপর। সৃষ্টি মানেই রূপসৃষ্টি।

রূপসৃষ্টি থেকে মনে হতে পারে রূপ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। কিন্তু তা নয়। রূপ হচ্ছে রসের পরিসমাপ্তি। যেখানে রস নেই সেখানে রূপ নেই, যদি থাকে তবে তা প্রাণহীন রূপ। যেমন মূলহীন ফুল। যারা বিশুদ্ধ রূপের পূজারী তারা স্রষ্টা নয়, কারণ সৃষ্টির শেষ কথা যদিও রূপ, সার কথা হচ্ছে রস। পক্ষান্তরে যারা বিশুদ্ধ রসের উপাসক তারাও স্রষ্টা নয়, কারণ সৃষ্টি যেমন মূলহীন ফুল নয় তেমনি ফুলহীন মূল নয়। সাকার ও নিরাকার, রূপ ও রস উভয়বিধ সাধনাই শিল্পীর সাধনা। শিল্পীর অন্য নাম স্রষ্টা।

রস জিনিসটার সংজ্ঞা দেওয়া শক্ত। কেননা রস একটা জিনিসই নয়। যারা বস্তুবাদী রস তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সুতরাং রসের সাধনা যে তারা স্বীকার করবে এ কখনো আশা করা যায় না। যারা বস্তুবাদী নয় অথচ পদে পদে ইনটেলেকটের হাত ধরে চলে তারা বিশ্লেষণধর্মী। বিশ্লেষণ করে কেউ কোনো দিন রসের আস্বাদন পায়নি। একটা অখণ্ড অনুভূতিকে খণ্ড খণ্ড করলে তার অখণ্ডত্ব হারিয়ে যায়। প্রাণ যদি চলে যায় তো দেহ ভাগ করে কী হবে! ওটা ভোগের উপায় নয়।

রসের সংজ্ঞা জানিনে। শুধু এই জানি যে রস একটা অখণ্ড উপভোগ, একটা পরম উপভোগ, অনেকের জীবনে একটা দুর্লভ উপভোগ। সেইজন্যে রসের এত মূল্য। যার মূল্য যত বেশী তার নকল তত বেশী, বিকার তত বেশী। রসাভাব ও রসবিকার দিয়ে কত লোক তাদের রসপিপাসা মেটায়। যেমন ঘোল দিয়ে মেটায় দুধের সাধ। রস এত দুর্লভ বলে রসের সাধকও দুর্লভ। রসের সাধনা হচ্ছে দুর্লভের সাধনা। রসের উপভোগ যাদের জীবনে ঘটেছে তারা অপরকে চায় সেই উপভোগের ভাগ দিতে। ভাগ দিতে গিয়ে দেখে নিজেদের ভাগ তাতে কমে না, বরং বাড়ে। কারণ রস দিতে গেলেই রূপ দিতে হয়। আর রূপদান হচ্ছে রূপভোগ। এটাও একটা উপভোগ। রসের উপভোগ বহুধা বিভক্ত হলে তার সঙ্গে যুক্ত হয় রূপের উপভোগ। কিন্তু এর জন্যেও সাধনা করতে হয়। রসের সাধনার উপর রূপের সাধনা।

রূপের সাধনাও দুর্লভের সাধনা। সকলে তার মূল্য দিতে পারে না বলে তার বিকৃতি অথবা অনুকৃতি এত বেশী। একটি রূপবান কবিতা বা গল্প লিখতে পারা বহু ভাগ্যে ঘটে। কবি কীট্‌স্ ছিলেন ভাগ্যবান পুরুষ। অকালমরণে তাঁর তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। হতো না রবীন্দ্রনাথেরও। রসভোগ ও রূপভোগ দ্বিবিধ উপভোগ এঁদের জীবনে ঘটেছিল অদীর্ঘ সাধনায়। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য তাঁকে শেষ বয়সেও পরিত্যাগ করেনি, কারণ দ্বিবিধ সাধনাকে তিনি শেষ বয়সেও পরিত্যাগ করেননি। এ সাধনা কাল-সাপেক্ষ নয়, কিন্তু নিষ্ঠা-সাপেক্ষ। নিষ্ঠা যেখানে দুর্বল সিদ্ধি সেখানে সুদূর। সেইজন্যে সারা জীবনেও কেউ কেউ রস থেকে রূপে, রসলোক থেকে

রূপলোকে উপনীত হয় না।

আগে রসলোক, তার পরে রূপলোক। এই অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞানটাও কারো কারো থাকে না। তারা চায় রসলোকের পাশ কাটিয়ে রূপলোকে পৌঁছতে। আকাশে উড়ে নদী পার হতে। কিন্তু জলে না নেমে হাবুডুবু না খেয়ে পারে যারা যায় তারা একটা পরম উপভোগ হারায়। রসের উপভোগ যাদের হয়নি তারা কিসের ভাগ দিতে যাবে, কেনই বা যাবে! কে তাদের ডাকছে! দান করবার মতো রস যার হাতে নেই দান করবার মতো রূপও কি তার হাতে আছে। নিষ্ফল রূপচর্চার নাম রূপভোগ নয়। রসহীন কবিতা বা গল্প রূপবান হতে পারে না। হয়তো তাকে রূপবানের মতো দেখায়। সেটা দৃষ্টি-বিভ্রম।

রসের জন্যে সাধারণ মানুষের চিত্তে শাশ্বত পিপাসা। তাই এত নৃত্য গীত অভিনয় চিত্র ভাস্কর্য গাথা গল্প। এ পিপাসা কি নিছক রূপ দিয়ে মিটতে পারে! যে রূপ রসের রূপ তার জন্যেও পিপাসা জাগে। সে পিপাসাও শাশ্বত। কিন্তু রসবিরহিত রূপের জন্যে তো পিপাসা নেই। যে রূপ আত্মসর্বস্ব তার যদি কোনো আদর থাকে তো সেটা পিপাসাতৃপ্তির পরে। সেটা হলো সাজসজ্জার সামগ্রী। প্রসাধনের অঙ্গ। অলঙ্কার। নিশ্চয় তার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। কিন্তু পিপাসুর কাছে নয়, পিপাসামুক্তের কাছে। যে দেশে রসসমন্বিত রূপের অভাব নেই সে দেশে রসবিরহিত রূপের আদর স্বাভাবিক। কিন্তু যে দেশে রসবিরহিত রূপ ভিন্ন আর রূপ নেই সে দেশে তার আদর যেন অনাবৃষ্টির দেশে গোলাপজলের আদর।

অন্ন মানুষের চাইই চাই, অন্নের দুর্ভিক্ষ যে কেমন তা আমরা পঞ্চাশের মন্বন্তরে প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু মানুষের তো কেবল অন্নের ক্ষুধা নয়, অমৃতের তৃষ্ণাও আছে। অমৃতের তৃষ্ণা আছে বলেই কোরাণ বাইবেল উপনিষদ আছে ও থাকবে। এসব যদি যায় তো এসবের স্থান নেবে এই জাতীয় আর কোনো উৎস, জল যার অফুরন্ত। অমৃতের তৃষ্ণা অমৃতেই মিটবে, অন্নে মিটবে না। ভোগোপকরণ হয়তো একদিন সব মানুষের সমান প্রচুর হবে, এবং সেদিন হয়তো অদূরে। কিন্তু অমৃতের পিয়াস তো অমৃত বিনা তৃপ্ত হবে না। ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।

অমৃতের পিয়াস যাকে বললুম রসের পিপাসা ঠিক সেই জাতীয় না হলেও তারই সঙ্গে তুলনীয়। মেঘদূত ঠিক উপনিষদ্ বর্গীয় নয়, হ্যামলেট বা টেম্পেস্ট নয় বাইবেল বর্গীয়। কিন্তু তার সঙ্গে তুলনার যোগ্য এই জন্যে যে মেঘদূত বা হ্যামলেটের রস বহুকাল ধরে বহু মানবের চিত্ত সরস করেছে ও করবে। সাহিত্য বা সঙ্গীত একটা বিলাস বা মণ্ডন নয়। ত কে বাদ দিলে মানুষের একটা পরম উপভোগ বাদ পড়ে। তার থেকে বঞ্চিত হলে মানুষ কী নিয়ে তৃপ্ত হবে! তার স্থান পূরণ করতে পারে কী এমন আছে! ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।

রস আমাদের চাইই চাই এবং অন্য কিছুতেই রসের তৃষ্ণা মিটবে না,

সুতরাং রসই দিতে হবে মানুষকে, যদি অন্তরে রসের উপলব্ধি ঘটে থাকে। এটা একটা কর্তব্য। ধর্মও বটে। রসের উপলব্ধি যাতে অবারিত হয় তার জন্যে রসের সাধনা আমাদের নিত্য, কৃত্য। কেবল রসের সাধনাই যথেষ্ট নয়। রূপের সাধনাও আবশ্যিক। কিন্তু রসবিরহিত রূপের সাধনা নয়। তাতে হৃদয়ের বিকাশ বা বিস্তার নেই। সেটা একটা পরম উপভোগ নয়। রসের উপলব্ধি দূরে থাক, রূপের উপলব্ধিও নেই তাতে। কারণ রূপ তো রস থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। যাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব তার নাম রূপ নয়, আবরণ না আভরণ। তারও প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে প্রয়োজন প্রাথমিক নয়, সে প্রয়োজন প্রাথমিকের পরিপূরক বা পরিসমাপক নয়। সেটা অতিরিক্ত বা উদ্‌বৃত্ত। সেও এক প্রকার উপভোগ, কিন্তু পরম বা চরম উপভোগ নয়। সেইজন্যে তাকে আমি উপলব্ধির কোঠায় ফেলিনে। তবে আমি এ কথাও মানি যে মানুষের যেমন দেহ আছে তার জন্যে চাই অন্ন, মানুষের যেমন মন আছে তার জন্যে চাই আলো, মানুষের যেমন আত্মা আছে তার জন্যে চাই অমৃত, মানুষের যেমন হৃদয় আছে তার জন্যে চাই রস, মানুষের যেমন ইন্দ্রিয় আছে তার জন্যে চাই রূপ--মানুষের তেমনি রুচি আছে তার জন্যে চাই আবরণ বা আভরণ। কারুশিল্পের উদ্‌ভব হয়েছে মানুষের রুচির দাবি মেটাতে।

কারুশিল্পকে কেন আর্ট বলা হয় না তার কারণ তার সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক গৌণ। রুচির সম্পর্কই মুখ্য। সোনার হার বা চুড়ি কার না ভালো লাগে! কিন্তু সেই ভালো লাগাটা রসোপলব্ধি নয়, সেইজন্যে কারুশিল্পকে চারু-শিল্পের আসন দেওয়া হয় না। তা হলেও কারুশিল্পও তো শিল্প। বৃহত্তর অর্থে আর্ট বলতে দোষ কী? স্বর্ণকারের অন্তরে যে রস আছে সে রস তো রূপায়নের আর কোনো উপায় পাচ্ছে না। স্বর্ণকার যদি ঐ সোনার অলঙ্কারের সঙ্গে তার হৃদয়রস সংমিশ্রণ করে তো সেরূপ স্থলে তাকে স্রষ্টা বলতে ও তার নির্মিতিকে সৃষ্টি বলতে আপত্তি কী? ক্রাফট সেরূপ ক্ষেত্রে আর্ট নয় কেন? গ্রীসদেশীয় পাত্র দেখে কীটসের মনে যে আনন্দ তা কি কেবল ক্রাফট দেখে, না ক্রাফটের মধ্যে আর্ট দেখে? কারুশিল্প ও চারুশিল্প বিভিন্নও বটে। ওটা নির্ভর করে হৃদয়রসের যোগবিয়োগের উপরে। সেই অনুসারে ওদের রূপও বিভিন্ন বা অভিন্ন। একটা হলো রসের রূপ, অপরটি রুচির রূপ। রসরূপ ও রুচিরূপ একাধারে বিধৃত হলে আমরা খুশি হয়ে বলি, এই আর্টিস্ট একজন ক্রাফটস্‌ম্যান, এই ক্রাফটস্‌ম্যান একজন আর্টিস্ট।

(১৯৪৭)

অন্তঃসার

জীবন যেন একটা বহতা নদী আর আমরা শিল্পীরা যেন তাতে ডুব দিয়ে যে যার গাগরী ভরিয়ে ঘরে ফিরি। যে যার গাগরী উপুড় করে বলি, আমার

কিছু দেবার ছিল, যা একান্ত আমারই। কথাটা মিথ্যা নয়, কেননা ডুব তো আমি সত্যই দিয়েছি, গাগরী আমি সত্যই ভরিয়েছি। অথচ যাতে ডুব দিয়েছি, যার জল দিয়ে গাগরী ভরিয়েছি তা আমার নয়, তা নিখিল বিশ্বের নিত্য প্রবাহিত জীবনযমুনা। যে রস আমি দিয়ে যাচ্ছি সেও কি আমার! হায়! আমার বলতে ঐ গাগরীটি। ঐ মানবহৃদয়টি।

শিল্পীর হৃদয় ভরে রয়েছে জীবনের কাছে পাওয়া কটুতিক্ত অম্লমধুর নানা অব্যক্ত অভিজ্ঞতায়। তার লেখনী বা তুলি বা সেতার দিয়ে সে ব্যক্ত করতে চাইছে সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ব্যক্ত করতে পারলেই হালকা হয় তার হৃদয়। তার পর তার হৃদয়ের রস হয় অপরের, হয় সকলের। ব্যক্ত করতে করতে ছড়িয়ে দিতে দিতে যা একের অন্তর হতে অন্যের অন্তরে উপনীত হয় আর্টের অন্তঃসার সেই জীবনযমুনার জল, সেই হৃদয়গাগরীর রস। যার নাম জীবনের সত্য সেই হয় হৃদয়ের সত্য। সেই সত্যই ব্যক্ত হতে হতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তখন তাকে বলি আর্টের সত্য। জীবন থেকে হৃদয়ে, হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তরে তার যাত্রা। এই যাত্রা যেখানে শেষ হয়েছে আর্ট সেখানে অস্তিত্ব পেয়েছে।

জীবনের সত্য কি আর্টের সত্য? হাঁ এবং না। 'হাঁ' এইজন্যে যে গোড়ায় ওটা একই বস্তু। 'না' এইজন্যে যে মাঝখানে আছে মানবহৃদয়। হৃদয়ের ভিতর দিয়ে না গেলে জীবনের সত্য আর্টের সত্য হয় না। হতে পারে বিজ্ঞানের সত্য, দর্শনের সত্য, কিন্তু আর্টের সত্য হৃদয়নিরপেক্ষ নয়। ঐ যে গাগরীটি ওটি না থাকলে নাগরী হয় না। জীবনযমুনার জল আনতে হয় নাগরীকে গাগরী ভরিয়ে। শিল্পীকে হৃদয় ভরিয়ে। হৃদয় না থাকলে শিল্পী হয় না।

হৃদয় যেন মধুচক্র। সেখানে সঞ্চিত হয় নানা ফুলের মধু। কিন্তু তোমার সঞ্চিত মধুর আস্বাদ যদি আর কেউ না পায় তা হলে তোমার মধুসঞ্চয় কোনো দিন আর্টের পর্যায়ে উঠবে না। হৃদয় না থাকলে শিল্পী হয় না। কিন্তু হৃদয় থাকলেও শিল্পী হয় না, যদি না তার সঙ্গে থাকে উজাড় করে বিলিয়ে দেবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা ও কৌশল। যাতে শিল্পীর সঞ্চয় রসিকের উপভোগ্য হয়। রসের সঙ্গে রূপ যোগ করতে পারলে তবেই রসিকজন উপভোগ করেন, রূপভোগ করেন।

রস যখন রূপান্বিত হয়, রূপান্তরিত হয় তখনি তা আস্বাদনযোগ্য হয়। তখনি তা হয় বাক্য বা সঙ্গীত, চিত্র বা অভিনয়। রস বলতে বুঝি হৃদয়রস, কিন্তু তার পূর্বে সেটা জীবনযমুনার জল। হৃদয়রস যদি হয় মানবহৃদয়ের অভিজ্ঞতা তবে জীবনযমুনার জল হবে রিয়ালিটি, মানবহৃদয়কে যে ভরে দিচ্ছে অভিজ্ঞতায়। অভিজ্ঞতার পূর্বে সেটা রিয়ালিটির খণ্ড। শিল্পের মূলে রিয়ালিটি, মাঝখানে রিয়ালিটির অভিজ্ঞতা, উপরের দিকে অভিজ্ঞতার রূপান্বয় বা রূপান্তর। ফুল সকলে দেখতে পায়, কিন্তু মূল দেখতে যায় ক'জন! আর কাণ্ড—তাই বা ক'জন দেখতে চায়! শিল্প শেখানোর জন্যে যে-সব স্কুল কলেজ হয়েছে সেখানে রিয়ালিটির খোঁজখবর কেউ রাখে না, মানব-

হৃদয়ের নাড়ীনক্ষত্র জানে না, কলাবিদ্যাই সেখানকার একমাত্র পাঠ। সেখান থেকে উত্তরে আসা রীতিনিপুণদের কাছে বিশ্বরহস্য বা হৃদয়রহস্য একটা কথার কথা। একমাত্র সত্য হচ্ছে রূপ।

কিন্তু কিসের রূপ? রূপের পশ্চাতে কী আছে? অভ্যন্তরে কী আছে? এর উত্তরে কেউ বলবে, কিছুই নেই, না থাকলেও চলে। কেউ বলবে, আছে একটা বিষয়, কিন্তু সেটা ইন্দ্রিয়ের গোচর, তার সঙ্গে হৃদয়ের কী সম্পর্ক তা জানিনে। চোখ দিয়ে দেখেছি, হৃদয় দিয়ে দেখিনি, কান দিয়ে শুনেছি, প্রাণ দিয়ে শুনিনি, হাত দিয়ে ছুঁয়েছি, চেতনা দিয়ে ছুঁইনি। দরকার আছে বলে মনে হয়নি।

রূপভোগ যে কেন রসভোগ নয় তার কারণ নিহিত রয়েছে এই উত্তরে। আর্ট বলে সাধারণত যার পরিচয় তার রূপ আছে, কিন্তু সৌন্দর্য নেই। সৌন্দর্য অনেক গভীর স্তরের ব্যাপার। মানবহৃদয়ের গাগরী কাঁখে নিয়ে জীবনযমুনার সলিলে অবতরণ করলে, অবগাহন করলে, নিমগ্ন হলে তবেই তুমি তার সন্ধান পাবে। আগে সন্ধান পেলে পরে সন্ধান দেবে। তখন তোমার রূপসৃষ্টি হবে সৌন্দর্যসৃষ্টি। সত্যই সৌন্দর্য, সৌন্দর্যই সত্য, কবি কীটসের এই আপ্তবাক্য তখন অর্থবান হবে।

আর্টের অন্তঃসার তা হলে জীবনের সত্য, জীবনের সৌন্দর্য। তোমার অন্তরের অন্তঃসার হয়েই তা আর্টের অন্তঃসার। আর্টের প্রতিষ্ঠা সত্যের শৈলের উপরে। অতি কঠোর ভিত্তি। অতি সুদৃঢ় ভিত্তি। তবে মানবহৃদয়ের নরম মাটি ও কচি ঘাসপাতা দিয়ে ঢাকা। সত্যিকারের আর্ট কখনো অসত্য হতে পারে না। তবে মানুষের সুখ দুঃখ তাকে রসাল করে। তার পর সেই রসাল সত্যকে রূপান্তরিত করে কলাবিদের কলাবিদ্যা, মায়াবীর মায়াদণ্ড। সত্যের অঙ্গে মায়া মাখানো হয়। তখন তাকে মায়া বলে ভ্রম জন্মায়। তবু আসলে সে সত্যই। সত্যই আর্টের অন্তঃসার। আর্ট দাঁড়িয়ে থাকে সত্যের জোরে। এবং সত্যের জোর হচ্ছে সৌন্দর্যের শক্তি। সত্যই সৌন্দর্য, সৌন্দর্যই সত্য। এখানে যে সৌন্দর্যের কথা হচ্ছে তা শিল্পীর সৃষ্ট নয়, তা শিল্পীর দৃষ্ট।

কিন্তু এ কথাও ঠিক যে সত্যকে বা সৌন্দর্যকে আমরা শিল্পীরা যেমনটি দেখি তেমনিটি দেখাইনে। কারণ আমরা তো কেবল দ্রষ্টা নই, আমরা স্রষ্টা। স্রষ্টামাত্রেরই অধিকার আছে সৃষ্টিকে তার মনোমতো করবার। মনোমতো না হলে ভেঙে চুরমার করবার। বিশ্বস্রষ্টা প্রতিনিয়ত এই কর্ম করছেন। আমরাও করে থাকি। একটি গল্প বা একখানি উপন্যাস শেষ পর্যন্ত যে আকার নেয় তা আমাদের নিজেদেরই স্বপ্নাতীত। জানার সঙ্গে অজানাকে মিলিয়ে ঘটনার সঙ্গে কল্পনাকে জুড়ে, কত বাদসাদ দিয়ে, কত অদল-বদল করে অবশেষে যা গড়ে তুলি তা জীবনের মতো নয়, তা মনের মতো। হয়তো মনের মতোও নয়, নিজের মতো। গল্প তার নিজের নিয়মে চলে, লেখকের শাসন মানে না, এমনও তো দেখেছি। সেই অবাধ্য ঘোড়ার পিঠে চড়লে সে যে কোন তেপান্তরের মাঠে

নিয়ে যায়, কোন খালে বিলে কন্দরে, তা সে-ই জানে। স্রষ্টার অধিকার খাটাতে গিয়ে দেখি সৃষ্টির স্বকীয় একটা অধিকার আছে, বেশী রাশ টানতে পারিনে। বিশ্বস্রষ্টার দশাটাও বোধ করি আমাদেরই মতো।

মোটের উপর যা হয়ে ওঠে তার সমস্ত স্খলন পতন সত্ত্বেও স্থিতি সত্যের উপর। সত্যের অভিজ্ঞতার উপর। সেইজন্যে সে বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয়। শুধু তাই নয়, সে বিশ্বসৃষ্টির অঙ্গ। তাকে ছেড়ে বিশ্বসৃষ্টি নয়। আমরা যখন সত্যিকারের শিল্প সৃষ্টি করি তখন বিধাতার সঙ্গে যোগ দিয়ে বিশ্ব-সৃষ্টি করি। বিধাতার সৃষ্টি যদি নিরর্থক না হয় আমাদের সৃষ্টিও নিরর্থক নয়। এর সার্থকতা এর অন্তর্গূঢ় সত্যে। সত্যের সাক্ষাৎকার যদি না পেয়ে থাকি তবে অবশ্য অন্য কথা। তা হলে ব্যর্থতা ঢাকবার উপায় নেই। কানা চোখ চশমায় ঢাকলে কী হবে! হলেই বা সোনার চশমা! সৃষ্টি সেখানে অনাসৃষ্টি। কারণ অন্তঃসারশূন্য। আর্টের চরম বিচার তার অন্তঃসার দিয়ে। রূপ বা রীতি দিয়ে নয়। আর্ট যেন এক প্রকার সাক্ষ্য। যদি সত্য না হয় তবে বিচারক তাকে নাকচ করেন।

কিন্তু আমাদের সত্য আদালতের সত্য নয়। জীবনের তথা হৃদয়ের সত্য। এর বয়ানের ধারাও একরকম নয়। এর প্রতি অঙ্গে মায়া মাখানো। সেইজন্যে একে মিথ্যা বলে মনে হতে পারে। শিল্পীকে সামাজিক কাঠগড়ায় দাঁড় করালে তার মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে আসে তা নিরেট বাস্তব সত্য নয়, মায়াময় রসাল সত্য। সংসারী লোকের শুনে ধাঁধা লাগে। তারা বুঝতে না পেরে মাথা নাড়ে আর বলে, রবি ঠাকুর হেঁয়ালি লিখেছেন।

সত্যের বিচার ওভাবে হয় না। হয় সহজ বোধ দিয়ে। ঘণ্টা যেমন বাজে সত্যও তেমনি। কথাটা কি সত্যের মতো বাজছে? যদি সত্যের মতো বাজে তা হলে ওটা সত্যই। গল্পটা কি সত্যের মতো বাজছে? না, বাজছে না। তা হলে ওটা সত্য নয়। অনেক জাগতিক ঘটনা সত্যের মতো বাজে না, যদিও লোকের চোখে দেখা। আবার কাল্পনিক ঘটনাও সত্যের মতো বাজে। যদিও কেউ চোখে দেখেনি। মানুষের চোখের আড়ালেও কত কী ঘটছে, ভিতরে ভিতরে মন দেওয়া-নেওয়া হয়ে যাচ্ছে, একজন আরেকজনকে টানছে, কিংবা ঠেলছে, দূরে সরে যাচ্ছে বা সরিয়ে দিচ্ছে, এসবের সত্যতা কি চোখে দেখা ঘটনার চেয়ে কম? লোকে হয়তো বোঝে না, সরল করে বোঝানোও যায় না, পাঠকের ও লেখকের উভয়ের অক্ষমতার দরুন সত্যের প্রতি সংশয় জাগে।

সত্যকে উপলব্ধি করতে হয়। যে লিখবে সেও উপলব্ধি করবে। যে পড়বে সেও। উপলব্ধির অভাব আর কিছু দিয়ে ভরে না। এর জন্যে ডুব দিতে হয় জীবনযমুনায়। সেটা একটা কাটা খাল নয় যে তোমার ইচ্ছা খাটবে তার উপর। কোথায় যে তার আদি তা কেউ বলতে পারে না, কোথায় যে তার অন্ত তাও কেউ জানে না। কবিত্ব করে যমুনা বলেছি বটে, কিন্তু জীবনের দিকে তাকাতে ভয় করে। ডুব দিতে গিয়ে কত লোক তলিয়ে গেছে অতলে। জীবন একেবারেই সহজ ব্যাপার নয়, তার পদে পদে দুঃখ দৈন্য দ্বন্দ্ব। পদে পদে স্নেহ প্রীতি

করুণাও আছে। নইলে চলা কবে থেমে যেত। মানুষের চলার কথা বলছি। জীবনের চলা কি থামতে পারে! জীবন নিত্য চলমান। মানুষ না থাকলেও সে চলত, না থাকলেও চলবে। মানুষকে বাদ দিয়ে ভাবলে দুঃখ দৈন্য স্নেহ প্রীতি ইত্যাদির অর্থ হয় না। মানুষিক ভাবনার ঊর্ধ্বে উঠলে এ সকলের প্রকৃত অর্থ জানা যায়। কিন্তু এ কাজ শিল্পীর নয়, দার্শনিকের। তবে যিনি শিল্পী তিনি দার্শনিকও হতে পারেন, তাঁর শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে তাঁর বিশ্বসৃষ্টি একাকার হতে পারে। বড় বড় কবির বেলা এরকম ঘটেছে। দান্তে, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথের বেলা।

(১৯৫৪ ?)

অন্তঃসৌন্দর্য

দার্শনিক বলো, বৈজ্ঞানিক বলো, ধার্মিক বলো, শিল্পী বলো, সকলের মনে এই একই ভাবনা যে সত্যকে দেখতে হবে, ছুঁতে হবে, ধরতে হবে, পেতে হবে, দিতে হবে। এ ভাবনা যার নেই সে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক নয়, ধার্মিক বা শিল্পী নয়। যাদৃশী ভাবনা তাদৃশী সিদ্ধি। সত্যকে যারা চায় সত্য তাদের নিরাশ করে না।

কিন্তু শিল্পীর ভাবনা কেবল সত্যের ভাবনা নয়। সৌন্দর্যের ভাবনাও বটে। এ ভাবনা দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ধার্মিককে কাঁদায় না, কাঁদালে কাঁদায় মরমীকে মিস্টিককে। অথচ শিল্পীমাত্রেরই এ কাঁদন কপালে লেখা। সৌন্দর্য বিশেষ করে শিল্পীরই দায়। শিল্পী, অথচ সৌন্দর্যের দায় নেই, এমনটি দেখা যায় না। সমাজের দায় নিয়ে যারা কাতর তাদেরও কি সৌন্দর্যের দায় নেই? হয়তো গৌণ, তবু আছে। না থাকলে তাদের শিল্পী না বলাই সঙ্গত। শিল্প তাদের কাছে সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তমাত্র।

সত্য আর সৌন্দর্য এ দুটির একটি বেছে নিতে বললে শিল্পী বেছে নেবে সৌন্দর্য। দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ধার্মিক বেছে নেবে সত্য। তবে ধার্মিকের পক্ষে বেছে নেওয়া শক্ত। সত্য আর সৌন্দর্য এ দুটির দ্বিতীয়টি না থাকলে দর্শনের চলে, বিজ্ঞানের চলে, ধর্মেরও হয়তো চলে, কিন্তু শিল্পের বেলা অচল। অবশ্য বেছে নিতে কেউ বলেও না, কেউ চায়ও না। শিল্পের রাজ্যে সত্য ও সৌন্দর্য উভয়ের সমান গুরুত্ব। অন্তত উনিশ বিশ।

সৃষ্টি যদি সত্যের শৈলের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত না হয় তা হলে তা অচিরস্থায়ী। নিছক সৌন্দর্যের সাহায্যে কালজয়ী হওয়া যায় না। সৌন্দর্যকে তার জন্যে সত্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে। কিংবা হতে হবে সত্যের সমার্থক। কীটসের ভাষায়। শিল্পীকে ভাবতে হবে সত্যের ভাবনা, তথা সৌন্দর্যের ভাবনা। একাধারে উভয়ের। সত্যকে গৌণ করা চলবে না। সৌন্দর্যকে মুখ্য না করাও চলবে না। চলতে পারে উভয়ের উনিশ বিশ।

শিল্পীরা মনে মনে এর একটা নিষ্পত্তি করে নেয়। সত্য বলে, সুন্দর করে

বলে। বলার ভঙ্গী বা পদ্ধতি বা ঢং বা ঠাট বা ধরণটা সুন্দর। শৈলী সুন্দর। আঙ্গিক সুন্দর। অলঙ্কার সুন্দর। রূপ সুন্দর। কিন্তু বলার কথাটা হয়তো অসুন্দর। অসুন্দর সত্য। বিষয়টা হয়তো সৌন্দর্যবিরহিত। অথচ সত্য-সমন্বিত। শিল্পীরা সত্যের সঙ্গে অসুন্দরকে জুড়ে তার উপর কারিগরি ফলিয়ে তাকে সুন্দর করে তোলে। মনে করে বহিঃসৌন্দর্যই যথেষ্ট।

কিন্তু বহিঃসৌন্দর্যই যথেষ্ট নয়। ভিতরে থাকবে সুন্দর মন সুন্দর আত্মা। অন্তঃসৌন্দর্য। অসংখ্য তথ্য পরিবৃত হয়ে আমাদের জীবনযাত্রা। কোথায় তার অন্তর্নিহিত সত্য তার উপর যদি হাতের মুঠো শক্ত হয় তবেই সার্থকতা। এক হাতের মুঠো। আরেক হাতের মুঠো শক্ত হবে যার উপর তার নাম অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য। সৃষ্টির বাইরেটা যদি সুন্দর নাও হয় তবু তার অন্তঃসৌন্দর্য তার ভিতর থেকে ফুটে বেরোবে।

জীবনকে কেউ কোনো দিন সরল করতে পারেনি। বড়ো জোর আপনার জীবনযাত্রাকে সরলতর করতে গিয়ে সাধুসন্ন্যাসীর মতো হয়েছে। জীবন চিরদিন জটিল ছিল, জটিলই থাকবে চিরদিন। সেই জটিলতার গ্লানি মোচন করে উদ্ধার করতে হবে প্রকৃত সত্য। তেমনি আবিলতার ভিতর থেকে অনাবিল সৌন্দর্য। যার দুই হাত এই নিয়ে ব্যাপৃত তার সাধনা সংসারী বা সন্ন্যাসী কারো সঙ্গে মিলবে না। শিল্পীকে তার আপনার মতো করে বাঁচতে দিতে হবে, নইলে মানুষটা হয়তো বাঁচবে, কিন্তু তার শিল্পীত্ব হয়তো বাঁচবে না। শিল্পকে মূল্য দিলে শিল্পীপ্রকৃতিকেও মূল্য দিতে হয়।

অপরে যা এড়াতে পারে শিল্পী তা এড়াতে পারে না। তাকে পাঁকে নামতে হয়, খাদে নামতে হয়। এমন সব লোকের সঙ্গে মিলতে ও মিশতে হয় যারা পাপী আর দাগী আর পতিত আর পীড়িত। লাইব্রেরী বা ল্যাবরেটারিতে বসে, মঠে বা মন্দিরে বসে শিল্পী তার সত্যের সাক্ষাৎ চায় না কিংবা পায় না। কখনো সে যুদ্ধবিগ্রহের রক্ততরল আবর্তে খড়কুটোর মতো অসহায়, কখনো হাসপাতালে যমে মানুষে টানাটানির নীরব সাক্ষী। কখনো ধূর্ত শৃগালদের বেচাকেনার বাজারে হাজির, কখনো ফন্দীবাজ পায়রাদের পলিটিকসের আসরে উপস্থিত। উৎসবে ব্যাসনে রাজদ্বারে শ্মশানে কোথাও সে অনধিকারী বা অশোভন নয়। যেখানেই মানুষ সেখানেই শিল্পী।

আবার যেখানে জনমানব নেই, আছে কেবল প্রকৃতি, সেখানেও শিল্পী আছে তার সত্যজিজ্ঞাসা নিয়ে, তার সৌন্দর্যতৃষ্ণা নিয়ে। সেখানেও সে একা নয়, প্রকৃতি তার সঙ্গিনী। সঙ্গিনী কখনো দক্ষিণা, কখনো করালী। কিন্তু প্রতিদিন বিচিত্ররূপিণী। শিল্পী যদি মানুষকে এড়ায়, প্রকৃতিকে না এড়ায়, তা হলেও তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ভরে ওঠে। আর যদি প্রকৃতিকেও এড়ায়, অন্তর্জীবনের রহস্য ভেদ করতে এক কোণে বসে যদি ধ্যান করে, তা হলেও তার উপলব্ধি সুপ্রচুর হতে পারে।

অজস্র অভিজ্ঞতা অসীম উপলব্ধি ক্রমে শিল্পে রূপান্তরিত হয়। যখন হয় তখন তার মূল্য নির্ধারণ করা হয় তার অন্তর্নিহিত সত্য দিয়ে, অন্তঃসৌন্দর্য

দিয়ে। কেবল একরাশ তথ্য থাকলেই চলবে না, কেবল মনোজ্ঞ ভঙ্গী বা মনোহর শব্দবিন্যাস থাকলেই চলবে না, আরো গভীরে যেতে হবে সত্যের উপলব্ধি করতে ও করাতে, আরো আড়ালে যেতে হবে সৌন্দর্যের অবগুণ্ঠন খুলে দেখতে ও দেখাতে। তথ্যের অরণ্যের ভিতরে সত্যের সাক্ষাৎ। এমন দৃষ্টি চাই যা সব ছদ্মবেশের অন্তরালে সত্যকে দেখতে পায়। চিনতে পারে। তেমনি সৌন্দর্যকেও।

অন্তর্নিহিত সত্য কেবল বস্তুগত নয়। মুখ দেখে মানুষ চেনা যায় না। তবে কি তা ব্যবহারগত ? না, কেবল তাও নয়। কাজ থেকেও চেনা যায় না মানুষকে। বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হতে হয়, আপনাকে মিলিয়ে দিতে হয়, বিলীন করে দিতে হয়। তবেই চেনা যায় তাকে, চেনা যায় মানুষকে। তেমনি অন্তঃসৌন্দর্য কেবল সুন্দর ভাষা বা ছন্দ নয়, আঙ্গিক বা অলঙ্কার নয়। তাদের যা সৌন্দর্য তা অন্তঃসৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ হতেও পারে, না হতেও পারে। যদি হয় তবেই তারা অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনাময়।

রূপমাত্রেরই বিকার ঘটে, তা বাসি হয়ে যায়, ম্লান হয়ে যায়, শুকিয়ে ঝরে পড়ে। কিন্তু যেখানে অন্তঃসৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে সেখানে রূপ আর শুধু রূপ নয়, তার চেয়ে বেশী। সে ফুল শুকিয়ে ঝরে পড়বার মতো নয়, সে চিরমন্দার। তেমন রূপের জন্যে প্রসাধনের দরকার হয় না। অবশ্য প্রসাধনেরও একটা মূল্য আছে। তাতে রূপ আরো খোলে। কিন্তু যেখানে অন্তঃসৌন্দর্যেরই অভাব সেখানে প্রসাধনের যাদুকরী সাধারণের মনোহরণ করতে পারলেও মহাকালের মনোহরণে অক্ষম।

সমস্ত প্রতিবাদসত্ত্বেও এই জগতের অন্তর সৌন্দর্য দিয়ে ভরা। সেই অব্যক্ত সৌন্দর্যই রূপে রূপে ব্যক্ত হচ্ছে। রূপ ফুরিয়ে গেলেও সৌন্দর্য ফুরিয়ে যাচ্ছে না। সে নিয়ত পূর্ণ। পূর্ণতা থেকে আসছে তার বিচিত্র প্রকাশ। যেন পূর্ণতার ফোয়ারা থেকে উপচে ওঠা রস। যা সুন্দর নয় তাকেও সে সৌন্দর্যের রসায়নে রূপান্তরিত করে। অসুন্দরের উপর সুন্দরের প্রভাব পড়ে। সুন্দরেরই ক্ষমতা বেশী।

এ জগতে অসুন্দর আগে। কোনো সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু আর্ট এই অবধি এসে থেমে যায় না। সে যখন এর থেকে কিছুদূর এগিয়ে যায় তখন তার সঙ্গে চলতে চলতে অসুন্দরও সুন্দর হয়ে যায়। বিজ্ঞানীর কাছে যেটা তথ্য শিল্পীর কাছে সেটা উপাদান। উপাদানকে সুন্দরের প্রভাবে সুন্দর করে তোলা যায়। তখন অসুন্দরের তুলনায় সুন্দরের সীমানা বেড়ে যায়। বলা বাহুল্য বস্তুগত কোনো পরিবর্তনের কথা হচ্ছে না। বস্তু যেখানকার সেখানে সে অসুন্দর হতে পারে, কিন্তু আর্টের উপাদান হয়ে চিত্রের বা ভাস্কর্যের বা কাব্যের বা নাট্যের সামিল হলে তার পর সে সুন্দর হয়ে ওঠে।

বাহির ও ভিতর

সদর মহলে সারাদিন কাটানোর পরে স্বভাবতই মন চায় অন্দর মহলে যেতে। বাইরের সঙ্গে তো পরিচয় ঘটল, এবার দেখতে হবে ভিতরে কী আছে।

রূপ রস গন্ধের জগৎ, ঘটনার পর ঘটনার জগৎ, তথ্যের ও যুক্তির জগৎ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ—এর কি কোথাও শেষ আছে না সীমা আছে? হয়তো আছে, কিন্তু সেই সব নয়। জানতে ইচ্ছা করে এর আড়ালে কী আছে, ভিতরে কী আছে? হয়তো কিছুই নেই, কিন্তু কোন্ অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে বলব যে নেই! সদর মহল থেকে অন্দর মহলের আন্দাজ করা যায় না। ভিতরে না ঢুকে ভিতরের সত্য উপলব্ধি করা যায় না।

বিজ্ঞান যেখানে গিয়ে আর এগোতে পারে না, ইনটেলেকট যেখানে গিয়ে আর কূল পায় না, শিল্পীর ইনটুইশন সেখানকার রহস্য ভেদ করতে পারে। শিল্পীর দৃষ্টি কেবল বহির্দৃষ্টি নয়, বহির্দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তার পরিপূরক অন্তর্দৃষ্টি।

শুধু অন্তর্দৃষ্টিও নয়। সেটা হয়তো যোগী ঋষির। তাঁদের চোখ মেলে তাকাতে হয় না। তাঁরা ধ্যানেই বহির্বিশ্ব দেখতে পান। কিন্তু শিল্পী সেকথা বলতে পারে না। তার চোখ কান সব সময় খোলা। বহির্বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে তার চোখ কান সৃষ্টি করা হয়েছে। তার বহির্দৃষ্টিতে সব কিছুই পড়ে। অধিকন্তু তার অন্তর্দৃষ্টিও আছে। তা দিয়ে সে বহির্জগতের সীমানা ছাড়িয়ে যায়।

সে-জগৎ থেকে ফিরে এসে যে ভাষায় সে কথা বলে সে ভাষা রূপকথার ভাষা, রূপকের ভাষা, সাঙ্কেতিক কাব্যের ভাষা, অ্যাবসার্ড নাটকের ভাষা। এমনও হতে পারে যে তার মুখে কথাটি নেই, সে শুধু আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করে সে কী দেখেছে, কী জেনেছে। কোনো মানবিক শব্দই তার বাহন হবার যোগ্য নয়।

যুগপৎ সদরে ও অন্দরে যার চলাফেরা সে মানবিক শব্দ পরিহার করতে পারে না। তাকে দুই ভাষায় কথা বলতে হয়। সেইজন্যে তার সৃষ্টি অমন দুর্বোধ্য মনে হয়। কতক বুঝি, কতক বুঝিনে। ভাবি অভিধানের সাহায্যে বুঝতে পারব। কিন্তু অভিধানের সহজতম শব্দও দুর্বোধ্য হতে পারে। অনুভূতিটাই দুরূহ।

ভাষা আসলে তৈরি হয়েছে বহির্জগতের প্রয়োজনে, তার ঘটনা ও তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে। একই ভাষায় অন্তর্জগতের প্রয়োজন মেটানো যায় না, অথচ সেই চেষ্টাই করতে হয়। আরেক সেট শব্দ খুশিমতো বানানো যদি বা সম্ভব হয় তবে সাধারণ সেটা নেয় না, তার পরমায়ু বেশীদিন নয়। শব্দের জন্যে যেতে হয় সাধারণের ভাণ্ডারে। নতুন অর্থ দিয়ে তাকে ভাণ্ডারে ফেরত পাঠাতে হয়।

যতক্ষণ বহির্জগতের কথা হচ্ছে ততক্ষণ শব্দের একপ্রকার অর্থ, চেনা অর্থ। বহুজনের ব্যবহৃত অর্থ। কিন্তু অন্দর মহলের কথা বলতে গেলে অর্থান্তর ঘটে, অচেনা অর্থ উড়ে আসে, বহুজনের ব্যবহারে দোলা লাগে। ক্রমে সেটাও গা-সওয়া হয়ে যায়।

বাইরের জগতে জরা আছে, ব্যাধি আছে, মরণ আছে। আছে অন্যায় ও অপরাধ ও পাপ। অসত্য ও হিংসা। কতরকম দুঃখ আর দুর্দৈব। প্রকৃতির কত না উৎপাত, মানুষের কত না স্খলন পতন। তেমনি এর প্রত্যেকটির বিপরীত বা সংশোধন বা ক্ষতিপূরণও আছে। যৌবন আর স্বাস্থ্য আর পরমায়ু। ন্যায় আর পুণ্য, সত্য আর প্রেম। প্রকৃতির রাজ্যে কিসের অভাব? মৃত্যুও প্রাণের অভাব নয়। প্রকৃতির রাজ্যে যদি কোনোকিছুর অভাব থাকেও বিধাতার রাজ্যে নেই। সেখানে চির পরিপূর্ণতা। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

শিল্পীরা সুন্দরের ঘরানা, তাদের কারবার সৌন্দর্য নিয়ে। কিন্তু অন্দর মহলের বাইরে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য কোথায়? বহিঃসৌন্দর্যের উপর দৃষ্টিপাত করলেই সেইসঙ্গে অসুন্দরের উপরেও দৃষ্টি পড়ে। সেই ভয়ে যদি দৃষ্টি রুদ্ধ করি তবে সুন্দরকেও দেখা হয় না। অসুন্দরকে এড়াতে গেলে সুন্দরকেও এড়াতে হয়। এমন কোনো কৌশল কি কেউ জানে যা দিয়ে পানী না ছুঁয়েও মাছ ধরা যায়, পাঁক না ছুঁয়েও পদ্ম তুলে আনতে পারা যায়?

অন্দর মহলে সুন্দর ছাড়া আর কেউ নেই। মাঝে মাঝে সেখানে যাওয়া যায়, কিন্তু দিনরাত সেখানে থাকতে পারা যায় না। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য যেন বিশুদ্ধ আত্মা। আমরা দেহও চাই। দেহসুখও চাই। সুখের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও আসে। জন্মালেই মরতে হয়। যৌবনের সূর্যাস্ত জরা। একটাকে চাইলে আরেকটাকেও চাওয়া হয়ে যায়। দেহ যার আছে তাকে দেহের সুন্দর অসুন্দর মেনে নিতে হয়। তেমনি বহির্জগতের সুন্দর অসুন্দর। সুন্দরের কারবারীকেও অসুন্দরের ব্যাপার করতে হয়, করতে না হোক বুঝতে হয়। শিল্পীর মার্গ ছুঁৎমার্গ নয়। যেটা তোমার ভালো লাগে না সেটার অস্তিত্ব তা বলে নাস্তিত্ব হয়ে যায় না। শাদা আছে, কালো আছে, তাতে আরো কতরকম রং। তোমার যেটা ভালো লাগে না অপরের হয়তো সেটা ভালো লাগে, অন্তত সত্যের খাতিরে ভালো লাগে। সমগ্রকে নিয়েই সত্য। সমগ্র নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ প্রীতিকর নয়। তা বলে নিছক প্রীতিকরকে নিয়ে সৃষ্টি চলে না। না বিধাতার সৃষ্টি, না প্রকৃতির সৃষ্টি, না মানুষের সৃষ্টি। তেমনি নিছক অপ্রীতিকরকে নিয়েও সৃষ্টি নয়। যদিও সেটাই হাল ফ্যাশান।

বৈজ্ঞানিক তাঁর ল্যাবরেটরিতে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। কবির তেমন কোনো গবেষণাগার নেই। কিন্তু কবির আছে অন্দর মহল। সেখানে গিয়ে তিনি চিরসুন্দরের সঙ্গে মিলিত হন, অন্তঃসৌন্দর্যের সঙ্গে বহিঃসৌন্দর্যকে মিলিয়ে নেন, যাচাই করেন। এই যে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর অন্তঃপুরে যাওয়া ও প্রবেশ পাওয়া এ এক দুর্লভ সৌভাগ্য। কারো কারো জীবনে এ

সৌভাগ্য আপনি আসে। অন্যদের এর জন্যে সাধনা করতে হয়। ইনটেলেকটের বিকাশ না হলে যেমন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হওয়া যায় না তেমনি কবি বা চিত্রকর হওয়া যায় না ইনটুইশনের বিকাশ না হলে।

সূর্যের আলোর মতো আরো একরকম আলো আছে যার উদয় পূব আকাশে নয়, চিদ্‌গগনে। কবিদের সে আলোর জন্যে প্রতীক্ষা করতে হয়, তার জন্যে প্রস্তুত হতে হয়। সূর্যের আলো যেমন পৃথিবীর বাইরে থেকে আসে তেমনি যে আলোর কথা বলছি সে আলো আসে সদর মহলের বাইরে থেকে। আমাদের সাধারণ জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার উপর সে আলো যখন পড়ে তখন সব পরিষ্কার হয়ে যায়। যা দেখেছি অথচ দেখিনি তা যেন নতুন চোখে দেখি, নতুন আলোয় দেখি। আর এই যে নতুন আলোয় দেখা একে দেখানোও হয় আমাদের কাজ, আমাদের সৃষ্টিকর্ম। একের সৃষ্টি অপরকে দৃষ্টিদান করে।

কবিদের যে দ্রষ্টা বলা হয় সেটা এই কারণেই। দ্রষ্টা, অপিচ দৃষ্টিদাতা। বলা বাহুল্য নিছক বহুদর্শিতার জন্যে কেউ দ্রষ্টা বা দৃষ্টিদাতা বলে অভিহিত হন না। নিছক বহুদর্শিতারও মূল্য আছে নিশ্চয়। কবিরাও কবিরাজের মতো বহুদর্শী হলে অভিজ্ঞতাসম্পদে সমৃদ্ধ হন। কিন্তু কোন আলোয় দেখেছেন তারই উপর নির্ভর করে অন্তিম মূল্য। দেয়ালি রাতে হাজার হাজার পিদিমের আলোয় আমরা বহুদর্শী হতে পারি, কিন্তু তার পরের দিন সূর্যের আলোয় যা হই তার নাম দ্রষ্টা। একই দৃশ্য দিনের আলোয় দেখতে আরেক রকম।

জীবনটা এত ছোট যে সদর মহলের সব ক'টা ঘর একজীবনে দেখা হয়ে ওঠে না। শতবর্ষ পরমায়ুও তার জন্যে যথেষ্ট নয়। আমাদের সকলেরই দৌড় পরিমিত। কিন্তু অন্দর মহলে যাবার দুয়ার সব বয়সেই খোলা থাকে। কিশোরবয়সীও হয়তো বর্ষীয়ানের আগে সেখানে প্রবেশ পায়। পঁচিশ বছরের কীটস যা দেখেছেন তার তুলনা তাঁর দ্বিগুণবয়সীদের অনেকের জীবনে নেই। কীটসের গৌরব শুধু তাঁর অনবদ্য কাব্যদেহের জন্যে নয়। তাঁর কবিচিত্ত কোন্ সুদূরের সৌরালোকে উদ্‌ভাসিত! সুদূরের হয়েও তা ভিতরের!

বাইরের রিয়ালিটির মতো ভিতরের রিয়ালিটিও আছে। চোখ খুলে গেলে ইনার রিয়ালিটির দর্শন মেলে। তখন সৃষ্টিলীলা প্রত্যক্ষ হয়। কবি তখন তার নিজের সৃষ্টিলীলাকেও বিধাতার সৃষ্টিলীলার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারলে বাঁচেন।

বাইরের রিয়ালিটিকে আমি মায়া বলিনে। তা যদি বলতুম তবে সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি সবই মায়া। কিন্তু ইনার রিয়ালিটির আলোয় না দেখলে, না দেখতে জানলে, দেখার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তার ফলে সৃষ্টিকর্মেও অসম্পূর্ণতা আসে। একরাশ লিখলে হবে কী, দৃষ্টি যে অসম্পূর্ণ। পক্ষান্তরে একটি কবিতাই যথেষ্ট হতে পারে। সে কবিতা এতটুকুও হতে পারে। কী দেখলুম তা দেখানোর জন্যে মহাকাব্য লিখতে হয় না প্রত্যেক

কবিকে। মহাকাল তেমন কোনো দাবীও করেন না কালজয়ীর কাছে। দু'চার পঙ্‌ক্তিও কালজয়ী হয়েছে।

সদর মহলে যেমন সুন্দরের সঙ্গে অসুন্দরও আছে অন্দর মহলে তেমন নয়। সদর মহলে যেমন শিবের সঙ্গে অশিবও আছে অন্দর মহলে তেমন নয়। সদর মহলে যেমন আনন্দের সঙ্গে নিরানন্দও আছে অন্দর মহলে তেমন নয়। সদর মহলে যেমন প্রেমের সঙ্গে অপ্রেমও আছে, সত্যের সঙ্গে অসত্যও আছে, অন্দর মহলে তেমন নয়। সদর মহলে যেমন জীবনের সঙ্গে মৃত্যুও আছে, যৌবনের সঙ্গে জরাও আছে, অন্দর মহলে তেমন নয়। একদিক থেকে অন্দর মহল বৈচিত্র্যহীন। মানুষ বৈচিত্র্য চায়। তাই অন্দর মহলে চিরবসন্ত উপভোগ করতে রাজী নয়। সে মুখে যাই বলুক না কেন, সদর মহলের বৈচিত্র্য ছেড়ে অন্দর মহলে বৈকুণ্ঠসুখ চায় না।

হাসি আর কান্না, জন্ম আর মরণ, পাপ আর পুণ্য, মিলন আর বিরোধ, সুন্দর আর অসুন্দর, ভালো আর মন্দ এই নিয়ে বাইরের রিয়ালিটি। এর বৈচিত্র্যের শেষ নেই। সেইজন্যে সাহিত্যেরও শেষ নেই, সঙ্গীতেরও শেষ নেই, ললিতকলারও শেষ নেই। একদল বিদায় হবার আগে আরেক দল এসে হাজির হয়। সৃষ্টির কাজ চালিয়ে নিয়ে যায়। সৃষ্টিপ্রবাহ বহতা থাকে। সদর মহলে লোকারণ্য। তারই মাঝখানে দু'চারজনকে দেখি যাঁরা ভিতরের রিয়ালিটির সন্ধান রাখেন। তারই আলোয় পথ চলেন। তাঁদের সৃষ্টি আভ্যন্তরিক আলোকে উদ্‌ভাসিত।

না, দু'চারজন নয়। অনেকেই মাঝে মাঝে ভিতরের বারতা পান, মুহূর্তের জন্যে অন্দরে উঁকি মেরে আসেন, ইনার রিয়ালিটির আভাস বয়ে আনেন। কিন্তু বাইরের রিয়ালিটি তাঁদের অভিভূত করে রাখে। যেমন অভিভূত করে অফিস বা দোকান। দোকানদারের কাছে দোকানই পরম সত্য আর অফিস-ওয়ালার কাছে অফিস। যদি নিজের দোকান বা নিজের অফিস হয়ে থাকে।

অন্দর মহলের তাতে কিছুই আসে যায় না। সে তার চিরবসন্ত নিয়ে অপেক্ষা করে। যে চায় সে পায়। আর যে পায় সে তার প্রাপ্তির সৌরভ বিতরণ করে।

অখণ্ডদৃষ্টি

সূর্যের আলো যেখানে জন্ম নেয় সেইখানেই আবদ্ধ থাকে না, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কত কোটি কোটি যোজন দূরে তার গতি, তেমনি কবির বাক্য সংস্কৃত বা গ্রীক বা চৈনিক ভাষায় জন্ম নিলেও সেই ভাষা যে দেশের ভাষা সেই দেশেই নিবদ্ধ রয় না। অনুবাদের সাহায্যে দেশে দেশে সঞ্চারিত হয়।

তেমনি যুগে যুগে। বিংশ শতাব্দীতে যার জন্ম সে ত্রিংশ শতাব্দীতেও জীবিত থাকতে পারে। এ সম্ভাবনা কবিদের প্রত্যেকের বাক্যে নিহিত।

'সম্ভাবনা' বলেছি। 'সম্ভবপরতা' বলিনি। যা প্রত্যেকের বেলা সম্ভব তা অত্যল্পের বেলা সম্ভবপর। ডাকা হয় অনেকজনকে, বেছে নেওয়া হয় কয়েকজনকে। কারা সেই ভাগ্যবান তা মহাকালই জানেন।

আর্ট দেশ ও কালে জন্ম নিলেও তার জীবন দেশ ও কালে সীমিত নয়। নিখিল বিশ্ব ও নিরবধি কাল তার স্বদেশ ও স্বকাল। সেইজন্যে আর্টের মূল্য নিশ্চয়ই এক দেশের হয়েও সব দেশের, একযুগের হয়েও সব যুগের। স্বাদেশিক হয়েও বিশ্বজনীন, ইদানীন্তন হয়েও চিরন্তন। যেক্ষেত্রে নিতান্তই একদেশী বা একযুগী সেক্ষেত্রে আর্ট হয়ে থাকে সংকীর্ণ, প্রাদেশিক, সাময়িক ও কোনো একটা উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়। সে উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন উদ্দেশ্য-সিদ্ধি জিনিসটাই এমন যে আর্টকে তার বাহন করতে গেলে আর্ট খাটো হয়ে যাবেই। গঙ্গার মতো নদী—যাকে দেবী বলে লোকে পূজা করে—যদি জল-বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যে যন্ত্ররাজ বিভূতির দ্বারা শৃঙ্খলিত হয় তবে তার মুক্ত ধারার জন্যে যারা পিপাসিত তারা বিদ্রোহ করবেই।

আজকের জগতে সাহিত্য হয়েছে নানা বিচিত্র উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়। অথবা একান্ত প্রাদেশিক বা সামাজিক, সাময়িক বা ক্ষণিক। সাহিত্য যে একটা গোষ্ঠীর সামগ্রী হবে না, হবে জনগণের এটা একটা বড়ো কথা। কথাটা এই যুগেই শোনা যাচ্ছে সুতরাং এ যুগের মনের কথা। কিন্তু তার আগে তাকে সাহিত্য হতে হবে। সাহিত্য নামধেয় হলেই হবে না। সাহিত্য থেকে যদি সাহিত্যরস চলে যায় তা হলে সেই নীরস পদার্থকে সাহিত্য নামে ডাকলেই কি তা সাহিত্যের মতো সুগন্ধ বিতরণ করবে? জনগণের তৃষ্ণা যদি সাহিত্যের অপেক্ষা রাখে তবে তাদের জন্যে পরিবেশিত সাহিত্যেও থাকবে সাহিত্যের রস, সাহিত্যের সত্য, কেবল কতকগুলি তত্ত্ব বা তথ্য নয়। যা দিয়ে হয়তো সামাজিক প্রগতি বা কল্যাণ হবে, ব্যক্তিগত তৃষাহরণ নয়।

সে রস, সে সত্য বিশ্বজনীন তথা চিরন্তন বলেই মহামূল্য। নয়তো মূল্যহীন বা স্বল্পমূল্য। নিকৃষ্ট পদার্থও রস বলে বিকোতে পারে। সুধাও রস, আবার সুরাও রস, সোমরস। বিষও রস হতে পারে। দশ বিশ লক্ষ পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শক ভোট দিয়ে নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট করতে পারে না। তাদের অনাদর উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট করতে পারে না। তার যে মহিমা তা লোক-গণনার ঊর্ধ্বে। পুরস্কার বা তিরস্কারের দ্বারা তার ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। সে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তাকে মহামূল্য করে দেশাতীত ও কালাতীত মূল্য। সত্য শিব সুন্দর।

আর্টের সত্য শিব সুন্দর ঠিক সমাজের সত্য শিব সুন্দর নয়। সামাজিক বিচার ব্যক্তিগত বিচারের মতো ভুলভ্রান্তিতে ভরা, হ্রস্বদৃষ্টি ও অনুদার হতে পারে। প্রায়ই হয়ে থাকে। ধার্মিকরা তো সত্য শিব সুন্দরকে ধর্মীয় ব্যাখ্যা দেবেনই। একালের এক একটা ইডিওলজির প্রভাব এক একটা ধর্মের মতো। তাদের সত্য শিব সুন্দরকে তারা আর্টের উপর আরোপ করতে চায়। যদি আদৌ মানে। সামাজিক, ধার্মিক বা ইডিওলজিকাল দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে

আর্টিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গী সব সময় মেলে না, মিললেও হুবহু মেলে না। আর্টিস্টের আর একজোড়া চোখ আছে। তা দিয়ে সে সত্য শিব সুন্দরকে নিরন্তর দেখছে। কিন্তু অপরের দেখার সঙ্গে তার দেখার এমন কিছু তফাৎ আছে যার জন্যে সে আর্টিস্ট।

প্রেম, করুণা ইত্যাদি হৃদয়ভাব—কোনো কোনোটা সুনীতির পর্যায়ে পড়ে না, যেমন হিংসাদ্বেষ নিয়ে সাহিত্যের কারবার। শেকসপীয়ারের নাটকে না আছে কী! সমস্তই কি সাধুসম্মত হৃদয়ভাব! না। মানুষের হৃদয়ে যদি হিংসাদ্বেষ থাকে তবে সাহিত্যেও তা থাকবে। তার পরিণাম যদি ভয়ঙ্কর হয় তবে সে ভয়ঙ্করও থাকবে। বহুক্ষেত্রে নিরীহ নির্দোষ যারা তাদেরই যত দুঃখ, দুরাত্মার দণ্ড নেই, এমনও তো দেখা যায়। সাহিত্য কেমন করে সব ক্ষেত্রে দণ্ডদান করবে? জীবনের প্রতি সত্যনিষ্ঠ যে সাহিত্য সে জীবনের অন্তরালে কোনো নৈতিক বিধান কাজ করছে কিনা তার অনুসন্ধান করে, কিন্তু যতক্ষণ না তার খোঁজ পাচ্ছে ততক্ষণ গতানুগতিকভাবে পাপের সাজা বা পুণ্যের পুরস্কার দেখায় না। কারণ প্রতিক্ষেত্রে পাপের সাজা ও পুণ্যের পুরস্কার দেখা যায় না। জীবন যেমন তাকে তেমনিটি দেখাতে হবে। তবে সরল দৃষ্টিতে নয়, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে। অন্তরালে গিয়ে, গভীরে নেমে। আজকালকার জীবন এমন বিপর্যস্ত যে সাধারণত অশিবেরই জয়, শিবের পরাজয়, অসুন্দরেরই প্রতাপ, সুন্দরের দুর্বলতা চোখে পড়ে। সেইজন্যে আরো গভীরে নামতে হবে, অন্তরালে যেতে হবে, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখতে হবে, নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে হবে, দিব্যদৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করতে হবে, চোখ বুজে ধ্যান করতে হবে। তা হলেই পাওয়া যাবে সত্যের দর্শন, শিবেরও। সাহিত্যিকের দৃষ্টি নিছক প্রত্যক্ষদর্শী নাগরিকের নয়, অপরপক্ষে নীতিনিপুণের বা ধার্মিকেরও নয়, সমাজপতির তো নয়ই।

জীবন একালে এমন ভাঙাচোরা খণ্ডবিখণ্ড যে এর একটি সমগ্র রূপ কোথাও দেখবার জো নেই। না শহরে না গ্রামে না প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে না মধ্য আফ্রিকার অরণ্যে না হিমালয়ের গুহায়। ভাঙা কাচের টুকরো-গুলোকে একত্র জুড়লে তা সমগ্র হয় না। প্রাচীনরা জীবনের সমগ্র রূপ কোথাও না কোথাও দেখতে পেয়েছিলেন বলে তাঁদের মধ্যে একটা প্রশান্তি ছিল। যদিও তাঁদের সকলে কিছু গভীরে যাননি, অন্তরালে যাননি, ধ্যানী ছিলেন না, সূক্ষ্ম দৃষ্টি বা দূর দৃষ্টি লাভ করেননি। আধুনিকরা জীবনের সমগ্র রূপ কোথাও দেখতে পাচ্ছেন না। হয় তাঁদের এটা জুড়ে জুড়ে তৈরি করতে হবে—যা কখনো সমগ্রতার আবিষ্কারের আনন্দ দেয় না—নয় সমগ্রকে সাধনার দ্বারা আবিষ্কার করতে হবে। যাঁরা এর কোনোটাই করেন না তাঁরা নিছক প্রত্যক্ষদর্শী বা পর্যবেক্ষক হয়েই ক্ষান্ত হবেন। কেউ কেউ ধর্মজ্ঞ বা নীতিজ্ঞ হবেন। বহুসংখ্যক হবেন সমাজহিতৈষী, গণহিতৈষী। দু'চারজন তত্ত্বজ্ঞও হবেন। কিন্তু রসজ্ঞ একজনও না। কারণ রসের সাধনা সমগ্রের আবিষ্কারের সাধনা। হৃদয় দিয়ে আবিষ্কারের। সে সমগ্র হয়তো ভাণ্ডারের

মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের মতো স্থিত। একটি মুহূর্তের মধ্যে অনন্তকালের মতো।

অবচেতন বা অচেতন স্তরের অস্তিত্ব এযুগের মস্ত বড়ো এক আবিষ্কার। সাধারণ চেতনা দিয়ে সব কিছু জানা যায় না। সাধারণ চেতনার আড়ালে কত কী কাজ করছে। সাহিত্যে ও চিত্রকলায় তাকেও ধরতে ছুঁতে হবে। তাকেও ঠাঁই দিতে হবে। বিংশ শতাব্দীর কবি ও চিত্রীদের অনেকেই একপ্রকার স্বপ্নলোকের বার্তা বয়ে নিয়ে আসছেন যেখানকার ধরনধারণ স্বপ্নের মতো খামখেয়ালী বা হেঁয়ালী, অশাসিত, অনিয়ন্ত্রিত, অটোমেটিক, পারম্পর্যহীন, যুক্তিহীন, অর্থহীন। এটা একটা বৈপ্লবিক বিকাশ। কিন্তু স্বাধীন বিকাশ নয়। মনোবিজ্ঞানের বিকাশ থেকেই এটার উদ্ভব। চাঁদের আলোর মতো এটা প্রতিফলিত আলোক। তা বলে কম সত্য নয়।

কিন্তু এহো বাহ্য। একে জুড়ে জুড়েও সমগ্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। এও একরকম খণ্ডদর্শন। অখণ্ডদর্শন নয়। মানুষ নিশ্চয় এর চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক বেশী জটিল। জগৎটাও নিরালম্ব স্বপ্নলোক নয়। সেটার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও সে অস্তিত্ব সমগ্রের একটি ভগ্নাংশমাত্র। সমগ্রের উপর দৃষ্টি থাকলে সে অস্তিত্বেরও অর্থভেদ হতে পারে। বৃহত্তর যুক্তির অঙ্গীভূত হলে অযৌক্তিক আর অযৌক্তিক নয়। যেটা বল্গাহীন, অটোমেটিক, নিরঙ্কুশ সেটাও প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা শাসিত। আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলার আয়ত্তাধীন। বিজ্ঞানীরা ততদূর না গেলেও শিল্পীরা ততদূর যেতে পারেন, যদি স্বাধীনভাবে যাত্রা করেন। এই যে বিজ্ঞানের আঁচল ধরে চলা এটাও সেকালের সেই ধর্মের আঁচল ধরে চলার মতো স্বাধীনতার অন্তরায়। আর স্বাধীন না হলে শিল্পী তার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে পারে না। গতানুগতিকের অনুসরণ করে।

প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে বিজ্ঞানের এমন জয়জয়কার ছিল না। বিজ্ঞানের দৌলতে আজ মানুষ কেবলমাত্র আকাশে আকাশে উড়তে পারছে তাই নয়, মহাশূন্যেও বিহার করছে, ডেরা বাঁধার কৌশল ফাঁদছে। একদিন চাঁদেও পৌঁছে যাবে। এর ফলে বিজ্ঞানের গৌরব আর্টের গৌরবকে নিষ্প্রভ করছে। তাতেও কিছু এসে যেত না। কিন্তু অনেকেই প্রত্যাশা করছেন যে নাটক উপন্যাসও বিজ্ঞানের মতো অবজেকটিভ হবে। সব কিছু মাপাজোখা, যথাযথ, তথ্যসিদ্ধ, দলিলবদ্ধ। কিন্তু হাজার অবজেকটিভ হলেও তা আনরিয়াল হতে পারে। কারণ যেসব সত্য নিয়ে নাটক উপন্যাসের কারবার সেসব স্রষ্টার অনুভূতি ও কল্পনাকে বাদ দিয়ে নয়। বিজ্ঞানীর পক্ষে যেটা গুণ নয়, দোষ, শিল্পীর পক্ষে সেইটেই গুণ, দোষ নয়। বাল্মীকি যদি ক্রৌঞ্চনিধনে শোক পেয়ে শ্লোক রচনা করা ছেড়ে দিয়ে পাখীটাকে ব্যবচ্ছেদ করে পক্ষিতত্ত্বের সন্দর্ভ লিখতেন তা হলে সেটা অবজেকটিভ হতো, সন্দেহ নেই। কিন্তু কাব্য হতো না, নিঃসন্দেহ।

একালে যদি কোনো বাল্মীকি থাকেন তাঁর হৃদয় হবে সংবেদনশীল, অপরের দুঃখ দেখে তিনি দুঃখ অনুভব করবেন, তেমনি সুখ দেখে সুখীও

হবেন। তিনি অসঙ্কোচে হৃদয়চর্চা করবেন। ট্রাজেডির দিকে কমেডির দিকে তাঁর চোখ খোলা থাকবে দিল খোলা থাকবে। সাধারণের অনুভূতির চেয়ে তাঁর অনুভূতি হবে বহুগুণ প্রখর ও গভীর। অনুভূতির সঙ্গে থাকবে কল্পনা। অনুভূতি শোক পায়। আর কল্পনা তাকে নিয়ে শ্লোক বানায়। একটিকে ছেড়ে আরেকটি বেশীদূর যেতে পারে না।

তা হলে কি নাটক উপন্যাস অবজেকটিভ হবে না? যথাসম্ভব হবে। না হলেও ক্ষতি নেই। হলে আরো ভালো হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলাফল এখন হোমারের ইলিয়াডের সমর্থন করছে। ট্রয়ের যুদ্ধ নিছক কবিকল্পনা নয়। কুরুক্ষেত্র খনন করলে একদিন হয়তো মহাভারতের সমর্থন পাওয়া যাবে। তা বলে ইলিয়াডকে বা মহাভারতকে কোনো ঐতিহাসিক ইতিহাস বলে স্বীকার করেন না। ইলিয়াড বা মহাভারতের রস ইতিহাসের রস নয়, সুতরাং ঐতিহাসিকদের উপর নির্ভর করছে না তার মূল্য। অথচ যথাসম্ভব অবজেকটিভ হলে তার মর্যাদাও মানতে হবে। সমসাময়িক জীবনের সঙ্গে নিবিড়তম পরিচয় অখণ্ডদৃষ্টির সহায়ক। গ্যেটে তো একই কালে বৈজ্ঞানিকও ছিলেন। বৈজ্ঞানিক তাঁর বেলা শিল্পীর সহযোগী। সহযোগী না হয়ে প্রভু বা গুরু হতে চাইলে মুশকিল। তা হলে আবার সেই ধর্মের প্রভুত্বের বা গুরু-গিরির মতো ব্যাপার হবে। আর্টের ও সাহিত্যের ইতিহাসে যা বার বার হয়েছে।

অখণ্ডদৃষ্টির জন্যে সকলের সাহায্য নিতে হবে। বিজ্ঞানের, ধর্মের, নীতির, দর্শনের। কিন্তু শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী যেন আচ্ছন্ন বা বিভক্ত না হয়।

গতি ও স্থিতি

জীবনযাত্রা পরিবর্তনশীল। জীবন তা নয়। সেই জন্ম সেই মৃত্যু, সেই জরা সেই ব্যাধি, সেই যন্ত্রণা সেই বেদনা, সেই শোক সেই দুর্ভোগ। আবার সেই কামনা সেই বাসনা, সেই প্রেম সেই প্রীতি, সেই বিরহ সেই মিলন, সেই মমতা সেই মায়া।

সাহিত্য যদি পরিবর্তনশীলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে তা হলে সাহিত্যে আর সাংবাদিকতায় প্রভেদ থাকে না। সাহিত্যের গাঁটছড়া জীবনযাত্রার সঙ্গে নয়, জীবনের সঙ্গে। তা বলে সাহিত্যে পরিবর্তনের প্রতিফলন থাকবে না তা নয়। তার সমালোচনা থাকবে না তা নয়। পরিবর্তনের সঙ্গে তার বিরোধও নেই। সে নিজেও তো যুগে যুগে বদলে যায়। বদলাতে বদলাতে সাহিত্যই থাকে।

মানুষের জীবনযাত্রা কোনোদিনই অপরিবর্তনীয় ছিল না। যুগে যুগে পরিবর্তিত হতে হতে দু'তিনশো বছর আগে সব দেশেই মোটের উপর একই রূপ ধারণ করেছিল। অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী, কারুশিল্পজীবী। গ্রামেই

তাদের বসতি। অল্পলোকের বাস শহরে। তারা বাণিজ্য করে, রাজ্য চালায়। সংস্কৃতিও তাদেরি সঙ্গে জড়িত। যদি না হয় লোকসঙ্গীত বা রূপকথা বা ছড়া।

তারপর এই দু'তিনশো বছরে জীবনযাত্রার রূপ সব দেশেই কম বেশী বদলে গেছে, বদলে গিয়ে একই রূপ হয়েছে বা হতে চলেছে। সর্বত্র গ্রাম হটে যাচ্ছে, কৃষি হটে যাচ্ছে, কারুশিল্প হটে যাচ্ছে, শহর বেড়ে যাচ্ছে, তার বহর বেড়ে যাচ্ছে, তার আকর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে, বাণিজ্য ফেঁপে উঠছে, যন্ত্রশিল্প বলে একটা নতুন জিনিস ভূঁই ফুঁড়ে উঠছে, মানুষ এখন আকাশে উড়ছে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে উড়ে যেতেও পারবে। যদি নিজের তৈরি পরমাণবিক অস্ত্রে নিজেকেই ধ্বংস না করে।

এই যে রূপান্তর এর কোথাও পুরাতন স্বাভাবিক ছন্দ নেই, মন্থর গতি নেই। সর্বত্র তোলপাড়, বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয়। কোথাও বেশী, কোথাও কম। ইংলণ্ডে যা হতে দেড়শো বছর লেগেছে, রুশদেশে পঞ্চাশ বছর, ভারত হয়তো তাকে ত্রিশ বছরে নিষ্পন্ন করবে। করতে গিয়ে বিপর্যস্ত হবে। খুব কম সময়ের মধ্যে খুব বেশী অদলবদলের যে গতিবেগ তা মানুষের জীবনযাত্রাকে লণ্ডভণ্ড করে। ধনতন্ত্রের জায়গায় সমাজতন্ত্র বসলেও গতিবেগের ইতরবিশেষ হয় না। অস্থিরতা লেগেই থাকে।

আলোড়নের ফলে ক্ষুণ্ণ হয় পূর্বপুরুষের ধর্ম, সমাজব্যবস্থা, পরিবারের গড়ন, রীতিনীতি, সংস্কার, চিরাচরিত মূল্য। তেমনি নতুন মূল্য, নতুন গড়ন, নতুন ব্যবস্থা, নতুন রীতিনীতির প্রবর্তন হয়। এসব পরিবর্তনের তলেতলে কাজ করছে কয়েকটি আইডিয়া ও আইডিয়াল। মানুষ ইচ্ছা করলে বিশ্বনিয়ন্তা হতে পারে, প্রকৃতির নিয়ন্তাও হতে পারে। ব্যক্তিহিসাবে সে যতই দুর্বল হোক না কেন সমষ্টিহিসাবে সে প্রবলপ্রতাপ। সকলের সব দুঃখ দূর হওয়া সম্ভব। জগৎটা মায়া নয়। মর্ত্য থেকে স্বর্গে যাবার স্বপ্ন না দেখে স্বর্গকেই মর্ত্যে নামিয়ে আনা যায়। সব মানুষই সমান। সব মানুষই স্বাধীন। মৈত্রীই কাম্য, তবে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকাই সুবুদ্ধি। মানবিক ব্যাপারে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতের স্থান নেই। যুক্তি আর বিবেক হবে চিন্তা ও কর্মের নিয়ামক। ভগবান থাকতেও পারেন, না থাকতেও পারেন, কিন্তু মানুষ তো আছে। সে যদি ইচ্ছা করে ও সাধনা করে তবে অতিমানব হতে পারে। পারফেকশন লাভ করতে পারে। মৃত্যুকে জয় করতে না পারলেও ব্যাধিকে ও জরাকে জয় করতে পারে।

গত দুই মহাযুদ্ধে মানবিকবাদীদের মানবের উপর বিশ্বাস মানবভাগ্যের উপর বিশ্বাস গুরুতর ধাক্কা খেয়েছে। প্রকৃতির হাতে নয়, ভগবানের হাতে নয়, মানুষেরই হাতে। সেইজন্যে ধাক্কা সামলে নেওয়াটাই আপাতত প্রাথমিক কাজ। তার জন্যে বেশ কিছুকাল শান্তি। গত শতাব্দীটা মোটের উপর শান্তিতে কেটেছিল বলেই মানুষ ইহলোকেই স্বর্গসুখের কল্পনা করতে পেরেছিল। কিন্তু একটার পর একটা মহাযুদ্ধ ঘটবার পর মানুষ আর সহজে

বিশ্বাস করতে পারছে না যে মহাযুদ্ধের দিন গেছে, সম্মুখে মহাশান্তি।

গত শতাব্দীর ফ্রী উইলের সে প্রতিপত্তি আর নেই। একজন কি দু'জন মানুষের বুদ্ধির দোষে বা ভুলে বা আকস্মিকভাবে যে-কোনোদিন একটা মহামারী বেধে যেতে পারে। কেই বা বেঁচে থাকবে যে সেই একজন বা দু'জনকে দায়ী করবে বা সেই আকস্মিকতাকে আয়ত্তে আনবে। এটা যদি সাধারণ মানুষের হাতে না হয় তবে ফ্রী উইলের তাৎপর্য কী? তা হলে ডিটারমিনিজমের উপরে ছেড়ে দিতে হয়। মানুষ নিমিত্তমাত্র। ঐতিহাসিক শক্তির দ্বন্দ্বে সে সতরঞ্চের বোড়ে। তার ধারণা সে-ই চালক। ধারণাটা ফাঁপা।

সাধারণ মানুষ ইচ্ছা করলে আত্মাহুতি দিতে পারে। সেইভাবে ফ্রী উইলকে জিতিয়ে দিতে পারে। ডিটারমিনিজমকে অস্বীকার করতে পারে। 'না' বলার ক্ষমতা এখনো সাধারণ মানুষের হাতে। যে কোনো মানুষের হাতে। কোনো মানুষই সম্পূর্ণ অসহায় নয়। দুর্বলতম মানুষেরও আত্মিক বল আছে। কিন্তু তা হলে মধ্যযুগের সন্তদের মতো আগুনে পুড়ে আত্মিক বলের সাক্ষ্য দিতে হয়। সেদিক থেকে তিনশো বছর পেছিয়ে যেতে হয়। পেছিয়ে যাওয়া ও এগিয়ে যাওয়া দুই কেমন করে হতে পারে? আর পেছিয়ে গেলে গ্রামে ফিরে যেতে হয়, সরলতর জীবনে ফিরে যেতে হয়। জটিলতর সভ্যতার থেকে পিছু হটা কি মুখের কথা! যখন দেখা যাচ্ছে শহরের দিকেই ঐশ্বর্যের দিকেই গড্ডালিকাপ্রবাহ।

যার চোখ আছে সেই দেখছে যে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে এক বিরাট নাটকের অভিনয় চলেছে। তার কয়েক অঙ্ক শেষ হয়েছে, কয়েক অঙ্ক এখনো বাকী। এটা ইণ্টারভাল। পরাক্রান্ত ঐতিহাসিক ও নৈতিক শক্তিসমূহ লীলা করছে।

সঙ্গে সঙ্গে এও দেখতে পাচ্ছে যে একে একে নিবিছে দেউটি। মানুষের প্রাণ এখন কীটপতঙ্গের মতো মূল্যহীন। সে নারীই হোক আর শিশুই হোক তার প্রাণ থাকা না থাকা সমান। যুদ্ধে যেটুকু দয়ামায়া ছিল এখন সেটুকু উঠে গেছে। সেটা এখন ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য। যেমন হৃদয়বত্তার স্থান নেই তেমনি বিবেকেরও স্থান নেই। ন্যায় অন্যায় বিবেচনাও দুর্বলচিত্ততা। বিজ্ঞান মানুষকে যতই শক্তিমান করছে ততই দেখা যাচ্ছে সে হৃদয়হীন বিবেকহীন প্রাণসম্বন্ধে শ্রদ্ধাহীন মারণযন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। মানুষের পক্ষে এটা গৌরবের কথা নয়।

পক্ষান্তরে মারণাস্ত্রের মার খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ও লড়তে থাকাও কম গৌরবের কথা নয়। অতি সাধারণ মানুষও অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছে, হার মানছে না, আত্মসমর্পণ করছে না। এটাও তো গণনার মধ্যে আনতে হবে। মানবাত্মা যতদিন অপরাজিত থাকবে ততদিন মানবের উপর বিশ্বাসও থাকবে। একটা দেশ হয়তো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েও প্রমাণ করে যাবে যে সে অপরাজিত ও অনবনত। পরিণামে অন্তঃপরিবর্তন ঘটবে। আর সব পরিবর্তন বাহ্য। অন্তঃপরিবর্তনই সবচেয়ে মূল্যবান। আমাদের যুগ তার জন্যেই প্রতীক্ষমান।

সাহিত্যিক এখন কী করবে? একে তো জীবন থেকে মহত্ত্ব চলে যাচ্ছে, হৃদয় থেকে করুণা, প্রাণ থেকে প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা, চরিত্র থেকে ন্যায় অন্যায় বোধ। এই অমানবিকতার উপর কোনো বড়ো সাহিত্য দাঁড়াতে পারে না। সাহিত্যিকের কাছে এর মতো প্রতিবন্ধ আর কী আছে? অবশ্য সব প্রতিবন্ধকের পাশ কাটিয়ে যাবার কৌশল খুঁজলেই মেলে। তা হলেও মানতে হবে সে সাহিত্য কখনো মহৎ হতে পারে না, যদি জীবন থেকে মহত্ত্ব চলে যায়। জীবনের কোনো একটি কোণে যদি না একটুখানি মহত্ত্বের সলতে জ্বলতে থাকে। যার আলো সাহিত্যের উপরেও পড়বে।

দেউটি যদি একবার নিবে যায় তো বহু শতাব্দীর জন্যে নিবে যাবে। এমনি করেই এক একটা সভ্যতা দেউলে হয়ে গেছে। মূল্যগুলোই হচ্ছে দীপ। মূল্য চলে গেলে দীপ নিবে যায়। আমরা যেন একটা অন্ধকার হতে থাকা প্রেক্ষাগৃহে বসে নাটকের অভিনয় দেখছি আর সে নাটক ক্রমশ ক্লাইমাক্সের দিকে চলেছে। ট্র্যাজিক ক্লাইমাক্স। অবশ্য মন্দের ভিতর থেকে ভালো আসবে। অন্তঃপরিবর্তন। এই যা সান্ত্বনা। আরেক সান্ত্বনা এই যে নাটকটা চিত্তাকর্ষক।

সাহিত্যিককে আত্মরক্ষা করতে হবে। রক্ষা করতে হবে তার আপনার আত্মাকে। সে নিজে অমানবিক হবে না। অপ্রমত্ত থাকবে। বিবেকহীন হবে না। হৃদয়বান হবে। শাশ্বত মূল্যরাজি অবিকৃত রাখবে। চিরন্তন সত্য শিব সৌন্দর্যকে, প্রেম মৈত্রী করুণাকে সযত্নে পাহারা দেবে। এর জন্যে যদি দুঃখ পেতে হয় দুঃখ পাবে। যদি প্রাণে মরতে হয় তাও শ্রেয়।

তারপর এই অন্ধকারের মধ্যে আলো খুঁজতে হবে। আলো যে কোনোখানেই নেই তা নয়। প্রত্যেক মেঘের রুপালি পাড় থাকে। অন্ধকারের ছিদ্রে ছিদ্রে আলোক প্রবেশ করে। সাহিত্যিকের দৃষ্টি অন্ধকারেও অন্ধ হয়ে যায় না। তার চোখ সব অবস্থায় খোলা থাকে। আলোর রেখা সেই সর্বপ্রথম দেখতে পায়।

রিয়ালিটির অভ্যন্তরে যেতে হলে আরো এক জোড়া চোখ চাই। নাটক দেখতেও তো অপেরা গ্লাস লাগে। অনেক সময় চোখ বুজে দেখাই আসল দেখা। দৃশ্যমান জগতের পিছনে যে সত্য আছে তাকে উদ্ধার করতে হলে চাই ধ্যানদৃষ্টি।

স্থিতি একটা জায়গায় আছেই। যেখানে এ জগৎ স্থিত। কেউ একে ধ্বংস করতে পারবে না। তেমনি মানুষকেও, তার সত্যকেও। সত্যিকার জীবনকেও। গতি যেখানেই নিয়ে যাক স্থিতি সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আকাশের ধ্রুবতারার মতো। শাশ্বত মূল্যরাজি নির্বাপিত হবে না, হতে পারে না। যখন মনে হবে যে নিবে গেছে তখনো জ্বলতে থাকবে।

আর্ট কি স্বাধীন

আমাদের দেশের অজানা গুহাচিত্রের চেয়ে বহুগুণ প্রাচীন গুহাচিত্র অন্যান্য দেশে আবিষ্কৃত হয়েছে বলে শুনি। মানুষের সেই আদিম স্বাক্ষরের সমানবয়সী সমাজ বা ধর্ম ইতিমধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে। কারা এঁকেছিল, কাদের জন্যে এঁকেছিল, কেন এঁকেছিল এসব প্রশ্নের উত্তর মেলে না। হাজার হাজার বছর কোথায় তলিয়ে গেছে। মাটির উপর দিয়ে বয়ে গেছে জলস্রোতের মতো জনস্রোত। অনধিগম্য বলে কাল এতদিন ধ্বংস করেনি। হয়তো একালের মানুষই হাজার হাজার বছরের অদেখা অজানা গুহাচিত্রের দ্বিতীয় সাক্ষী।

এর থেকে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় যে সমাজের চেয়ে, ধর্মমতের চেয়ে আর্ট আরো বেশী দিন বাঁচে। যদি সুযোগ পায়। তেমন সুযোগ সকলের বরাতে জোটে না। কিন্তু জুটলে বোঝা যেত যে আর্টের জীবনীশক্তি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। আর তার সেই জীবনীশক্তির মূলে তার স্বকীয় সত্তা।

হাঁ, আর্ট একটি সত্তা। একটি অস্তিত্ব। যেমন আলো হাওয়া জল মাটি বিদ্যুৎ। তফাতের মধ্যে এটা মানুষের সৃষ্টি। প্রকৃতির সৃষ্টি নয়। যেটা প্রকৃতির সৃষ্টি সেটা আগে এসেছে, যেটা মানুষের সৃষ্টি সেটা পরে। কিন্তু পরে বলেই সেটা কম অস্তিত্ববান নয়। সেকালের নদনদীও তো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রকৃতির সৃষ্টিও চিরদিন থাকে না। কিন্তু যতদিন থাকে ততদিন তাদের জীবনীশক্তির মূলে থাকে তাদের স্বকীয় সত্তা।

আর্ট আছে। আর আছে তার স্বকীয়তা। এই পর্যন্ত মেনে নিতে বাধা নেই। বাধা আসে স্বাধীনতার বেলা। আর্ট কি স্বাধীন?

স্বাধীন সত্তা নিয়েই আর্ট একদা আবির্ভূত হয়েছিল। মানুষ তার আপন কীর্তি দেখে অবাক। সে যেন এক বিশ্ব আবিষ্কার। সেদিন যা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত তাই ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয় ও তার সঙ্গে জড়িয়ে যায় রকমারি পাশ। সমাজের দাবী, ধর্মের অনুশাসন, রাজার ফরমাস, রাজ্যের আইন। উচিত অনুচিতের প্রশ্ন উঠে সৃষ্টির প্রেরণাকে নিয়ন্ত্রিত করে। কোথায় আর্টের স্বাধীনতা? তার জায়গা নেয় ঐতিহ্য। ধারাবাহিকতা। সামাজিক প্রয়োজন। লোকহিত। একটা না একটা মতবাদ। যা আর্টের নিজের ঘরের নয়, বাইরের দুনিয়ার।

ধর্মের দিক থেকে বলা হয় যে জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগ ধর্মের আমলে আসবে ও ধর্মের আজ্ঞাবহ হবে। শিল্পমাত্রেই হবে ধর্মীয় শিল্প। নয়তো তাকে বর্জন করা হবে। অপাঙ্‌ক্তেয় করা হবে। এ মনোভাব আজকের দিনেও কাজ করছে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। তবে সভ্যজগতে আর কেউ ধর্মের এই সর্বব্যাপিতায় বিশ্বাস করে না। গত শতাব্দীতে ধর্মের বদলে নীতির তরফ থেকে উঠেছিল ওই একই দাবী। জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগ নীতির আমলে আসবে, আর্টও বাদ যাবে না। যা নীতিহীন তা অপাঙ্‌ক্তেয়। এ মনোভাব

আজও এখানে ওখানে কাজ করছে। কিন্তু সভ্যজগৎ মোটের উপর একমত যে নীতি না থাকলেও আর্ট থাকে, কিন্তু রস না থাকলে আর্ট থাকে না, রূপ না থাকলে আর্ট থাকে না।

তা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদীরা, সমাজতন্ত্রবাদীরা, সাম্যবাদীরা বর্তমান শতাব্দীর বিভিন্ন পর্যায়ে, বিশেষত যুদ্ধকালে বা বিপ্লবকালে, আর্টের কাছে আনুগত্য চেয়েছেন ও পেয়েছেন। ন্যাশনাল আর্ট, সোশিয়াল রিয়ালিজম ইত্যাদি বয়ান বার বার উচ্চারিত হয়েছে। ধর্ম বা নীতি যা করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছে দেশপ্রেম বা সমাজপ্রীতি তাই করতে কোমর বেঁধেছে। পারবেও। কিন্তু ক'দিনের জন্যে? একদিন নাচার হয়ে মানতে হবে যে শিল্পীদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া যত সহজ শিল্পের আপনার স্বাধীনতা হরণ করা তত সহজ নয়।

শিল্পীরা যতক্ষণ সৃষ্টি করে ততক্ষণ অসাধারণ। তারপরে আর সকলের মতো নিতান্ত সাধারণ মানুষ। তাদেরি মতো ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, অভাবে অনটনে জর্জর, লোভে নষ্ট, উচ্চাভিলাষে ভ্রষ্ট। তাদের দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া বা আঁকিয়ে নেওয়া চিরকাল চলে এসেছে, চিরকাল চলবে। অতীতে এই কাজটি করাতেন রাজন্যবর্গ বা পুরোহিতকুল। ইদানীং করাচ্ছেন বণিক বা কমিশনার মণ্ডলী।

কিন্তু শিল্পী স্বাধীন না হলেও শিল্প স্বাধীন ছিল ও থাকবে। কাব্য বা নাট্য বা সঙ্গীত বা নৃত্য যে সমাজের বা সমষ্টির বা রাষ্ট্রের বা ধর্মসঙ্ঘের অনুগত হতে বাধ্য এটা কেউ কোনোদিন মন থেকে স্বীকার করেনি ও করবে না। রসের ও রূপের জগৎ একটা স্বতন্ত্র জগৎ। সে জগতে যাদের প্রবেশ আছে তারাই শিল্পী। যাদের নেই তারা বাইরের লোক। বাইরের লোকের অধিকার উপভোগে। তারা উপভোগ করেই সুখী হোক। তা না করে তারা যাবে শিল্পীর হাত ধরে লেখাতে বা আঁকাতে। ফলে যা আকার ধারণ করে তা আর্ট নয় বা আর্ট হিসাবে নিরেস।

আর্ট নিরাকার ব্রহ্ম নয়। আকার ধারণ করেই তাকে অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে হয়। যার হাত দিয়ে বা কণ্ঠ দিয়ে বা অঙ্গ দিয়ে সাকার হয় তারই নাম শিল্পী। শিল্পী পরাধীন হতে পারে। শিল্প কিন্তু স্বাধীন। আর শিল্পের সেই স্বাধীনতাই শিল্পীকে মর্যাদা দেয়। স্বাধীনতা বিনা মর্যাদা নেই। স্বাধীনতা বিনা সৃষ্টিও কি আছে? নব নব উন্মেষের জন্যেও চাই স্বাধীনতা। ধর্ম বা সমাজ বা রাষ্ট্র আপনার জন্যে যে স্বাধীনতা দাবী করে আর্টের বেলা সে স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেই শিল্পের তথা শিল্পীর স্ফূর্তি। তার পরে কেউ যদি স্বাধীনতা পেয়েও তার অপব্যবহার করে সে ভিন্ন কথা।

বলা বাহুল্য স্বাধীনতা যদিও অনন্যনির্ভর তবু অনন্যনিরপেক্ষ নয়। আর্টের স্বাধীনতা বলতে ধর্মের থেকে বা নীতির থেকে বিচ্ছিন্নতা বোঝায় না। সব ক'টি জগৎই পরস্পরপ্রবিষ্ট। আর্টের ভিতরে সমাজের অনুপ্রবেশ তেমনি সত্য যেমন সত্য সমাজের ভিতরে আর্টের অনুপ্রবেশ। লোকনৃত্যে বা লোক-

সঙ্গীতে যোগ দেয় সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা। এই যে হোলি আসছে, এটি তেমনি একটি উৎসবরূপে কল্পিত হয়েছিল। এর অনুরূপ ছিল প্রাচীন গ্রীসে। প্রাচীনদের মধ্যে লোকের সঙ্গে শিল্পের বিচ্ছেদ তেমন ঘটেনি যেমন ঘটেছে আধুনিকদের মধ্যে। যেসব সমাজ এখনো ট্রাইবাল যুগে বাস করছে সেসব সমাজেও বিচ্ছেদ ঘটেনি।

আধুনিককালের এটাও একটা সমস্যা, কেমন করে আর্টের সঙ্গে সমাজের তথা ধর্মের তথা নীতির বিচ্ছেদ বা ব্যবধান পরিহার করা যায়, ঘটে থাকলে দূর করা যায় বা হ্রাস করা যায়। যতদিন না এটা সম্ভব হচ্ছে ততদিন আধুনিক মানবের জীবন খণ্ডিত হবেই। সেটা কম দুঃখের নয়। তা বলে তো আর্টের স্বাধীনতাকে খর্ব করা যায় না। সে পথে সমস্যার সমাধান নেই। স্বাধীনতাকে গোড়ায় স্বীকার করে নিয়ে তারপরে পরস্পরনির্ভরতার সন্ধান করতে হবে।

এখানে কথা উঠবে যে, গুহাচিত্রের যুগেও কি স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরনির্ভরতা ছিল? সে যুগেও কি ধর্ম আর সমাজ শিল্পকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল? না রূপদক্ষ জনের অবাধ স্বাধীনতার জন্যে গুহাভিন্ন আর কোনো গোপনীয় আশ্রয় ছিল না? তাই যদি হয়ে থাকে তবে সমস্যাটা কেবল আধুনিক মানবের নয়, এটা আদিতম মানবেরও সমস্যা। সেকালেও শিল্পীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ঘটে থাকতে পারে, শিল্পের স্বাধীনতা ব্যাহত হয়ে থাকতে পারে, ইচ্ছামতো সৃষ্টি করতে পারা যাচ্ছে না দেখে রূপদক্ষরা গুহার নির্জনতা বরণ করে নিয়ে থাকতে পারে। এতকাল পরে কেউ জোর করে বলতে পারে না প্রকৃত ব্যাপারটা কী। গুহা হয়তো পলাতকদের গজদন্তের গম্বুজ ছিল।

আমরা শুধু আমাদের সমসাময়িকদের সম্বন্ধেই জোর করে বলতে পারি। এর জন্যে দু'চার শতাব্দী পেছিয়ে যাওয়া যদি দরকার হয় তাও করতে পারি। আধুনিক যুগের প্রসঙ্গে মধ্যযুগের প্রসঙ্গও ওঠে।

এমন দেশ নেই যে দেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সেনসরাসিপ নেই। তুমি লিখতে পারো, কিন্তু রাষ্ট্রের ভয়ে বা ধর্মসঙ্ঘের ভয়ে বা সমাজের ভয়ে সম্পাদক তা মঞ্জুর করবেন না, প্রকাশক তা প্রত্যাখ্যান করবেন, মুদ্রাকর তা ছাপবেন না। সাজা হয়তো একজন কি আধজন পান, কিন্তু সাজার ভয়ে বেশীর ভাগ লোক তটস্থ। অবশেষে লেখকেরও হাত পা অবশ হয়ে যায়। তার হাত দিয়ে সাহসের কাজ হয় না। যেটা হয় সেটা নিরীহ নিষ্পাপ ভালোমানুষী। তার সঙ্গে সৌন্দর্য থাকে বলেই তা উত্তীর্ণ হয়। যেখানে সত্য বা সৌন্দর্য কোনোটারই মর্যাদা নেই সেখানে কেউ মনে রাখে না।

আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের বার বার বিদ্রোহ করতে ও কর্তৃপক্ষের রোষে পড়তে হয়েছে। এটাও একপ্রকার সত্যাগ্রহ। এর ফলে সাহিত্যের রাজপথ এখন জনপথে পরিণত হয়েছে। বহুজন যে স্বাধীনভাবে লিখতে পারছেন এটা দেশবিদেশের অসংখ্য সত্যাগ্রহীর শৌর্যের ও দুঃখভোগের নীট

ফল। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এখনো করায়ত্ত হয়নি। যদি হয়ে থাকে তবে ফ্রান্সে বা ইংলণ্ডে বা আমেরিকায়। যেসব দেশে সাহিত্যিক সত্যাগ্রহের ঐতিহ্য দুই শত বর্ষব্যাপী। আমরা তাদের সাধনার শরিক না হয়েও তাদের সিদ্ধির অংশভাগী হয়েছি।

না, সেসব দেশেও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা করায়ত্ত হয়নি। তবে নিষিদ্ধ দ্বার একে একে খুলে যাচ্ছে। যেখানে প্রবেশ মানা ছিল সেখানে ঢুকতে বাধা নেই। নিষিদ্ধ গ্রন্থের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হচ্ছে। নিষিদ্ধ নাটক দেখানো হচ্ছে। তাতে যে এমন কিছু অনিষ্ট হচ্ছে তাও নয়। আসলে সেসব দেশের বুনিয়াদ এমন মজবুৎ যে সহজে চৌচির হতে পারে না। দুটো একটা দেয়াল কি থাম ধ্বসে পড়া বিচিত্র নয়। আর্টের মুখ চেয়ে তেমন ঝুঁকি নেওয়া যায়। সভ্যতার বা সংস্কৃতির পরখ সেইখানে।

অথচ মধ্যযুগে এরকম ছিল না। তার কারণ সে নয় যে মধ্যযুগের ফিউডাল ব্যবস্থা কম সুদৃঢ় ছিল। তার হেতু জীবনজিজ্ঞাসায় গতানুগতিক ঔদাসীন্য। সব উত্তর বেদ বাইবেল কোরানে লেখা আছে, নতুন কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। জানতে চাও তো গুরু ধরো। নিজের চেষ্টায় কিছু হবে না। আঁকতে চাও তো অনুসরণ করো। বিষয়গুলোও বাঁধাধরা। মধ্যযুগে সৌন্দর্যসৃষ্টির অপ্রতুল ছিল না, কিন্তু পদে পদে সীমার বঁধন। আধুনিক যুগ বেপরোয়া। রেনেসাঁস তাকে অসীমের ইঙ্গিত দিয়েছে। মানুষ তার জিজ্ঞাসার উত্তর পাক না পাক জিজ্ঞাসায় উদাসীন নয়। সেইজন্যে প্রতি দশ বিশ বছর অন্তর অন্তর আর্টের জগতে ইজম বদলে যায়। গতানুগতিককে কেউ আমল দিতে চায় না।

(১৯৪৫)

সৃষ্টির স্বাধীনতা

শিল্প সব অবস্থায় স্বাধীন, সব সময় স্বাধীন। কিন্তু শিল্পী তা নয়। শিল্পীকে তার দেশকাল যতটুকু বা যতখানি স্বাধীনতা দেয় ততটুকুই বা ততখানিই সে স্বাধীন। স্বাধীনতার সীমা বাড়িয়ে নেবার জন্যে, স্বাধীনতাকে অর্থপূর্ণ করার জন্যে, সৃষ্টিকর্মে নিরঙ্কুশ হবার জন্যে শিল্পীরা যুগে যুগে ও দেশে দেশে কম চেষ্টা করেন নি। বহু আয়াসে যা অর্জিত হয়েছে তার সংরক্ষণের জন্যেও সজাগ থাকতে হয়।

সৃষ্টির পূর্ণতার জন্যেই সৃষ্টিকরের স্বাধীনতা চাই। নইলে যা সৃষ্ট হবে তাতে জীবনের সর্বাঙ্গীণতা থাকবে না। কতক অঙ্গ অন্ধকারে গোপন রয়ে যাবে। অন্ধকারের বন্ধ কারা থেকে সে কি কোনোকালেই ছাড়া পাবে না ? প্রাচীর ভেঙে তাকে উদ্ধার করে আনবে কে ? শিল্পী ছাড়া কার উপরে এ দায়িত্ব ?

মধ্যযুগের আলকেমিস্টরা যা ভয়ে ভয়ে করতেন আধুনিক যুগের

বৈজ্ঞানিকরা তা বুক ফুলিয়ে করছেন। বৈজ্ঞানিকদের স্বাধীনতা অঙ্কুশমুক্ত হওয়ায় জীবনও বহু পরিমাণে অন্ধকারমুক্ত হয়েছে। বিজ্ঞান—বিশেষত মনোবিজ্ঞান—শত শত বন্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছে। সেইসব অন্ধকূপে আবদ্ধ সত্য এতকাল পরে বাইরে আসতে পেরেছে।

কিন্তু সৌন্দর্যের মহলে বৈজ্ঞানিকের প্রবেশ নেই। আর সত্যেরও একটা অন্দর মহল আছে যেখানে শুধু শিল্পীজনেরই প্রবেশ। অথচ বৈজ্ঞানিকদের অনুরূপ স্বাধীনতা শিল্পীদের বেলা স্বীকৃত হয় না। পাছে স্বাধীনতার অপব্যবহার হয় ও উন্মার্গগামী শিল্পীরা সমাজকেও উন্মার্গগামী করেন। লোকের ধারণা স্বাধীনতার অপব্যবহার বৈজ্ঞানিকরা করেন না, রাজনীতিকরা করেন না, আর কেউ করেন না। করেন শুধু শিল্পীরাই।

সমষ্টিকে উন্মার্গগামী করার জন্যে এতরকম ও এতগুলো শক্তি কাজ করছে যে শিল্পীরা যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকেন তা হলেও উন্মার্গযাত্রার বিরাম হবে না। হতে পারে উনিশ বিশ। বরঞ্চ শিল্পীরা যদি স্বাধীনভাবে সক্রিয় থাকেন তবে শিল্পের আয়নায় আপনার মুখ দেখে সমাজ শিউরে উঠবে, হুঁশিয়ার হবে, রাশ টেনে ধরবে আশা করা যেতে পারে।

প্রাচীনরা দেবতা ও দানব কল্পনা করে জীবনের একটা ব্যাখ্যা পেয়েছিলেন। তেমনি স্বর্গ ও নরক কল্পনা করে মানুষের নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিকরা দেখছেন মানুষই দেবতা, মানুষই রাক্ষস, মানুষের অন্তরেই স্বর্গ আর নরক, বাইরেও তাই। এখন একথা শিল্পীরা যদি না বলেন তো বলবে কে? বলতে হলে খোলাখুলিই বলতে হয়। সবটাই বলতে হয়। ঠারেঠোরে আভাসে ইঙ্গিতে নয়।

মানুষের স্বার্থেই মানুষকে বলার দরকার যে, জীবনটা যেন একটা ভাসমান তুষারশৈল। সমুদ্রের উপরে তার চূড়াটুকুই দৃশ্যমান। আর-সব জাহাজের লোকের অগোচর। যাত্রীরা তো পরম উল্লাসে নাচ গান হল্লা করছে আর নাবিকরাও পরম নির্ভয়ে দুর্বার বেগে ইঞ্জিন ছুটিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ ও কী! কই, টাইটানিক কোথায়! টাইটানিক চলে গেছে আটলান্টিক মহাদেশের সন্ধানে। কয়েকটি নারী ও শিশুকে লাইফবোটে নামিয়ে দিয়ে।

মানুষকে বোঝানোর দরকার যে, তুষারশৈলের দৃশ্যমান অংশটুকুই জীবন নয়। যা তার দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে তা যদি আমি দেখতে পাই তো আমার মানবিক কর্তব্য তাকে দেখানো। তাতে হয়তো সে এমন শক পাবে যে মিথ্যাবাদী বলে আমাকেই এক ঘা কষিয়ে দেবে। কিন্তু সে আপনি বাঁচবে কোন্ জাদুবলে! সত্যই তাকে বাঁচাতে পারে। পূর্ণ সত্য।

আধুনিক সাহিত্যিকের আসল জোর এইখানেই। আধুনিক সাহিত্যিক অনুসন্ধিৎসু। সে ধরে নেয় না যে যত কিছু জানবার সব জানা হয়ে গেছে বা যতকিছু বলবার সব বলা হয়ে গেছে। সে ধরে নেয় না যে নাবিকরা সবজান্তা, ক্যাপটেন অভ্রান্ত। সে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে হুল্লোড় করবার মতো নিরুদ্বিগ্ন নয়। তার নিজস্ব একটা যন্ত্র আছে, যা দিয়ে সে তুষারশৈলের

মগ্ন অধোভাগ দেখতে পায়। যা দেখেছে তার কথা যদি সে না বলে তো কে বলবে ? বলতে তাকে হবেই। সেটাই তার মানবিক কর্তব্য।

অখণ্ড জীবনের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া ও দেওয়া, এই হচ্ছে একালের সাহিত্যিকদের সাধনা ও সাধ্য। এই তাঁদের লক্ষ্য ও মোক্ষ। বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে না গেলে, বিচিত্র আস্বাদন না পেলে কেউ পরিণত বা পরিপক্ক হয় না। তেমনি ভাষা বা রূপ নিয়ে বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনা কেউ সুদক্ষ হয় না। শতমারী ভবেৎ বৈদ্য, শিল্পেও এই নিয়ম খাটে। বার বার ব্যর্থ হতে হতেই নিশানা অব্যর্থ হয়। শিল্পের বা সাহিত্যের আর কোনো রাজপথ নেই।

আদিরস আদিকাল হতেই জীবনের তথা সাহিত্যের অঙ্গ। তাকে বাদ দিয়ে বা তুচ্ছ করে জীবনও হয় না, সাহিত্যও হয় না। সব দেশেই সব যুগেই মোটামুটি এটা স্বীকৃত। আমাদের সমসাময়িক কালে নতুনের মধ্যে এই হয়েছে যে, মনোবিজ্ঞান ও মনোবিশ্লেষণ সাহিত্যকেও স্পর্শ করেছে। বদ্ধমূল সংস্কার বা ইনহিবিশন একে একে ভেঙে গেছে ও যাচ্ছে। আরো যাবে। সাহিত্যিকের সংস্কারমুক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আরো দেখা দেবে। নইলে জীবনের রহস্যভেদ করা যাবে না। জীবনের ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে সেকালের সেই ধার্মিক ব্যাখ্যা বা গত শতকের সেই নৈতিক ভাষ্য কেউ মেনে নিতে রাজী নয়।

জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা একদা আমাদের দেশের একদল সাহিত্যিককে বস্তি অভিমুখী করেছিল। চল্লিশ বছর পরে তেমনি আরেক দলকে মনো-রাজ্যের আণ্ডারগ্রাউণ্ডের দিকে টানছে। তাঁরা যদি সেখান থেকে উদ্ধার করে আনতে পারেন এমন কোনো অবদমিত সত্য যা জেনে রাখবার আর মনে রাখবার মতো, তা হলে তাঁদের জীবনজিজ্ঞাসা অপরের জীবনজিজ্ঞাসার পরিপূরক হবে। সেইভাবে সাহিত্যের ভাণ্ডারে পরিপূর্ণতা আসবে।

মানুষ নামক সত্যটি পাশ্চাত্ত্য রেনেসাঁসের পূর্বে যে পরিমাণ সরল ছিল তার পরবর্তী অধ্যায়ে সে পরিমাণে নয়। দান্তে থেকে শেক্সপীয়ার কতটুকু ব্যবধান! তবু জটিলতার দিক থেকে দুস্তর। তেমনি ফ্রয়েডের পূর্বে ও পরে। আধুনিকরা যদি মনের পাতালে নামতে ভয় পান তবে আমি আশ্চর্য হব না। কারণ আমি নিজেও নিঃশঙ্ক নই। অবচেতনের কেঁচো খুঁড়তে কে জানে কখন কেউটের ছোবল খেতে হবে। কিন্তু কেউ যদি অগ্রণী হতে চান আমি তাঁকে পেছন থেকে আটকাব না। তবে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দেব যে, রোগ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হলে যেমন স্বাস্থ্যসম্পন্ন ডাক্তার হওয়া চাই তেমনি পাতালে পা দেবার আগে স্বর্গের থেকে শক্তি সংগ্রহ করা চাই। বিষের চিকিৎসায় অমৃত কাজে লাগে।

যাঁর আধ্যাত্মিক জীবন বলতে কিছু নেই, সে-জীবনে কিছু জমেনি, তাঁর পক্ষে ওসব বিপজ্জনক বিষয় নিয়ে কারবার করা সমীচীন নয়। তা বলে তাঁর স্বাধীনতায় বাদ সাধতে যাওয়াও ঠিক নয়। কতক লোক অগ্রণী না হলে তো কোনোদিন কোনো নতুন সত্যই আবিষ্কৃত হতো না। কোনো বন্ধ দুয়ারই

খুলত না। সাহিত্যও আমাদের অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের মতো কয়েকটা মামুলী ছন্দ নিয়ে পদচারণ করত। অথবা স্ত্রীপাঠ্য ও বিদ্যালয়পাঠ্য রচনায় নিবদ্ধ হতো।

আধুনিক দর্শন যেমন আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে নিচ্ছে আধুনিক সাহিত্যও তেমনি করে আপনাকে মিলিয়ে নেবে। জীবন যদি অবিভাজ্য হয়ে থাকে তবে তার সেই অবিভাজ্যতা দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি ভাগাবিভাগকেও প্রভাবিত করে একসূত্রে গাঁথবে। কিন্তু সাহিত্য তা বলে স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে দর্শন বা বিজ্ঞান বনে যাবে না। সে তার পারম্পর্য রক্ষা করেই বিবর্তিত হবে।

যেসব কথা বিজ্ঞানের মুখে দিব্যি মানায় সেইসব কথাই সাহিত্যের মুখে শুনলে সমাজরক্ষীরা হৈ হৈ করে তেড়ে আসেন। বিজ্ঞানের বই হলে আদালত ছেড়ে দেন, কিন্তু একই বিষয়ে সাহিত্যের বই হলে সাজা দেন। ক্ষতি কি বিজ্ঞানের বই কিছু কম করে? জীবনের তথ্যগুলো বিজ্ঞানে শ্লীল আর সাহিত্যে অশ্লীল এটা কি একটা মান্য করবার মতো যুক্তি? এ যুক্তি পরিত্যক্ত না হলে সাহিত্যের বাড় থেমে যাবে।

"সত্য কখনো শ্লীল অশ্লীল হতে পারে না। তবে তার পরিবেশন শ্লীল অশ্লীল হতে পারে।" এ হলো আমাদের স্বনামধন্য এক লেখিকার উক্তি। বিষয়ে তাঁর আপত্তি নয়। ভাষায় ও ভঙ্গীতে আপত্তি। এক্ষেত্রে আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারিনি। কারণ তা হলে জেমস জয়েস, ডি এইচ লরেন্স প্রমুখ যুগান্তকারীদের উপর নিষেধাজ্ঞা বা দণ্ডাদেশ সমর্থন করতে হয়। পরবর্তীকালে তাঁদের দুষ্কৃতিই হয়েছে তাঁদের কীর্তি। সাহিত্যে কী ছিল না, তাঁরাই প্রথম এনে দিলেন, কেন সত্যকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে এলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ও আর সকলের মুক্তি ঘটালেন ভাবীকালের পাঠক এই লাইনেই বিচার করবেন। পরিবেশনের স্বাধীনতায় আপত্তি করবেন না।

সাহিত্যে যাকে শ্লীল অশ্লীল বলা হয়ে থাকে আসলে তা সাহিত্যের উপর সমাজনীতির আরোপ। সমাজের পক্ষে যা শুচি তারই নাম শ্লীল, যা অশুচি তারই নাম অশ্লীল। তার সঙ্গে কিছুটা রুচির প্রশ্নও জড়িয়ে থাকে। ভদ্র ও ভদ্রাদের রুচি। শিল্পীরাও সামাজিক মানুষ, তাঁদের রুচিও ভদ্রজনের রুচি, কিন্তু কিসের দাবীকে তাঁরা অগ্রাধিকার দেবেন? সত্যের দাবীকে না সমাজহিতের দাবীকে, সৌন্দর্যের দাবীকে না ভদ্ররুচির দাবীকে? নিশ্চয় সত্যের ও সৌন্দর্যের দাবীকে।

যেমন সাদা আর কালো বলে দুটি মাত্র রং নেই, মাঝখানে নীল লাল হলদে প্রভৃতি আরো অনেকগুলি রং বা শেড, তেমনি শুচি আর অশুচি, ভালো আর মন্দ, সুরুচিকর আর কুরুচিকর বলে দুটিমাত্র গুণ নেই, মাঝখানে আছে আরো কতরকম গুণ বা স্তর। পাপ পুণ্যের মাঝখানেও তেমনি। আমরা যে-জগতের বা যে-জীবনের কথা বলি সে-জগৎ বা সে-জীবন দুটিমাত্র রং দিয়ে আঁকা যায় না। আঁকলে তার প্রতি সুবিচার করা হয় না। সমগ্রতার উপর নজর রেখে

আঁকতে বসলে নীতিনিপুণ বা রুচিরোচন অঙ্কনরীতি পরিহার করতে হয়। তা বলে নীতির দাবী বা রুচির দাবী উড়িয়ে দেবার নয়। সামাজিক মানুষ হিসাবে আমরা নীতির দাবী মানতে বাধ্য। তেমনি ভদ্রজন হিসাবে রুচির দাবী। কিন্তু যখন আমরা স্রষ্টা তখন আমরা বিশ্বস্রষ্টার দোসর। তখন আমাদের সামনে আরো বড়ো দাবী।

তিরস্কার বা পুরস্কার, রাজদণ্ড বা রাজপ্রসাদ স্রষ্টার কাছে এসব গণনা অবান্তর। এসব লোক কেই বা ক'দিন থাকবে! সৃষ্টির আয়ু আরো বেশী। আমাদের যে সৃষ্টির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এর যেন সদ্ব্যবহার করতে পারি। নয়তো যিনি দিয়েছেন তিনিই কেড়ে নেবেন। আর্টের নিঠুরা দেবীর করুণা লাভ করা কি সহজ কথা! কে তাঁকে অশ্লীলতা দিয়ে ভোলাবে! আর কেই বা শ্লীলতা দিয়ে!

নিষিদ্ধ সৃষ্টি

সভ্য সমাজে বাস করতে হলে সারাক্ষণ পোশাক পরে থাকতে হয়। যাতে নগ্নতা ঢাকে। যাতে দর্শকের দৃষ্টি পীড়িত না হয়। তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে। তাঁর মনে বিকার না জন্মায়। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষকে অল্পসল্প অসংবৃত হতে দেওয়া হলেও নারীর বেলা সর্বাঙ্গ মুড়ে রাখাই বিধি।

গত শতাব্দীর ইউরোপে এ নিয়ে প্রতিবাদ ওঠে। বর্তমান শতাব্দীতে মেয়েদের পোশাক এত বেশী সংক্ষিপ্ত হয়েছে যে রাণী ভিক্টোরিয়া দেখলে মূর্ছা যেতেন। তবে পুরুষদের পোশাক তার সঙ্গে পাল্লা রেখে বদলায় নি। শোধরানোর প্রস্তাব যতবারই উঠেছে রক্ষণশীলতা বাধা দিয়েছে। মেয়েদের তুলনায় ছেলেরাই এখন পর্দানশীন। অথচ প্রাচীন গ্রীকদের বেলা পুরুষরা ছিল অনেকটা মুক্তদেহ।

নগ্নতার সেই যে গ্রীক আদর্শ সেইটেই ইউরোপীয় শিল্পের মন জুড়ে রয়েছে। মাঝখানে খ্রীস্টান সাধুদের কবলে পড়ে শিল্পীরা গ্রীক আদর্শ ভুলেছিলেন। কিন্তু রেনেসাঁস এসে তাঁদের চোখের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে দেয়। নগ্ন পুরুষ মূর্তি গড়তে কারো বাধে না। দেখতে কারো আপত্তি খাটে না। কিন্তু নগ্ন নারী মূর্তি আঁকতে আরো তিন চার শতাব্দী লেগে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিবসনা নারী আঁকার রেওয়াজ সেই যে শুরু হয় আজো তার বিরাম নেই।

তবে হ্যাঁ, দর্শকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে একটা ডুমুরের পাতার বা সেই জাতীয় আবরণের দরকার হয়। একখানা হাত দিয়ে হয়তো চাপা দেয়। তা সত্ত্বেও যা দেখবার তার কতক দেখা যায়। বড়ো বড়ো মিউজিয়ামে এসব চিত্র সযত্নে সংরক্ষিত হয়। লোকে দর্শনী দিয়ে প্রবেশ করে। লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে ধনীরা এসব কিনে ঘর সাজান। প্রখ্যাত শিল্পীরা সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্য

মিশিয়ে যা গড়েন যা আঁকেন তাকে অশ্লীল বলে অভিযুক্ত করলেও সে অভিযোগ ধোপে টেকে না। যেটা টেকে সেটা ওই সৃষ্টির হয়ে ওঠা। সভ্যতার পর সভ্যতা ফৌত হয়ে গেছে, তবু শিল্পসৃষ্টি এখনো অম্লান। কারণ সে যে কথা বলছে তা সভ্যতার চেয়েও গভীরতর স্তরের কথা।

সভ্য সমাজ মাত্রেই পোশাকী সমাজ। মানুষ রেখে ঢেকে কথা বলে। রেখে ঢেকে ব্যবহার করে। সব সময় সেজেগুজে থাকে। কেবল দেহের দিক থেকে নয়, মনের দিক থেকেও। এটাও একপ্রকার অভিনয়। এই যে কৃত্রিমতা এরই উপর দাঁড়িয়ে আছে সভ্য মানুষের ব্যবহারিক জীবন। তা হলে কি এই জীবনই হবে আর্টের জীবন?

সমাজ হয়তো এর উত্তর একভাবে দেবে। কিন্তু আর্ট সেইভাবে নাও দিতে পারে। সমাজ হয়তো বলবে সভ্যসমাজে বাস করতে হলে মিথ্যার সঙ্গে আপোস করা চাই। নয়তো মরবে। কিন্তু আর্ট তেমন কথা বলতে রাজী নয়। বললে বাঁচবে না। তেমনি সৌন্দর্য সম্বন্ধে সমাজ হয়তো বলবে বসনভূষণ যত গুরুভার হয় তত সুন্দর দেখায়। আর্ট বলবে যত লঘুভার হয় তত মনোহর। নাচতে নাচতে সম্পূর্ণ নিরাভরণ ও নিরাবরণ হওয়াই সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা।

ব্যবহারিক জীবনে লোকলজ্জা একটা প্রধান গণনা। কিন্তু আর্টের জীবনে তা নয়। আর্ট যদি লোকলজ্জার ভয়ে জড়সড় হয় তবে তার থেকে জীবনটাই বাদ পড়ে। একটা অলীক অবাস্তব সামাজিক ছলনা বা খেলা কখনো আর্টের জগতে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। যা সমাজের চোখে রেস্‌পেকটেবল তা আর্টের চোখে সুন্দর বা সত্য হবে এটা দুরাশা। সমাজের চোখে যা শিব তা যে শিল্পীর চোখেও শিব এমন প্রত্যাশাও অত্যাশা।

আসলে এসব শিল্পীর সহজ ও ইনটুইশনের উপর ছেড়ে দিলে ভালো হতো। তাকেও ঘরসংসার করতে হয়। তাই সেও সব কথা খোলাখুলি বলে না। হাতে রেখে বলে। কিন্তু বলতে চাইলে বলার অধিকার তার আছে। সমাজ হয়তো একদিন নগ্ন সত্য ও নগ্ন সৌন্দর্যকে স্বীকৃতি দিয়ে শিল্পীকে অভয় দেবে। হাজার হাজার বছর এখনো সামনে পড়ে আছে। সভ্যতা যদি পোশাক-পরিচ্ছদের বাহুল্য থেকে মুক্ত হয় তবে শিল্পও প্রকৃতির আরো নিকটবর্তী হবে।

আমাদের যুগে আর্টের উপর সভ্যতার কৃত্রিমতা চাপানোর বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ ধূমায়িত হচ্ছে। ইচ্ছে করেই এমন সব বিষয়ে লেখা হচ্ছে যা নিষিদ্ধ, এমন ভাষায় লেখা হচ্ছে যেটা ব্রাত্য। বিদ্রোহের মূলে যদি আমরা যাই ও বিদ্রোহের তাৎপর্য বুঝে তার বক্তব্য মেনে নিই তা হলে নৌকার পালের থেকে বাতাস কেড়ে নিতে পারব। যাঁদের অকারণে বীর বা শহীদ করে তোলা হচ্ছে তাঁরা "না" কথাটার উত্তরে "না" কথাটি বলছেন। প্রথম "না"-টি ফিরিয়ে নাও। তা হলে দ্বিতীয় "না"-টিও ফিরে যাবে।

তর্কটা অনেকটা এইরূপ। "তোমরা এসব কথা লিখতে পারবে না। এমন ভাষায় লিখতে পারবে না। খবরদার!"

"আমরা এইসব কথাই লিখব। এমনি ভাষাতেই লিখব। দেখি কতদিন ঠেকাতে পারো!"

"সমাজের সর্বনাশ হবে। সাহিত্যের সপিণ্ডীকরণ হবে।"

"সমাজ বলতে কতকগুলি নাবালক নাবালিকা নয়। আর সাহিত্য অত ক্ষীণায়ু নয়।

"দাঁড়াও, পুলিশ ডাকছি। আদালতে নালিশ ঠুকছি।"

"সাহিত্যবিচার ওঁদের কর্ম নয়। ওঁরা বিচারের নামে অবিচারই করবেন।"

সাহিত্যের বা শিল্পের অন্তিম বিচার সরকার বা আদালতের হাতে নয়, পাঠকের বা দর্শকের হাতে। পাঠক যদি পড়তে চান কেউ তাঁকে নিরস্ত করতে পারেন না। তেমনি দর্শককে। একদিন না একদিন নিষিদ্ধ বই বা ছবির প্রচার হয়। বরঞ্চ নিষিদ্ধ বলেই একটু বেশী করেই হয়। নাবালক ও নাবালিকাদের রক্ষা করার জন্যে বালির বাঁধ তখন কোথায় ভেসে যায়। তা বলে কি তারা ডুবে মরে? তেমন কোনো দুর্ঘটনার খবর আমাদের জানা নেই।

কোন্ সৃষ্টি সত্যিকার সৃষ্টি আর কোন্ সৃষ্টি অনাসৃষ্টি তা বিষয় অনুসারে নির্দিষ্ট হতে পারে না। ভাষা অনুসারেও না। অনাসৃষ্টি আপনার কবর আপনি খোঁড়ে। তার জন্যে ঘটা করে কবর খুঁড়তে হয় না। আর সত্যিকার সৃষ্টি একটা কিছু বলতে এসেছে। তাকে তার বক্তব্য বলতে না দিয়ে কণ্ঠরোধ করলে শ্রোতারাই একদিন তার পক্ষ নেবেন। জনমতই তার বাণী শুনতে চাইবে।

তা হলে কি অশ্লীলতারই জিৎ! না, জয়টা অশ্লীলতার নয়। জয়টা নবজাতকের। যার অঙ্গে হয়তো জন্মের আনুষঙ্গিক পঙ্ক। সেটা প্রকৃতির সঙ্গে মেলে। সভ্যতার সঙ্গে না মিলুক। সভ্য ভব্য হতে গিয়ে প্রকৃতির কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়াই ভ্রান্তি। অমন করে কাগজের ফুল তৈরি হয়। মাটির ফুল ফোটানো যায় না। 'শুদ্ধি', 'শুদ্ধি' করে সৃষ্টির গায়ে হাত দিতে গেলে দশের লাভ হয়তো কিছু হবে, কিন্তু সৃষ্টির প্রতিভা যাঁদের নেই, সৃষ্টির মালিক যাঁরা নন, তাঁরা কি প্রকৃত অধিকারী না অনধিকারী? প্রকৃত অধিকার যাঁর তিনি হয়তো কিছু অনিষ্টই করবেন, কিন্তু অনধিকারীকে দিয়ে যা হবে তা সৃষ্টির উৎসমুখে জগদ্দল পাষাণ চাপানো।

ধর্মের নাম করে, নীতির নাম করে মধ্যযুগে এটা হয়েছে। এখন হচ্ছে সমাজের নাম করে, রুচির নাম করে। এতে সমাজ রক্ষা হয়, কিন্তু সৃষ্টি রক্ষা হয় না। আর আমাদের এই আধুনিক যুগে বলবার মতো কথা এত বেশী আর এত রকম যে কয়েকটি নীতিকথা বা তত্ত্বকথা যেমন সাহিত্যের বা আর্টের সম্বল হতে পারে না তেমনি কয়েকটি ধরাবাঁধা সামাজিক ধারণাকে 'শুদ্ধ' আর অবশিষ্টকে 'অশুদ্ধ' বলে সাহিত্যের বা আর্টের সীমা সঙ্কুচিত করা সঙ্গত হবে না। আর ভাষা তো ভাবেরই উপযোগী হবে। অনুপযোগী হলে শুদ্ধ ভাষারই বা মূল্য কী? অনেক ক্ষেত্রে অশ্লীল ভাষাই উপযোগী ভাষা।

পাঠকের হাতে একটা মোক্ষম অস্ত্র আছে। তিনি না পড়তে পারেন। সেই যে না পড়া সেটাই লেখকের পক্ষে মারাত্মক। পাঠকরা যদি অমনোযোগী বা অসহযোগী হন তা হলে লেখকের উৎসাহ নিবে যায় ও তিনি পাঠকের সঙ্গে সন্ধি করতে উদ্যোগী হন। এমন লেখক নেই যিনি পাঠকদের বিতৃষ্ণাকে ভয় না করেন।

তবে এমন লেখকও আছেন যিনি বিশ্বাস করেন যে তাঁর বক্তব্য অবিকৃত ভাবে ব্যক্ত করে যাওয়াই তাঁর কর্তব্য। এ যুগে কেউ কান না দিলেও পরবর্তী যুগে দিতে পারেন। লেখা তো কেবল আজকের জন্যেই নয়। কালকের জন্যেও। সেইজন্যে একালের পাঠকদের ওই যে মোক্ষম অস্ত্র তাতে তিনি ডরান না। অবশ্য তাঁর সাংসারিক ক্ষতি কিছু হয়। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির অঙ্গে আঁচড়টি লাগে না। যদি সত্যি তাঁর লেখায় সত্য থাকে, সৌন্দর্য থাকে।

সাধারণত আপত্তি যাঁরা করেন তাঁরা সত্যের দিক থেকে বা সৌন্দর্যের দিক থেকে করেন না। করেন শিবের দিক থেকে। অর্থাৎ সমাজের মঙ্গলের দিক থেকে। বহুজনের হিতের দিক থেকে। তাঁদের কেবলি ভয় আগুন লেগে কারো ঘর না পুড়ে যায়। কারো মাথা না বিগড়ে যায়। কিন্তু বাইবেল বা পুরাণ পড়েও কি কারো অধঃপতন ঘটে না? ঘটতে পারে না? আমার হাতের কাছে রয়েছে স্বর্গীয় সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের "পৌরাণিক অভিধান" আর স্মিথ রচিত "স্মলার ক্লাসিকাল ডিকসনারী"। গ্রীক ও রোমক পুরাণের নির্যাস। দেবদেবী, বীর বীরাঙ্গনা, ঋষি ঋষিপত্নী, রাজা রানী, গন্ধর্ব অপ্সরা প্রভৃতি বিচিত্র চরিত্রচিত্র। তার মধ্যে ভালো মন্দ দুই আছে। মন্দকে বাদ দিয়ে ভালোটুকু পরিবেশন করা যেত নিশ্চয়, কিন্তু প্রাচীন কবিরা সে যুক্তি গ্রাহ্য করেন নি। সেইজন্যে চরিত্রগুলি এমন জীবন্ত হয়েছে। কোনো একটি মানুষ নির্জলা মন্দও নয়, নিপাট ভালোও নয়। দেহ যখন আছে তখন দেহের আনুষঙ্গিক রিপুগুলোও আছে। তাদের বাদ দিয়ে শুদ্ধি ঘটানো যেন জীবনকে বাদ দিয়ে মৃত্যু ঘটানো।

সরকার বা স্মিথ তেমন শুদ্ধিকর্ম করতে যান নি। পুরাণকর্তারা তো শুদ্ধিকর্মের কথা ভাবতেই পারেন নি। ইন্দ্র, চন্দ্র, বৃহস্পতি, তারা, কেউ মৃত নন। জীবিত প্রাণীর মতো-ই তাঁদের জীবনেও প্রবৃত্তির তাড়না এসেছে, তাঁরা নিবৃত্ত হননি, যা করে বসেছেন তা অকরণীয়। কিন্তু অকরণীয় বলেই কি অকথনীয়? অপ্রকাশনীয়? নইলে সমাজের অহিত হবে? বালকবালিকারা উৎসন্ন যাবে? লোকের পাপে মতি হবে?

লোকের যেমন পাপে মতি হতে পারে, তেমনি পুণ্যে মতি হতেও পারে। কারণ মহত্ত্বের কথাও তো বিস্তর বর্ণিত হয়েছে। পাপ যারা করেছে পুণ্যও তারা করেছে। আস্ত একটা চরিত্র ভালোমন্দ দুই করে। ভালোর দিকটা যদি কেউ আদৌ না দেখেন বা না দেখান তবে তাঁর সেই ত্রুটি তাঁর সৃষ্টির অঙ্গহানি ঘটাবে। শিল্পী বা সাহিত্যিক হয়ে থাকলে তিনি তাঁর সৃষ্টির অঙ্গহানি কখনো পছন্দ করবেন না। নিজের ত্রুটি নিজেই সংশোধন করবেন।

তাঁর ভুল যদি কোনোদিন না শোধরান তবে বুঝতে হবে তাঁর দৃষ্টিটাই ভ্রান্ত। তাঁর অনাসৃষ্টি কোথায় তলিয়ে যাবে !

সোনার জহুরী

বাউলদের মুখে শোনা যায়—

"কমলবনে কে আসিল সোনার জহুরী
নিকষে কষয়ে কমল আ মরি আ মরি !"

জহুরীও ভালো, নিকষও ভালো, কিন্তু কমলের পক্ষে নয়, সোনার পক্ষে। এই সামান্য কথাটা মনে থাকলে সোনার সমঝদার যিনি তিনি কমলের সমঝদার হতে রাজী হতেন না। কিন্তু কথাটা তাঁরও মনে থাকে না, যাঁদের চোখে সোনার দামই বেশী তাঁরাও মনে করিয়ে দেন না। তাই অনেক সময় সোনার জহুরী এসে কমল পরীক্ষা করেন।

নীতির বেলা বা আইনের বেলা বা সাংসারিক লাভ-লোকসানের বেলা যাঁর বিচার শিরোধার্য রুচির বেলা তাঁর রায় হয়তো নির্ভরযোগ্য নয়। আবার রুচির বেলা যাঁর অভিমত নির্ভরযোগ্য তিনিও হয়তো শিল্পকর্মের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্যক অবগত নন।

বিধাতা আমাকে যেমনটি করে গড়েছেন আমি তেমনিটি। তার চেয়ে ভালোও নই, তার চেয়ে খারাপও নই। আমি যদি আমার প্রকৃতির প্রতি সত্য হয়ে থাকি তবে আমি যা হবার তাই হয়েছি। আমাকে আরো ভালো করতে গিয়ে অসত্য করে তোলা বিধাতার অভিপ্রায় নয়। তা যদি হতো তবে তিনি আমাকে না গড়ে আরেকজনকে গড়লেই পারতেন। আমাকে যারা চায় তারা আমার স্বকীয়কেই চায়, আমার উত্তমকে নয়।

উপরে যা বলা গেল তা যেমন প্রত্যেকটি মানুষের ক্ষেত্রে খাটে তেমনি প্রত্যেকটি শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে। কাব্য যদি তার প্রকৃতির প্রতি সত্য হয়ে থাকে তবে যা হবার তাই হয়েছে। তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয়ে থাকে তবে সে যেমনটি হয়েছে তেমনিটিই ভালো। চিত্র বা নৃত্য সম্বন্ধেও সেই কথা।

এক একটি সৃষ্টি এক একটি বিশেষ রূপ ধারণ করে আসে। সঞ্চার করতে আসে এক একটি বিশেষ রস। বিশেষেরও একটা মূল্য আছে। সেইজন্যেই তার এত আদর। আর-সব গুণ বাড়তি গুণ। নীতির দিক থেকে রুচির দিক থেকে অনবদ্য হলে সেটা হবে বাড়তি গুণ। আইনের দিক থেকে, বাজারের দিক থেকে মার না খেলে সেটাও হবে তেমনি বাড়তি গুণ।

কিন্তু যেখানে বিশেষ বলে কোনো রস বা রূপ নেই সেখানে ভালো বলে একটি গুণ তার জায়গা নিতে পারে না। নীতিবোধ যাকে ভালো বলে রসবোধ বা রূপবোধ হয়তো তাকে নিয়ে কিছু একটা সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়।

সাহিত্যে ইতিপূর্বে এত বেশী নীতিমূলক কাহিনী বা কাব্য লেখা হয়ে গেছে যে নীতির গন্ধ পেলেই একালের পাঠকরা দৌড় দেন। তেমনি রুচিতেও অরুচি ধরে গেছে অনেকের। গুছিয়ে লেখা দেখলেই সন্দেহ হয় যে বানিয়ে লেখা। বানিয়ে লেখার উপরেও অনেকে ক্ষিপ্ত। জীবন যদি মসৃণ না হয় তো সাহিত্য মসৃণ হবে কী করে! এলোমেলো এবড়োখেবড়ো রচনাই তাঁদের পছন্দ। চেতনার স্রোত বলা হয় যাকে তার গতি আঁকাবাঁকা উল্টোপাল্টা মাথামুণ্ডুহীন।

এমনি করে এসেছে অ্যাবসার্ড নাটক। সোনার জহুরীদের সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। হাজার চেষ্টা করেও সে নাটকের সংস্কার ঘটানো যায় না। তাকে তারো ভালো বা কম মন্দ করা অসম্ভব। নাটকের সঙ্গে ঝগড়া করে কী হবে! জীবনটাই অ্যাবসার্ড। তার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাও তো করো গে।

অ্যাবসার্ড নাটকের একটা বিশেষ রস আছে। সেইজন্যে তা সাহিত্যের ঘরের জিনিস। তার বিচার হবে সাহিত্যের নিজস্ব নিকষে। সেটা দিয়ে শুধু সাহিত্যের পরীক্ষা হয়, সোনার পরীক্ষা হয় না। জীবনের এক এক বিভাগের জন্যে এক এক নিকষ আছে। নীতির নিকষ বিজ্ঞানে অচল। বিজ্ঞানের নিকষ সাহিত্যে অচল।

কোথাও হয়তো একটা সবতাল চাবী আছে, যা দিয়ে সব ক'টা তালা খোলা যায়। জীবন যদিও বহুধা বিভক্ত তবু মূলে তো এক। নিকষও তা হলে একটাই হবে না কেন? কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা সেই সবতাল চাবীর সন্ধান পাইনি। ধর্মকেই এককালে সর্বক্ষেত্রের উপযোগী নিকষ মনে করা হতো। ধর্মের জহুরীদের বিচারই ছিল শেষ বিচার। কিন্তু মানব ইতিহাসের সেই স্বর্ণযুগ এখন বহু পশ্চাতে পড়ে আছে।

মাঝখানে ধর্মের স্থান নিতে চেষ্টা করেছিল নীতি। কিন্তু নীতির জহুরীরাও বিকল্প কিছু সৃষ্টি করতে বা করাতে পারেন নি। নেতি নেতি বলে তৈরি জিনিসকে বাতিল করা এক, ইতি ইতি বলে নতুন জিনিস তৈরি করে তোলা আরেক। নীতির বিচারে যেটা নিখুঁত বলে গণ্য হলো লোকে তার দিকে ফিরেও তাকাল না। দেখা গেল পাপের উপরেই তাদের পক্ষপাত, অবশ্য পাপের জন্যে অনুতাপ বা শাস্তিবিধান থাকারও তারা পক্ষপাতী। পাপ জিতে যাবে এটা তো তারা চায় না। পাপও থাকবে, পাপের পরাজয়ও থাকবে। আর নয়তো পাপের থেকে পরিত্রাণ।

টলস্টয় ডস্টয়েভস্কির যুগ ছাড়িয়ে আমরা অনেকদূর চলে এসেছি। পাপ দেখতে চাইলে যতখুশি দেখাতে পারি, কিন্তু পাপের জন্যে অনুতাপ বা শাস্তিবিধান বা তার থেকে পরিত্রাণ কি জীবনে দেখতে পাই যে সাহিত্যে দেখাব? সে ভার জীবনবিধাতার উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো। তিনি হয়তো একভাবে না একভাবে শাস্তি দেন, আমরা খোঁজ রাখিনে। পরিত্রাণও ঘটে হয়তো। আমরা খবর পাইনে। বাধ্য হয়ে মানতে হয় সেই দর্শন যে বলে পাপই পাপের পরিণাম পুণ্যই পুণ্যের পুরস্কার।

পাপ পুণ্যের মাঝখানে অনেকগুলি স্তর। যেমন শাদা কালোর মাঝখানে অনেকগুলি রং। আধুনিক শিল্পী চরমপন্থী নন। তিনি মধ্যপন্থী। তিনি সহসা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হন না। শেষটা অনির্দিষ্ট রেখে দেন। 'মরাল' ও 'ইম্‌মরাল' ছাড়া আরো একটা কথা আছে। তাকে বলে 'আমরাল'। আজকালকার আর্টে 'আমরাল' চারদিকে ছড়ানো। কিন্তু তাকেই লোকে ভুল করে ঠাওরায় 'ইম্‌মরাল'। কারণ বহুদিন থেকে লোকের সংস্কার যা ভালো নয় তা মন্দ। ও ছাড়া যে আরো একটা কথা আছে এটা তাদের সংস্কার-বিরুদ্ধ।

সমাজে যেমন কতকগুলি জাতকে যুগ যুগ ধরে অস্পৃশ্য ও অশুচি বলে বর্জন করা হয়ে এসেছে সাহিত্যেও তেমনি কতকগুলি বিষয়কে ও শব্দকে। এসব বিষয়ে লেখা যায় না, এসব কথা লেখনীর মুখে আনা যায় না। এরা অবদ্য, এরা অনুচ্চারণীয়।

বিংশ শতাব্দীর সমাজভাবনা স্বীকার করে না যে হরিজনরা মন্দিরে প্রবেশ করলে মন্দির অপবিত্র হবে বা বিগ্রহকে স্পর্শ করলে বিগ্রহ অপবিত্র হবে। ওরাও তো মানুষ। এ কেমন মন্দির যে মানুষের দ্বারা অপবিত্র হয়! এ কেমন দেবতা যে মানুষ এঁকে অপবিত্র করতে পারে! উল্টে পবিত্র করার সাধ্য কি মন্দিরেরও নেই! দেবতারও নেই!

সাহিত্যেরও সেই একই জিজ্ঞাসা। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের সদর দরজা দিয়ে এমন সব বিষয় আর শব্দ নিত্য প্রবেশ করছে যারা খিড়কি দিয়ে অনুপ্রবেশ করতেও সাহস পেতো না। এখন কেউ অপাঙ্‌ক্তেয় বলে সরাসরি বহিষ্কারযোগ্য নয়। সমাজভাবনার মতো সাহিত্যভাবনাও আজকের দিনে আর আচারসর্বস্ব নয়, সেও বিচারসম্পন্ন। বিচারও আর কাজীর বিচার নয়, ইতিমধ্যে অনেকরকম সূক্ষ্ম প্রশ্ন উঠেছে। কাজীরাও ততটা নিশ্চিন্ত নন, যতটা আগে ছিলেন। এক দেশের কাজীর রায় আরেক দেশের কাজী মানতে চান না। এক যুগের কাজীর রায় আরেক যুগের কাজী রদবদল করেন।

ভগবান কারো মুখ চেয়ে সৃষ্টি করেন নি। ধ্বংসও যখন করেন তখন কারো মুখ চেয়ে নয়। শিল্পীরাও যে যার আপন সীমানার মধ্যে সৃষ্টি করে থাকেন। বিশ্বের এক একটি প্রকোষ্ঠে শিল্পীরাও স্রষ্টা। তাঁরাও কারো মুখ চেয়ে সৃষ্টি করার পাত্র নন। যাঁর পছন্দ হবে না তিনি পড়বেন না বা দেখবেন না। কিন্তু সাধারণত পাঠকের বা দর্শকের অভাব হয় না। বরঞ্চ তাঁদের ঠেকিয়ে রাখবার জন্যেই বই বাজেয়াপ্ত বা নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু আখেরে ঠেকিয়ে রাখা যায় কি? পড়বার মতো হলে লোকে পড়বেই, দেখবার মতো হলে দেখবেই। হয়তো তারপর ফেলে দেবে। কিন্তু পরের কথায় ফেলে দেবে না।

মুসলমানদের মধ্যে একটা কথা আছে—

"মিঞা বিবি রাজী
কী করবে কাজী?"

লেখক ও পাঠক যদি একমত হন তা হলে সমালোচক বা বিচারক বা

সরকার কীই বা করতে পারেন! মিঞা আর বিবি যেমন বিয়ে করতে চাইলে বিয়ে করেন লেখকও তেমনি লেখেন, পাঠকও তেমনি পড়েন, কারো জন্যে কিছু আটকায় না।

"লেডী চ্যাটার্লিজ লাভার" এখন ইংরেজরা লাখে লাখে পড়ছে। বকে যাবার ভয় ভেঙে গেছে। ভয়টা যে অমূলক ছিল তা আমি বলব না। কমবয়সীরা সত্যি বকে যেতে পারত। এখনো পারে। ভবিষ্যতেও পারবে। কিন্তু তা বলে প্রাচীন মূর্তির গায়ে তো কেউ ঘেরাটোপ জড়িয়ে রাখে না। সমাজকে ভয় অতিক্রমণের শক্তি অর্জন করতে হয়। এটা রসের খাতিরে, রূপের খাতিরে। নয়তো কোণার্ক বা খাজুরাহো আর কখনো গড়া হবে না।

"লেডী চ্যাটার্লি"র কথাই ধরা যাক। ওর সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, ও বই লেখার সত্যি কি কোনো দরকার ছিল? দরকার ছিল মেনে নিলে দ্বিতীয় প্রশ্ন ওঠে, ও ভাবে না লিখে কি অন্যভাবে লেখা যেত না? ও ভাষায় না লিখে অন্য ভাষায়? ওই যে প্রশ্ন দুটি ওদের উত্তর দিতে পারতেন একমাত্র লরেন্স। তাঁর অবর্তমানে দিতে পারেন লরেন্সের পক্ষপাতী পাঠক, যদি পাঠকদের পাঠ করার সুযোগ দেওয়া হয়। সুযোগ পাবার পর ইংলণ্ডের পাঠকদের ব্যবহার দেখে মনে হয় তাঁরা প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন "হাঁ", আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে "না"।

যে কোনো সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে ওই দুটি প্রশ্নই সত্যিকার প্রশ্ন। বিচারকরা যদি বিচারকের আসনে না বসে পাঠকের স্থানে বসেন তা হলে তাঁদের সেই পাঠকসত্তাই সত্যিকার উত্তর দেবে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় তাঁরা সমাজের মুখ চেয়ে নীতিবোধের নিকষ হাতে নিয়ে রুচিবোধের দ্বারা চালিত হয়ে বিচার করেন। চূড়ান্ত মীমাংসার ভার কিন্তু কাজীর উপর নয়, বিবির উপর। রসিকের উপর।

আর্টের উদ্দেশ্য

আর্টের উদ্দেশ্য কী?

এর পাল্টা প্রশ্ন, প্রকৃতির উদ্দেশ্য কী?

একমাত্র প্রকৃতির সঙ্গেই আর্টের প্রতিতুলনা। আর্টের কথা ভাবলে নেচারের কথা মনে আসে। আবার নেচারের কথা ভাবলে আর্টের কথা। মানুষ বলে আরেকজন না থাকলে প্রকৃতি একাই থাকত। এটা হতো একমাত্র প্রকৃতির জগৎ। মানুষ এসেছে তার সৃষ্টির অমিত শক্তি নিয়ে। প্রকৃতির মতোই সে অকৃপণ ও সর্বক্ষণ সক্রিয়। এটা তাই মানুষেরও জগৎ।

কিন্তু মানুষ যদি শ্রান্ত হয়ে ক্ষান্তি দেয় তা হলে আর মানুষের জগৎ বলে কিছু থাকবে না। থাকবে শুধু প্রকৃতির জগৎ। প্রকৃতির শ্রান্তি নেই। ক্ষান্তি নেই। মানুষ যদি প্রকৃতির কাছ থেকে প্রকৃতিরই মতো অশ্রান্ত

অক্ষান্ত থাকার রহস্যটি আয়ত্ত করতে পারে তা হলে মানুষেরও শ্রান্তি নেই, ক্ষান্তি নেই। সেও অনন্তকাল সৃষ্টি করে যেতে পারবে।

প্রায় প্রত্যেক যুগসন্ধিতে একবার করে প্রকৃতির কাছে ফিরে চলার রব ওঠে। কিন্তু সভ্যতা মানুষকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে যে প্রকৃতির সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে নেবার সাধ্য তার ক্ষীণ। আরো প্রাকৃতিক না হয়ে সে তাই আরো সভ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সেটা যে আর্টের দিক থেকেও অগ্রগতি তা নয়। কারণ আর্টের দিক থেকে সে হয়তো ক্লান্ত বা নিঃশেষিত। তখন তার নূতনত্ব সাধারণত পদ্ধতির বা ঘটনার। আর নয়তো বিকৃতির।

প্রকৃতির থেকে দূরে সরে গেলে আর্ট তার উদ্দেশ্য থেকেও দূরে সরে যায়। তখন আর্ট হয় উদ্দেশ্যহীন কেরামতী। প্রকৃতি তো কোনোদিন কেরামতীর চেষ্টা করে না। প্রকৃতির রাজ্যে কেরামতী বলে কিছু নেই। প্রকৃতির সমস্তটাই লীলা। প্রকৃতির উদ্দেশ্য ওই এককথায় বলা যায়—লীলা।

তেমনি আর্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে লীলা।

যে কোনো একটি খেলার মতো তার নিয়মকানুন খুব কড়া। সেসব মেনে না নিলে খেলা জমে না। কিন্তু খেলার শেষে বোঝা যায় তার সার্থকতা আছে। খেলোয়াড়রা খেলায় সুখ পান নিয়মকানুন মেনে ও তার ঊর্ধ্বে উঠে। তেমনি লীলারও নিয়মকানুন আছে। সেসবও কম কড়া নয়। যদিও অনেক সময় আমরা না জেনেই মেনে চলি। লিখতে লিখতে লেখা আপনি নিখুঁত হয়।

লীলা তখনি সার্থক হয় যখন সৃষ্টি একটা পরিপূর্ণতায় এসে পৌঁছয়। হয়তো চার লাইনের একটি কবিতা। চৌপদী যার নাম। জাপানী হাইকুর মতো সতেরো সিলেবলও হতে পারে। নির্দিষ্ট একটি সীমার মধ্যেই তার পরিপূর্ণতা। তার সেই সীমা মেনে নিয়ে সে যখন পরিপূর্ণতা পায় তখন তার আকৃতি তাকে আর্ট বলে চিনিয়ে দেয়। আকৃতি বিনা আর্ট নেই। আর্ট বিনা আকৃতি নেই।

আর্টের একদিকে যেমন প্রকৃতি আরেকদিকে তেমনি আকৃতি। প্রকৃতির প্রত্যেকটি সৃষ্টির নিজের একটি আকৃতি আছে। প্রকৃতি যত খুশি সৃষ্টি করে চললেও প্রত্যেকের জন্যে আলাদা একটা আকৃতি বরাদ্দ করতে ভোলে না। তেমনি শিল্পীরাও তাঁদের সৃষ্টির প্রত্যেকটির আকৃতি সম্বন্ধে সচেতন। কোনো সৃষ্টিই নিরবয়ব বা নিরাকার নয়। কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। আকারের সঙ্গে থাকবে আকৃতি।

নৈসর্গিক কবিপ্রতিভা সকলের নেই। কিন্তু আকৃতিজ্ঞান যেমন করে হোক অর্জন করতে হবে। নানা দেশের নানা যুগের সেরা কবিতা পড়তে পড়তে শুনতে শুনতে এ জ্ঞান জন্মাতে পারে। তেমনি ছবি দেখতে দেখতে চিত্রকর-সুলভ আকৃতিজ্ঞান। গান শুনতে শুনতে সঙ্গীতসম্পর্কিত আকৃতিজ্ঞান। মানুষকে জন্মসূত্রে যা দেওয়া হয়েছে তার অভাব যদি কারো জীবনে দেখা যায় তবে তার অভাব পূরণ করে শিক্ষা। এইজন্যে শিক্ষার এত মূল্য। যারা

জাতশিল্পী তাদেরও শিক্ষার দরকার হয়। ঐতিহ্য তো পড়ে পাওয়া যায় না। বড়ো বড়ো প্রতিভাকেও হাতে কলমে পূর্বসূরীদের কাছে শিখতে হয়।

ধারাবাহিকতা যেমন প্রকৃতির বেলা তেমনি আর্টের বেলাও সত্য। বহতা নদীর মতো এর আদি নেই অন্ত নেই। আছে শুধু ধারা। তোমার ইচ্ছা হলে তুমি ধারাভঙ্গ করতে পারো, কিন্তু তা হলেও একটি নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়। আর সে ধারাকে আলাদা করে দেখলেও সে একেবারে নিঃসম্পর্কীয় নয়। যার থেকে সে পৃথক তার ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্র কোথাও এক জায়গায় রয়েছেই। শাখা অসংখ্য হলেও মূলস্রোত একই। ধারাভঙ্গ বার বার ঘটলেও ধারা-বাহিকতা গঙ্গোত্রীর সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করে। ঐতিহ্য যেখানে হারিয়ে গেছে সেখানেও তার সঙ্গে সংযোগ ফিরে পাবার জন্যে প্রাচীনের পুনরুদ্ধার করতে হয়।

কিন্তু পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে পুনরাবৃত্তি নয়। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে যখন আমরা ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে নতুন করে সজাগ হই তখন অজন্তার সঙ্গে জোড় মিলিয়ে নেবার দরকার ছিল। কিন্তু পৌরাণিকের পুনরাবৃত্তি দু'দিনেই নিঃশেষ হতে বাধ্য। কারণ স্বযুগটা পৌরাণিক নয়। ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের পরে আর পুনরাবৃত্তি নয়। নব নব কল্পনা ও নব নব আকৃতি আমাদের ঐশ্বর্যের পরিচায়ক।

দেশের মতো যুগেরও একটা মূলস্রোত আছে। তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে শুধুমাত্র দেশের ধারা বেশীদিন বিচিত্র থাকে না। উনবিংশ শতাব্দী আমাদের কবিদের গঙ্গাস্নানে অভ্যস্ত জীবনকে সমুদ্রস্নান করায়। সমুদ্রের জোয়ার ছুটে আসে গঙ্গার বুকে। তার ফলে যা ঘটে তার নাম আমাদের সাহিত্যের রেনেসাঁস। প্রয়াগের বা হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় বার বার গঙ্গাবগাহন করেও এ ফল লাভ হতো না। আমাদের অনেকেই এ সত্য ইতিমধ্যে ভুলে গেছেন। কুম্ভমেলার সহস্র সহস্র বর্ষের পুনরাবৃত্তি পরম বিস্ময়ের বিষয় হলেও সমুদ্রের একদিনের একটা জোয়ার তার চেয়েও ফলপ্রসূ। তবে ফলপ্রসূ বলতে যাঁরা পরকালে বা পরলোকে ফলপ্রসূ বোঝেন তাঁদের কাছে এ যুক্তি নিষ্ফল।

এ যুগে বাস করলে এ যুগের মূলস্রোতে অবগাহন করতে হয়। সেই মূলস্রোত যদি জোয়ার হয়ে এ দেশের নদীতে প্রবেশ করে তবে তা যদিও উল্টো স্রোত তবু তার সঙ্গে স্বদেশের বহমান স্রোতকে মিলিয়ে নিতে হবে। এটা একপ্রকার সংস্কৃতিবিপ্লব। সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরে এর সঙ্গে যোঝাযুঝি ও বোঝাবুঝি চলেছে। বিংশ শতাব্দীতেও তার শেষ নিষ্পত্তি হয়নি। লক্ষণ দেখে মনে হয় সমুদ্র আমাদের পর আর গঙ্গা আমাদের আপনার এই সংস্কার এখনো একান্ত প্রবল। রেনেসাঁস যদি ভঙ্গীসর্বস্ব হয় তবে তার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে বলতে হবে।

রেনেসাঁস হচ্ছে নতুন প্রাণশক্তির উত্তাল তরঙ্গ। তার রঙ্গ জীবনের অন্যান্য বিভাগের মতো আর্টকেও আন্দোলিত করে। যে তরণী এতদিন নদীর জলে

পাল তুলে ভেসেছিল সে এখন সমুদ্রের জলে দিশাহারা বোধ করে। মাথার উপরে ধ্রুবতারা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। হাতের কাছে থাকে কম্পাস। আকাশ যখন মেঘে ঢাকা তখনো তার দিক্‌নির্ণয়ের ভুল হয় না। ঝড় ঝাপটায় কম্পাসও ভেঙে যেতে পারে। সে সময় তাকে বাঁচাবে কে! সেইটেই বিংশ শতকের মধ্যভাগে যুদ্ধবিগ্রহের ও রাষ্ট্রবিপ্লবের মুখে পড়া তরণীর প্রশ্ন। এ প্রশ্নে ইউরোপই এখন জর্জরিত। জীবন যদি লণ্ডভণ্ড হয় আর্ট কী করে আপনাকে নিয়ে আত্মসমাহিতভাবে বাঁচবে?

কবিদের কাছে জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা আসছে। তাঁদের নিজেদেরও জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা জমছে। এসব জিজ্ঞাসার উত্তর হোমর বাল্মীকি ভার্জিল কালিদাসের দিকে তাকালে পাওয়া যাবে না। ক্লাসিক এখানে নিরুত্তর। রেনেসাঁস যতগুলো ঢেউ তুলেছে ততগুলো ঢেউ ভাঙতে বা ঢেউয়ের পিঠে চড়তে শেখায়নি। সাহিত্য আজকাল সমস্যার অবতারণা করে। সমাধান বলে দেয় না। বলতে পারে না। সমাধানের জন্যে দ্বারস্থ হলে পাশ কাটিয়ে যায়। বলে, "একালের সাহিত্য বেদ বাইবেল কোরান তো নয়ই, কার্ল মার্কসের ডাস কাপিটাল বা মাও ৎ-সে-তুং এর চিন্তাও নয়। কী জবাব দেবে? জবাব জানা থাকলে তো? আজকের যেটা দেবে কালকেই সেটা বাসি হয়ে যাবে। কাল যে কী ঘটবে কেউ তা বলতে পারে না। আমরা দিন আনি দিন খাই।"

কতক লোক যে ধর্মের শরণ নেবে এটা অস্বাভাবিক নয়, এটাই বরং স্বাভাবিক। তেমনি সঙ্ঘের শরণ নেওয়া, তা সে যে কোনো সঙ্ঘই হোক। বুদ্ধের স্থান নিয়েছেন রাজনীতির গণনায়করা। তাঁদের কাছেও লোকে শরণ পায়। কিন্তু আর্ট বা সাহিত্য কাউকে শরণ দিতে অক্ষম। ঐ যে অক্ষমতা ওটা ইচ্ছাকৃত নয়। ধ্রুবতারা অদৃশ্য হলে, কম্পাস অচল হলে তরণী নিজেই দিশাহারা।

তা হলেও কেবল ভেসে বেড়ানো চলবে না। আপনার ভিতর থেকেই প্রত্যয় সংগ্রহ করতে হবে। আর্টের কাছে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর মিলবে না সেকথা ঠিক। কিন্তু আর্ট কেন মিথ্যার ব্যাপারী হবে? আর্টের কাজ সত্যের কাছে সত্যরক্ষা। আমার জীবনের যা সত্য, আমার যা সত্য, তাই আমার হাতে রূপ পাবে। কারো ভয়ে আমি যেন তাকে চেপে না রাখি বা অন্যরকম না করি।

সংকট যতই ঘনিয়ে আসুক না কেন কবি বলে কেউ যদি কেউ বেঁচে থাকেন ও লেখনী তুলে ধরা যদি অসম্ভব না হয় তবে সত্যের কাছে সত্যরক্ষাই তাঁর কাজ। সেইভাবে কাব্যের মধুচক্রে যা জমবার তা জমবে। লোকে একদিন তার আস্বাদন নেবে, কিন্তু সদ্য সদ্য কোনো দুরূহ প্রশ্নের উত্তর পাবে কি না সন্দেহ।

সভ্যতা দিন দিন যেমন জটিল হচ্ছে তাকে সরল করে আনার কোনো উপায় যদি না থাকে তবে আর্ট তাকে কারো কাছে সরল করতে পারবে না।

সরল করতে হলে বাদসাদ দিতে হয়, পরিহার করতে হয়। পপুলার সায়েন্সের মতো পপুলার আর্ট সৃষ্টি করতে হয়। তেমন করে আর্ট অগ্রসর হবে না।

যেটুকু আমার কাছে উপলব্ধ সত্য সেইটুকুতেই আমার অধিকার। আর্টের অতি সামান্য ভগ্নাংশ হলেও সত্যের দিক থেকে তা নিটোল। তেমনি রূপের দিক থেকেও নিখুঁত। হয়তো একফোঁটা চোখের জল, তবু আর্টের মধুচক্রে তারও ঠাঁই আছে। কোনো জিজ্ঞাসার উত্তর না হয়েও সে স্বত্ত্ববান। সে অস্তিত্ববান।

লীলা যাকে বলি তা এই অস্তিত্বের মধ্যে আপনাকে খুঁজে পাওয়া ও ধরে দেওয়া। কার কোন্ কাজে লাগবে জানিনে, তবে এ না হলে আমি বাঁচিনে। আর্ট আমাকে বাঁচায়।

আর্টের খাতিরে আর্ট

'আর্টের খাতিরে আর্ট' বলি যখন, তখন এই কথাটাই বোঝাতে চাই যে আর্ট নয় সামাজিক বা আধ্যাত্মিক বা নৈতিক বা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। আর্ট হচ্ছে আপনি আপনার উদ্দেশ্য। আপনি আপনার উপায়।

এখানে সমাজ বা ধর্ম বা নীতি বা রাজনীতি বা অর্থনীতির গুরুত্ব অস্বীকার করা হচ্ছে না। এর কোনো একটিকে বাদ দিলে বা খাটো করলে সভ্যতা হয় না। কোনো একটির অভাব আর-একটিকে দিয়ে পূরণ হয় না। মানবিক পরিপূর্ণতার শতদল প্রত্যেকটি দলের উন্মীলন চায়। তা বলে কোনো একটিকে আর-সকলের বা আর-একটির উপায় করতে চাইবে কেন? সেও যে একপ্রকার খাটো করা।

আর্ট যদি অপরের বাঁক কাঁধে করে তবে তার নিজের বাঁকটি কাঁধে তুলে নেবে কে? অপরের বাঁক বইতে গিয়ে যদি তার কাঁধ বেঁকে যায় তবে তার গতি হবে কী করে? যাঁরা আর্টের উপর রাজ্যের দায় চাপাতে চান তারা কি মনে করেন যে রসের দায় বা রূপের দায় বলে আর কোনো দায় নেই, থাকলে তার কোনো গুরুত্ব নেই?

অথচ দু'তিন হাজার বছর পরেও যা বেঁচে থাকে তা ওই আর্ট। তাই নিয়ে সভ্যতার গর্ব। বিংশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থার বা তার ওলটপালটের গুরুত্ব ত্রিংশ শতাব্দীর লোক উপলব্ধি করবে না। কিন্তু চিত্রকলার বা সাহিত্যের গুরুত্ব যদি থাকে তবে তার দিকে দু'দণ্ড ফিরে তাকাবে। সভ্যতারও নিরিখ হবে তাই।

এমন যে আর্ট তাকে অন্য কিছুর উপায়ে পরিণত করা হয়তো মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় দেয়, কিন্তু আর্টের নিজস্ব দায়কে খাটো করে। রসের দায় বা রূপের দায়কে লঘু করলে তার যথোচিত অনুশীলন হয় না। ফলে

কীর্তি খর্ব হয়। আর্টকে তার রাজকীয় খাজনা দিয়ে হাতে যদি কিছু বাঁচে তবে সমাজকে বা ধর্মকে দিতে পারো, কিন্তু তার রাজমহিমা না মেনে তাকে দিয়ে ধর্মের বা সমাজের কর্ম করিয়ে নিলে তার রাজকোষে পড়বেই। শিল্পীর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাকে দিয়ে একশো রকম কাজ করিয়ে নেওয়া যায়, যা প্রকৃতপক্ষে শিল্পের কাজ নয়। কিন্তু শিল্পী অসহায় হলেও শিল্প অসহায় নয়। শিল্প তার মর্যাদা দাবী করবেই, না পেলে তার অভাব বোধ করিয়ে ছাড়বেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ঘুরে যাবে, স্মরণযোগ্য বা সংরক্ষণযোগ্য কিছু সৃষ্টি হবে না।

তা বলে কি আর্ট নিঃসম্পর্কীয়? তার তিনকুলে কেউ নেই? না, সে বিচ্ছিন্ন বা নিঃসঙ্গ নয়। জীবনের বিভিন্ন ও বিচিত্র বিভাগের সঙ্গে তার নিবিড় ও সানুরাগ সম্বন্ধ। মহাভারত এর মহত্তম দৃষ্টান্ত। যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে। কুরুক্ষেত্রের যুগের সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, রণনীতি প্রভৃতি সমস্তই রয়েছে মহাভারতে। যৌননীতিও। মহাভারতকারের দৃষ্টি সর্বব্যাপী ও সর্বত্র প্রবিষ্ট। কিন্তু তিনি মহাকাব্য বা মহান উপন্যাস রচনা করতে বসেছিলেন। দর্শন বা সমাজতত্ত্ব, ধর্মশাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্র নয়। যৌনবিজ্ঞান বা যুদ্ধবিদ্যাও নয়। রাজনীতি তো নয়ই। আর্ট সবাইকে ঠাঁই দেয়, তবু সকলের ঊর্ধ্বে থাকে।

এর থেকে যেন এমন ধারণা কারো না জন্মায় যে জীবনের সমস্ত বিভাগ সম্বন্ধে অবহিত ও সংবেদনশীল হওয়া সকল শিল্পকর্মের আদর্শ। না, মহাভারতের আদর্শই একমাত্র আদর্শ নয়। রামায়ণে এত রকম এত কথা কই? আসলে মহাভারতের কোনো জুড়ি নেই। আড়াই হাজার বছর পরেও সে একাই একশো। আড়াই হাজার বছরে জীবনের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা বাড়তে বাড়তে এমন বিপুল হয়েছে যে এখন আর মহাভারতের আয়তনেও কুলোবে না। যদিবা লেখকের আয়ত্তে কুলোয়। যেটা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে নয় সেটা আমাদের আদর্শও নয়।

আদর্শ হচ্ছে আর্টের স্বকীয় দায় বহন করে জীবনের আর-দশটা বিভাগের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ও জীবনের সমগ্রতার সঙ্গে পা মিলিয়ে নেওয়া। সব কিছু না দেখেও সব কিছু না চেখেও সমগ্রতার একটা মোটামুটি বোধ যদি থাকে তা হলেই হলো। যেমন শেক্সপীয়ারের বেলা। গ্যেটের বেলা। টলস্টয়ের বেলা।

এটাও কিছু কম কঠিন নয়। সেইজন্যে শিল্পীমাত্রেরই উপর শিল্প-সরস্বতীর তেমন কোনো বরাত নেই। যার পক্ষে যেটা সম্ভব, যতটা সম্ভব তার পক্ষে সেটাই ও ততটাই যথেষ্ট। তার সৃষ্টি যদি সমগ্রের সঙ্গে না মেলে তবু একাংশের সঙ্গে মিলবে। সিন্ধুর সঙ্গে না মিলুক, শিশিরবিন্দুর সঙ্গেই মিলুক। তার পক্ষে ভাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড। চীনদেশের এক বিশিষ্ট শিল্পী শুনেছি শুধু চিংড়িমাছই আঁকেন। আর তাঁর আঁকা চিংড়িমাছ রসিকজনের কাছে মহা-মূল্য। জাপানের এক কবির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তিনি শুধু ব্যাঙ্ নিয়ে কবিতা লেখেন। মানুষও তাঁর চোখে ব্যাঙ্ ছাড়া কিছু নয়। এরও কি মূল্য

নেই ? আপাতদৃষ্টিতে যা তুচ্ছ শিল্পীর দৃষ্টিতে তাই হচ্ছে বৃহত্তর সত্যের প্রতীক। তুচ্ছই হোক আর মহৎই হোক প্রত্যেক শিল্পীকে তার সত্য বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিতে হবে। কার হাতে কোন্‌টা কেমন ওতরায় তাই দিয়েই বিচার হবে। মহৎ বিষয়ে লিখলেই যে লেখা স্মরণীয় বা শাশ্বত হবে তা নয়। উচ্ছে দিয়েও উচ্চাঙ্গের সুক্তো হয়, তুচ্ছ দিয়েও উচ্চাঙ্গের নকশা হয়। দেশে বিদেশে অসংখ্য ছড়া মুখে মুখে তৈরি হয়েছে, বেঁচে আছেও অনেকগুলি। ব্যালাড বা চারণ গাথা না থাকলে সাহিত্যের একটা দিকই থাকে না। সাহিত্য কানা হয়ে যায় যদি হাস্যকৌতুক বা অশ্লীলতাপূর্ণ তামাশা বাদ যায়।

'আর্টের খাতিরে আর্ট' যদিও বলি, তবু একথাও স্বীকার করি যে আর্টের ফল সুদূরপ্রসারী। তার প্রত্যক্ষ ফল রূপভোগ ও রসভোগ, কিন্তু পরোক্ষ ফল এমন সব পরিবর্তন যা সমাজনায়ক বা রাষ্ট্রনায়কদের স্বপ্ন। কথাটা যতদূর মনে পড়ে শেলীর—কবিরা হচ্ছেন মানবজাতির অপরিজ্ঞাত বিধান-দাতা। হাতের কাছেই বঙ্কিমচন্দ্রের উদাহরণ রয়েছে। তাঁর 'বন্দে মাতরম্' গান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে রচিত হয়নি, তা সত্ত্বেও তার দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন উদ্বুদ্ধ হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা নিকটতর হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য আমাদের অনেকের জীবনধারা বদলে দিয়েছে। শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' পড়ে একটি তরুণীর চৈতন্য হয়, সেইরাত্রেই তার কুলত্যাগের কথা ছিল।

অবশ্য এর বিপরীতটাও সত্য। উপন্যাস পড়ে বহুলোকের মাথা ঘুরে গেছে। তারা কাল্পনিক জগতে বিহার করতে গিয়ে বাস্তব জগতে হোঁচট খেয়েছে। এসব দেখেশুনে সমাজকর্তারা গল্প উপন্যাসের উপর খড়্গহস্ত হয়েছেন। তার মুখে বল্‌গা পরিয়েছেন। সে যাতে অহিত করতে না পারে তার জন্যে তাকে খাসী বানিয়েছেন। সমাজের হিত হয়েছে হয়তো, কিন্তু সৃষ্টি নিষ্ফলা হয়েছে।

লেখক অনেক সময় জানে না সে কিসের জনক। কে তার জাতক। জাতকটি ভালো না মন্দ। মনোহর না ভয়ঙ্কর। আমাদের ছেলেবেলায় প্রায়ই শোনা যেত যে জার্মান যুদ্ধের জন্যে দায়ী নীট্‌শে। তিনিই সেই জাতকটির জনক। বেঁচে থাকলে ও সজ্ঞানে থাকলে তিনি হয়তো তার পিতৃত্ব অস্বীকার করতেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সাহিত্যকে বা দর্শনকে যুদ্ধের দিনে প্রেরণার্থে ব্যবহার করা হয়। যারা প্রচারকার্যের জন্যে লেখেন নি তাঁদের রচনাকেও প্রচারের বাহন করে তার থেকে ফল আদায় করা হয়। দীর্ঘকাল যে বই ফলপ্রদ হয়নি, যার পাঠকসংখ্যা মুষ্টিমেয়, হঠাৎ তার উপরে নজর পড়ে। জাতকের জনক ঠাওরানো হয় তাকেই।

'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' যেমন একালের মানুষের অসহ্য তেমনি অসহ্য 'ফলার্থে ক্রিয়তে কাব্য'। পুত্রার্থের জায়গায় আমরা বসিয়ে দিই প্রেমার্থে। কিন্তু পুত্রকন্যা কি হয় না ? না হলেই আশ্চর্য হতে হয়। প্রণয়লীলা যদিও প্রণয়লীলার জন্যেই তবু তার মধ্যে বংশরক্ষার সম্ভাব্যতাও থাকে। তেমনি

কাব্যকেলির মধ্যেও থাকে সামাজিক বা ঐতিহাসিক ঘটনার সম্ভাব্যতা। যদিও কাব্যকেলি হচ্ছে কাব্যকেলির জন্যেই। যেখানে তেমন কোনো সম্ভাব্যতা নেই সেখানে বন্ধ্যাত্বের অনুযোগ উঠলে বিস্মিত হবার কী আছে? আর্ট যদিও আর্টের খাতিরেই সৃষ্টি হয় তবু সেই সৃষ্টির ভিতরে হয়তো একটা অরণ্য আত্মগোপন করে থাকে। উপযুক্ত দিনক্ষণ এলে আবির্ভূত হয়। ততদিনে জনকের পঞ্চত্বলাভ হয়েছে। জাতকের আগমনের আভাসও পায়নি সে। কিংবা জীবিত থাকলেও তার পক্ষে কবুল করা শক্ত যে ওরকম কিছু তার কল্পনায় ছিল। যা ঘটে তা সকলের সব কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায়।

কখনো কখনো মনে হয় সৃষ্টির প্রেরণা কোন্ অনাদি উৎস থেকে আসে। কবিরা বা শিল্পীরা নিমিত্তমাত্র। প্রেমের প্রেরণার মতো আর্টের প্রেরণাও ব্যক্তির ভিতর দিয়ে কাজ করলেও নিখিল বিশ্বের আভ্যন্তরিক রহস্য। আমরা যারা লিখি তারা যেন স্বাধীন হয়েও স্বাধীন নই, কোনো এক বৃহত্তর সত্তার অধীন। সে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আমাদের এনেছে, আমাদের দিয়েছে, আমাদের কাছ থেকে নিচ্ছে, আমাদের বিদায় দেবে। যেটা থাকবে সেটার উপর আমাদের নামাঙ্কন থাকলেও সেটা আমাদের নয়, সেটা তার। নামাঙ্কন যে থাকবেই তেমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। রাজশাহী জেলার পথেঘাটে প্রাচীন শিলামূর্তি ছড়ানো দেখেছি। কেউ বলতে পারে না কার হাতে গড়া। হাজার বছর বয়স।

মহাকালের সোনার তরী ফসল তুলে নিয়ে চলে যায়, যার ফসল তাকে তুলে নেয় না। তার ফসলটাই আসল। সে আসল নয়। কেনই বা তার নাম থাকবে! যদি থাকে তবে এমন অদৃশ্যভাবে থাকবে যে সহজে কারো চোখে পড়বে না। যেটা সৃষ্টি করা গেল বা আমাদের হাত দিয়ে সৃষ্ট হয়ে উঠল তার পরমায়ু যদি আমাদের পরমায়ুর থেকে বেশী হয় তা হলেই আমরা ধন্য। তাও যে সব সময় হয় না। সাধারণত যে বছরের ফসল সেই বছরই ভোগ হয়ে যায়। ক'খানা বই বিশ ত্রিশ বছর সমান আনন্দ দেয়!

'আর্টের খাতিরে আর্ট' যখন বলি, তখন একথা মনে করেই বলি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা ক্ষণিক বা তাৎক্ষণিক তার উপরে সামাজিক বা নৈতিক দায়িত্বের গুরুভার চাপিয়ে দিয়ো না। ভারাক্রান্ত হলে সে যেটুকু আনন্দ দিতে পারত সেটুকু দিতে পারবে না। জীবনে অন্তত একটিবার তাকে গলা ছেড়ে গাইতে দাও। হয়তো একখানা গানই সে গাইতে এসেছে, গেয়ে বিদায় নেবে। যাবার সময় অনুরণন রেখে যাবে। হয়তো একটি ছোট কবিতাই তার দেবার। হয়তো দুটি সার্থক পঙ্‌ক্তি। মহাভারত বা রামায়ণ রচনা সকলের সাধ্য নয়। অথচ আর্ট যদি লঘুভার হয় তবে তা সকলের সাধ্য। তেমনি করে লোকসাহিত্য হয়েছে, লোকসঙ্গীত হয়েছে। সকলের অন্তরে যে রূপকার ও রসিক রয়েছে তাকে যদি অন্তত একটিবার সৃষ্টির সুযোগ দিতে হয় তবে সেটা হোক সৃষ্টির খাতিরে সৃষ্টি।

বিশুদ্ধ আর্ট

ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ীতে জল ফুটিয়ে খাওয়া হতো না। স্বাস্থ্যরক্ষার বই পড়ে বাবাকে যখন বলি যে বিশুদ্ধ জল খেতে হলে ফুটিয়ে খেতে হয় তিনি ওকথা হেসে উড়িয়ে দেন। ফুটিয়ে খেলে কি জলের স্বাদ থাকে ? যে জিনিসের যা স্বাদ।

কথাটা সত্যি। আমাদের কুয়োর জলে একটা প্রাণ জুড়ানো স্বাদ ছিল। স্বাস্থ্যরক্ষার বই পড়ে ফুটিয়ে দেখি বিশুদ্ধ জল সেই বিশেষ কুয়োটির বিশেষ স্বাদে স্বাদু জল নয়। তা খেয়ে প্রাণ জুড়ায় না। বাড়ীতে বিশুদ্ধ জলের প্রবর্তন সেইখানেই শেষ।

বড়ো হয়ে যখন সাহিত্যে আসি তখন বিশুদ্ধ জলের মতো বিশুদ্ধ আর্টের কথা শুনি। কথাটা মনে ধরে। তারপরে কতবার ওকথা শুনেছি ও বলেছি। কিন্তু বার বার লক্ষ করেছি প্রকৃতি যেমন বিশুদ্ধ জল বলে কিছু সৃষ্টি করেনি, করে থাকলে তার বিশুদ্ধি রক্ষা করতে পারেনি, যে জলই মুখে দেবে সেই জলই ধুলো কাদা ঝরা পাতা মেশানো অশুদ্ধ জল, মানুষও তেমনি বিশুদ্ধ আর্ট বলে কিছু সৃষ্টি করেনি, করে থাকলে তার বিশুদ্ধি রক্ষা করতে পারেনি. সেটাও একটা মিশ্র পদার্থ, সুতরাং অশুদ্ধ পদার্থ।

তারপর আরো লক্ষ্য করেছি যে আস্বাদনের দিক থেকে বিশুদ্ধের চেয়ে অশুদ্ধই শ্রেয়। শ্রেয় আর প্রেয় এ দুটির মধ্যে বেছে নিতে বললে অধিকাংশ সুজন প্রেয়কেই বরণ করবেন। কারণ তার একটা বিশেষ স্বাদ আছে, যা দিয়ে প্রাণ জুড়ায়।

তা ছাড়া শুদ্ধিকরণ ব্যাপারটাই বর্জনশীল। জলকে ফুটিয়ে খাওয়া মানে অনেকগুলি উপাদান বর্জন করে খাওয়া। উপাদানগুলির মধ্যে যেমন ব্যাধিবীজ লুকিয়ে থাকে তেমনি আরো কিছু থাকে যা স্বাস্থ্যপ্রদ ও হিতকর। একটা খারাপকে তাড়াতে গিয়ে তুমি একটা ভালোকেও তাড়ালে। তোমার শ্রেয়োবুদ্ধি কি এই যুক্তি শুনে সন্তুষ্ট হয় যে, ভালো না থাকলেও ভালো, কিন্তু মন্দ থাকলেই মন্দ ?

বাবা বোধহয় আমাকে একথাও বুঝিয়েছিলেন যে কুয়োর জল ফুটিয়ে খেলে কতকগুলি উপাদান বাদ পড়ে. সেগুলি হিতকর। অসুখ যদি করে তাহলে কী হবে ? এর উত্তরে বোধহয় বলেছিলেন যে কুয়ো পরিষ্কার রাখতে হবে, ঘটি পরিষ্কার রাখতে হবে, গেলাস পরিষ্কার রাখতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চয়ই দরকারী, কিন্তু বহিষ্কার তেমন অত্যাবশ্যক নয়।

বিশুদ্ধ আর্ট বলে যদি কোনো পদার্থ থাকে তবে বহিষ্কারনীতির আতিশয্য তাকে নীরক্ত ও নির্মাংস করে আস্বাদনের অযোগ্য করতে পারে। তখন সেই বর্জনশীলকে তার উপভোক্তারাই বর্জন করতে পারে। আর্টের নীতি 'নেতি নেতি' নয়। আর্ট বরং বলে 'ইতি ইতি'।

সবরকম উপাদান নিয়েই আর্টের ঘরকন্না। কিন্তু কোন্ পদটি রাঁধতে গিয়ে কোন্ কোন্ উপাদান ব্যবহার করতে হবে সেটি তারই বিবেচনানির্ভর। কোন্‌টার পরিমাণ কত হবে সেটাও তেমনি তারই বিবেচ্য। সমঝদার যাঁরা তাঁরা আস্বাদন করে তৃপ্ত হলেই সে কৃতার্থ। যদি কেউ মুখে না দেন, যদি পাতে পড়ে থাকে তবে আর রেঁধে কী সুখ! তাহলে অবশ্য সকলের স্বাস্থ্য ভালো থাকে, কারো অসুখবিসুখ করে না। অপঠিত গ্রন্থ বা অশ্রুত সঙ্গীত যে কারো অহিত করতে পারে না এ তো স্বতঃসিদ্ধ।

আসলে বিশুদ্ধ আর্ট বলতে যা বোঝায় তা রর্জনশীল মনোভাবের ফসল নয়। বিশুদ্ধ আর্টের কথা তখনি ওঠে যখন আর্টের কাছে রকমারি প্রত্যাশা করা হয়। সেকালে যেমন ছিল ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়। পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি। একালে যেমন সমাজের পরিবর্তন বা বিপ্লব। রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা বা প্রতিবাদ। প্রত্যাশার ফর্দ শুনে যখন উত্ত্যক্ত হই তখন বলে উঠি, আমার হাত দিয়ে ওসব হবে না। আমার আরাধনার বস্তু বিশুদ্ধ আর্ট। আমার লক্ষ্য এস্থেটিক।

সাহিত্যিক বা চিত্রকরের লক্ষ্য যে এস্থেটিক হবে এটাও তো স্বতঃসিদ্ধ। তবু এ নিয়ে তর্কের অন্ত নেই। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র এটা মানবে না, কারণ সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজে সবাইকে হাত লাগাতে হবে, তুমি শিল্পী বলে তোমাকে ছাড় দেওয়া হবে না। ইসলামী রাষ্ট্র, ক্যাথলিক রাষ্ট্র, হিন্দু রাষ্ট্র প্রভৃতির দাবীও সেইজাতীয়। পশ্চিম ইউরোপের রেনেসাঁস এসে আর্টের লক্ষ্য যে এস্থেটিক এরূপ একটি প্রত্যয়ের বীজ বুনেছিল। সেই বীজ থেকে যে চারাগাছ হয় তা নানা দেশে চালান হয়েছিল। কোথাও সে চারা অনুকূল মাটি জল আলো হাওয়া পায়, কোথাও শুকিয়ে যায়। কোনো কোনো দেশে পূর্বতন ঐতিহ্য ছিল এস্থেটিক। যেমন জাপানে। ধর্ম বা সমাজ সেখানে শিল্পীর পিঠে সওয়ার হয়ে বসেনি।

বিশুদ্ধ আর্ট বলতে বুঝি সেই আর্ট যা শিল্পকে মুক্তি দেয়। যার সাধনা ও সিদ্ধি এস্থেটিক। অবশ্য যাঁর ইচ্ছা তিনি তাঁর বিষয়বস্তু বা প্রেরণা বাইবেল থেকে বা পুরাণ থেকে নিতে পারেন। বা ডাস কাপিটাল থেকে। বা মাও মহোদয়ের চিন্তা থেকে। কিন্তু শেষফল যেন মুখে রোচে, যেন আস্বাদন-সুখ দেয়, যেন এস্থেটিক বিচারে উত্তীর্ণ হয়। উপরন্তু যদি সমাজের বা ধর্মের লক্ষ্য ভেদ করে তো বহুৎ আচ্ছা, কিন্তু আর্টের লক্ষ্যভেদই প্রথম কাজ, যা না করলেই নয়।

মনে রাখতে হবে যে আর্ট যদিও একদেশে না একদেশে সৃষ্টি হয় তবু তা দেশাতীত ও বিশ্বজনীন। যেমন শিশু একজনের গর্ভে জন্মালেও সারা সমাজের। নইলে রাশিয়ান ব্যালে সবাইকে এত আনন্দ দেয় কেন? এমন কি আমেরিকার ক্যাপিটালিস্ট ও ফ্রান্সের বুর্জোয়াদেরও? তেমনি আর্ট যদিও একযুগে না একযুগে সৃষ্টি হয় তবু তা যুগাতীত ও সর্বকালীন। তাই যদি না হতো তবে মিলো দ্বীপের ভীনাস আমার দেহেমনে এমন পুলক সঞ্চার

করত না। যেসব শিল্পকর্ম কালজয়ী বা ক্লাসিক হয়েছে তাদের সকলেরই সেই হ্লাদিনী শক্তি রয়েছে।

যার দেশ আছে অথচ বিদেশ নেই, সব দেশই স্বদেশ, যার যুগ আছে অথচ বিযুগ নেই, সব যুগই স্বযুগ তাকে যথাসম্ভব বিশুদ্ধ হতে হবে বইকি। যেমন বিশুদ্ধ এসেন্স বা আতর। যেটা তার পক্ষে এসেনশিয়াল সেটাই তার কাছে অগ্রগণ্য। সেটা হয়তো তার হ্লাদিনীশক্তি। অথবা তার অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্য। অথবা তার মধুচক্রের অমৃত যা মানুষকে অমর করে। অথবা তার পাগল করা রূপযৌবন, যা কোনদিনই ফুরোবে না। অথবা তার ধরাছোঁয়ার অতীত জাদু, যা সব গণনার ঊর্ধ্বে।

আধুনিকরা চাতুর্য দিয়ে জাদুর স্বাদ মেটাতে চান। পারেন না। চাতুর্যেরও হয়তো একটা স্থান আছে, কিন্তু সেটা তেমন অগ্রগণ্য নয়। চাতুর্য যদি আর্টের এসেন্স হতো তা হলে সে ফলিত বিজ্ঞান হয়ে উঠত। একালের ইমারত দেখে অনেক সময় বোঝা যায় না আর্ট না ফলিত বিজ্ঞান। তাজমহলের জাদু কি আধুনিক চাতুর্যের নাগালের বাইরে নয়? ফলিত বিজ্ঞান আমাদের মহাশূন্যে নিয়ে যেতে পারে, চাঁদের বুড়ি ছুঁইয়ে দিতে পারে, কিন্তু জাদুর রহস্য সে জানে না। জানলে আর্টই জানে। সেইজন্যে আর্টের অভাব ফলিত বিজ্ঞান দিয়ে মেটে না। আধুনিক সভ্যতা যদি আর্টের সাধনা ও সিদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ফলিত বিজ্ঞান নিয়ে মশগুল থাকে ও তারই মতো চতুর এক আর্ট পেলেই চরিতার্থ হয় তবে যাঁরা সমঝদার তাঁরা ক্লাসিকের মধ্যেই আশ্রয় নেবেন। মডার্ন আর্ট যাকে বলা হয় তার সম্বন্ধে আমার নিজেরই মনে দ্বিধা আছে। পরীক্ষা নিরীক্ষার দিক থেকে এর মূল্য অশেষ। কিন্তু বিশুদ্ধ আর্টের নামে এও তো সেই ফুটিয়ে খাওয়া জল। আরো শুদ্ধ। ডিস্‌টিলড ওয়াটার। পরের ধাপটা বোধহয় অবিমিশ্র হাইড্রোজেন অক্সিজেন।

না, বিশুদ্ধ আর্ট বলতে যদি সেইপ্রকার বিশুদ্ধি যার আছে তেমনি এক আর্ট বোঝায় তবে আর তাকে আর্ট বলে চেনা যাবে না। সে তার বিশুদ্ধি নিয়েই থাকবে। তাতে জলতৃষ্ণা মিটবে না। প্রাণ জুড়াবে না। এমন কয়েকটা উপাদান বাদ পড়বে যাদের বহিষ্কার আর্টের রীতি নয়। আর্টের নীতি নয়।

রাজনীতি সমাজনীতি ইত্যাদি যখন আর্টকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে যায় তখন বিশুদ্ধ আর্টের নাম করে আত্মরক্ষা তথা আর্টরক্ষা করতে চাওয়া এক জিনিস। যেটা সত্যি এসেনশিয়াল তার উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বিশুদ্ধির নামে বর্জনশীল ও অবিমিশ্র একটা মৌলিককে লক্ষ্য করতে যাওয়া আরেক জিনিস। বিশুদ্ধ আর্ট কথাটার দুইরকম অর্থ, মনের প্রবণতা প্রথমটারই প্রতি। তা বলে আমি দ্বিতীয়টার বিরোধী নই। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে চলুক। দেখাই যাক না নীট ফল কী দাঁড়ায়।

তা ছাড়া আর্টের অগ্রগতির পথটা যে কোন্ দিকে সে বিষয়ে আমরা যথার্থই দোটানায় পড়েছি। 'সবকিছু নিয়েই আর্ট' যেমন একদিক থেকে টানছে তেমনি আরেকদিক থেকে টানছে 'কোনো কিছুকে নিয়ে আর্ট নয়,

আর্ট তার আপনাকে নিয়ে।' একদিকে 'ইতি ইতি' করে পাওয়া। আরেকদিকে 'নেতি নেতি' করে পাওয়া। পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে সব শেষে কী থাকে দেখা যাক। থাকবেই কিছু না কিছু।

যাঁরা দোটানায় পড়ে মনঃস্থির করতে পারছেন না তাঁদের সঙ্কট সহজে কাটবে না। সমস্যাটা বহুকাল ধরে ঘনাচ্ছে। কিন্তু আজকের মতো স্পষ্ট হয়নি। সেদিন এক চিত্রশিল্পী বলছিলেন, "ছবি আঁকা হচ্ছে বিস্তর। এক একখানা হাজার টাকা দামে বিকোচ্ছে। কিন্তু আর্ট হচ্ছে কিনা সন্দেহ।" কথাটা মোটামুটি সাহিত্য সম্বন্ধেও খাটে। শিল্পী তা হলে করবে কী? কী করলে আর্ট হবে?

যেখানে স্পষ্ট একটা দোটানা সেখানে ঐতিহ্যের অনুসরণ করতে বলা নিষ্ফল। কারণ ঐতিহ্য তো 'নেতি নেতি' বলে না। আধুনিকতাই বলে 'নেতি নেতি'। আবার আধুনিকতার অনুসরণ করতে বলাও নিরর্থক, কারণ আধুনিকতা মাত্র সেদিনকার। যাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলব তাঁরা সবে পা ফেলতে শিখছেন। তবে আমার নিজের মনের প্রবণতা 'ইতি ইতি' মূলক। সঙ্কটের দিন আমি ক্লাসিক পড়ি ও তারই মধ্যে দিশা পাই।

তারপর যখন পারি জনগণের দিকে তাকাই। লোকসাহিত্যের মধ্যেও নিশানা মেলে। যদিও তার অনুসরণ করা চলে না। করা চলে অনুকরণ। কিন্তু অনুকৃতি তো আর্ট নয়। লোকসাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। জনগণের সঙ্গে পা মেলানো যায়। কিন্তু তারাই প্রত্যাশা করছে পথ প্রদর্শন। আমরা কি তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারব? না তারা করবে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ? না আমরা তাদের মধ্যে বিলীন হয়ে যাব?

আধুনিক না আদিম

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য পড়তে পড়তে সংশয় জাগে। এসব ব্যাপার কি আধুনিক না আদিম? হতে পারে বর্তমান শতাব্দীতেই ঘটেছে। কিন্তু খোসা ছাড়িয়ে দেখলে যা পাই তা একালের নয়, আদ্যিকালের শাঁস। খোসার জন্যে নয়, শাঁসের জন্যেই সে সাহিত্য উপভোগ্য।

মাঝখানে বহু শতাব্দী কেটে গেছে। সভ্য সমাজ মাত্রেই মানা দিয়ে রেখেছে, সাহিত্যে তোমরা এসব ব্যাপার এনো না। আনাটা পাপ কিংবা অপরাধ। মানা যদি না মানো কঠোর শাস্তি পাবে। তা সত্ত্বেও সাহিত্য শুদ্ধাচারী সাত্ত্বিক হয়ে ওঠেনি। সাধারণত ধর্মের বর্মচর্ম বা নীতিবাক্যের নামাবলী গায়ে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করেছে ও করিয়েছে।

আধুনিক সাহিত্যিকরা ভণ্ডামির ধার ধারেন না। কোদালকে কোদাল বলেন। কেউ কেউ দণ্ডিত হলেও বেশীর ভাগ পার পেয়ে যান। তাঁদের সাফাই হলো বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা। খুঁটিয়ে দেখলে ওটা বৈজ্ঞানিকও নয়,

বাস্তবতাও নয়, আসলে ওটা বহু পুরাতন আদিমতা। সমাজের পরতে পরতে জড়ানো। সভ্য সমাজে আর অসভ্য সমাজে লেশমাত্র প্রভেদ নেই। যা আছে তার নাম সামাজিক শিষ্টাচার। বাইরের পালিশ।

আধুনিকতার সঙ্গে আদিমতাকে কী করে মেলানো যায় সে এক প্রহেলিকা। যখন ধর্মের যুগ ছিল তখন আদিমতার জন্যে খানিকটে জায়গা ছেড়ে দেওয়া হতো। এখন ধর্ম পিছিয়ে পড়েছে, সামাজিক মতবাদ এগিয়ে গেছে। সামাজিক মতবাদ আদিমকে আধুনিক করতে চায়, আধুনিককে আদিম করতে চায় না। একদিনের জন্যেও না। সেইজন্যে আধুনিক উপাখ্যানের মধ্যে আদিমের গন্ধ পেলে ক্ষুব্ধ হয়। বর্ণচোরা আদিমতা পাঠকদের কামনাপূরণ করলেও সমাজনায়কদের অনুমোদন পায় না।

অথচ কত সহজ ছিল ভারতচন্দ্রের যুগে! সে যুগ ধীরে ধীরে অস্ত গেলেও তার গোধূলি দীর্ঘকাল থাকে। সাহিত্যে না হোক জীবনে।

আমার এক আলাপী তাঁর ছেলেবেলায় এমন একটি দৃশ্য চাক্ষুষ করেছিলেন যা অবর্ণনীয়। বছর ষাটেক আগেকার ঘটনা। কবি রবি তখন মধ্যগগনে। স্বদেশীর যুগ। যে সম্প্রদায়ের কথা হচ্ছে সেটি পুরোপুরি স্বদেশী। কলকাতার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে তাদের আখড়া বা আস্তানা ছিল। কীর্তনাদি শুনতে আমার আলাপীর কাকা বা মামা মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন। সঙ্গে নিয়ে যেতেন সাত আট বছরের বালককে। সেও একজন ভক্ত। বালকটি মুগ্ধ হয়ে কীর্তন বা ভাগবত পাঠ শোনে, খাজা বা গজা প্রসাদ পায়, ঘুমের ঘোরে বা ভক্তিভরে ঢলে পড়ে। কেউ তাকে উপস্থিত বলে গণ্য করে না। একবার তাকে দেখে মনে হলো সে ঘুমিয়েই পড়েছে। কিন্তু তার ওটা ঘুম নয়, তন্দ্রা। রাত তখন দশটা কি সাড়ে দশটা। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা একটু একটু করে গোপীদের বস্ত্রহরণে পৌঁছয়।

হলঘরটার একদিকে একটা গাছের মতো বা মাচার মতো কিছু ছিল। এতক্ষণ সেদিকে নজর পড়েনি বালকের। হঠাৎ দেখা গেল কে একজন লাফ দিয়ে সেখানে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে এক ফুঁয়ে বাতি নিবিয়ে দিল। বিজলীর বাতি নয়। হলঘরের একধারে নানা বয়সের পুরুষ। অন্য ধারে নানা বয়সের নারী। সবাই ভক্তিমান ও ভক্তিমতী। এতক্ষণ সকলেই সুসংযত ও সুসংবৃত ছিলেন। কিন্তু যেই শ্যামের মুরলী ধ্বনি শুনলেন অমনি লাজ মান ভয় বিসর্জন দিলেন। রাশি রাশি শাড়ী কাপড় অন্ধকারে গাছের উপর বা মাচার উপর ছুঁড়ে ফেলা হলো।

পুরাণে হয়তো সেইখানেই শেষ। জীবনে কিন্তু সেইখানেই শেষ নয়। অন্ধকারের আড়ালে যে যাকে পায় তাকে টেনে নিয়ে একটু দূরে সরে যায়। যতগুলি গোপী ততগুলি কৃষ্ণ। বালক বুঝতে পারে না বাকীটা কী? শুধু বোঝে সেটাও একপ্রকার হরির লুট। ওর সমবয়সিনী কেউ নেই। থাকলে সেও হয়তো লুট করত বা লুট হতো।

জিজ্ঞাসা করিনি, ওরা ওদের শাড়ী কাপড় ফিরে পেল তো? চিনে নিল

কী করে? বাতি জ্বলে ওঠার আগে না পরে? শুনতে শুনতে এমন বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলুম যে বাক্‌স্ফূর্তি হয়নি।

শান্তশিষ্ট সামাজিক মানুষ। ছেলেমেয়ের বাপ, ছেলেমেয়ের মা। হয়তো ঠাকুমা, ঠাকুরদা। শুদ্ধাচারী ধার্মিক। পরকালের ভয় আছে। কিন্তু ওই যে ওদের সাধনা। লাজ মান ভয় ত্যাগ করতে হবে। লাজ মান ভয়, তিন থাকতে নয়।

সমাজে এরূপ সাধনার স্বীকৃতি কোনোদিন ছিল না। তবু সাধনাটা ছিল ও নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপে ছিল। এখনো থাকতে পারে। খোঁজ করিনি। কথা হলো সমাজের নীতি আর ধর্মের রহস্য সব সময় এক নয়। আর ধর্মের রহস্যকে রূপক বলে ব্যাখ্যা করলেও তা সব ক্ষেত্রে রূপক নয়। সেও বস্তুগত তথ্য। তাকেও চাক্ষুষ করা যায়। কিন্তু তার জন্যে হয়তো সাত বছরের খোকা হতে হবে ও নিদ্রার ভান করতে হবে। ধার্মিকদের প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া যাবে না। মন্ত্রগুপ্তি তাঁদের নিয়ম।

ধর্মের রহস্যের মধ্যে আদিম যদি আত্মগোপন করে থাকে তবে মধ্যযুগে যা সত্য ছিল আধুনিক যুগেও তা সত্য। যুগ পরিবর্তনে তার এমন কিছু ঘোরতর পরিবর্তন হয় নি যে তাকে প্রাগৈতিহাসিক বলে অপাঙ্‌ক্তেয় করতে হবে।

ধর্মের শামিল ছিল বলে যা এতকাল ধরে চলে আসছিল তাকে ধর্মের থেকে বিযুক্ত করে দেখলে তা কুৎসিত দেখাবেই। তা ছাড়া ধর্মও তো শিক্ষিতজনের সংশয় জাত হয়েছে। যেখানে ধর্মবিশ্বাস প্রবল সেখানে ধর্মের আনুষঙ্গিকরূপে অনেক কিছুই পার পায়। যেমন নরবলি বা সতীদাহ। এগুলিও প্রাগৈতিহাসিক। এখনো বহু লোক আছে যারা সুযোগ পেলেই সতীদাহ করে, নরবলি দেয়। সেই আদিমের মতো এইসব আদিমও যুগ পরিবর্তন সত্ত্বে গোপনে বিদ্যমান। ধর্মের থেকে বিযুক্ত করলে এসব হলো দস্তুরমতো 'হরর' বা বিভীষিকা। পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে 'হরর' উপন্যাস বা গল্প এখন বিপুলসংখ্যকের প্রিয়পাঠ্য। পাশ্চাত্ত্য থেকে প্রাচ্যেও তার সংক্রমণ ঘটেছে। ছোট ছোট ছেলেদেরও আজকাল 'হরর' কাহিনী পড়তে দেওয়া হয়। কেনাবেচার উপর বিধিনিষেধ নেই।

মানুষের অভিরুচি কেন এমন হলো তার উত্তর, জন্ম আর মৃত্যু এ দুটোই সব চেয়ে দুর্ভেদ্য রহস্য। আদিকাল থেকেই মানুষ এর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে, আজও করে। জন্মরহস্য তাকে আকৃষ্ট করে একপ্রান্তের আদিমের দিকে। মৃত্যুরহস্য আরেকপ্রান্তের আদিমের দিকে। আকর্ষণ অতি স্বাভাবিক ও অতি প্রচণ্ড বলেই আধুনিক সাহিত্যেও আদিমের প্রতিফলন ঘটে। তবে ও জিনিস সাহিত্য না অসাহিত্য সেটাও একটা প্রশ্ন। যেমন ধর্ম না অধর্ম এটাও একদা একটা প্রশ্ন ছিল।

বলতে পারা যায় আজকের দিনে ধর্মের স্থান নিয়েছে সাহিত্য। সাহিত্যের নামে অনেক কিছুই পার পেয়ে যাচ্ছে। তা বলে বহিষ্কার নীতি

অবলম্বন করতেও মন সায় দেয় না। ইউরোপে ধর্মান্ধদের প্রতাপ এককালে প্রভূত অবিচার ও অনিষ্ট করেছে। ডাইনী শিকার ও ভিন্নমতের ব্যক্তিদের জীবন্ত দহন হাজার বছর ধরে চলেছিল। আধুনিক যুগ তার থেকে মুক্তি দিয়েছে বলেই তার নাম আধুনিক ও তার প্রতিপত্তি এত নিবিড়। ধর্মান্ধদের স্থানে যাঁদের বসানো হবে তাঁরাও যদি সমান অন্ধ হন তবে তো সাহিত্যের আঁচল ধরে সেইসব অবিচার ও অত্যাচারই ফিরে এল।

যে যার নিজের মতো করে বাঁচবে, স্বাধীনতার সারমর্ম এই নয় কি? একবার এটাকে কাম্য বলে মেনে নিলে এক একজনের এক এক রূপরুচিও মেনে নিতে হয়। সে রুচি যদি বিকৃত বা বীভৎস না হয় তবে কেবলমাত্র ইউনিফর্মিটির খাতিরে হস্তক্ষেপ করা উচিত কি? বৈচিত্র্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বিকৃত বা বীভৎস যদি হয় তবে শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন করতে হবে, সংশোধনের উপায় খুঁজতে হবে, যথাসম্ভব উদার হতে হবে, সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে আইন অনুসারে হস্তক্ষেপ করতে হবে। স্বাধীনতার অপব্যবহার যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তবে বিচারের আমলে আসবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অভয় দিতে হবে যে স্বাধীনতাই কাম্য।

সুখও যে মানবজীবনের অন্যতম কাম্য এটার ব্যাপক স্বীকৃতিও আধুনিকতার লক্ষণ। সুখের চেয়ে দুঃখের পাল্লা এত ভারী ছিল যে মানুষ পৃথিবীকে দুঃখের স্থান ও স্বর্গকে সুখের স্থান ভাবতে অভ্যস্ত ছিল। জন্ম সার্থক করার মতো সুখ অল্পলোকের কপালেই জুটত। ধরে নেওয়া হতো যে সেই ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতীরা পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই কোনো সুকৃতি করেছিল। যারা জন্মান্তর মানত না তারা জন্মগত দৈবী অধিকার মানত। অভিজাত কুলে জন্মানোর সুকৃতি। অধিকাংশ লোক ওই একই জন্মের প্রবেশদ্বার দিয়ে এসেছে, অথচ তাদের জন্ম দুঃখের। তারা জন্মদুঃখী। গত চার শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষাদীক্ষা চিন্তন ও কর্ম মানুষকে সেই নিষ্ঠুর লৌহ নিয়ম হতে মুক্তি দিয়েছে। যে নিয়ম দুঃখকেই নিয়তি বলে ও সুখকে ব্যতিক্রম বলে মানুষের মন ভোলাত।

সুখের জন্যে আরেক জন্ম অপেক্ষা করতে বা পরলোকের জন্যে ধৈর্য ধরতে আজকাল বিশেষ কেউ রাজী নয়। এটা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন নয় কি? সব দেশের আধুনিক সাহিত্যিক ও মনীষীরা মোটামুটি মেনে নিয়েছেন যে সুখও মানবজীবনের অন্যতম কাম্য। সুখ বলতে ঠিক কী বোঝায় সেটা কিন্তু তর্কের বিষয়। কেউ যদি সন্ন্যাসী হয়েই সুখী হয় তবে তার পথটাও অপথ নয়। তা বলে সেইটেই একমাত্র সুপথ নয়। সন্ন্যাসীশাসিত সমাজে বংশরক্ষা ছিল একটা অপ্রিয় কর্তব্য। কোনো মতে চোখ বুজে সেটা সম্পাদন করতে হতো যারা সন্ন্যাসী নয় সেইসব দ্বিতীয়শ্রেণীর নাগরিকদের। ওই 'পাপক্রিয়া'র মধ্যে সুখ আশা করাটাই ছিল অন্যায়। প্রেম? প্রেমের সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক? প্রেম হবে অশরীরী, প্রেম হবে নিষ্পাপ।

অপ্রিয় কর্তব্য বনাম প্রিয়মিলন নিয়ে মানুষের মনে যে পুঞ্জীভূত দ্বন্দ্ব

ছিল সেটা প্রাচ্যের চেয়ে প্রতীচ্যেই বেশী। সেইজন্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যেই তা নিয়ে এত বেশী বিদ্রোহ। বিদ্রোহ থেকে স্বাভাবিক আতিশয্য। এর সবটাই আধুনিকতা নয়। সবটাই যে ধোপে টিকবে তা নয়। পেণ্ডুলাম যেমন একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে যেতে যেতে একসময় মধ্যপন্থী হয় সাহিত্যও তেমনি হবে। তখন আদিমের দিকে অতটা ঝোঁক থাকবে না। দেহের সঙ্গে মনের, প্রেমের সঙ্গে কামের, বিবাহের সঙ্গে স্বাধীনতার সামূহিক বোঝাপড়া যখন হবে তখন আধুনিকের সঙ্গে আদিমেরও বিশিষ্ট বোঝাপড়া হবে। তখন সাহিত্যের উপরেও সে বোঝাপড়ার ছাপ পড়বে।

সেই পথেই মানবমানবীর সুখ ও সার্থকতা। তারই স্বপ্ন দেখতে হবে। কিন্তু বাস্তবের উপর এক চোখ রেখে। দুঃখ শোক আর ব্যর্থতা দিয়ে জীবনের পথ আকীর্ণ।

মায়া ও সত্য

আমার মা বলতেন, "এ সংসার মায়ার। কেউ কারো নয়। ওই যে গোপাল বিগ্রহ দেখছিস, ওই সত্য।"

অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মায়া। ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন তত্ত্ব। মা কিন্তু ওটা শাস্ত্র পড়ে পাননি। অত বিদ্যা ছিল না তাঁর। পেয়েছিলেন বহু দুঃখে। ঠাকুরের কাছে দিনরাত পড়ে থেকে। এ জ্ঞান যার হয়েছে সে বেশীদিন বাঁচে না। সংসারের মায়া কাটায়।

আমি কিন্তু ও কথা মানতুম না। এখনো মানিনে। ব্রহ্ম সত্য সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু এ জগৎ মায়ার জগৎ হলে কিসের আকর্ষণে আমি বেঁচে আছি? কেনই বা সৃষ্টির দায় মাথায় নিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছি?

না, আমি স্বীকার করব না যে এ সংসার মায়ার সংসার। কিন্তু মা যে ওর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন কেউ কারো নয় সেটা এককথায় উড়িয়ে দিই কী করে? মানুষ কোন্‌খান থেকে আসে, কোন্‌খানে যায়, মাঝখানে ক'টা দিনের জন্যে কতরকম সম্পর্কে বাঁধা পড়ে, একজনের ছেলে, আরেকজনের স্বামী, আরেকজনের বাপ, আরেকজনের বন্ধু, এসব যখন ভাবি তখন আমিও মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, সমুদ্রের বেলায় বালুর খেলাঘর।

মহাযুদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি যদি সত্য না হয় তো সত্য কী? সত্য কাকে বলে? তবু আমারও থেকে থেকে মনে হয় যে মহামায়ার মায়া। সব যেন পর্দার উপর ছায়াছবির মতো ভাসছে। একটু বাদে মিলিয়ে যাবে। এই অভিনেতারা কেউ থাকবে না। এদের কীর্তির রেকর্ডও হাজার কয়েক বছর বাদে নিঃশেষে মুছে যাবে। মহাকালের দৃশ্যপটে কয়েক হাজার বছর তো কয়েকটা মুহূর্ত। কয়েক লক্ষ বছর বাদে পৃথিবীও থাকে কি না দেখ। মহাকালের মহামায়া সৌরজগৎকেও বালুর খেলাঘরের মতো ভাঙবেন।

দেখতে দেখতে চোখের সম্মুখে মিলিয়ে গেল দীর্ঘ সাত পুরুষের ইংরেজ রাজত্ব। মায়া নয় তো কী! সাত শতাব্দীর গৌড়বঙ্গ ভূমিকম্পে দ্বিখণ্ড হয়ে গেল। মায়া নয় তো কী! কিন্তু কত লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ গেল, প্রাণের চেয়ে প্রিয় পূর্বপুরুষের বাস্তু গেল, কত সহস্র সহস্র নারীর প্রাণের চেয়ে মূল্যবান ইজ্জৎ গেল—হায় মহামায়া! সেও কি তোমার মায়া! শঙ্করাচার্য কী বলেন?

জ্ঞান হবার সময় থেকেই মানবজাতির এ জিজ্ঞাসা। যা কিছু দেখছি সবই কি সত্য? সবই কি মায়া? যা কিছু ঘটছে সবই কি সত্য? সবই কি মায়া?

দেশবিদেশের দার্শনিকরা এখনো এ জিজ্ঞাসার সর্বসম্মত মীমাংসা খুঁজে পাননি। দর্শনের মতো আর্টেরও এটা একটা অমীমাংসিত প্রশ্ন। সাপের মতো যেটা দেখতে সেটা হয়তো সাপ নয়, দড়ি। কিংবা দড়ির মতো যেটা দেখতে সেটা হয়তো দড়ি নয়, সাপ। জীবনমরণের প্রশ্ন বইকি। যদি দড়ি না হয়ে সাপ হয়ে থাকে তবে সর্পে রজ্জুভ্রমের পরিণাম হয়তো মৃত্যু। রজ্জুতে সর্পভ্রমও অনেক সময় ভয়ঙ্কর হয়। অকারণ ভয় থেকেও কখনো কখনো মৃত্যু ঘটে। শক পেয়ে মৃত্যু।

বিভ্রম ও সত্যতা দর্শন, বিজ্ঞানের মতো আর্টেরও একটা মূলগত সমস্যা। কোন্‌টা ইলিউশন, কোন্‌টা রিয়ালিটি এ নিয়ে মতভেদ হতে পারে, কিন্তু একটা যে অপরটা নয় এ বিষয়ে সকলে একমত। সাপটা যদি সত্য হয় দড়িটা মায়া। দড়িটা যদি সত্য হয় সাপটা মায়া। কিন্তু কী করে স্থিরনিশ্চিত হব যে ওটা দেখতে দড়ির মতো, আসলে সাপ? বা দেখতে সাপের মতো, আসলে দড়ি?

শিল্পীদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে অন্তহীন তর্ক করবেন না। সোজা এগিয়ে গিয়ে সাপের গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করবেন সাপ না দড়ি। অত্যন্ত বিপজ্জনক পরীক্ষা। এঁরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস করেন ও তার ঝুঁকি নিতেও তৈরি। আগুনে হাত না দিয়ে এঁরা মেনে নেবেন না যে হাত পুড়ে যাবে, হাতের ছোঁয়া লেগে মুখও পুড়বে। জীবনের স্বাদ জীবনের কাছেই মেলে, দুধের স্বাদ যেমন দুধের কাছে। কল্পনা সে স্বাদ যোগাতে পারে না। পরোক্ষ অভিজ্ঞতা বা শোনা কথা তার স্থান নিতে পারে না। অথচ জীবনের ক'টা অভিজ্ঞতাই বা ক'জনের বেলা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা!

আমার এক বন্ধু আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন বিবাহযোগ্যা কুমারীদের ফোটো দেখে বিশ্বাস না করতে। ফোটোতে নাকি আসল রূপ ধরা পড়ে না। বলতে হয়, কন্যাটিকে স্বচক্ষে দেখতে চাই। স্বচক্ষে দেখেও কত লোক ঠকে গেছে বন্ধু বোধহয় জানতেন না। কিংবা জানলেও একজন বাস্তববাদী সাহিত্যিক হিসাবে সেইটেই তাঁর দাবী। নিজের চোখের উপর তাঁর অসীম আস্থা। বাস্তববাদী হলে যা হয়। আমি কিন্তু রোমান্টিক। আমি চোখে না দেখেও ইমেজ বানাই। ফোটো না দেখেও প্রতিমা গড়ি। রূপ

যাকে বলি তার কতক আমার কল্পনা, কতক নারীর আপন রূপ। তেমনি যে কোন মানুষের বা প্রাণীর বা বস্তুর বা ঘটনার। আসল সত্যের রূপ খোলা চোখেও দেখা যায় না। সে যেন সূর্যের রূপ।

একজন বিচারক হিসাবে আমার কাজ ছিল ঠিক কী হয়েছিল তা সাক্ষীদের মুখে শোনা ও শুনে লিপিবদ্ধ করা। ঠিক যে কী হয়েছিল তা চাক্ষুষ সাক্ষীরাও বলতে পারে না। অনেক জায়গায় ফাঁক থেকে যায়। অনেক জায়গায় গোলমাল হয়ে যায়। লিপিবদ্ধ যেটা হয় সেটা হুবহু সত্য নয়। বাস্তববাদ তা হলে কিসের উপর নির্ভর করে পাঁচজনকে ডেকে বলবে, এই যা লিপিবদ্ধ হলো তাই সত্য? তাই ঠিক? তাই আসল?

কাজ চালানো গোছের বাস্তবতা না হলে আপিস আদালত চলে না, সংসার চলে না। এমন কি ঘরগৃহস্থালীও চলে না। কিন্তু কাজ চালানো গোছের রিয়ালিটি দিয়ে উচ্চাঙ্গের দর্শন বা সাহিত্য হতে পারে কি? আর্ট আরো গভীরে যেতে চায়। কাজ চালানো গোছের রিয়ালিটি তার জন্যে নয়। কাজ চালানোর জন্যে মাথাব্যথা তার নেই। "নইলে কাজ চলবে কী করে" এ প্রশ্ন তাকে ভাবিয়ে তোলে না। তার প্রশ্ন, "আসল ব্যাপারটা কী?"

এই চেয়ারটার একটা বাহ্য রূপ আছে, সেটাই এর আসল রূপ। কিন্তু এর উপরে যে মানুষটা বসে আছে তার কি শুধু একটা বাহ্য রূপই আছে? তার আভ্যন্তরিক রূপ অপরে দেখবে কী করে? সে-ই বা দেখাবে কী করে? মুখের কথায়? পুরো মানুষটার পুরো রূপ সে নিজেই দেখেনি, সেইজন্যেই তো সাধকরা বলে থাকেন, আত্মানং বিদ্ধি। বাহ্যরূপের বর্ণনা এমন কিছু কঠিন নয়, কিন্তু তার আড়ালে ও তাকে জড়িয়ে যে অনির্বচনীয় রূপ আছে সে যে বর্ণনাতীত।

তেমনি বাহ্য ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা শক্ত নয়, কিন্তু তার পেছনে যে কার্যকারণ পরম্পরা রয়েছে তার সন্ধান নিতে গেলে মহাভারত হয়। আর্টের পরিসর সীমাবদ্ধ। তা ছাড়া ঘটনা যেমন আকর্ষক কার্যকারণ পরম্পরা হয়তো তেমন নয়। সাধারণত এত ক্লান্তিকর যে পাঠককে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। অসংখ্য খুঁটিনাটি দিয়ে জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা পরিচালিত। শরীরকে চালায় মন, মনকে চালায় প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন বা দয়ামায়া বা উদারতা। যথার্থ অভিপ্রায় যে কী তা অনেক সময় দুর্জ্ঞেয়। অসুখ না করলে কেউ মনোবিশ্লেষণ করায় না। অসুখী ছাড়া কারো মন মনোবিশ্লেষকদের পরীক্ষায় বিষয় হয় না। খাপছাড়া বা খারাপ কিছু না হলে সেটা 'খবর' হয় না। অধিকাংশ গল্প উপন্যাস 'খবর' ধর্মী।

সেইজন্যে প্রকৃত সত্য যে কী তা রীতিমতো ধাঁধা। বৈজ্ঞানিকরা এতকাল প্রকৃতিকে নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। ইদানীং মানুষের উপর দৃষ্টি পড়েছে। কিন্তু আভ্যন্তরিক বলতে তাঁরা যা বোঝেন তা যথেষ্ট গভীর নয়। আরো গভীরে যেতে হলে কবি ও ঋষিরাই পথপ্রদর্শক। তাঁদের পথ দেখায় তাঁদের গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। যেখানে যে নিয়ে যায় তার নাম ইনার রিয়্যালিটি।

সেই যদি সত্য হয় তবে আর-সব আপাত সত্য। বা সত্যাভাস।

এই দৃশ্যমান জগৎকে মায়া বলে অগ্রাহ্য করে বা ছোট করে কোনো কিছুই সৃষ্টি করা যায় না। সে পন্থা আর্টের পন্থা নয়। এ যেমন একদিকের কথা তেমনি আরেকদিকের কথা হচ্ছে এই দৃশ্যমান জগৎকে তার নিজের ভাষায় বা নিজের অর্থে বোঝাও যায় না, বোঝানোও যায় না। বৃথা চেষ্টা। এর বাইরে গিয়ে বাইরে থেকে দৃষ্টিপাত করা জীবিত মানুষের অসাধ্য, কিন্তু সাধনা করলে ভিতরে গিয়ে ভিতর থেকে দর্শন করা সম্ভব। সেটা কেবল সাধুসন্ত বা মুনিঋষি বা মরমীদের পন্থা নয়, কবি বা শিল্পীদেরও পন্থা। শুধু ধর্মের পন্থা নয়, আর্টেরও পন্থা সেই।

আর্টকে আমি ধর্মের অনুসরণ করতে বলছিনে। স্বধর্মের অনুসরণ করতেই বলছি। স্বধর্মের অনুসরণ করতে করতেই সে দৃশ্যমানের অন্তরালে কী আছে তার মর্মভেদ করবে। তখন তারই আলোয় দৃশ্যমানকেও ঠিকভাবে চিনবে। ঠিকভাবে বুঝবে। তার ফলে যে তার সৃষ্টি ব্যাহত বা বন্ধ হবে তা নয়। আধুনিকদের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক যে গ্যেটে তাঁর 'ফাউস্টের' সমাপ্তির জন্যে বিশ্বরূপ প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল। আর বিশ্বরূপ কেবল মর্ত্যরূপ নয়। কী করে তিনি তা নিরীক্ষণ করতেন যদি না অন্তর্ভেদী দৃষ্টির বর্তিকা হাতে নিয়ে যাত্রা করতেন? ফাউস্টের জীবনবৃত্ত কোথায় গিয়ে সম্পূর্ণতা পেল তা উপলব্ধি করেই তিনি শান্তি পান। নইলে প্রথম খণ্ডের খণ্ডসত্য তাঁকে আমরণ অস্বস্তি দিত।

না, দৃশ্যমানকে খারিজ করে বা খাটো করে নয়, তাকে তার আভ্যন্তরিকের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েই বিধাতার সৃষ্টির সমগ্রতাবোধ ও মানবের সৃষ্টির পরিণতি। রবীন্দ্রনাথ যে রূপসাগরে ডুব দিয়েছিলেন তাঁর মনে ছিল অরূপ-রতনের আশা। রূপদৃষ্টি তাঁর মতো আর কার অমন ছিল! অথচ সেইখানেই তিনি ক্ষান্ত হননি। অরূপদৃষ্টির উন্মীলন চেয়েছেন। তাঁর কাব্য তা বলে ব্রহ্মসূত্রে পর্যবসিত হয়নি।

বিধাতা তাঁর সৃষ্টির দায়ের খানিকটা আমাদের হস্তান্তর করে দিয়েছেন। আমরাও স্রষ্টা। আমরা যা সৃষ্টি করি তার অঙ্গেও মায়া মাখানো। নাটকের বা উপন্যাসের জগৎও কি মায়ার জগৎ নয়? হ্যামলেট বা আনা কারেনিনা কি সত্যিকার চরিত্র? তাদের জীবনের ঘটনা কি সত্য ঘটনা? মায়া নিয়েই আমাদের কারবার। অথচ আমরা সত্যের আবরণ খুলে দিই। হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত। সে আবরণ খুলে দেখানোর ভার যাদের উপরে পড়েছে আমরাও তাদের মধ্যে আছি। হে শিল্পী, হে কবি, তৎ ত্বম্ অপাবৃণু।

যেমনটি তেমনটি

ছেলেবেলায় যিনি আমাদের অঙ্ক শেখাতেন তিনিই শেখাতেন অঙ্কন। একবার তিনি আমাকে একটা অশ্বত্থের পাতা দিয়ে বলেন, যেমনটি দেখছ তেমনটি এঁকে নিয়ে এস। আমি সেই পাতাটাকে পাতলা কাগজ দিয়ে অবিকল ট্রেস করি। মাস্টার মশায় তো মহাখুশি। যেমনটি দেখতে তেমনটি দেখিয়েছি। আর কী চাই? অঙ্কনের জন্যে সেবার আমি পুরো মার্ক পাই। আমিও মহাখুশি।

বড়ো হয়ে বুঝতে পারলুম যে অঙ্কের বেলা যেটা খাটে অঙ্কনের বেলা সেটা খাটে না। মাস্টার মশায় আসলে অঙ্কের লোক। অঙ্কনের ভার তাঁর উপর দেওয়া হয়েছিল অধিকন্তু। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে দুই আর দুই মিলে যেমন চার হয় তেমনি গাছের পাতা আর খাতার পাতা মিলে এক হয়। বড়ো হয়ে জ্ঞান হলো যে প্রকৃতির অনুকৃতির নাম আর্ট নয়। অশ্বত্থের পাতার হুবহু নকল যারা করে তারা শিল্পী নয়। আমি যে পুরো মার্ক পেয়েছিলুম সেটা আমার পাওনা নয়। তখন আমি মহাদুঃখিত হই।

অনেকের স্মরণশক্তি এত প্রখর যে তাঁরা অশ্বত্থের পাতা সামনে না রেখেও বিলকুল তেমনিটি আঁকতে পারেন। সেটাও অনুকৃতি। এক্ষেত্রে সামনে রাখা না রাখাটা পয়েণ্ট নয়। পয়েণ্ট হচ্ছে যেমনটি তেমনিটি। সেটা হয়তো আমার খাতার অশ্বত্থপাতার মতো জালিয়াতী নয়। কিন্তু সেটাও একপ্রকার কেরামতী যার জন্যে স্মরণশক্তি থাকলেই যথেষ্ট।

ধরো, একজনের স্মরণশক্তি নেই। তা বলে কি সে শিল্পকর্ম করবে না? শিল্পী হবে না? নিশ্চয়ই হবে। যাঁরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চান তাঁরা নিরাশ হয়ে বলবেন, অশ্বত্থ পাতা এরকম তো হয় না। অতএব ফেল। যাঁরা মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন মনে করেন না তাঁরা বলবেন, গাছের পাতা গাছেই সুন্দর। ছবিতে তাকে না এনে তার ভিতরের সুষমাটুকু ফোটাও। তা হলেই পাশ।

এ জগৎ যেমনটি তাকে তেমনিটি দেখতে হবে, একথা ঠিক। কিন্তু একে তেমনিটি দেখাতে হবে, একথা ঠিক নয়। যদি বলি তেমনিটি দেখাতে হবে তবে কথাটার একটা বিশেষ অর্থ আছে যে-অর্থে সেটা ঠিক। সেই বিশেষ অর্থটা যাঁরা বোঝেন তাঁরাই শিল্পী, বাদবাকী ফোটোগ্রাফার।

ডাক্তারদের মতো শিল্পীরাও অ্যানাটমি ফিজিওলজি শিখতে পারেন, কিন্তু আঁকবার সময় সে বিদ্যা ভুলে যেতে হবে। অঙ্কনের কাজ প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া নয়, তার রহস্য ভেদ করা। রিয়ালিটি তার আড়ালে রয়েছে। তাকে ছাড়িয়ে রয়েছে। তাকে ধরতে পারাটাই আসল। সহজে কি সে ধরা দেয়? দিব্যদৃষ্টির শরণ নিতে হয়। তখন যা ফোটে তা সাধারণ অর্থে যেমনটি তেমনিটি নয়, বিশেষ অর্থে যেমনটি তেমনিটি।

সাধারণের চেনা জগতের সঙ্গে শিল্পীর আঁকা জগতের ষোল আনা মিল আশা করাই অন্যায়। আশা যাঁরা করেন তাঁরা ধরে নেন যে আর্ট মানে মিল রাখা বা মিল দেওয়া। যে যত মেলাতে পারবে তারই তত বাহাদুরি। এই যে বদ্ধমূল সংস্কার এটাকে ভেঙে দিতে গিয়ে একালের শিল্পীরা অনেক সময় ইচ্ছে করেই অমিল উদ্ভাবন করছেন। যে যত না মেলাতে পারবে সে তত বাহাদুর। আদৌ যদি না মেলে তো পুরো মার্ক পাওনা।

এইসব বিদ্রোহীরা বিপরীত দিকে দৌড়তে দৌড়তে ইতিমধ্যে এতদূর চলে গেছেন যে প্রকৃতির দিকে ফিরেও তাকান না। কিংবা অনুকৃতির অপবাদ খণ্ডনের জন্যে সংকেতের বা ফ্যানটাসির আশ্রয় নেন। এদের দিব্যদৃষ্টি যে বস্তুর অন্তর্ভেদী তাও নয়। এঁরা বরং বস্তুকে ব্যবচ্ছেদ করেন ও টুকরো-গুলিকে নতুন করে সাজান।

যেমনটি দেখব তেমনটি দেখাব এ তত্ত্বে এঁদের বিশ্বাস নেই। সাধারণ অর্থে তো নয়ই, বিশেষ অর্থেও না। রিয়ালিটির সঙ্গে ষোল আনা অমিল না থাকলে আর্ট হয় না, এটাই মনে হয় এঁদের পালটা তত্ত্ব। সাদৃশ্যের রেশটুকুও থাকবে না, তবেই সেটা হবে আর্ট, নইলে হবে না, এটাই বোধহয় এদের পালটা দাবী।

প্রকৃতির জগৎ ও আর্টের জগৎ যে এক নয় তা মানতেই হবে। কিন্তু এক নয় বলে কি তাদের ষোল আনা বিসদৃশ হওয়া চাই? আর্টের কি তবে প্রকৃতির কাছে পাঠ নেবার দায় নেই? চোখ মেললেই প্রকৃতিকে দেখতে পাই, প্রকৃতির প্রতিবিম্ব মনের মুকুরে পড়বেই। তাকে কি আমি সচেতনভাবে বহিষ্কার করব? অতখানি আত্মসচেতন হলে কি আমি রূপধ্যান করতে পারব? রূপসৃষ্টি করতে পারব?

আর্ট হবে প্রকৃতিছুট এমন কোনো তত্ত্ব যদি কেউ প্রচার করেন তবে সেটা হবে একপ্রকার ডগমা। চোখ বুজে সেটা মেনে নিলে আর চোখ খোলা রাখতে পারব না। অথচ শিল্পীকে সর্বক্ষণ চোখ খোলা রাখতে হয়। তা না করে যদি কেউ সর্বক্ষণ চোখ বন্ধ রাখেন তবে হয় তিনি একজন ধ্যানী, যাঁর ধ্যানদৃষ্টি সক্রিয়, আর নয়তো তিনি একজন পাতালচারী, যাঁর বিহার অচেতন বা অবচেতন রাজ্যে।

বলা বাহুল্য রিয়ালিটির অন্বেষণ কতক শিল্পীকে পাতালে নিয়ে গেলেও সেটা বৃহত্তর অন্বেষণের শামিল। পাতালও রিয়ালিটির এলাকার বাইরে নয়। সেক্ষেত্রে ষোল আনা অমিল অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু সেটা যেন আত্মসচেতন-ভাবে জাহির করা না হয়। আপনা হতে যতটা অমিল আসে তাকে আসতে দাও। জোর করে টেনে না আনলেই হলো। রিয়ালিটিকে ধরতে ছুঁতে না পারলে শুধুমাত্র আকার অবয়ব শুদ্ধভাবে আঁকাই কি আর্ট? রূপ কি কেবল যেমনটি দেখতে?

পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে রেনেসাঁসের পর যুক্তির যুগ এসে এমন এক গাণিতিক বিশ্বের রূপ বর্ণনা করে যে আর্টও বেশীদিন পিছিয়ে থাকতে পারে না।

আর্টকেও নতুন রিয়ালিটির সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হয়। অঙ্কের নিয়ম অঙ্কনেও প্রভাব বিস্তার করে। এখন গাণিতিক বিশ্বের উপর নির্ভরতা টলেছে। প্রকৃত বিশ্ব যে একান্ত গাণিতিক নয় এ সংশয় জেগেছে। মধ্যযুগের শাস্ত্রীয় বিশ্ব যেমন একদিন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের আলোয় অবাস্তব ঠেকেছিল আধুনিক যুগের গাণিতিক বিশ্বও তেমনি গভীরতর অনুসন্ধানের আলোয় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মশৃঙ্খলাবদ্ধ ও কার্যকারণ শাসিত বলে প্রতিভাত হচ্ছে না।

আমরা আবার এক যুগসন্ধিতে পৌঁছেছি। রিয়ালিটির স্বরূপ সম্বন্ধে সংশয়মোচন না হলে সে সংশয়ের ছায়া আর্টের উপরেও পড়বে। সংশয়ই এ যুগের বাদী সুর। বৈজ্ঞানিক বা অর্থনৈতিক বা বৈপ্লবিক সাফল্য এর কণ্ঠরোধ করতে পারছে না।

বিজ্ঞান তথা বিপ্লবী মতবাদ মিলে খোদার উপর খোদকারী করতে পারে, মহাশূন্য অভিযান ও গ্রহগ্রহান্তর জয় করতে পারে। আত্মকলহে নির্বাণ লাভ না করলে মানবজাতি আক্ষরিক অর্থে অপার্থিব হতে পারে। এমনি কতরকম মধুর স্বপ্ন আমাদের জীবনে। কিন্তু রিয়ালিটির স্বরূপ সম্বন্ধে নতুন করে যে সংশয় জন্মেছে তার কণ্ঠস্বর দিন দিন জোরালো হয়ে উঠছে। যুক্তির যুগ ধীরে ধীরে নিযুক্তির যুগে পরিণত হচ্ছে। এর লক্ষণ চারদিকে।

বাইরে যদি নির্যুক্তির রাজত্ব হয় তবে আর্টের ঘরে তার পদসঞ্চার অপরিহার্য। আর্টের ঘর তো সংসারের বাইরে নয়। আর্ট বড়ো জোর স্বাতন্ত্র্য দাবী করতে পারে, কিন্তু বিচ্ছিন্নতা দাবী করতে পারে না। তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের হাওয়া তার দেহের বাইরের সঙ্গে তার এলাকার বাইরের সঙ্গে ওতপ্রোত।

নির্যুক্তির যুগে বাস করলে আর্টের ভিতরেও তার অনুপ্রবেশ মেনে নিতে হয়। কিন্তু ছেলেবেলায় অশ্বত্থপাতার গায়ে দাগা বুলিয়ে আমি যে ভুল করেছিলুম সেই ভুলই আবার করা হবে, যদি নির্যুক্তির জগতের গায়ে আর্টের দাগা বুলোতে যাই। প্রকৃতির অনুকৃতি যদি ভ্রম হয় তবে নির্যুক্তির অনুকৃতিও ভ্রম। যেমনটি দেখছি তেমনিটি দেখাব বলতে কি এই বোঝায় যে দুনিয়াটা একটা পাগলা গারদ বা মানসিক হাসপাতাল ? না, এক্ষেত্রেও সেই বিশেষ অর্থে বুঝতে হবে। সাধারণ অর্থে যেমনটি তেমনিটি মানে নির্যুক্তির অবিকল অনুকৃতি। আর বিশেষ অর্থে যেমনটি তেমনিটি মানে নির্যুক্তির আড়ালে যে উচ্চতর সত্য আছে তার সঙ্গে সত্য রক্ষা। আর্টে সে জিনিস কোনো মতেই নকলনবিশী হতে পারে না।

দুনিয়াতে যদি নিয়ম বলে কিছু না থাকে, সমস্তটাই হয় অনিয়ম, তা হলেও আর্ট তার নিজের নিয়ম মেনে চলবে, নিয়মভ্রষ্ট হবে না। আর্টের শাসন গতকাল যেমন কঠোর ছিল আজও তেমনি কঠোর, আগামীকালও তেমনি কঠোর হবে। বাইরে নির্যুক্তির যুগ এসেছে বলে ও প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন-গুলোর সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিয়েছে বলে আর্ট তার আপনার নিয়মনিষ্ঠতা

বিসর্জন দেবে না। আর্ট এক জায়গায় স্থির থাকবে। সেটা তার ঘরের শাসন।

এর মানে অবশ্য এমন নয় যে আর্টের নিয়মাবলী বদলায় না। নিশ্চয় বদলায়। বার বার বদলায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নিয়মশৃঙ্খলার দ্বারা শাসিত। নিয়মশৃঙ্খলা এক্ষেত্রে আর্টের স্বকীয়। পরকীয় নিয়মশৃঙ্খলার বেলা সে সত্যাগ্রহী।

এমন যে আর্ট সে নির্যুক্তির যুগেও স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে না, যেমন যুক্তির যুগেও স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়নি। অঙ্কনের বেলা যেমন অঙ্কের নিয়ম খাটেনি তেমনি খাটবে না অগাণিতিক নিয়ম। জ্ঞানবিজ্ঞানের চোখে জগতের চেহারা যেমনি হোক না কেন আর্টে হুবহু তেমনিটি ফুটবে না। তবে তার যেটা স্পিরিট সেটা ফুটতে পারে।

প্রধানত অনুভূতি ও কল্পনা নিয়েই আর্টের আপনার সংসার। যুক্তি কিংবা নির্যুক্তি কোনোটাই সেখানে মুখ্য নয়। যুক্তি ও জীবনকে গণ্ডীবদ্ধ করতে পারে, সেইজন্যে তার মুক্তির জন্যে নির্যুক্তিকে স্বাগত জানাতে পারে। আবার নির্যুক্তি যে মুক্তি দেয় সে মুক্তিও জীবনকে পাগলা গারদে কোণঠাসা করতে পারে। তার বাইরে পা দিলেই সে গাড়ীচাপা পড়তে পারে।

যাতে সব চেয়ে কম সঙ্কোচন ও সব চেয়ে বেশী প্রসারণ সেইরূপ জীবনই আর্টের কাম্য। জীবন যদি মোটের উপর সঙ্কোচনশীল হয়ে ওঠে আর্ট ত্রাহি ত্রাহি করবে। আর যদি মোটের ওপর প্রসারণশীল থাকে তবে সেই আওতায় আর্ট তার আপনার বিকাশে মন দেবে। বিকাশের পক্ষে প্রসারণশীলতাই শ্রেয়।

তা বলে শিল্পীর উপরে জীবনকে প্রসারণশীল করার ভার অর্পণ করা হয়নি। আর্ট যদিও জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে, জীবনের গতি নির্দেশ করতে পারে তবু সে কাজ সচেতনভাবে করতে যাওয়াও একপ্রকার উদ্দেশ্য সাধন। সে উদ্দেশ্য আর্টের ঘরোয়া উদ্দেশ্য নয়। রিয়ালিটিকে জানতে চাও, বুঝতে চাও, ধরতে চাও, ছুঁতে চাও—বেশ। কিন্তু তাকে নিজের হাতে বানাতে যেয়ো না। অন্তত সচেতনভাবে নয়। তা করতে গেলে এতদূরে সরে যাবে যে অনায়াসে স্বক্ষেত্রে ফিরে আসতে পারবে না। স্বক্ষেত্র ত্যাগ স্বধর্ম ত্যাগের মতোই ভয়াবহ।

আধুনিক মানুষ রিয়ালিটিকে বানিয়ে নেবার স্পর্ধা রাখে। তা বলে শিল্পী যেন স্বস্থানচ্যুত না হয়। স্বস্থানে পা ঠিক রেখে টাল সামলে সুস্থির হয়ে তার পরে অন্য কথা।

—প্রবন্ধ সমগ্র তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত—

গ্রন্থপঞ্জী

আধুনিকতা

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা

মূল্য ঃ দুই টাকা

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি ১৯৪৪ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে লেখা।

একটি প্রবন্ধ (দুঃসময়ের কবিতা) ১৯৪১ সনে রচিত।

উৎসর্গ—শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
পূজনীয়াসু

প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩

এখানে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছে। লেখকের ভূমিকা এবং সূচীপত্র নিচে দেওয়া হলো—

> 'বিশ্বসাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু হয় এক হিসাবে রেনেসাঁসের সময় থেকে। আর এক হিসাবে ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্‌কাল থেকে। রুশো, ভলতেয়ার ও গ্যোটে এই হিসাবে যুগপ্রবর্তক। গ্যোটের উপর লেখা প্রবন্ধ দুটি এই বইটির মূল সুর নির্দেশ করছে। মূল সুর আধুনিকতা।'

খোলা মন ও খোলা দরজা

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা

দাম আট টাকা

উৎসর্গ—আবু সয়ীদ আইয়ুব
শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রথম প্রকাশ আষাঢ়,

এখানে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছে। লেখকের ভূমিকা এবং সূচীপত্র মূল গ্রন্থের সঙ্গে দেওয়া হলো।

প্রাণরক্ষার ও বংশরক্ষার অধিকার

অন্নদাশঙ্কর রায়
প্রকাশক—ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি
মন্ত্রীনিবাস, রাজভবন, কলিকাতা-১
প্রচ্ছদ ঃ শ্রীসুধাময় দাশগুপ্ত
মূল্য ঃ পঁচিশ পয়সা
এই পুস্তিকাটি কারুকে উৎসর্গ করা হয়নি

এখানে পুস্তিকার প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছে।
পুস্তিকায় লেখকের কোন ভূমিকা ছিল না।
প্রকাশকের একটি ভূমিকা ছিল। তা নিচে দেওয়া হচ্ছে—

দুটি কথা

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের পরিচয় বাঙালী পাঠকের কাছে নিষ্প্রয়োজন। সৃজনী-সাহিত্য এবং প্রবন্ধ রচনা উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সিদ্ধহস্ত। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি বিশিষ্টতার দাবি রাখেন। কেননা তাঁর সকল রচনাই গতানুগতিকতার পথ থেকে মুক্ত ; তিনি একজন স্বাধীনচেতা মানুষ।

বর্তমান পুস্তিকায় তাঁর দুটি রচনা 'প্রাণরক্ষার ও বংশরক্ষার অধিকার' এবং 'এক পুরুষ ফাঁক' সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই লেখা দুটিতেও তিনি তাঁর বিশিষ্ট চিন্তার ছাপ রেখেছেন। বিপ্লবের নাম করে কয়েকজন পথভ্রষ্ট তরুণ আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি যে-আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছেন প্রথম রচনাটিতে অন্নদাশঙ্করবাবু তার বিরুদ্ধেই আপীল করেছেন জনগণের কাছে। নিজের অতীতকে হারিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ যে রচনা করা যায় না সেই কথাই তিনি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় লেখাটিতে আজকের সন্ত্রাসসৃষ্টির বিপদের দিকটি তিনি সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, আজকের মেঘ কেটে গিয়ে নতুনের আলোক দেখা দেবে এই আশার বাণীও তিনি শুনিয়েছেন।

এই লেখা দুটি যথাক্রমে ১৩৭৭ সালের 'শারদীয় নরনারী' ও 'পরিচয়ের' শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শিক্ষার ভবিষ্যৎ

অন্নদাশঙ্কর রায়
প্রকাশক—আশিস্‌গোপাল মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদ বলাই পাল
মূল্য ঃ বারো টাকা

উৎসর্গ—শ্রীমতী কমল দাশ
শ্রীদেবেশ দাশ
যুক্তকরকমলেষু

এখানে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছে। লেখকের ভূমিকা এবং সূচীপত্র মূল গ্রন্থের সঙ্গে দেওয়া হলো।

গ্রন্থে প্রকাশকের তরফে একটি বক্তব্য ছিল। তা নিচে দেওয়া হচ্ছে—

বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অগ্রগণ্য, প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় বর্তমান 'শিক্ষা বিতর্কে' সরাসরি যোগ দেননি বলে অনেকে ক্ষুব্ধ। এদের মূল বক্তব্য শ্রীযুক্ত রায় কেন এই বিতর্কের রাজনীতিতে যোগ দিয়ে পথে নামেন নি ? কেন সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য তাঁর বক্তব্য সাংবাদিকদের দেননি ?

এর উত্তর লেখক এই বইয়ে দিয়েছেন--"আমার কণ্ঠস্বর দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছয় না। কিন্তু কলকাতার মহাকরণ অঞ্চল বোধ হয় তার নাগালের বাইরে নয়। আমাকে তাই শোভাযাত্রা করতে হয় না, জনসভাও করতে হয় না, আইন ভঙ্গ করে কারাবরণও করতে হয় না।···

'শিক্ষা বিতর্কে' এই প্রবীণ বুদ্ধিজীবী কথাসাহিত্যিক পথে না নামলেও তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য প্রবন্ধাকারে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। সেইসব প্রবন্ধের সংকলন বর্তমান গ্রন্থ 'শিক্ষার ভবিষ্যৎ'।